সূচিপত্র

বার্ষিক বসুমতীর সূচিপত্র।

চিত্র-সূচী

ত্রিবর্ণ চিত্র

একবর্ণ চিত্র

রেখাচিত্র—

দেলখোস

শারদীয় উৎসবে আপনার প্রিয়জন-
দের উপহার দিয়া তৃপ্ত হইবেন
এবং তাঁহারাও এই সুগন্ধি উপহার
পাইয়া পরিতুষ্ট হইবেন।

এইচ বসু, পারফিউমার, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঙ্গ চিত্র—

দীর্ঘ চিত্র—

স্বহস্তলিপি চিত্র

মোট চিত্র—

ত্রিবর্ণ চিত্র	৪১
একবর্ণ চিত্র	৮২
রেখা চিত্র	৩৯
রঙ্গ চিত্র	৩২
দীর্ঘ চিত্র	২
স্বহস্তলিপি চিত্র	৭

মোট চিত্র - ২০৩

এ আনন্দোৎসবের শ্রেষ্ঠ উপহার কি

জানেন কি ?

গত ছাপান্ন বৎসর ধরিয়া যে **কুন্তলবৃষ্য তৈল** বাঙ্গালার নরনারীকে ৮ পূজার আনন্দ পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার সুযোগ দিয়া আসিয়াছে, তাহা এবারও আপনার সংসারে আনন্দপ্রবাহ ছুটাইবে।

মূল্য—প্রতি শিশি এক টাকা। ডাক ব্যয় সাত আনা।

বি, এল, সেন এণ্ড কোং

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়—৩৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন, কবিভূষণ।

বিনামূল্যে ঔষধের তালিকা সর্ব্বত্র পাঠান হয়।

আমেরিকান

"এভার রেডি টর্চ্চ লাইট"

ইলেক্‌ট্রিক ফোকাসিং সার্চ্চ লাইট

৫০০ ফুট আলো যায় সম্পূর্ণ প্রত্যেকটীর মূল্য ১৩৲ টাকা
৩০০ ফুট " " " " " ১১৲ টাকা
২০০ ফুট " " " " " ৮৲ টাকা

ষ্ট্যাণ্ডার্ড নন্‌-ফোকাসিং

১০০ ফুট হইতে ১০০ ফুট আলো যায়, মূল্য ৫৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা

সেলফ্ জেনারেটিং টর্চ্চ লাইট

ইহাতে ব্যাটারী আবশ্যক হয় না; বরাবর চলিবে, মূল্য ৯৲ টাকা মাত্র।

আমরা ইলেক্‌ট্রিকের সমস্ত জিনিষ, কারবাইড, ম্যাণ্টেল, সাইকেল লাইট, টর্চ্চ লাইট, হ্যাণ্ডল্যাম্প, পেট্রোম্যাক্স লাইট, ব্যাটারী, বাল্‌ব, ইত্যাদি আমদানী করি এবং পাইকারী ও খুচরা দরে বিক্রয় করিয়া থাকি।

মফঃস্বলের মাল ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সচিত্র ক্যাটালগ ও মূল্য তালিকা পাঠান হয়।

ক্যালকাটা ইঞ্জিনীয়ারিং কোং

হেড অফিস ঃ—৮৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা } ব্রাঞ্চ—১৬১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় যৌবন-পাঠ্য গ্রন্থ—

৭৬ খানি ফটো চিত্রে দেখান হইয়াছে।

যে পুস্তকের আশায় সমগ্র নর-নারী অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেই যুগান্তকারী গ্রন্থ—
ঋতু সহবাস গর্ভও প্রসব সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত ও ৭৬ খানি ফটো চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে রমণীরা যে উপায়ে ইচ্ছামত ৫।৬ বৎসর অথবা ততোধিক সময় অন্তর সন্তান উৎপাদন করেন—কি উপায়ে ও কিরূপ নিয়মে গর্ভ হয়—সুশ্রী যমজ হিজরা মূর্খ দুশ্চরিত্র বিকলাঙ্গ সন্তান কেন হয়—গর্ভ নিয়মিত করিবার ইউরোপীয় সমুদয় বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেষ্ঠ উপায় ও তাহার ঔষধ—স্বামী-স্ত্রীর প্রিয়তম হওয়া—ইন্দ্রিয় চিকিৎসা প্রভৃতি ও ইচ্ছামত গর্ভ—ইচ্ছানুসারে পুত্র কন্যা উৎপাদন—পুত্রোৎপাদক ঔষধ—গর্ভস্রাব ও মৃত-বৎসা নিবারণ—চিরবন্ধ্যা নারীর গর্ভ ও সন্তান উৎপত্তি কিরূপে ইচ্ছাধীন হয় শিখুন। প্রথম শ্রেণীর ছাপা—দশ পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্রসহ পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে দুই খণ্ডে সমাপ্ত বহু হাফটোন ও ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রসহ স্বর্ণাক্ষরে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ১৸০ সাত সিকা। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় প্রকাশ করা যায় না। পুস্তকে অসংখ্য বিষয় আছে। পাঠে মনে হইবে—আপনাদেরই মধুর-মিলন ও মধুর উদ্দেশ্য সফলতায় জন্যই বুঝি—যৌবন পথে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র লিখিলে দশ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তারিত সূচীপত্র পাঠান হয়।

CHASTITY THY NAME IS WOMAN.

সতী সাধ্বী অন্য নাম রমণী তোমার—

সাহিত্যাকাশের ধ্রুবতারা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত—যদি ইহ-সংসার স্বর্গে পরিণত করিয়া প্রকৃত সংসার-সুখে সুখী ও সৌভাগ্যবান হইতে চান, তবে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, জীবনের অবলম্বন, রুগ্নশয্যার সহায়, প্রেমময়ী-সহধর্ম্মিণীকে সর্ব্বাগ্রে ইহা পাঠ করিতে দিন। স্বামী-স্ত্রীর শিখিবার ও স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা, সুচরিত্রা, ও সুগৃহিণী করিবার এবং রীতিনীতি বেশভূষা, লেখাপড়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, গীতবাদ্য, কারুকার্য্য, পাক-প্রণালী, গৃহিণীপনা, শিশুপালন, সেবাশুশ্রূষা, স্ত্রীধর্ম্ম, শিল্প, সহবাস এবং আদর্শ দম্পতীর যাবতীয় শিক্ষার বিষয় ইহাতে আছে। দুই খণ্ডে সমাপ্ত অসংখ্য হাফটোন ও ত্রিবর্ণ চিত্ররঞ্জিত দ্বাদশ সংস্করণ স্বর্ণাক্ষরে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

(মদন-বিজ্ঞান)—সেই বিশ্ববিখ্যাত এম, ডি, ডাক্তারের বিজ্ঞানপূর্ণ যুগান্তকারী গ্রন্থ। ইহাতে কিশোর-কিশোরী, নব-দম্পতী, যুবক-যুবতী, ইন্দ্রিয় পরিচালনা, ঋতু, সহবাস-রীতি, হিন্দুমহিলার গুপ্ত গৃহের ব্যাপার—সুখ-সম্ভোগ, গর্ভ সঞ্চার, ইচ্ছামত সুন্দর দীর্ঘায়ু ও সবল পুত্র-কন্যা উৎপাদন, শশ, মৃগ, বৃষ, অশ্ব—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শাঙ্খিনী, হস্তিনী চারিজাতি স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণ মিলন, শয্যা ও তাহাদের পরস্পর সন্তোষ-বিধান (ফটো চিত্র সহ), সুখ প্রসব, পুরুষ ও রমণীগণের শরীরের কান্তি বৃদ্ধি, স্তন সুশ্রী ও চির-যৌবন রক্ষা করার ঔষধ, জননেন্দ্রিয় বিষয়ক পীড়ার ও স্ত্রী ব্যাধির ডাক্তারী ঔষধাবলী, মেহ, একশিরা, স্বপ্নদোষ, পারার ঘা ধ্বজভঙ্গ, প্রদর, রক্তস্রাব, রজোরোধ প্রভৃতি বিবিধ গুপ্ত রোগের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু হাফটোন চিত্র ও চারিজাতি স্ত্রী-পুরুষের মিলন-ফটো শোভিত স্বর্ণাক্ষরে সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১৸০ সাত সিকা।

বসাক এণ্ড সন্স (বি) ১২৭ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজার উপহার !

ফুটবল

৫নং জায়েণ্ট - - - ১২৸৹
" কুহিনুর - - - ১০৸৹
" স্পেশাল হিরো - ৮৸৹
" স্পেশাল ম্যাচ - ৬৲
৪নং কুহিনুর - - - ৮৲
" স্পেশাল হিরো - ৬৲
" স্পেশাল ম্যাচ - ৪৸৹
৩নং কুহিনুর - - - ৪৸৹

"খোকা"

৩নং - ২৸৵৹ ও ৩৸৹
২নং - ২৸৹ ও ২৸৹
১নং - ১৸৹ ও ২৲
জাসি ৩৲, ৩৸৹, ৪৲
সুইমিং কষ্টিউম ২৲, ৩৲, ৪৲

ব্রাঞ্চ—মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

গৃহ-খেলা ঃ—

লুডো, স্নেক্ লেডার ৸৹, ১৲, ১।৹
ওয়ার্ডমেকিং - - - ৸৹, ১৲, ১।৹
বডি বিল্ডিং - - - ১৲, ১।৹
স্কিপিং রোপ - - - ৸৹, ১।৹
মেকানো (ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা) ৪৸৹, ৭৸

গ্রাজুটেয়স্ ইউনিয়ন

৬৬।৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

পূজার উপহার !

ক্যারমবোর্ড সেট্

১২৸৹, ১৫৸৹, ২৫৸৹, ও ৩৫৸৹

ব্যাডমিণ্টন সেট্

৩৸৹, ৫৸৹, ৭৸৹, ৯৸৹, ১৫৲

ডাম্বেল

স্যাণ্ডো ৮৲, ১০৲, ১২৲, ১৪৲
সিসিল ৬৲, ৮৲, ১০৲,
বয়েজ ৫৸৹, ৭৸৹
স্বদেশী ৫৲, ৬৲, ৬৸৹
ডিভেলপার—১৭৲

পিতলের বাঁশী

১৸৹, ১৸৹, ২৲, ২৸৹

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

—মায়ের পূজায় মায়েদের হাতে উপহার দিবার একমাত্র পুস্তক—

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

দ্বিতীয় সংস্করণ] **ভারতের নারী** [পরিবর্দ্ধিত

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

ফরওয়ার্ড, সার্ভেণ্ট, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, আত্মশক্তি, নায়ক, বিজলী, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রে উচ্চ প্রশংসিত।

একটি অভিমত ঃ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার প্রধান পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋগ্বেদের অধ্যাপক এবং সীতা, কুমারী, পলাস বণ অরণ্যবাস, দুর্গারাণী, Rigvedic India, Regvedic Culture প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা **ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র দাস, এম, এ, পি, এইচ ডি** মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত "গন্ধবণিক" পত্রিকায় স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

"উপেন্দ্রবাবুর এই পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। ইহার একটি পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। পুস্তকান্তর্গত বিষয়ের ন্যায় ইহার আকারও মনোজ্ঞ হইয়াছে। আর্য্য মহিলাগণের কতিপয় সুন্দর চিত্রে গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত। হিন্দু মহিলাগণের **সুপাঠ্য একপ গ্রন্থ বিরল।** প্রথম ভাগে আর্য্যশাস্ত্রে নারীধর্ম্ম, স্ত্রী-শিক্ষা, বিবাহ, সংসার, সমাজীয় কর্ত্তব্য, সন্তান পালন, সন্তানের শিক্ষা, স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিত্তোৎকর্ষসাধন, অতিথিসেবা ও ধর্ম্ম-কার্য্য প্রভৃতি বিষয়গুলি সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ সতীকথায় পূর্ণ। এই ভাগে সতী, পার্ব্বতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, চিন্তা, বেহুলা প্রভৃতি মনস্বিনী আদর্শ স্থানীয় মহিলাগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে ঋষি অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং বারীন্দ্রের "মায়ের কথা" প্রভৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান কুশিক্ষার দিনে এইরূপ একখানি গ্রন্থ গৃহে গৃহে রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক হিন্দু মহিলার অবশ্য পাঠনীয়। অসার কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেল ত্যাগ করিয়া বঙ্গমহিলাগণ যদি এইরূপ পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আত্মমঙ্গল সাধনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের এবং সমাজেরও মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

সুবৃহৎ বাংলা পুস্তকের তালিকা আমরা আদেশ পাইবামাত্র বিনামূল্যে পাঠাইয়া থাকি।

আর, কাম্বে এণ্ড কোং, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিলাসে অবসাদ আসিবে না !

এক দিনে প্রত্যক্ষ ফল !

কেবল উত্তেজনা—কেবল উত্তেজনা

শক্তিহীন—সামর্থ্যহীন জীবনে হতাশ ব্যক্তির আর নিরাশার হতাশ্বাসে আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করিতে হইবে না ! যতদিনের সামর্থ্যহীনতা হউক

অঙ্গ লেপনে আশ্চর্য্য বৃদ্ধি—

অদ্ভুত শক্তিলাভ সুনিশ্চিত !

আশ্চর্য্য-প্রলেপ

সঙ্গে সঙ্গে সেবনীয় বৈদ্যুতিক শক্তিময় মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন মহৌষধ

রতিবিলাস বা অনঙ্গ বটিকা

সুখের স্রোতে নববসন্তের প্রমোদরঙ্গে ভাসিয়া যান—

জীবনে এমন আনন্দ বুঝি আর পান নাই।

মূল্য :—এক মাস ৪৵০ চারি টাকা দুই আনা, ঐ সঙ্গে ৭ সাত দিনের লেপ বিনামূল্যে বিদেশে মাশুলাদি স্বতন্ত্র। রতিবিলাস না লইলে কেবল মাত্র লেপ সডাক ২॥০ আড়াই টাকায় ৭ সাত দিন মাত্র।

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

এই স্থানে নিম্নলক্ষণাক্রান্ত রোগীসমূহ এবং যে সকল রোগী শত শত ইনজেকসন শেষ করিয়া অবশেষে যাঁর বাতরক্ত চর্ম্মরোগ এবং

ধবল ও কুষ্ঠ

জন্য নিম্নলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা ভিন্ন উক্ত রোগ হেতু যাহাদের সর্ব্বাঙ্গে সাদা, লাল, কাল, বাদামী, তাম্রাভ, চাকা, অসমতল দাগ, দদ্রুবৎ দাগ, স্পর্শহীনতা, কার্শ্যভাব, বোলতা, ভীমরুলদষ্ট দাগের ন্যায় উচ্চ দাগ প্রকাশ, আবার মিলাইয়া যাওয়া, চর্ম্মবিকৃতি, মৎস্য শল্ক উঠামত চর্ম্ম, সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা অথবা বোলতা, ভীমরুল এবং পীপিলিকা দষ্টবৎ যাতনা, পিপড়ে সড় সড় করিয়া চলিতেছে এমন বোধ হওয়া, জানু প্রভৃতির যাতনা, নাক, কান, আঙ্গুল অথবা সর্ব্বাঙ্গের শোথ, হস্ত ও পাদতলের চর্ম্ম কর্কশ, ক্ষত হইলে সহসা শুষ্ক না হওয়া, বিবিধ স্ফোটকোৎপত্তি, রতিস্পৃহাশূন্যতা, শুক্রদোষ, চক্ষুর দোষ, সর্ব্বাঙ্গের গুটিকাযুক্ত চর্ম্ম, সঙ্কুচিত চর্ম্ম, দেহ পচা ঘায়ের জন্য খসিয়া যাইতেছে, ক্ষতে পোকা হইয়াছে, বাগী, গর্ম্মি ও পারা-বিষে জর্জ্জরিত বা কোন প্রকার কৌলিক বিষ দোষযুক্ত, যাহারা প্রমেহ ও উপদংশবিকৃতি জন্য কষ্টভোগ করিতেছেন, তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ দিন মাত্র হাওড়া কুষ্ঠকুটীরে এই অত্যাশ্চার্য্যমতান্তর চিকিৎসার গুণ পরীক্ষা করুন।

ঠিকানা—কুষ্ঠ ধবলাদি চর্ম্মরোগতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন কবিরাজ এম. ডি, এইচ, পামিষ্ট। হেড আফিস—হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর (বি) পোষ্ট বক্স নং ৭ খুরট রোড, হাওড়া। শাখা আয়ুর্ব্বেদ সমবায় (বি) ১১৬।১১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। (সেন্ট্রাল এভিনিউ জংসন)

আনন্দ সংবাদ ! অপূর্ব্ব সুযোগ !!

সাভারের কবিরাজ কে ? খাঁটী ঔষধ কোথায় ?

বঙ্গের খ্যাতনামা ভিষক্‌প্রবর স্বর্গীয় গুরুচরণ দত্ত কবিরাজ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বনামধন্য চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীগোপীনাথ দত্ত ভিষগরত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত জগদ্বিখ্যাত—

ঢাকা "গুরুচরণ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়" ঢাকা

Dacca—গোপীনাথ দত্ত কবিরাজ ষ্ট্রীট, পোষ্ট অফিস ঢাকা—Dacca

আমাদের অভ্রান্ত ব্যবস্থা ও খাঁটী ঔষধের কথা আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, ভুক্তভোগী মাত্রেই সম্যক্‌ জ্ঞাত আছেন। বিজ্ঞাপনের কুহকে পড়িয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ হারাইবেন না। সাবধান আমাদের অনুকরণ করিয়া অনেকেই নিরীহ গ্রাহকদিগকে প্রতারণা করিতেছে। নিম্নের নাম ও ঠিকানা কখনও বিস্মৃত হইবেন না। আমরা কদাচ এজেণ্ট নিযুক্ত করি না এবং কোথাও আমাদের আর ব্রাঞ্চ নাই। মনে রাখিবেন আমরাই সাভারের কবিরাজ।

(আইন মতে রেজেষ্ট্রী করা, অন্যের অপরিজ্ঞাত ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ)

১। "সূতিকা হেমাঙ্গ সুন্দর"—৩॥ বটীকায় সর্ব্ববিধ সূতিকা রোগ আরোগ্য হয়। ৩॥ বটী ৩॥০ টাকা।
২। "মহাবাত কুলান্তক ঘৃত"—বাত বেদনার এমন ঔষধ আর নাই। শিশি ২৲ টাকা। আর আমাদের—
৩। চ্যবনপ্রাশ জগতে অতুলনীয়। প্রতি সের ৮৲ টাকা।
৪। প্রকৃত মকরধ্বজ—আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরের উজ্জ্বলতম রত্ন ! প্রতি তোলা ৮৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় পথ্যাপথ্য ও মুষ্টিযোগ সম্বলিত ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। হ্যাণ্ডবিল, বিবিধ রঙ্গিন ছবি, পঞ্জিকা প্রভৃতি সর্ব্বদা বিনামূল্যে বিতরণ করি। পত্রাদি লিখিবার প্রকৃত ঠিকানা মনে রাখুন :—

প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিদ্যাবিনোদ কবিরাজ—শ্রীযশোদানন্দ দত্ত, বি-এ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী বিদ্যাতীর্থ।

কবিরাজ—শ্রীআশুতোষ দত্ত, বি-এ, ভিষগরত্ন। গোপীনাথ দত্ত কবিরাজ ষ্ট্রীট, পোষ্ট ঢাকা।

টেলিগ্রাফ করিবার সংক্ষিপ্ত ঠিকানা : "কবিরাজ—ঢাকা" !

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহজ উপায়।

বিধাতার দান এবং শোভাই প্রকৃতির প্রাণ। প্রতি ঋতুতে প্রকৃতির তাই নব নব সজ্জা। নারী-প্রকৃতির মধ্যেও এই শোভা এবং সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই বিধাতারই অভিপ্রায় এবং সৌন্দর্য্য দ্বারা হৃদয় আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা, ইহার একটি অতি স্বাভাবিক এবং মজ্জাগত স্বধর্ম্ম।

স্বাভাবিক কোমলতা এবং হৃদয়ের মাধুর্য্য বাহির হইতে বোঝা যায় না, তাই দৈহিক শ্রী দিয়াই অনেক সময় রমণীর সম্বন্ধে প্রথম ধারণা করা হয়। চর্ম্মের স্বাস্থ্যই সেই সৌন্দর্য্য-বিচারের মূল উপাদান। **সুন্দর হইয়া জন্মান মানুষের আয়ত্বাধীন নহে কিন্তু শারীরিক শ্রী এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে সকল সময়ে দৈবের উপর নির্ভর করিতে হয় না।**

সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় অধিক সময় ক্ষেপণ করা সকল রমণীর পক্ষে সম্ভব নয় বিবেচনায়, নর-নারীর শরীরের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শ্রী কিসে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার উপায় চর্ম্মতত্ত্ববিৎ বিশেষজ্ঞের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রতি রাত্রে সামান্য মাত্র যত্ন এবং অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক রমণীই আপন আপন কমনীয় শ্রী বৃদ্ধি করিতে পারেন।

প্রসাধনে সকল দেশে সাবানই বেশী প্রচলিত, কিন্তু, সাবানে শুধু শরীরের উপরটাই পরিষ্কার হয়, লোমকূপের ময়লা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। কিন্তু নির্ম্মল এবং নিয়মিত ভাবে পরিষ্কৃত লোমকূপের উপরই চর্ম্মের স্বাস্থ্য এবং মুখশ্রীর উজ্জ্বলতা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে।

প্রতি রাত্রে নিয়মিত ভাবে অল্প গরম জলে হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া ওটীন ক্রীম ব্যবহার করাই এই ধূলিমলিন লোমকূপগুলি পরিষ্কারের একমাত্র উপায়। সামান্য ক্রীম আঙুলে করিয়া লইয়া চর্ম্মের উপর ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করুন। কিছুক্ষণ পরে তোয়ালেতে মুছিয়া ফেলিলে দেখিবেন

সাবান জলে যে ময়লা দূর করিতে পারে নাই, সেই সমস্ত ময়লা তোয়ালেতে উঠিয়াছে।

সাবান যে ময়লা পরিষ্কার করিতে অক্ষম, ওটীন ক্রীম সেই অন্তর্নিহিত মলিনতা দূর করিয়া লোমকূপগুলির নিজ নিজ বৃত্তির সহায়তা করে। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শ্রী যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ওটীন ক্রীম অপরিহার্য্য। শীতের বাতাসে চাম্‌ড়া কর্কশ হইয়া ফাটিয়া যায় এবং গ্রীষ্মের রৌদ্রে অনেক সময় লাল হইয়া জ্বালা করে। এই দুইটি বিপরীত-ধর্ম্মী উপসর্গই ওটীন ক্রীম শীঘ্র ও অতি সহজভাবেই দূর করে। স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে, বিশেষভাবে দেহের সুস্থ মসৃণতা রক্ষার জন্য তৈল একেবারে অপরিহার্য্য—ইহা শীত এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অধিক শীত বা গ্রীষ্মে আমাদের দেহের সেই স্বাভাবিক তৈল নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ওটীন ক্রীম। এই জন্যই আইস্‌ল্যাণ্ড্‌ এবং ভারতবর্ষ উভয় স্থলেই ইহার সমান আদর।

ওটীন ক্রীম বিশুদ্ধ তৈলে প্রস্তুত। ইহাতে গ্লীসেরীণ অথবা চর্ব্বিজাতীয় কোনও পদার্থ না থাকায় অনাবশ্যক কেশাধিক্যের আশঙ্কা নাই। অধিক শীত এবং তাপ হইতে শরীর রক্ষা করিতে যতটুকু তৈলের প্রয়োজন, ওটীন ক্রীম নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে তাহা পাওয়া যায়। রাত্রিই ওটীন ক্রীম ব্যবহারের উপযুক্ত সময়। ইহাতে মুখের যাবতীয় কর্কশ ভাব এবং মলিনতা মন্ত্রপ্রয়োগের মত অতি সহজেই বিদূরিত হয়।

কার্য্যগতিকে যাঁহাদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় অথবা যাঁহাদের বাহিরে বাহিরে শীতাতপ সহ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, এই উভয় শ্রেণীর লোকের পক্ষেই ওটীন ক্রীম সমান উপকারী।

দাড়ি-কামানোর পর, তজ্জনিত জ্বালা এবং অস্বস্তি দূর করিতে ওটীন ক্রীমের মত আরাম-প্রদ প্রলেপ আর কিছুই নাই। ওটীন ক্রীম যে শুধু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে। ব্রণ, মেছ্‌তা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ ইহার ব্যবহারে নিরাময় হয়।
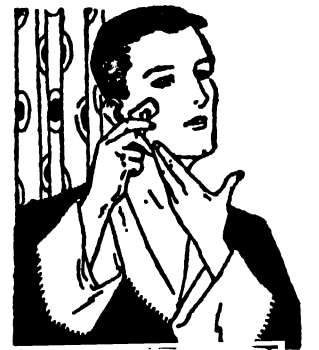
শিশুদিগের চর্ম্মে ঋতু-পরিবর্ত্তনের প্রভাব অতি সহজেই প্রকাশ পায়। শীতের বাতাস লাগিয়া তাহাদের চাম্‌ড়া শুষ্ক ও কর্কশ হইয়া যায় এবং রৌদ্র লাগিলে সেইগুলি আবার ফাটিয়া, উঠিয়া যাইতে থাকে ওটীন ক্রীমই এই কষ্টদায়ক অবস্থা হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র নিরাপদ উপায় মশা, মাছি বা অন্য কোনও পোকা-মাকড়ের কামড়ও ওটীন ক্রীম ব্যবহার করিলে সারিয়া যায়

তুষার-কণার মত ইহা শীতল, সুন্দর এবং ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই ইহার নাম "স্নো"। অল্প পরিমাণ ওটীন স্নো লইয়া চামড়ার উপর ঘর্ষণ করিলে ইহা অবিলম্বে মিলাইয়া যায় এবং তাহার ফলে সেই স্থানটি চমৎকার শীতল, কোমল এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠে। রৌদ্র এবং শীতল বাতাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দিনের বেলাতেই ইহার বহুল প্রচলন। কিন্তু দিনে ওটীন স্নো ব্যবহার করিলেও চর্ম্মের একান্ত আবশ্যকীয় তৈল-সরবরাহের এবং লোমকূপগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য রাত্রে **ওটীন ক্রীম** ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সমস্ত গুণ থাকিলে যে কোনও ফেস্ পাউডার উচ্চ শ্রেণীর মুখরাগ বলিয়া পরিগণিত হয়, ওটীন ফেস্ পাউডারে সে সমস্তগুণই প্রচুর পরিমাণে আছে। মুখের উপরকার তৈলাক্ত ভাব দূর করিবার জন্যই পাউডার ব্যবহৃত হয়। ওটীন ফেস্ পাউডারে তাহা অতি উত্তম ভাবেই সম্পন্ন হয়। ইহা অতি মৃদু সৌরভযুক্ত এবং এত মোলায়েম যে মুখের রঙের সঙ্গে প্রায় মিলাইয়া যায় এবং অনেকক্ষণ থাকে। সেইজন্যই অন্যান্য পাউডারের মত ইহা বারে বারে মাখিতে হয় না। চর্ম্ম-স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে এমন কোনও পদার্থ ইহাতে নাই।
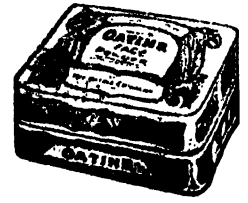
শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া ঘামাচি, প্রভৃতি চর্ম্মের যাবতীয় প্রদাহ আরাম করিতে ওটীন ট্যাল্‌কম্ পাউডার অদ্বিতীয়। সুকুমার শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী এবং একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রসাধনের জন্য এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সাবান আবিষ্কৃত হইয়াছে, **ওটীন সাবান** তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। যাবতীয় বিশুদ্ধ পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহা প্রস্তুত হয়। চর্ম্মের ক্ষতি করে এরূপ কোনও ক্ষারজাতীয় বা অন্য কোনও পদার্থ বা রং করিয়া মন ভুলাইবার কোনও আয়োজন ইহাতে নাই। এই সাবান অতি মৃদু সুগন্ধযুক্ত এবং সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া শিশুদের জন্যও অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে।
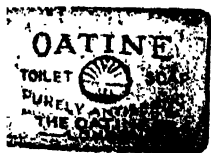
ওটীন শ্যাম্পু পাউডার।

রমণীর সৌন্দর্য্য কেশে, সেই কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে "ওটীন শ্যাম্পু পাউডার"। সকলের চুল সমান নয়, কাহারও চুল শুষ্ক ও কর্কশ, কাহারও বা তৈলাক্ত। সুতরাং সাধারণ শ্যাম্পু পাউডার বা মাথা ঘষায় সমান উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। বহুদিনব্যাপী এই অভাব দূর করিবার জন্য ওটীন কোম্পানী এই দুই শ্রেণীর চুলের উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ শ্যাম্পু পাউডার প্রস্তুত করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ নারিকেল তৈলে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার ব্যবহারে মাথার মরা মাস, খুস্কি প্রভৃতি দূর হয় এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই কেশের বর্ণ এবং গুচ্ছের উন্নতিতে ইহার উপকারিতা বেশ বোঝা যায়। ইহা অতি চমৎকার সৌরভযুক্ত। লাল এবং সবুজ খামে পাওয়া যায়।

[illegible]

উচ্চ শ্রেণীর কেশতৈলের সকল গুণই ইহাতে বর্ত্তমান অথচ মাথায় মাখিলে ইহা দেখা যায় না। ব্রীলিয়্যান্টাইন্ ব্যবহারে কেশ উজ্জ্বল এবং পুষ্ট হয়। চুলের রঙ্ গাঢ় হয়।

মুখের দুর্গন্ধ এবং যাবতীয় দূষিত বীজানু বিনষ্ট করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ইহাতে দন্ত মুক্তার মত সুন্দর এবং উজ্জ্বল হয় অথচ দন্তের উপরকার এনামেল নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। ওটীন দন্ত-মঞ্জন ব্যবহার করার পর চমৎকার আরাম বোধ হয়।

[illegible]

দাড়ি কামাইবার অন্যান্য সাবান হইতে ইহাতে অধিক আরামপ্রদ এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী ফেনা হয় এবং ওটীন ক্রীম মিশ্রিত থাকায় অন্য সাবানের পক্ষে যাহা অসম্ভব কামাইবার পর সেই আরাম এবং তৃপ্তি পাওয়া যায়।

[illegible]

ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ফেনা হয় এবং সহজে মুখের উপর শুকাইয়া যায় না। দাড়ি কামাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রীম আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ।

[illegible]

ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্য এবং নবীনতা আনয়ন করিতে ইহার মত প্রীতিপ্রদ আর কিছুই প্রস্তুত হয় নাই। যে কোনও প্রকারের প্রদাহ ইহার প্রলেপে শীঘ্র দূর হয়।

ওটীন বাম।

ফাটা হাত মুখ সারাইতে ইহার মত উপকারী ঔষধ আর নাই। লোমকূপস্থিত ময়লা পরিষ্কার করিয়া কঠিন কর্কশ চামড়া কোমল, মসৃণ এবং উজ্জ্বল করিতে ওটীন বাম অদ্বিতীয়।

দি কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী, প্রিণ্টার্স কর্ত্তৃক রচিত ও মুদ্রিত।

৺পুজার বিপুল আয়োজন!

সকল প্রকার তৈয়ারী জামা ও পোষাক পরিচ্ছদ মনের মত লইতে হইলে, আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। আপনাদের চিরপরিচিত ও ধর্ম্মাশ্রিত—

২০২।৫নং হ্যারিসন রোড, [বড়বাজার] কলিকাতা

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ১৬নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

ঔষধের অকৃত্রিমতা সাধুতার ও কার্য্যপরিচালনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

সব ঔষধই টাট্‌কা | প্রতি ড্রাম /৫ পাঁচ পয়সা

নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস্, সুগার অফ মিল্ক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয়।

কলেরা বা গৃহ-চিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহ-চিকিৎসা ও ফোটা ফেলিবার যন্ত্রসহ

২৪, ৩০, ৪৮ শি, ৬০, ১০৪শি, পূর্ণ যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫॥০, ৬৸০, এবং ১১॥০। মাশুল স্বতন্ত্র।

বিনামুল্যে নমুনা বিতরণ

জ্বরারিণ ট্যাবলেট

৩০ বৎসরব্যাপী গবেষণার ফলে, এস, সি, রায় বি, এ, রাসায়নিক কার্য্যকারক আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতে কুইনাইন নাই। জ্বরের সময় সেবন করিলে, তৎক্ষণাৎ জ্বর কমে ও ২।৩ দিনে রোগী জ্বরমুক্ত, কর্ম্মঠ হয়। ৪।৫ বৎসরের লিভার ও প্লীহা ৭ দিনে আরাম হইয়াছে। সাধারণের পরীক্ষার্থ ট্যাবলেটের নমুনা মুল্য ৵০ মাত্র ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৩৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোং'র

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বনফিল্ডস্ লেনের মোড়, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ ঔষধালয়সমূহ—৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার। ২৫৩।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ। ৬৬।৪ নং রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা। মাদার টিঞ্চার ড্রাম ।০ আনা।

কলেরা চিকিৎসার ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, পুস্তক, ড্রপারসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩।০, ৫।০, ৬।৶০, ১০৸৶০ আনা। মাশুল অতিরিক্ত দিতে হয়। হোমিওপ্যাথিক—গার্হস্থ্য চিকিৎসা (বাঁধান) মূল্য ॥৶০ আনা, মাঃ ।০ আনা। ওলাউঠা চিকিৎসা (বাঁধান) মূল্য ।০, মাঃ ৶০ আনা। চিকিৎসা-রত্নাকর (বাঁধান) ২॥০, মাঃ ॥০ আনা। স্ত্রী-চিকিৎসা (বাঁধান) ১।০, মাঃ ।/০ আনা।

কবিরাজ
চন্দ্র কিশোর সেন মহাশয়ের
জবাকুসুম তৈল
কলুটোলা স্ট্রীট
কলিকাতা
JABAKUSUM TAILA
মূল্য ১ টাকা RE.1

পূজার সাজ "জবাকুসুম"

শতবৎসরের পরীক্ষিত!
বাদগেট এণ্ড কোংর
পারফিউমড্ ক্যাষ্টর অয়েল।
সর্ব্বজন পরিচিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ তৈল।
মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ইহা অদ্বিতীয় সুবাসিত তৈল।
CASTOR OIL
সমস্ত ঔষধালয়ে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য :—
বাদগেট এণ্ড কোং,
কেমিষ্টস
কলিকাতা।

মহাপূজায় ঘরে ঘরে আনন্দের ফোয়ারা!

সর্ব্ববিধ সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ!!

* * নূতন মেসিন * *

* * নূতন রেকর্ড * * *

রণ মডেল্

২১নং	৮৫৲
২৩নং	১১২॥০
২৫নং	১৬০৲
৩০নং	১৯০৲

টেবেল গ্র্যাণ্ড মডেল্

১০৩নং	ওক্	১৫০৲
১০৩নং	মেহগনি	১৬০৲
১০৯নং	ওক্	২০০৲
১১১নং	মেহগনি	২৬০৲
২২৬নং	মেহগনি	৩০০৲
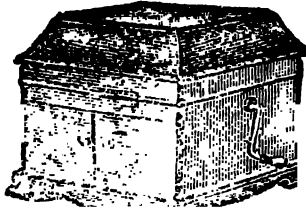
আগামী পূজার মধ্যে অর্ডার পাঠাইলে প্যাকিং খরচ এবং মাশুল লাগিবে না। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়।
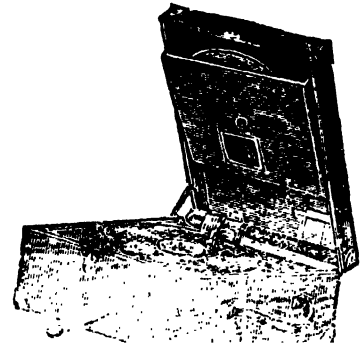
পোর্টেবল মডেল্

১০১নং ১৩৫৲

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

দি গ্রামোফোন প্যালেস এণ্ড মিউজিক্যাল ভ্যারাইটিজ

৮০নং লোয়ার চিৎপুর রোড, [সিন্দুরিয়াপটীর চৌমাথা] কলিকাতা।

ফোন ৫০২ বড়বাজার। টেলিগ্রাম "Kecidey" পোষ্ট বক্স ৬৭৯৯

গোলোক-বিহারী

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবাণীচরণ লাহা
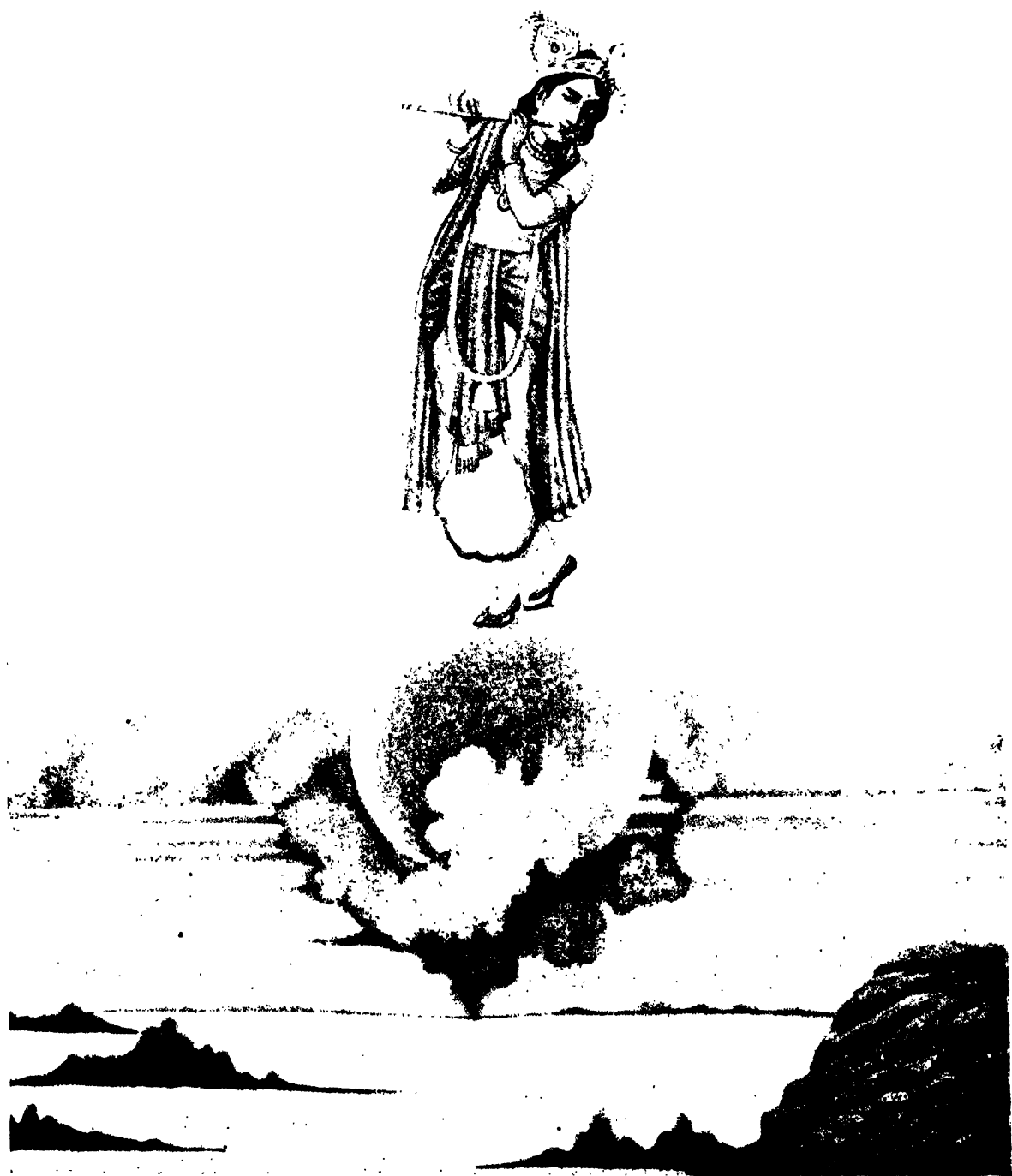
PURE ALUMINIUM
THE CROWN
CROWN BRAND
Aluminium
WARE MANUFACTURERS
JEEWAN LAL & Co.
55, CANNING STREET,
CALCUTTA.
Branches:—Bombay, Rangoon,
Madras, Rajahmundry
& B70/71, Municipal Market,
CALCUTTA.
Please turn over.
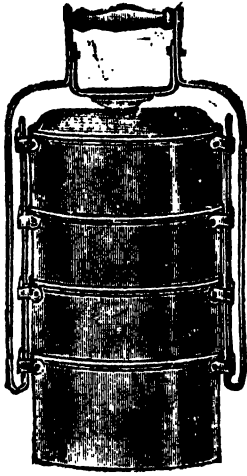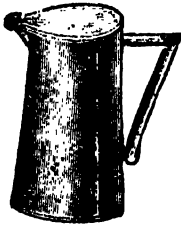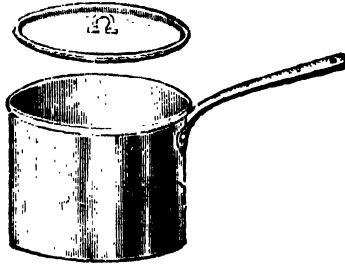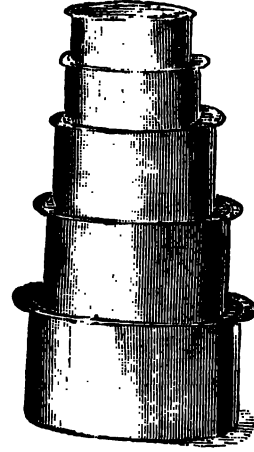
ফিরে চাও !

১

পাছু ফিরে চাও মন,
দেখ চিত্র পুরাতন,
শরতে হরিৎক্ষেত্র নেত্র-তৃপ্তিকর।
ভাদ্র-শেষে আর্দ্র ধরা,
নব রৌদ্রে মনোহরা,
শরদিজ সরসিজ শোভে সরোবর ॥

২

সবুজে সাজানো ঘাস,
শুভ্র হাসি হাসে কাশ,
ফুটেছে দোবুটি বহু বিচিত্রবরণ।
শাখায় মাখানো পঙ্ক,
ফুল্লমুখী স্থল-পদ্ম,
কেতকী-শেফালি গন্ধে আনন্দিত মন ॥

৩

আজো শত বর্ষ নয়,
ছিল দেশ হর্ষময়,
স্বল্পেতে সন্তুষ্টচিত্ত গৃহস্থ বাঙ্গালী।
গোলাভরা ছিল ধান্য,
অন্নদানে গণ্য-মান্য,
রিশের নেশায় নয় হাসির কাঙ্গালী ॥

৪

কাম্য ছিল গ্রাম্যবাস,
বাস্তুপূজা জমী-চাষ,
প্রকৃতি মাতারে সেবি' অন্ন আহরণ।
একমাত্র ছিল গর্ব্ব,
গৃহে তার নিত্য পর্ব্ব,
দিন-রাত পাতা পাত পরের কারণ ॥

৫

সত্য বটে দেশ-ভক্তি,
বাড়ায়ে বাক্যের শক্তি,
ঐক্য তরে ছোটে নাই পঞ্জাব অঞ্চলে।
উপাসী পিসী-মা কাঁদে,
মাসী কোথা ভাত রাঁধে,
রুগ্ন ভাগ্নে চাপে ভগ্নী-গ্রন্থিত-অঞ্চলে ॥

৬

তবু হে ফিরাও দৃষ্টি,
দেখ ছিল কত মিষ্টি,
বেষ্টিত পল্লবীবল্লী পল্লীর ভবন।
খাটো ধুতি গাড়ু হাতে,
পাছু কত লোক সাথে।
মোটর কোটরে যাও চায় বা ক'জন ॥

৭

এই যে আশ্বিন মাস,
দাস-কর্ম্মে অবকাশ,
আজি যে খুঁজিছ মাত্র দিন গণনায়।
গৃহ যেন গ্রহ জ্ঞান,
পলাইলে পরিত্রাণ,
কন্সেসনে সেস্সেসন প্রাণ পেতে চায়॥

৮

সেকালে বিকালবেলা,
বসিত মেয়ের মেলা,
অলস ললিত অঙ্গে কলসী কাঁকালে।
তাদেরো রূপের ঠাট,
আলোকি' পুকুরঘাট,
আনিত অধরে হাসি জলেতে তাকালে॥

৯

তারা-ও কহিত কথা,
জানাইত মনোব্যথা,
হাসা-কাঁদা ভালবাসা আছে চিরকাল।
"হোলো না নার্কোল পাড়া,
ক'দিন দিতেছি তাড়া,
বোলে বোলে সত্যি, সই, ব্যথা হোলো গাল॥

১০

"দেখ না কেমন কুণো,
কবে বা কুরিব ঝুনো,
মনে করে না ডুগড়া শুয়ে শুয়ে হয়!
ভেজে নিতে খই ক'টা,
এত কি কাযের ঘটা,
গুড়েতে মুড়কিমাখা বেশী কিছু নয়॥"

১১

লুণের দারোগা স্বামী,
বলেন বিমল-মামী,
"ভাবি বাছা, পাছে আসে বড় নদী বেয়ে।
বেগুন-বাড়ীর বিলে,
নৌকো চলে লগি দিলে,
উর্দ্ধে থেকে পশু এল মোল্লারা ছু'ভেয়ে॥"

১২

শেফালির বোঁটা খুলে,
কেউ বা রেখেছে তুলে,
ফোটায় গরম জলে রঙাবে বসন।
ভাবিনী বুঝেছে ভেবে,
বিরাজ তাবিজ নেবে,
না নিয়ে সে চেলি চা'বে রূপার রসন॥

১৩

পঞ্চমী প্রভাত হ'তে,
চেয়ে দেখ পল্লী-পথে,
উল্লি-ধুল্লি ছেড়ে প'রে কোরা ধুতি-শাড়ী।
দলে দলে ছেলে-মেয়ে,
মল কি পাদুকা পেয়ে,
সাজানো প্রতিমা দেখে ফেরে বাড়ী বাড়ী॥

১৪

প্রবাসী এ শুভক্ষণে,
ফিরেছেন ভদ্রাসনে,
প্রতিবেশিগণে ঘিরে করে আলাপন।
মালদহ আমসত্ত্ব,
বাঁটিছেন গোপী দত্ত,
চণ্ডী-দা নাটুরে মোণ্ডা করে বিতরণ॥

১৫

আনন্দে রন্ধনশালা,
হাসিমুখে ক'রে আলা,
আধ-ভিজে চুল-মূল গুটায়ে গোলায়।
শাশুড়ী-ননদ-বধূ,
নিধু-বিধু-কাদু-সদু,
চড়ান তিজেল-তোলো তেল দে খোলায়॥

১৬

বর্দ্ধমেনে-বউ সাধে
কলায়ের দা'ল রাঁধে
কাটোয়ার কাকী করে ডাঁটা চড়্চড়ি।
গুগলি, হুগলীর মেয়ে,
রাঁধে সে আপনি চেয়ে,
মোচা-ঘণ্ট থোড়-বড়ি ভাজে ফুলবড়ি॥

১৭

বরিশেলে ঠাকুরঝি,
মসুরে ঢালেন ঘি,
ওতোরপাড়া-পিসী ঝাড়ে অড়রের দাল।
বীরভূমে উমো-মাসী,
রেখেছেন ক'রে বাসি,
রুয়ের অম্বল রেঁধে দিয়ে সর্ষে-ঝাল॥

১৮

পাবনার নাতনী নেতো,
বানা'য়ে বেতের তেতো,
কড়ায় চড়ায়ে দেছে ইলিশের ঝোল।
কুঁড়ুলী আঁছুলে-দিদি,
শিল্পকর্ম্মে গুণনিধি,
ডাবাভরা ভাবা দই ঢেলে করে গোল॥

১৯

পূজাবাড়ী ভারি জাঁক,
মেঠাই গড়ার পাক,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে লোক খেয়ে নিয়ে খুসী।
অতি দীন-দুঃখী যারা,
নূতন বসন তারা,
পরেছে, পড়শী দেছে না দেখায়ে ঘুসি॥

২০

বাতাসেতে পূজাবোধ,
পূজো পূজো ওঠে রোদ,
আমোদে আনন্দহাট ঘাটে-মাঠে ঘরে।
আনন্দময়ীর নামে,
কি আনন্দ বঙ্গধামে,
দেখ চেয়ে ফিরে, যেও দেওঘরে পরে॥

২১

ভুলে গেছে জাতিভেদ,
রোদন বেদন খেদ,
অবিবাদে আনন্দিত হিন্দু-মুসলমান।
চাষী কিংবা জমীদার,
পুলিসের জমাদার,
হাড়ী-মুচি-দুলে-পোদ-বামুন সমান॥

২২

আনন্দিত হিন্দু তুল্য
তমু শেখ পানাউল্লো,
ফুলমুখী ফতি বিবি ডুরেপরা ছবি।
বেজেছে পূজার ঢোল,
উঠেছে আনন্দরোল,
রাত্রে হবে যাত্রা গান চণ্ডী তর্জা কবি॥

২৩

পাছু ফিরে চাও মন,
বারান্দা তোমার বন,
হারায়ে সন্তোষ-ধন গৃহ অন্ধকার।
টাকা টাকা টাকা ডাক,
বাহিরে বাহারে জাঁক,
অন্তরেতে নিরন্তর ওঠে হাহাকার॥

২৪

হয়েছে বিছানা বাঁধা,
নিয়েছ হোটেলে রাঁধা
কট্‌লেট্ ক্রুকেট্
ডিম কৌটায় ভ'রে।
ডাকে তোমা ওল্টেয়ার,
ঘর-বাড়ী ডোঙ্কেয়ার,
শান্তি চর্চ্চা ক'রে এস খর্চা কিছু ক'রে ;—
আরাধ্য না হ'লে দুর্গা দুর্গতি কে হরে॥

শ্রী [signature]

পাঁচ ছেলের গল্প

আমি আজ একটি গল্প বলিব। সেই—সেই—পুরান গল্প। ঠান্‌দিদিদের কাছে শোনা গল্প, তাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের ঠান্‌দিদিদের কাছে। তাঁরা তাঁদের ঠান্‌দিদিদের কাছে, তারা তাঁদের;—এই রকম ক'রে গল্প ঠানদিদিতে ঠানদিদিতে চলিয়া আসিতেছিল। এখন ইংরাজীর চোটে ঠানদিদিদের গল্প আর ভাল লাগে না, শোনাও যায় না। এই ঠান্‌দিদিদের গল্প যখন বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে জাতক! যখন মহাযানীরা বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে অবদান। যখন ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তখন হইয়াছে সংবাদ। আবার বিষ্ণুশর্ম্মার মুখে হইয়াছে পঞ্চতন্ত্র। এখনকার পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকদের কাছে হইয়াছে ব্রতকথা। এ সব গল্পে প্রেমের ছড়াছড়ি নাই, প্রেমের বীজ গজায় না ও ক্রমে ফলফুল ঝাঁকড়িয়া পড়ে না। এ লেখায় কৌশল নাই, বাঁধুনী নাই, রকমারি নাই। নিভাননী, নগেন্দ্রবালা, বিদ্যুৎবরণী, তড়িৎ-সৌদামিনী, অমিয়ানিভা, চপলাপ্রভা প্রভৃতি এ কেলে বাহারে নাম নাই। চন্দ্রিমার বর্ণনা নাই, বসন্তের হা-হুতাশ নাই। আছে শুদ্ধ একটি গল্প। সেকালে মিষ্ট লাগিত। লোক পড়িত, শুনিত। এ কালে যাঁদের ভাল না লাগে, পড়িবেন না, শুনিবেন না। গল্পটি এই :—

এক আছেন রাজপুত্র, তাঁর আছেন চার বন্ধু—গুরুপুত্র, পাত্রের পুত্র, পুরুত-পুত্র, আর কোটালের পুত্র। তাঁদের বয়স এক, বাড়ী একখানে, এক পাঠশালায় পড়া, একত্রে খেলা করা, যেন পাঁচটিতে এক। রাজা ছেলেগুলিকে ভালবাসেন, গুরুঠাকুর তাদের ভালবাসেন, পাত্র ভালবাসেন, পুরুত ভালবাসেন, কোটালও ভালবাসেন। সকলেই পাঁচটি ছেলেকে আপনার ছেলের মত দেখেন। চাকররা ভালবাসে, কাছারীর লোকজন ভালবাসে, প্রজারা ভালবাসে এবং যে দেখে, সে-ই ভালবাসে। কিন্তু পাঁচ জনের প্রকৃতি পাঁচ রকমের। তাঁরা পাঁচ রকম জিনিষ ভাল করিয়া শিখিলেন, আপনার মনোমত জিনিষ শিখিলেন। রাজপুত্র শিখিলেন পুণ্যকর্ম্ম, দান, ধ্যান, অতিথিসৎকার, সরলতা, অমায়িকতা, সত্যকথা বলা ইত্যাদি। গুরুপুত্র শিখিলেন বিচার করা, সূক্ষ্ম হইতে আরও সূক্ষ্মে যাওয়া; শিখিলেন শাস্ত্র, শিখিলেন বুদ্ধি কেমন করিয়া মাজিয়া লইতে হয়; শিখিলেন শাস্ত্র কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। পুরুতের পুত্র শিখিলেন শিল্প, ৬৪ কলা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি। পাত্রের পুত্র দেখিতে সুন্দর ছিলেন। তিনি শিখিলেন চেহারাটা কেমন করিয়া খোলে তাই করিতে, রূপের কেমন করিয়া বাহার দিতে হয়। কোটালের পুত্র শিখিলেন কুস্তী, কসরৎ, লাঠীখেলা ইত্যাদি এবং শিখিলেন কেমন করিয়া দেহে জোর করিতে হয়, আর কেমন করিয়া সে জোর কাযে লাগান যায়।

বৌদ্ধ বইএ বলে, ইহাদের বাড়ী কাশী। ইহাদের প্রকৃতি অনুসারে নাম হইয়াছে, পুণ্যবন্ত, প্রজ্ঞাবন্ত, রূপবন্ত, শিল্পবন্ত আর বীর্য্যবন্ত। রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড দেউড়ী, তারই ভিতরে অন্তঃপুর, হাতীশালা, ঘোড়াশালা, গোশালা, কাছারী, দেওয়ানখানা ইত্যাদি রাজার সমস্ত মহল। দেশের মধ্যে বড় রাস্তার উপর রাজার বাড়ী। এক দিকে রাজার বাড়ী—আর এক দিকে সব দেবমন্দির, মাঝখানে প্রকাণ্ড রাস্তা। রাস্তা প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ একেবারে দুই তিনখানা টানা যায়। মন্দিরগুলিতে বিষ্ণু আছেন, শিব আছেন, কালী আছেন, কার্ত্তিক আছেন, গণেশ আছেন, ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি আছেন। প্রত্যেক মন্দিরে ছোট-বড় নাটমন্দির, সেইখানে দেশের লোক ব'সে গল্প করে। দেবতার সাম্‌নে বসিয়া মিছা কথা বলিতে পারে না। উহারই মধ্যে একটায় পাঠশালা। রাজপুত্র প্রভৃতিরা পড়েন, লেখেন, খেলা ও গল্প করেন। গল্প করিতে করিতে এক দিন কথা উঠিল, পুণ্য বড় না প্রজ্ঞা বড়, না শিল্প বড়, না রূপ বড়, না বীর্য্য বড়। আপন আপন কোট কেহই ছাড়িলেন না। রাজপুত্র বলিলেন, পুণ্য বড়; গুরুপুত্র বলিল, প্রজ্ঞা বড়; পাত্রের পুত্র বলিল, রূপ বড়; পুরুত-পুত্র বলিল, শিল্প বড়; কোটালের পুত্র বলিল, বীর্য্য বড়। বিচার ত হয় না, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এখানে এর বিচার হবে না, এখানে সকলে আমাদের চেনে; পক্ষপাত করিবে। চল আর এক ভিন্ন রাজার দেশে যাই। ঘর থেকে কেউ কিছু লইয়া যাইতে পারিবে না। যে যা উপার্জ্জন করিবে, ভাগ করিয়া খরচ চালাইব।

যাইতে যাইতে তাঁহারা কাম্পিল্য নগরে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটি বাড়ী ভাড়া করিলেন এবং পাঁচ জনই আপনার গুণের পরিচয় দিয়া রোজগারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের মনের ইচ্ছা, তাঁহার গুণের পুরস্কার দেখিয়া অন্য বন্ধুরা তাক হইয়া যাইবেন। দুপুরবেলা কোমরে গামছা জড়াইয়া পাঁচ জন মহাপ্রভু স্নান করিতে গেলেন; গঙ্গায় পড়িয়া স্নান করিতেছেন। সাঁতার দিতেছেন, দেখা গেল, একখানা বাহাদুরী কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে। বর্ষায় গঙ্গার বেগ খরতর, মাঝে মাঝে ঘূর্ণীও আছে, কেহই সে কাঠ ধরিতে যাইতে সাহস করিতেছে না। কোটালের পুত্র বলিল, "আমি যাইব," বলিয়া সাঁতার দিয়া কাঠের উপর উঠিল। তাহার পর যেমন দাঁড় বহে, হাতে-পায়ে সেইরূপ জল কাটাইয়া তাহাকে কৌশলে ডাঙ্গার কাছে আনিল এবং গায়ে অসীম জোর ছিল, উহাকে পাড়ে তুলিয়া ফেলিল। পাঁচ বন্ধুতে তখন বাহাদুরী কাঠখানাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশ সুগন্ধ বাহির হইতেছে। কিসের গন্ধ? কিসের গন্ধ? চন্দনের গন্ধ। তবে এটা চন্দনের কাঠ। প্রকাণ্ড চন্দনের কাঠ নদীর পাড়ে তোলা হইয়াছে শুনিয়া কাম্পিল্যের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। গন্ধবেণেরা এমন দাঁও ছাড়া যায় না বলিয়া বীর্য্যবন্তের কাছ থেকে অল্প দামে কাঠখানি কিনিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া, ও "উহাকে ঠকান সহজ নয়" বুঝিয়া এক লক্ষ "পুরাণ" নামে টাকা দিয়া কিনিয়া লইল। সে-ও বাসায় আসিয়া আপনার বন্ধুবর্গকে ভাগ করিয়া দিল এবং একটি গাথা পড়িল—

"বীর্য্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
মানুষের বাহুবল সবার উপর ॥
বীর্য্যের প্রভাবে দেখ কোটালের সুত।
আনিল প্রচুর ধন সহস্র অযুত ॥"

সকলে বীর্য্যবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিল।

তাহার পর শিল্পবন্তের পালা। তিনি বীণা লইয়া বন্ধুদের কাছ হইতে সরিয়া পড়িয়া একটি মন্দিরের নিকটে দাঁড়াইয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন। নগর ভাঙ্গিয়া পড়িল। যত লোক কাম্পিল্য নগরে বীণা বাজাইতে পটু ছিল, সকলেই আসিয়া জুটিল। কত আমাত্য-পুত্র আসিলেন, কত শ্রেষ্ঠি-পুত্র আসিলেন। সকলেই শিল্পবন্তকে হারাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন, সকলকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। এমন সময় তাঁহার সাততারা বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। ছয় তার হইতেই সাত তারার সমস্ত আওয়াজ ও সুর বাহির হইতে লাগিল। লোক চমৎকৃত হইয়া গেল। ক্রমে আরও এক তার ছিঁড়িল, তবুও সেই সুর, যেন তার ছিঁড়েই নাই। ক্রমে সব তার ছিঁড়িয়া যখন একটিমাত্র তারে ঠেকিল, তখনও সেই সাততারার সব সুর বাহির হইতে লাগিল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া উহাকে 'পুরাণ' নামে টাকা ও বস্ত্র, অলঙ্কার পেলা দিতে লাগিল। সে সব পেলা কুড়াইয়া বাড়ী আসিল ও পাঁচ জনে ভাগ করিয়া লইল। সকলে খুব খুসী হইল ও গাথা গাহিল—

"শিল্পের প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
শিল্পকলা মানুষের সবার উপর ॥
শিল্পের প্রভাবে দেখ পুরুত-নন্দন।
আনিলেন কত ধন করি উপার্জ্জন ॥"

সকলে শিল্পবন্তের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এবার রূপবন্তের পালা। তিনিও অন্যান্য বন্ধুদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া, অনুপম বেশ-বিন্যাস করিয়া, চকের রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, এমন রূপ ত কখন দেখি নাই। এ কোথা হইতে আসিল? এ কি "অমিয় ছানিয়া বিধি রূপ নিরমিল। তাহাতে গড়িল বরবপু?" স্ত্রীলোকরা দেখিয়াই মনে মনে স্বামি-নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, আমার এইরূপ একটি স্বামী হইলে কত ভাল হইত। তা নয়, বাবা একটা পোড়া কাঠের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছে!

যাহাই হউক, চকের বাজার দিয়া যাইতে যাইতে পাত্রের পুত্র নগরের প্রধান গণিকার চোখে পড়িয়া গেলেন। সে দোতলায় জানালায় বসিয়া ছিল, উহাকে দেখিয়াই চাকরাণীকে বলিল, "তুমি যাও, ঐ লোকটিকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া লইয়া আইস।" তিনি দাসীর সঙ্গে গণিকার সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। গণিকা অমনই স্বহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিয়া মাথার চুল দিয়া পা মুছাইয়া দিল এবং বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি দাসীর এই খাটের উপর বসুন। আমার যা' কিছু আছে, আপনি সকলেরই মালিক। আজ হইতে আমি আপনার দাসী। আপনি আমার সহিত ক্রীড়া করুন, কৌতুক করুন, আর যাই করুন, সব আপনার স্বেচ্ছাধীন।" স্নানের ঘরে তাঁহাকে

লইয়া গিয়া গণিকা তাঁহাকে স্বহস্তে গন্ধ-তৈল মাখাইয়া দিল; নানারকম স্নান-চূর্ণ দিয়া জল সুবাসিত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইল। তাহার সুগন্ধ অনুলেপন দিয়া তাঁহার গা লেপিয়া দিল; মিহি কাপড় ও চাদর পরাইয়া তাহার মধ্যে নানারূপ ধূপের ধোঁয়া লাগাইয়া দিল। তাহার পর সে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চারি প্রকারের উৎকৃষ্ট আহার প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন, "আমার ঘরে আমার চারি জন বন্ধু আছেন, তাঁহাদের এই সময়ে আনান আবশ্যক এবং তাঁহাদের টাকা-কড়ি দেওয়া আবশ্যক।" তাহাদের ডাকা হইল। তাহারা আসিয়া সব দেখিল। তখন সে গাথা গাহিল—

"রূপের প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
মানুষের রূপ হয় সবার উপর॥
দেখ রূপবন্ত গণিকার কোলে বসি।
আহরণ করিয়াছে কত ধনরাশি॥"

তোমরা এখন এই লক্ষ টাকা লও ও খরচ কর। তাহারা টাকা লইয়া বাসায় গেল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি রাস্তায় যাইতে যাইতে শুনিলেন, এ দেশে এক মজার মামলা উপস্থিত হইয়াছে। রাজসভায় কেহই তাহার সুক্ষ্ম বিচার করিয়া দিতে পারিতেছেন না। ব্যাপারটি এই—এক জন শ্রেষ্ঠী নগরের প্রধানা গণিকাকে এক রাত্রি তাঁহার সঙ্গে কাটাইবার জন্য আহ্বান করেন এবং তাহাকে লক্ষ টাকা দিবেন স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যে দিন তাহাকে চান, সে দিন সে আসিয়া বলিয়া যায়, সে অন্যত্র ভাড়া লইয়াছে, সে-দিন আসিতে পারিবে না। তাহার পরদিন সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কবে আসিতে হইবে? শ্রেষ্ঠী বলে, "তোমায় আর আসিতে হইবে না, আমি কা'ল রাত্রে তোমায় স্বপ্নে দেখিয়াছি।" তখন সে বলিল, "আচ্ছা, যদি আমারই সঙ্গে সারারাত কাটাইয়াছ, তবে আমার ভাড়া লক্ষ টাকা দাও।" সে বলিল, "তা কেন দিব? তুমি ত অন্যত্র ছিলে, আমি তোমায় দক্ষিণা কেন দিব?" জবাব হইল, "তুমি ত আমাকেই পাইয়াছিলে, আমার প্রাপ্য আমায় দিবে না কেন?" তখন দু' পক্ষই রাজার কাছে গিয়া নালিশবন্দী হইল। রাজা ও রাজার সভাসদ্‌গণ কেহই ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেছেন না এবং যে পারিবে, তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দুই পক্ষই রোজ দরবারে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু কিছুই হইতেছে না।

শুনিয়া প্রজ্ঞাবন্ত রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, এক জন তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণকে সভায় আসিতে দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার সৎকার করিয়া বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন দিলেন। তিনি বসিয়া আলাপচারি করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা এই কঠিন মোকর্দ্দমার কথা তাঁহাকে বলিলেন এবং তিনি যদি ইহার কিনারা করিয়া দিতে পারেন, পুরস্কার দিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "বাদী প্রতিবাদী উপস্থিত আছে?" রাজা বলিলেন, "আছে।" তিনি তাহাদের সামনা-সামনি দাঁড় করাইয়া তাহাদের ব্যবহার শুনিলেন। উভয় পক্ষই যখন স্বীকার করিতেছে, তখন সাক্ষী-সাবুদের দরকার নাই। তিনি গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ ভাবিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "তুমি এক লক্ষ টাকা এইখানে রাখ।" আর মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, একখানা বড় আরসী আনাইয়া এইখানে রাখিবার আজ্ঞা হউক।"

বলিবামাত্রই দুই জিনিষ আসিয়া পৌঁছিল। তিনি গণিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, শ্রেষ্ঠী স্বপ্নে তোমার আবছায়া উপভোগ করিয়াছেন। তুমি যে তাহার ভাড়া বা দক্ষিণাস্বরূপ সত্যকার টাকা চাহিতেছ, তাহা হইতেই পারে না। তুমি এই আরসীর মধ্যে ঐ লক্ষ টাকার যে আবছায়া আছে, তাই তোমার দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ কর।" এই নিষ্পত্তিতে রাজসভায় একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এমন বিচার করিতে পারিতেন না।" কেহ বলিল, "বোধ হয়, রাজার বিপদে স্বয়ং বৃহস্পতি স্বর্গ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন।" রাজা মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যে পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা ত দিলেনই, আর তাহার উপরও কিছু দিলেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এত সহজে এমন মামলার বিচার হইবে। উদ্ধার পাইয়া শ্রেষ্ঠী বলিল, "আপনি আমার মান বাঁচাইয়াছেন, এ লক্ষ টাকা আপনারই, আমি আর উহা বাড়ী লইয়া যাইব না।"

সমস্ত ধন-রত্ন লইয়া প্রজ্ঞাবন্ত তাঁহার বন্ধুদিগকে বাঁটিয়া দিলেন এবং গাথা গাহিলেন—

"প্রজ্ঞার প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
প্রজ্ঞা মানুষের হয় সবার উপর ॥
এই দেখ প্রজ্ঞাবন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া।
রাশীকৃত ধন-রত্ন দিলেক আনিয়া ॥"

এ বার রাজপুত্রের পালা। তিনিও বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া রাজবাড়ীর নিকট এক যায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রাজার এক অমাত্যপুত্র সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্রকে দেখিয়াই অমাত্যপুত্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া আখড়ায় গেলেন, নানারূপ কুস্তী-খেলার পর তাঁহাকে লইয়া স্নানাগারে গেলেন, সেখানে স্নান করাইয়া অনুলেপন মাখাইয়া শরীর ধূপ দিয়া সুগন্ধ করাইয়া রাজপুত্রকে আহারে বসাইলেন। সে আহার ত রাজভোগ। আহারাদির পর অমাত্যপুত্র তাঁহাকে লইয়া রাজার যানশালায় একটি সুসজ্জিত গৃহে শয়ন করাইয়া দিলেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন, খুব ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দুর হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনিও একখানি যান লইয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজপুত্র উঠিলেই "তাঁহার সহিত কথা কহিয়া যাইব" ভাবিয়া "এই উঠেন, এই উঠেন" করিয়া সারারাত কাটাইয়া দিলেন। যখন তিনি যানশালা হইতে যানে চড়িয়া ঘরে যায়েন, তখন অমাত্যেরা ভাবিলেন, "এ কি? রাজকন্যা রাত্রিতে যানশালায় ছিলেন কেন?" খুঁজিতে খুঁজিতে এক ঘরে রাজপুত্র শুইয়া আছেন দেখা গেল। দেখিয়াই অমাত্যগণ তাঁহাকে রাজার কাছে লইয়া গেল এবং কন্যান্তঃপুরদূষক বলিয়া অভিযোগ করিল। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বল?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ, অমাত্যপুত্র আমায় যানশালায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি তথায় আর কাহাকেও দেখি নাই।" রাজকন্যাও সেইরূপ সাক্ষ্য দিলেন। অমাত্যপুত্রও সব কথা খুলিয়া বলিল। রাজার বোধ হইল, আসামী নির্দ্দোষ। তিনি উঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, উনি বলিলেন, "আমি বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র, দেশভ্রমণে এখানে আসিয়াছি।" রাজা অপুত্রক ছিলেন, ঐ কন্যাটিই তাঁহার একমাত্র সন্তান। তিনি বলিলেন, "তোমায় দেখিয়া আমার পুত্রস্নেহ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার পুত্র হও ও আমার এই বিস্তীর্ণ রাজত্ব তোমার হউক।" পুণ্যবন্ত রাজা হইয়া আপন বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন,—

"পুণ্যের প্রশংসা লোকে আছে পূর্ব্বাপর।
নরলোকে নাহি কিছু পুণ্যের উপর ॥
এই দেখ পুণ্যবলে আমি পুণ্যবন্ত।
পাইলাম রাজ্য যার নাই সীমা-অন্ত ॥"

এইরূপে পাঁচ বন্ধুই আপন আপন শিক্ষার পুরস্কারে অন্য অন্য বন্ধুগণকে তাক করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন, পুণ্য, প্রজ্ঞা, রূপ, শিল্প ও বীর্য্য ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করা যায় না। সকলই মানুষের কাযে আইসে এবং সকলেরই সময়ে সময়ে প্রচুর পুরস্কার হয়।

বৌদ্ধ গল্পে বলিল, ঐ যে রাজপুত্র পুণ্যের জোরে কাম্পিল্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, উনিই অনেক জন্মের পর হইয়াছিলেন ভগবান্ বুদ্ধদেব, শুদ্ধোদনের পুত্র ও কপিলবাস্তবাসী। যিনি সে জন্মে বীর্য্যবন্ত ছিলেন, বুদ্ধের সময় তিনি শোণক হইয়াছিলেন; যিনি শিল্পবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন রাষ্ট্রপাল; যিনি রূপবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন সুন্দরনন্দ। আর যিনি প্রজ্ঞাবন্ত ছিলেন, তিনি হইয়াছিলেন শারিপুত্র। যাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্যে দক্ষ, তাঁহারাই এই সকল জাতকের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, তাহার জন্য আমার আর বাক্যব্যয় করা বৃথা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রাণের পরশ

১

মোটের উপর বিবাহটা সুখের হয় নাই।

বাঙ্গালীর ঘরে নব-বধূর নব-গুণের মধ্যে এক প্রধান গুণ এই যে, তাহার গালে চড় মারিলেও সে "রা" কাড়ে না! অপর একটি এই, তাহাকে যেখানে বসাইয়া রাখ, সে ঠিক সেইখানটিতেই বসিয়া থাকিবে, যেন "মাটীর ঠাকুরটি!" কিন্তু এই নূতন বধূটির "গালে চড়" না মারা সত্বেও তাঁহার "রা" বাড়ীশুদ্ধ লোকই শুনিতে পায় এবং মলের শব্দে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া সে যত্র তত্রই ঘুরিয়া বেড়ায়, এক স্থানে তাহাকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইয়া বসিতে দেখা যায় না। এতই সে চঞ্চলা।

আবার বৎসরান্তে যখন দ্বিরাগমন হইল, তখনও অবশ্য বউ-মানুষের কোন অবস্থায়ই কাহারও সহিত চোপা করা বিধি নহে, কিন্তু বিবাহকালের ক'নে বউটির মত এখন আর তাহাকে গড়া মূর্ত্তির মত চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিলে ভাল দেখায় না। মুখটি বুজিয়া এখন তাহার সংসারের "নুড়-কুতে"র ছোটখাট কাযগুলি করিয়া যাওয়া উচিত। বউ অবশ্য এখন হাঁড়ি ধরিবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই সে পাণ সাজিবে, কুটনা কুটিবে, পূজার সাজ সাজাইবে, ঘর-দ্বার ঝাঁট দিবে, বিছানা তুলিবে এবং পাতিবে। বাটনা বাটা এবারটাও তাহার কায নহে; কিন্তু প্রয়োজনমত দু' গাট হলুদ বাটিতে অথবা দুইটা টাট্‌কা সর্ষে-বাটার আবশ্যক হইলে শাশুড়ীকে "হেঁসেল" হইতে রান্নার হাঁড়ি নামাইয়া আসিতে হয়, বউ বিদ্যমানে সেইটেই কি চোখে ভাল দেখায়?

কিন্তু এই বড়লোকের ঘরের আদরে পালিতা মেয়েটি নব-বধূজনোচিত এ সকল অবশ্য-শিক্ষণীয় শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিতা হইয়া এই গরীব গৃহস্থের ঘরে ঘর করিতে আসিয়াছিল। বউ 'কুটি'টি ভাঙ্গিয়া দু'খানি করে না, কোন কাযেই তাহার মন নাই, কাযের বিধিও কিছুমাত্র সে জ্ঞাত নহে। এ দিকে কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই ঘরের এবং তাহাদের সঙ্গী পাড়ার ছেলে-মেয়ের দলের সঙ্গে 'বউমা'র হাসি-গল্প, খেলা এবং হুড়াহুড়ির অত্যাচারের স্রোতঃ অত্যধিক।

বিবাহের যোগ্য মেয়েদের এবং নব-বধূদের পায়ে যে মল পরাইয়া রাখা রীতি, সে-ও ত যেমন ইংরাজ মেয়েদের গাউনের তলায় তারের বেড় ঘেরিয়া তাহাদের চলন ধীর করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই রকম একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত! পায়ের মল যেমন চলনের অসৌজন্যকে সর্ব্বগোচরীভূত করিতে সমর্থ, এমন ত আর খালি পায়ের সাধ্য নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, এ বউমাটির সে সব লজ্জা-সরমের কোন বালাই-ই যে ছিল না! দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বারই অমন বধূর পায়ের মলের বাজনার ঝমর-ঝমর বাড়ীর লোকের কানে তালা ধরাইয়া দিয়া চীৎকার-শব্দে পাড়াশুদ্ধ সবাইকেই জানান দিতে থাকে যে, বউ-মা এখন ছুটা-ছুটি খেলিতেছেন। কখনও কখনও বউ-মা সঙ্গি-দলের সঙ্গে হাসিত, সে হাসির শব্দ পাড়া ছাড়াইয়াও যায়। দেশশুদ্ধ লোকের নববধূর হাসির শব্দ একরকম অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

বধূর বাপ বড়লোক। মেয়ের সঙ্গে দানা-তসর-পরা, গোলগাল-চেহারা-দর্পিত, হাস্যযুক্তাধরা ঝি আসিয়াছিল। বড়লোকের বাড়ীর ঝি, তাহাকে দু'টি বেলায় জলখাবারে সন্দেশটি মোণ্ডাটি দিতে হয়, ভাতের পাতে বড় মাছখানা, এমন কি, চারুকে শুদ্ধ বঞ্চিত করিয়াও না দিলে চলে না; একটু দুধও দেওয়া চাই, একে কুটুম-বাড়ীর ঝি, তাহাতে সে কুটুম আবার বড়মানুষ! ঝি ফরসা ফরসা ফিতা-পেড়ে মিহি মিহি মেলের কাপড় পরে, ধোপার দুঃখে নিজের কাপড় দুই তিন দিন অন্তর নিজেই সাবান দিয়া কাচে। স্নানের সময় ঠাণ্ডা তেল না মাখিলে ঝিয়ের মাথা ধরে, সে তাহার সঙ্গেই আনিয়াছে।

রোজ এক গ্লাস মিছরির সরবত লেবুর রস দিয়া ভাত খাইবার পর না খাইলে ঝিয়ের শরীর না কি মোটেই ভাল থাকে না। সর্ব্বদাই পান-দোক্তা ঝিয়ের গালের পাশে ভরিয়া রাখা অভ্যাস, নহিলে মুখ যেন কি রকম ফস্-ফস্ করে। মেঝের বিছানায় শুইয়া ঝিয়ের ঘুম হয় না। আবার একা ঘরে এবং অন্ধকার ঘরে শুইতেও তাহার বড় ভয় ভয় করে। কারণ, ঘরের পাশেই বাঁশঝাড়, বাতাসে ভূতের মত শন্-শন্ শব্দ করে। কাজেই সে গৃহিণীর সহিত এক ঘরে স্বতন্ত্র তক্তপোষে শয়ন করে। সারারাত্রি প্রদীপে তেল পুড়িতে থাকে। এ দিকে আবার চারুর মা নিজের মশারির উপর একটা কাঁথা আড়াল দিয়া নিজের চোখ হইতে আলো আড়াল করিয়া রাখেন। কারণ, তেল-খরচেরও ভয়ে বটে এবং চিরদিনের অনভ্যাসের জন্যও বটে, তাঁহার আবার ঘরে আলো থাকিলে ঘুম হয় না।

ঝি এ সংসারের কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। কেমন করিয়া সে করিবে? কাজের কোনরূপ বালাই ত এ বাড়ীতে নাই! ধর, তরকারি কোটা, তা' তাহাদের সেখানে কত রকমের তরি-তরকারি ঝুড়ি ভরিয়া ভরিয়া মালী মিনষেরা বাগান হইতে রোজ দিয়া যায়। সকালের রান্নার কুটনো সেখানে কি "সাজো" কুটিবার যো আছে? দুপুরবেলা ভাত মুখে দিয়া বিন্দির মা আর সুরোর পিসী দুই জনে কাঠের বারকোশ ভরিয়া ভরিয়া কেবল দুই বেলার কুটনাই কুটিতেছে! ও মা, এই রকম কুমড়োর ফালি? এও আবার না কি দুই বেলার তরকারিতে পড়িবে! শুনিলে কে হাসি পায়। এ বাপু কুটিতে গেলে আঙ্গুল কাটিয়া মরিতে হইবে, তার চেয়ে যাদের এ সব অভ্যাস আছে, তাদেরই কোটা ভাল!

গৃহিণী রাঁধিতে বসেন, ধুচুনিভরা চাউল বাহির করা থাকে, ধুইয়া আনিতে পারিলেই হয় ভাল! তা অবশ্য আনা যায়, কিন্তু বাপু, পরিষ্কার না হইলে সে ত সে জন্য দায়ী হইতে পারিবে না! এ রকম চাউল,—তাহাদের সেখানে কেহ, বোধ করি, কখন চক্ষুতেও দেখে নাই। দুই বেলা সেখানে যে দু'শ' মানুষের পাত পড়ে; তা' সেই পাতে কি এই রকম আরসোলার ছানার মত রাঙ্গা রাঙ্গা মোটা মোটা ভাত কখন পড়িয়াছে? উঁহুঃ, সেখানকার জন-মজুরও এমন চাউলের ভাত খায় না। সেখানকার সে চাউল, সে কেমন! কেমন ভুরভুরে গন্ধ, মল্লিকাফুলের মত সাদা ধব্‌ধবে, আহা! সে কি! এ কি গলা দিয়া নামিতে চাহে? মনে হয়, কে যেন বুকের মধ্যে বাঁশ পুরিতেছে। পোড়া কপাল!

চারুর মা এক দিন জনান্তিকে চারুকে বলিলেন, "দেখ বাবা, ঝি মাগীকে নিয়ে আমি ত ভাজা ভাজা হয়ে উঠেছি, এমন 'ট্যাকখর' 'গতোরখেকো' মেয়েমানুষ ত বাবার কালে কখন দেখি নি।"

চারু ছেলেটি বড় ভীরু-স্বভাব। আসল কথা ধরিতে গেলে বড়মানুষের বাড়ী বলিয়া শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধে তাহার মনে সুপ্রচুর লজ্জা ও ভয় ছিল। গরীব বলিয়া তাঁহারা হয় ত মনে মনে কতই অবজ্ঞা করিতেছেন, এই ভাবনায় সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়া সাহস করিয়া কাহারও নিকট একটু মুখ তুলিয়া কথাই কহিতে পারে না। পেট ভরিয়া সে সেখানে ভাত খায় না, পাছে কেহ মনে করে, কাঙ্গালের মত হাঁস্-হাঁস্ করিয়া খাইতেছে। জামাই বাড়ী আসিলে শাশুড়ী নানারূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; ফল, মিষ্ট, ব্যঞ্জন—সে সব গরীব চারু কখন চোখেও দেখে নাই। কিন্তু হইলে কি হয়? ভরসা করিয়া কোন ভাললাগা জিনিষই সে কখন ভাল করিয়া খায় না, হয় ত ধনি-গৃহের মহিলারা মনে মনে হাসিয়া ভাবিবেন, "এ সব ত কখন চোখে দেখে নাই, তাই অমন করিয়া খাইতেছে। ভাগ্যে আমাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছিল!"

এইরূপে চারু শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত জিনিষ এবং সকল মানুষকেই অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিত! শ্বশুরের মণিহারী দোকানের মত সাজান ঘরের মধ্যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে ত তাহার রীতিমত হৃৎকম্পই উপস্থিত হইত। তাঁহার মুখে চুরুট, গায়ে "সাহেবী" পোষাক, জিভে ইংরাজীর ছাঁচে ঢালা মিশ্র বাঙ্গালা বুলি। তিনি জামাইকে ধুতি পরার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা ভিন্ন কখন রূঢ় বাক্য তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার করেন নাই, তথাপি কে জানে কেন, তাঁহাকে দেখিলেই চারুর প্রাণ উড়িয়া যায়। শাশুড়ীকে সে ঠিক ভয় করে না বটে, কিন্তু বোধ হয়, অত্যধিক সম্মান করে। তিনি তাঁহার এক-মাত্র কন্যার স্বামী একটিমাত্র জামাতাকে যথেষ্টই স্নেহ-যত্ন করিয়া থাকেন; কিন্তু হইলে কি হয়, গরীব-বড়মানুষে যে একটা "পরমাণ-মেরু"র ভেদ রহিয়াছে! গরীবের নিকট গরীবের আদর এক জিনিষ, বড়মানুষের আদর আর

এক জিনিষ, একজাতীয় হইলেও দুইটায় রাজা-ভিখারীর প্রভেদ!

কিন্তু এ সব বড় জিনিষ ছাড়িয়া দাও, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি করিল কি ভয় করিল, সে কথা কিছু খুব সঙ্গীন নহে, সে সে বাড়ীর দাসী-চাকরদিগকেও তাঁহাদের অপেক্ষা যে অল্প পরিমাণে ভয়-ভক্তি করিত, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ অহঙ্কারে ভরা আদুরে ঝিয়ের দলের নিকট সে বিশেষ একটু আতঙ্কিত হইয়াই থাকিত। ইহারা "তত্ত্বতাবাস" উপলক্ষ করিয়া চারুর নিজ গৃহের অবস্থার সহিত সবিশেষই পরিচয়-প্রাপ্ত। কত সময় সেই ধনি-গৃহে শাশুড়ী অথবা অপরা কোন শাশুড়ীসম্পর্কীয়া বা শ্যালিকাস্থানীয়াগণের সমক্ষেই তাহারা গপ করিয়া এখানকার কোন একটা কথার উল্লেখ করিয়া তাহাকে যেন লজ্জায় হেঁট-মুখ করিয়া দেয়। সে-সেই সময় নতমুখে থাকিয়াও অনুভব করে—চারি দিকে সুবেশধারিণী হীরক-স্বর্ণ-ভূষিতা তাহার শ্বশুর-বাড়ীর আত্মীয়াগণ তাহার দৈন্য-পীড়িতা দুঃখিনী মায়ের দিকে যেন সকৌতুক তাচ্ছীল্য-ভঙ্গীতে অপাঙ্গে চাহিয়া উপহাসের লঘু হাসি হাসিতেছে। তাহার যেন তখন ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া লজ্জা ঢাকিতে ইচ্ছা করে।

মা'র কথায় ম্লান হইয়া চারু বলিল, "বেশী দিন ত নয়, মা; কি করবে, স'য়ে যাও, যা করে করুক। পর বৈ ত নয়।"

সে এই কথায় মা'কে জানাইল, "তোমার বউ ত কিছু করে নাই, ঝিয়ের কথা ছাড়িয়া দাও, ও তোমার কে?"

মা, চারুর মা—সংসারে অনেক দুঃখ-ধাক্কা করিয়া কাঁচা বয়সের বৈধব্য হইতে নিজেকে সামলাইয়া কষ্টে-সৃষ্টে ছেলেটিকে কোনমতে মানুষ করিয়া তুলিতেছেন; ছেলে, বউ, কুটুম্ব লইয়া এখন একটুখানি সুখী হইবার সাধ। কোন কোন বিজ্ঞলোকের কথা কানে না তুলিয়া অনেকগুলি নগদ টাকা এবং ভবিষ্যতের অনেকখানি আশা-ভরসা শুদ্ধ এই ধনি-কন্যাটিকে তাড়াতাড়ি পুত্রবধূ করিয়া ফেলিয়া বারো মাসের তের পার্ব্বণে বড় বড় তত্ত্ব খাওয়ার এবং ছেলের আঙ্গুলে হীরার আংটী, গায়ে কাশ্মীরী শাল, পায়ে রকম-বেরকমের দামী জুতা দেখিয়া চক্ষু সফল করিতেছেন। কিন্তু বক্রী বিষয়গুলিতে বিশেষ বাধা পড়ারই লক্ষণ যেন দেখা যাইতেছিল। ঝিটি যে আসিয়াছেন, যেন মাঠাকুরাণীটি! রান্নাঘরের দালানে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বসিয়া তিনি "চিপটানের' পর 'চিপটান" কাটিয়াই চলিয়াছেন।

২

চারু কলিকাতার মেসে থাকে, মেডিকেল কলেজে সে পড়ে। মেসের আর কি খাওয়া-দাওয়া! এই গরমের ছুটীতে সে কয়দিন বাড়ীতে আসিয়াছে, মা'র রাঁধা ভাত-ব্যঞ্জন চিরদিনই তাহার খাওয়া অভ্যাস, দু'টি বেশী ভাতই সে যেন খায়। তেমন কিছু চপ খাওয়া নাই, ঘি খাওয়া নাই, এ ক'টি না খাইয়াই বা খাইবে কি? এই ত খাওয়া-দাওয়ারই জোয়ান বয়স। তাহার উপর এখনও জাতীয় বংশানুসারে অজীর্ণ রোগে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে নাই। তা' পোড়া ঝিয়ের পোড়া চক্ষু কি সে দিকেও আছে!

এক দিন চারু রান্নাঘরের ভিতরে খাইতে বসিয়াছে; ইহারা আসিয়া অবধি সে আর এ ঘরের বাহিরে খায় না, এক রকম লুকাইয়া বসিয়াই সে ভাত খায়। হঠাৎ সেখানেও আজ তাহার শ্বশুরবাড়ীর ঝি বিলাসী আসিয়া রান্নাঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া মাতা-পুত্র দুই জনই একটুখানি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। মা তাড়াতাড়ি উনান হইতে কড়াটা দুম্ করিয়া মাটীতে নামাইয়া দিয়া ছেলের পাতের কাছে চলিয়া আসিলেন, পাছে সে আধ-খাওয়া করিয়াই এই দুর্ম্মুখী ঝিয়ের মুখের ভয়ে উঠিয়া পড়ে।

বিলাসী সেই মোটা মোটা অপরিষ্কার ভাতের রাশিটির দিকে চাহিয়া যেন আচমকা অবাক্ হইয়া গিয়াই গালে হাত দিল—

"ও মা! জামাই বাবু! তুমি ঐ ভাতের কাঁড়িটি খাবে? উ কি গো! ঐ বানের মতন গোটা গোটা মোটা ভাত অত ক'রে খেয়ো নি, বাবু, ব্যারামে প'ড়ে যাবে যে! ও তোমাদের ভদ্দর লোকের পেটে সইবে কেন গো?"

চারু লজ্জায় মাথা নত করিয়া কি বলিবে, কি করিবে, যেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

চারুর মা এ দিকে কিন্তু বেজায় রকম রাগিয়াছিলেন; তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সরোষে কহিলেন, "তা বাছা

আমাদের ঘরে ত আর তোমাদের মত লুচির গোছা, ক্ষীরের বাটি নেই ; ভাত দুটো না খেলে খাবে কি বল ত ? অমন ক'রে ছেলের আমার খাওয়া তুমি খুঁড়ো না, তা' আমি ব'লে দিচ্ছি।"

বিলাসীর মনের সে গভীর বিস্ময় তখনও যেন দূরীভূত হয় নাই, এমনই ভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া গাল কাৎ করিয়া সেই গালে অসহায়ভাবে হাত দিয়া সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই অনুযোগ গায়ে না মাখিয়াই তেমনই অবাক্ সুরে সে কথা বলিল, "তা, মা, ক্ষীরের বাটি, লুচির গোছা না হয় সবার ভাগ্যে জোটে না, তা মান্‌লাম,— কিন্তু তাই ব'লে মা, তুমি কতকগুলো 'হাবজা'-'গোবজা' দিয়ে যে সোনার চাঁদ বেটাছেলের কোলে ভাতটি ঢেলে দিয়েছ, তা ওসব 'শুদ্দুর ভাদ্দুর' ছোট নোক মোট নোক আমাদেরই পেটে সয় না, মা! ওঁদের পেটে গেলে কি আর রক্ষে রাখবে! কে জানে বাবু! তোমাদের খাওয়া-দাওয়ায় ভরসা বাছা খুব বলতে হবে! আমরা কি অমন দেখতে পারি? আমাদের ত আর ও সব দেখা অভ্যেস নেই, তাই অমন ধারা কাণ্ড সব চোখে যেন দেখলেই ভয় করে। এই সে দিনে তুমি কাঁঠাল ভেঙ্গে চারটি কোয়া যে থপ থপ ক'রে দিদিমণির পাতে ফেলে দিয়ে গেলে, সে দেখে আমি ভয়েতে বুক দুড় দুড় ক'রে মরি! সে আমার মুখের পানে তাকায়, আমি তার মুখের পানে তাকাই; শেষে ইসারা ক'রে পাতের তলায় সেগুনো নুকিয়ে ফেলতে ব'লে দিই, তবে বুকের ধড়ফড়ানি যায়। আমাদের সেখানে বাগানে কাঁদি কাঁদি তাল, বড় বড় সব কাঁঠাল- কিবা তার সুতার; যেন মিছরির পানা; একটি এত বড় ক'রে মর্ত্তমান কলা, কত কিই যে সব ফলে, তার কি হিসেব আছে? তা সে সব কি বাবুর ভয়ে কেউ বাড়ীতে আন্‌তে পারে, না খায়? সব অমনি গরুকে ধ'রে দেওয়া হয়। ও সব খেলেই না কি কলেরা হয়, আমরাই একটা মুখে দিই নে, মা, বলি গরীব বটি, তবু মানুষের শরীল ত, খেয়ে কি শেষে প্রাণ হারাবো?"

চারুর মা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমাদের গরীবের ঘরে, বাছা অত বিচার করতে গেলে, চলবে কেন বল? তোমাদের বাবু হলেন বড়লোক, তাঁর সঙ্গে কার কথা! নে বাবা চারু, এই অম্বলের 'কাঁই'টুকু দিয়ে দুটি ভাত টেনে ঐ সঙ্গে মেখে নে। ও কি করলি! যাঃ— উঠে পড়লি যে!"

এই ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে চারুর খাইবার স্পৃহা অনেক দূরেই চলিয়া গিয়াছিল। সে নিজের চাষার মত ক্ষুধার উপর অসহায়ভাবে রাগিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিল। ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোক হইয়া এমন অশোভন খাওয়া তাহার যে, একটা দাসীর চোখেও তাহা বিসদৃশ ঠেকে! সে আরক্ত মুখে কোনমতে উঠিয়া পড়িয়া পলাইবার জোগাড় করিয়া বলিল, "না মা! আর আমি মোটেই খেতে পারবো না, ভাত তুমি আজ বড্ড বেশী দিয়ে ফেলেছিলে।"

চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া চটিজুতাটা পা দিয়া টানিয়া লইয়া কোন রকমে ঝিয়ের সাম্‌নে হইতে সে ত্বরিত গতিতে সরিয়া পলাইল। পান লইবার কথাটা মনে পড়িলেও তাহা লইতে সে ফিরিয়া আসিল না। কারণ, কাযের মধ্যে বিলাসী এ বাড়ীর পান সাজার ভারটি নিজের হাতে লইয়াছিল, তাহা না লইলে নিজের পক্ষে দোক্তা খাইবার সুবিধা হয় না বলিয়া। যেহেতু, দোক্তাখোরের পান সাজা এমন দৃষ্টিকৃপণের কর্ম্ম নহে।

চারু চলিয়া গেলে চারুর মা মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া বিলাসীর দিকে ফিরিলেন। রাগে তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতেছিল; বলিলেন,—"হ্যাঁগা মেয়ে, বলি, অমন ক'রে খাওয়ার সময় আমার ছেলের খাওয়া তোমার খোঁড়া কেন, বাছা? কি এমন এক কাঠা চালের ভাত তুমি ওকে খেতে দেখলে যে, অমন করেই লজ্জা দিলে?"

ছেলে যে আধ-খাওয়া করিয়া উঠিয়া গেল, ইহাতে রাগে দুঃখে গৃহিণীর কান্না আসিয়াছিল।

বিলাসী ইহার মধ্যে লজ্জা পাইবার মত কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া অতি সহজভাবেই এ অনুযোগের জবাব দিল,— "তা মা, বেশী খাওয়ায় লক্ষ্মীর-ছিরি থাকে না, এই দেখছো ত, আমাদের বাড়ীর সবাইকার কত ক'টি ক'রে খাওয়া। তবু তোমার এখানে কি-ই বা খাবার আছে? ওদের কত ম্যাওয়া, কত ঘি-দুধ খাওয়া অভ্যেস, তা এখানে পাচ্ছে কি তেমনি কিছু! তবু ত ঐ ক'টা ভাত নিয়েই নাড়ে চাড়ে। যেন একটি পাখীর আহার। যাই, দিদিমণিকে ডেকে আনি গে, একে ত ঐ আসচালের মোটা ভাত, তাতে আবার জুড়িয়ে গেলে গলা দিয়ে সে উল্‌বে কেন?"

"দেখ বাছা! তোমার বড় টেঁকটেঁকে কথা। গরীবের ঘর দেখে বেহাই মেয়ে দিয়েছেন, এখন উঠতে বসতে অত ধনের নাড়া দিলে সে আমি সইবো কিসের জন্যে? এত যদি, তবে মেয়েকে ঘর-জামায়ে ক'রে ঘরে রাখতে হয়; না হয় মেয়ের সঙ্গে একখানা তালুক লিখে দিতে হয়। আমার যেমন জুটবে, তেমনি আমি দেবো, সেইমত চল্‌তে হবে। অত ক্যাটক্যাট ক'রে খোঁটা আমি তোমার কাছে দিন-রাত্তির খাবো না, খাবো না, স্পষ্ট করেই তোমায় তা ব'লে দিচ্ছি, বাপু!"

বড়লোকের বাড়ীর দাসী, মনটাও বোধ করি তাই যথেষ্ট বড়! বিলাসী এ ভৎর্সনায় রাগ ত করিল না, বরং ঈষৎ হাসিয়াই বলিল, "ঘরেই রাখবে, ঘরবসত করতে এই যা একবারটি পাঠিয়েছে, আর তা ব'লে পাঠাচ্ছে না। জামাই বাবুর একবার পড়াটাই শেষ হ'লে হয়। তখন ঐখানেই ত ডাক্তারখানা-টানা সব ক'রে দেওয়া হবে। সে আর ক'টা দিন। তখন আর এ-মুখো হবে? নেহাৎ ওনারই সাধ দেখে এই দিন পনেরোর তরে পাঠিয়ে দিলে। তা' মা কি বাবু—কারুই মন নয়।"

চারুর মা'র সর্ব্বশরীর এবার অপমানের আঘাতে থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উগ্র ক্রোধে ধৈর্য্যহারা হইয়া একেবারে তীব্রকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আঃ মলো! এ মাগীর যত বড় না মুখ, তত বড় কথা! আমার ছেলে গিয়ে ওঁর বাবুর অন্নদাস হবে! কেন, ও কি আমার মুখ্যু ছেলে, না ছেলে বেচে আমি খেয়েছি?"

বিলাসী মন্থর-পদে সরিয়া আসিল, আসিবার কালে অনুচ্চ কণ্ঠে শুধু বলিয়া আসিল, "তা এক প্রকার বেচা বৈ আর কি? ট্যাকার নোবেই ত, বাপু, বড়লোকের ঘরে ব্যাটা দিয়েছ? জান না কি, তাদের মতন লোকের মেয়ে তোমাদের মত লোকের ঘরে পা ধুতেও আসে না? শুধু ছেলেটির জন্যেই ত যা কিছু!".

কথাটা বড় সত্য! হায় রে টাকা! হায় রে মাতৃ-হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা! ছেলেকে ত সে দিনই ছেলের মা বেচিয়া ফেলিয়াছেন—যে দিন তিনি তাহার শ্বশুরের দেওয়া নগদ দুইটি হাজার টাকা দিয়া এই তাঁহার শ্বশুরের ভিটাটুকুর বন্ধক ছাড়াইয়া ইহার জীর্ণসংস্কার করাইয়াছেন!

তা' ছেলে বেচিতে খুব বেশী লাগে না ত। মেয়ের বাপ কতই বা জামাইয়ের উপর খরচ করিয়া তাহাদের নিজের করিয়া থাকেন? মা-বাপের আশৈশব সব খরচের (স্নেহের ও কষ্টের হিসাবে না হয় বাদই পড়ুক) দাবী নিঃশেষে ফুরাইয়া তাঁহারা কোথাও দু'তিন হাজার, কোথাও না হয় ন'দশ হাজারই হউক, ইহার বেশী ত আর দাম দেন না!

চারুর মা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন পূর্ব্বক নিজ-কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

৩

চারুর স্ত্রী প্রমীলার বয়স যদিও চৌদ্দ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঐ বয়সে বাঙ্গালীর মেয়ের জীবন যে ভাবে গঠিত হয়, ইহার মধ্যে তাহার কিছুই পরিণতি দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সে মেয়ে হইয়া জন্মিলেও, এই বয়সে বিবাহিত হইয়া শ্বশুরঘরে ঘর করিতে আসিতে বাধ্য হইলেও স্বভাবটাকে সে ত্যাগ করিয়া আসিতে পারে নাই, আর সেই স্বভাবটিও মোটে মেয়েলী স্বভাব নহে। হুড়োহুড়ি পাছড়া-পাছড়ি করিয়া বেড়ান, হিঃ হিঃ—হাঃ—হাঃ হাসি, লাফাইয়া ঝমর-ঝমর করিয়া কর্ণপটহ-বিদীর্ণকারী হাস্য-তরঙ্গের সৃষ্টি করা—এই সবেতেই তাহার রুচিটা খুব বেশী। পুতুল সাজাইয়া বসিয়া যে ঘর-করনার খেলা, সখী-সাথীদের সঙ্গে পুতুলের বিয়ে দেওয়া, তাহা লইয়া আমোদ-প্রমোদ তত্ত্ব-তাবাস সাজান, সে সব তাহার যেন প্রকৃতির মধ্যেই নাই। পাড়ার মেয়েরা দুই দিন চার দিন তাহাদের পুঁতিমালা ও রাংতার মল-পরা ছোপান ন্যাকড়া-জড়ানো কাচের ও মাটীর পুতুলগুলি লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছিল। প্রমীলা তাহাদের মোটেই আমল দেয় না, মেয়েদের অনু-রোধে তাহার বিচিত্র পোষাক-আঁটা মেম-পুতুলে-ভরা বাক্সের ডালা তুলিয়া তাহাদের সে সব দুষ্প্রাপ্য বস্তু-সম্ভার দেখাইয়া কিঞ্চিৎ প্রশংসাপূর্ণ করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু এদের মধ্যের একটির সহিত তাহাদের কাহারও ছেলেমেয়ের বিবাহের সম্বন্ধে সে রাজী হইল না। চাঁপা, চন্দন ও ফেলীর একান্ত সাগ্রহ আবেদনের উত্তরে মুখখানা বেজায় ভার ও গম্ভীর করিয়া সে এই বলিয়া জবাব দিল, "না ভাই! ওদের আমি এই পাড়াগাঁয় বিয়ে দিতে পারবো না! দিলে
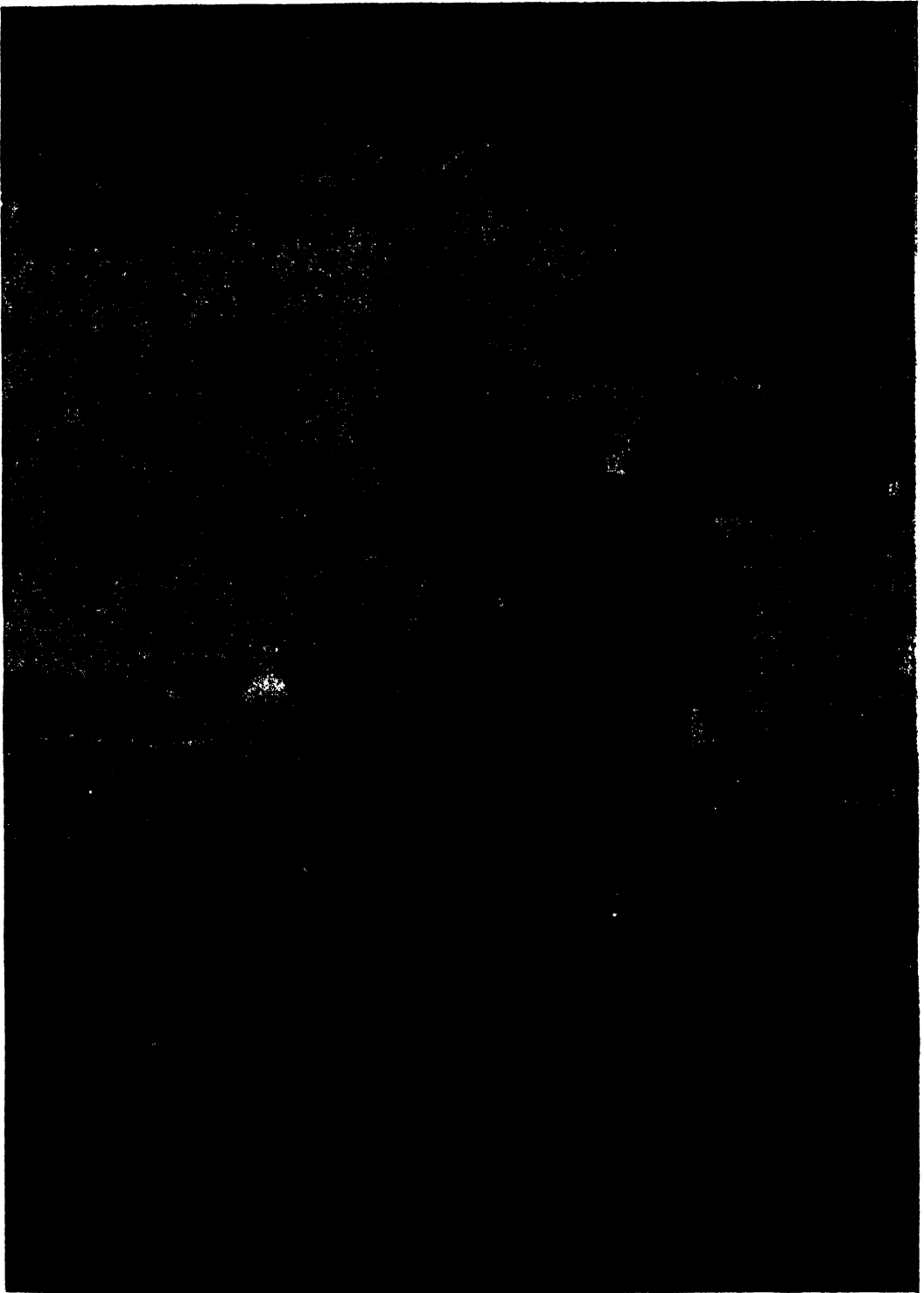
তীর্থ-যাত্রী

[শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে]

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ গাঙ্গুলী]

আমি যেমন আমার মা-বাপকে দোষ দিচ্ছি, আমায় পাড়াগাঁয় দেওয়ার জন্যে, ওরাও ত আমায় তাই দেবে!"

ফেলী তাহাতেও ছাড়ে না, সে বলে, "তা না হয় বিয়ে আবার ফিরিয়ে নিও, একবার ত দাও। আমাদের, ভাই, বড্ড সাধ গেছে।"

তাহাতে প্রমীলা অসন্তোষে হাস্য করিয়া জবাব দেয়, "সে হয় না, ভাই, দেখছ না, এরা সব মেমসাহেব, তোমাদের ঘরে যেতে বল্লে চটেই এখনই আগুন হয়ে উঠবে। তার চেয়ে ছাদে চলো, জলডিঙ্গাডিঙ্গী খেলি গে।"

মেয়েগুলি নিতান্তই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পুতুল লইয়া ফিরিয়া গেল। দুই এক জন তাহাকে বরের গল্পের জন্য ধরিয়াছিল; চাঁপা, টেঁপী ও সৈরভী তাহাদের মধ্যে অগ্রণী। টেঁপী প্রথম দিন আসিয়াই বলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, চারুদা'র সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হয়, সে সব বলা চাই।

দ্বিতীয় দিন আসিয়া সে সেই দাবী তুলিতেই প্রমীলা অবাক্ হইয়া গিয়া উত্তর করিল, "ও মা, কাল মোটে এসেছি, এসেই কথা কইব কি? আমি ত আগে থেকেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি ভান ক'রে রইলুম, তার পর যখন এসে কথা কইতে এল, ঘুম ভাঙ্গলুম না, হাত ধ'রে টানতে যেতেই এক ধাক্কা। আর একটু হলেই খাট থেকে গ'ড়ে যেত। আমার তখন এমনি হাসি পেয়েছিল, আর একটু হলেই হেসে ফেলেছিলুম আর কি! ভাগ্যে ভাগ্যে সামলে গেছি।"

চাঁপা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "তার পর?"

প্রমীলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তার পর আবার কি? যতই ডাকে, সাড়া দিই নে, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরের মত জড়িয়ে জড়িয়ে 'আঃ উঃ' করি, শেষটায় নিজেই হায়রাণ হয়ে শুয়ে পড়লো। ব্যস! তার পর সত্যিকারের ঘুম! তবু অন্ধকার ব'লে ভাল ক'রে ঘুমুতে পারি নি।"

ইহার পরদিনের দাম্পত্য ইতিহাস উদ্ধার করিতে আসিয়া টেঁপী-সৈরভীর দল প্রায় এক রকমেরই কাহিনী শুনিয়া গেল। সে দিন অবশ্য শেষটায় ঘুম ভাঙ্গাইতে হইয়াছিল এবং স্বামীর প্রেমালাপের অশেষ চেষ্টার উত্তরে একটা জবাবও দিতে হইয়াছিল। সেটা এই—

"সারাদিন তোমার মা'র উপদেশ, রাত্তিরে তোমার বড়-বড়ানী, এতে আমায় পাগল ক'রে ছাড়বে দেখছি! না ঘুমুলে আমার অসুখ হবে, এখানে ত তোমাদের ডাক্তারও কত ভাল! শেষটায় আমি ম'রে যাব।"

এই কথাটাও সে না চাপা দিয়া বেশ গর্ব্বিতভাবেই বলিয়া গেল। চারুর পক্ষ হইতে যে ইহার প্রত্যুত্তরে দিন দুই তিন কথা বন্ধ ছিল, তাহাও কাহারও অবিদিত ছিল না।

রাত্রিতে শয্যায় এই রকমেই প্রেমালাপটা চলিতে থাকে, কদাচ সামান্য একটুখানি ব্যতিক্রম হয়; কিন্তু দিনের বেলা যত লোকের মধ্যেও বরের সঙ্গে কথা কহিতে, তাহাকে ফাইফরমাইস করিতে প্রমীলার কিছুমাত্র লজ্জা বা আপত্তি নাই। দিনের বেলা স্ত্রীকে লুকাইয়া চুরি করিয়া দেখার লোভে চারু বেচারা চারিদিকে উঁকি মারিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ আড়ালে দেখা হইলে হাতটা ধরিয়া কাছে টানিয়া আনে, একটুখানি আদর-সোহাগও জানাইতে চেষ্টা যে না করে, তাহা নহে। কিন্তু বেশী ভরসা সে করিতেই পারে না। হয় ত পিছন হইতে গিয়া চোখটা চাপিয়া ধরিয়াছে, প্রমীলা তখনই "মা গো! কে গো!" বলিয়া এমনই চেঁচাইয়া উঠে যে, ঝি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত। অপ্রস্তুত চারু তাড়াতাড়ি চোখ ছাড়িয়া দিয়া পলাইতে পথ পায় না; তাহারই মধ্যে শ্বশুরবাড়ীর আদুরে ঝির তিরস্কার লাভ করিয়া যায়—"বলি জামাই বাবু! আহা, ছেলেমানুষকে কি এমনি ক'রে ভয় পাওয়ায় গা? যদি চমকে উঠে ভিরমি যেত! তোমাদের পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ত নয়, যে, বাঘের সঙ্গে কুমীরের সঙ্গে লড়তে ডরায় নি।"

চারুর সকৌতুক প্রেমলীলার সকল আগ্রহ দারুণ লজ্জার অবসাদে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া তাহাকে মাটী করিয়া দিত, তথাপি তাহার যৌবনোৎফুল্ল তাজা প্রাণ ইহাতেই একেবারে দমিয়া পড়িত না। সে অশিক্ষিত বা নির্ব্বোধ নহে, নিজের মনকে সে এই বলিয়া বুঝাইত যে, "এইসা দিন নেহি রহেগা," এবং ইহার জন্য পণ্ডিত জনের বাক্যানুসারে "শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্" এই নীতি অনুসারেই চলিত। তাহার চরিত্রে উত্তেজনা বা লোভ কিছুই খুব বেশী প্রবল নহে। বিশেষতঃ প্রমীলার বাপের বাড়ীর সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া সে নিজে তাহার কাছে অন্তরে বাহিরে অত্যন্তই কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। ইহার উপর তাহার ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি ধরিয়া তাহার দুঃখ বাড়াইবার প্রবৃত্তিও

তাহার ছিল না। তবে ঐ তন্মুখী দুঃশীলা মন্থরাপ্রকৃতি ঝিটিকে সে-ও আদৌ দেখিতে পারিত না এবং সে ইহাও ভাবিত যে, ঐ ঝিটি মাঝখানে না থাকিলে প্রমীলাও অনেকখানি অন্য রকম হইতে পারিত। মা'র উপরেও চারুর মনে এ সম্বন্ধে একটুখানি সূক্ষ্ম অভিমান ছিল। অনেক সময় সে দেখিত, তাহার মা সেই হীনজাতীয়া ঝিয়ের কথায় এত বেশী উত্তেজিত হইয়া তাহার সঙ্গে সমানভাবে কলহ করিতেন যে, সে তাহাতে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইত। অশিক্ষিতা একটা সামান্য স্ত্রীলোকও যাহা, আর চারুর নিজের মা-ও কি তাহাই হইবেন? সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, এ সকল মহৎ গুণাবলী না থাকিলে আর বড়-ছোটর প্রভেদটা কি রহিল? জগতের এ বৈষম্যই যদি ঘুচিয়া যায়, তবে ত এ দেশেও আভিজাত্যের মৃত্যুকাল আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিতে হইবে! এই রকম করিয়াই চারু এই দাসীবিভ্রাটটাকে নিজেও সহ্য করিয়া লইত এবং তাহার ইচ্ছা হইত যে, তাহার মা-ও তাই করেন। মা'র কিন্তু মনের ভিতরটায় অত বড় উদারতার কোন খবর পাওয়া যাইত না। তিনি ঝিয়ের প্রত্যেক টিপটেনীটির জবাব ত যথাসাধ্য রূঢ় করিয়া দিতেনই, আবার সেই সব কথাই সাতটি করিয়া চারুর কাছে যখন তখন লাগাইতে যাইতেন। তাহার পর আরও এক বিষয় ইহার অপেক্ষাও চারুকে বেশী ব্যথিত ও বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা শ্বশ্রূ-বধূর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার। বউ ত শাশুড়ীকে ভয়, ভক্তি, এমন কি, একটুখানি সমীহ করিয়া চলেই না, শাশুড়ীও সেটা পারেন, কথার খোঁটায় খোঁটায় ইহার শোধ তুলিয়া লয়েন। তাহাতেও যখন কোন কাজ হয় না, অথবা বধূর পক্ষের প্রবল শক্তির নিকট তাঁহাকে হার মানিতে বাধ্য হইতে হয়, তখন আবার ছেলের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়া উহাদের উদ্দেশ্যে বিস্তর কটুকাটব্য করিতে থাকেন। তিনি কখন বলেন, "তোর মুখ চেয়ে ঢের সহ্যুম, বাবা! আর আমি পারছিনে চারু! তুই ওদের কোন বিহিত কর্।" কখন বলেন, "আমার দিব্যি দেন, তুই যদি ঐ বড়মানুষের মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে আবার একটা বিয়ে না করবি। তাই কর্ চারু, তাই কর্, দেমাকে মাগী মিন্‌ষে আর ঐ তাদের গতরখাকী আদুরী মেয়ে একসঙ্গে জব্দ হোক্।"

চারু মা'র এই সকল কথায় অত্যন্ত বেদনা পাইত। মা'কে সে চিরদিন প্রাণপণেই ভালবাসিয়াছে। পিতৃহীন চারু পৃথিবীতে মা ভিন্ন জানেই বা আর কাহাকে? সেই মা তাহার জন্য এতখানি অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন, অসুখী হইয়া পড়িতেছেন, অপমানিতাও হইতেছেন, ইহাতে তাহার যে অত ঠাণ্ডা রক্ত, তাহাও যেন গরম হইয়া উঠিতে চাহিত। সে যখন বিবাহ করিতে যায়, মা'কে বলিয়া গিয়াছিল, "মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি," মনেও করিয়াছিল তাহাই, দাসী না-ই হউক, অন্ততঃ মায়ের একটি মেয়ে—একটি সঙ্গিনী আনিয়া দিয়া নিঃসঙ্গ জননীর সে অনেকখানি তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে। কিন্তু এ কি হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল! ইহার অপেক্ষা আজন্ম সে আইবুড় হইয়া থাকিত, সে-ও যে তাহার পক্ষে ঢের বেশী ভাল হইত।

আবার এমন কথাটাও ভাবিতে চারু মনে মনে বেদনা বোধ করিত। আশার যে প্রবল প্রোজ্জ্বল দীপশিখা অন্তরে জ্বালাইয়া সে প্রমীলাকে তাহার অন্তরে বাহিরে বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহার মোহিনী শক্তিতে তাহার মন আজিও সে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া আছে! এ আশাদীপ কেমন করিয়া সে নিবাইয়া ফেলিবে? আত্মীয়স্বজন, ভাই, বোন্ তাহার কেহই আপন বলিতে নাই, আবার মুখচোরা চারুর বাহিরের বন্ধুও কেহ অন্তরঙ্গভাবে ছিল না; তাই সে তাহার আশৈশব অভ্যস্ত ভয়, লজ্জা, স্নেহ, প্রেম, প্রীতির অঞ্জলি উজাড় করিয়া লইয়া তাহার মানসমন্দিরের এই একমাত্র প্রিয়তমার চরণপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিল। তাই তাহার সেই প্রেমের দেবতার প্রেমহীনতায় সে মনে মনে ব্যথা পাইত, কিন্তু আশা ছাড়িত না; অধিকন্তু তাহার প্রীতির দেবতাকে তাহার জগতের শ্রেষ্ঠ বন্ধু মা'র কাছে অপ্রীতিভাজন দেখিলে তাহার মন গুমরিয়া কাঁদিতে থাকিত। কত দিন সে এই কথা মনে করিয়া ক্ষোভের নিশ্বাস মোচন করিয়াছে, কি পাপে সে এমন অসুখী হইতে বসিয়াছে? কেন প্রমীলা তাহার মা'কে আর তাহার মা প্রমীলাকে একটু সহ্য করিয়া চলিতে পারিল না?

৪

আষাঢ়ের নবনীল কাদম্বিনী সৌরকরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়া, কঠোর শব্দে শব্দায়মান বজ্রপ্রহরণে সাজিয়া আসিয়াছিল। চারুদের অঙ্গনে চারুর মা'র পূজার জন্য কয়েকটি

ফুলগাছ সযত্নে প্রতিপালিত হইত; ইহাতে যুঁই ও মল্লিকা অজস্র ফুটিয়াছিল; তাহারা মানব-হস্ত-নিষিক্ত জললাভকে যেন পর্য্যাপ্ত বোধ না করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত মুখে ঊর্দ্ধে চাহিয়া আছে। মেঘের গুরু গুরু গম্ভীর তূর্য্যরবে তাহাদের ক্ষুদ্র প্রাণ ভয়ে নহে, পরন্তু আসন্ন লাভের আশায় আনন্দে ঐ গুরু গুরু শব্দের প্রতিধ্বনি তুলিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। এক পাশে একটি মাচায় করিয়া একটা মালতী-লতা, চারুই কোথা হইতে আনিয়া পুতিয়াছিল, সেটা ত আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল —বাতাসের সঙ্গে তাহার যেন সে দিন কথার শেষ হইতেছিল না। আর খুসী হইয়াছিল চারুর মা'র রান্নাঘরের পাশের বাঁশঝাড়গুলা। তাহাদের পাতাগুলা সর্ সর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া কত কিই না বলাবলি করিতেছে, কাটা বাঁশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাতাস ঢকিয়া ফুঁ দিয়া দিয়া বাঁশীর তান ধরিয়া দিয়াছে। তাহাদের উঁচু মাথা নত হইয়া হইয়া আসন্নবর্ষী নব মেঘমালার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইতেছে। কণ্ঠে বুঝি উহারই বন্দনা-গান!

এই আকাশ-ভরা মেঘের আড়ম্বর ও ঝড়ের হাওয়ায় প্রমীলা ভারী খুসী হইয়াছিল। তাহার শ্বশুরবাড়ীর কঠোর নাগপাশে বাঁধা মন-প্রাণ এ দৃশ্যে ময়রের মত সঘন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার তিনটি ছোট ছেলে সে সময়ে তাহার নিকট উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া সে দ্রুত চঞ্চল চরণে তেতলার ছাতে উঠিয়া গেল; সেখানে কতকগুলি কাপড় শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি তুলিয়া লইবার কথা তাহার মনেও হইল না, আম-সত্তর পাতরখানাও তাহার দৃষ্টিতে পড়িল না, সে ঐ সঙ্গী দলের সঙ্গে মাথায় দেওয়া অঞ্চলখানাকে খুলিয়া দুই হাতে হাওয়ার বিপরীত দিকে পালের মত তুলিয়া ধরিয়া ঝম্-ঝম্ মল বাজাইয়া একেবারে উদ্দাম হইয়া ছাতের এ ধার হইতে ও ধার পর্য্যন্ত ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আর সে হাসিরই বা ঘটা কি!

চারুর মা নীচে হইতে অনেক ডাকাডাকি করিয়াও কাহারও সাড়া পাইলেন না। বিলাসী পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিল, চারুও বাড়ী নাই। এ বাড়ীর ঠিকা ঝি এখনও দেখা দেয় নাই। তেতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে চারুর মা'র বুকে বড় হাঁপ ধরে, তাই যথাসাধ্য চীৎকারশব্দে বধূকে ডাকিয়া তিনি শেষে স্থির করিলেন, বউ হয় ত কোথাও ঘরে দোর বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে, ঘুম অবশ্য সে দস্যি মেয়ের চক্ষুতে নাই, তথাপি হয় ত কেমন করিয়া দৈবাৎ আজ ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে।

যখন চড়বড় করিয়া মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন অগত্যা চারুর মা'কে শুষ্ক কাপড়, বিশে-ষতঃ আমসত্ত্বর মমতা ব্যস্তসমস্ত করিয়া উপরে তুলিয়া আনিল। কিন্তু ছাতে উঠিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল—বধূর আক্কেল দেখিয়া। গায়ের মাথার কাপড় খোলা - পাল তোলা ঝড়ে-পড়া নৌকার মত। আর তিনখানা ঐ রকমই নৌকার মধ্যবর্ত্তী হইয়া সে ছাতখানাকে তোল-পাড় করিয়া ফিরিতেছে। বৃষ্টি বলিয়াও কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই; জিনিষগুলা যে নষ্ট হইতেছে, সে দিকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। চারুর মা'কে ক্রোধ ও লজ্জা যেন অন্ধ করিয়া দিল, অত বড় মেয়ে একটুক লজ্জা-সরমও দেহের মধ্যে নাই —তিন তিনটে বেটাছেলের মধ্যে গা-মাথা খুলিয়া ঐ তাণ্ডব!

তিনি জ্ঞানশূন্যের মত দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিয়া উঠিয়া বধূকে উচ্চকণ্ঠে গালি দিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"ভালখাকির বেটী! কি বলবো, তুই আমার চারুর বউ, তা' না হ'লে তোকে আমি আজ পাঁশ পেড়ে কেটে ফেলতুম!"

প্রমীলা উড়ন্ত পাল-তোলা আঁচলখানা তেমনই ভাবে ধরিয়া থাকিয়াই দৌড় বন্ধ করিয়া সদর্পে ফিরিয়া দাঁড়াইল; উদ্ধত কণ্ঠে সবেগে কহিয়া উঠিল, "কি, করেছি কি যে, খামোকা এসেই গাল দিলে?"

এই প্রত্যুত্তরবাক্যে চারুর মা'র চিত্ত ছাড়িয়া পিত্ত অবধি যেন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি রোষরুদ্ধ তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন;—"হতচ্ছাড়ী হারামজাদী! দোষ ক'রে ফের চোপা! বেহায়া ছোটলোকের বেটী! কোন্ দিন তুই কুলে আমার কালি দিবি! বেটাছেলের সঙ্গে এই ধীঙ্গী-নাচ বউমানুষের!"

এই সাঙ্ঘাতিক ভীষণ অভিব্যক্তির একটা ভীষণতর ফলও এক মুহূর্ত্তেই ফলিয়া গেল; প্রমীলার সমস্ত দেহমন এক মুহূর্ত্তে যেন একটা উন্মত্ত হিংস্র রোষে আরণ্য পশুর মতই উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে ফোঁস করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দুর্দ্দান্ত বাঘের মতই শাশুড়ীর ঘাড়ের উপর পড়িল।

তিনি হাত দিয়া ঠেলিয়া দিতে যাইতেই সে তখন তাঁহার সেই হাতখানা এমন প্রাণপণ জোরে কামড়াইয়া ধরিল যে, দেখিতে দেখিতে তাহার দাঁতের পাশ দিয়া হাত হইতে রক্ত পড়িয়া গেল।

এ দিকে প্রমীলার এই অমানুষিক কাণ্ডে মহাভয়ে ভীত হইয়া তাহার সঙ্গী তিনটিই দুড় দুড় শব্দে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহাদের মনে হইল, ইহার পর তাহারা সুদ্ধ এই ব্যাপারে এমন হইয়া জড়াইয়া পড়িবে যে, সে একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া যাইবে। সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া নামিতে নামিতে তাহারা প্রত্যেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া লইল যে, আর কখন তাহারা প্রমীলার সহিত খেলার লোভে এ বাড়ীর মাটী মাড়াইবে না।

"কেষ্ট! মতে! কোথা যাচ্ছিস্ রে? তোদের বৌদি কোথা? মা কোথা?" চারুর এই সহাস্য প্রশ্নে কেবলমাত্র তাহারা ভীত দৃষ্টিতে বারেক উর্দ্ধদিকে ইসারা করিয়াই দ্বিগুণ বেগে ছুটিয়া পলাইল।

ঝড় তখন প্রবল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাই দূর হইতেই শুনা যায় নাই, নিকটে আসিতেই একসঙ্গে চারুর দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়ই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল। চারুর স্ত্রী কুপিতা সিংহীর মত রাগে ফুলিতে ফুলিতে শাশুড়ীকে কামড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর তিনি অপর হস্তে তাহাকে ধাক্কা দিতে দিতে অজস্র ধারায় তীব্র গালির স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন।

এই দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া প্রথমটা চারু যেন বজ্রস্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। প্রমীলা যতই মন্দ হউক না, সে যে এত বড় অসমসাহসিকতা ও অনাচার ঘটাইতে পারে, এ বোধ করি, নিজের চোখে না দেখিলে চারু কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। পরক্ষণেই একটা নিদারুণ ক্রোধের আগুন তাহার শরীরের প্রতি রন্ধ্রে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। তাহার মা'র রক্ত প্রমীলার ঠোঁটের পাশে গড়াইয়া আসিয়াছে! চারু নিজের পায়ের চটি-জুতা খুলিয়া লইয়া প্রচণ্ড বলে প্রমীলার পৃষ্ঠে আঘাত করিল।

এই যে কাণ্ডগুলা অকস্মাৎ কয়েকটা মাত্র সেকেণ্ডের ভিতর ঘটিয়া গেল, ইহা কেহই কি কোন দিন কল্পনা করিতেও পারিত? চারুর মা পল্লীবাসিনী অশিক্ষিতা মুখরা স্ত্রীলোক হইলেও চারুর বউকে বাপ তুলিয়া বা তাহার চরিত্র লইয়া যে এত বড় কঠিন কথাগুলা সে দিন বে-ফাঁস ভাবেই বলিয়া ফেলিবেন, তাহাও তিনি সুস্থমনে কখনও হয় ত মনে করিতে পারিতেন না। প্রমীলা শাশুড়ীকে ভাল না বাসিলেও, শ্রদ্ধা না করিলেও, সে যে কদাচ কাহারও সহিত এত বড় অসৎ ব্যবহার করিতে পারে, সে-ও কখনও এরূপ কল্পনাই করিতে পারিত না। আর চারু? তাহার ত কথাই নাই।

প্রথমটা রাগে অন্ধ হইয়া গিয়া চারু যখন স্ত্রীকে জুতা মারিয়াছিল, তখন তাহার মনে শুধু এই কথাই প্রবল হইয়া জাগিয়াছিল যে, সে তাহার মাতৃ-অঙ্গে আঘাতকারীর দণ্ডবিধান করিতেছে। দণ্ডটা যে কতখানি হইয়া গেল, এ কথাটা তাহার তখন যেন একেবারেই আর খেয়ালের ভিতর ছিল না। মা'র দুর্জ্জয় ক্রোধ, অভিমান ও দুঃখে মিশ্রিত অজস্র উত্তেজনার বাণী, মাথার উপরের বৃষ্টিধারার সঙ্গে সমান স্রোতে তাহার ফুটন্ত রক্তের উত্তাপ বর্দ্ধিত করিতেছিল। তাহার পর তাহাকে সহসা স্তম্ভিত করিয়া দিল— সেই রঙ্গভূমে চতুর্থ ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাব। বোধ করি, সেই ছেলেদেরই কাহারও মুখে অর্দ্ধেকটা ঘটনার কাহিনী কর্ণ-গোচর হইয়াছিল, তাই বিলাসী এই ঝড়-জল মাথায় করিয়াই হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। চারুর হাতের দ্বিতীয় জুতার ঘা প্রমীলার পিঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আসিয়া আকাশের মেঘের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া কঠোর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"জামাই বাবু!"

সঙ্গে সঙ্গেই বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া গিয়া ধাক্কা দিয়া বিলাসী চারুকে ঠেলিয়া দিল এবং প্রমীলাকে বুকের মধ্যে সাপটিয়া ধরিল।

"জামাই বাবু! মনে করতুম, তুমি বুঝি তবু একটু ভদ্দর নোক; তা নয়, তুমি আমাদের বাগ্‌দী দরোয়ান ভজার চেয়েও বেহদ্দ! নেকাপড়া শিকে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল্‌তে ঘেন্না হলোনি? তাও আবার পায়ের জুতো! গলায় দড়ি অমন নেকা-পড়ার!"

চারুর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। এ তিরস্কারে নিজের কৃত কর্ম্মটা যেন তাহার চোখে তৎক্ষণাৎ জলজল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সত্যই ত, সে এ কি করিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মা'র নির্য্যাতনের শোধ লইতে গিয়া নিজে সে বড়

ভয়ানক পাপ করিয়া ফেলিয়াছে যে! অমন করিয়া জুতা-মারাটা তাহার মোটেই সঙ্গত হয় নাই। অথচ এ ছাড়াই বা সে অবস্থায় সে কোন্ সহজ উপায়ে প্রমীলার হিংস্র দংশন হইতে তাহার মা'কে ছাড়াইতে পারিত, সে কথাটাও বেশ ভাল করিয়া তাহার উৎক্ষিপ্ত চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে-ছিল না। এ কাযটা যে খুব বেশী অন্যায় হইয়াছে, এমন ভাবনা মা'র তখনকার অবস্থা স্মরণ করিতে গেলে মনে করিতে পারা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। আবার এই বালিকা, তাহার স্ত্রী, স্ত্রীলোক, ইহাকেও নির্ম্মমভাবে জুতা মারা, এ যে পৌরুষের একেবারেই বিরোধী বস্তু, এ যে অত্যন্তই হীনাচার, এ বিষয়েও ত কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সন্দেহ করিবার নাই।

বিলাসীর হাতের ঠেলায় পিছনদিকে প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খাইয়া চারু সেইখানেই স্তব্ধ অসাড় হইয়া তেমনই ভাবেই রহিয়া গেল। ঝড়ে, জলে, মেঘের ডাকে প্রকৃতির যেন রুদ্রাণীর প্রতিকৃতিপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে দিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। ইহার অপেক্ষা ঘোরতর বিপ্লব তখন তাহার শরীর-মনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

বিলাসী প্রমীলাকে বুকে বাঁধিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এবং তাহার শত্রুস্থানীয় মাতাপুত্রের উদ্দেশ্য প্রবল শাসনবাণী বর্ষণ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল। এতখানি বৃষ্টির জলে ভেজা যে এ দেশে তাহাদের দুই জনের পক্ষেই সুবিধা নহে, তাহা ভাবিয়াই সে আপাততঃ রণ-রঙ্গে ভঙ্গ দিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রমীলাকে শীঘ্রই শান্ত না করিলে নহে; সে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত ঘটনাটা তাহার মুখ হইতে একবার ভাল করিয়া শুনাও দরকার।

চারুর মা'র সঙ্গে ইহারই মধ্যে একটা খণ্ড-যুদ্ধ হইয়া গেল। গৃহিণী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটনার যে পরিচয় শুনাইতেছিলেন, তাহা শুনিয়াই বিলাসী ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বাছা, কম মেয়ে নও! লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে ছেলেকে দিয়ে এই যে কাণ্ডটি করালে, এ কি খুব ভাল হ'ল? বাবু কি ভেবেছ, তাঁর মেয়েকে জুতো মারার রাগ জামাই বলেই ভুলে যাবে? তা' যদি যায়, তা হ'লে এই নাক-কান নিজের হাতে কেটে নিয়ে আমি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব! সে পাত্তরই নয় তারা।"

চারুর মাও বিলাসীর সহিত সমান স্বরে সতেজে জবাব করিলেন, "কি করবে তোদের বাবু, করতে বলিস্! তার মেয়ে যে কামড়ে আমার গায়ের ছাল তুলে নিলে, সেটা কি চোখের মাথা খেয়ে কাণা গিন্নে দেখতে পাবে না? মা'কে ধ'রে মারবার জন্যেই কি ছেলে আমার তাঁর ঘরে বিয়ে করতে গেছলো?"

"নাঃ, তানাদের মেয়েকে জবাই ক'রে মাংস খাবার তরেই তানারা তোমাদের বাড়ী মেয়ে পাঠিয়েছিল!"—চটাং করিয়া এই জবাবটা দিয়া বিলাসী প্রমীলাকে ধরিয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। চারুর মা অতঃপর যে সব কথা তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সে কেবল তাঁহার নিজের কানে আসিয়াই আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল। চারু সেখানে উপস্থিত থাকিলেও, বৃষ্টির শব্দও ততক্ষণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও প্রবলতর কারণ—তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম তখন একেবারেই যেন নিঃশক্তি হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টির বেগ, ঝড়ের চীৎকার, মা'র কণ্ঠ কিছুই তাহার অনুভূত হইতেছিল না। তাহার মনটা যেন একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

মা বলিলেন, "আয়, চারু! নেমে যাই। অবেলায় ভিজে গেলি, রোগে না পড়িস আবার। কি কুক্ষণেই যে বাছার বে' দিয়েছিলুম! ছি ছি ছি, একটা দিন ভালন্তে কাটলো না। তাই ত বলছি বাবা! আবার একটি বিয়ে কর, এদেরও দেমাক ভাঙ্গবে, তোরও সুখ হবে।"

চারু শুধু শূন্যদৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে নামিয়া গেলল। একটি কথাও সে উচ্চারণ করিল না।

৮

সব যেন এলোমেলো হইয়া গেল। চারুর মা'র বাহিরটা যতই কঠিন দেখাউক, তাঁহার মনের ভিতরটা তত দূর শক্ত নহে। তিনি সেই দংশনক্ষত হস্তে জলপটী বাঁধিয়া আবার সংসারধর্ম্মে মনোযোগী হইলেন। প্রতিদিনের মতই রান্নাবান্না সারিয়া চারুকে আহারের জন্য ডাকিতে

আসিতেই সে তাহার শূন্য দৃষ্টি অন্ধকারের চক্র হইতে ফিরাইয়া লইয়া নিঃশব্দে মাতার অনুসরণ করিয়া আসিয়া আসনে বসিল; আহারে বসিয়া খুব ভাল করিয়া না-ই হউক, তবু যা' পারিল, খাইয়া উঠিয়া গেল। মাতা-পুত্রে কোন কথাই এখন হইল না, শুধু আচমনের জলের ঘটী ছেলের হাতে তুলিয়া দিয়া মা বলিলেন, "এই মাসেই আমি তোর আবার বিয়ে দেব চারু! এবার কিন্তু নিজে না দেখে আর বউ আন্‌ব না।"

চারু হাঁ, না কোন জবাব না দিয়াই যেমন আসিয়াছিল, তেমনই নীরবে ফিরিয়া চলিয়া গেল। তাহার এ মৌনটা সম্মতিলক্ষণ কি না, ঠিক করিয়া তাহাও বুঝিতে পারা গেল না।

কিন্তু তাই বলিয়া চারুর মা তাঁহার আতিথ্য-ধর্ম্মের প্রত্যবায় ঘটিতে দিলেন না। বধূর ঘরের দ্বারে আসিয়া ডাকিলেন, "বৌমা! খেতে এস। ওগো বাছা, শুন্‌ছো? রাত হয়ে গেছে, উঠে এস! ও ঝি! শুন্‌তে পাচ্ছো গা? বৌমাকে নিয়ে খেয়ে যাও না, বাছা!"

ভিতর হইতে বিলাসীর রোষ-দর্পিত কণ্ঠ সাড়া দিল, "ও আর এ বাড়ীর ভাত খাবে নি গো, একেবারে তখন কালকে বাড়ী যেয়ে মুখে জল দেবে বলছে!"

চারুর মা'র গা আবার এই উত্তরে জ্বলিয়া উঠিল। দোষ যখন উভয় পক্ষেরই আছে, আর তিনি যখন নিজের মান খোয়াইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন উহাদেরই বা এতখানি তেজ কিসের? তিনি ক্রোধ-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "সেই ভাল।" মনে মনেও বলিলেন, "তা হ'লে আমিও বাঁচি বাবু! আর বেটার বউ নিয়ে আমার ঘর ক'রে কায নেই মা, দুষ্টু গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ভাল, কি আর সাধ করেই বলে! থাক, কালই একবার সদার পিসীকে ডাকাতে হবে। এবারে টাকাওলা ঘরে আর কায করব না, বৌটি যেন সুশীল হয়। আচ্ছা, নিস্তারের মেয়েটি নিলে কেমন হয়? পাড়াঘরেরই মেয়ে, মা'রও যা কিছু আছে, সব পাবে, মুখে রাটুকু নেই! নিত্যি রোগী বটে, ছেলে ত আমার ডাক্তার হয়েছে, রোগ হ'লে সারিয়ে নেবে। ডাক্তার-খরচা ত আর লাগবে না!"

ঝড় থামিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির বেগও মন্দীভূত হইয়াছিল, টিপ-টিপ করিয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে বাতাস বাঁশের ঝাড় ও গাছের পাতা নাড়া দিয়া তাহাদের মধ্যের সঞ্চিত জলের ধারা ঝর্-ঝর্ করিয়া ঝরাইয়া ফেলিতেছিল। বহু দিনের পিপাসা-শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া ভেকগুলা পরম পরিতৃপ্তির উচ্চ আনন্দোচ্ছ্বাস প্রচার করিতেছিল। নিবিড় অন্ধকারে আকাশ ও পৃথিবী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

চারু আসিয়া আস্তে আস্তে চোরের মত নিজের শয়ন-ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়াইল। ক্ষণকাল সেই নিঃসাড় ও রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাহিরে কান পাতিয়া থাকিয়া যখন ভিতরের কোন খবরই সে জানিতে পারিল না, তখন উদ্বেগ-ব্যাকুল-বক্ষে ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এবার একটুখানি জোর দিয়া ঠেলিয়া সে অনুচ্চস্বরে ডাক দিল, "ঝি!"

"কে গা?" বলিয়া বিলাসী ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল।

"আমি, দোরটা খুলে দাও ত" বলিয়াই চারু যেন সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল। অনেকখানি দ্বিধা ও সঙ্কোচকে অনেক চেষ্টায় কাটাইয়া তবেই সে এতখানি দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এখন বিলাসীর গলার স্বর তাহার সেই সঙ্কুচিত মনকে যেন সংশয়সঙ্কুল করিয়া তুলিয়া পুনশ্চ সমধিক দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। সে যে একটা নিষ্পত্তির শেষ আশা মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিল, সেটা তাহার সেই মুহূর্ত্তেই প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। প্রমীলার এই মন্থরা দাসীটা তাহার আশালতার মূলে যে কুঠারাঘাত করিবার জন্যই এই মধ্য-রাত্রিতেও দ্বারে খিল আঁটিয়া জাগিয়া বসিয়া তাহাকে পাহারা দিতেছে, ইহা সে অনুমানেই বুঝিয়া লইল।

তথাপি যখন এতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তখন ত নিতান্ত ফিরিয়া যাওয়া যায় না। চারু তখন সাহসে ভর করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "দোরটা একবার খুলে দাও ত, ঝি।"

ঝি কহিল, "এই রাতটুকুনের তরে আর আমাদের জ্বালিও নি, বাবু; যেমন একটি ধারে প'ড়ে আছি, প'ড়ে থাক্‌তে দাও, সক্কালবেলা পরাণ হালদারের বাড়ী যেয়ে বাবুকে তার করাবো, তারা এসে আমাদের নিয়ে গেলে তখন নিশ্চিন্দি হয়ে ঘর দকোল করো।"

এই উত্তর পাইয়া চারুর মনে একটা দারুণ লজ্জা হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও দেখা দিল। এই ঘৃণিত নিতান্ত

লজ্জাজনক কাহিনী যদি পাড়ায় পাড়ায় প্রচার হয় এবং তাহাদেরই সাহায্য লইয়া যদি বিলাসী এই খবরটা চারুর শ্বশুরকে পাঠায়, তাহা হইলে সে যে কি লজ্জাকর, ক্ষতিকর কাণ্ডই হইবে, তাহা মনে করিতে গিয়াও চারুর মনটা যেন নিদারুণ আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া উঠিল ; কণ্ঠে মিনতি ভরিয়া সে কোনমতে বলিয়া ফেলিল,—"তুমি দোরটা একটিবার খুলে দাও, আমি বেশীক্ষণ থাকব না।"

ভিতরে একটুখানি ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহার শব্দ শুনা গেল, ঝমর ঝমর করিয়া হঠাৎ প্রমীলার পায়ের মল একবারটি বাজিয়া উঠিল, প্রচণ্ড আশায় চারুর বুকের ভিতরটায় তড়াক্ করিয়া রক্তটা লাফাইয়া উঠিল। স্বয়ং প্রমীলাই কি তবে তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিতে উঠিতেছে !

কৈ না ! দ্বার ত খুলিল না ! চারুর শরীরের স্নায়ু-শিরাগুলা যেন ঘনীভূত বেদনায় টাটাইয়া উঠিল। একটা তীব্র ক্ষুব্ধ অভিমান বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া সে বহুক্ষণ নিষ্ফল প্রতীক্ষার পরে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। দুঃখে যেন তাহার বুকটা তখন চড়-চড় করিয়া ফাটিতেছিল। চারুর মনে আজ কি যে অকথ্য যন্ত্রণা, তাহার এতটুকু—একটি বিন্দু ধারণাও যদি তাহাদের থাকিত ! শিথিল অবশ পদে চারু সমস্ত রাতটাই ঘরে-বাহিরে পাইচারী করিয়া বেড়াইল। রাত্রি ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল ;—বারোটা, একটা, দুইটা পর-পর বাজিয়া চলিল। বাতাস কখন একটু মন্দীভূত হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, আবার কখন শোঁ শোঁ,গোঁ গোঁ করিয়া ঝড়ের হাওয়া হুঙ্কার ঝাড়িয়া প্রবল আক্রমণে গাছ-পালাগুলারই উপর ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়ে। জলের ছাটে খোলা বারান্দা ভাসিয়া যাইতেছিল, চারুর গায়ের উপরেও তীরের ফলার মত কখনও জোরে, কখনও ক্ষীণ-ভাবে জলের ঝাপট আসিয়া পড়িতেছিল ; তাহার কাপড়-জামা সন্ধ্যাকালেই ভিজিয়াছিল, সারারাত্রিতেও তাহা শুকা-ইতে অবসর পাইল না। ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কন্-কন্ করিয়া উঠিতেছিল ; আবার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে, লজ্জায় ও দুশ্চিন্তায় তাহার শরীরের ভিতরে যেন সেই ঠাণ্ডা রক্ত ১ শত ১০ ডিগ্রীর তাতে তাতিয়া তাহার মাথার ভিতরটাতে তোলপাড় করিতেছিল। সে যে কায আজ করিয়াছে, তাহার পর তাহার জন্য যত বড় শাস্তিরই বন্দোবস্ত করা হউক, তাহার আর আপত্তি করিবার কোন উপায় নাই ! এই কথা মনে হইতেই নৈরাশ্যে তাহার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইতেছিল।

৬

প্রাতঃকালে অনেক বেলায় দরজা খুলিয়া বাহির হইতেই বিলাসীর সদ্য-নিদ্রাভঙ্গ-অলস ও রক্তরাগযুক্ত চোখের দৃষ্টি চারুর সঙ্কুচিত নেত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া গেল। অমনই সবেগে মুখখানাকে ঘুরাইয়া লইয়া বিলাসী তাড়াতাড়ি দরজাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর চারুর দিকে না চাহিয়া মাটীর দিকে চোখ করিয়া মেঘ-গম্ভীর স্বরে চারুকেই শুনাইয়া বলিল, "যাই একবার পদ্মর মা'র কাছে, ওদের বাড়ীর বাবুদের দিয়ে বাবুকে একটা তার করিয়ে দিয়ে আসি গে, আজকের মধ্যেই ত বাছাকে কোন রকমে এখান থেকে বা'র ক'রে নিয়ে যেতে হবে। নৈলে ত আর হাড় কখানাও তাদের ফিরিয়ে দিতে পারব না।"

এই ব্যাখানটুকু শুনিয়াই চারু যেন লজ্জায় একেবারে মর্ম্মের ভিতর মরিয়া গেল। ছি ছি ! কি ঘৃণার কথা ! এই লইয়া ঝি মাগীটা তবে পাড়ায় পাড়ায় একটা ভীষণ কুৎসার সৃষ্টি না করিয়াই ছাড়িবে না ! একে ত চারু নিজের কাযে নিজেই লজ্জার আঘাতে মরিয়া গিয়াছে, তাহার উপর এই সকল অপমানের আঘাত তাহাকে কি মর্ম্মান্তিক হইয়াই যে বাজিবে, সে যেন তাহা ধারণাও করিতে পারিল না।

বিলাসী হাই তুলিয়া, আলস্যে গা ভাঙ্গিয়া, তাহার ফরসা কাপড়ের আঁচলখানি ভাল করিয়া গুছাইয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেই চারু আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। গভীর লজ্জায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে থাকিলেও জোর করিয়া সঙ্কোচ ঠেলিয়া ফেলিয়া সে ঝি'র কাছে হাতযোড় করিল, "রাগের মাথায় মহা অন্যায় কায করেছি, ঝি ! এবার তোমরা আমায় মাপ কর, প্রমীলাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে কিছু খাওয়াও, তাহার পর না হয় আমি নিজে গিয়ে তোমা-দের কাল-পরশু রেখে আসব।"

রাগে ভ্রুকুটি করিয়া চারুর শ্বশুরবাড়ীর ঝি বলিল, "ও সব ছেঁদো কথায় নেই, জামাই বাবু ! আমরা মুখ্যু নোক বাবু, এক কথাই জানি। পিসী বলেছে, সে এখানের অন্ন-গ্রহণ করবে না, তাকে ত উপুসী রেখে মারতে পারি নে। আমার কায আমায় করতেই হবে। তা' দেখ, সারারাত পিঠের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে ক'রে এই ভোরের বেলাটায়

একটু চোখ বুজেছে, ঘুম যেন ভাঙ্গিয়ে দিও না। আমি কাযটা সেরে আসি।"

এই বলিয়া ঝম্-ঝম্ শব্দে কয়েকটা টাকা বাজাইতে বাজাইতে চারুর দিকে একটা ক্রূর কটাক্ষ হানিয়া বিলাসী খর-চরণে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল। সাড়া পাইয়া চারুর মা বাসি পাট সারিতে সারিতে ডাক দিলেন, "মেয়ে! বলি ও মেয়ে! শুন্‌ছো? শুনে যাও—"

বিলাসী মুখখানা ঘুরাইয়া বাঁকা সুরে জবাব দিল, "দাঁড়াও বাছা, এখন যা করতে যাচ্ছি, তাই ক'রে আসি আগে। কি পেছন থেকে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ ক'রে বাধা দেওয়া গা! একটু যদি আক্কেলের নাম-গন্ধও আছে দেহে!"

চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া চারু যখন আসিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল, তখন তাহার মনের মধ্যে কত রকমেরই নূতন নূতন সঙ্কল্প যেন সঘনে ঘূর্ণায়মান একখানা কলের চাকার মতই এই উঠা এই নামা করিয়া অতি দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছিল। একবার সে ভাবিল, না, কায নাই, এখনও ফিরিয়া যাই। বলিবার তাহার ত কিছুই নাই, সে বলিবে কি? নিজের হাতে পায়ের জুতা খুলিয়া যে তাহার বালিকা স্ত্রীকে প্রহার করিতে পারিয়াছে, তাহাকে আর কে বিশ্বাস করিতে পারে? প্রমীলা তাহাকে এ জন্মে আর কখন ক্ষমা করিতে পারিবে না, তাহার পক্ষে তাহা যে সম্ভব নয় এবং এই ক্ষমার দাবী করিবার কোন অধিকারই তাহার নাই।

প্রমীলা তখন জাগিয়া ছিল। কেমন করিয়া বলা যায় না, হঠাৎ চারুর সান্নিধ্য জানিতে পারিয়াই বোধ করি চট্ করিয়া পাশ ফিরিল এবং ঠিক দ্বারের সম্মুখেই দ্বারের দিকে পিঠ করিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া চারুকে ঠায় তাহারই দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া যেন ক্রোধে অভিমানে ফুলিয়া উঠিল। মাথার কাপড়টাও তুলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়া সে সভয় উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "বিলাসী! বিলাসী! শীগ্‌গির আয়।"

প্রমীলার ভাব দেখিয়া চারুর অপরাধ-সঙ্কুচিত চিত্ত যেন হীনতার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। সে নিজেকে লইয়া যে কি করিবে, কোন্‌খানে লুকাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত, লজ্জিত ও খেদ-জড়িত স্বরে ব্যাকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ক্ষমা চাইবার মত কায আমি করি নি প্রমীলা! তাই সে কথা আমি তোমায় বলতেও আসি নি; আমি জানি, এ জন্মে তুমি আমায় আর কখন ক্ষমা করতে পারবে না। শুধু এইটুকু আমি বলতে এসেছি, তুমি উঠে মুখ ধুয়ে কিছু খাও, যদি এ বাড়ীর জিনিষ না খাও, নিজের পয়সা দিয়ে আনিয়ে খাও, তা'র পর যদি অনুমতি কর, আমি তোমায় তোমাদের বাড়ী রেখে আসি। পরকে দিয়ে আমায় অপমান করতে দিও না।"

চারুর কণ্ঠে যে আকুল মিনতি বাজিল, তাহার রেষ প্রমীলার অপমান-ক্ষুব্ধ রোষ-তপ্ত অন্তরেও যেন একটুখানি স্পর্শ না করিয়া পারিল না। আর আসলে প্রমীলার মনটাও যে খুবই শক্ত ছিল, তাহাও নহে। বিলাসীর কুপরামর্শ ও প্রশ্রয় না পাইলে সে হয় ত এমন উদ্ধতাচরণ করিত না; এত দিনে হয় ত ইহাদের অনেকটাই বশ হইয়া যাইত। এখন বিলাসীর অজ্ঞাতে স্বামীর এই দীন মূর্ত্তি ও আকুলতাভরা অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর তাহার মনকে একটুখানি বিচলিত করিলেও সে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে টলিল না। কাল অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বিলাসী তাহাকে বুঝাইয়াছে যে, সে যদি এখন শক্ত থাকিতে পারে, তবেই এই কারাগৃহ হইতে তাহাদের দুই জনের উদ্ধার সম্ভব হইবে। আর তাহার পর—এই সমস্ত শুনিলে নিশ্চয়ই তাহার বাবু আর কখনও তাহাকে এ-মুখো হইতে দিবেন না। প্রমীলার আবার ভাবনা কি? নাই বা সে এমন হতভাগা শ্বশুরবাড়ী ঘর করিল! বাপের রাজত্বে পায়ের উপর পা দিয়া সে অনায়াসে রাজকন্যার মত জীবন কাটাইয়া দিবে। বড়লোকের মেয়েরা না কি কখন গরীবের ঘর করিয়া থাকে! আগে মনে হইত, জামাইবাবু বুঝি লোক ভাল! ও মা, তা নয়, ভিতরে ভিতরে সব এককাট্টা! ঐ যে কথায় বলে "মোষের শিং বাঁকা, যোঝবার বেলায় একা" এও তাই! মা'র দিক্ হয়ে কি না অবলা মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা! তাও আবার পায়ের জুতো! ওর লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে, ওর আয়ুতে ঘুণ ধরেছে, ওকে সর্ব্বনাশে গ্রাস করেছে; খবরদার, প্রমীলা যেন উহার কথায় না ভিজে! বিলাসীরা ছোটলোক বটে, কিন্তু তাহার স্বামী কখন্ তাহার গায়ে হাত তোলা ছেড়ে উঁচু 'রা'টিও করে নাই। করিলে সে দেখিয়া লইত কত বড় স্বামী সে!

কাযেই প্রমীলা চারুর মিনতিতে কর্ণ রুদ্ধ করিয়া যেমন তেমনই ক্রুদ্ধ, উদ্ধত ও বিদ্রোহিভাবে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া

মহাপ্রভুর ভাবাবেশ

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
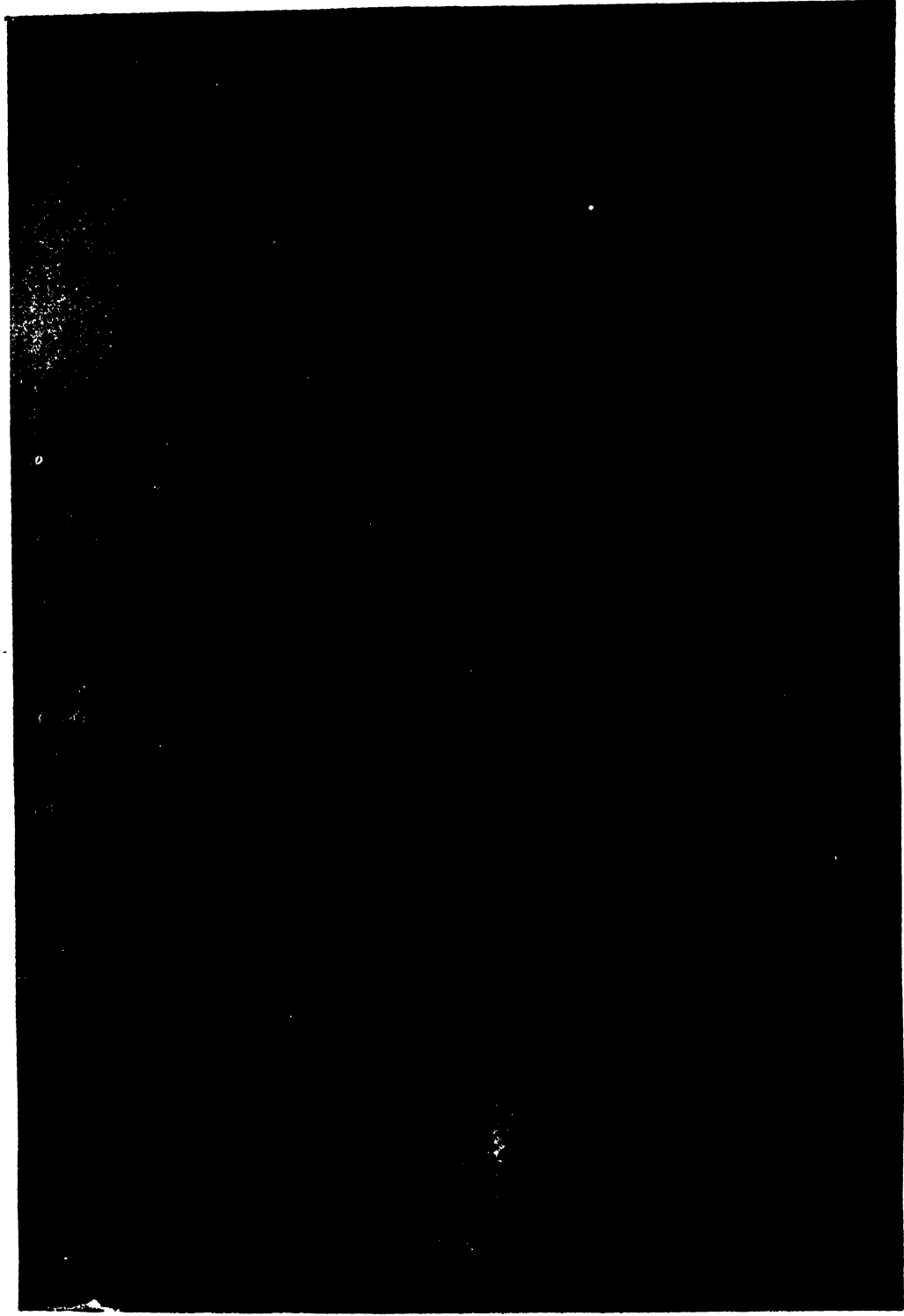
রহিল। তাহার রোষপ্রদীপ্ত কঠোর দৃষ্টি বারেকমাত্র চারুর অশ্রু-আবিল কাতর নেত্রকে ঝলসিত করিয়া গেল।

প্রমীলার পায়ের তলায় বসিয়া হাতযোড় করিয়া চারু বলিল, "এইটুকু ভিক্ষা চাইছি, মিলি! শুধু এইটুকু! অনাহারে এমন ক'রে চ'লে যেও না। আর দয়া ক'রে আমায় পৌঁছে দেবার আদেশ দাও। যা' আমি করেছি, আমার আর জোর ক'রে বলবার কিছু নেই, এখন যদি দয়া কর, তবেই—"

প্রমীলা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষকে যে জুতো মারতে পারে, সে চামার। আমি চামারের বাড়ী খাই না, তুমি যাও। আমি তোমার সঙ্গে যাব না; কক্ষন যাব না।"

"মা গো! জামাইবাবু! তোমার শরীলে এতটুকু হায়া, লজ্জা নেই বাপু! আবার তুমি কোন্ মুখ নেড়ে ওকে কথার ঘা দিতে এলে শুনি? যাও গো, আর বেশীক্ষণ নয়। সন্ধ্যে নাগাদ—সেখান থেকে লোক-জন সব এসে পড়বেই। তারা আমাদের এমন নয় যে, মেয়ে না খেয়ে প'ড়ে আছে জানলে এতটুকু দেরি করবে। এখন তুমি চ'লে যাও দেখি বাপু! একটু হাওয়া করি।"

চারু উঠিয়া বেত্রাহত কুক্কুরের মত নীরবে প্রস্থান করিল। অসহ্য অপমানে তাহার মাথার ভিতরে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়াছিল, তথাপি কৃত কার্য্যের অপরিবর্ত্তনীয় ফলকেও সে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে কুণ্ঠিত হইল না।

৭

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুই জন বন্দুকধারী দ্বারবান্ লইয়া প্রমীলার বড় ভাই ধীরেন্দ্রনাথ প্রমীলাকে লইয়া যাইতে আসিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে চারুকে সম্বোধন করিলেন, "ব্যাপার কি চারু! তোমাদের পাড়ার লোক বাবার কাছে তার দিয়েছে যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে অত্যন্ত মার-ধর করেছ! আমার ত এ কথাটা একটুও বিশ্বাস হয় নি! কোন রকম ভুলটুল একটা কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে না? আর কারুকে তার করতে কি এই কাণ্ড ক'রে বসেছে না কি?"

ধীরেন্দ্রনাথ চারুর কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ, স্বভাবটি বেশ সুভদ্র, চারুর প্রতি তিনি যথেষ্ট স্নেহসম্পন্ন এবং তাহার চরিত্রের প্রতি পূর্ণরূপেই শ্রদ্ধাশীল।

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া চারুর হেঁট মাথা যেন অধিকতর নত হইয়া আসিল। সে তাঁহার সনির্ব্বন্ধ জিজ্ঞাসার ভাল-মন্দ কোন উত্তরই না দিতে পারিয়া চুপ করিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। "এসো, বসো" বলিয়া একটা ভদ্রতার কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

ধীরেন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল,—"তা হ'লে এ সবই সত্যি? বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না, তবু তুমি নিজেই যখন স্বীকার ক'রে নিচ্ছ, তখন আর বলবার কিছুই নেই! কিন্তু এখনও আমার মনে হচ্ছে, এ যেন কার সাজানো মিথ্যা অপবাদ। চারু! তুমি এমন হীন কায করতে পার, এ যে আমি নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না।"

জ্যেষ্ঠ শ্যালকের এই নির্ভরতাপূর্ণ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের অভিব্যক্তিতে চারুর মনের ভিতরে যে কি হইতেছিল, তাহা বলিবার নহে। তাহার অন্তরের ভাব ভাষার অতীত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই সে নিজের স্বপক্ষ-সমর্থনের এতটুকু চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই। এখনও সে এই স্নেহ-তিরস্কারের এই অর্দ্ধ-সংশয়িত কৈফিয়ৎ তলবের কোন জবাবই দিল না।

তখন ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া চারুর এই আত্ম-সমর্থন-বিমুখতায় মনে মনে ঈষৎ রুষ্ট হইতে থাকিয়া হঠাৎ পরুষকণ্ঠে ধীরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে আর কোন উপায় দেখি না, প্রমীলাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। তাকে নিয়েই যাই। মার খেয়ে ত আর সে তোমার এখানে প'ড়ে থাক্‌তে পারে না।"

প্রমীলা সগর্ব্বে এবং সানন্দে শ্বশুরঘর করা সাঙ্গ করিয়া ভাইয়ের সহিত বাপের বাড়ী যাত্রা করিল। তাহার মনে হইল, চারু তাহাকে জুতা মারিয়া ভালই করিয়াছিল, না হইলে ত আরও একটা মাস তাহাকে এখানে থাকিতে হইত।

বিলাসী বাজার হইতে খাবার আনিয়া প্রমীলাকে খওয়াইয়াছিল, নিজেও বাদ যায় নাই। চারুর মা বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াও উহাদের ভাত খাওয়াইতে পারেন নাই। ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া তাঁহার নিজের রাগ

অনেকক্ষণ আগেই পড়িয়া গিয়াছিল, এবং নিজেকেও এই দুর্ঘটনার অনেকখানি মূল জানিয়া ছেলের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মন আত্মগ্লানিতে পরিতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মনের মধ্যে ঠিক সায় না দিলেও বধূকে ও বধূর দাসীকে তিনি সারাদিনে বিস্তর তোষামোদ করিয়াছেন, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। বউমা ত কথাও কহেন নাই, মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াছেন। আর ঝি যাহা বলিয়াছে, সে সব খুবই শ্রুতিসুখকর নহে। যাত্রাকালেও আর একচোট হাতে ধরাধরি হইল; কিন্তু দুই জনেরই ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গিল না।

চারুর মা ধীরেনকে ডাকাইয়া নিজেই কথা কহিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথাই তিনি প্রকাশ করিয়া কহিলেন। নিজের হাতের দংশনক্ষত দেখাইয়া বলিলেন, "চারুর কোন দোষ নেই বাবা! সে তা'র মা'কে ছাড়াবার জন্যেই হঠাৎ ওই কাযটা ক'রে ফেলেছিল। তা' এ নিয়ে কি এতখানি করে কেউ? তোমাদের ঐ বজ্জাত ঝি মাগীটে না থাক্‌লে বউমা এমন ধারা কর্‌তে পারতেনও না। ঐ মাগীই যত নষ্টের গোড়া!"

বিলাসী বোধ করি আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে এই কথা শুনিতে পাইয়াই একেবারে রণরঙ্গিণীর মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া পড়িল। "বজ্জাত বেটী ত বটেই গো! মায়ে পোয়ে মেয়েটাকে জবাই করতে পারনি কি না এই বজ্জাত বেটীর জন্যে, তাই এতটা গায়ের ঝাল হয়েছে! বুঝলে গা দাদাবাবু! তোমাদের কাছে পাওনা-থোওনা পাওয়া হয়ে গেছে। এখন জামাই বাবুর আর একটা বিয়ে দিয়ে আরও কিছু হাত করবার জন্যে এই রকম ক'রে মেয়েটাকে শাস্তি দিচ্ছে। হয় না হয় নিজেরাই বলুক ত! যখন তখন ছেলেকে শলাচ্ছে; বলছে কি না যে, আর একটা বিয়ে কর্, এবার নিজে দেখে বউ আনবো! বলুক না সত্যিবাদী কায়েতের মেয়ে।"

চারুর মা এই সমস্ত কথায় একেবারে আগুনের তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া উঠিলেন;—"বলেছিই ত; এমন ক'রে বউ নিয়ে জ্ব'লে মরলে কোন্ শাশুড়ীতে আবার এ কথা না বলে রে হারামজাদী! ছোটলোকের বেটীর যত বড় মুখ, তত বড় চোপা!"

"হুঁ, হারামজাদী ছোটনোক সব তোলা রইলো গো; কিচ্ছুটি এর থেকে বাদ পড়বে না, তা দেখে নিও তখন! হ্যাগা! বড়দাদাবাবু! বলি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে খামোকা কতকগুলো গাল খাওয়াবে, না আমাদের একটা গতি করবে? বাবুকে মা'কে গিয়ে বল্‌ব যে, খুব কুটুমবাড়ী পাঠিয়েছিলে বাছা। যা হ'ক, এখন ধম্মে ধম্মে হাড় কখানা টেনে নিয়ে গিয়ে একবার পড়তে পারলে বোঝা যায়!"

যাত্রাকালে ধীরেন্দ্রনাথ চারুর সহিত কথা কহিলেন না; চারুও তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার সাহস করিল না; একটা জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া শুধু অনিমেষ নেত্রে প্রমীলার উৎসাহোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা চোখের অদৃশ্য হইয়া গেলে একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক ঠেলিয়া উঠিল, তাহার চোখ দিয়া দুইটি ফোঁটা অশ্রু নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

৮

প্রমীলার পিতা সারদাচরণ বাবু স্বভাবতঃ অত্যন্ত কোপনপ্রকৃতির লোক। তাহার উপর নিজের মর্য্যাদাটাকে তিনি বোধ করি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের মর্য্যাদার অপেক্ষাও বড় কম মনে করিতেন না। তাঁহার বংশ, তাঁহার ধন, তাঁহার মান সকলেই যেন এ সকলের সম্মান করিতে একান্ত বাধ্য। যাহার দ্বারা ইহার কোনখানে একটুখানিও আঘাত পড়ে, তাহার ভাগ্য একেবারেই অপ্রসন্ন বলিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের তিনি আদর-যত্ন যথেষ্টই করিতেন, কিন্তু তাহাদেরও এমন স্বাধীনতা ছিল না যে, তাহারা তাঁহার অনভিপ্রেতভাবে হস্তপদ সঞ্চালনও করিতে পারে। সামান্য ত্রুটিতে ছেলেদের বেত্রাঘাত, উপবাস এ সকলই ভোগ করিতে হইয়াছে। তবে মেয়ে বলিয়া এবং একমাত্র মেয়ে বলিয়া প্রমীলার আদর সকলের চাইতেই বেশী ছিল। অধিকন্তু মা'র কাছে তাহার প্রশ্রয়ের সীমা ছিল না।

সেই মেয়ে আসিয়া যখন কাঁদিয়া পড়িয়া জুতা মারার কাহিনী শুনাইল, তখন সারদাচরণের মূর্ত্তি যে কি ভীষণ ভাবই ধারণ করিল, তাহা অভিজ্ঞ ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিবে না। প্রমীলার অপেক্ষা বিলাসীই সেই ক্রোধের আগুনে ইন্ধন জোগাইল বেশী। বিনাইয়া বিনাইয়া এক গুণের যায়গায় সাত গুণ রং চড়াইয়া সে যে কাহিনীটি শুনাইল, তাহার মধ্যে বেশ একটি ইচ্ছাকৃত

ষড়্‌যন্ত্রের সূচনা পাইতে বিলম্ব ঘটে না। চারুর অর্থ-পিশাচী পাড়াগেঁয়ে মা চারুর আর একটা বিবাহ দিয়া আরও কিঞ্চিৎ অর্থলাভের আশাতেই যে এই ষড়যন্ত্রটি তৈয়ারী করিয়াছে এবং প্রমীলা যাহাতে চারুর চক্ষুঃশূল হয়, তাহারই জন্য আগাগোড়াই বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়া অবশেষে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই প্রমাণ হইয়া গেল। মা'র কানভাঙ্গানীতে ভুলিয়া চারুও প্রমীলার প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে; শেষকালে ভীষণ ঝড়বৃষ্টির দিনে বিলাসীর অনুপস্থিতিকালে তাহাকে ছাতে তুলিয়া দুই জনে মিলিয়া মারধর করে; মারিয়া ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। শেষকালে কাপড়ে একটু কেরোসিন ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। বউ নিজে পুড়িয়া মরিয়াছে!

সজল-জলদতুল্য মুখে সারদাচরণ প্রমীলাকে প্রশ্ন করিলেন, "বেশ ক'রে ভেবে দেখ প্রেম! তোমার স্বামীর কাছে আর কখনও যাবার ইচ্ছে হবে কি না? ঐ স্বামীর ঘর আর কখন করতে চাইবে কি না? তা' যদি কর, তা হ'লে এ সব সহ্য ক'রে চুপ ক'রে থাক। আর যদি সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারীর শাস্তি দিতে চাও, তা' হ'লে এ জন্মের মত তার আশা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে থাক।"

প্রমীলা বাপের প্রশ্নে এতটুকুও দমিল না, সাহঙ্কারে মুখ তুলিয়া সগর্ব্বে কহিয়া উঠিল—"তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। এ জন্মে আর কখন আমি তাদের ছায়াও মাড়াবো না। যে কষ্ট আমায় দিয়েছে! আমায় বলে কি না, ছোটলোকের মেয়ে! নবাবের বেটী!—"

"হুঁ" বলিয়া দংশিতাধরে সারদাচরণ উঠিয়া গেলেন। তাহার পর এক দিন আদালতের শমন পাইয়া চারু জানিল, তাহার স্ত্রী তাহার নামে নালিশ করিয়াছে। আর একটা বিবাহের ইচ্ছায় প্রমীলাকে তাড়াইবার চেষ্টায় (অথবা তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলারও দুরভিসন্ধি ছিল কি না, তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না) চারুরা মাতাপুত্রে তাহার উপর প্রবল শারীরিক অত্যাচার করিয়াছে; অতএব যাহাতে প্রমীলাকে আর কখনও শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার চেষ্টা না হয়, তাহারই জন্য আদালত হইতে লিখাপড়া হইয়া যাওয়া সঙ্গত।

চারু তাহার উপর অর্পিত অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রীর ঈপ্সিত দলীল লিখিয়া দিল। তাহার পর স্ত্রীনির্য্যাতনের জন্য অর্থদণ্ড প্রদান করিয়া সে তাহার বিবাহিত জীবনের সকল দণ্ড-পুরস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল।

পাড়ার লোক চারুকে ছি ছি করিতে লাগিল। মা কাঁদিয়া ভাসাইলেন। চারু কাহারও কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। তবে সামান্য দিন না যাইতে যাইতেই যখন তাহার মা এবং পাড়ার লোক মিলিয়া ঘটক-ঘটকীর সঙ্গে পরামর্শ আরম্ভ করিয়াছেন দেখা গেল, তখনই সে অত্যন্ত দৃঢ়কঠিন কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বসিল। মা'র অনুনয়, আদেশ ও অশ্রুর বিনিময়ে সে শুধু এই কথাটি বলিল;—"একবারেই যথেষ্ট হয়েছে, মা! এ জন্মে ত নয়ই, যদি জন্মান্তর থাকে আর মানুষ হয়ে জন্মাতে পারি, তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিয়ে করবার প্রবৃত্তি আমার তখনও না হয়।"

চারুর মা বছরখানেক ধরিয়া বৃথাই অশ্রুপাত ও অনুতাপ করিয়া সামান্য কয় দিনের অসুখে তাঁহার অতৃপ্ত সংসার-সুখাকাঙ্ক্ষাকে অপরিতৃপ্ত রাখিয়াই ছেলের নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন চারু সবেমাত্র এম, বি, পাশ করিয়া কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে।

৯

প্রমীলার মনের মধ্যে কি যে বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া উঠিতেছিল, সে নিজেও যেন তাহার আশ্চর্য্য আবির্ভাবে অবাক্ হইয়া যাইত; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে ইহার অপরাজেয় শক্তির হস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত না। শ্বশুরবাড়ীর জন্য—স্বামীর জন্য তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিত, একখানা চিঠি লিখিয়া সে চাঞ্চল্য নিবারণ করিবারও উপায় নাই। এই অপ্রতিবিধেয় অবস্থায় সে যেন ক্রমশঃই কেমন এক প্রকার অভিভূতপ্রায় হইয়া পড়িতে লাগিল। শাশুড়ীকে কোন দিনই সে ভাল চোখে দেখে নাই। পাড়াগেঁয়ে মাগী, না তাঁহার কথার কোন শ্রী আছে, সর্ব্বদা ছল-ছুতা ধরিয়া ফড়-ফড় করিয়া কতকগুলা বকুনি, কথায় কথায় তাহার নামে ছেলের কাছে লাগানো, এতটুকু ত্রুটি হইলেই বাপ-মা তুলিয়াও কথা বলা, এ সব প্রমীলার একান্ত অসহ্য

বোধ হইত। তাহার উপর বিলাসীর জন্য তাহার মন শাশুড়ীর উপর আরও বেশী তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চারুর ব্যবহার তাহার কোন দিনই খুব মন্দ লাগে নাই। তাহার সস্নেহ বাক্য, সাদর ব্যবহার, সংযত আচরণ প্রমীলার মনের মধ্যে তাহাকে একটা বিশেষ স্থান দান না করিয়া পারে নাই। সেটা হঠাৎ সে দিনের সেই আকস্মিক কাণ্ডটায় সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া গেলেও ক্রমশঃ আবার দিনে দিনে যতই দিন গত হইতেছিল, সে দিনের সেই প্রচণ্ড ক্রোধের শিখা যতই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, সেই নিস্তেজ ক্রোধাভিমানের অন্তরাল হইতে একটা দারুণ অস্বস্তিকর লজ্জার জ্বালা উত্থিত হইয়া ততই যেন তাহার বুকের মধ্যটাতে আশ্রয় লইতেছিল। যে ক্রোধের উত্তেজনা তাহার মনটাকে তীব্রভাবে চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কবল হইতে অব্যাহতি পাইবামাত্র তাহার মন যেন ভিতরে ভিতরে একটা স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাহার সহিত মিশ্রিত একটা ব্যথাও বোধ করিল।

প্রমীলার প্রথম প্রথম নিজেকে একান্তই নিগৃহীতা বলিয়া মনে হইত, এবং স্বামীর এই হীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে তাহার সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তুলিয়া ইহার নির্ম্মম কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। আরও সর্ব্বপ্রকার তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিয়াও যে কোনরূপেই হউক তাহাকে খর্ব্ব করিতে সে সমুৎসাহিতই ছিল। তাহার কত সময় মনে হইয়াছে, চারুর দণ্ড তাহার পাপের যোগ্যতানুসারে কিছুই হয় নাই; ইহার অপেক্ষা ঢের বেশী প্রায়শ্চিত্ত তাহার হওয়া উচিত ছিল। জেল খাটিলে, দ্বীপান্তর হইলে, আরও কিছু বেশী হইলেও তাহার কৃত কর্ম্মের যোগ্য ফল হয়। মেয়েমানুষকে জুতা মারিবার পরেও সে যে অক্ষত হইয়া যেমন তেমনই রহিয়া গেল, ইহার ব্যর্থতার বিষ তাহার মনকে যেন বেড়া আগুন দিয়া পুড়াইয়া মারিতে লাগিল। সে তাহার কোন ক্ষতিই ত করিতে পারিল না! মাত্র একটু লোকলজ্জা, মাত্র ঐ অতটুকু! নাঃ, আরও অনেক বেশীই হওয়া উচিত ছিল যে!

এই রকম মনের ভাব লইয়া প্রমীলা আপনার পৌরুষের অভাবে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও অনেকখানি সার্থকতার গৌরবে উৎফুল্ল ও নিশ্চিন্ত চিত্তে বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নাটাই-ঘুড়ি, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদি খেলিয়া প্রাণ ভরিয়া হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর এমনই করিয়া বছরখানেক কাটিয়া গেলে হঠাৎ এক দিন তাহার মনের মধ্যে একটা যেন বড় উতলা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহার সব যেন এলোমেলো বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। তাহার মুখের হাসি, বুকের অহঙ্কার সহসাই যেন সে দিন হইতে ক্ষীণকলা চন্দ্রের মত নিত্য নিত্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

প্রমীলার খুড়তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল। সেই মেয়েটি প্রমীলারই প্রায় সমবয়সী। দীর্ঘকাল শ্বশুরবাড়ী ঘর করিয়া কমলিনী বাপের বাড়ী আসিয়াছে। প্রমীলা খবর পাইয়াই দেখা করিতে গেল এবং দেখিয়া অবাক্ হইল যে, কমল আর সে কমল নাই! সে মাথায় কাপড় দিয়া রহিয়াছে, কথা কয় আস্তে আস্তে, ভাইবোন্‌দের জলখাবার দেওয়া, ভাত খাওয়ানো, বোনেদের চুল বাঁধা, মা'র পাকা চুল দেখা, বাপের পা টিপা, কত কাযেই সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়! প্রমীলা তাহাকে "চোর চোর" খেলিতে ডাকিলে ঈষৎ সলজ্জ হাস্যের সহিত সে নিজের অক্ষমতা জানাইল; হাসিমুখে বলিল—"না ভাই, এখন কি ও সব খেলতে আছে? তা ছাড়া ও সব আমি ভুলেও গেছি।" নির্জ্জন ঘরে ডাকিয়া আনিয়া কমল বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রমীলা এই প্রথমবারের জন্য—নিজের জন্য যেন একটা লজ্জা বোধ করিল। বরের কথা তাহার ত সব শেষই হইয়া গিয়াছে। সে কথা বলার আর আছে কি? সে চুপ করিয়া রহিল। কমলিনী বলিতে লাগিল—"তুই কি আর সেই পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ী যাস্‌নি না কি? চারু বাবু আসেন ত? সে কি ভাই! তোরা হু'জনে হু'জনকে ছেড়ে কেমন ক'রে আছিস্ বল ত? আমরা হ'লে কিন্তু পারতুম না। এই হু'দিন হলো এসেছি, মনে হচ্ছে যেন কত দিনই হয়ে গেছে। একটু সামান্য ঝগড়া নিয়ে কি ক'রে এমন ক'রে আছিস্, ভাই?"

প্রমীলা নিজের পক্ষে বড় দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়াও সাহঙ্কারে জবাব দিল,—"একটু সামান্য! জুতো মারাটা সামান্য হ'ল?"

কমল মুখটা বিকৃত করিয়া তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর

"সামান্য না ত কি? এই সে দিন অনেক রাত হয়ে গেছলো শুতে যেতে, যেমন ঘরে ঢুকেছি, অমনই তোর ভগ্নীপতি ফোঁস্ ক'রে উঠলেন, 'যাও, বেরিয়ে যাও—আস্তে হবে না ঘরে। সারা রাত কে ব'সে ব'সে তোমার পথ চেয়ে থাকে?' খুব রেগে গেলুম, কাঁদলুম, কথা কইলুম না অনেকক্ষণ। আবার খোসামোদ, পায়ে ধরতে যাওয়া, সব মিটমাট হয়ে গেল। এ রকম কার না হয়, ভাই? তুই যেমন মানোয়ারী গোরা। এতটাই কি করতে আছে?"

প্রমীলার মনের উপর একটা বিষাদের গাম্ভীর্য্য যেন ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি সে জোর করিয়াই নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। রোষগম্ভীর মুখে সে জবাব দিল, "তাতে আর এতে ঢের তফাৎ আছে। তোমায় ত আর জুতো মারে নি!" তাহার পর ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ ভাই, তোর শাশুড়ী আছে? সে তোকে জ্বালা দেয়?"

কমলিনী মুখখানা ঘুরাইয়া হাসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, আমার আবার শাশুড়ী কোথায়? সৎ-শাশুড়ী ত! তা ভাই, জ্বালা যে দেয় না, ঠিক তা বল্‌তে পারি নে, তবে আমি তাতে ঠিক জ্বালা বোধ করি নে। রাগ-ঝাল সবারই আছে, কখনও কখনও তা' আমার ঘাড়ে ঝেড়েও ফেলে। ফেল্লেই বা? গায়ে ত আর আমার তাতে ফোস্কা পড়ে না। তবে ইদানী তাঁকে আমি খুব বশ ক'রে ফেলেছি। কোন কায বড় একটা করতে দিই না, হাতে হাতে সব জোগাই। তাই খুব সুখ্যাত করেন, বলেন—'মেজ বৌমা আমার মানুষের ঘরের মেয়ে বটে!' শাশুড়ী বশ করা, ভাই, অনেকটা নিজের হাত। খুব গতর বার করলে, আর চোপা না করলেই ত বেশীর ভাগ শাশুড়ী বশে থাকে। তবে নেহাৎ দজ্জাল যারা, তাদের কথা ছেড়ে দাও!"

প্রমীলার বুকে এই মন্তব্যগুলা একটা দাগ কাটিল। এই সর্ব্বপ্রথম তাহার মনে হইল, তাহার শাশুড়ীকে সে যত মন্দ করিয়া তুলিয়াছিল, হয় ত তিনি ততটা নহেন, সে-ও ত কৈ কোন দিনই তাঁহার সহিত একটুখানিও ভাল ব্যবহার করে নাই। বরং অশেষবিশেষে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যই করিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বিলাসীর শিক্ষাতেও সে তাঁহার সঙ্গে বড়ই কুব্যবহার করিয়াছে। বিলাসীর উপর তাহার মনটা যেন বিষাইয়া উঠিল। সে-ই যেন যত নষ্টের গোড়া।

সে রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমীলা জাগিয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতি দেবী যেন জগতের উপর একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের ঘন আবরণ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রমীলা নিঃশব্দে পড়িয়া পড়িয়া ভূত-ব্যাপারগুলিকে লইয়া বিশেষ বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। তাহার চোখে ঘুম দেখা দিল না। চিন্তার পর চিন্তার স্রোতঃ আসিয়া তাহার বুকের ভিতরটাকে যেন ত্রস্তব্যস্ত করিয়া তুলিল।

চারুর সেদিনকার সেই দীনমূর্ত্তিখানা এই এক বৎসর-কাল ধরিয়া অনেকবারই প্রমীলার মনের চোখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিতে গিয়াছে, কিন্তু কোন দিনই সে সেখানার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই; ভ্রূকুটি করিয়া অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। সে মনে মনে রাগ করিয়া বলিয়াছে, "জুতোমারা ছোটলোকের কথা আমি মনেও আসতে দিইনে।" কিন্তু আজ সে কথাটা সে মনে করিতে যেন ভুলিয়া গেল। শুইয়া শুইয়া সেই ঘন অন্ধকারের রাশির মধ্য দিয়াও সে যেন সুস্পষ্টভাবে সেই বিষাদের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ম্লান মুখ ও বেদনায় অশ্রু-ভারাতুর গভীর দৃষ্টি চোখের উপরেই দেখিতে পাইল। কি সুগভীর নৈরাশ্যের সেই সজল গম্ভীর স্বর! উঃ, কি বেদনা, কি নৈরাশ্যই না তাহার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছিল! আজ তাহার সেদিনকার মনের অবস্থা যেন সহসাই নিজের মনে মনে অনুভব করিয়া, তাহার অন্তরের সেই পাষাণভার নিজের বুকে উপলব্ধি করিয়া অকস্মাৎ প্রমীলার নিজের বুকটাও যেন তেমনই একটা নিদারুণ নৈরাশ্যজড়িত ব্যথায় ভরিয়া আসিল; তাহার চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া অকস্মাৎ কোথা হইতে হুহু করিয়া জলের স্রোতঃ বহিয়া আসিল; সে নীরবে একা পড়িয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল।

সেই দিন হইতে প্রমীলার জীবনের গতি ফিরিল। আর তাহার খেলার দাপাদাপি নাই, তাহার ছুটাছুটি, হা হা হি হি কলহাস্য সবই যেন কাহার মন্ত্রবলে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে আর হাসিটুকুও বড় একটা দেখা যায় না। তাহার মনে হয়, তাহার চারিদিকটা যেন অন্ধকার। সমগ্র সংসারটাতেই যেন কেমন একটা আলোর অভাব ঘটিয়াছে। সবই ত আছে, তবু মনে হয়, তাহার যেন

কোথাও কিছু নাই। এই বাড়ী, এই ঘর, এই যে সুখ-ঐশ্বর্য্য, এত দিন পরে সহসাই তাহার মনে হইল, এ সবকে সে যে এত আপন মনে করিয়া গর্ব্বে সারা হইয়া আছে, তা' এ সকলে তাহার কিসের অধিকার? এ সব ত তাহার দাদাদের; বৌদিরাই ত এ সমস্ত ভোগ করিবে; তাহার নিজের বলিতে এ জগতে কোথায় কি আছে? তাহার প্রাণের মধ্যে যেন হু হু করিয়া একটা ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া উঠিতে থাকে, বুকের মধ্য হইতে একটা বুভুক্ষু পীড়িত তৃষিত চিত্ত সকাতরে কাঁদিয়া বলে—"হায় রে! সর্ব্বহারা! এই নিঃসম্বলে তুই পথ চলিবি ভাবিয়াছিলি!" প্রমীলার মনের মধ্যে দিনের পর দিন সেই অন্ধকারটা যেন ব্যাপ্ত ও নিবিড় হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহা যেন তাহার অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

১০

প্রমীলার দাদা ধীরেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাড়ীতে খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। যেখানে যত আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এক দিন যাত্রা, এক দিন থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখানর ব্যবস্থাও হইয়াছে; বাড়ীর ও পাড়ার লোক এই লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই উৎসবের বাড়ীতে প্রমীলার শুধু মনের মধ্যে একটুখানিও সুখ নাই। সে মনে মনে একটা আশা করিতেছিল যে, এই উপলক্ষে হয় ত এইবার চারুকে ইঁহারা নিমন্ত্রণ করিবেন, এবং নিমন্ত্রণ পাইলে হয় ত বা সে একবারটি আসিবে। কিন্তু সে আশার স্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ ধীরেন বাপকে পড়িয়া শুনাইতেছিল, তাহার ভিতর একটা শব্দ কানে ঢুকিতেই প্রমীলার পিতা সারদা বাবু ও প্রমীলা উভয়েই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন—"চারুচন্দ্র বসু, হাউস সার্জ্জন, মেডিক্যাল কলেজ।"

সারদা বাবু বলিলেন, "এ লোকটা কে হে?" নাম ত কখন শুনিনি!"

প্রমীলার বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া কে যেন সজোরে একটা দরজা বন্ধ করিয়া দিল, সে আর্ত্ত বিমূঢ়ভাবে দাদার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিল।

ধীরেন্দ্রনাথ মাথাটা একটু চুলকাইয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, ও আমাদের চারু, সে এখন পাশ ক'রে ঐ চাকরীটা পেয়েছে।"

সারদা বাবু ক্রোধগম্ভীর মুখে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিবার পর স্থিরগম্ভীর স্বরে মন্তব্য করিলেন, "তা' ও নাম আমার বাড়ীর নেমন্তন্নের ফর্দ্দে কেন? চামড়াছেঁড়া কসাই কি কখন কায়েতবাড়ীতে পাংক্তেয় হয়? নাম কেটে দাও।"

ধীরেন কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াও ভরসা করিল না, শুধু নীরবে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। তাহার সেই কালী-কলমের খোঁচাটা কিন্তু প্রমীলার বুকের উপর দিয়া বেদনা-ভরা বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ রেখার মতই করকর করিয়া টান দিয়া গেল। তাহার বোধ হইল, তাহার ভাইপোর অন্নপ্রাশনে তাহাকেই যেন অপাংক্তেয় করা হইল; তাহারই যেন নিমন্ত্রণ রদ হইল। তাহার মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত ক্রোধের শিখা যেন অস্পষ্টভাবে ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। তীব্র বেদনার সহিত মিশ্রিত কোপে সে মনে মনে বলিল—"বাবার এ আবার বেশী বাড়াবাড়ি কাণ্ড।"

কোন রকমে পলাইয়া গিয়া নিজের ঘরে প্রমীলা এলো-মেলো বিছানাগুলার উপর শুইয়া পড়িয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। বাপ ত ঐ, মা-ও জামাইএর নাম করেন না, দাদার যদিই একটু দয়া হইয়াছিল, তাহাও শেষ হইয়া গেল। কেন, এতই বা কেন? সে দোষ ইঁহারাই বা কি কমটা করিয়াছেন? নালিশ-ফরিয়াদ যাহা করিবার, তাহার ত কিছুই বাকী রাখা হয় নাই। এখনও—এখনও কি একটা মিটাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে? আর ইঁহারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি সে আসিত? তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এখন চাকরী হইয়াছে। হয় ত, হয় তই বা কেন? প্রায় দুই বৎসর হইতে যায়, এত দিনে নিশ্চয়ই আর একটা বিবাহ করিয়াছে। আচ্ছা, সত্যই কি বিবাহ করিয়া বউ আনিয়াছে? আশ্চর্য্য কি? এ ত আর মেয়েমানুষ নয় যে মারই খাক্, যাই হ'ক, তবু সেই ভিন্ন গতি নাই! নাঃ, এ কিন্তু বড় অন্যায়! এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে আবার যাহারা বিবাহ করে, তাহাদের মুখ দেখিতে নাই।

প্রমীলার অশ্রুপ্লাবিত মুখে চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, মুখ দেখা ত এ জন্মের মতই শেষ হইয়াছে! কে কাহার মুখ দেখিবে?

"ও মা ঠাকুরঝি! এই কি তোর শুয়ে থাকবার সময়? নে, ওঠ্, কায কি নেই বাড়ীতে একটুও? আয় দেখি, ছেলে-মেয়ের দল জমা ক'রে বাদামগুলো ভাঙ্গবি।"

এই বলিয়া প্রমীলার বড় ভাজ সুধারাণী প্রমীলার হাত ধরিয়া টান দিলেন। "ও মা! ও কি লো! আজকের দিনে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিস? কেন ভাই? কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বল্ ত?"

প্রমীলা ধরা পড়িয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তথাপি এই ধরা পড়ার লজ্জাকেও ছাপাইয়া তাহার মুক্ত বেদনা যেন এই কথায় উথলিয়া উঠিয়াছিল, সে জোর করিয়া হাত টানিয়া লইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুতেই সে কন্না আর থামে না।

সুধারাণী পাশে বসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে সজল চোখে বলিতে লাগিলেন, "বুঝেছি, ওলো বুঝেছি! এক দিন যে এম্‌নি করেই কাঁদতে হবে, সে আমার জানাই ছিল। মেয়েমানুষ বই ত আর কিছুই নস্! নে, এখন ওঠ, অমন ক'রে কেঁদে ভাসালে আর কি হবে? যদি বর চাস, তার উপায় কর, মা'র কাছে বল্ না যে, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব। মা'র কাছে আবার লজ্জা কি?"

প্রমীলা বিস্ফারিত জিজ্ঞাসু নেত্রে বৌদিদির মুখের দিকে তাকাইল, কথা কহিতে তাহার ভারী লজ্জাবোধ হইতেছিল, তথাপি চেষ্টায় জিহ্বার জড়তাকে জয় করিয়া সে মৃদু স্বরে কহিল, "তুমি বল, আমি বল্‌তে পারব না।"

সুধারাণী কহিলেন, "আমি বল্লে হবে না ভাই, আমি কি আর বলিনি ব'লে মনে করছ? তোমার অন্যমনস্ক ভাব আর লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়ানো দেখে অবধি দু'তিন দিন কথা তুলেছিলুম। তাতে প্রথম দিন কান দিলেন না, দ্বিতীয় দিন বল্লেন, 'বাবুকে ব'লে দেখি।' তৃতীয় দিন বল্লেন, 'কেন বৌমা! ননদ বুঝি তোমাদের জ্বালা হয়ে উঠেছে! তাই বিদায় করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ অত? মেয়ে আমি পাঠাব না, সে বার জুতো মেরেছে, এবার হাতে পেলে চাই কি প্রাণেই মারবে। কেন, আমার মেয়ে কি এতই ফেলনা হয়েছে যে, তাকে যমের মুখে পাঠাবো'?"

প্রমীলা শুনিয়া একটুখানি নিশ্বাস ফেলিল।

সুধারাণী কহিতে লাগিলেন, "তা কিন্তু নয়, ঠাকুরজামাই চিরদিনই খুব ভদ্র, তুই কি ক'রে যে ওঁকেও দিয়ে গায়ে হাত তুলিয়েছিলি, সে তুই-ই জানিস। এই ত আমার বাপের বাড়ীতে আজকাল ওঁকেই আমরা ছোট-খাট অসুখ-বিসুখে ডেকে আনি, এত যত্ন ক'রে দেখেন, আর এমনই শান্ত-স্বভাব। পয়সা ত নেনই না কিছুতে, তাই মধ্যে মধ্যে খেতে বলা হয়, ফলটল পাঠানও হয়। আমার দাদারা ব'লে, 'তোর ননদের বাহাদুরী আছে, এমন লোকের হাতেরও জুতো খায়!' সত্যি ভাই! তোর বরাত ভাল নয়, নৈলে অমন স্বামী তুই পেয়েও হারালি!"

প্রমীলার বুকের মধ্যটা আনচান্ করিতে লাগিল। সকলেই যাহার অত সুখ্যাতি করে, সে একাই তাহাকে অত মন্দ চোখে কেন দেখিল? তাহার উপর এই চারিদিকেই নিজে নিজেদের একটা এতবড় অখ্যাতি রটনা করাইল, ইহার ফলে না জানি তাহাকেও জনসমাজে কতই না লজ্জা পাইতে হইয়াছে ও হইতেছে! যাহারা চিনে না, তাহারা ত তাহাকেই দোষী করিবে! প্রমীলার চোখ ফাটিয়া আবার জল আসিল।

সুধা আঁচল দিয়া প্রমীলার চোখ মুছাইয়া বলিল, "তবু ভাল যে, তোর এত দিনে চৈতন্য ফিরেছে। আচ্ছা ভাই, আমি তোর একটা উপায় দেখছি দাঁড়া, তোর দাদাকে দিয়ে দেখি যদি কিছু করতে পারি।"

খোলা জানালার মধ্য দিয়া আকাশের অনেকখানি দেখা যাইতেছিল। বাড়ীতে লোক-জন অনেক আসিয়াছে, ছেলেদের হুড়াহুড়ি ও কলহাস্যের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রমীলা কয়েক মুহূর্ত্ত বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার অশ্রু-বাষ্পসমাচ্ছন্ন দৃষ্টি বৌদিদির চোখের দৃষ্টি হইতে সরাইয়া রাখিয়া গাঢ় স্পন্দিত স্বরে উত্তর করিল, "বাবার মত হবে না দেখো।"

বলিয়াই আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল। লুকান বেদনা যখন আজ বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন আর যেন তাহাকে কোনমতেই ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছিল না।

সুধারাণীর মুখ অহঙ্কারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, "ইস্, মত না করলেই হ'ল আর কি! কেন মত করবেন না, শুনি? দেখিস্, তোকে তোর বরের ঘাড়ে চাপাতে পারি কি না! নে, এখন উঠে আয়, ভাইপোর ভাতে কায কর্, খা-দা,

আমোদ-আহ্লাদ কর, তা না হ'লে কিছুই আমি করব না ব'লে রাখলুম।"

সেই কান্নাভরা চোখেই হাসিয়া ফেলিয়া প্রমীলা তখন উঠিয়া বসিল।

১১

কিন্তু সুধারাণী কাযটাকে যত সহজ মনে করিয়াছিল, কার্য্যারম্ভের পর সে দেখিল, ব্যাপারটা তত সোজা নহে। ধীরেনকে সে সকল কথাই বলিয়াছিল। চারুর সঙ্গে যদিও সেই পর্য্যন্ত ধীরেনের আর চাক্ষুষ হয় নাই, তবুও তাহার শ্বশুরবাড়ীর মারফৎ সে চারুর খবরাখবর রাখিত। দেখা ইচ্ছা করিয়াই করে নাই। চারুর প্রতি তাহার বাপের ব্যবহারটাকেও সে খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিত না। তাই এই দেখা-সাক্ষাতে তাহার একটা লজ্জা বোধ হইত। তবে এটুকু সে জানিয়াছিল যে, চারু আর বিবাহ করে নাই এবং তাহার এক শালার মুখে শুনিয়াছিল, সকল বিষয়ে পূর্ণ মাতৃভক্ত চারু শুধু এই বিষয়েই মা'র একান্ত অবাধ্য হইয়া তাহার মা'র মনোব্যথার কারণ হইয়াছিল। ডাক্তার বাবুর মা তাহার কাছেও অনেক দুঃখ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, "সে বউ যখন তোকে ত্যাগই করলে, তখন মেয়েমানুষের মতন তারই ধ্যানে জীবন কাটান—এ কি রকম বেটাছেলে, তা বুঝতে পারি নে।"

ধীরেন গিয়া সে দিন বাপের পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে।"

সারদাচরণ চশমার মধ্য দিয়া বারেক ছেলের কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ খবরের কাগজে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া কহিলেন, "কি বলতে চাও, বল।"

ধীরেন বিপন্ন হইয়া উঠিল, বাপের মেজাজ ত তাহার অজ্ঞাত নহে। তাহার কপালে ঘাম দেখা দিল। তাঁহার মতের বিরুদ্ধ উপদেশ তিনি স্বয়ং গুরুঠাকুরের মুখেও শুনিতে অভ্যস্ত নহেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। তথাপি হতভাগিনী বোনটার মুখ চাহিয়া সে মোরিয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিল, "প্রমীলার এখন তাহার স্বামীর ঘরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে, চারুকে একবার আনবার চেষ্টা করলে হয় না?"

সারদাচরণ খবরের কাগজ হইতে চোখ তুলিলেন, "ওঃ, এই কথা! প্রেম কি তোমায় বলেছে যে, তাহার স্বামীর ঘরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে?"

ধীরেন্দ্রনাথ দৃষ্টি নত করিলেন, একটুখানি কাসিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "আমায় বলে নি, আমার স্ত্রীকে বলেছে।"

সারদাচরণ তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের আনত মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কিছুদিন থেকেই শুনতে পাচ্ছি, তোমার স্ত্রী আমার মেয়ের এ বাড়ীতে বাস করার সম্বন্ধে কিছু অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। এখন দেখছি, শুধু তিনিই নন, তাঁর পরামর্শে তোমারও মনে সে বেচারীকে বিদায় করবার জন্য আগ্রহ কিছু প্রবল হয়ে উঠেছে। তা হ'লে এক কায করা যাক্, তুমি ও তোমার স্ত্রী বরং কিছু দিন আলাদা একটা বাসাটাসা ক'রে তাতেই উঠে যাও। প্রমীলা আমাদের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে থাকবে। তার পরের জন্যও তার ব্যবস্থাটা আমিই ক'রে রেখে যাব। তোমাদের সে গলগ্রহ হবে না।"

বাপের এই শান্তভাবে উচ্চারিত কথাগুলিতে ধীরেনের বুকে যেন শেল মারিল। একটিমাত্র বোন্ বলিয়া প্রমীলাকে সে মনের সহিতই ভালবাসিত। বাপের কথার ঘায়ে আহত হইয়া তাহার মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিলেও কোনমতে আত্মদমন করিয়া সে শান্ত বিনীতভাবেই উত্তর করিল,"আমি কি তার জন্যই বলছিলুম; চারু এখন ডাক্তারীতে বেশ পসার জমাচ্ছে, বিয়েও করে নি, সকলেই তাকে ভাল বলে। বিশেষ যখন প্রমীলা স্বামীর জন্য উৎসুক হয়েছে। সে যদি যায়, তখন কেন না আমরা তাকে যেতে দিই?"

সারদা বাবু কহিলেন, "সে যদি আকাশের চাঁদ চায়, তুমি তাকে পেড়ে দিতে পারবে? চাইলেই ত আর হয় না! বুঝে-সুঝে চাইতে ও দিতে হয়। এক দিন মেয়ে বল্লেন, 'আমার স্বামী চাই নে', আজ বলছেন, 'আমার স্বামী চাই!' তা বল্লে হবে কি ক'রে? এখন আর তাঁর স্বামী পাওয়া চলে না! তাঁকে বলো, আমি যা করি, তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করি। তাঁরই মতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর ফারখৎ ক'রে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুর ঘর না হ'লে আমি আবার তাঁর বিয়েও দিতুম। এখন যে আবার সেই লাথি

বিরহিণী যক্ষ (মেঘদূত)

বসুমতী প্রেস। শিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মেয়ে পায়ে ধরতে যাওয়া, সে আমার বংশে হবে না। মনে করুন, তিনি বিধবা; এই মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করুন। থাকবার বাড়ী আর মাসিক দেড়শো টাকা, এ ছাড়া নগদ ১০ হাজার এই আমি তাঁর নামে লিখে রেখেছি, যা তাঁর স্বামীর ঘরে জন্মে কখন জুটতো কি না জানি না। আচ্ছা যাও, তুমি না পার, আমিই তাকে বলবো, তবে তোমরা আর আমায় এ নিয়ে বিরক্ত করতে এস না। এ কথা বেশ ক'রে মনে রেখ, আর তোমার স্ত্রীকেও সেটা বুঝিয়ে দিও। হুঁ, তা হ'লে এখন যাও!"

প্রমীলা বৌদিদির মুখ দিয়া কতকটা ছাঁটকাট করিয়া খবরটা পাইয়াছিল, তথাপি বাপের মুখেও তাহাকে স্পষ্ট ভাষাতেই ইহা শুনিতে হইল। শুনিয়া তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে গুম হইয়া বসিয়া থাকিল, তাহার পর উঠিয়া গুম্-গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে একটা কোণের মধ্যে বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে সবলে কান্না চাপিতে লাগিল। বাপের উপর একটা অকথ্য ক্রোধের জ্বালায় তাহার বুকটা যেন ভিতরে ভিতরে আগুন লাগার মতই জ্বলিয়া উঠিতেছিল। একবার তাহার মনে হইল, এক বোতল কেরোসিন তেল ঢালিয়া নিজের গায়ে আগুন ধরাইয়া দিলেই ইহার উত্তম প্রতিশোধ লওয়া হইবে। তাহার পর আবার মনে হইল, নাঃ, কায কি, বাস্তবিকই চারু এখনও তাহাকে ঘরে লইতে চাহে কি না, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! হয় ত সে-ও তাহার দুর্ব্বলতা দেখিয়া মনে মনে হাসিবে; নিশ্চিন্ত হইয়া আবার বিবাহ করিবে।

এখন চারুর আর একটা বিবাহের চিন্তায় প্রমীলার মনটা বড় বেশী তিক্ত হইয়া যায়। বিবাহ করে নাই বলিয়াই তাহার উপর যেটুকু মায়া হয়। সে যদি আবার কাহাকেও বিবাহ করিত, তবে কি আর প্রমীলা তাহাকে মনেই ভাবিত?

১২

আষাঢ়ের ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন আকাশে সন্ত বৃষ্টি থামার সুযোগে অস্ত-রবির আলোর ধারা বারিসিক্ত ধরণীবক্ষে নামিয়া আসিয়াছিল। ঝিপ্-ঝিপ ঝিম্-ঝিম্ রব থামাইয়া ঝির্-ঝির্ হাওয়া বহিতেছিল। সিক্ত তরুর সবুজ পত্রে বৃষ্টি-জলের বিন্দুগুলি টল্‌টলে নিটোল মুক্তার মতই শোভনীয় বোধ হইতেছিল। টগর, করবী ও কৃষ্ণচূড়া—অপর্য্যাপ্ত ফুলের রাশি সদ্যস্নাতা সুবেশা সুন্দরীদের মতই সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। আকাশের উত্তর-পূর্ব্বদিকে একটা রামধনুর বর্ণশোভা অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়া উঠিয়াছে, বাদলের অপরাহ্ণে সোনালী রংয়ের আলোর রাশিতে ধরণী যেন স্বপ্নপুরীর শোভা ধারণ করিয়াছিল।

দল বাঁধিয়া সে দিন সারদা বাবুরা আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সারদা বাবুর অবশ্য আসিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, কিন্তু হাজারিবাগের নিকটবর্ত্তী রামগড়ের জঙ্গলে ধৃত প্রকাণ্ডাকার বেঙ্গল টাইগারটাকে দেখার ও দেখাইবার উৎসাহে ছেলের দল তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া টিফিন কেরিয়ারগুলা ভরিয়া লইয়া বাড়ী শুদ্ধ সকলেই দুইখানা মোটরে করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রমীলার মেজ ভাই নরেনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—নূতন বধূ সাবিত্রীও এই দলের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল।

ছেলে-মেয়েরা কাঠবিড়ালীর মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুড়া-বুড়ীরা একটু-আধটু ঘুরিয়াই বিশ্রামস্থলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তরুণ-তরুণীরা কখন সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া হাসি-খুসী গল্প করিতেছিল, কখন দ্রষ্টব্য জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে তর্কাতর্কি করিতেছিল, কখন তাহাদের ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল।

বাগানে আরও কয়েক জন ভদ্রলোক বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একটি তরুণবয়স্ক লোক একখানা খাতা ও পেন্সিল লইয়া পাখীর দিক্‌টাতেই নিবিষ্ট হইয়া দেখা-শুনা ও নোট করায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রমীলা সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠিল। বিস্ময়দীপ্ত তীক্ষ্ণ-নেত্রে সে সেই অজানা বাবুটির দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং তাহার সেই বিস্ময়াভিহত দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া সংশয়-শঙ্কিত বক্ষে তাঁহার কার্য্যরত আনত মুখের দিকে চাহিয়া অসাড় হইয়া রহিল।

সুধারাণী, সাবিত্রী, কমল এবং ইহাদের সঙ্গে ধীরেন, নরেন, জীতেন প্রভৃতি আপন মনে গল্প-স্বল্প করিতে

করিতে খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, এখন কি একটা কথায় সাক্ষি-স্বরূপে সুধা বলিল, "আচ্ছা, হয় না হয় ঠাকুরঝিকেই জিজ্ঞাসা কর। হ্যাঁ ভাই ঠাকুরঝি! তুমিই বল ত—"

বলিয়া সম্মুখে, পাশে, পিছনে চাহিয়া দেখে, তাহার ঠাকুরঝি তাহাদের মধ্যে নাই! "ও মা! ঠাকুরঝি কোথা গেল?" বলিয়া পিছনদিকে অনেক দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিতেই দেখা গেল, সে একটা লতার খুঁটি ধরিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে; অবাক্ হইয়া কি যেন একটা দেখিতেছে বুঝা গেল। সাবিত্রী ঠাট্টা করিয়া বলিল, "দেখ দিদি! ঠাকুরঝি ভাই পাখী চুরীর মতলবে আছে নিশ্চয়! কি রকম চোরের মত চুপটি ক'রে দেখছে দেখ!"

সুধাও তাহার এই স্তব্ধ নিশ্চলতা লক্ষ্য করিয়া এই কথায় একটুখানি হাসিল, তাহার পর বলিল, "তোরা এই-খানে দাঁড়া, আমি ওকে ডেকে আন্‌ছি।"

জিতেন বলিল, "তুমি কেন ডাকতে যাবে আবার, আমি এইখান থেকেই একটা হাঁক দিচ্ছি!"

বড়বৌ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না ছোট-ঠাকুর-পো! তুমি থাম, আমি চুপি চুপি যেয়ে আগে দেখি, ও অমন হাঁ ক'রে কি দেখছে।"

নিকটে আসিতেই প্রমীলার দ্রষ্টব্য বস্তুটা সুধারাণীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুধা তাহার বাপের বাড়ীতে দুই এক-বার চারুকে দেখিয়াছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিল। প্রমীলা সুধাকে দেখিয়া ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরাইয়া আনিল বটে, কিন্তু তাহার মুখখানা যে গভীর বেদনায় সাদা হইয়া গিয়াছিল, ঈষৎ লজ্জার লালিমাও তাহাকে মুছিয়া লইতে পারিল না। সুধা ডাকিল, "চারু বাবু!"

চারু বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে পেন্সিলটা মাটীতে পড়িয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই পুনশ্চ সে অস্বাভাবিকরূপে চমকিত হইল। একটি মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সে তাহার তিন বৎসরের অদর্শনে অদেখা স্ত্রীর মুখ চিনিতে পারিল;—পারিয়া আর সে যেন সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইল না; বজ্রাহতের মত নিশ্চল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই আকস্মিক নিশ্চলতার হাওয়া হইতে শুধু সুধা-রাণীই নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে পারিল। সে তাহাদের দুই জনেরই সেই অভিভূতভাব দেখিয়া, দুই জনের দিকেই এক একবার করিয়া চাহিয়া হাসিল; তাহার পর সেই হাস্যস্মিত মুখে বলিয়া উঠিল—"একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ! কেমন তিনি ষড়যন্ত্রটা ক'রে দু'জনকে দু'দিক থেকে টেনে এনে মিলিয়ে দিয়েছেন দেখ ত!" এই বলিয়া প্রমীলাকে টানিয়া লইয়া সে চারুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রমীলার তখন হয় ত শরীরে সংজ্ঞাটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। সে বৌদিদির হস্তে আকর্ষিত একটা মাটীর পুতুলের মতই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার চিন্তাশক্তি, তাহার বোধশক্তি সমস্তই তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পা এমন কাঁপিতেছিল যে, সুধা তাহাকে ধরিয়া না থাকিলে সে হয় ত তখনই পড়িয়া যাইত।

এ দিকে এই আকস্মিকতার অতর্কিত বিস্ময়ের আঘাত হইতে চারুও আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। সে-ও চুপ করিয়া নীরবে প্রমীলার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটায় একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। সে এখন ইহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার কিছুই যেন সে ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া গভীর সন্দেহের দোলায় তাহার মনটা ভীষণভাবেই দুলিতে লাগিল। প্রমীলা এখনও তাহার স্ত্রী হইলেও সে ঠিক তাহার স্ত্রী নহে। তাহারা যে তাহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে।

হিন্দুবিবাহে বিবাহবিচ্ছেদ নাই বটে, তবু চারু যে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছে, প্রমীলাকে সে কোন দিন নিজের কাছে আনিতে চাহিবে না।

সুধার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে চারু কহিল, "ভাল আছেন, বৌদি?"

"ভাল আছি ভাই, তুমিও এইবার থেকে ভাল যাতে থাকতে পার, ভগবান্‌ই তার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন বুঝি! ও মা! বাবা আসছেন যে! ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! ও ভাই! শীগ্‌গির ভাই পালিয়ে আয়। দেখতে পেলে আর আমায় আস্ত রাখবেন না। ভাববেন, আমিই ওঁকে ডেকে এনেছি।"

সুধারাণী শ্বশুরকে তাহাদের অদূরে দেখিয়াই এক রকম

পলাইল; কিন্তু প্রমীলা যেমন অবস্থায় যেখানে ছিল, তাহা হইতে সে এক পাও নড়িল না। তাহার বুকের মধ্যে যে একটা অসহ্য বেদনার প্রবল আলোড়ন ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল এবং একটা অব্যক্ত অসহ্য আর্ত্ত ক্রন্দনে যে তাহার সমস্ত শরীর-মন ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তাহা তাহার সেই নিদাঘ অপরাহ্ণের আসন্ন ঝটিকাব্যাপ্ত স্তব্ধ আকাশের মত মুখ-ভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল। নিদারুণ আত্ম-তিরস্কারের কঠোর লাঞ্ছনায় মনে মনে নিজেকে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিয়া স্বামীর পায়ের তলায় নিজেকে লুণ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য প্রাণ তাহার তখন সকল কুণ্ঠার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। আর কিছুরই অস্তিত্ব তখন তাহার মনের ভিতর প্রবেশপথ পায় নাই।

সারদা বাবু ছেলেমেয়েদের খোঁজে আসিয়া এই পথ ধরিয়া চলিতেছিলেন। সহসা তাঁহার পায়ের গতি একেবারে নিশ্চলতার চরমে গিয়া আটকাইয়া পড়িল। এ কি! এই নির্জ্জনে লতাবিতানে এক জন পুরুষের সঙ্গে মুখামুখি সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইয়া তাঁহারই মেয়ে প্রমীলা!

একটি মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সারদাচরণ মেয়ের দিকে ফিরিয়া জ্বলন্ত স্বরে ডাকিলেন,—"প্রমীলা!"

তাঁহার সেই স্বরে যেন একটা অগ্নিগর্ভ বোমা ফাটিয়া পড়িল।

"প্রমীলা! আমার কাছে চ'লে এস।"

বাপের আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি প্রমীলার মত আদুরে মেয়েরও ছিল না। সে যেন মন্ত্রবশীভূতার মতই যথানির্দ্দেশিত কায করিল।

"তোমার ইচ্ছানুসারে আমি তোমায় তোমার স্বামীর সঙ্গে স্বতন্ত্র থাকার ব্যবস্থা করেছিলুম। তোমার অনিচ্ছায় তা করা হয় নি। এখন আমার অপমান ক'রে, আমার মুখে চুণকালি দিয়ে তুমি গোপনে গোপনে তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছ, এর মানে কি? আজ থেকে তোমার বাড়ীর বার হওয়া বারণ হ'ল, এর পর থেকে আর কোথাও কখনও তুমি যেতে পাবে না।"

একটা জ্বলন্ত উল্কার মতই তীব্র দৃষ্টি জামাতার দিকে হানিয়া সারদাচরণ হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। যাত্রারম্ভের প্রথমেই বজ্রকঠিন কণ্ঠে আদেশ প্রদত্ত হইল,—"প্রমীলা! আমার সঙ্গে এস।"

একবারও আর পিছনে না চাহিয়া প্রমীলা নতমুখে শ্লথপদে পিতার অনুসরণ করিল। তাহার বুকের মধ্যটা তখন ঝড়ের হাওয়ায় নদীর মতই ভীষণ বেগে তোলপাড় হইতেছিল।

আর চারু? সে সেই তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই বিদায়-দিনের মতই আর একটা প্রাণ-ফাটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে নিজের অন্তরস্থ ক্ষুধিত ব্যাকুল আর্ত্তনাদের এতটুকুমাত্র বাহিরে প্রেরণ করিয়া অকথ্য অসীম যন্ত্রণার রাশিকে সবলে নিজের মধ্যেই চাপিয়া লইল।

১৩

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। কলেজ ষ্ট্রীটে একটি বড় ডিস্-পেনসারির উপরতলায় চারুর বাসাবাড়ীতে একটি কক্ষে চারু বসিয়া নিজের কথাই ভাবিতেছিল। আজ তিন বৎসর পরে কি আশ্চর্য্যভাবেই তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কতটুকুই বা সে!

ঘরখানি একটু বড়। খাটের উপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। ঠিক সামনের দেওয়ালে প্রমীলার একখানি ফটো-গ্রাফ এনলার্জ্জ করিয়া খুব চওড়া ফ্রেমে বাঁধান। ছবির ফ্রেমটিকে বেষ্টন করিয়া একগাছি যুঁইয়ের গোড়ে মালা; শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। মালাটি বেশী দিন পূর্ব্বের গাঁথা নহে, মাত্র এক দিনের বাসি। এখনও তাহা হইতে তাহাদের অতীত স্মৃতির মতই একটা ক্ষীণ সৌরভ উত্থিত হইয়া ঘরের বাতাসে ভাসিতেছিল।

আজিকার এই সদ্য দেখার সমস্ত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা মিলিয়া এই ক্ষীণ স্মৃতির সৌরভকে যেন অভিভব করিয়া দিতেছিল। এত দিনের সকল সংযম যেন আজ তাহাকে একেবারেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ভোঁ-ভোঁ করিয়া হর্ণ বাজাইয়া রাস্তা দিয়া হাজারখানা মোটরকার যাতায়াত করিতেছিল, তাহারই মধ্যের একখানা আসিয়া যেন দরজার কাছে থামিল, হয় ত ডিস্পেন্সারী সম্বন্ধীয় লোক, হয় ত বা কোন রোগী। চারু সে দিকে বড় একটা মন দিল না। কিন্তু সহসাই তাহার মনকে মনের রাশ ফিরাইয়া লইতে হইল। হঠাৎ তাহার ঘরের বন্ধ করা দরজাটা সবেগে খুলিয়া গেল এবং এক জন কেহ ত্রস্ত

গতিতে সেই দ্বারপথে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তখন চারু সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সে এক জন স্ত্রীলোক!

এত রাত্রিতে তাহার ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক কে আসিল এবং কে লইয়া আসিল? ইহার কোন মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইয়া গভীর বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চারু দারুণ সংশয়ে উচ্চারণ করিয়া উঠিল,—"কে আপনি?"

"আমি প্রমীলা"—বলিয়াই সেই আগন্তুকা নারী অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্পষ্ট স্বরে কহিল,—

"আমি বাড়ী থেকে চ'লে এসেছি। জিতুকে সঙ্গে নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি। সেখানে হয় ত আর ফিরে গেলেও বাবা আমায় স্থান দেবেন না। তুমি কি আমায় যায়গা দেবে?"

বিস্ময়বিমূঢ়তা হইতে নিজেকে টানিয়া তুলিয়া চারু গভীর আনন্দে বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার দুই চোখ দিয়া অনেক দিনের জমান গভীর বিষাদাশ্রুরাশি আজ এই শুভক্ষণে অজস্র আনন্দাশ্রুর রূপ ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে কোনমতে ভাষা সংগ্রহ পূর্ব্বক গভীর স্বরে কহিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা করেছ, প্রমীলা? করেছ?"

শ্রীমতী [illegible] দেবী

ব্রজের উদ্দেশে

হে ব্রজ, তোমার রজের মাঝারে
নবীন জীবন দাও মোরে,
ভক্ত গোপের চরণের তলে
তুচ্ছ তৃণটি দাও ক'রে।

পুষ্প হ'বার গরিমা রাখি না,
কর মোরে দীন মৌমাছি।
পঙ্কে বা বালু কঙ্করে হ'ক,
অঙ্কে তোমার ঠাঁই যাচি।

যমুনার জলে ধুইয়া এসেছি
বিদ্বেষ লোভ রোষ মদে,
একটুকু ঠাঁই আজি আমি চাই
তোমার গোঠের গোষ্পদে।

পাখী যদি কর শ্যামেরে জাগাব
কুঞ্জভঙ্গ গান করি',
ঝিল্লী করিলে অভিসার-পথ
চিনাব আঁধারে তান ধরি'।

ভেক যদি কর ভাদর নিশীথে
গাব গীতি প্রাণ-মন-গলা,
শ্যামের সখীরে গৃহের সখীরে
করিব কেবলি চঞ্চলা।

চঞ্চরী যদি কর তব বনে
বেড়াব সদাই সঞ্চরি'
মুকুলে মুকুলে বুলে বুলে বুলে
শ্যাম-গুণ-গান গুঞ্জরি'।

মীন যদি কর তবে যমুনার
ঘাটে ঘাটে বিচরণ করি,
জলকেলিরত শ্যামের চরণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাব সন্তরি'।

কৃমি কীট তৃণ হীন পতঙ্গ
যা খুসী আমারে তাই কর,
হে ব্রজ, তোমার ব্রজের মাঝারে
এইটুকু মোর ঠাঁই কর।

শ্রীকালিদাস রায়।

মার্কের কারখানা

বিজ্ঞানবলে য়ুরোপে ও আমেরিকায় কত অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বলিবার আজকাল আর প্রয়োজন নাই। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্যারিস প্রদর্শনীতে যখন এক জন ফরাসী রাসায়নিক রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধাতু—এক টুকরা এলুমিনিয়াম—The metal from clay অর্থাৎ মাটী হইতে প্রস্তুত ধাতু প্রদর্শন করেন, তখন সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। আজ ভারতবর্ষে সুদূর পল্লীতেও ঘরে ঘরে এলুমিনিয়মের বাসন ব্যবহৃত। হাল্কা বলিয়া

কর্ম্মচারীদের খাদ্যাগার

বিমান-যান ও সৈনিকদিগের ব্যবহার্য্য বাসন ইহা হইতেই প্রস্তুত। আবার কোথায় নায়েগ্রার ভীষণ জল-প্রপাত,—তাহার অসীম শক্তির ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশও ব্যবহার করিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়। সেই প্রবাহের সাহায্যে এক প্রকার খনিজ পদার্থ হইতেই এই ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহাতে আমেরিকা বৎসরে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করে। আমাদের দেশে আবহমানকাল মঞ্জিষ্ঠা ও নীল রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে নীলের চাষ লইয়া কতই অত্যাচার অনাচার হইয়া গিয়াছে! 'নীলদর্পণের' পাঠকগণ এখন ইহা ঐতিহাসিক ভাবে গ্রহণ করেন। নীলকরের অত্যাচার না হইলেও সময়ে নীলের আবাদ অর্থনীতিক হিসাবে আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া আসিত। এক সময় ভারতবর্ষ, পারস্য ও এসিয়া-মাইনরে এবং তাহার পর ফ্রান্স, হলাণ্ড, ইটালী ও তুর্কীতেও মঞ্জিষ্ঠার চাষ হইত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২ জন বিখ্যাত জার্ম্মাণ রাসায়নিক আল্‌কাতরা হইতে মঞ্জিষ্ঠার রং—যাহা Alizarin বা Turkey Red Dyeing নামে খ্যাত—কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিলেন। এখন এই রং পৃথিবীময় ব্যবহৃত হয়। আবার নীলও কৃত্রিম উপায়ে আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত হইয়া প্রকৃতিজাত নীলকে পৃথিবীর বাজার

বোতল-ঘর

হইতে এক প্রকার বহিষ্কৃত করিয়াছে। অধিক কি বলিব, এক আল্‌কাতরা হইতে লক্ষাধিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র প্রধান প্রধান ব্যবহৃত রংই ৬ বা ৭ শত হইবে। যে সব চাক্‌চিক্যময় চক্ষুবিমোহন রং দেখিয়া শুধু শিশুগণ নহে, আমাদের সীমন্তিনীগণও পাগল হইয়া উঠেন এবং যাহা আজকাল ছেলে-মেয়েদের জামা, সাড়ী, বডিস্‌, সেমিজ প্রভৃতির শোভা বর্দ্ধন করে, সেই সমস্ত রংই আল্‌কাতরা হইতে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত।

এতদ্ভিন্ন শত শত ঔষধ কৃত্রিম উপায়ে আল্‌কাতরা, সুরাসার (Alcohol) প্রভৃতি হইতে জার্ম্মাণ দেশে প্রস্তুত হইতেছে। আমি ৮০ বৎসরের অধিককাল অনিদ্রারোগ ভোগ করিতেছি। যখন বড় বাড়াবাড়ি হয়, এক Sulfonal অথবা Veronal সেবন করিয়া নিদ্রা-দেবীর শরণ লই। ইহারা উভয়েই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, আজকাল আমাদের দেশের ডাক্তাররা এই প্রকারে প্রস্তুত শত শত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি আমি পঞ্চম বার য়ুরোপ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমার দৃষ্টি প্রধানতঃ রাসায়নিকগণের গবেষণাগারের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন "বেঙ্গল কেমিকেল" সংস্থাপন করিবার জন্য প্রথম প্রয়াস করি, তখন আমার মনে এই ভাবই ছিল যে, আমাদের দেশেও নানাপ্রকার রাসায়নিক কারখানা সৃষ্টি করিতে না পারিলে, অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে না।

আমরা এমনই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি যে, নিত্য অবশ্য ব্যবহার্য্য যাহা কিছু, তাহা ঘরের পয়সা দিয়া বিদেশীর নিকট হইতে ক্রয় করি এবং সেই কারণেই আমাদের দেশ দিন দিন নির্ধন হইয়া যাইতেছে। এই কারণেই আমি কেবল খাদি নহে, পরন্তু সকল লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার ও নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তনে শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে ব্যস্ত।

অবশ্য ইতঃপূর্ব্বে ইংলণ্ডে ২।১টি বিরাট রাসায়নিক কারখানা দেখিয়াছি। কিন্তু আমি যখন স্বয়ং আমাদের দেশে ঔষধ প্রস্তুতের কারখানার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তখন জার্ম্মাণীর একটি বিরাট ঔষধের কারখানা দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে উৎসুক ছিলাম। সম্প্রতি আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। ঠিক এক মাস হইল, এক

আফিস-ঘর

দিন প্রাতঃকালে প্যারিস হইতে যাত্রা করিয়া ১৫ ঘণ্টা-কাল একাদিক্রমে রেল-গাড়ীতে চড়িয়া জার্ম্মাণীর ডার্ম্মষ্টাড সহরে রাত্রি ১০টার সময় পৌঁছিলাম। ইহারই উপকণ্ঠে মার্কের (Merck's) প্রথিতনামা বিরাট ঔষধের কারখানা। ইহার ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মার্কের এক জন পূর্ব্বপুরুষ একটি সামান্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। ইহাই এখন ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধের কারখানায় পরিণত হইয়াছে। এই কারখানার সহিত "বেঙ্গল কেমিকেলে"র ব্যবসাসূত্রে লেন-দেন আছে। আমি পূর্ব্বে তারযোগে কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলাম যে, আমি অমুক সময় তথায় পৌঁছিব। গাড়ীতে ভ্রমণের সময় আমার ভয় হইতেছিল, বিদেশে রাত্রি ১০টায় যাইয়া পৌঁছিব—বিশেষতঃ যদিও জার্ম্মাণ ভাষা কেতাবে একটু পড়িতে পারি, তথাপি কথাবার্ত্তা বলা অভ্যাস নাই; হয় ত ফাঁপরে পড়িব। কিন্তু আমার সে ভাবনা যে অমূলক, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনাতেই প্রকাশ পাইবে। ট্রেন হইতে নামিবামাত্র দেখিলাম, কারখানার এক জন প্রতিনিধি আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত এবং তিনি ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে একটি হোটেলে আমার থাকিবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার থাকিবার ও আহার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া তিনি বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেলেন, পরদিন প্রাতে ১০টার সময় আমাকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর আসিবে।

যথাসময়ে আমি কারখানায় পৌঁছিলে এই কারখানার স্বত্বাধিকারিগণ আমাকে সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাদের নানা বিভাগে লইয়া যাইয়া সমস্ত দেখাইয়া দিতে লাগিলেন এবং নানারূপ অদ্ভুত রাসায়নিক প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দিতেও ক্রটি করিলেন না। আমি একে বৃদ্ধ, তাহাতে ক্ষীণদেহ—৩।৪ ঘণ্টাকাল ক্রমান্বয়ে একতলা, দোতলা ও নানা বিভাগে ঘুরিয়া যখন আমার পদদ্বয় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তাহার পর তাঁহারা আমার জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন এবং অনেক প্রকার আলাপ-পরিচয়ের পর তাঁহাদের কারখানার আড়াই শত বৎসরব্যাপী ইতিহাস আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

আমাদের দেশে দেখা যায়, যদি কোন কৃতী পুরুষ

ধনোপার্জ্জন করেন এবং কোম্পানীর কাগজ অথবা জমীদারী রাখিয়া পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ যাবৎ শাপগ্রস্ত থাকেন। "ব'সে খাওয়া" আমাদের দেশের ideal অর্থাৎ আদর্শ। সম্প্রতি এই কলিকাতার কতকগুলি বনিয়াদী ঘরে আমার যাতায়াত করিবার কারণ ঘটে। প্রায়ই দেখি, বাড়ীর কর্ত্তা কেন, যুবক ও প্রৌঢ় পুত্রগণও যেমন স্থূলকলেবর, তেমনই অকর্ম্মণ্য; ফরাসের উপর অজগর-সর্পের ন্যায় প্রলম্বিত। কোন প্রকার ব্যায়ামচর্চ্চা নাই, শকটযান না হইলে এক পা মাটীতে দিব না, ইহাই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা। এই সব কারণে তাঁহাদের স্বাস্থ্যেরও যেমন হানি হয়, শরীরও যেমন ব্যাধিমন্দির হয়, আয়ুও তেমনই স্বল্প হয়। কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আড়াই শত বৎসর ধরিয়া এই কারখানা বংশানুক্রমে এই মার্ক-পরিবার দ্বারা বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পুরুষের পর পুরুষ যেমন কার্য্যদক্ষ, তেমনই বৈজ্ঞানিক। এত ধনী হইয়াও ইঁহারা এক এক বিভাগের এক এক জন কর্ত্তা হইয়া কায চালাইতেছেন। এক জন কর্ত্তা একটু হাসিয়া আমাকে বলিলেন, আপনাকে আমাদের অনেক গূঢ় প্রক্রিয়া যেমন তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলাম, তাহা আমরা প্রায় কাহাকেও দেখাই না। আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, আপনাদের কারখানাকে যদি সমুদ্র বলা যায়, আমাদের কারখানাকে শিশিরবিন্দুমাত্র বলিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এক জন মার্ক আমাদের মাণিকতলার কারখানা দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং যাইবার সময় একটু ইঙ্গিত করিয়া যায়েন;—"এ প্রকার কারখানা যে এসিয়াখণ্ডে আছে, তাহা আমি জানিতাম না।" কর্ত্তা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কারখানায় কত লোক খাটে?" আমি বলিলাম, "১১শত ১২শতের অধিক হইবে না।" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"আপনাদের কারখানা নেহাৎ ছোটখাটো নহে।" মার্কের এই কারখানায় এখন প্রায় ৮ সহস্র শ্রমজীবী; এবং এখানে যে কেবল ধাতব পদার্থ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা নহে; পরন্তু নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেও অনেক রকম সার নিষ্কাশিত হয়। বিশেষতঃ নানাবিধ ক্ষারাত্মক (Alkaloid) পদার্থ যথা—

তরল পদার্থের মাপ-ঘর

অহিফেন হইতে Morphine, Codeine ইত্যাদি; তাহা ছাড়া কোকেন, গ্যালিক এসিড ও ট্যানিক এসিড যাহা হরীতকী প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহাও প্রস্তুত হয়। চায়ের পাতা ও কোকোর পাতা হইতে কাফেইন (Caffeine) ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

যদি এক মাস ধরিয়াও আমি দেখিতাম, তাহা হইলেও সমস্ত বিভাগ শেষ করা যাইত না। একটি বিভাগে অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ কেবল গবেষণায় নিযুক্ত। তাঁহারা নূতন নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া গিনিপিগ, খরগোস ও মর্কট প্রভৃতির দেহে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, ইহা মানুষের উপর ফলপ্রদ হয় কি না। যখন প্যাকিং বিভাগে যাইলাম, তখন দেখিলাম, প্রত্যহ বড় বড় case বা বাক্স পৃথিবীর নানা স্থানে -য়ুরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকায়- প্রেরিত হইতেছে। কলিকাতার ঔষধের বাজারেও মার্কের মাল অজস্র আসিতেছে। য়ুরোপীয় জাতির উদ্যমশীলতা, শক্তি ও সামর্থ্যের নিদর্শনস্বরূপ এই একটিমাত্র কারখানার পরিচয় দিলাম। এই প্রকার শত শত ব্যাপারে তাঁহাদের মস্তিষ্ক নিতাই পরিচালিত। তাঁহারা পৃথিবীর উপর আধিপত্য কেন না করিবেন? আর আমরা নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিস্পন্দ, জড়বৎ পড়িয়া আছি, কেবল পূর্ব্ব-স্মৃতি ও গৌরবের দোহাই দিয়া ইতর প্রাণীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছি। সাধে কি কবি গাহিয়াছিলেন—"ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!"

ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই কারখানায় ৩ শত পৃথক্ পৃথক্ বাড়ী আছে এবং কারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই নূতন নূতন গৃহ সংযোগ করা হইতেছে। ইহা ৭৫ বিঘা জমীর উপর সংস্থাপিত এবং ৩০ শত বিঘা জমী ভবিষ্যতের প্রসারের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

কারখানার ইতিহাস

অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে কত বড় মহীরুহ আজ মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। আমাদের দেশের কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিকরা এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া, যাহাতে আমাদের দেশেও এই ভাবের কারখানার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েন, তাহাই এই বিবরণদানের উদ্দেশ্য।

প্যাকিং ঘর (একাংশ)

সে আজ প্রায় আড়াই শত বৎসরের কথা। ১৬৬৮ ান্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে ফ্রেডরিক জোহান মার্ক, সির ল্যাণ্ডগ্রেভ (জমীদার) ষষ্ঠ লাডউইগের নিকট হইতে ম্‌ষ্টাড সহরের এক পল্লীতে রাসায়নিক প্রণালীতে ঔষধাদি স্তুত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি সেই সময়ে সামান্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই ভিত্তি রিয়া আজিও তাঁহার বংশধরগণ ঔষধের বিরাট ব্যবসায় রচালিত করিতেছেন।

প্রয়োগ করিয়া মানুষের প্রয়োজনীয় নিত্য নূতন পণ্য বা ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি কোনও কোনও সমৃদ্ধ লোকের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। হেনরিচ ইমানুয়েল মার্ক স্বয়ং বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিধাতার যোগাযোগের ফলে তাঁহার এক কৃতবিদ্য অন্তরঙ্গ বন্ধুও জুটিয়াছিলেন। তাঁহার নাম লায়েবিগ। তিনিও ডার্মষ্টাড-নিবাসী। রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। মার্ক এই বন্ধুর সাহায্যে তাঁহার নিজের পাণ্ডিত্য প্রয়োগ করিয়া

কারখানার একটি রাস্তা

এই প্রথম মার্ক হইতে পঞ্চম পুরুষ পরে হেনরিচ ইমানুয়েল মার্কই প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুদ্র ঔষধালয়কে বিরাট পৃথিবীর াহিত সংশ্লিষ্ট কারখানায় পরিণত করিয়াছিলেন। ১৮১৬ ৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই ঔষধালয়ের কারখানায় প্রস্তুত পণ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন।

সেই সময়ে প্রতীচ্যে রসায়ন-শাস্ত্রের বিশেষ সমাদর হইতেছিল। সে সময়ে বহু মনীষী রাসায়নিকেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। রাসায়নিকগণ রসায়ন-শাস্ত্রের সাহায্যে সে সময়ে যে সকল অদ্ভুত আবিষ্কার করিতেছিলেন, তাহা ব্যবসায়ক্ষেত্রে

রসায়ন-শাস্ত্রানুসারে নানাবিধ ভেষজ আবিষ্কারে মনোযোগ প্রদান করিলেন।

কারখানার ভিত্তি-পত্তন

ডার্মষ্টাড সহর-প্রাচীরের ঠিক বাহিরে এক বাগান-বাড়ীতে মার্ক তাঁহার কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। শীঘ্রই দেখা গেল, সেই ক্ষুদ্র উদ্যান-বাটিকায় রাসায়নিক কারখানার স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। কারখানার বাগানে নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। শেষে কারখানা-বাড়ীর আয়তন ২০ একর (১ একর = ৩ বিঘা) ভূমি জুড়িয়া বসিল।

ক্রমোন্নতি

কিন্তু আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। ডার্মষ্টাড সহরেরও ক্রমশঃ আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, সহর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া এই বাগান-বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টিত করিয়া ফেলিল। কাযেই মার্ক স্থির করিলেন যে, নূতন স্থানে ভূমি সংগ্রহ করিয়া নূতন কারখানার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন স্থানে বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সহজ কথা নহে। ইহাতে অনেক কাঠ-খড়ের প্রয়োজন। সমস্যা অনেক। সে সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নূতন স্থানে ভূমি সংগ্রহ করিতে হইবে, তথায় নূতন গৃহসমূহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, একে একে তথায় পুরাতন কারখানার সাজ-সরঞ্জাম স্থানান্তরিত করিতে হইবে; এক কথায় একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে কত বড় মস্তিষ্ক নিয়োজিত করিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বহুকালের ভূয়োদর্শনের ফলে আধুনিক প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া মার্ক একে একে কারখানার অংশ-প্রত্যংশ গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। পুরাতন কারখানার কার্য্যে ব্যাঘাত না ঘটে, অথচ নূতন কারখানায় সুবিধা ও সুযোগমত কল-কব্জা ও সাজ-সরঞ্জাম স্থানান্তরিত হয়,—এই ভাবে নূতন কারখানা গঠিত হইতে লাগিল। ইহাতে মার্কের অসাধারণ গঠন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নূতন কারখানার কার্য্যারম্ভ হইল। ইহা এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে, সকলেই মার্কের কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ডার্মষ্টাড সহরের এক মাইল উত্তরে চারিদিকে হরিৎক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডে এই নূতন কারখানার প্রতিষ্ঠা হইল। এই কারখানার আয়তন ১ শত ১২ একর। অথচ কারখানার কার্য্য এত দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, এখন ইহাতেও ইহার স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার দ্বারা যাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা এই কারখানা-নির্ম্মাণে ও কল-কব্জা-স্থাপনে নিয়োজিত হইয়াছে। ফলে ইহা এখন পৃথিবীর মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য পদার্থে পরিণত হইয়াছে।

ঔষধ প্রস্তুত করিবার কলঘর
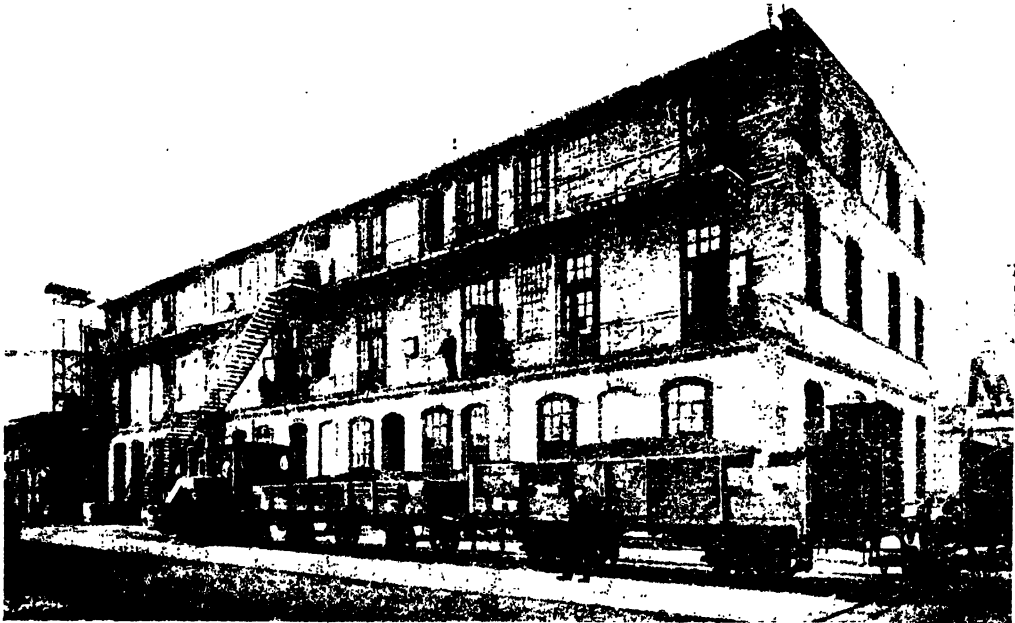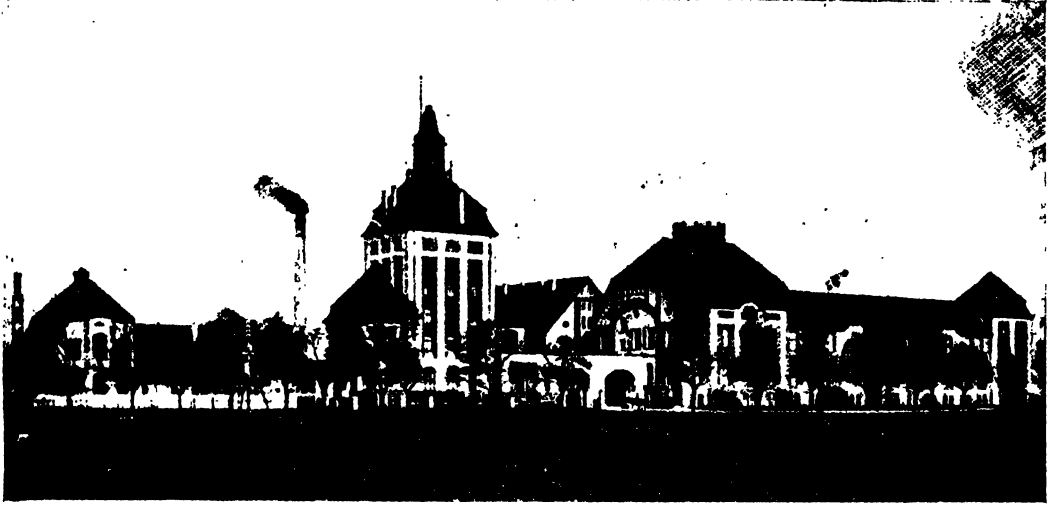
অফিস ও প্রবেশদ্বার

পণ্য উৎপাদন

পুরাতন কারখানায় থাকিতেই মার্ক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে নানারূপ ব্যবসায়ের অনুকূল পণ্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্ষারাত্মক পদার্থ (Alkaloids) প্রস্তুতকরণে মার্কের কারখানা প্রথমাবধি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সামান্যভাবে এমেটিন, ষ্ট্রিকনাইন, পাইক্রোটক্সিন, মরফাইন (১৮২৭ খৃঃ), ভ্যাণ্টোনাইন (১৮৩৩ খৃঃ), কোডিন (১৮৩৬ খৃঃ) প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু কিরূপে ঐ সকল দ্রব্য বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া মানুষের উপকার করা যায়, পরন্তু নিজেও প্রভূত লাভবান্ হওয়া যায়, —তাহা এ যাবৎ কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। মার্ক তাহার সূত্রপাত করিলেন।

ক্ষারাত্মক দ্রব্যসমূহ আবিষ্কারের পর মার্ক আরও গবেষণার ফলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে উদ্ভিজ্জ জগতের শত প্রকার ভেষজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সকল ভেষজ বিরাট ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে

লাগিলেন। প্রতি বৎসরেই মার্কের কারখানা হইতে নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত ও পণ্যরূপে জগতে প্রেরিত হইতে লাগিল।

প্রথম বাষ্প-যন্ত্র

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মার্কের কারখানায় বাষ্প-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এট্রোপিন এবং ইহার ক্ষারসমূহ, যথা ক্যান্থারিডিন, থিওব্রোমাইন, কাফেইন, ডিজিট্যালিন ও কলচিকিন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া জগতে পণ্যরূপে প্রেরিত হইতে লাগিল।

বিদ্যুতের কারখানা

কোকেন

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মার্কের কারখানায় কোকেন প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইহার ২২ বৎসর পরে কোকেন মেটিরিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করিয়াছিল।

কেমিক্যালস্ ও সার-সংগ্রহ

মার্কের কারখানা যে কেবল ক্ষারাত্মক পণ্যই প্রস্তুত করিত, তাহা নহে; গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ঐ কারখানা ব্রোমোফরম, পাইরোগ্যালিক এসিড, ট্যানিন এবং সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি কেমিক্যালসও প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল দ্রব্যও ক্রমে পণ্যরূপে জগতের নানা স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল।

কারখানার কারিকর ও কর্ম্মচারী

এত বড় বিরাট কারখানার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করাও কম কৃতিত্বপরিচায়ক নহে। একটা ছোটখাট রাজ্যের শাসন ও পালনে যেরূপ মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয়, ইহাতে তাহর অপেক্ষা কম মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না।

এই কারখানার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫ শতের কম নহে। কারিকরের সংখ্যাও ১৫ শতের অধিক। ন্যূনাধিক ২ হাজার লোকের শাসন-পালন নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

কারখানার ৫ শত নর-নারী কর্ম্মচারীর জন্য একটি প্রকাণ্ড রেস্তোঁরা আছে। এতদ্ব্যতীত নর ও নারীর জন্য স্বতন্ত্র "মেস" বাড়ী আছে। আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য একটি হাঁসপাতালের ওয়ার্ড আছে। উহার সংলগ্ন একটি ছোট ডিস্পেন্সারীও আছে। শীতল ও উষ্ণ জলে স্নানের জন্য কর্ম্মচারী ও কারিকরগণের একটি স্নানাগার আছে। কারখানায়

শ্রমজীবীদিগের আবাস

বয়লার ঘরের অভ্যন্তর
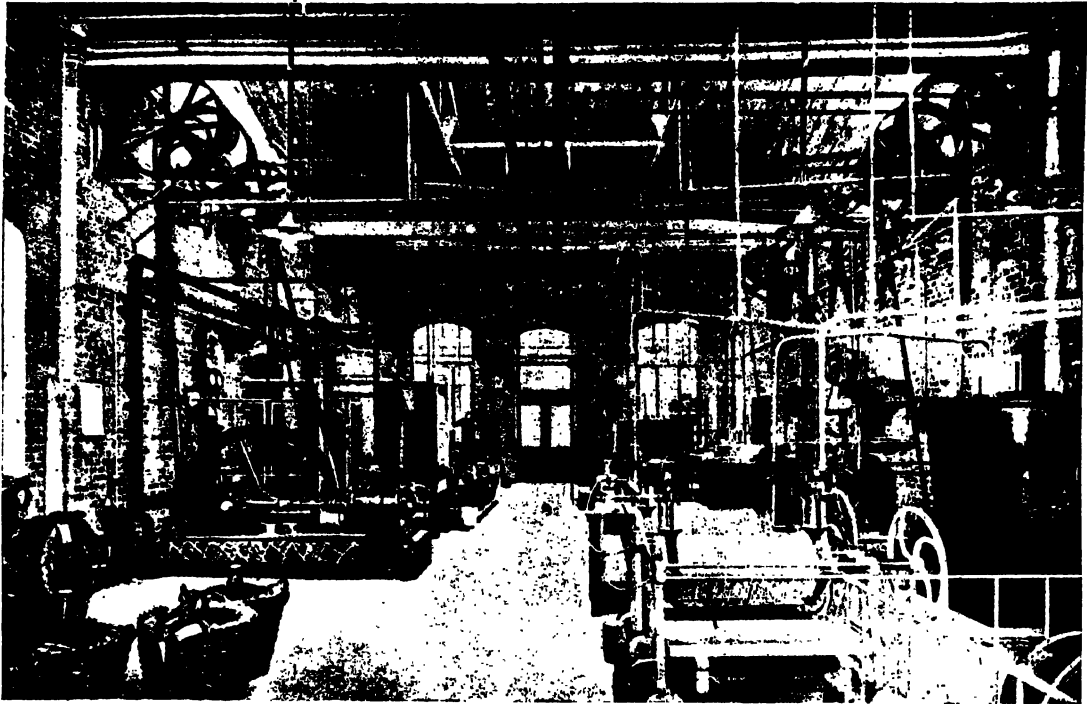
লেবরেটারীর অভ্যন্তর

আফিসের একাংশ (জার্ম্মাণ বিভাগ)
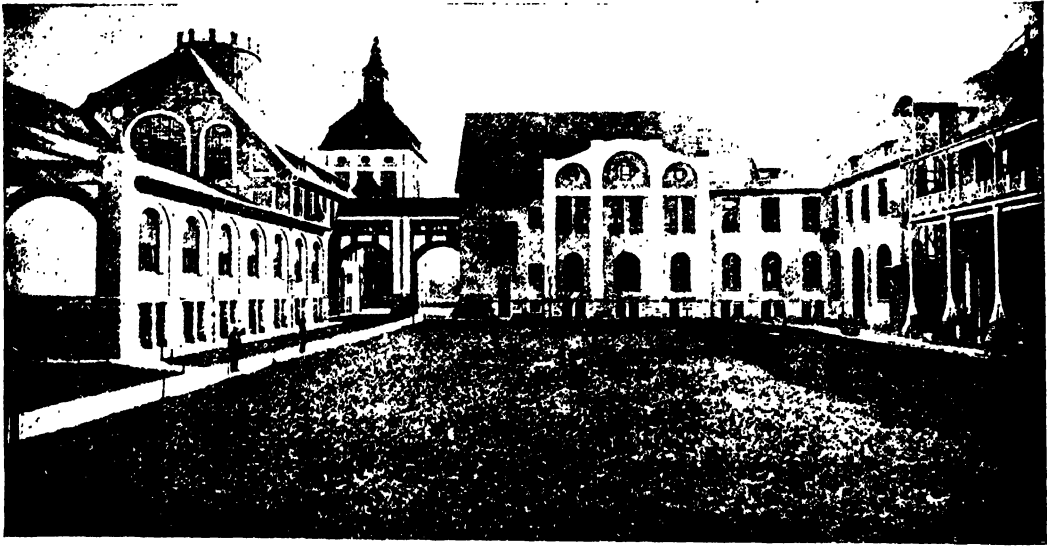
পুস্তকাগার ও গবেষণাগার

যে কর্ম্মচারী ও কারিকরগণের দৈহিক উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়, এমন নহে; তাহাদের মানসিক উন্নতির নিমিত্ত একটি বড় রকমের পুস্তকাগার আছে। উহাদের জন্য একটি পীড়িতগণের ক্লাবও আছে। বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ও কারিকরগণের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা আছে। কর্ম্মচারী ও কারিকরগণের পীড়ার সময়ে তাহাদের পোষ্যগণের প্রতিপালনের জন্য কারখানা হইতে ভাতার ব্যবস্থা আছে। কোন কারিকর বা কর্ম্মচারীর সন্তান হইলে সন্তানের জননীকে অর্থসাহায্য করা হয়। কারিকরগণের জন্য আদর্শ বাসগৃহেরও একটি সুন্দর উপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

কর্ম্মচারিগণের জন্য পেন্সনের বন্দোবস্ত আছে। একটা নির্দ্দিষ্ট কাল চাকুরী করিবার পর তাহারা পেন্সন পাইয়া থাকে। কাহারও ২৫ বা ততোঽধিক বৎসর কার্য্যকাল পূর্ণ হইলে কারখানার অংশীদাররা কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। সে সময় কারখানার ব্যাণ্ড বাজে এবং খেলা-ধুলা ও বায়স্কোপ-থিয়েটারের অভিনয় হয়। বস্তুতঃ কারিকর ও কর্ম্মচারিগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে যতদূর সুব্যবস্থা করা যায়, কারখানার মালিকরা তাহা করিতে ত্রুটি প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাদের নীতি,—"Best fed, best work."

কারখানার কার্য্যালয়াদি

কারখানার সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বের হর্ম্ম্যসমূহ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বক্ষে ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ডার্মষ্টাড সহরে ইহা একটি প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষ। এই গৃহগুলিতে কারখানার দপ্তর ও বিজ্ঞানাগার অবস্থিত।

বিজ্ঞানাগারটি দেখিবার জিনিষ। এখানে যে সকল লেবরেটারী আছে, তাহাতে কেবলই বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারকার্য্য চলিতেছে। এ জন্য বহু বৈজ্ঞানিক এই স্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার ফলে জগতের রাসায়নিক ও ভেষজ-সম্পর্কিত নানা পণ্য নিত্য উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হইতেছে। তাঁহাদের মার্কা "মার্ক" জগতে সাধুতা ও অকৃত্রিমতার জন্য প্রসিদ্ধ। গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলসমূহ মার্কের বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহা ৫টি ভাষায় মুদ্রিত হয়।

লেবরেটারীগুলি প্রকাণ্ড ও প্রশস্তায়তন। ইহার কোথাও ক্ষারাত্মক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও বা কোকেন প্রস্তুত হইতেছে, আবার কোথাও বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সার সংগ্রহ করা হইতেছে। এই সঙ্গে মার্কের কতকগুলি বিশেষ কেমিক্যালও প্রস্তুত হয়; যথা—ডাইওনিন, ব্রমিপিন, লোভিপিন ইত্যাদি। আর এক

রাস্তা
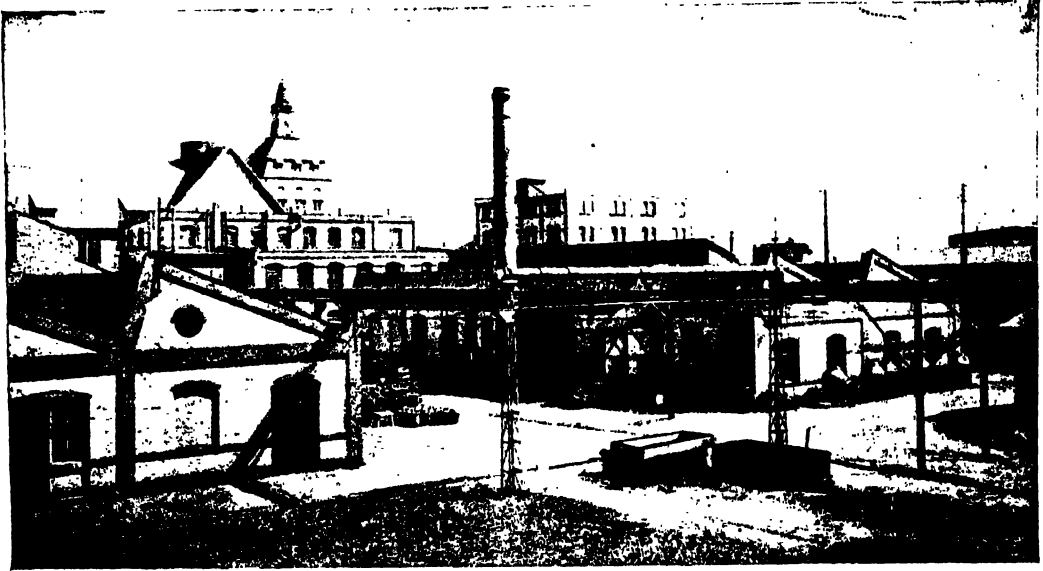
লেবরেটারীতে জগতের নানা স্থান হইতে আনীত ভেষজ পরীক্ষিত হইতেছে।

কারখানার নিজস্ব তাড়িত ও গ্যাস প্রস্তুতের কল আছে। কারখানা নিজের জল নিজেই সরবরাহ করে। এতদ্ব্যতীত নিজস্ব ছুতার, কামার, দপ্তরী ও মেরামতী কাযেরও কারখানাসমূহ ইহার সহিত সংলগ্ন আছে। টিনের বাক্স প্রস্তুত করিবারও একটা কল আছে।

জীবাণু-তত্ব বিভাগে নানাবিধ পশুর (অশ্ব, গো, শশক ইত্যাদি) থাকিবার গৃহ আছে। ঐ সকল প্রাণী হইতে ভ্যাকসিন ও এন্টি-টক্সিন সংগ্রহ করা হয়।

এই সকল লেবরেটারীতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া "পাশ" করিবার নিমিত্ত এক Control Laboratory আছে। ঐ লেবরেটারী কোন দ্রব্য "পাশ" না করিলে তাহা বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠান হয় না। বহু মাইল রেল-পথ কারখানার বক্ষ ভেদ করিয়া গিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ য়ুরোপের সহিত কারখানার সংস্রব রাখিবার নিমিত্ত বহু রেল-গাড়ী অনবরত কারখানা হইতে অন্যত্র ধাবিত হইতেছে।

এত বড় বিরাট কারখানা অন্যত্র অতি অল্পই আছে। ভারতে এক টাটার কারখানা ব্যতীত এমন কারখানা আছে বলিয়া শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ ঔষধাদির এত বড় কারখানাও ভারতে নাই। কিরূপে বিরাট ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া ঔষধের কারখানা গড়িয়া তুলিতে হয়, মার্কের কারখানা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে উপাদান, শ্রম ও অর্থের অভাব নাই। অভাব কেবল সাহস, উদ্যম, একতা ও দেশপ্রেমের। দেশের মঙ্গলের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে এমন কারখানা কি এ দেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয় না?

লক্ষ্মীর বরপুত্র

১

বড় আদরের লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে লক্ষ্মী যখন ভরা যৌবনে উনিশ বছর বয়সে বিধবা হইল, তখন বাপ-মা'র মাথায় যেন বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাপ বাবুরাম ঘোষ মেয়ে-মানুষের মত আছাড় খাইয়া পড়িয়া আকুলি-বিকুলি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মা'র ত কথাই নাই।

এই মেয়ে যখন প্রথম সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে, তখন মেয়ে হইলেও বাপ-মা'র কতই আনন্দ—কতই উল্লাস! দৈবজ্ঞ মহেশ্বর আচার্য্য মেয়ের ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়া দিয়া বাবুরামকে বলিলেন, "তোমার এ মেয়ে যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হে বাবুরাম! এ মেয়ে যার ঘরে থাকবে, তারই ঘর যে উথলে উঠবে!"

মেয়ের ঠিকুজীর কথা শুনিয়া বাবুরামের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। সে সাহ্লাদে দৈবজ্ঞকে পাঁচ পালি ধান মাপিয়া দিল এবং তাঁহার গণনানুসারে মেয়ের নাম রাখিল লক্ষ্মী।

দৈবজ্ঞের গণনা মিথ্যা হইল না। লক্ষ্মীর জন্মের পর হইতেই বাবুরামের সংসারে লক্ষ্মীশ্রী যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, ফসলভরা ক্ষেত—বাবুরামের সংসারে সুখ-শান্তি যেন উথলিয়া উঠিতে থাকিল। তাহা দেখিয়া বাবুরাম মনে মনে ভাবিল, "হবে না, সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী যে আমার ঘরে বিরাজ কচ্ছেন। কিন্তু হায়, এই লক্ষ্মীকে যখন পরের ঘরে দিতে হবে!"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর রূপ ও গুণ দুই-ই যেন ফুটিয়া উঠিতে থাকিল। চাষার ঘরে এমন রূপ ত দেখাই যায় না। আর গুণ—প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত সমস্বরে বলিত, "এমন শান্ত-শিষ্ট মেয়ে কেউ কখন চোখে দেখে নাই।"

লক্ষ্মীর পর আরও দুই তিনটি ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিলেও লক্ষ্মী যেমন মা-বাপের—বিশেষতঃ বাপের আদর পাইল, তেমন আর কেহই নহে। লক্ষ্মী যেন বাপের নয়নের মণি।

কিন্তু এত আদরের মেয়ে যখন এগারো ছাড়াইয়া বারোয় পা দিল এবং পাড়া-প্রতিবেশী হইতে গৃহিণী পর্য্যন্ত তাড়া দিতে লাগিলেন, এ মেয়ের বিবাহ সত্বর না দিলেই নহে, তখন মেয়েকে পরের হাতে দিতে হইবে ভাবিয়া বাবুরামের বুকটা চড়্ চড়্ করিয়া উঠিল। উঠিলেও তাহাকে মেয়ের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতে হইল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে কইগাছির রামবল্লভ হাজরার ছোট ভাই কৃষ্ণবল্লভের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল।

কইগাছির হাজরাদের অবস্থা আগে খুব ভালই ছিল। কিন্তু রামবল্লভের বাপের আমল হইতে অবস্থায় যেন ভাঁটা পড়িয়া আসিতেছিল। সরিকী বিবাদে মামলা-মোকর্দ্দমায় অধিকাংশ জমীজমাই মহাজনের কুক্ষিগত হইয়াছিল। সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই হাতে-কোদালে চাষ করিয়া রামবল্লভ কায়ক্লেশে সংসার চালাইয়া আসিতেছিল। ছোট ভাই কৃষ্ণবল্লভ মোটামুটি বাঙ্গালা লিখা-পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় যাইয়া রোজগারের চেষ্টা দেখিতেছিল।

অবস্থা ভাল না হইলেও বাবুরাম ছেলেটিকে দেখিয়া, বিশেষতঃ কোষ্ঠীর মিল হওয়ায়, কৃষ্ণবল্লভের হাতেই কন্যা-সম্প্রদান করিল।

লক্ষ্মীর বিবাহের পর হইতেই হাজরাদের অবস্থার মধ্যে যেন একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। কৃষ্ণবল্লভ সামান্য চাঁপাদারীর কায হইতে সহসা কয়ালের কাযে নিযুক্ত হইল এবং সেই কাযে বেশ দশ টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিল। বহু দিন হইতে বেতাই নদীর পশ্চিম পারের বাঁধে একটা হানা পড়ায় রামবল্লভের কতকগুলা জমী হাজা-পতিত হইয়াছিল। লক্ষ্মী যে বৎসর প্রথম স্বামীর ঘর করিতে গেল, সেই বৎসর হঠাৎ নদীর পূর্ব্বপারে একটা বড় হানা পড়িয়া গেল। নদীর প্রায় সমস্ত জলই সেই হানা-পথে বাহির হইয়া যাওয়ায় রামবল্লভের জমীগুলা হাসিল হইয়া উঠিল। ও দিকে বছর তিনেকের মধ্যে কৃষ্ণবল্লভ মুঠা মুঠা টাকা রোজগার করিয়া মহাজনের কবল হইতে বন্ধকী জমীগুলা উদ্ধার করিয়া ফেলিল। রামবল্লভ মহোৎসাহে ভাল ভাল

গরু কিনিয়া, কৃষাণ রাখিয়া ভাল করিয়া চাষ-আবাদ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে রামবল্লভের খামার, ক্ষেত, গোলা ধনে-ধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল; সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করিতে লাগিল।

রামবল্লভের বুঝিতে বাকী রহিল না, মা লক্ষ্মী কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহার শূন্য গৃহ এমনভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন। ছোট বৌমাই যে তাহাদের এই অভাবনীয় উন্নতির মূল, এ বিষয়ে রামবল্লভের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সুতরাং ছোট বৌমা'র উপর স্নেহে ও শ্রদ্ধায় তাহার অন্তরটা সর্ব্বদাই পূর্ণ হইয়া থাকিত। সর্ব্বদাই সে এই লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটিকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিতে ইচ্ছুক হইত এবং তাহার আদর-যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি বা তাহাকে কোনরূপে কষ্ট পাইতে দেখিলে রামবল্লভ স্ত্রী সুখদাকে তিরস্কার করিয়া, গালাগালি দিয়া বাড়ী যেন মাথায় করিত।

রামবল্লভের এতটা বাড়াবাড়ি সুখদার কিন্তু সহ্য হইত না,—লক্ষ্মীর আয়-পয়ই যে সংসারের উন্নতির মূল, ইহা সে স্বীকার করিতে চাহিত না। কেন, তাহার মেজো মেয়ে বিমলাও ত কৃষ্ণবল্লভের বিবাহের বছরখানেক আগে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। তাহার আয়-পয়েও ত এমন হইতে পারে; হইতেছেও তাহাই, কিন্তু চোখখেকো লোকগুলা ত সে দিকে চাহিয়া দেখিতেছে না; ছোট বৌয়ের ঐ কটা রং, আর তাহার লোক-ভুলানো ডাইনীর মত মুখখানা দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা সুখদার পয়মন্ত মেয়ে বিম-লাকে পিছনে ফেলিয়া ছোট বৌটাকেই উঁচু করিয়া তুলি-য়াছে। আর ইহাদের এই অলীক প্রশংসায় ছোট বৌও অহঙ্কারে দিন দিন ফুলিয়া উঠিতেছে। দর্পহারী মধুসূদন কবে উহার এই দর্প চূর্ণ করিবেন!

সুখদা শুধু মনে মনে এইটুকু ভাবিয়াই নিরস্ত থাকিত না; সে নিজের মনোভাবটা রামবল্লভকেও বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। রামবল্লভ কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিত না; লক্ষ্মীর সৌম্য-মধুর মূর্ত্তিখানা তাহার সরল উদার প্রাণের মধ্যে এতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, স্ত্রীর এই অখণ্ডনীয় যুক্তিগুলাকে সে হাসিয়াই উড়াইয়া দিত এবং ছোট বৌমাকে আদর-যত্ন করিবার উপদেশ দিয়া সুখদার অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ-বুদ্ধিটাকে আরও যেন জ্বালাইয়া তুলিত।

২

আলোকের বিপরীত দিকে অন্ধকার। এ দিকে লক্ষ্মীর আবির্ভাবে হাজরাদের ঘরে যেমন সুখের আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, অন্য দিকে বাবুরামের সংসারে তেমনই দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। যে বৎসর লক্ষ্মী তাহার ঘর ছাড়িয়া প্রথম শ্বশুর-ঘর করিতে গেল, সেই বৎসরই বেতাই নদীর পূর্ব্বপারে হানা পড়িয়া বানের জলে বাবু-রামের অধিকাংশ জমীই ডুবাইয়া রাখিল। সে বৎসরে বাবু-রাম সারা বছরের খোরাকও গোলায় তুলিতে পারিল না। ইহার উপর জমার নিরিখ-বৃদ্ধি লইয়া জমীদারের সঙ্গে একটা মোকর্দ্দমা বাধিল। সে মোকর্দ্দমায় গোলায় যে সঞ্চিত ধান ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। গো-মড়কে গোয়ালের দুই তিনটা দামী বলদ মরিয়া গেল। হঠাৎ রান্নাশালায় আগুন ধরিয়া ঘর দুইখানা ভস্মীভূত হইল। খাতকালীতে যে সামান্য টাকা খাটিতেছিল, খাতাপত্র পুড়িয়া যাওয়ায় তাহারও আদায়ের সম্ভাবনা রহিল না। দুই তিন বৎসরের মধ্যে বাবুরামকে মহাজনের কাছে হাত পাতিতে হইল।

গৃহিণী বলিল, "ওগো, পুরুতঠাকুর বলছিলেন, এ সব গ্রহের ফের। একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর।"

বাবুরাম দুঃখের হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "শান্তি-স্বস্ত্যয়নে কিছুই হবে না গিন্নি, কিছুই হবে না। আমাকে এখন এই রকম দশাই ভোগ কত্তে হবে। আমার মা লক্ষ্মী যে আমার ঘর ছেড়ে কইগাছির হাজরাদের ঘরে চ'লে গিয়েছে।"

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কন্যার গৌরবে বাবুরামের মুখ-খানা হর্ষপ্রদীপ্ত—চক্ষুর্দ্বয় স্নেহ-সজল হইয়া আসিত। সে দুঃখের কঠোর ঝঞ্ঝাবাত হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইয়া আশা ও আনন্দ-প্রফুল্ল-নেত্রে হাজরাদের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া যাইত।

এমন লক্ষ্মীস্বরূপিণী আদরিণী কন্যার বৈধব্য-সংবাদ শত বজ্রের বেগ লইয়া যখন বুকে আসিয়া বাজিল, তখন বাবুরাম ধরাশয্যা গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে ধূলায় লুটোপুটি খাইয়া, মাটীতে মাথা কুটিয়া আর্ত্ত চীৎ-কারে বলিতে লাগিল, "ওগো, আমার লক্ষ্মী মেয়ের কপালে

এ কি বিড়ম্বনা গো!" কন্যার সৌভাগ্যের গৌরব যতই স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল, বাবুরাম শোকে ততই কাতর হইয়া পড়িল।

সংসারে শোকদুঃখ কিন্তু চিরস্থায়ী নহে। গৃহিণী অন্যান্য ছেলে-মেয়ের মুখ চাহিয়া, শোকের বেদনা বুকে চাপিয়া, স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "হাঁ গা, এই রকম কাঁদাকাটা করলেই কি দিন চলবে? সংসারে আর যারা আছে, তাদের মুখের দিকে চাইতে হবে ত।"

চোখের জলে বুক ভাসাইয়া বাবুরাম বলিল, "লক্ষ্মীর মুখখানা মনে পড়লে আমার বুকটা যে ফেটে যায়, গিন্নি!"

চোখের জল মুছিয়া গৃহিণী বলিল, "বুকের ভিতরটা ফেটে গেলেও উপরটাকে পাষাণ দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। তুমি এতটা অধীর হ'লে লক্ষ্মীকে শান্ত করবে কে?"

সত্যই ত, বাবুরাম যে লক্ষ্মীর দুঃখ স্মরণে এতটা অধীর হইয়া পড়িয়াছে, সেই লক্ষ্মীর অবস্থা কি হইয়াছে, তাহা ত সে একবারও ভাবিয়া দেখিতেছে না! এই দুঃসহ শোকের আঘাতে কাতর হইয়া লক্ষ্মী কি করিতেছে, কে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে? গৃহিণীর কথায় বাবুরামের যেন চমক ভাঙ্গিল। গৃহিণী বলিল, "একবার গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এস। সেখানে তার মুখ চাইতে আছে কে?"

বাবুরামও ইহা বুঝিল, বুঝিয়া লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য যাইতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু কিরূপে গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে, তাহাই ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

ব্যাকুল হইলেও বাবুরামকে যাইতে হইল। বাপকে দেখিয়া লক্ষ্মীর শোক যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাবুরামও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

খানিক কান্নাকাটির পর শোকের ভারটা যখন অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া আসিল, তখন বাবুরাম কোঁচার খুটে চোখ মুছিয়া বলিল, "আর এখানে কেন, মা, আমার ঘরে চল্। এখানে আর দেখবে কে?"

স্থির গম্ভীরভাবে লক্ষ্মী বলিল, "কেন, বাবা, এক জনই গিয়েছে, তা ছাড়া আর সকলেই ত রয়েছে।"

মেয়ের এই প্রত্যাখ্যানে বাবুরাম যেন একটু আঘাত পাইয়া অভিমানগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "বুঝেছি, মা, এই সোনার অট্টালিকে ছেড়ে গরীব বাপের ঘরে যেতে আর মন সরে না।"

ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমার বাপ যদি গরীব হয়, তবে আমিও ত গরীবের মেয়ে বাবা।"

কন্যার এই উত্তরে বাবুরাম যেন একটু লজ্জিত হইল; বলিল, "তা বাছা, দিন কয়েকের জন্যেও গেলে ভাল হ'ত।"

লক্ষ্মী বলিল, "আমারও ইচ্ছে, দিনকতক গিয়ে তোমাদের কাছে থাকি। কিন্তু আমার ভাসুরের ইচ্ছে তা নয়। তিনি বলেন, বাড়ীর বৌ, কোথায় যাবে?"

একটু ভাবিয়া বাবুরাম বলিল, "তোমার ভাসুরের মতলব বুঝেছি, লক্ষ্মী। বাপের ঘরে গিয়ে থাকলে পাছে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে গোল বাধে, এই ভয়েই তিনি পাঠাতে নারাজ।"

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কি গোল বাধবে, বাবা?"

বাবুরাম বলিল, "এদের যে সম্পত্তি আছে এখন, তার অর্দ্ধেকের মালিক ত তুমি। ইচ্ছা করলে তুমি সব চুল চিরে ভাগ ক'রে নিয়ে যা খুসী কত্তে পার।"

লক্ষ্মী বলিল, "বিষয়-সম্পত্তি ভাগ ক'রে নিয়ে আমি কি করব বাবা? আমার ত এখন এক সন্ধ্যে এক মুঠো ভাত আর একখানা পরণের কাপড়ের দরকার।"

লক্ষ্মীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। বাবুরাম তাহার কথায় কান না দিয়াই ঘৃণা-কুঞ্চিত মুখে বলিল, "রামবল্লভ খুব চালাক-চতুর হ'লেও বাবুরাম ঘোষকে চিন্‌তে পারে নি। পাহাড়ের সোনার চুড়ো ভেঙ্গে পড়লো, আর আমি এখন পাহাড়ের তলায় নুড়ি কুড়ুতে যাব!"

দুঃখের গভীর উচ্ছ্বাসে বাবুরামের বুকটা ফুলিয়া উঠিল, চোখের পাতা জলে ভিজিয়া আসিল। অনেক কষ্টে চোখের জল চাপিয়া সে বলিল, "থাক্ তবে এখন এইখানেই। তবে কষ্ট হ'লে আমাকে সংবাদ দিবি। কাকের মুখে খবর পেলে আমি তক্ষুনি এসে তোকে নিয়ে যাব।"

আর দুই চারি কথায় কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বাবুরাম বিদায় গ্রহণ করিল। লক্ষ্মী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "বাবাকে এমন ক'রে ফিরিয়ে দেওয়া ভাল হ'লো না, একবার গেলেও হ'ত।"

৩

এমন অবস্থায় দশ দিনের জন্য বাপের বাড়ীতে যাইয়া জুড়াই-বার ইচ্ছা সকল স্ত্রীলোকেরই হয়। লক্ষ্মীরও যে সে ইচ্ছা ছিল না, এমন নহে; কিন্তু যাইবার পথে দুইটি অন্তরায় ছিল। প্রথম অন্তরায়—স্বামীর অন্তিম আদেশ। কৃষ্ণ-বল্লভ রোগ-শয্যায় পড়িয়া যখন বুঝিতে পারিল যে, এ যাত্রায় তাহার রক্ষা নাই, তখন সে লক্ষ্মীকে কাছে ডাকিয়া সকাতর অনুরোধের স্বরে বলিল, "আমি তোমার জীবনের সুখ-সাধ কেড়ে নিয়ে চললুম, লক্ষ্মি, তবে তোমাকে অকূল-পাথারে ভাসিয়ে গেলাম না; যা ক'রে গিয়েছি, তা'তে খাওয়া-পরার ভাবনা তোমার থাকবে না। কিন্তু আমার একটা অনু-রোধ, এই ভিটে ছেড়ে তুমি কোথাও যেও না। যে ক'দিন বাঁচবে, দুঃখু হ'ক, কষ্ট হ'ক, এইখানেই প'ড়ে থেকো। তার পর দামোদরের ধারে আমার পাশেই হাড় ক'খানা রেখে দিও।" স্বামীর এই অন্তিম অনুরোধ যখনই মনে পড়িত, তখনই শোক-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা সকলকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া লক্ষ্মী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত, "ম'রে গেলেও এই ভিটে ছেড়ে এক পা কোথাও যাব না।"

দ্বিতীয় অন্তরায়—মেধো ওরফে মাধবচন্দ্র। দুই বছ-রের ভাইটিকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া লক্ষ্মী যখন প্রথম স্বামিগৃহে আসিল, তখন সে সেই ছোট ভাইটিকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু এখানে আসিতেই সুখদার আড়াই বছরের ছেলে মাধবচন্দ্র যখন কচি কচি হাত দুইটি বাড়াইয়া লক্ষ্মীর কোলে উঠিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল, লক্ষ্মী তখন সাগ্রহে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সুদৃঢ় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। কিন্তু লক্ষ্মী তখন জানিত না, আরব্যোপ-ন্যাস-বর্ণিত সিন্ধুবাদের গল্পের দৈত্যের মত মাধবচন্দ্র সেই যে কোলে উঠিল, তাহাকে কোল হইতে নামান আর সহজ-সাধ্য হইবে না।

সুখদা তখন আর একটি কন্যা প্রসব করিয়া তাহারই লালনপালনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ছেলের দিকে চাহিবার অবসর তাহার ছিল না বলিলেই হয়। কাযেই মেধোর সকল ভার লক্ষ্মীকেই গ্রহণ করিতে হইল। তাহার নাওয়া-খাওয়া, আবদার-উপদ্রব সকলই লক্ষ্মীর ঘাড়ে পড়িল। লক্ষ্মীও সেই ভার লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না, বরং এই ভার অপরিচিত স্থানে বাসের কষ্টটাকে খুব লঘু করিয়া দিল।

ক্রমে মেধো মা'র এমন অবাধ্য হইয়া পড়িল যে, মা'র সঙ্গে সে আর কোন সংস্রবই রাখিতে চাহিল না। কাকী-মা ছাড়া সংসারে মা'র যে কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথাটা সে যেন ভুলিয়াই গেল। পাঠশালা হইতে আসিয়া সে মাকে খুঁজিত না, কাকী-মা'কেই খুঁজিয়া বেড়া-ইত; মা খাইতে দিলে তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া খাবারের জন্য কাকীমা'কে উত্ত্যক্ত করিত, কাকীমা'র কোলের কাছে না শুইলে সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। কাকীমা'রও মেধোকে কোলের কাছে না পাইলে চোখে যেন ঘুম আসিত না।

পরের ঘাড় দিয়া ছেলে "মানুষ" হইতেছে, সুখদার ইহাতে ক্ষতি কিছুই ছিল না, বরং এ জন্য লক্ষ্মীর কাছে তাহার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু সুখদা সে প্রকৃতির মেয়ে ছিল না। মেধো যতই লক্ষ্মীর অনুগত হইয়া পড়িতেছিল, সুখদার মনটা উদ্বেগে আশঙ্কায় ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতে-ছিল। লক্ষ্মী যে ঔষধের গুণে তাহার পেটের ছেলেটাকে তাহার নিকট পর করিয়া দিয়াছে, এ ধারণা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং মেধোর অবাধ্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্বটা লক্ষ্মীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া সুখদা তাহাকে ডাইনী, যাদুকরী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিতে ইতস্ততঃ করিত না। তা ছাড়া অবাধ্য ছেলেটাকে বশে আনিবার জন্য সে সময়ে সময়ে মেধোকে এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিত যে, লক্ষ্মী ছুটিয়া গিয়া তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিত না। ইহার ফলে লক্ষ্মীকে এমন সব কটূক্তি শুনিতে হইত যে, তাহা শুনিয়া লক্ষ্মী কাঁদিয়া ফেলিত। কাঁদিতে কাঁদিতে অনেকবার সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, "দূর হ'ক, পরের ছেলে—তার জন্য কেন এত গালমন্দ খেতে যাই? আজ থেকে মেধোর দিকে আর ফিরেও চাইব না।"

প্রতিজ্ঞা করিলেও সে প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে পারিত না। সে মেধোকে দূরে রাখিতে চাহিলেও মেধো তাহাকে ছাড়িত না। সে পাঠশালা হইতে ফিরিয়া, পাতা-দোয়াত ফেলিয়াই লক্ষ্মীর কাছে ছুটিয়া যাইয়া বলিত, "বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, ভাত দাও কাকী-মা।"

লক্ষ্মী তাহার কথার উত্তর না দিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইত এবং মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া হাতের কাযে ব্যস্ততা প্রদর্শন করিত। কাকীমা'কে নীরব দেখিয়া মেধো অভিমানে মুখখানাকে ভারী করিয়া বলিত, "চুপ ক'রে রইলে যে? ভাত দেবে না?"

ঝঙ্কার দিয়া লক্ষ্মী বলিত, "নাঃ। আমি কেন ভাত দিতে যাব, তোর মা'র কাছে যা।"

"হুঁ, যাচ্ছি এই যে মা'র কাছে" বলিয়া মেধো তাহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত। লক্ষ্মী ব্যস্ততা সহকারে বলিত, "করলি কি রে, পাঠশালার কাপড়ে ছুঁয়ে দিলি?"

মেধো দুই হাতে লক্ষ্মীর গলাটা ছাঁদিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, "বেশ করেছি ছুঁয়েছি, তুমি কেন ভাত দেবে না?"

"করিস্ কি রে সর্ব্বনেশে ছেলে! গলা ছাড়, গলা ছাড়, ভাত দিচ্ছি।"

বলিতে বলিতে লক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া হাসিয়া ফেলিত। সুখদা দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে আপন মনে বলিত, "আহা হা, দরদ দেখেও বাঁচি নে। একেই বলে, না বিইয়ে কানাইয়ের মা।"

কথাগুলা এমনভাবে বলা হইত যে, তাহা লক্ষ্মীর শ্রুতি-গোচর হইবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা থাকিত না। লক্ষ্মী তাহা শুনিয়া আপন মনে হাসিয়া বলিত, "দিদি একটি আস্ত পাগল।"

স্বামীর অকাল-মৃত্যুতে পতি-বিয়োগ-বেদনায় লক্ষ্মী যখন নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িল, সংসার একটা বিরাট শূন্যতা—নিদারুণ কঠোরতা লইয়া তাহার হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া দিল, তখন একমাত্র মেধোই কাকীমা'র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইল, তাহাকে বুকে ধরিয়াই লক্ষ্মী বিধাতার এমন কঠোর বজ্রাঘাতেও দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইল।

কৃষ্ণবল্লভের মৃত্যুর পর অনেকেই সন্দেহ করিল, লক্ষ্মী বোধ হয় আর এখানে থাকিবে না, অচিরাৎ পিত্রালয়বাসিনী হইবে। সুখদাও ইহা নিশ্চিত বলিয়াই বুঝিয়াছিল এবং আপনার অনুমানটা পাঁচ জনের কাছে প্রকাশ করিতে-ছিল। কথাটা মেধোর কর্ণগোচর হইলে সে ছুটিয়া যাইয়া লক্ষ্মীর আঁচল টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ কাকী-মা, তুমি বাপের বাড়ী যাবে?"

লক্ষ্মী একটু বিস্ময় সহকারেই জিজ্ঞাসা করিল, "কে বল্লে রে?"

মেধো বলিল, "কেন, মা বল্‌ছিল, ও বাড়ীর মতি পিসী, ফ'নের মা সব্বাই বল্‌ছিল।"

কথাটার মর্ম্ম প্রণিধান করিয়া ম্লানমুখে লক্ষ্মী উত্তর করিল, "যদিই যাই।"

ঘাড় দোলাইয়া মেধো বলিল, "উঁ, যাবে বৈ কি!"

"গেলে তুই ধ'রে রাখবি?"

"রাখবোই ত। কৈ যাও দেখি?"

বলিয়া সে দুই হাতে লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "এখন ত যাচ্ছি নে। তুই যখন পাঠশালে থাক্‌বি, তখন লুকিয়ে চ'লে যাব।"

শঙ্কা-মলিন মুখে মেধো বলিল, "হুঁ, যাবে বৈ কি? আমি ত আজ থেকে পাঠশালায় যাব না তা হ'লে।"

লক্ষ্মী বলিল, "রাত্তিরে তুই যখন ঘুমুবি, তখন যদি চ'লে যাই?"

কাঁদ-কাঁদ মুখে মেধো বলিল, "তা হ'লে আমি কেঁদে এমন ত অনখ করব না।"

"কাঁদবি কেন? তোর মা রয়েছে, বাপ রয়েছে।"

"উঃ, মা রয়েছে, বাপ রয়েছে। অমন যদি কর তুমি—"

মেধো আর কথা বলিতে পারিল না, ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া, তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে ঘন ঘন চুম্বন দিয়া স্নেহগাঢ়-কণ্ঠে বলিল, "না রে পাগ্‌লা ছেলে, আমি কোথাও যাব না। যেতে ইচ্ছে হ'লেও তোকে ছেড়ে যাবার শক্তি আমার নেই।"

কাকীমা'র কথায় মেধোর অশ্রু-মলিন মুখে আহ্লাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

৪

যে দিন বাবুরাম আসিয়াছিল, সেই দিন রামবল্লভ গ্রামান্তরে গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর সে বাড়ীতে ফিরিলে সুখদা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ বাড়ীতে কুটুম এসেছিল যে গো।"

রামবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কুটুম? তোমার সেই জ্যেঠতুতো ভাই?"

মুখ মচ্‌কাইয়া সুখদা বলিল, "সে আস্‌তে যাবে কেন? এসেছিল ছোট গিন্নীর বাপ।"

গম্ভীরভাবে রামবল্লভ বলিল, "এদ্দিন পরে বুঝি তাঁর আস্‌বার সাবকাশ হ'ল? কেন এসেছিলেন?"

"বোধ হয় মেয়েকে নিয়ে যেতে।"

"তার পর? নিয়ে যাবেন না কি?"

"নিয়ে যাবেন কি রেখে যাবেন, সে খবর আমি কি ক'রে জানবো বল। আমার সঙ্গে ত যুক্তি কত্তে আসে নি।"

"যুক্তিটা তবে কার সঙ্গে হ'ল?"

"বাপে-ঝিয়ে।"

"কি যুক্তি হ'ল শুন্‌লে?"

অবজ্ঞায় মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া সুখদা বলিল, "আমি আর শুন্‌ব কোত্থেকে বল। সে ফুশুর ফুশুর পরামোশ কি শোনা যায়? তবে এইখানে ব'সে কানে যতটুকু এল, তাই শুন্‌লুম।"

উৎসুক-নেত্রে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রামবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল, "কি শুন্‌লে?"

মুখ মচ্‌কাইয়া সুখদা বলিল, "শুন্‌বো আর কি মাথা-মুণ্ডু! বিষয়, জমী-যায়গা ভাগাভাগি—এই সব কথা।"

সর্পদষ্টের ন্যায় চমকিতভাবে রামবল্লভ বলিয়া উঠিল, "ভাগাভাগি! কিসের ভাগ?"

সুখদা বলিল, "কিসের ভাগ, তা আমি কি ক'রে জান্‌বো বল? বাপ বলছেন, তার রোজগারেই সব। এর চুল চিরে অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হবে। মেয়ে বলছেন, ভাগ কি সহজে দেবে, বাবা? বাপ বল্লেন—"

নিতান্ত অধীরভাবে রামবল্লভ বলিয়া উঠিল, "ছোট বৌমা এ কথা বল্‌লে?"

শ্লেষরুক্ষ-স্বরে সুখদা বলিল, "ছোট বৌমা বল্‌লে না ত আমি শুন্‌লুম কোত্থেকে বল।"

রামবল্লভের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?"

সুখদা বলিল, "তার পর বাপ উঠে দাঁড়িয়ে যেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললে, দিন কতক বাদেই আমি আবার আস্‌ছি। এর মধ্যে যদি দরকার হয়, কাকের মুখে খবর দিলেই আমি এসে সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

রামবল্লভের মনে হইল, সংসারটা যেন এক প্রহেলিকা-পূর্ণ স্থান। এখানে বুঝিবার—বিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। সব জটিল, সব কুটিল, সমস্তই নিষ্ঠুর প্রহেলিকাপূর্ণ।

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া যেন আর্ত্তকণ্ঠে রামবল্লভ বলিয়া উঠিল, "কেষ্টা যে এখনও দু' মাস মরে নি, বড়-বৌ!"

রামবল্লভের বিস্তৃত নাসারন্ধ্র দিয়া যেন কামারের জাঁতার মত একটা গভীর শব্দ উত্থিত হইল। সুখদা আঁচলে শুক্‌না চোখ দুইটা মুছিয়া, স্বরে খানিকটা কাতরতা আনিয়া বলিল, "ঠাকুরপোর শোক তোমার আমার বুকে যেমন বেজেছে, তেমন আর কারও বেজেছে মনে কর কি?"

মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়িয়া অশ্রুগাঢ়-কণ্ঠে রামবল্লভ বলিল, "ছোট বৌমাকে আমি কিন্তু বড্ড ভাল ব'লেই জানতাম।"

ঠোঁটটা একটু ফুলাইয়া অনুযোগের স্বরে সুখদা বলিল, "তুমিই জান্‌তে। আমি কিন্তু বরাবর ব'লে আস্‌ছি, ও মেয়ে ভাল নয়, কটা চামড়াটুকু দিয়ে সবাইকে যাদু ক'রে রেখেছে। সয়তানী গো, সয়তানী,—আমাদের সোনার জাহাজ ভরা গাঙ্গে ডুবিয়ে দিলে!"

শোকের উচ্ছ্বাসে সুখদা আঁচলে চোখ দুইটা ঢাকিয়া ফেলিল। রামবল্লভ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ছোট বৌমা কোথায়? ছোট বৌমা!"

লক্ষ্মী তখন রাত্রির রন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া হেঁসেল পরিষ্কার করিতেছিল। ভাসুরের ডাকে তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া, গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া দিয়া দাবার নীচেয় সুখদার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সে আসিয়া দাঁড়াইলেও রামবল্লভ কিন্তু কিছুই বলিল না, গম্ভীর মুখখানা নীচু করিয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া সুখদা যেন স্বামীকে সচেতন করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "ছোট বৌকে ডাক্‌লে যে?"

রামবল্লভ মুখটা একবার তুলিয়াই আবার নীচু করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ, ডাকলুম। হাঁ ছোট বৌমা, তোমার বাপ—ঘোষজা মশাই আজ এসেছিলেন কি জন্যে?"

লক্ষ্মী ভাসুরের সঙ্গে মুখামুখি কথা কহিত না। সুতরাং

সে সুখদাকে সম্বোধন করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "বল না দিদি, বাবা এসেছিলেন, আমাকে একবার ওখানে নিয়ে যাবার কথা বল্‌তে।"

সুখদা যেন তাচ্ছীল্য সহকারে মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "আমাকে বল্‌তে হবে কেন? যা বল্‌তে হয়, নিজেই বল না। ঐ ত ঠায় ব'সে রয়েছে।"

রামবল্লভ আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া গভীর ক্রোধ ও দুঃখমিশ্রিত স্বরে বলিল, "বল্‌তে আর কিছু হবে না, বৌমা! আমি শুধু জিজ্ঞাসা করি, এখনও দু' মাস পেরোয়নি, এরই মধ্যে ভাগাভাগি—এগুলো কি ভাল কথা?"

ভাগাভাগি! রামভল্লভের কথায় ভীতি অনুভব করিয়া লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল। এ কথার সে কি উত্তর দিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

রামবল্লভ তাহার নিকট উত্তরের প্রত্যাশা করিল না। সে একটু থামিয়া যেন দম্ লইয়া ভারী গলায় বলিল, "দেখ বৌমা, কেষ্টা ছোঁড়া সুখের হাট পেতে গিয়েছে, কিন্তু এ হাটে সে বেসাতি কত্তে সময় পেলে না, বেসাতি কত্তে রেখে গিয়েছে আমাকে। কপাল আমার! আমি কিন্তু এই জোর গলায় বলছি, বল্লভ হাজরা বেঁচে থাকৃতে এ হাট ভেঙ্গে দেয়, এমন বাপের ব্যাটা এখনও জন্মে নি। কেষ্টা যা রেখে গিয়েছে, আমি তা বুক দিয়ে রক্ষা করব।"

রামবল্লভের বড় বড় চোখ দুইটা দিয়ে টপ টপ করিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে আর বসিতে পারিল না, যেন নিতান্ত অধীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অজগর-শ্বাসতুল্য গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী কিয়ৎক্ষণ নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়া হেঁসেল গুছাইয়া, আলো নিবাইয়া,নিজের ঘরের অন্ধকার দাবায় যাইয়া বসিল। হায় রে, যে মানুষ চলিয়া গিয়াছে, তাহার নামও কেহ একবার করে না, শুধু বিষয়ের ভাগ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে! সে বাঁচিয়া থাকিলে এমন দশ গণ্ডা বিষয় যে করিয়া ফেলিত, ইহা কেহ একবার ভাবিয়াও দেখে না! ওঃ, মানুষের বুক বুঝি পাষাণ দিয়া গড়া!

ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মীর বুকের ভিতর যেন একটা মোচড় দিতে লাগিল, চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। সে জল অন্ধকারেই দর দর ধারায় প্রবাহিত হইয়া তাহার গণ্ড বক্ষঃ প্লাবিত করিল। লক্ষ্মী আর বসিতে পারিল না, আঁচল পাড়িয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল এবং শুইয়া শুইয়া অনন্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্রাবলীর মধ্যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, মানুষ মরিয়া নক্ষত্র হয় শুনিয়াছি। তাহা হইলে ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি কি তিনিই? তাহা না হইলে ওটি প্রত্যহ এমন সময় ঠিক এই দিকেই চাহিয়া থাকে কেন? ওগো, তুমি ওখান হইতে দেখিতে পাইতেছ কি, তোমাকে ভুলিয়া, তোমার হাতের ময়লার বিষয় লইয়া সকলে কিরূপ টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে?

ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মী ঘুমাইয়া পড়িল।

৮

লক্ষ্মীর উপর রামবল্লভের যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল, কৃষ্ণবল্লভের মৃত্যুর পর হইতে তাহা যেন অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। ইহার উপর সুখদা দিন-রাত তাহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল যে, ছোট বৌ একেবারে লক্ষ্মীছাড়া পোড়া-কপালী। তাহাদের যে কিছু বাড়-বাড়ন্ত, তাহা তাহার কন্যা বিমলার আয়-পয়েই হইয়াছে,—ছোট বৌয়ের কপালের জোরে নহে। তাহা না হইলে তাহাদের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইবে কেন? রাক্ষসী ছোট বৌটাই তাহার সোনার দেবর কৃষ্ণকে খাইয়া ফেলিল। এখন সংসারে আরও কি অনর্থ বাধায়, তাহাও একটা ভাবনার বিষয়।

রামবল্লভ লোকটি যেমন সাদাসিধা, তেমনই "কান-পাতলা।" যে যখন যাহা বুঝাইয়া দেয়, তাহাই বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সে ইতস্ততঃ করে না। নিজের ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিবার শক্তি তাহার খুব কমই ছিল। সুতরাং স্ত্রীর কথাগুলা সে যথার্থ বলিয়াই মানিয়া লইল এবং তজ্জন্য লক্ষ্মীর উপরে তাহার যেন কতকটা ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। যে ছোট বৌমাকে সে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী বলিয়া জ্ঞান করিত, এখন সেই ছোট বৌয়ের প্রতি কার্য্যে—প্রতি পদক্ষেপে সে যেন অলক্ষ্মীর ছায়া দেখিতে লাগিল। সে নিজে ভাল দেখিতে না পাইলেও সুখদা যেন তাহার চোখ ফুটাইয়া দেখাইয়া দিত।

চোর !

[শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইদানীং রাত্রিকালে সুখদার ভাল ঘুম হইত না ; ভাবনায় চিন্তায় রাত্রির তিন ভাগ কাটাইয়া দিয়া শেষ রাত্রিতে হয় ত ঘুমাইয়া পড়িত। কাযেই সে খুব সকালে উঠিতে পারিত না, ঘুম ভাঙ্গিতে একটু বেলা হইত। সুখদা ত ছেলে-পিলের জন্য সকালে উঠিতেই পারিত না। কাযেই বাড়ীতে ছড়া-ঝাঁট পড়িতে বিলম্ব হইত। গৃহস্থ-ঘরে বাসী ঘর-দুয়ারে রোদ লাগা যে লক্ষ্মীছাড়ার একটা প্রধান লক্ষণ, ইহা সুখদার অবিদিত ছিল না ; সুতরাং সে ইহাতে শঙ্কা অনুভব করিয়া গৃহস্থের অমঙ্গলচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। রামবল্লভ তাহার অনুযোগে লক্ষ্মীর উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে থাকিত।

রাঁধিতে রাঁধিতে হাঁড়ী চিরকালই ভাঙ্গিত। কিন্তু আগে সে জন্য কোনরূপ উচ্চবাচ্য হইত না। এখন কিন্তু হাঁড়ী ভাঙ্গিলেই দু'পুরবেলা হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ছোটবৌ যে সংসারে ঘোর অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে, ইহা ব্যক্ত করিয়া সুখদা শুধু স্বামীর কাছে নহে, পাড়ার পাঁচ জনের কাছেও আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকিত।

ঝড়ে সন্ধ্যার প্রদীপ নিবিয়া গেলে সুখদা সে দোষটা ঝড়ের ঘাড়ে না ফেলিয়া লক্ষ্মীকেই সে জন্য দায়ী করিত এবং এই সকল অলক্ষুণে কীর্ত্তির জন্য সংসারে যে নানা অমঙ্গল ঘটিতেছে, তাহার ছেলে-পিলেগুলো নিয়ত রোগে ভুগিতেছে, সকরুণ সুরে ইহাই ব্যক্ত করিতে থাকিত।

রামবল্লভ সব সময়ে এ সকল মেয়েলী কথায় কান দিত না ; কিন্তু স্ত্রীর অভিযোগের উপর অভিযোগে উত্ত্যক্ত হইয়া এক একবার লক্ষ্মীর উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিত না।। যখন রাগিত, তখন সে বাড়ীখানা যেন মাথায় করিয়া তুলিত।

লক্ষ্মীও সকল সময়ে রামবল্লভের তিরস্কারে বিচলিত হইত না ; কিন্তু এক এক সময়ে ভাসুরের কড়া কড়া কথাগুলা যখন মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিত, তখন নিঃশব্দে চোখের জলে বুক ভাসাইতে থাকিত। চোখের জলটাও গোপনে ফেলিতে হইত। কেন না, সুখদা সময়ে অসময়ে চোখের জল ফেলাকে সংসারের ভয়ানক অমঙ্গল বলিয়া জ্ঞান করিত।

রাগিলে রামবল্লভের জ্ঞান থাকিত না বটে, কিন্তু রাগটা যখন পড়িয়া আসিত, তখন লক্ষ্মীর উপর স্বীয় দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত। স্নেহকোমল স্বরে লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিয়া সে বলিত, "আমার কথায় রাগ ক'র না বৌমা, আমার মাথার ঠিক নেই। কেষ্টা ছোঁড়া আমার মাথাটা একেবারে খেয়ে গিয়েছে।"

বলিতে বলিতে রামবল্লভের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিত। লক্ষ্মীও চোখের জল রাখিতে পারিত না।

কৃষ্ণবল্লভ মারা গেলে লক্ষ্মী প্রথম একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করিতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। রামবল্লভ কিন্তু ইহাতে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ বৌমা, একরত্তি মেয়ে তুমি,—তুমি নির্জ্জলা একাদশী করবে ? আমি বলছি, তুমি জল খাও বৌমা, তাতে যত পাপ হয়, আমার হবে।"

ভাসুরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া লক্ষ্মীকে জল খাইতে হইল। সুখদা কিন্তু এই জল খাওয়ার ব্যাপারটা লইয়া পাড়ার মধ্যে এমন সমালোচনার তরঙ্গ তুলিল যে, লজ্জায় ঘৃণায় পরের একাদশীতে জল খাইতে লক্ষ্মীর আর প্রবৃত্তি হইল না। সুখদাও স্বামীকে বুঝাইয়া দিল যে, গৃহস্থের সংসারে বিধবা মেয়ে একাদশীতে জল খাইলে শুধু তাহারই পাপ হয় না ; তাহার এই অনাচারে সংসারের ঘোর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। কাযেই রামবল্লভ আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

কিন্তু একাদশীর রাত্রিতে অনশনক্লিষ্টা লক্ষ্মী রামবল্লভকে ভাত দিতে গিয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ মাথা ঘুরিয়া যখন পড়িয়া গেল, রামবল্লভ তখন উচ্চ চীৎকারে বাড়ীখানাকে কাঁপাইয়া বলিল, "আচ্ছা বড়বৌ, তোমরা মনে করেছ কি ? তোমরা কি এই একরত্তি মেয়েটাকে খুন করবে ? তোমাদের কারও কি একটু দয়া-মায়াও নেই ? আমি কিন্তু জোর গলায় বলছি, এই পাপে তোমাদের লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে, হা অন্ন, জো অন্ন ক'রে তোমাদের বেড়াতে হবে। এ যদি না হয়, তবে আমার নাম রামবল্লভই নয়।"

রামবল্লভের সরোষ চীৎকারে লজ্জিত হইয়া লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং চোখে মুখে জল দিয়া ভাত বাড়িতে চলিল। সুখদা ব্যস্ততা সহকারে আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া রোষগম্ভীর মুখে বলিল, "যাও যাও, তুমি না পার, শুয়ে থাক গে। কে তোমাকে উপোস দিয়ে কায কত্তে বলেছে বল ত ? উপোস ত কেউ দেয় না!

তবে আমাদের কষ্টের শরীর, আমাদের সব সইবে, ননীর দেহ নিয়ে তোমরা পারবে কেন?"

বলিতে বলিতে সুখদা হেঁসেলে গিয়া ঢুকিল। লক্ষ্মী লজ্জায় ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাত বাড়িতে বাড়িতে সুখদা বলিল, "কা'ল থেকে যদি হেঁসেলে এস, তবে আমার দিব্যি রইল। আমি মরি বাঁচি, যত-ক্ষণে পারি করব।"

এই সময় অপর ঘর হইতে কোলের ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। সুখদা কিন্তু তাহা যেন শুনিতে পায় নাই, এমনই ভাবে স্বামীর কোলের কাছে ভাত ধরিয়া দিয়া হেঁসেলে গিয়া বসিল। ছেলেটার চীৎকারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রামবল্লভ বলিল, "চেঁচিয়ে ছেলেটার গলা ফেটে গেল যে!"

ঝঙ্কার দিয়া সুখদা বলিল, "গেল তা কি করব আমি? এমন হতচ্ছাড়া সংসারে এসে যখন জন্মেছে, তখন ওরা কাঁদবে না ত কাঁদবে কে?"

সংসারটা যে কিসে হতচ্ছাড়া হইল, তাহা সম্যক্ প্রণি-ধান করিতে না পারিয়া রামবল্লভ লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি তবে আর দাঁড়িয়ে কেন, ছোট বৌমা? তুমিই না হয় গিয়ে ছেলেটাকে তোলো না।"

সুখদা বসিয়া ছিল; তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "না, ছেলেকে আমার তুলতে হবে না। খবরদার বল্‌ছি, কেঁদে ম'রে গেলেও কেউ যেন আমার ছেলের গায়ে হাত না দেয়।"

লক্ষ্মী কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিল, সুখদার গর্জ্জনে ভীত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রামবল্লভও সুখদার এই অহেতুক ক্রোধে বিরক্ত হইয়া আর কিছু বলিল না, নিঃশব্দে আহার সম্পন্ন করিতে লাগিল। সুখদা অনুনাসিক সুরে আপনার ও স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের দুর্ভাগ্য কীর্ত্তন করিয়া মনঃক্ষোভের নিবৃত্তি করিতে থাকিল।

লক্ষ্মী সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা অনর্থক বিবেচনায় নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন বাক্যযন্ত্রণা সহিয়া সে কিরূপে এখানে থাকিবে? অথচ তাহার স্বামীর আদেশ—"এ ভিটে ছেড়ে কোথাও যেও না, লক্ষ্মি!" ওগো, আমি ত যেতে চাই নে, কিন্তু এরা আমায় কিছুতেই এখানে থাক্‌তে দেবে না। রক্তমাংসের শরীর নিয়ে এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য ক'রে আমি এখানে থাক্‌বো কি ক'রে? তুমি হুকুম দিয়ে স্বর্গে গিয়েছ, সেখান থেকে আমাকে শক্তি দাও—যাতে এ সব সয়ে থাকতে পারি। নইলে আমি দুর্ব্বল মেয়েমানুষ, মড়ার উপর এমন খাঁড়ার ঘা সহ্য কর্‌তে পারব না ত!

৬

প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শেষ রাত্রিতে লক্ষ্মী এমন ঘুমাইয়া পড়িল যে, ঘুম ভাঙ্গিতে অনেকটা বেলা হইয়া গেল। তখনও বাসী ঘরে ঝাঁটপাট হয় নাই দেখিয়া রামবল্লভ সক্রোধ চীৎকারে বাড়ীখানা কাঁপাইয়া তুলিতে-ছিল। সুখদা বিছানা হইতে উঠিতে গেলে ছেলেটা কিছুতেই ছাড়ে না দেখিয়া তাহার পিঠে চড়-চাপড় বসাইয়া দিল। তখন ছেলের চীৎকারে, রামবল্লভের তর্জ্জন-গর্জ্জনে এবং সুখদার সকরুণ আক্ষেপে বাড়ীর মধ্যে এমন একটা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, লক্ষ্মী ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেও যেন ভয় পাইতেছিল। অবশেষে সে সাহসে নির্ভর করিয়া, লজ্জায় জড়-সড় হইয়া বাহির হইল এবং উপবাসখিন্ন দেহটাকে জোর করিয়া টানিয়া তৎপরতার সহিত গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

তাড়াতাড়ি গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া তেল মাখিয়া লক্ষ্মী স্নান করিতে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল, ঘাটে তখন বেশ ভীড় বাধিয়া উঠিয়াছে;—রায়-গিন্নী, কেষ্টার মা, নেত্য পিসী, বোসেদের মেজো বৌ প্রভৃতি অনেকগুলি পুরমহিলা তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর হিতাহিত-সংবাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দীনু মিত্তিরের বড় ছেলেটা কলিকাতায় গিয়া একেবারে বকাট হইয়া গিয়াছে, মহেশ সরকার স্ত্রীর প্ররোচনায় অক্ষম ছোট ভাইটাকে আলাদা করিয়া দিতেছে, রসিক রায়ের বিধবা বোন্ ভগী একাদশীতে লুকাইয়া জল খায়, চাটু-য্যেদের ছোট বৌএর চালচলন ভাবভঙ্গী ভাল নয়, ইত্যাদি নানাপ্রসঙ্গের অবতারণায় স্নানের ঘাটটা জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্মী এই সকল আলোচনায় কর্ণপাত না করিয়া পাশ দিয়া ঘাটে নামিতেছিল, নেত্য-পিসী তাহার দিকে ফিরিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো ছোটবৌ, আজ এত বেলা যে?"

লক্ষ্মী ঘাটের পৈঠার উপর কলসীটা রাখিয়া তাহা মাজিতে মাজিতে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "কাযকর্ম্ম সারতে আজ একটু বেলা হয়ে গেল।"

বোসেদের মেজোবৌ বলিল, "কেন গা, দু'জনায় কায কর, তবু এত বেলা হয় কেন?"

নেত্য পিসী তাহার দিকে ফিরিয়া যেন নিতান্ত দুঃখিত-ভাবে উত্তর করিলেন, "আ পোড়াকপাল, বড়বৌ বুঝি কায করে? সারাদিন ছেলে কোলে ক'রে গপ্প ক'রে বেড়ায়। কায-কর্ম্ম সব ছোটবৌকেই কত্তে হয়। এই দেখ না, কা'ল একাদশীর উপোস গিয়েছে, তবু আজ রেহাই নেই, বাসী পাট থেকে রান্না, দেওয়া-থোওয়া পর্য্যন্ত সব কত্তে হবে।"

কেষ্টার মা সহানুভূতি-কোমল স্বরে বলিয়া উঠিল, "আহা, একরত্তি মেয়ে, ওর কি এখন উপোস দেবার, না এত খাটবার বয়স? পোড়াকপাল পুড়ে গিয়েছে ব'লেই যা।"

রায়গিন্নী বুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া আহ্নিক করিতে-ছিলেন। তিনি সূর্য্যার্ঘ্যদানের উদ্দেশ্যে গৃহীত জল অঞ্জলি-মধ্যে রাখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কপাল পুড়লেও ওর কিসের অভাব গো! ও যদি মনে করে, দাসী-চাকরাণী রেখে খেতে পারে। আমাদের উনি বলেন, বিষয়-আশয় যা কিছু, কেষ্টর রোজগারেই ত সব। মনে করলে ও সমস্ত বিষয় চুল চিরে ভাগ ক'রে নিতে পারবে।"

কেষ্টার মা বলিল, "কিন্তু মেয়েমানুষ, এত কাণ্ড করে কে?"

রায়গিন্নী বলিলেন, "কেন গা, ওর বাপ যদি এসে দাঁড়ায়, তা হ'লে রামবল্লভ কি ভাগ না দিয়ে থাকতে পারে?"

নেত্য পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ ছোটবৌ, তোমার বাপ আসে না কি?"

অতি মৃদুস্বরে লক্ষ্মী উত্তর দিল, "আসে বৈ কি।"

নেত্য পিসী বলিলেন, "বুড়ো শুধু আসে আর চ'লে যায়, মেয়ের কোন একটা ব্যবস্থা করে না?"

"কি জানি" বলিয়া লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া কলসীতে জল ভরিতে লাগিল। এই সকল অপ্রিয় আলোচনা লক্ষ্মীর আদৌ ভাল লাগিতেছিল না, বরং ইহাতে তাহার ভয়ানক বিরক্তিই বোধ হইতেছিল। কিন্তু ইহাদের মুখের উপর সে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। শুধু তাড়াতাড়ি এখান হইতে পলাইয়া যাইয়া এই অপ্রিয় আলোচনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া কলসীতে জল ভরিয়া উঠিয়া পড়িল এবং সত্বরপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

লক্ষ্মীর এই সত্বর প্রস্থানে যাহারা তাহার প্রতি সহানু-ভূতি প্রকাশ করিতেছিল, তাহারা কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না। লক্ষ্মীর এই ব্যবহারটাকে তাহারা অহঙ্কারের লক্ষণ বলি-য়াই স্থির করিয়া লইল এবং এই অহঙ্কৃতা মেয়েটা তাহার অহঙ্কারের ফলেই যে এমন সোনারচাঁদ স্বামীকে হারাইয়া হতভাগিনী হইয়াছে, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া লক্ষ্মী দেখিল, সুখদা তখনও পা ছড়াইয়া বসিয়া নিশ্চিন্তমনে ছেলেকে স্তন্যপান করাইতেছে। সে লক্ষ্মীকে হেঁসেলে যাইতে নিষেধ করিয়া দিব্য দিয়াছিল বটে, কিন্তু নিজে হেঁসেলে যাইবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। এমন কি, তখনও তাহার বাসী কাপড় পর্য্যন্ত কাচা হয় নাই। এ দিকে বেলাও প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছিল। কাযেই লক্ষ্মী তাহার কাছে গিয়া মিনতি সহ-কারে জিজ্ঞাসা করিল, "রান্নাটা আমি চড়িয়ে দেব, দিদি?"

সুখদা যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনই ভাবে খোকার কেশবিরল মস্তকে উকুন জন্মিয়াছে কি না, একাগ্রচিত্তে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া লক্ষ্মী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা হচ্ছে, রান্না চড়িয়ে দেব আমি?"

মুখ না তুলিয়াই সুখদা গম্ভীরভাবে বলিল, "সে তোমার খুসী। আমি কি কাউকে রাঁধতে বারণ ক'রে দিয়েছি?"

লক্ষ্মী বলিল, "কা'ল তুমি দিব্যি দিয়েছিলে কি না।"

সুখদা এবার মুখ তুলিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "ওঃ, আমি দিব্যি দিয়েছিলাম, তাই আমার হুকুম নিতে এসেছ। আমার হুকুম নিয়েই সবাই কায কচ্ছে কি না? তবু যদি

আমাকে সংসারের দাসী-বাঁদী ব'লে মনে না কত্তে। তা আমি দাসী-বাঁদীই ত। আমার রূপেও বাতি জ্বলে না, গুণেও কপাল দিয়ে লক্ষ্মী ঝরে না।"

লক্ষ্মী আর কথা না বাড়াইয়া ধীরে ধীরে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। সুখদা শ্লেষ-তীব্রস্বরে বলিল, "দেখো, "রাঁধতে গিয়ে উপোসের ঘোরে যেন উনানে মুখ গুঁজে প'ড়ে যেও না। তা হ'লে দুপুরবেলা হয় ত আবার একটা কাণ্ড বেধে যাবে।"

লক্ষ্মী নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উনান জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। সুখদা ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া, তেল মাখিয়া স্নান করিতে চলিল।

৭

"কাকী-মা, ও কাকী-মা, ও বাবা, কালা হয়ে গেছ না কি? কাকী-মা!"

গম্ভীরভাবে লক্ষ্মী উত্তর দিল, "কেন?"

মেধো রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইয়া সতর্জ্জনে বলিল, "কেন কি? এখনও রান্না হচ্ছে, ভাত দেবে কখন্?"

"যখন রান্না হবে।"

"বেলা দু'পুর হয়ে গেল, এখনও রান্না হ'ল না! এতক্ষণ কচ্ছিলে কি?"

"ফলার।"

ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ ক্রন্দনের সুরে মেধো বলিল, "হুঁ, ফলার! তুমি ত ফলার খেয়েছ, আমার যে ক্ষিধে পেয়েছে।"

লক্ষ্মী বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে থাম্, মাছটা রেঁধে ভাত দিচ্ছি।"

"নাঃ, মাছ রাঁধতে হবে না, আমাকে ভাত দাও তুমি।" বলিয়া মেধো অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মীর আঁচল ধরিয়া টান দিল। লক্ষ্মী একটু উষ্ণস্বরে বলিল, "কি করলি, পাঠশালার কাপড়ে আমাকে ছুঁয়ে দিলি?"

ঘাড় উঁচু করিয়া জোর গলায় মেধো বলিল, "হুঁ, দিয়েছি ছুঁয়ে, কি হবে তার?"

লক্ষ্মী বলিল, "হবে আর কি, আমাকে আবার এই পচা পুকুরে ডুব দিয়ে আস্‌তে হবে। না মেধো, সত্যিই তুই ভারী অবাধ্য—ভারী দুষ্টু হয়ে পড়েছিস্।"

মেধো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। সুখদা ক্রোধসমুচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মেধো!"

নির্ভীকভাবে মেধো উত্তর দিল, "কেন?"

"এ দিকে আয় হতভাগা ছেলে।"

নিতান্ত তাচ্ছীল্যের স্বরে মেধো উত্তর করিল, "যাচ্ছি এই যে!"

"আস্‌বি না?"

"নাঃ।"

পুত্রের এই স্পর্দ্ধা মাতার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। সুখদা ছুটিয়া আসিয়া মেধোর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উঠানে আনিয়া ফেলিল এবং এরূপ অবাধ্য পুত্রের মুখে অগ্নি-সংযোগের ব্যবস্থা করিতে করিতে তাহার পৃষ্ঠে, গণ্ডে, বাহুতে দমাদম কীল-চড় বর্ষণ করিতে লাগিল। মেধো আর্ত্তস্বরে কাকী-মা'কে ডাকিতে ডাকিতে মাতার এই নির্ম্মম প্রহার হইতে আত্মরক্ষার নিস্ফল প্রয়াস করিতে থাকিল। কিন্তু তাহার প্রয়াস সফল হইল না। সুখদা দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে প্রহার করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "ডাক্, কে কোথায় তোর দরদী আছে। কে আজ তোকে রাখে, তাই আমি দেখবো।"

লক্ষ্মী ত অবাক্। তুচ্ছ কথায় যে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে, ইহা সে কল্পনাতেও আনে নাই। এক্ষণে কল্পনাতীত শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে সে যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। সুখদাকে ধরিতে যাইতে তাহার সাহস হইল না। ধরিতে গেলে ব্যাপারটা যে আরও গুরুতর হইয়া পড়িবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। কাষেই সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু প্রহারের মাত্রা ও মেধোর কাতর চীৎকার ক্রমে যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, লক্ষ্মী তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; ছুটিয়া যাইয়া সুখদার প্রহার-নিরত হাতখানা ধরিল। সুখদার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল; সে রোষ-কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "খবদ্দার ছোট-বৌ, আমার ছেলেকে আমি মারব, তুই স'রে যা।"

লক্ষ্মী বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ দিদি; তোমার ছেলে ব'লে তুমি তাকে খুন করবে?"

"তবে রে হারামজাদি!" বলিয়া সুখদা লক্ষ্মীকে এমন

জোরে ধাক্কা দিল যে, লক্ষ্মী দুই তিন হাত দূরে গিয়া পড়িল। মেধো নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বাঁ হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। লক্ষ্মীর সহিত সে-ও আছাড় খাইয়া পড়িল।

এমন সময় "ব্যাপার কি গো" বলিতে বলিতে রামবল্লভ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

রামবল্লভ ব্যাপারটা না বুঝিতেই সুখদা ছুটিয়া যাইয়া পায়ের কাছে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "ওগো, হয় আমাকে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল, নয় কোন চুলোয় দূর ক'রে দাও। ছোটলোকের মেয়ের মুখ-নাড়া খেয়ে এ সংসারে আমি আর এক দণ্ডও থাকৃতে পারব না।"

৮

রামবল্লভ বলিল, "সত্যিই তুমি ছোটলোকের মেয়ে বৌ-মা, নইলে ঘরের কথা পাড়ায় পাড়ায় ব'লে বেড়াও!"

লক্ষ্মী কোন দিনই পাড়া বেড়াইতে যায় নাই এবং পাড়ার লোকের কাছে কোন কথাই বলিয়া বেড়ায় নাই। সুতরাং রামবল্লভের তিরস্কারে অবাক্ হইয়া বিস্ময়-বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রামবল্লভ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন অতিশয় দুঃখগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "দু' বেলা দু' মুটো খাচ্চি, এতে পাড়ার লোক হিংসায় ফেটে মচ্ছে। কিন্তু তুমিও যদি ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দাও, বৌ-মা, তা হ'লে আমার আর বল্‌বার কিছুই নেই।"

রামবল্লভ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথাটা নীচু করিল। সুখদা অদূরে বসিয়া ছিল। সে ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, তোমার পায়ে মাথা কুটে বল্‌ছি, ওর যদি কিছু থাকে, তা ভাগ ক'রে কড়ায় গণ্ডায় ফেলে দাও। ও বাপ-মায়ের পেট ভরিয়ে সুখী হ'ক্। তার পর আমাদের জোটে খাব, নয় নিজের ঘরে উপুড় হয়ে প'ড়ে থাকব। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি,—উনি যে দিন-রাত দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়বেন, চোখের জল ফেলবেন, তা আমি সইতে পারব না।"

রামবল্লভ মাথা তুলিয়া রোষবিক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "ভাগ? কিসের ভাগ? আমি বেঁচে থাকৃতে উনি কিসের ভাগীদার শুনি?"

সুখদা বলিল, "কিসের ভাগীদার, তা আমি কি ক'রে জান্‌ব বল। কিন্তু কি তিন কড়ার বিষয়, তার জন্যে পাড়ায় ত কান পাতবার জো নেই। আজ নাইতে গিয়ে রায়-গিন্নীর কাছে যে সব কথা ব'লে এসেছে, তা শুন্‌লে তুমি ত—"

লক্ষ্মী মৃদু স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি ত তাঁকে কোন কথাই বলি নি, দিদি।"

মুখ খিঁচাইয়া সুখদা বলিল, "তুমি বল নি, তারা আশ-মান থেকে বল্‌লে। তাদের বড্ড মাথাব্যথা কি না!"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক রামবল্লভ বলিল, "আমি তোমাকে খুব ভাল ব'লেই জানতাম, বৌ-মা! তুমি যে একটা ছোটলোকের ঘরের মেয়ে, তা আমি এক দিনও ভাবি নি। ছিঃ!"

নির্দোষের উপর কি অন্যায় দোষারোপ! এই অযথা দোষারোপে লক্ষ্মী যেন একটু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িল। সে ছোটলোকের মেয়ে! তাহার বাপ ছোটলোক! অপেক্ষা-কৃত উচ্চ কণ্ঠে সুখদাকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আমি ছোটলোকের ঘরের মেয়ে নই, দিদি! তা যদি হতাম—"

গর্জ্জন করিয়া রামবল্লভ বলিল, "কি কত্তে তুমি? জমী-যায়গা সব বেচে কিনে বাপের পেট ভরাতে ত? আচ্ছা, ভরাও তার পেট, তা হ'লে বুঝব, হাঁ, বাবুরাম ঘোষের মেয়ে বটে তুমি।"

লক্ষ্মী আর সেখানে দাঁড়াইল না; রোষচঞ্চল পদে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সুখদা গালে হাত দিয়া বলিল, "মা গো, ধন্যি মেয়ে বটে! ভাসুরের মুখে মুখে সমান উত্তর! রাঁড় ষাঁড় হ'লে এই রকমেই কি লাজ-লজ্জার মাথা খেতে হয়!"

সুখদা অবশ্য লক্ষ্মীকে শুনাইবার অভিপ্রায়েই কথাগুলা বলিলেও, সে সকল কথা লক্ষ্মীর কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে বিনা দোষে বার বার কেন এইরূপ তিরস্কৃত হইতেছে, তাহাই ভাবিয়া সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

তা দোষ লক্ষ্মীরও ছিল না, রামবল্লভেরও নহে। দোষ ছিল বিধাতার—যিনি মানুষের প্রাণে পরের সুখ দর্শনে দুঃখ-প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণবল্লভের চেষ্টায় রাম-বল্লভ যখন পাঁচ জনের এক জন হইয়া বসিয়াছিল, তখন তাহার আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবাসী সকলেই যে সন্তুষ্ট হয় নাই,

তাহা নহে। আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল বটে,কিন্তু এ কলাগাছ বৈশাখের ঝড়ে টিকিবে কি না, এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ রহিল। তাহার পর কৃষ্ণবল্লভ মারা গেলে তাহারা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হবে না? এতটা বাড়াবাড়ি কি ভাল?" তাহারা আশা করিল, এইবার কৃষ্ণবল্লভের বিধবা স্ত্রী এই সম্পত্তির অংশ লইয়া টান দিবে, রামবল্লভও কিন্তু নিজের দিকে টান দিতে ছাড়িবে না। তাহা হইলেই কলাগাছটা অচিরেই পুনরায় ক্ষীণ অঙ্গুলীতেই পরিণত হইবে।

দুই মাস, ছয় মাস, বছর কাটিয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণবল্লভের স্ত্রী ত একেবারেই চুপচাপ। তাহার বাপেরও কোন সাড়াশব্দ নাই। বিষয়টা রামবল্লভ একাই সুস্থ-শরীরে খোসমেজাজে ভোগ করিয়া যাইতেছে, আর মেয়েটা অর্দ্ধেক বিষয়ের মালিক হইয়াও ঠিক চাকরাণীর মতই সংসারে খাটিতেছে এবং রামবল্লভের স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। কি অন্যায় ব্যাপার! এই অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য অনেকেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইল এবং সমগ্র গ্রামখানাকেই যেন সেই আন্দোলনে মাতাইয়া তুলিল।

এই আন্দোলনের তরঙ্গ রামবল্লভের কানে আসিয়াও আঘাত দিতে লাগিল। রামবল্লভ কিন্তু ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা খুঁজিয়া দেখিল না; ইহার জন্য সে লক্ষ্মীকেই দোষী স্থির করিয়া লইল।

৯

প্রতিবেশীদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, রামবল্লভ ও লক্ষ্মীর মধ্যে গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। এক দল রামবল্লভকে উৎসাহ দিয়া বলিল, "কেষ্টবল্লভের স্ত্রী মাত্র খোরাক-পোষাক পাবার মালিক, বিষয়ের ভাগ সে কিছুতেই পাবে না।" অপর দল বাবুরামের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিল, "এ সমস্তই কেষ্টবল্লভের স্বোপার্জ্জিত বিষয়। তার বিধবা স্ত্রী এর কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে ভাগ পাবে।" হাজরাদের এই বিবাদ লইয়া গ্রামের মধ্যে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল; অনেক আইনজ্ঞ ব্যক্তির আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ হইবার উপক্রম হইল।

রামবল্লভের ত আহার-নিদ্রা নাই বলিলেই হয়। সুখদা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "হ্যাঁগা, এত ভাবছ কেন তুমি? সকলেই বল্‌ছে, এ মামলায় তুমি জিতবেই জিতবে।"

রামবল্লভ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মামলায় হার-জিত দু-ই আছে বড়বৌ, কিন্তু কেষ্টা ছোঁড়া সাত বছরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে যা কিছু ক'রে গিয়েছে, এক বছরের মামলাতে তার গুঁড়ো গন্ধও বোধ হয় থাকবে না।"

সুখদা বলিল, "না থাকে না থাক্‌বে। তাই ব'লে ওই সয়তানীকে অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হবে না কি?"

রামবল্লভ বলিল, "তা দিলেও ক্ষতি ছিল না, কেষ্টার খাটুনীর পয়সা উকীল-মোক্তারের পেটে যেত না।"

শুধু রামবল্লভই যে কাতর হইয়াছিল, তাহা নহে; লক্ষ্মীরও অনুতাপের সীমা ছিল না। রাগের মাথায় বাপকে আনাইয়া সে যখন নিজের অংশ বাহির করিয়া দিতে বলিয়াছিল, বাবুরাম তখন এই বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বুঝাইতে ত্রুটি করে নাই। লক্ষ্মী কিন্তু বাপের কথা শুনে নাই; উত্তেজিতভাবে বলিয়াছিল, "যে আমাকে ছোটলোকের মেয়ে বলেছে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া না ক'রে কিছুতেই আমি ছাড়ব না।"

কন্যার দৃঢ়তা দেখিয়া বাবুরামকে অগত্যা বিবাদে লিপ্ত হইতে হয়। কাগজপত্র, জমী-যায়গার চৌহদ্দী ঠিক করিয়া লইয়া বাবুরাম লক্ষ্মীর পক্ষ হইয়া বাটোয়ারার নালিশ রুজু করিয়া দিল। নালিশ রুজু হইবার পর কিন্তু লক্ষ্মীর ভুল ভাঙ্গিল। সর্ব্বনাশ, রাগের মাথায় সে কি করিয়া বসিল? সত্যই যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল! এ যুদ্ধে কোন পক্ষেরই যে কল্যাণ নাই, বাবুরাম তাহা পূর্ব্বেই কন্যাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। সে সময় উত্তেজনার বশে লক্ষ্মী ইহা শুনিয়াও শুনে নাই, কিন্তু এখন যেন তাহা সত্য বলিয়াই বোধ হইল। হায়, স্বামীর উপার্জ্জিত সম্পত্তিটাকে সে এমনভাবে নষ্ট করিয়া দিল!

মোকর্দ্দমায় টাকার দরকার আগে। বাবুরামের তেমন সঙ্গতি ছিল না যে, নিজ হইতে টাকা দিয়া মামলা চালাইবে। লক্ষ্মীর গহনা একখানা বন্ধক দিয়া মামলা রুজু করা হইল। পরের দিনে আবার টাকার দরকার হইলে লক্ষ্মী বলিল, "রোজ রোজ গয়নাই যদি বাঁধা দিতে হয়, তবে এত গয়না পাব কোথায়, বাবা?"

সহাস্যে বাবুরাম বলিল, "গয়না ফুরিয়ে গেলে তোমার ভাগের জমী বাঁধা দিতে হবে।"

"তা' হ'লে শেষ আমার থাকবে কি?"

"আদালতের জয়পত্র—জজ সাহেবের বিশ পাতার রায়ের কাগজ এক তাড়া।"

খানিক ভাবিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "এ বিবাদ শেষ করবার কোন উপায় নেই কি, বাবা?"

বাবুরাম বলিল, "তুমি চুপ ক'রে গেলেই সব মিটে যায়।"

"কিন্তু আজ মিটে গেল, দশ দিন পরে আবার ত বাধতে পারে?"

"একেবারে বিবাদের শেষ ক'রে দিতে চাও?"

"হাঁ বাবা।"

কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বাবুরাম বলিল, "পারবে কি ততটা? একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে যে।"

ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "সর্ব্বস্বের মধ্যে ত এই পোড়া দেহখানা।"

"আচ্ছা দেখি" বলিয়া বাবুরাম সে দিন চলিয়া গেল।

* * * *

দিনের দিন আদালতে হাজির করিতে হইবে বলিয়া রামবল্লভ দলীল-দস্তাবেজগুলা গুছাইয়া ঠিক করিতেছিল। সুখদা আসিয়া বলিল, "ছোট গিন্নী পাল্কী ক'রে গিয়েছিলেন কোথায় বল দেখি?"

রামবল্লভ বলিল, "শুনলাম, জমী বাঁধা দিতে রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়েছে। ফিরে এলেন না কি?"

সুখদা বলিল, "হাঁ, বাপে-ঝিয়ে ঐ যে এলেন।"

রামবল্লভ উপেক্ষা-সূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া কাগজে মনঃসংযোগ করিল।

একটু পরে লক্ষ্মী মেধোকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং রামবল্লভের সম্মুখে একতাড়া কাগজ ফেলিয়া দিয়া প্রণাম করিল। রামবল্লভ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কিসের কাগজ?"

লক্ষ্মী মেধোকে উপলক্ষ করিয়া বলিল, "বল্ না মেধো, দানপত্র।"

"দানপত্র? কিসের দানপত্র?"

রামবল্লভ কাগজের তাড়া খুলিয়া পড়িয়া দেখিল, লক্ষ্মী তাহার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি রামবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবচন্দ্রকে দান করিয়া সমস্ত সম্পত্তিতে নিঃস্বত্ব হইয়াছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠনাবৃত মুখের দিকে চাহিয়া রামবল্লভ বলিয়া উঠিল, "তুমি তোমার সব সম্পত্তি মেধোকে দান করলে, বৌমা?"

লক্ষ্মী বলিল, "বল্ না মেধো, তাঁর রোজগার করা সম্পত্তি মহাজনে, উকীল-মোক্তারে খেত, তার চাইতে মেধোই না হয় খাবে।"

রামবল্লভ বিস্ময়ের আতিশয্যে হাঁ করিয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুখদা স্বরটাকে একটু চিবাইয়া বলিল, "সেই মল খসালি, মিছে লোক হাসালি। আগে এইটুকু লিখে দিলে এত লোক-হাসাহাসি হ'ত না।"

বাবুরাম দূর হইতে উত্তর দিল, "ছোটলোকের মেয়ের কত আর বুদ্ধি হবে, বড়-মা?"

রামবল্লভ শুনিয়া লজ্জায় মস্তক নত করিল। মেধো দুই হাতে লক্ষ্মীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি তা' হ'লে বাড়ী ছেড়ে আর যাবে না, কাকী-মা?"

রামবল্লভ বলিল, "না রে বোকা ছেলে, তুই হচ্ছিস্ লক্ষ্মীর বরপুত্র। তোকে ছেড়ে মা লক্ষ্মী যাবে কোথায়?"

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

কথা-সাহিত্য

আজ বছর চার পাঁচ থেকে পূজোর সময় গল্প লেখবার ফরমায়েস আমি নিয়মিত পাই। প্রতিবারই আমি এ অনুরোধ কি ক'রে রক্ষা করব, ভেবে পাই নে। আমি প্রবন্ধ-লেখক, গল্পলেখক নই। আমি অবশ্য পূর্ব্বে দু চারটি গল্পও লিখেছি—সে কারণ যদি আমি গল্পলেখক হয়ে উঠি, তা হ'লে আমি কবি ব'লেও গণ্য—কেন না, আমি পদ্যও লিখেছি। কিন্তু কি গল্প, কি পদ্য—আমি যে অবলীলাক্রমে লিখিনে, তার প্রমাণ আমার ও-জাতীয় লেখার পরিমাণ অতি সামান্য। সে যাই হোক্, এডিটার মহোদয়দের বোঝা উচিত যে, প্রবন্ধলেখকদের গল্প লিখতে আদেশ করা, বক্তাদের গান গাইবার আদেশ দেওয়ার তুল্য'। এর ফলে অনেক লেখক, যাঁরা সুপাঠ্য প্রবন্ধ লিখতে পারতেন, তাঁরা আজ অপাঠ্য গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

এডিটাররা যে কেন গল্প চান—তা আমি সম্পূর্ণ জানি। পাঠকরা, বিশেষতঃ পাঠিকারা গল্প চান, কাযেই এডিটাররাও লেখকদের কাছে তাই চাইতেই বাধ্য। গল্পে রুচি বাঙ্গালী পাঠকদের একচেটে নয় ও রুচি বিশ্বপাঠকসামান্য। এক জন ফরাসী সমালোচক লিখেছেন যে, তিনি বৎসরে কম সে কম ছশ'খানি নতুন নভেল পড়তে বাধ্য হন, তার সমালোচনা করবার জন্য। অর্থাৎ দিনে দুখানি নভেল গলাধঃকরণ করতে হয়। ভদ্রলোক—এত নভেল পড়বার সময় কোত্থেকে পান, বুঝতে পারি নে। কারণ, Duhamel সুধু সমালোচক নন, তিনি ফরাসীদেশের এক জন প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক, উপরন্তু তাঁর ব্যবসা হচ্ছে ডাক্তারি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এ যুগের পাঠকদের গল্প পড়বার লালসা কত বেশি। এ এপিডেমিক থেকে মুক্ত সুধু নিরক্ষর লোক—যেমন বেরি-বেরি থেকে মুক্ত সুধু নিরন্ন লোক।

কিন্তু একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সকল যুগেই মানুষের সর্ব্বপ্রধান মানসিক আহার হচ্ছে গল্প। পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-ভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়, সে অতীত গল্পপ্রাণ। এ দেশে পুরাকালে যত গল্প বলা হয়েছে ও লেখা হয়েছে, অন্য কুত্রাপি তার তুলনা নেই। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ব'লে বিশ্বে পরিচিত। কিন্তু যুগ যুগ ধ'রে আমাদের ধর্ম্মের বাহন হয়েছে, মুখ্যতঃ গল্প। রামায়ণ, মহাভারত বাদ দিলে হিন্দু-ধর্ম্মের পোনেরো আনা বাদ প'ড়ে যায়, আর জাতক বাদ দিলে বৌদ্ধধর্ম্ম দর্শনের কচকচি মাত্র হয়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ছাড়াও এ দেশে অসংখ্য গল্প আছে যা সেকালে সাহিত্য বলেই গণ্য হ'ত। এ দেশের যত কাব্য-নাটকের মূলে আছে গল্প। তা ছাড়া আখ্যায়িকা ও কথা নামে দুটি বিপুল সাহিত্য সেকালে ছিল এবং এ কালেও তার কতক অংশের সাক্ষাৎ মেলে। আখ্যায়িকাই বলো আর কথাই বলো, ও দুই হচ্ছে একই বস্তু—অন্ততঃ সেকালের আলঙ্কারিকরা অনেক তর্ক-বিতর্ক ক'রে শেষটা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,—

তৎ কথাখ্যায়িকা হ্যেকা জাতিসংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।
অত্রৈবান্তর্ভবিষ্যন্তি শেষাশ্চাখ্যানজাতয়ঃ॥

(কাব্যাদর্শ—প্রথম পরিচ্ছেদ, ২৮ শ্লোক)।

অর্থাৎ ও দুই এক জাতি, সুধু নাম আলাদা। ইংরাজী লজিকের ভাষায় যাকে বলে genus এক species আলাদা। এই speciesও বহুবিধ ছিল। তার মধ্যে পাঁচটির তাঁরা নাম উল্লেখ করেছেন।

"আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
কথানিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা॥"

দূরে অতি দূরে

বসুমতী প্রেস

শিল্পী- শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণ (ত্রিপুর)

এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে "কথা"ও চার রকম ছিল, যথা—"কথা", "খণ্ডকথা", "পরিকথা", "কথানিকা"। আর এই কথা-সাহিত্য সর্ব্বভাষাতেই রচিত হ'ত, সংস্কৃত ভাষাতেও। দণ্ডী বলেছেন যে,—

"কথা হি সর্ব্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে।"

এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের লৌকিক অলৌকিক সকল সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে—কথা-সাহিত্য।

কথা-সাহিত্য এ দেশে বিলেত থেকে আমদানী করা নূতন সাহিত্য নয়। বরং সত্য কথা এই যে, পুরাকালেও সাহিত্য ভারতবর্ষে রচিত হয়ে, তার পর দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এক কালে পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের প্রচলন য়ুরোপের লোকসমাজে যে অতি বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু বহু পণ্ডিতের মতে আরব্য উপন্যাসের জন্মভূমিও হচ্ছে ভারতবর্ষ।

আজ যে আমরা সকলেই গল্প শুনতে চাই, তার কারণ, এ প্রবৃত্তি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। এ ত গেল শ্রোতা অথবা পাঠকের কথা।

এখন মুস্কিল হয়েছে লেখকদের। সমাজ যত গল্প চায়, তত গল্প আমরা জোগাই কোত্থেকে? কথা-বস্তু আমরা সংগ্রহ করব কোন্ জগৎ থেকে, তাই হয়েছে আমাদের ভাবনার বিষয়। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বাচার্য্যরা যেখান থেকে তা সংগ্রহ করেছেন, আমাদেরও সেখান থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে,—অর্থাৎ বই থেকে।

গল্পের উপাদান হয় জীবনের বই, না হয় ত কাগজের বই থেকে আমদানী করতে হয়, এ দুই ছাড়া এমন কোন তৃতীয় বই নেই, যার থেকে আমরা গল্পের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে পারি।

জীবন-গ্রন্থ থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা এক হিসেবে অতি সহজ। কেন না, এ গ্রন্থ সকলের সুমুখেই প'ড়ে রয়েছে। এ গ্রন্থ পড়বার জন্য কারও পক্ষে কোনই রূপ ব্যাকরণ কি অভিধান মুখস্থ করবার প্রয়োজন নেই, কোনও রূপ শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আর এক হিসেবে, এ বই পড়া অতি কঠিন। আমাদের অধিকাংশ লোকের এ পুস্তকের সুধু মলাটের সঙ্গে পরিচয় আছে। সে মলাট আমরা খুলতে ভয় পাই—কেন না, আমরা জানিনে যে, জীবনের সামাজিক আবরণ উদ্ঘাটিত করলে তার ভিতর থেকে সাপ ব্যাং কি বেরিয়ে পড়বে।

অপর পক্ষে কাগজের বই থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এক হিসেবে মামুলি। বড় বড় লেখকদেরই উদাহরণ দেওয়া যাক্। তাঁরা অনেকেই ও-বস্তু বই থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কালিদাস 'শকুন্তলার' কথাবস্তু নিয়েছেন—মহাভারত থেকে, ভবভূতি 'উত্তররামচরিতের' কথাবস্তু নিয়েছেন—রামায়ণ থেকে। অপর পক্ষে কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' কথাবস্তু কতক সংগ্রহ করেছিলেন ইতিহাস থেকে আর কতক বানিয়েছিলেন নিজে। আর ভবভূতির 'মালতী-মাধবের' কথা সম্ভবতঃ আগাগোড়া ভবভূতির মনগড়া।

'শকুন্তলার' সঙ্গে 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র আর 'উত্তররামচরিতের' সঙ্গে 'মালতী-মাধবের' প্রভেদ যে কি, তা সকলেই জানেন। উপরি-উক্ত নাটকসমূহের তারতম্যের কারণ নির্ণয় করতে হ'লে বলতে হয় যে, লেখকরা পাকা হাতে কথাবস্তু সংগ্রহ করেন বই থেকে, আর কাঁচা হাতে জীবন থেকে। ভারতবর্ষ ছেড়ে বিলেতে গেলেও এই একই সত্যের পরিচয় পাই। Shakespeareএর সব বড় নাটকের কথাবস্তু তাঁর মনগড়া নয়—তা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পলেখকদের কথামালা থেকে সংগৃহীত।

আসল কথা, সাহিত্য-জগতে চুরি ব'লে কোনও জিনিষ নেই। রামের কথা শ্যাম আত্মসাৎ করতে পারলেই, তা শ্যামের কথা হয়ে উঠে। এই আত্মসাৎ ক্রিয়াটাই প্রতিভাসাপেক্ষ। যে পরের জিনিষ নিজের মনের উত্তাপে গলিয়ে নিতে পারে না, সাহিত্য-রাজ্যে সে-ই চোরদায়ে ধরা পড়ে।

আর এক কথা, কাগজের বই থেকে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করা যদি চুরি হয়, তা হ'লে জীবনের বই থেকে তা সংগ্রহ করাও চুরি। সত্য কথা এই যে, মানুষের সুমুখে দুটি জগৎ প'ড়ে রয়েছে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রকৃতির হাতে গড়া, অপরটি মানুষের হাতে গড়া। এই উভয় জগৎ থেকেই মনের খোরাক সংগ্রহ করবার আমাদের সমান অধিকার আছে।

তাই যখন দেখতে পাই যে, সমালোচকরা গল্পলেখকদের প্রতি এই দোষারোপ করেন যে, তাঁরা তাঁদের কথাবস্তু

বিদেশী সাহিত্য থেকে চুরি করেন, তখন অবাক্ হয়ে যাই। এ অপবাদ সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, কোন্ য়ুরোপীয় লেখকের কোন্ গল্প বাঙ্গালা লেখকরা হস্তান্তর করেছেন, সে সন্ধান সমালোচকরা আমাদের দেন না। কিন্তু এ কথা যদি সত্যই হয়, তাতে কিন্তু কিছু আসে যায় না। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, সাহিত্য-জগতে চুরি ব'লে কোনও পাপ নেই। আর আমরা যদি য়ুরোপীয় সাহিত্যের দ্রব্য না ব'লে গ্রহণ করি, তা হ'লে সে কার্য্য নৈতিক হিসেব থেকে হেয় ব'লে গণ্য হয় না। সেকালে ভারতবর্ষ যদি দেদার কথাবস্তু বিদেশে রপ্তানী ক'রে থাকে ত একালে বিদেশ থেকে দেদার আমদানী করবার অধিকার আমাদের আছে। এ হচ্ছে আমাদের পিতৃঋণ পরকে দিয়ে শোধ করানো।

এ ক্ষেত্রে আসল বিচার্য্য হচ্ছে, য়ুরোপীয় কথাবস্তু আমরা যথার্থ আত্মসাৎ করতে পারি কি না। পঞ্চতন্ত্রের কথামালা যে য়ুরোপের অধিবাসীরা বেমালুম আত্মসাৎ করতে পেরেছিল, তার কারণ—সে সব কথা হচ্ছে বাঘ-ভালুক, শেয়াল-কুকুর ইত্যাদির কথা। আর ও সব জীব পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই ধরণের ; অন্ততঃ সব দেশেই তাদের ভাব ও ভাষা একই ছাঁচে ঢালা। আর আরব্য উপন্যাসের কথাকাহিনীর কোনও স্বদেশ নেই।—ও পুস্তকের বর্ণিত ব্যাপার সব ভারতবর্ষেও যেমন অলৌকিক, আরব-দেশেও তেমনই, য়ুরোপেও তাদৃশ।

কিন্তু একালের কথাবস্তু সবই লৌকিক, আর তার পাত্র-পাত্রী সব মানুষ। এক দেশের লৌকিক আচার-ব্যবহার আর এক দেশের লৌকিক আচার-ব্যবহারের সঙ্গে মেলে না। তা ছাড়া য়ুরোপের স্ত্রী পুরুষ—সুধু চর্ম্মে নয়, মর্ম্মেও এ দেশের স্ত্রী-পুরুষ থেকে অনেক তফাৎ। সুতরাং য়ুরোপের লোকদের বাঙ্গালীতে রূপান্তরিত করা তেমনই কঠিন—বাঙ্গালীকে ইংরাজ করা যেমন কঠিন। ও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করবার মত হাত-সাফাই সকলের নয়।

এখন আমার প্রস্তাব এই যে, "এসো, আমরা সকলে সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের খনির ভিতর প্রবেশ করি, তা হলেই সেখান থেকে এমন সব রত্ন উদ্ধার করতে পারব, যা বঙ্গসরস্বতীর গায়ে অনায়াসে পরাতেও পারব এবং তার ফলে বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য অপর্য্যাপ্ত রকম বেড়ে যাবে।"

এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে অনেকে ইতস্ততঃ করবেন। অনেকে বলবেন যে, সংস্কৃত ভাষা তাঁরা জানেন না। তাতে কিছু আসে যায় না। সত্য কথা বলতে গেলে ইংরাজীও আমরা জানি নে ; সুতরাং ইংরাজীর আশ্রয় নিতে যদি আমরা রাজী থাকি, তা হ'লে সংস্কৃতের আশ্রয় নিতে নারাজ হবার কোনই কারণ নেই। এ কথা শুনে যাঁরা চম্‌কে উঠবেন, তাঁদের কাছে নিবেদন করি যে, যে রকম ইংরাজী তাঁরা জানেন, সে রকম সংস্কৃত তাঁরা সবাই জানেন। বাঙ্গালী লেখকমাত্রেই ত সাধুভাষা জানেন আর সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের ভাষা প্রায় ঐ গোছের। এমন কি, অনুস্বার-বিসর্গ দেখে যারা ভড়কান না, তাঁরা দু'দিনেই বুঝতে পারবেন যে, সে ভাষা সাধুভাষার চাইতে সহজবোধ্য।

কেউ কেউ হয় ত এই আপত্তি করবেন যে, সেকেলে গল্পে আমাদের মন উঠবে না। কেন না, তাতে একেলে গল্পের মত psychology নেই। এর উত্তরে বক্তব্য যে, একালের বহু ইংরাজী গল্পে, গল্প নেই, আছে সুধু psychology। বিলেতের একটি বড় নভেলিষ্টের উদাহরণ নেওয়া যাক্। H. D. Wellsএর নভেলে কথা-বস্তু ব'লে কোনও জিনিষ কি আছে? তাঁর নভেলের পাত্র-পাত্রীরা কি বড় বড় বক্তৃতা ঝোলাবার আলনা-মাত্র নয়? এখন এ কথা জোর ক'রে বলা যায় যে, নভেলই লেখো আর ছোট গল্পই লেখো, ভাষান্তরে আখ্যায়িকাই লেখো আর খণ্ডকথাই লেখো, ও দুয়েরই প্রাণ হচ্ছে "কথা" ওরফে গল্প। কথা ছুট কথাসাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পলিটিক্‌স ইকনমিক্‌স্ যা খুসি তাই হ'তে পারে, কিন্তু তা গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়। শিক্ষা-লাভ করতে আর কেউ থিয়েটারে যায় না—যায় স্কুলে। সংস্কৃত গল্পলেখকদের এ জ্ঞান ছিল যে, তাঁরা স্কুলমাষ্টার নন। সকল বিলেতি লেখকের তা নেই। সে যাই হোক্, সংস্কৃত গল্পে যে psychology নেই—এ আশঙ্কা অমূলক। নাটককার দর্শকমণ্ডলীকে পুতুলনাচ দেখান না—ছায়াবাজিও দেখান না ; রক্তমাংসের দেহধারী নরনারী নিয়েই তাঁর কারবার। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা অবশ্য ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন চিত্রপুত্তলিকার মত তটস্থ হয়ে থাকেন না। তাঁরা নড়েন চড়েন, কথা কন, হাসেন, কাঁদেন, এবং

মাঝে মাঝে হাত-পা ছোড়েন। বলা বহুল্য যে, এ সব ক্রিয়ার জন্মভূমি হচ্ছে মন নামক দেশ।

গল্পের নায়ক-নায়িকারাও একেবারে নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বাক্ নন। সুতরাং গল্প-সাহিত্যের ভিতর থেকেও আমরা মানব-মন ও মানব-চরিত্রের অসংখ্য বৈচিত্র্যের পরিচয় পাই। সংস্কৃত কথা-সাহিত্য এ ধর্ম্মে বঞ্চিত নয়।

আমাদের দেশের বহু নাটকের কথাবস্তু যে কথা-সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সে সত্য তাঁর কাছেই সুবিদিত—যাঁর রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় আছে। আর পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি যে, সংস্কৃত ভাষার বড় বড় পদ্য-কাব্যের মূলও ঐ কথা-সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়।

সুতরাং নব্য গল্পলেখকদের ইংরাজী ছেড়ে সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের আঁচল ধরবার পরামর্শ দিয়ে আমি তাদের বিপথে নিয়ে যাবার কুপরামর্শ দিচ্ছি নে।

এ কায করায় আমাদের মৌলিকতাও নষ্ট হবে না। পরের জিনিষ আপন ক'রে নেবার ভিতর একটা মস্ত মৌলিকতা আছে। প্রকৃত গুণী ব্যতীত অপর কারও দ্বারা তা সুসাধ্য নয়। একটু আধটু বদলে জিনিষ যে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে যায়, তার প্রমাণ দেখতে চান ত অতি বড় সুন্দরী রমণীর নাসাবংশ এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দেখুন, সে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে কি না? সত্য কথা এই যে,

"অয়ং নিজঃ পরে বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।"

বাঙ্গালার গল্পলেখকরা যদি আমার পরামর্শ প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করেন ত আস্‌ছে বছর পূজোর সময় তাঁরা দেশ গল্পে ছেয়ে দিতে পারবেন। ইতি

শ্রী-প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)

শারদ-শ্রী

আমি শ্যামা শ্যামের গরবিণী,
মহামায়ার সাক্ষী আমি শরৎ
আমি কনক-আলোর পসারিণী
কমল-করে ফুটাই বুকের দরদ।

২

মলিনকে লই আমি বিমল করে
সুনীল করি আকাশ চাঁদের লাগি',
বিরহি-বুক আলিঙ্গনে ভ'রে
চকোর সাথে চাঁদিনী রাত জাগি।

৪

আমি অটুট যৌবনেরি ঊষা,
অমরী মোর জরা-মরণ নাই;
চন্দ্র-মল্লী-সেফালি মোর ভূষা,
ভ্রমরী সেই ঝুমার গীতি গাই।

আনন্দেরি গন্ধ অধিবাসে
আমিই আগে ধরি বরণ-ডালা,
নিশ্বাসে মোর ধূপের ধোঁয়া ভাসে
সাথীর লাগি আমিই গাঁথি মালা।

মন্ত্র পড়ি বধূর কানে কানে
আমিই খোকার আদর-সোহাগ বাড়াই,
প্রবাসী যে আমার কদর জানে
নয়ন-জলে প্রীতির রাখী পরাই।

৬

ছিলাম রঘুর দিগ্বিজয়ের কালে,
রামের অকাল-বোধন দেখিয়াছি,
দেবীর পূজা নবীন নীলোৎপলে
সেই উৎসবই স্মরণ ক'রে বাঁচি।

৭

বৃন্দাবনে আমার গতাগতি
কুঞ্জে কুঞ্জে ঝুলন ঝুলাই আমি,
যুগলরূপে আমার পরম-প্রীতি
তমালবনে কাটাই দিবস-যামি'।

আবার তুলি' অপরাজিতা, জবা,
ভক্তিভরে পূজতে মহামায়া,
দেহে আমার তাঁহার দেওয়া শোভা
আমি শুধু তাঁহার স্নেহের ছায়া।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দ্বিজেন্দ্রলালের তানসেন নাটকের একটি দৃশ্য

(অসমাপ্ত)

স্থান--তানসেনের গৃহের উদ্যান-সংলগ্ন নিকুঞ্জ।

কাল---অপরাহ্ণ।

নিকুঞ্জমধ্যে তানসেন ও তানসেন-পত্নী প্রেমালাপে নিরত, বাহিরে বিদূষক আসিয়া তানসেনের প্রেমস্বপ্ন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; কারণ, বৃক্ষ-পত্রান্তরাল হইতে প্রণয়ালাপমগ্ন দম্পতিকে দেখা যাইতেছিল।

বিদূষক। (নানারূপে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া) এরা এক রকম জীবনটাকে সুবিধে ক'রে নিয়েছে মন্দ নয়। ইনি বলেন- "বাহা রে তুমি", উনিও বলেন---"বাহা রে তুমি।" দুই জনে নেশায় ভোর। কোথায় লাগে সোমরস। প্রেমরসের কাছে বাবা কোন রসই নয়! এঁরা এখন ভাবছেন, "পৃথিবীতে অন্য লোক যে সব আছে, তারা বেঁচে থাকতে চায় ত থাকুক, ক্ষতি কি? কিন্তু কি সুখে যে বেঁচে থাকতে চায়, তা ত বুঝি নে। রাস্তায় চৌঘুড়ি চ'ড়ে যাবার সময় যেমন যারা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের কৃপার পাত্র ব'লে মনে হয়। মনে হয়, আহা, বেচারীরা যাচ্ছে, যাক্—কেবল আমাদের চৌঘুড়ির জন্যে পথ ছেড়ে দিলেই হোলো।" এই দেখ না কেন আমি এখানে পুরো দেড় ঘণ্টা ধ'রে খাড়া রয়েছি, আর এঁদের কেয়ার নেই। খাসা দেখতে পাচ্ছেন, তবু আমাকে একটা দ্রষ্টব্য পদার্থ ব'লেই এঁদের মনে হচ্ছে না! কিন্তু আর ত পারা যায় না।---অগ্রসর হওয়াই যাক্! (কাসিয়া) বলি ও—বলি—আঃ কি বলি ছাই? (পুনরায় কাসিয়া) বলি ওগো প্রেমিক-প্রেমিকা—

(তানসেন-পত্নীর কুঞ্জের অপর পার্শ্বের একটি দ্বার দিয়া সলজ্জে দ্রুত প্রস্থান, তানসেনের বিরক্তভাবে বাহিরে আগমন)

তানসেন। (কুঞ্চিত ললাটে নিরীক্ষণ করিয়া) কে—বিদূষক না কি?

বিদূষক। একটা অণুবীক্ষণ চাই কি?

তানসেন। (বিরক্তি গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া) এস এস (কুঞ্জমধ্যে উৎসুক দৃষ্টিপাত)।

বিদূষক। ওহে জান, একটা গল্প আছে যে, এক জামাই শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিল। শ্বশুর বল্লেন, "ওরে জামাই এয়েছে," শাশুড়ী বল্লেন "ওরে জামাই এয়েছে রে," শ্যালীরা বল্লে "ওলো জামাই বাবু এয়েছেন রে।" চাকর-বাকর ত্রস্তসমস্ত,---সকলের মুখেই কেবল এক শব্দ "ওরে জামাই এয়েছে, জামাই এয়েছে।" পরে পাহাড়ের ভিতর থেকে যেমন ইঁদুর বেরোয়, সেই রকম এই বিরাট হুলস্থূল চীৎকার ও হট্টগোলের ভিতর থেকে জামাই অভ্যর্থনার জন্য বেরোল—দু'খানা জিলিপি আর দু'-খানা কচুরি। ক্ষুধার্ত্ত জামাই আহার করতে বস্‌লেন। এখন, শ্বশুরের অন্য সব দিকে কার্পণ্য থাক্‌লেও সন্তান-সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনরূপ কার্পণ্য ছিল না। জামাই আহার করতে বসলে তার চারিধার ঘিরে অন্ততঃ ১২টি ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি দেখা গেল। জামাই ভদ্রতার খাতিরে তাঁর সামান্য পুঁজি থেকে জিলিপি টুকরো টুকরো ক'রে প্রত্যেক শ্যালক-শ্যালিকার হাতে দিতে লাগলেন ও আদর ক'রে বল্‌তে লাগলেন, "খাও না ভাই, খাও, খেতে হয় যে।" আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অলক্ষিতে অন্তঃপুর লক্ষ্য ক'রে ঘুষি দেখাতে লাগলেন। তোমারও হোলো সেইরকম, বাবাজী। মুখে বল্‌ছ, "এস এস, বোসো বোসো," আর চোখে বল্‌ছ, "এ আপদ আবার এখানে এসে জুটলো কেন—এ সময়ে?"

তানসেন। (অপ্রস্তুত) না না, সে কি কথা? সে কি কথা? রাজসভার খবর কি?

বিদূষক। সেই খবরই ত দিতে এলাম।

তান্‌সেন। নতুন কিছু?

বিদূষক। নতুন নইলে আর "খবর" বল্‌ব কেন? পুরোনো জিনিষ কখন "খবর" হয়? খবর পুরোনো হলেই ত' সে "ইতিহাস" হয়ে গেল!

তানসেন। তা হ'লে বলুন—দেরি করছেন কেন ?

বিদূষক। আরে বল্‌ছি, বাবাজী, বল্‌ছি। কিন্তু তোমার নবোঢ়াটিকেও যে সে খবরটি শোনাবার ইচ্ছে ছিল। তিনি ধাঁ ক'রে স'রে পড়লেন কেন—আমাকে দেখে ? আমি ত আর বাঘ-ভালুক নই—বা তিনিও কিছু সন্দেশ-রসগোল্লা নন যে—

তানসেন। (বিব্রত) কি জান—ও—উনি—একটু লজ্জাশীলা—মানে—

বিদূষক। (সন্দিগ্ধ) কিন্তু এতক্ষণ এই গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যা চোখে পড়ল, দেখে ত ঠিক্ তা মনে হয় না! তোমার হাতখানি তুলে নিজের গলায় দেওয়া, নিজের হাতখানি তোমার গলার চারদিকে লতিয়ে দেওয়া, তোমার গণ্ডে গণ্ড স্থাপন করা, তোমার কাঁধে মাথাটি এলিয়ে দেওয়া—তা আবার ঘোমটা না দিয়ে—এ সব যে খুব লজ্জাশীলতার লক্ষণ, তা ত' জান্তাম না!

তানসেন। (অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া) মানে—কি জান—আহা—তুমি যে নিকটে আছ, তা উনি জান্তেন না কি না, তাই—

বিদূষক। উহুঁঃ। ও একটা কথাই নয়। আমাকে দেখেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার মনে করেন নি এই আর কি। ভাবছিলেন বোধ হয় যে, আমি একটা গরু-বাছুরের মধ্যেই।

তানসেন। (হাসিয়া) না হে না। তোমাকে বাছুর কখনোই মনে করেন নি।

বিদূষক। কেন ?

তানসেন। (সপরিহাসে) সে সাধ আবার গেছে না কি—শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশতে ?

বিদূষক। আপাততঃ তার আর আবশ্যক দেখছি নে ত। বাছুরগুলোই ক্রমে এখন শিং ফুঁড়ে গরু হয়ে উঠেছে যে!

তানসেন। (পরাজিত হইয়া) আচ্ছা হয়েছে। এখন রাজসভার খবর কি শুনি।

বিদূষক। আগে প্রেমের আলোচনাটাই শেষ হোক্, বাবাজী। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, প্রেম ত করছ—প্রেমের কয় দশা, তার খবর রাখো কি ?

তানসেন। না। বিরহের দশ দশাই জান্‌তাম—প্রেমেরও কি—

বিদূষক। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, প্রেমেরও দশা আছে। এ বিষয়ে পুরাতন কবিরা যে কেন লেখেন নি, বল্‌তে পারি নে।

তানসেন। শুনি তা'লে প্রেমের ক' দশা ?

বিদূষক। দুই।

তানসেন। যথা ?—

বিদূষক। "ওগো মা গো গেলাম গো" আর "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।"

তানসেন। তোমার কি তা'লে এখন—

বিদূষক। হাঁ—ঐ শেষেরটা—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

তানসেন। সত্যি না কি ?—যাক্, এখন রাজসভার খবর জান্‌তে পারি কি ?

বিদূষক। শোন—সেই খবর দিতেই এসেছি। সম্রাট আকবর শা আস্‌ছেন।

তানসেন। (সবিস্ময়ে)। সে কি! কোথায় ? কখন্ ?

বিদূষক। ভয় নেই গো ভয় নেই। তোমার এ প্রেমকুঞ্জে নয়।—গোয়ালিয়রে—এই কার্ত্তিক মাসে।

তানসেন। কেন ?

বিদূষক। তা জানি নে। তবে আমাদের মহারাজ তোমায় সেই জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছেন।

তানসেন। কি জন্যে ?

বিদূষক। আরে—এও বুঝতে পারছ না, বাবাজী ? আকবর শা'র প্রশংসা ক'রে তোমাকে একটা গান বাঁধতে হবে, মহারাজ ব'লেছেন—ভৈরবী ইমনকল্যাণে মিশিয়ে।

তানসেন। তা কখনও হয় মূর্খ ?

বিদূষক। আরে এও যদি না পার, তবে তুমি কিসের ওস্তাদ বট হে ? আর তাল—

তানসেন। সেটাও কি—

বিদূষক। নিশ্চয়—নতুন চাই—(ভাবিয়া) বোধ হয়

আড়খেমটা আর সুরফাক্তা মিশিয়ে করলেই সব চেয়ে খাসা হয়। মহারাজের অন্ততঃ তাই ইচ্ছে। আর গানটা ধ্রুপদ ও কীর্ত্তনের মাঝামাঝি।

তানসেন। তুমি বিদূষক বটে।

বিদূষক। বেঁচে থাক, বাবাজী, বেঁচে থাক। যা যা বল্‌লাম, সব মনে রেখো কিন্তু। আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি তবে? তোমাদের প্রেমালাপের মধ্যে রামকেলি রাগিণীতে কড়ি-মধ্যমের মত এসে পড়লাম, মার্জ্জনা কোরো। [প্রস্থান।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

* কবির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত। নাটকটি বিখ্যাত গায়ক তানসেনের উপর। শ্রীদিলীপকুমার রায়।

রাস্তা দিয়ে কর্ম্মী চলেন—উদ্ধারিতে দেশ
দেশের দুঃখ ভেবে ভেবে আলু-থালু বেশ;
ভিখারীতে ভিক্ষা চাহে—অভাব বড় তা'র—
ধম্‌কে দিলেন—দূর করিবেন দুঃখ দেশের মা'র।

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁশী

এহেন চাঁদনি রেতে কে যায় বাজায়ে বাঁশী,
পরাণ মাতায়ে যায় ফুটে ফুল রাশি রাশি !
নাহি গো নাহি গো আর
বৃন্দাবন অভিসার—
একাকিনী রাধিকার
নয়নের জল ;
শ্যামের বাঁশরী আর
বাজে না'ক বার বার
বহে না উজান আর
যমুনার জল !
তবু কেন প্রাণ মম, এমন আকুল হয়
বাঁশরী বাজায়ে গেলে পরাণ মাতিয়া রয় ?
বৃন্দাবন গেছে ম'রে, বাঁশী কেন আজ জেগে ?
স্মৃতিটুকু কেন এসে, পরাণ মাতায়ে যায় ?
নাহি যদি রাধারাণী, নাহি যদি শ্যামরায়
কি কায বাঁশরী দিয়ে কেন বা বাজায়ে যায় ?
বাঁশরী ভাঙ্গিয়ে ফেল, আর বাজাও না বাঁশী
পরাণ চম্‌কে উঠে ফুটে স্মৃতি রাশি রাশি !
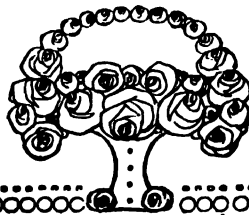
আত্মারাম

(অলৌকিক চিত্র)

আদি

কৃষ্ণকিশোর একটি গোলাপগাছের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার ডান হাতে ফুলকাটা কাঁচি, বাঁ কাঁধে আত্মারাম বসিয়া ছিল। নাম শুনিয়া পাঠক মনে করিবেন না, কোন ব্যক্তিবিশেষের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হইয়া এই প্রৌঢ়বয়স্ক নিরীহ ভদ্রলোকের স্কন্ধে ভর করিয়াছিল। নামটা একটা বৃহৎকায় কাকাতুয়া পাখীর এবং পাখীটা কৃষ্ণকিশোরের মৃতা স্ত্রীর। এখনও যখন-তখন সে তাহার নাম করিয়া ডাকে, কৃষ্ণা! হায়, অবোধ বিহঙ্গ, যে গিয়াছে, সে কি আর আসিবে? কিন্তু পাখীটা ঐ নাম করিলেই কৃষ্ণকিশোরের বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠে। তিনি আকুল হইয়া এদিক্-ওদিক্ চান আর একটা সাড়া পাইবার আশায় কান খাড়া করিয়া থাকেন। এক দিন যাহাকে অযত্নে হারাইয়াছেন, আজ সেই পূর্ব্ব-ত্রুটি স্মরণ করিয়া কৃষ্ণকিশোর অতি যত্নে পাখীটিকে পালন করেন; এক দণ্ড কাছ-ছাড়া করেন না। কাকাতুয়া তাঁহার কাঁধে বসিয়া পতঙ্গের অন্বেষণে চারিদিক্ চাহিতেছিল।

কৃষ্ণকিশোর ডাকিলেন, "সুরো!"

পাখীটাও ডাকিল, "সুরো!"

কিন্তু কোন ডাকই সুরনাথের কর্ণগোচর হইল না। তাহার অবস্থা তখন অতি সঙ্কটাপন্ন। যে নভেলখানি সে পাঠ করিতেছিল, তাহার নায়ক-নায়িকার মিলনের মুখে নিদারুণ বিচ্ছেদ সূচিত হইয়াছে। সে পক্ষ হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কৃষ্ণকিশোর বিরক্তি-ব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া উচ্চ স্বরে আবার ডাকিলেন, "সুরো!"

পাখীটা এবার "সুরো! সুরো" করিয়া বিকট চীৎকারে বিশাল বাগান তোলপাড় করিয়া তুলিল।

একটি যুবক তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "কি, কাকা?"

"কোথায় ছিলি?"

বৃদ্ধের সুর একটু বেসুর শুনিয়া সুরনাথ কোন উত্তর করিল না। কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞাসিলেন, "কি করছিলি? নভেল্ পড়া হচ্ছিল? শোন, সুরনাথ!" ইহা বৃদ্ধের বিরক্তির সম্ভাষণ।

"তোমাকে বারবার বলেছি, আর এখনও বল্ছি, ক্রমাগত এই সব অসার মিথ্যার আলোচনা করতে করতে মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, হৃদয় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কেবল কল্পনার চাষ করলে সত্য-মিথ্যার জ্ঞান পর্য্যন্ত—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কৃষ্ণকিশোর হঠাৎ থামিয়া গেলেন। এই যে প্রত্যক্ষ সংসারটাকে এত দিন তিনি সত্য ব'লে বুকে আঁক্‌ড়ে ধরেছিলেন, এটার চেয়ে ত ভূয়ো আর কিছুই নাই। এটা সত্য, না স্বপ্ন? যাকে আমরা 'বাস্তব' ব'লে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ক'রে রাখতে চাই, তার ভিতর বস্তু কোথায়? কিছুই থাকে না। শরীর পুড়ে ছাই হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসাও লোপ পায়। কেবল স্মৃতি থাকে। তাও কৈ থাকে? যত দিন যায়, তত ঝাপসা হয়ে আসে। ক্রমে মনে হয়, কি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম। কৃষ্ণকিশোরের পূর্ব্ব-জীবন মনে পড়িতে লাগিল। সেই স্ত্রী, এক সময় যার সৌন্দর্য্য তাঁর জীবনের গর্ব্ব ছিল, আজ তার চেহারা স্বপ্নের মূর্ত্তির মত অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। পুত্র-কন্যা—যাদের সম্বন্ধে কত কল্পনা করেছিলেন—এখন তাদের কথা কখন কখন মাত্র মনে পড়ে। তাও স্বপ্নবৎ। তবে "বাস্তব বাস্তব" ক'রে এত চেঁচামেচি কেন? "বাস্তব" ত দেখছি যতক্ষণ চোখের ওপর থাকে, ততক্ষণ। কৃষ্ণকিশোরের চক্ষু আপনা হইতে একবার চারিদিক্ চাহিয়া সুরনাথের উপর নিবদ্ধ হইল।

জবা ফুল

শ্রীগণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর সৌজন্যে] শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু।

"ওঃ, তোকে যে জন্য ডেকেছিলুম! রাধানাথবাবুর আজ পেমেণ্টের দিন। যাও, টাকাটা নিয়ে এস।"

সুরনাথ কি বলি বলি করিয়া ঈষৎ ইতস্ততঃ করিতেই কৃষ্ণকিশোর বলিয়া উঠিলেন, "কথাটা কানে গেল না না কি? এখনও নভেলের ঘোর কাটে নি?"

সুরনাথ বিলক্ষণ জানিত, কৃষ্ণকিশোর প্রতিবাদে অতিশয় অসহিষ্ণু। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই কৃষ্ণকিশোর পুনরায় ডাকিলেন, "আর শোন্!" তার পর বাছিয়া বাছিয়া একটি গোলাপ কাটিয়া সুরনাথের হাতে দিয়া বলিলেন, "ফুলটি মা'কে দিস।"

ফুলটি সুরনাথের হস্তচ্যুত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গেল।

"অকর্ম্মণ্য! নভেল্ পড়া ছাড়া আর কোন যোগ্যতা যদি থাকে! আমি আমার স্নেহের পাত্রীকে ফুল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলুম, আর তুই সেটাকে ধূলায় ফেলে দিলি! থাক্, আর কুড়ুতে হবে না।"

কৃষ্ণকিশোর আর একটি ফুল কাটিয়া সুরনাথের হাতে দিতে দিতে বলিলেন, "নে, সাবধানে ধর্। রাধানাথ-বাবুকে বলিস্, সুরমাকে যেন আজ বিকেলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন—অতি অবশ্য।"

ফুলটি হাতে লইয়া সুরনাথ ভাবিতে লাগিল, আজ অতি দুর্দ্দিন। কাকা কথায় কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন। অথচ এই উত্তেজনাই তাঁহার পক্ষে বিষম সাংঘাতিক। ডাক্তার বিশেষ করিয়া সতর্ক হইতে বলেন। বাটীর বাহির হইলে অবসাদক ঔষধ সঙ্গে রাখিতে হয়। সুরনাথের মনে প্রবল ইচ্ছা হইল, সেই ঔষধ সেবন করিতে বলে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর নিরন্তর লক্ষ্য করিয়াও সে কৃষ্ণকিশোরের মেজাজের কিছুই ঠিক্ পায় নাই। কখন্ কোন্ কথায় তুষ্ট, কোন্ কথায় রুষ্ট হইবেন, তাহার কোনই আভাস পাওয়া যায় না। অনুরোধ করিলে হয় ত ঔষধ সেবন করিবেন, নয় ত তৎক্ষণাৎ শিশিশুদ্ধ দীঘির জলসই হইবে। ফুলটি হাতে করিয়া সুরনাথ নীরবে প্রস্থান করিল। কৃষ্ণকিশোর ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া বসিলেন।

কৃষ্ণকিশোর এক সময় ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। লোক তাঁহাকে বণিক্-সম্রাট্ বলিয়া অভিহিত করিত। এই বণিক্-সম্রাট্ যখন প্রথম কারবার সুরু করেন, তখন তাঁহার একমাত্র মূলধন ছিল সততা। তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "ষোল আনা দিব, ষোল আনা নিব।" কারবারের প্রথম অবস্থায়, যখন একখানি দোকানে মাত্র তাঁহার ব্যবসায় আবদ্ধ, এক দিন সারাদিনের খরিদ-বিক্রয়ের হিসাব নিকাশ করিয়া কৃষ্ণকিশোর দেখিলেন, তহবিলে দুইটি পয়সা বেশী। পুনঃ পুনঃ জাবেদা পরীক্ষা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইল। তহবিলবৃদ্ধির কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইলেন না। কৃষ্ণকিশোর দোকান বন্ধ করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলেন, কিন্তু সেই দুইটি পয়সা তাঁহার মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল, কৃষ্ণকিশোর চক্ষু বুজিতে পারিলেন না। হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল, এক ব্যক্তি নয় টাকা সাড়ে পনের আনার কাপড় কিনিয়া দশ টাকার নোট দিয়াছিল, তাহাকে অর্দ্ধ আনা ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণকিশোর তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। স্বামী বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই কৃষ্ণা জিজ্ঞাসিল, "এত রাত্রে কোথা যাচ্ছ?"

কৃষ্ণকিশোর স্ত্রীর কাছে ভ্রান্তির ইতিহাস বলিলেন। কৃষ্ণা বলিল, "তা এত রাত্রে কেন? কাল সকালবেলা ফেরত দিলেই ত হবে।"

"তুমি জান না। এমনই আজকাল করেই শৈথিল্য আসে। ক্রমে পা পেছলায়।"

ক্রেতা কৃষ্ণকিশোরের পরিচিত। তাহাকে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া জাগাইতে সে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কে? কৃষ্ণকিশোর? এত রাত্রে? খবর সব ভাল ত?"

"আজ্ঞে হাঁ! আপনি একবার উঠে আসুন।"

লোকটি মনে করিল, নিশ্চয় টাকা ধার করিতে আসিয়াছে। সে আবার ঘুমাইবার ভাণ করিল। কিন্তু কৃষ্ণকিশোর ছাড়িবার পাত্র নহেন। ঋণের প্রস্তাব করিলে কি বলিয়া কাটাইতে হইবে, ভাবিতে ভাবিতে লোকটি উঠিয়া আসিল। কৃষ্ণকিশোর তাহার হাতে দুইটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আপনি নোট্ দিয়েছিলেন, দুটি পয়সা ফেরত দেওয়া হয় নি।"

"সে ত আমারই দোষ। জরুরী কাযে তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে হয়েছিল। তা এ সামান্য বিষয়, কাল দিলেই ত পারতে।"

"আজ্ঞে, দেনা-পাওনা হাতে হাতে চোকানই ভাল।"

কারবারী মহলে এই বণিক্-সম্রাটের খ্যাতি ছিল, কৃষ্ণকিশোর খাঁটি লোক, এক কথার মানুষ। আজীবন সত্যাশ্রয়ী সত্যরক্ষা করিতে জীবনে দুইবার দেউলিয়া হইয়াছিলেন। শেষে সত্যই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। কায়ে, কথায়, এমন কি, চিন্তায়ও কখন কৃষ্ণকিশোর মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেন নাই। বলিতেন, "সত্যই আমার ভগবান্। আর কোন ঈশ্বর আছেন কি না, জানি না। তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু সত্য প্রত্যক্ষ। সত্য আর সততার ফলে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। আমি কখন কাউকে ঠকাবও না, ঠক্‌বও না। ষোল আনা দিব, ষোল আনা নিব।" তাঁহার জীবনে কখন এ নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই।

কিন্তু আজ পূর্ব্ব-জীবন পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কৃষ্ণকিশোরের মনে হইল, কেবল এক স্থলে এ নীতির নিদারুণ ব্যতিক্রম হইয়া গিয়াছে। সংসারের কারবারে যে তাঁহার প্রধান অংশভাগিনী ও কর্ম্মসঙ্গিনী ছিল, কেবল তাহারই বেলায় এ নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। প্রীতি, ভক্তি, ভালবাসা সে চিরদিন তাঁহাকে উদার হৃদয়ে দিয়াই গিয়াছে, এক দিনের জন্য এক কণা দাবী করে নাই, পায়ও নাই। এখন সে বঞ্চিতা প্রণয়িনীর স্মৃতি তাঁহাকে অনুক্ষণ নিপীড়িত করিতেছে। কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে অল্পক্ষণের জন্য তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া বাক্যালাপ করিবারও অবসর হয় নাই। তার পর যখন তাঁহার বিশাল ব্যবসায়ের জাল গুটাইয়া অফুরন্ত অবকাশ আসিল, তখন সে ইহসংসার হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লইয়াছে। সে যে এক মুহূর্ত্তের সঙ্গ, একটা মিষ্ট কথার জন্য কতটা পিপাসী হইয়া থাকিত, কৃষ্ণকিশোর ঘুণাক্ষরে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিলেন সেই দিন, যে দিন সে শেষ বিদায় গ্রহণ করে। স্বামী কাছে আসিলে বলিয়াছিল, "তোমাকে কখন কিছু বলি নি, আজ আমার কাছে একটু বোস। তোমায় দেখতে দেখতে"—সেই যে চক্ষু মুদিল, আর চাহিল না। সে তৃষ্ণার্ত্ত স্বর এখনও কৃষ্ণকিশোরের কানে বাজিতেছে। সে মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন অতৃপ্ত দৃষ্টি ভুলিবার নয়, ভোলা যায় না। কিন্তু তাহার হৃদয়ের এই বুভুক্ষা সে চিরদিন হাসিমুখে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, ইঙ্গিতেও কখন প্রকাশ করে নাই তাহার অন্তরে কত দৈন্য।

কৃষ্ণকিশোর নিষ্ফল চিন্তায় কাল কাটাইবার লোক নহেন, কিন্তু আজ কৃষ্ণার চিন্তা কিছুতেই তাঁহাকে অন্য চিন্তার অবকাশ দিতেছে না। কৃষ্ণকিশোর ভাবিতে লাগিলেন, সে চ'লে গেল; বোধ করি, আমার কাছে তেমন যত্ন হবে না ব'লে ছেলে-মেয়ে দুটকেও রেখে গেল না। কি আশ্চর্য্য, যাদের সুখী কর্‌ব ব'লে অনন্যচিন্তার অর্থোপার্জ্জন করেছি, তারাও কাছে এলে বিরক্ত হতুম! হায়, হায়, সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক দিছি ডালি!

জীবনের কারবারে লাভ-লোক্‌সান খতাইয়া বণিক্-সম্রাট্ দেখিলেন, আজ প্রকৃতই তিনি দেউলিয়া। ব্যাঙ্কে টাকা থাকিলে কি হয়, বুকের ভিতর বিশাল শূন্য, নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার! ইহার জন্য কেহই দায়ী নয়, তিনিই দায়ী। ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণকিশোর আপনার উপর যতই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা ততই বাড়িতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ অবসাদক ঔষধ সেবন করিয়াও সে উত্তেজনার নিবৃত্তি হইল না।

কৃষ্ণকিশোর যতই চেষ্টা করুন, কৃষ্ণা আজ আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না। আবার চিন্তা সুরু হইল। আমি যতই অর্থের উপাসনা করেছি, সে ততই তাকে উপেক্ষা করেছে। বাজার উজাড় ক'রে বস্ত্র অলঙ্কার এনে দিয়েছি, এক দিনও তার অঙ্গে ওঠেনি! সেই একখানি লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী! কিন্তু তাই প'রে সে রাজরাণীর পাশে দাঁড়িয়েছে, হীরে-জহরৎ হেরে গিয়েছে! যে নিজেই একটা ঐশ্বর্য্য, তার আবার অন্য ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি? এই অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য অবহেলা ক'রে অর্থকে জীবনের অবলম্বন করেছিলুম! তখন বুঝি নি, এমন এক দিন আস্‌তে পারে যে, সে অর্থ জঞ্জাল ব'লে মনে হবে! ভালবাসাই জীবনের পরম অবলম্বন। যারা সংসার-বিরাগী, তারাও একটা কিছু ভাল না-বেসে থাক্‌তে পারে না। তাই তারা ভগবান্‌কে ভালবাসে। কিন্তু আমি তাও পারছি কৈ? যাঁকে কখন জান্‌বার চেষ্টা করি নি, খুঁজিনি, আজ দরকার হয়েছে ব'লে হঠাৎ তাঁকে ভালবাস্‌ব কেমন ক'রে? বলে ভগবান্ সবার হৃদয়ে আছেন। কিন্তু আমার হৃদয় যত দূর তলিয়ে দেখেছি, কেবল শূন্য, শূন্য, শূন্য! সেই যে পাহাড়ের একটা গহ্বরে অন্ধকারে জল-বায়ুর গর্জ্জন শুনেছিলুম, ঠিক তেমনই! আমার বড় অসময়েই বন্ধু মারা গেল,

সুরনাথ অনাথ হয়ে আমার কাছে এল। নইলে জীবন-অবলম্বনশূন্য হয়ে আমাকেও গল্পের সেই ভবঘুরে ইহুদী (Wandering Jew) হ'তে হ'ত। কিন্তু সে তার প্রণয়িনীর দেখা পেত। আমি কি আশা নিয়ে ঘুরতুম! ইহুদী দেখা পেত, আমি কি পাব না?

মৃত্যুর পর কি অস্তিত্ব থাকে? নয় কেন? বিজ্ঞানের মতে শক্তির ক্ষয় নাই। এত বড় প্রচণ্ড শক্তি যে ভালবাসা—যা সমগ্র সংসারকে বেঁধে রেখেছে—সেটা কি সুধু প্রদীপের মত নেববার জন্য জ্বলে? একেবারে নিঃশেষ হয়ে নিবে যায়, একটু উত্তাপও থাকে না? তা কি হ'তে পারে? কখন না। আমি নিশ্চয় তার দেখা পাব। তার ভালবাসাই আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে যাবে। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে; চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরছে; শুনেছি, প্রতি পরমাণুতে পরমাণুতে বন্ধন। যে নিয়ম জড়ে, মানস-জগতে সে বিধি নাই? নিশ্চয় আছে। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ভগবান্ ব'লে যদি কেউ থাক, আমি কখন তোমার কাছে কিছু চাই নি, আজ আমার তিনটি প্রার্থনা পূর্ণ কর! কৃষ্ণার যেন আবার দেখা পাই; সুরনাথকে যা শিখিয়েছি, তা যেন নিষ্ফল না হয়, সে যেন চিরদিন সত্য ধ'রে থাকে; আর সুরো-সুরমার বিবাহ-জীবন যেন আমার জীবনের মত ব্যর্থ না হয়।

এই সময় সুরনাথ ফিরিয়া আসিল। কৃষ্ণকিশোর লোহার সিন্দুকের চাবিটা তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, "টাকাটা এখন তুলে রাখো, কাল ব্যাঙ্কে পাঠিও। আর ও চাবি তোমার কাছেই থাক্।"

সুরনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার কাছে?"

কৃষ্ণকিশোর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তোমার কাছে। তোমার কাছে। টাকাটা তুলে রাখো। ও জঞ্জাল আর আমি ঘাঁটবো না। ঢের হয়েছে। আমার হাতে পয়সার কলঙ্ক ধ'রে গেছে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? টাকাটা তুলে রাখতে বল্‌ছি"—বলিয়া কৃষ্ণকিশোর একেবারে দুই-তিনটা অবসাদক ট্যাব্‌লয়েড মুখে দিলেন।

সুরনাথ মৃদুস্বরে বলিল, "রাধানাথবাবু টাকা আজ দিতে পার্‌লেন না।"

"কি? দিতে পারলেন না কি? আজ দেবার কথা ছিল না?"

কৃষ্ণকিশোর পাশের ড্রয়ার হইতে নোটবই বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "এই ত ডিউ ডেট্ (কড়ারের তারিখ) লেখা রয়েছে।"

"আজ দেবার কথা ছিল সত্য, টাকাও রেখেছিলেন—"

"তার পর? হঠাৎ ডানা বের ক'রে উড়ে গেল? কি? কথাটা খুলেই বল না! তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে?"

কৃষ্ণকিশোর আবার ট্যাব্‌লয়েডের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুরনাথ বলিল, "আর এক জন দালাল তাঁর সম্ভ্রম নষ্ট করবার জন্য চুপিচুপি ডিক্রী ক'রে রাধানাথবাবুর বাড়ী শিল করেছিল। এ সময়টা তাঁর বড় টানাটানি, তাই ঐ টাকা দিয়ে রক্ষা করেছেন।"

"ঠিক আমার পাওনা ঐ দু-হাজারের জন্য বাড়ী শিল হ'ল, আবার ঠিক কড়ারের আগের দিন? মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক!"

"মিথ্যা নয়। সত্যই তাঁর বাড়ী শিল হয়েছিল। ঘটনাচক্রে—"

কৃষ্ণকিশোর ধমক্ দিয়া বলিলেন, "তোমার ও নভেলের বোলচাল, ফিলজফি নিজের জন্য রাখো। আমি প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ, খাঁটি ব্যাভার বুঝি। ব্যবসা ক'রে মাথার চুল পাক্‌লো, ঘটনাচক্র কখন দেখলুম না। যে সত্য রাখে, সত্য তাকে রাখেন।"

আবার ট্যাবলয়েড। এ শিশি ফুরাইয়া গেল। আল্‌মারী হইতে আর এক শিশি আনিয়া স্খলিতপদে চেয়ারে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কৃষ্ণকিশোর উচ্চ হাসি তুলিয়া বলিলেন, "হা-হা-হা বাড়ী শিল্! আমার সর্ব্বস্ব শিল্ ক'রে আমাকে যদি জেলে দিত, স্ত্রী-পুত্র পথে বস্‌ত, তবু কড়ার ভঙ্গ করতুম না।"

"তিনি ভেবেছিলেন, আপনি এ খেলাপ মাপ করবেন।"

"মাপ করব? ঐ দু-হাজারের এক একটা টাকা আমার গায়ের এক এক ফোঁটা রক্ত, তা জানো?"

হায় মানুষ! একটু পূর্ব্বে এই কৃষ্ণকিশোর বলিতেছিলেন, ও জঞ্জাল আমি আর ঘাঁটব না! রক্তের সামান্য একটু উত্তাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান, বিবেক, প্রতিজ্ঞা, শিক্ষা, আত্ম-দমন-প্রয়াস কোথায় ভাসিয়া যায়! নতশির ভুজঙ্গ কখন্ যে মাথা তুলিবে, তাহার স্থিরতা নাই। কৃষ্ণকিশোর বলিতে লাগিলেন, "মাপ! কখন না! শোন

সুরনাথ, আমি নিজে কখন কথা খেলাপ করি নি, নিজের অন্যায়ের জন্য নিজেকে কখন ক্ষমা করি নি, কাউকে করবও না। তোমাকে বালককাল থেকে কি শিখিয়েছি যে, আজ এই জোচ্চোরের পক্ষসমর্থন করছ, জুয়াচুরির প্রশ্রয় দিচ্ছ? কি শিখিয়েছি?"

"শিখিয়েছেন, সত্য রক্ষা করতে। আপনার শিক্ষায় আমিও কখন সত্য ভঙ্গ করি নি।"

"তবে? আজ সে জোচ্চোরের পক্ষ নিচ্ছ কেন?"

"আমার ঠিক জোচ্চুরি ব'লে মনে হচ্ছে না—"

"মেয়ের রূপ দেখিয়ে টাকা ফাঁকি দেওয়া যাদের ব্যবসা, সে জোচ্চোর নয় ত আর কি? আমি প্রথমেই ভুল করেছি। দালাল জোচ্চোর, এ কথা সুরমাকে দেখে ভুলে গিয়েছিলুম।"

সুরনাথ অতি মৃদু স্বরে কহিল, "বাপের অপরাধে তাকে কেন দণ্ড দিচ্ছেন—"

"বাপের পাপে সন্তানকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, জানো না? যক্ষ্মা, মহাব্যাধি পুরুষানুক্রমে সঞ্চার করে। শরীরে যে নিয়ম, মানস-জগতেও তাই। এই জন্যই পাপকে লোকে ভয় করে। আমি তোমার সঙ্গে শাস্ত্রের তর্ক করতে বসি নি।" কৃষ্ণকিশোর আবার বলিলেন, "শোন, সুরনাথ, সে ছোট লোক জোচ্চোরের সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখতে চাইনি। তুমি যদি আমার সম্পর্ক রাখতে চাও, তার মেয়েকে বে করতে পাবে না।"

সুরনাথ অতি মৃদু স্বরে বলিল, "আমি যে কথা দিয়েছি। আপনিই এক দিন মালাবদল করিয়েছিলেন।"

কৃষ্ণকিশোর কতকগুলা ট্যাবলয়েড মুখে পুরিয়া বলিলেন, "কথা দিয়েছ? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! তাঁকেও অবস্থা-সঙ্কটে মিথ্যা বল্‌তে হয়েছিল। তুমি কথা দিয়েছ? আমিও কথা দিচ্ছি, আমি থাক্‌তে এ বে হবে না। আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়তে রাজি?"

সুরনাথ অতি কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কাকা, তোমার পায় পড়ি, আমাকে এ সঙ্কটে ফেলো না। তুমিই শিখিয়েছ—"

কৃষ্ণকিশোর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "তাই—তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়! যে সত্য ভঙ্গ করে, তার সঙ্গে সত্য রাখা মহাপাপ!"

"কাকা, এ কথা আজ নূতন শুনলুম—"

কৃষ্ণকিশোর উঠিতে গিয়া বসিয়া পড়িলেন; হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "অকৃতজ্ঞ! তোর কথা, ব্যভার তীক্ষ্ণ-ধার ছোরার চেয়েও—ওঃ, তোকে মানুষ করেছি—যে ভালবাসা কৃষ্ণা পায় নি—ছেলেকে মেয়েকে দিই নি—তোকে দিয়েছি—"

কৃষ্ণকিশোরের স্বর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতেছিল। অতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কৃষ্ণা—কৃষ্ণা—তোমার প্রাপ্য বেইমানকে দিয়ে—প্রতিফল—আমাকে খুন করলে—কৃষ্ণা—খুন—খুন—হা-হা-হা—"

এ কি হাসি, না, অন্তিমের কণ্ঠধ্বনি! সুরনাথ কখন কৃষ্ণকিশোরের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত না। গলায় আশঙ্কাসূচক ঘড়-ঘড় শব্দ শুনিয়া চকিতে চাহিয়া দেখিল, কাকার মুখ মৃতের ন্যায় বিবর্ণ। ব্যাকুল হইয়া ডাকিল, "কাকা—কাকা—"

কৃষ্ণকিশোর নিথর, নিরুত্তর! সুরনাথ ভাবিল, আবার ফিট্‌ হয়েছে। সরকার, ভৃত্য প্রভৃতিকে শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া সে মোটরে ডাক্তার আনিতে ছুটিল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ফিট্‌ নয়, মৃত্যু।"

সুরনাথ ডাক্তারের মুখের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া বলিল, "মৃত্যু কি? না, না, মৃত্যু নয়, ডাক্তারবাবু! আরও দুবার ত এমনি ফিট হয়েছিল, আপনি ভাল করেছিলেন। আর একবার ভাল ক'রে দেখুন, ডাক্তারবাবু! মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়। আচ্ছা, আমি দেখছি—"

আত্মারাম তখনও মৃতের স্কন্ধে বসিয়া আছে। সুরনাথ কৃষ্ণকিশোরের দিকে অগ্রসর হইতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"খুন—খুন—হা-হা-হা!" সকলে চমকিয়া উঠিল। এ যেন কৃষ্ণকিশোরের স্বর শমন-ভবন হইতে ভাসিয়া আসিতেছে! সুরনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ডাক্তার চৈতন্যসম্পাদন করিলে সুরনাথ দেখিল, সুরমা কৃষ্ণকিশোরের পাদমূলে পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। রাধানাথের সঙ্গে কয়েক জন লোক মৃতকে শেষ বিশ্রামস্থলে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাধানাথ কন্যাকে বলিলেন, "মা, উঠে এস! কর্ত্তাকে নিয়ে যাবার জন্য সকলে অপেক্ষা করছেন।"

সুরমা উঠিয়া আসিল। কিন্তু শ্মশান-বন্ধুর দল অগ্রসর

সর হইতেই আত্মারাম তাহার শাণিত চঞ্চু-বিস্তার ও পালক-সকল উত্থিত করিয়া আক্রমণের ভঙ্গীতে সকলকে সুস্পষ্ট জানাইয়া দিল—যে মৃত দেহ স্পর্শ করিবে, তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইবে। কেহই সাহস করিল না। সুরনাথ আর একবার অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই বিহঙ্গ কঠোর চীৎকার করিয়া উঠিল। সুরনাথ তাহার ভৃত্যকে আদেশ দিল, আমার বন্দুক নিয়ে আয়!

সুরমা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "না, না, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।" তার পর সে অতি কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "আতু!" আত্মারাম তৎক্ষণাৎ আসিয়া সুরমার স্কন্ধদেশ আশ্রয় করিল।

কন্যা পাখী লইয়া প্রস্থান করিলে রাধানাথ সুরনাথকে বলিলেন, "বাবা, তুমি চল। তোমাকে তিনি পুত্র—"

সুরনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে বল্‌লে পুত্র! আমি পুত্র নই, পিতৃহন্তা, বেইমান—"

মধ্য

রাধানাথ-গৃহিণী রাধিকাসুন্দরী স্বামীর কাছে আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "তোমরা কি আমাকে পাগল করবে, বল্‌তে পার?"

রাধানাথ মুখে না স্বীকার করুন, মনে মনে গৃহিণীকে একটু ভয় করিতেন। ইহার মনস্তত্ত্ব কি, ঠিক নির্ণয় করা যায় না। ভূত না দেখিয়াও লোক ভয় করে। যাহা হউক, আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি, সেইটাই এই অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের কারণ কি না, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিবেন। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যে দিন এই প্রৌঢ় দম্পতির ফুলশয্যা হয়, রাধানাথ শয্যাস্থিতা, অবগুণ্ঠনবতী, তন্দ্রিতা বধূর গা ঠেলিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বল দিকি আমি কে?" বধূ তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল, একটা চোর তাহার কানের মাকড়ি ছিঁড়িয়া লইতেছে। সেই সময় রাধানাথের মৃদু স্পর্শে, ফিস্ ফিস্ শব্দে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বধূ কল্পিত চোরের নাকে এমন দংশন করিল যে, রাধানাথ একবারমাত্র "বাপ" বলিয়া সারারাত ছটফট করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশী বালিকা সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তখনই ঘুমাইয়া পড়িল। কবি বলিয়াছেন—

"ম'লে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন।"

রাধানাথ বলেন,—

"ম'লে কি ভুলিব হায় প্রথম দংশন।"

বন্ধুবর্গ যখন রাধিকার মুক্তার ন্যায় দন্তপাঁতির প্রশংসা করে, রাধানাথ নাকে হাত বুলাইয়া একটু হাসেন আর মনে মনে বলেন—Ignorant fools (অর্ব্বাচীন মূঢ় সব)।

গৃহিণীর ঝঙ্কারে রাধানাথ ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "কেন, কেন? কি হয়েছে?"

"তোমার চোখ নেই? দেখতে পাও না?"

রাধানাথ স্বীকার করিলেন, চোখ আছে।

পত্নী বলিলেন, "তবে?"

রাধানাথ একটু রসিকতার ভাণ করিয়া বলিলেন, "তবে, তোমাকে ছাড়া তারা ত আর কিছু দেখতে পায় না।"

"দেখ, আমার ঠাট্টা ভাল লাগছে না, গা জ্ব'লে যাচ্ছে!"

"ফ্যান্‌টা খুলে দিয়ে এইখানে একটু বোস না। ও কি! কথাটা আধখানা ব'লে যাও যে! আমার যে আধকপালে হবে!"

"একটা কাযের কথা বল্‌তে এলুম—"

"কি কাযের কথা? তোমার সেই গোপ-হার ত? সে ত গড়াতে দিয়েছি।"

রাধিকার পায়ে বেড়ি পড়িল। অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিলেন, "আমি রাত-দিন গয়নার স্বপ্ন দেখছি কি না!"

"তা দেখ না। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু দোহাই তোমার, চোরের স্বপ্ন দেখো না।"

"ঐ একটি বৈ ত আর কথা জান না।"

"কথা অনেক জানি। দালালি করি, কথা বেচেই খাই, কথা আর জানি নি! তবে তোমাকে দেখ্‌লে আমার বাক্যি হ'রে যায়। এখন পাগল হ'তে চাচ্ছ কেন বল দেখি?"

"তা বৈ কি! আমার কোন্ কথা তুমি শোন?"

"দেখ, ধর্ম্মকথা বল! কথা না শুনিয়ে তুমি ছাড়ো সারা দিন খেটেখুটে এসে বিছানায় ঢুক্‌লেই অমনি কানের কাছে চরকা-কাটা সুরু হ'ল—ঘ্যানোর ঘ্যানোর! তুমি যদি আমার মাষ্টার হ'তে, কিছু শিখতুম।"

"তা তুমি ঘুমুলেই পারো।"

"আর আঙ্গুলের খোঁচা খাবে কে? পাঁজরা টাটানো ত চাই!"

"বেশ, আর যদি আমি কোন কথা কই—"

"আ-হা-হা—দিব্যি কোর না! আজ পঁচিশ বছরের অভ্যাস, কথা না কইলে তোমারও পেট ফেঁপে ডিস্‌পেপসিয়া হবে, আর আমারও মনে হবে, কালা হয়ে গেছি। আমার মুখের পানে অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন?"

"তাই দেখ্‌ছি! এই না বল্‌ছিলে, আমার সাম্‌নে বাক্যি হ'রে যায়—"

"আচ্ছা, চুপ করলুম। এখন তুমি সুরু কর, কিন্তু সংক্ষেপে।"

"বলি ঐ অলক্ষুণে পাখীটাকে বিদায় কর। মেয়েটা একেবারে উন্মত্ত হয়ে রয়েছে। সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবল 'আতু' আর 'আতু'! সুরনাথের সর্ব্বনাশ ক'রে এখানে এসে আমাদের ঘরে তুলাল হয়ে বসেছেন। ও পাখী যেখানে যাবে, সর্ব্বনাশ করবে। আমার এক এক সময় ইচ্ছে করে, ঘাড়টা মুচ্‌ড়ে দি।"

রাধানাথ বলিলেন, "বেশ ত, দাও না কেন?"

"দাও না কেন! এক বার গায় হাত দিতে যাও না। এমন পালক ফুলিয়ে ঠোঁট ফাঁক ক'রে দাঁড়াবে—"

রাধানাথ হাসিলেন। এই সময় সুরমা ও আত্মারাম কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। "দেখ না, আমাকে দেখলে মুখ করে যেন হাঁড়িখাকী।"

আত্মারাম বলিল, "হাঁ'খাকী।"

রাধিকা বলিলেন,"আমার কোন পুরুষে হাঁড়ি খায় না।"

আত্মারাম। হাঁ'খায় না!

"শুনলে আস্পর্দ্ধা! হাঁড়ি খায়?"

আত্মারাম। হাঁ'খায়।

রাধিকা। কুঁহুলী!

আত্মারাম। কুঁহুলী!

রাধিকা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পাখীর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করিতেছেন। বলিলেন, "তুই কুঁহুলী!"

আত্মারাম। তুই কুঁহুলী।

সুরমা বলিল, "কেন মা, ওকে গাল শেখাচ্ছ? ওর কি বোধ আছে? যা শুনবে, তাই বল্‌বে।"

রাধিকা বলিলেন, "না, বোধ নেই! গায় হাতটি দিতে যাও দেখি। রেগে পালক ফুলিয়ে দাঁড়াবে।"

"কেন? এই ত আমি দিচ্ছি। আতু!"

কিশোরীর কোমল স্পর্শে ও কণ্ঠস্বরে আত্মারামের সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। সে চঞ্চুর দ্বারা বালিকার কপাল ও কপোল পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল। মা বলিলেন, "কে জানে, বাছা! আমাকে যেন খেতে আসে, পোড়ার-মুখী।"

আত্মারাম। পোড়ারমুখী।

রাধিকা। দূর হ!

আত্মারাম। দূর হ!

রাধিকা। দূর, দূর!

এবার আর আত্মারামকে পারা গেল না। সে আকাশ ফাটাইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে "দূর দূর" করিতে আরম্ভ করিল। রাধিকা কানে আঙ্গুল দিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। সুরমা আত্মারামকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাধিকা স্বামীকে বলিলেন, "অলক্ষুণে পাখী, আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে বিবাগী হয়ে গেল! তুমি কি মনে করেছ, সুরনাথ আর ফিরবে?"

রাধানাথ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বালাই! সে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, তার পর এখনও বে করে নি, সে কি দুঃখে বিবাগী হবে?"

"তুমি তাই মনে ক'রে ব'সে থাকো, আর ভাল ভাল সম্বন্ধ সব হাতছাড়া হয়ে যাক্—"

"সম্বন্ধ করছে কে যে হাতছাড়া হবে? তুমি মেয়ে-মানুষ হয়ে মেয়ের মন বোঝ না? রমা কি আর কারু গলায় মালা দেবে; না, দিতে পারবে?"

"খুব পারবে। আমি রমাপতির সঙ্গে সম্বন্ধ করি।"

রাধানাথ হাসিয়া ব'ললেন, "কে রমাপতি? সেই রাঙ্গা-মূলো?"

"রাঙ্গামূলো কেন হ'তে যাবে? তার কিসের অভাব? অমন রূপ, অমন তালুক।"

"বেশ ত! সে নিজেই তা পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করুক। আমার ঘাড়ে কেন? রূপ তালুক নিয়ে ধুয়ে খাব?"

"তবে আবার কি চাই?"

"কি চাই, মেয়েকে দেখে বুঝতে পারছ না? সুরনাথের খবর না পেয়ে কি রকম রোগা হয়ে যাচ্ছে।"

"সে তার জন্য নয়। ঐ অলক্ষুণে পাখীটার হাওয়া

লেগে। আর ভালবাসা ত বাপের বাড়ী থেকে কেউ সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে না, ঘর করতে করতে হয়।"

"আর নাসিকা-দংশন তার ভিত্তি।"

"ঐ এক ঠাট্টাই জানো!"

"ঠাট্টা কি? ঠাট্টায় রক্তপাত হয়? দাঁতের দাগ বসে।"

"তা বসে বসুক। আমি আর কিছু দিন দেখব। সুরনাথ না ফেরে, আমার মেয়ে আমি যাকে খুসী দেব।"

"মেয়ে ত বাপের বাড়ী থেকে সঙ্গে আনা হয় নি যে, তোমার মেয়ে!"

পত্নীর মুখের উপর এমন চোট্‌পাট্ জবাব দিবার মত সাহস রাধানাথের ছিল না। তবে কন্যার বিবাহের আলোচনা সম্প্রতি তাঁহার পক্ষে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাধানাথ নিজের দাম্পত্য-জীবন আলোচনা করিয়া স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কন্যার মনোমত পাত্র ব্যতীত তাহার বিবাহ দিবেন না। এ সুযোগ তাঁহাকে কেহ দেয় নাই! এই জন্যই পত্নী হইয়াছে ঠিক তাঁহার প্রকৃতির বিপরীত। রাধানাথ মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী; পত্নী মুক্তহস্ত, সঞ্চয়-শূন্যা। পতি সংযতভাষী, পত্নী মুখরা। এই দম্পতিকে দেখিলে মনে হয়, যেন উদয়গিরি ও অস্তগিরি পরস্পরের আলিঙ্গন-বদ্ধ। এইরূপ বিপরীত সম্মিলনেই সংসারচক্র ঘুরিতেছে।

শত্রু-মিত্রনির্ব্বিশেষে মুক্তহস্তে দানই ছিল রাধিকার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা। এক সময় কোন দরিদ্রা প্রতিবেশিনী এই দানশীলা মহিলাকে অসংযতভাবে অপমানিত করে। কিছু দিন পরে রাধিকা শুনিলেন, তাহার স্বামী সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়ী, ঔষধ-পথ্যের এবং অর্থেরও অভাব। রাধিকা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিবেশিনীর নিকটে গিয়ে বলিলেন, "দিদি, আমাকে মাপ কর। আমি না বুঝে অনেক কথা বলেছি।" তাহার পর তাহার সকল অভাবের ব্যবস্থা করিয়া রাধিকা গৃহে ফিরিলেন। দান এই রমণীর প্রাণ। পল্লীতে দরিদ্র-পরিবারে তাঁহার নাম ছিল "রাধারাণী।"

রাধানাথ পত্নীকে বলিলেন, "জান ত রমার সুরনাথগত প্রাণ। সুরনাথেরও তাই। গাছ কাটলে লতা বাঁচে না। ছেলেবেলা থেকে আনাগোনা, মেশামিশি। যখন একসঙ্গে খেলা করত, তুমিই কতবার বলেছ, বিধাতা এদের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছেন।"

"তাই ব'লে কি চিরকাল ব'সে থাক্‌তে হবে! সে যদি না ফেরে?"

"ফিরবে না কি? বাল্যকাল থেকে কৃষ্ণকিশোরের কাছে মানুষ, শোকটা বড় লেগেছে, তাই দিন কতক ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু ঠাণ্ডা হ'লেই আস্‌বে।"

"আসে ত তারই সঙ্গে বে হবে। তা রমাপতিকে মেয়ে দেখিয়ে রাখ্‌তে দোষ কি? সে আমার আত্মীয়। অবশ্য কাছাকাছি নয়, দূর-সম্পর্ক। সে হেথা এলে-গেলে লোকও নিন্দে করবে না। আর রমাও চাই কি তাকে পছন্দ করতে পারে।"

রাধানাথ বার-বার স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। রাধিকার প্রশ্রয় পাইয়া রমাপতি ক্রমে ঘনঘন যাতায়াত করিতে শুরু করিল।

গুরুভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া সুরনাথ যখন ভ্রমণে বাহির হয়, সুরমাকে পত্র লিখিয়াছিল, যে-আমি ছিলাম, সে-আমি আর নাই। কাকার অকস্মাৎ মৃত্যুতে সব ওলোট-পালট হয়ে গিয়েছে। এ মন নিয়ে কি তোমাকে আমি সুখী করতে পারব? তুমি স্থিরচিত্তে এ কথা ভেবো। আমার জীবনে যে জটিল সমস্যার উদয় হয়েছে, তা তোমাকেও বলবার নয়। আমার মনের অবস্থা এখন অতিশয় অস্থির। এই অশান্তি নিয়ে আমি চল্‌লুম। অতি গুরু কারণ না হ'লে তোমার কাছ থেকে দূরে থাক্‌তুম না। আমায় ক্ষমা করো, রমা! আশা করি, আবার পূর্ব্বের মত হয়েই তোমার কাছে ফিরে আস্‌ব।

রমাপতি প্রায়ই আসে। মাঝে মাঝে গৃহচূড়ে অবস্থিত পারাবত শীকার করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে। ছোকরা কবি হেম বাঁড়ুয্যের কবিতাবলীতে পড়িয়াছিল—

> "বীর বিনা আহা রমণী-রতন
> বীর বই আর রমণী-রতন
> আর কারে শোভা পায় রে?"

এ দিকে নিরীহ প্রাণি-হত্যায় রমা কাঁদিয়া আকুল হইলে রমাপতি বলে, "না না, কাঁদলে হবে না! আমাদের দেশের মহিলারা ঐ ছাই-পাঁশ কোমলতা নিয়েই গেল! তোমাকে বীর-পত্নী হ'তে হবে। জানো রমা, তোমাকে বীর-পত্নী

হ'তে হবে।" সুরমা মুখে কিছু বলে না, মনে মনে বলে, কখন্ এ পাপ বিদায় হবে! লোকটা মজবুত, মশাই! সহজে দমে না! রমা যখন নিরতিশয় বিরক্তি ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাহার পানে চায়, রমাপতি তখন হেমবাবুর কবিতা আবৃত্তি করে—

"এই কি আমার সেই জীবন-তোষিণী?
যৌবনের সুধা-ময়ী সুধা-তরঙ্গিণী?
এই কি সে করতল শিরীষ-কোমল,
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল?"

রমা লজ্জায় লাল হইয়া আতুকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। রমাপতি পাখীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া মনে মনে বলে, কোন রকমে একবার তোমাকে বাগে পেলে হয়! এমনই এক দিকে গুলী ও অন্য দিকে কবিতা-বৃষ্টিতে সুরমার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল।

রমাপতির এইরূপ আচরণে রমা যখন তাহার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য হরিল্লোট মানিতেছে, সুরনাথ তখন আপনার জীবন-সমস্যা লইয়া ঘুরিতেছে। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর পুরীতে আসিয়া সাগরকূলে বসিয়া সুরনাথ ভাবিতেছিল, আমার কর্ত্তব্য কি? সুরমার সহিত দীর্ঘ বিরহে হৃদয় নিরতিশয় ব্যাকুল। হঠাৎ দূরে দৃষ্টি পড়ায় সে চমকিয়া উঠিল, এ কি, কাকা! আমার কি শেষ মস্তিষ্ক-বিকৃতি হ'ল? যে লোকটকে দেখিয়া কৃষ্ণকিশোর বলিয়া সুরনাথের ভ্রম হইয়াছিল, তিনি কাছে আসিতে সুরনাথ আপনার ভুল বুঝিল। তাহার ব্যবহার কিন্তু লোকটির বিচক্ষণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি ধীরে ধীরে সুরনাথের কাছে আসিয়া বসিলেন এবং প্রথম সাধারণ ভদ্রতা-বিনিময়ের পর কথায় কথায় বলিলেন, "বাবুজী, দেখতে পাই, তুমি রোজ এইখানে এসে চুপ ক'রে ব'সে থাক। কিন্তু তোমার উদাস দৃষ্টি দেখে মনে হয়, সাগর পানে চেয়ে আছ, আর তোমার মনে যে সব তরঙ্গ উঠছে, তাই দেখ্‌ছ।"

লোকটি ভাবিয়াছিলেন, সুরনাথ কোন কারণে বিবাদ করিয়া বাড়ী হইতে পলাতক; ইহাকে বুঝাইয়া বাড়ী ফিরাইতে হইবে। ক্রমে কথায় কথায় তিনি সুরনাথের পরিচয় পাইলেন। ব্যথার ব্যথী ভাবিয়া সুরনাথ বলিতে লাগিল, "আমি জন্মাবার ছ'মাসের মধ্যে মা যক্ষ্মারোগে মারা যান। আমার যখন ৬।৭ বৎসর বয়স, তখন পিতৃহীন হই। সেই অবধি বাবার এক বন্ধুর কাছে মানুষ হয়েছি। ওঃ, কাকা আমাকে কি ভালই বাস্‌তেন! ক্রমে এম্-এ পাশ করলুম। তার পূর্ব্বে কাকা সুরমাকে আমার বধূরূপে নির্ব্বাচন করেছিলেন। তার বাপকে বাগ্‌দান ক'রে সেই মেয়েকে আমাদের বাগানে আন্‌তেন। একসঙ্গে খেলা, গল্প, আমোদ-আহ্লাদে আমাদের ভালবাসা যত গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল, কাকা ততই সুখী হলেন। বল্‌তেন, 'আমার জীবনে যে ভুল হয়েছে, সুরোর জীবনে তা হ'তে দেব না। আমার অগাধ সম্পত্তি রইল, এরা পরস্পর ভালবেসে জীবনটা ভোগ করুক।' এক দিন তাঁর সামনেই আমাদের মালাবদল হ'ল।"

"কি শালগ্রাম সাক্ষী ক'রে?"

"না, শালগ্রামের চেয়েও যিনি আমাদের বড়, সেই কাকার সাক্ষাতে। এমনই ক'রে সুরমার কাছে, তার বাপ-মা'র কাছে আমি সত্যে বদ্ধ হলুম।"

অতঃপর কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যুর পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস দিয়া সুরনাথ প্রশ্ন করিল, "বলুন দিকি, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? যিনি আমাকে ছেলের চেয়েও বেশী ক'রে মানুষ করেছেন, যাঁর কষ্টার্জ্জিত অর্থ সমস্ত আমাকে দান করেছেন, তাঁর শেষ আদেশ পালন করবো, না, আমার সত্য রাখ্‌ব?"

লোকটি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বাবুজি, সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর নাই। আমাকে এক সাধু বলেছিলেন, কলির ধর্ম্ম—সত্য। যে সত্য রক্ষা করে, সে সত্যের ভগবান্‌কে পায়। তোমার কাছে তোমার সত্যই বড়।"

"কিন্তু কাকার আদেশ?"

"সে বিকৃত আদেশ। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন, আত্মস্থ ছিলেন না। উত্তেজিত অবস্থায় আদেশ দিয়েছিলেন। না হ'লেও তোমার সত্য তোমার। তোমার কর্ম্ম-ফলের জন্য আর কেউ ভুগ্‌বে না। তোমার অদৃষ্ট তুমিই সৃষ্টি কর। তার পর-একটা কথা—"

"কি বলুন?"

"আর একটা বালিকার জীবন নিরপরাধে ব্যর্থ করা কি ভাল হবে?"

'আমিও দাবো'

বসুমতা প্রেস । শিল্পী শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ ।

মানুষের কথা এক এক সময় দেববাক্য ব'লে মনে হয়। তাহার উপর লোক'টর আকৃতি কৃষ্ণকিশোরের আকৃতির সদৃশ। সুরনাথের মনে হইল, এ যেন তাহার কাকারই পথ-নির্দ্দেশ। সে সোৎসুকে প্রশ্ন করিল, "আপনি আমায় তা হ'লে কি করতে বলেন? আপনি আমাকে যে পথে যেতে বল্‌বেন, সেই পথেই যাবো।"

"ওরে বাপ রে! আমি পথ দেখিয়ে দেব? পথ দেখিয়ে দেবেন যাঁর আশ্রয়ে এসেছেন, সেই জগন্নাথ।"

"আমার অবস্থায় আপনি কি করতেন?"

"আমি বাড়ী ফিরে গিয়ে বিবাহ করতুম।"

সুরনাথ সেই রাত্রিতেই বাটী ফিরিল এবং পরদিন শ্বশুরালয়ে গিয়া দেখিল, পশ্চাতের উদ্যানে সুরমা সূর্য্যাস্তের পানে চাহিয়া নিপর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রমাপতি উত্তেজিতভাবে কি বলিতেছে। সুরনাথের আহ্বান শুনিয়াই সুরমা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই বর্ব্বরটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

রমাপতি উভয়ের প্রতি একটা অগ্নিকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রাধিকা ডাকিলেন, "ওরে রমাপতি, একটু জল খেয়ে যা।"

রমাপতি মুখ হাঁড়ির মত করিয়া বলিল, "নাঃ!"

"কেন রে? আজ আবার তোর কি হ'ল? মুখ হাঁড়ি ক'রে যাচ্ছিস্ কেন?"

"সুরনাথ এসেছে।"

রাধানাথ কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য করিলেন। ঐ দিন বৈ আর লগ্ন নাই। পরে অকাল।

বাড়ী গিয়া রমাপতি ভাবিল, ও ভাবে চটিয়া চলিয়া আসাটা ভাল হয় নাই। অবস্থার কত রকম ওলোট্‌-পালট্ হয়ে যায়, কে বল্‌তে পারে? হাইকোর্টের একটা ডিক্রীতে মুখুয্যেরা তালুকটা খোয়ালে, আমরা পেয়ে গেলুম। পরদিন এক সময় আসিয়া সে হতাশ-কণ্ঠে কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর, রমা! তোমাকে কত বিরক্ত করেছি।"

সুরনাথের প্রত্যাগমনের আনন্দে সুরমা আজ রমাপতির অপরাধ ভুলিল। বলিল, "বেশ! কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"যদি তুমি নিরর্থক পায়রা না মারো।"

"আচ্ছা। রমা, পায়রা শীকারের চেয়ে তোমার সদ্ভাব আর স্নেহের দাম আমি ঢের বেশী মনে করি। যখন তার বেশী সৌভাগ্য আমার হবার নয়—"

"ঐ কথাটি তুমি আমাকে আর বোল না।"

"তাও স্বীকার। কিন্তু তুমি একটি অনুরোধ আমার রাখ্‌বে?"

"যদি রাখ্‌বার মত হয়।"

"যদি কখন দরকার হয়, আমাকে বন্ধু মনে ক'রে হুকুম করতে ভুল্‌বে না?"

লোকটা অগাধ জলের মাছ, ধাই দেয়, তবু থাই পাওয়া যায় না।

সুরমা বলিল, "আমার আবার কি দরকার হবে?"

"হবেই যে, এমন কথা নয়—যদি হয়। রমা, এতটুকু তৃপ্তিও কি আমার ভাগ্যে নাই যে, ঐটুকু মনে করেও মনকে সান্ত্বনা দেব?"

নারী আঘাত করিয়াও ব্যথা বোধ করে। রমা কহিল, "বেশ! তাতে যদি তুমি সুখী হও—"

"সুখী, রমা! তুমি কি মনে কর, তোমাকে যে ভাবে দেখেছি, সে ভাবে আর কাউকে দেখ্‌তে পারব? চোখ দু'ট উপ্‌ড়ে ফেলে দেব না! আর কি আমি বিবাহ করব? মনের কোণেও ঠাঁই দিও না! (সনিশ্বাসে) এত দিনে শ্রীপুর-জমীদার-বংশ লোপ হ'ল!"

তখন ভিতরে ভিতরে পাত্রী দেখা চল্‌ছিল। অনেকক্ষণ সুরমার মুখপানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ও দীর্ঘচ্ছন্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিতে চাপিতে রমাপতি চলিয়া গেল।

বিবাহের দিন সকালে সুরনাথ সুরমার কথা ভাবিতে ভাবিতে ও কল্পনায় সুখের ছবি আঁকিতে আঁকিতে বাগানে বেড়াইতেছিল। রাধানাথ আসিয়া বলিলেন, "সুরনাথ, তুমি ছিলে না ব'লে সে দু-হাজার টাকা ফিরে দেওয়া হয় নি।"

সেই দু-হাজার—যাহার জন্য সুরনাথের জীবন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। এ কি বিধাতার চক্র। আজই সেই কথা উত্থাপন। সুরনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে কি আপনারা ভুলতে দেবেন না?"

রাধানাথ ভিতরের কোন কথাই জানিতেন না। ভাবী জামাতার পাণ্ডু গণ্ড দেখিয়া ভীত হইয়া বলিলেন, "আমি যে ঋণী, বাবাজি!"

"থাকুন্ গে ঋণী। যাঁর কাছে ঋণ, তিনি যখন চাইবেন, দেবেন। আমি ও টাকা ছোঁব না।"

"কিন্তু বাবাজি, আমাকে ত ঋণমুক্ত হ'তে হবে।"

"না, না, হবে না, হবে না! তিনি যখন গেছেন, আপনার ঋণও গেছে। দয়া করুন আমায়! ও টাকা আপনি দান করবেন।"

রাধানাথ নতশিরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। এ কি ব্যাপার!

বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী-আচার হইয়া গেল। রাধানাথ কন্যা-সম্প্রদান করিতে বসিলেন। সেই সময় আত্মারাম কোথা হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "খুন—খুন—হা—হা—হা—"

সুরনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শেষ

চৈতন্য পাইয়া সুরনাথ দেখিল, সে রাধানাথের ভবনে শয্যায় শায়িত। সুরমা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছে। রাধানাথ এবং রাধিকাসুন্দরী উৎকণ্ঠিতভাবে পার্শ্বে বসিয়া আছেন। চোখ চাহিতেই রাধানাথ বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্!" এবং পরক্ষণেই সস্ত্রীক বাহির হইয়া গেলেন। সুরমা পাশে আসিয়া বসিতে সুরনাথ বলিল, "রমা, আমি কি তোমার শনি হয়েই জন্মেছিলুম?"

"কেন, কেন?"

"আজ কি কাণ্ড হ'ল বল দিকি?"

"হ'লই বা। বে' ত আমাদের অনেক আগে হয়ে গেছে। তুমি ভুলে গেছ?"

"ওঃ, সেই ছেলেবেলায় ছেলেখেলার মালা-বদল? সে ত শালগ্রাম সাক্ষী ক'রে হয় নি!"

সুরমা গম্ভীর স্বরে বলিল, "যিনি আমাদের কাছে তার চেয়েও বড়, সেই কাকা-বাবু নিজে সে কায ক'রে গেছেন। তার চেয়ে কি পাতরের শালগ্রাম বড়?"

"তোমার সীঁথায় সিঁদুর দেওয়া হয় নি।"

"তুমি সুস্থ হও, সে তখন হবে।"

"রমা, আমার জামা?"

"এখন জামা কি হবে?"

"তার পকেটে চেন্ সুদ্ধ লকেট্ আছে। এনে আমায় পরিয়ে দাও।"

এই লকেটে সুরমার চিত্র ছিল। সুরমা তাহা কণ্ঠে পরাইয়া দিতে সুরনাথ বলিল, "রমা, এই ছায়া বুকে ক'রে কি চিরদিন বেড়াতে হবে?"

"কেন এ কথা বল্ছ?"

"আমার মনে হচ্ছে, এ জন্মে তোমাকে আমি পাব না।"

"পাবে-ই পাবে। ইহলোকে না হয়, পরলোকে। তুমি ঘুমোও।"

"তুমিও শোও গে। আমি একটু নিরিবিলি না হ'লে ঘুমতে পারব না। আমি আপনা হ'তে যতক্ষণ না উঠ্ব, কেউ না আমায় ডাকে। আলো নিবিয়ে দিয়ে যেও।"

"পাশের ঘরে তোমার চাকর রইল, দরকার হ'লে ডেকো" বলিয়া সুরমা আলো নিবাইয়া চলিয়া গেল।

সেই অন্ধকার কক্ষে, তদপেক্ষা গাঢ়তর তিমিরাবৃত সুরনাথের অন্তরে কৃষ্ণকিশোরের শেষ চিত্র সমুদিত হইল। সুরনাথ ভাবিতে লাগিল, এক দিনে কি বিপর্য্যয়! নাটকে নভেলে একেই বলে ঘটনা-চক্র। জলে একটা ঢিল ফেল্লে তার তরঙ্গ চক্রাকারে কত দূরে, কত দূরে গিয়ে মিলায়! সোনার লঙ্কা ধ্বংস, রাবণ নির্ব্বংশ হ'ল, তার মূলে ক্ষুদ্র একটি বিস্ফোটক। রাধানাথবাবুকে জব্দ করতে এক জন বাড়ী শিল্ করলে, সেই দিন তাঁর হাতে নগদ টাকা নাই। কাকার টাকায় মান বাঁচল; যার টাকা, তার প্রাণ গেল আর আমি জীবনের শান্তি হারালুম, সঙ্গে সঙ্গে সুরমাও হারালে। চাকা চলে, দোষী নির্দ্দোষ বাছে না, পিষে যায়। কিন্তু ঘটনা-চক্র যদি, আমার অন্তরে এ আত্মগ্লানি কেন? আমার কি অপরাধ? অপরাধ? কাকার কথায় কেন আমি উত্তেজিত হলুম? কেন আমি চুপ ক'রে রইলুম না? কেন তাঁর পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা দেখেও ডাক্তার আন্তে ছুটিনি? কেন আপনাকে সংযত না ক'রে প্রতিবাদে তাঁকে উত্তেজিত ক'রে তুল্লুম? প্রতিবাদে তাঁর উত্তেজনা বাড়ে, তা ত আমি জান্তুম। তিনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ব'লে গেছেন। সত্যই আমি অকৃতজ্ঞ। কেন তাঁর আদেশ মেনে নিলুম না? না-হয় সত্যভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করতুম। না হয় সত্যভঙ্গে নরক হ'ত। এখনও ত সেই নরক ভোগ করছি। এ অনুতাপের আগুনের চেয়ে কি নরকাগ্নি বেশী? সেই ত সত্য রক্ষা হ'ল না। ঠিক সম্প্রদানের সময় বিঘ্ন। পাখীটা

"খুন—খুন" ব'লে উঠ্‌ল। অবোধ প্রাণী, ওর কি সময়-জ্ঞান আছে? নিশ্চয় ও পাখীর স্বর নয়, আমার বিবেকের বাণী। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি—সেই যে বুড় পণ্ডিত বল্‌ত! কিন্তু ধর্ম্মের আচরণ বুঝতে পারলুম না। সত্যি খুন ক'রে ত হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, তখন ধর্ম্ম কোথা থাকে? তবে কি আমি সত্যই মনের স্বাস্থ্য হারিয়েছি? তিলকে তাল করছি? কিন্তু পাখীটা "খুন—খুন" ক'রে চেঁচালে কেন? সত্যই কি খুন? কেন নয়? কথার ছুরিতে অস্ত্রের চেয়েও বেশি ধার। কিন্তু যার জন্য খুন করলুম, তা-ই বিফল হ'ল! সত্য ত রক্ষা হ'ল না। ওঃ, কি দোটানায় পড়েছি। রমা আমাকে এক দিকে টান্‌ছে, আমার মন তার বিপরীত দিকে ঠেলে দিচ্ছে; বল্‌ছে, ছুঁসনি, ছুঁসনি, এ তোর নিষিদ্ধ ফল! কি শাস্তি! বুকে তৃষ্ণা, হাতে সুধাপাত্র, কিন্তু মুখে তোল্‌বার যো নেই! কি হবে? কি করব? কিসে এ আগুনের শিখা নিব্‌বে? প্রায়শ্চিত্ত? কি প্রায়শ্চিত্ত? মৃত্যু?

পরদিন অনেক বেলা অবধি সুরনাথ উঠিতেছে না দেখিয়া রাধানাথ ডাকিতে গেলেন। গৃহ শূন্য! তার পর অনেক অন্বেষণ হইল, কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

এক পক্ষের পর কৃষ্ণকিশোরের এটর্ণী আসিয়া রাধানাথের হাতে একখানি উইল্ দিলেন। কাকার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুরনাথ তাহা সুরমাকে দান করিয়াছে।

রাধানাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সুরনাথ কোথা?"

"বলেন কেন, মশাই! আজকালের ছেলেদের মতি-গতি কিছু বোঝ্‌বার যো নেই। এই দেখুন না। গরীবের ছেলে, এত টাকা পেলি, দু' দিন ভোগ কর! তা নয়—"

"তা নয় ত কি?"

"আরে মশাই! বরাতে থাক্‌লে ত ভোগ করবে! একেই বলে সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়—এমনি একটা প্রবাদ আছে না?"

"তা ত আছে। কিন্তু সুরনাথ কোথা?"

"তিনি যুদ্ধে গেছেন।"

যদি সমস্ত পৃথিবী চোখের সামনে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেত, রাধানাথ এত বিস্মিত হইতেন না। যুদ্ধ কি?

"যুদ্ধ কি জানেন না? থোড়া জমিনকা ওয়াস্তে কাজিয়া। তার পর এক পক্ষে দ্ড়াম্, এক পক্ষে গুড়ুম্, শেষ কাটা-কাটি, খোঁচাখুঁচি, রক্তারক্তি। মাঠে পড়ে, এর মাথা ওর ঘাড়ে, তার পা' এর ধড়ে। যাকে বাংলায় বলে যুজ্জ্—যুজ্জু! আপনি কোন্ শতাব্দীর লোক? বিংশ শতাব্দীতে ট্রেস্‌পাস্ (trespass) অর্থাৎ অনধিকার প্রবেশ করেছেন? সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বেধেছে। এখান অবধি কামানের আওয়াজ আস্‌ছে, শুনতে পাচ্ছেন না?"

"তা ত আসছে। তাতে সুরনাথের কি?"

"তিনি কি আর স্থির থাক্‌তে পারেন? সেই কামানের মুখ বন্ধ করতে গেছেন।"

রাধানাথ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "মশাই, আমার যে সর্ব্বনাশ! আপনি ভেঙ্গেচুরে বলুন।"

"আরে মশাই, জার্ম্মাণী সারা য়ুরোপটা ভেঙ্গেচুরে চুরমার সমভূম ক'রে দিলে, আপনি তবু বল্‌ছেন ভেঙ্গে-চুরে?"

অতঃপর এটর্ণী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "পাছে খবরটা হঠাৎ শুনলে আপনার শক্ (shock) লাগে, তাই সুরনাথ ব'লে গেছলেন, একবারে না বল্‌তে। যাক্, আপনার স্ত্রী-কন্যার কাছে এ সব কথা এখন ভেঙ্গে কায নেই; বল্‌বেন, বেড়াতে গিয়েছেন। তবে উইল্ ক'রে কেন? তাতে আমার পরামর্শ এই, যা হয় একটা বল্‌বেন।"

"বল্‌বো আমার মাথা আর মুণ্ড।"

"সে কি মশাই, আপনি অত বড় ব্রোকার (broker), আপনার স্ত্রী-কন্যাকে ভোলাতে পারবেন না? বল্‌বেন, বেড়াতে গেছেন, ফিরতে দেরি হ'তে পারে। বিষয়-আশয়ের ওপর নজর ত রাখ্‌তে হবে? টাকার সুদ ত বার করতে হবে? আপনাকে আপনার কন্যার অছি নিযুক্ত ক'রে গেছেন। আপনি সব করবেন।"

"মশাই, মিথ্যার জালে একবার ঢুক্‌লে যে বেরুনো দায় হবে।"

"এখন ত ঢুকে পড়ুন, মশাই। পরের কথা পরে। অত ভাব্‌লে এটর্ণীগিরি করতে পারতুম না। এখন আসি মশাই, নমস্কার।"

সুরনাথ 'উইল্ করিবার পূর্ব্বেই ফরাসী-সৈন্যভুক্ত

হইয়াছে। এই দলে রমাপতির এক বন্ধু ছিল। কে কে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকেরই নাম সে জানিত। ইহার মুখে সুরনাথের সংবাদ পাইয়া রমাপতি কহিল, "যুদ্ধে যাচ্ছ, টাকা-কড়ি কিছু সঙ্গে নেছ কি ?"

"প্রাণ দিতে যাচ্ছি, টাকার কি দরকার ? আর পাই-ই বা কোথা ?"

"আমি দিচ্ছি। কিন্তু আমার, ভাই, একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হবে। সুরনাথের যেখানে যে হবে, তারা আমার আত্মীয়। মাঝে মাঝে তার খবর দিও। আর এ-দিক্ ও-দিক্ যদি কিছু হয়, তার সঙ্গে চিঠি-পত্তর যদি কিছু থাকে, কি জিনিষ-টিনিস্, আমার কাছে পাঠিও।"

রমাপতি বন্ধুর হাতে এক শত টাকা দিল ও সুরনাথের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করাইল।

রাধানাথ গোপন করিলেও সুরমা সুরনাথের জন্য দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

এমনই ভাবে ৭।৮ মাস কাটিয়া গেল। রমাপতি ভাবিতেছে, ভগবান্ কি নেই ? এত স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি, কোন ফল হচ্ছে না কেন ? কিছু কাল পরে এক দিন তাহার সাগ্রহে প্রসারিত করে পিয়ন একটি ক্ষুদ্র পার্শেল ও একখানি পত্র দিল। রমাপতি সোৎসুকে পার্শেল খুলিয়া দেখিল, একটি লকেট্। পত্র পড়িল—

"প্রিয় রমাপতি, তোমার সেই সুরনাথ আজ অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে পড়েছে। এখনও ঠিক মরে নি। তবে ডাক্তার বলে, এই যে অজ্ঞান হয়েছে, আর জ্ঞান হবে না। তার গলায় এই চেন্-লকেট্ ছিল। তুমি উৎসুক হয়ে আছ ব'লে তাড়াতাড়ি পাঠালুম। অজ্ঞান হবার আগে সে কয়েকবার তোমার নাম করেছিল, রমা—রমা—রমা !"

এই পত্র আসিবার দুই সপ্তাহ পরে আর এক পত্র আসিল, "ওহে রমাপতি, হরিলোট দাও ! তোমার সুরনাথের অখণ্ড পরমায়ু। কিন্তু, ভাই, তোমাকে আগে থাকৃতে ব'লে রাখি। তোমার বন্ধু বেঁচেছে বটে, তবে একেবারে কাযের বার, মরবারই দাখিল। ডাক্তার বলেন, বুকে আঘাত, একটা ঝট্‌কা (যাকে ইংরাজীতে তোমরা শক্ বল, আর আমরা ফরাসীতে বলি শোকে) এলেই মারা যাবে। ফিল্ড্-মার্শ্যাল্ তাকে দেশে পাঠাচ্ছেন।"

রমাপতির কাছে ইংরাজীও যা, ফরাসীও তাই। বুঝিল, একটা কিছু। ব্যাটা মরেও মরে না ! দাঁতে দাঁত পিষিতে পিষিতে চিঠিখানা ভস্মসাৎ করিয়া সঙ্কল্প করিল, এই সুযোগ, নইলে হাত ফস্‌কাবে। রমাপতি দ্রুতগতি রাধিকার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই রাধারাণী কহিলেন, "চুপি চুপি কথা ক'। রমা দু' রাত্রি ঘুমোয় নি। এই একটু ঘুমিয়েছে।"

রমাপতি চুপি চুপি কহিল, "কাকী, আর কত দিন তোমরা তার অপেক্ষা করবে ?"

"কার ?"

"সুরনাথের।"

"না ক'রে করি কি বল, বাছা ! সম্প্রদান করতে ব'সে বিঘ্ন, সে মেয়েকে কে নেবে ?"

রমাপতি হঠাৎ একটু জোরে হাসিয়া ফেলিল। হা-হা-হা—"কাকী হাসালে ! আজকাল আবার সম্প্রদান ! তোমরা রাজি আছ বল্‌তে পারো ? নেবার লোক আছে।"

সহসা সুরমা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কে ? তুমি ?"

রমাপতি নিরুত্তর। সুরমা বলিতে লাগিল, "লজ্জা করে না ? তার আসন অধিকার করতে চাও ? সিংহাসনে—"

উত্তেজনায় সুরমার শরীর, স্বর কাঁপিতেছিল। রমাপতিও ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, "চুপ করলে কেন, রমা ? বল না, সিংহাসনে কি ?"

রমা এই কথায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "শুন্‌বে ? কুকুর !"

রমাপতি কঠোর-স্বরে কহিল, "তুমি কার আশায় সিংহাসন পেতে ব'সে আছ, রমা ? তোমার ঠাকুর ফরাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে কুকুরেরই মতন ধূলায় লুটুচ্ছে।"

"তুমি মিথ্যাবাদী !"

রমাপতি কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "কে ? আমি ? হা-হা-হা—এই দেখ !" বলিয়া সে একটা লকেট্ ও চিঠি সুরমার কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

লকেট্ সুরমার সুপরিচিত। ইহাতে তাহারই চিত্র ছিল। জীবিতে সুরনাথ ইহা কাছ-ছাড়া করে নাই।

তাহার পর পত্র পড়িতে অক্ষর সকল তাহার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। "মা" বলিয়া সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। রাধিকা দ্রুত আসিয়া কন্যার মস্তক কোলে লইয়া বসিলেন। তাহার পর মৃত্যুপতির সঙ্গে অক্লান্ত যুদ্ধ, আশায় নিরাশায় দ্বন্দ্ব।

সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ বহুবিধ ঔষধ সেবন করাইলেন, কিন্তু সুরমা স্থির-ধীর পদক্ষেপে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঔষধ নিঃশেষ করিয়া চিকিৎসক বায়ু ও দৃশ্য পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন, কিন্তু সুরমা গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতেও স্বীকৃত হইল না।

রাধিকা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "চল না, মা! তোমার আতুকেও নিয়ে যাব।"

"আতুর জন্য নয়, মা। আমাকে এখানে অপেক্ষা ক'রে থাকতেই হবে।"

রাধি কা বুঝিলেন, কাহার অপেক্ষা। এ লজ্জার সময় নয়। বলিলেন, "সে কি আর আসবে?"

"আসবে, আসবে! আমাকে না ব'লে সে কোথা যাবে?"

রাধিকা নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিলেন। সুরমা বলিল, "কাঁদ কেন, মা?"

"মা, কত সাধ করেছিলুম, তোমার বে' হবে—"

"তাই ত হবে, মা! নইলে এখনও কেন রয়েছি?"

রাধিকা চকিতে কন্যার মুখ চাহিলেন, এ কি বিকার?

রাধানাথ জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন আছ, মা?"

"ভাল আছি, বাবা! মা, বাবাকে জল খেতে দাও গে, আমি ত আর পারবো না।"

"কেন পারবে না, মা! ভাল হয়ে দেবে।"

সুরমা অতি স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদ মিছে হবে না, বাবা! আমি শীঘ্রই নীরোগ হব।"

রাধানাথের জল খাওয়া শেষ হইলে রাধিকা গলায় অঞ্চল দিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "তোমাকে অনেক জ্বালাতন করেছি। আজ তুমি সব ভুলে গিয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমাকে বেঁচে থেকে যেন সে দিন না দেখতে হয়!"

উভয়ের একই বেদনা। পতি-পত্নীর বিপরীত প্রকৃতি শোকধারে গলিয়া এক হইল।

রাধিকা বলিলেন, "আমি কারুর কষ্ট দেখ্‌তে পারি নি। ভগবান্ আমার ওপর কি এই বজ্রাঘাত করবেন!"

রাধানাথ বলিলেন, "তাঁর ইচ্ছা! কিন্তু, রাধা, আমরা বাঁচব কি নিয়ে? ঐ তেতো-বিষ টাকার কাঁড়ি ঘেঁটে? ভগবান্, এ কি শাস্তি!"

আত্মারাম এখন আর সুরমার সঙ্গ পায় না। রুগ্ন-কক্ষের পাশে একটি সুনিবিড় বকুল-বৃক্ষ আছে। তাহার উপর বসিয়া সারাদিন সুরমার পানে চাহিয়া থাকে। কেবল আহারের সময় সে রুগ্ন-কক্ষে আসিয়া রোগিণীর সন্নিকটে বসিয়া আহার করে। ঐ সময় এক দিন রাধিকা বলিলেন, "আতু, রমা ভাল হবে?"

আত্মারাম বলিল, "ভাল হবে।"

রাধিকা সহর্ষে বলিলেন, "তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক!" কন্যার কল্যাণে তিনি আজ পাখীর প্রতি বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

দিনে দিনে সুরমার শরীর শয্যার সহিত যত মিশাইতে লাগিল, তাহার চোখে এক অপার্থিব আলোক তত ফুটিতে লাগিল। আজ দীর্ঘ আবল্যের পর বিস্ফারিত নয়নে চারিদিক্ চাহিয়া অতি ক্ষীণস্বরে সে বলিল, "আর কত দেরি করবে! আমি যে আর থাক্‌তে পারছি নি। কাকাকে আর কত ফেরাবো!"

আবার আবল্য। কিছুক্ষণ পরে সুরমা বলিল, "মা, আমার চুল বেঁধে দাও। বিয়ের দিন যে কাপড় পরিয়েছিলে, নিয়ে এস, পরিয়ে দাও। আমার সে সিঁদুর-কৌটো কৈ—বাবা যা গড়িয়েছিলেন?"

"কেন, মা?"

"আজ আবার আমার বিয়ে। তিনি আসছেন। দাও, মা, দাও! আর ত আব্দার করবো না।"

"কেন করবে না, মা? তুমি চিরদিন আমার কোল জুড়ে আব্দার কর।"

"না, মা! আর করবো না।"

"কেন, মা! আমি ত কখন তোমাকে কিছু বলি নি।"

"না, মা! তোমাদের কাছে বড় আদরে ছিলুম।"

"তবে যাচ্ছিস্ কেন, মা!"

সুরমা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দাও না, মা, চুল বেঁধে।"

কন্যা কিছুতেই স্থির হয় না দেখিয়া রাধিকা পরিচারিকার সাহায্যে বস্ত্র পরাইলেন এবং ধীরে ধীরে কেশচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। সিঁদূর-কৌটা হাতে লইয়া সুরমা আবার ঝিমাইয়া পড়িল; কিছুক্ষণ পরে চকিত হইয়া বলিল, "বাবা, বাবা, কে এল?"

"কেউ না, মা!"

"হাঁ, বাবা, এসেছে, এসেছে! তুমি যাও, ধ'রে ধ'রে নিয়ে এস। বড় কাহিল! যাও, বাবা, যাও!"

কন্যার অস্থিরতায় রাধানাথ বাহিরে গেলেন—সত্যই সুরনাথ! রাধানাথ এক প্রকার কোলে করিয়া আনিয়া সুরনাথকে কন্যার শয্যার উপর বসাইয়া দিলেন। সুরমাকে দেখিয়া সুরনাথ বুকে হাত দিয়া কিছুক্ষণ মুহ্যমান হইয়া রহিল; পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এ কি, রমা! আমার অপরাধে তোমার দণ্ড কেন? আমি কি এই দেখ্‌তে এলুম!"

সুরমা চকিত হইয়া চোখ চাহিয়া বলিল, "তুমি এসেছ?"

"এসেছি, রমা! তোমাকে না দেখে মরতে পারলুম না। চারিদিকে শিলা-বৃষ্টির মত গোলা পড়েছে—মরি নি কি এই দেখ্‌ব ব'লে? একটু জল।"

রাধিকা তাড়াতাড়ি গরম দুগ্ধ আনিয়া দিলেন। হায় রে মোহ! এখনও আশা তাঁহার বুকে বসিয়া বলিতেছে, সুরনাথ এসেছে, হয় ত রমা বাঁচবে। দুগ্ধপান করিয়া সুরনাথ বলিল, "তোমারই জন্য এসেছি, রমা! তুমি ভাল হয়ে ওঠ—"

সুরমা সন্ধ্যার জ্যোৎস্নার ন্যায় ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "ভাল হব? ঐ দেখ, কাকা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি আমায় সব বলেছেন, তোমার কোন অপরাধ নেই। আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি আর একা থাক্‌তে পারছেন না ব'লে। আজ তুমি নিজের হাতে আমার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দাও।"

সুরনাথ কম্পিত হস্তে মুমূর্ষুর সীমন্ত রঞ্জিত করিল।

সুরমা মৃদুস্বরে বলিল, "মা, বাবা, তোমরা পায়ের ধুলো দাও।"

পদধূলি লইয়া সে বলিল, "আতুকে তোমাদের দিয়ে গেলুম।"

রাধানাথ উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিতে চাপিতে বলিলেন, "আমাদের কাকে দিয়ে যাচ্ছ, মা! তুমি যে বলেছিলে, আমার আশীর্ব্বাদে নীরোগ হবে। সে কি এমনই ক'রে?"

বাহিরে উজ্জ্বল আলোক। পাখী ডাকিতেছে, ফুল গন্ধ বিলাইতেছে। কে বলিবে, এই রমণীয়া প্রকৃতির অন্তরালে শমনের করাল ছায়া লুকাইয়া আছে!

কিছুক্ষণ নিমীলিত নয়নে নীরব থাকিয়া শয্যা হাতড়াইতে হাতড়াইতে সুরমা বলিল, "কৈ তুমি? এগিয়ে এস, আরও এগিয়ে। তোমার মুখ যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। কাকা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তুমি কৈ? আমার হাত ধর! বি—দা—য়—"

সুরনাথ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ও কি! অমন ক'রে চাইছ কেন? চাও, চাও! আমি যে তোমারই জন্য এসেছি! চাও, এই যে হাত ধরেছি। আর চাইবে না? ওঃ—"

সুরনাথ সুরমার মৃতদেহের উপর ঢলিয়া পড়িল।

পরদিন আত্মারামকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

মরণ-আলিঙ্গনে

"মাপ কর, ভাই......মাপ কর......" রহমান ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে।

শঙ্কর বল্‌লে—"চুপ কর, ভাই, চুপ কর, কেঁদে আর কি হবে বল? এতে আমারও ত দোষ আছে, আমি নিজের কর্ম্মফল ভোগ করছি, তুমি নিমিত্ত মাত্র ....."

শঙ্করের কণ্ঠস্বরে অনুতাপ বা সান্ত্বনা বেশ সুস্পষ্ট আকার ধ'রে প্রকাশ পেল না, তা'র কথাগুলা কেমন ছাড়া-ছাড়া ফাঁকা-ফাঁকা।

রহমান কাঁদতে কাঁদতে মাথা নেড়ে বল্‌লে—"আমার এমন করা উচিত হয় নি......হাজার হ'ক, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু!......কিন্তু তুমি যে এত বড় মহৎ, তা' আগে জানতাম না......"

শঙ্কর বল্‌লে, "আমাকে যতটা মহৎ মনে করছ, তা' আমি মোটেই নই। তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, এক-সঙ্গে খেলা ক'রে বড় হয়ে উঠেছি, একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, এখনও এক পাড়াতেই আমাদের বাস; তোমার প্রতি আমার ত কোন বিদ্বেষ থাকতেই পারে না; কোন মুসলমানের প্রতিই আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু যখন আমি শুনলাম, মুসলমানরা কালীবাড়ী ভাঙ্গতে আসছে, তখন আমি আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারি নি; তুমি জান, ঠাকুর-দেবতার প্রতি খুব বেশী বিশ্বাস আর ভক্তি আমার নেই; কিন্তু যে বস্তুকে অনেক লোক শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তার অপমান সহ্য করায় মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়; আমি শুনেছি, হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অনেক মসজেদ অপবিত্র করেছে; আমি যদি তখন ভাল থাকতাম, তা হ'লে আমিও মুসলমানদের সঙ্গে মসজেদ রক্ষার জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতাম। আমি তোমার সঙ্গে আমাদের পাড়ারই আখড়ায় একই ওস্তাদের কাছে লাঠি-খেলা শিখেছিলাম। ওস্তাদের দেওয়া সেই লাঠি কখন কোন কাযে লাগেনি। এখন আমার পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্মবিশ্বাসের অপমান হ'তে যাচ্ছে দেখে সেই লাঠি অবলম্বন ক'রে কালীবাড়ীর সামনে পাহারায় নিযুক্ত হয়েছিলাম। মুসলমানদের আক্রমণ লাঠির চোটে চার-চারবার হটিয়ে যখন আমরা মনে করছিলাম, মুসলমানরা আর আসবে না, তখন পঞ্চম বারে এলে তুমি তাদের দলের নেতা হয়ে। দুই বন্ধুতে অনেক বার মহরমের সময় আপোষে লাঠি খেলেছি, সে দিনও মনে হ'ল, এই লাঠি-খেলা দুই বন্ধুর আপোষেই হবে। কিন্তু তোমার লাঠির চোট আমার লাঠি দিয়ে ঠেকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, তুমি বন্ধুভাবে আমাকে আক্রমণ কর নি। যাই হ'ক, বীরে বীরে অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা হচ্ছিল; হঠাৎ আমার মুখের উপর দিয়ে আগুন জ্ব'লে গেল; তখন বুঝলাম, আমি বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করছি না......"

রহমান আপনার কাপুরুষতার লজ্জায় ও অনুতাপে সন্তপ্ত হয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাতর স্বরে ব'লে উঠল—"থাক্, ভাই, সে কথা; আমাকে আর লজ্জা দিও না ....."

শঙ্কর রহমানের কাতরতা গ্রাহ্য না করেই বলতে লাগল—"আমার মুখে আগুন জ্ব'লে উঠতেই আমি বুঝতে পারলাম, তুমি আমার মুখের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছ!"

রহমান আবার কাতর স্বরে ব'লে উঠল—"মাপ কর, ভাই, আমার কসুর মাপ কর......"

শঙ্কর রহমানের কথা যেন শুনতেই পায় নি, এমনই ভাবে ব'লে চলল—"আমি অনুভব করলাম, আমার দুটো চোখই পুড়ে গেল, সমস্ত মুখখানা চিতায় মুখাগ্নি-করা মড়ার মতন বীভৎস হয়ে উঠল, হয় ত বা এই আমার অন্তিম মুখাগ্নি। তখন তোমার প্রতি আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা'কে বন্ধুত্বের প্রীতি-নাম কিছুতেই দেওয়া যায় না।"

রহমান আবেগভরে ব'লে উঠল—"কিন্তু পরে......

আমার বিচারের সময় তুমি ত বন্ধুত্বের চেয়েও মহৎ ভাবের পরিচয় দিয়েছ।"

এ বার শঙ্কর রহমানের কথার উত্তর দিল—"সেই ভাব হঠাৎ আমার মনে আসে নি...এ রকম অবস্থায় অদৃষ্টের হাতে মানুষ অকস্মাৎ আত্মসমর্পণ ক'রে হিংসাশূন্য হ'তে পারে না। তখন আমার মনে হয়েছিল, তোমায় হাতের কাছে পেলে নখ দিয়ে তোমার দুটো চোখ উপড়ে ছিঁড়ে তোমার মুখের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে দিই।"

রহমান কুণ্ঠিত ও কাতরভাবে বল্‌লে—"কিন্তু—"

শঙ্কর বল্‌তে লাগল—"কিন্তু তখনই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম, আর আমি কিছুই করতে পারিনি। তার পর হাঁসপাতালের বিছানায় শুয়ে চির-অন্ধকারের মধ্যে আমার যখন ধীরে ধীরে জ্ঞানোন্মেষ হ'ল, তখন অনেকখানি শান্তভাবে সমস্ত ব্যাপার তলিয়ে ভাববার অবসর পেলাম। তখন আমার চোখের দৃষ্টি ছিল না, তাই মানসদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল—দেখলাম, সেই আমাদের পাড়ায় আমরা দু'টি বালক ধর্ম্ম ও আচারের পার্থক্য সত্ত্বেও কেমন পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম; তোমার গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া কোঁকড়া চুল আর মিষ্টি হাসি আমাকে তোমার প্রীতির পিয়াসী ক'রে তুলেছিল; আমাদের বাল্য থেকে যৌবনের বন্ধুত্ব-প্রীতির কত কথাই মনের মধ্যে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। তখন এও মনে হ'ল যে, সেই সুদর্শন তুমি কেমন ক'রে আমাকে এমন নির্ম্মমভাবে চিরজীবনের জন্য কুৎসিত বীভৎসদর্শন ক'রে ফেল্‌তে পার্‌লে!"

রহমান কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত স্বরে বল্‌লে—"আমি তখন ভাবিনি যে, তুমি বেঁচে যাবে। এ রকম হয়ে থাকার চেয়ে..."

শঙ্কর রহমানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—"ম'রে যাওয়া ঢের ভাল ছিল। কিন্তু আমি মরি নি! ক্রমে যখন পোড়া মুখ আর অন্ধ চক্ষু নিয়ে ভাল হয়ে উঠলাম, তখন এল তোমার বিচারের পালা! আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমাকে দেখে তোমার হৃৎকম্প হয়েছিল নিশ্চয়ই—তোমার নিজের হাতের এই বীভৎস কীর্ত্তি দেখে আর আমার সাক্ষীতে তোমার দীর্ঘকালের কারাবাস সুনিশ্চিত জেনে। কিন্তু আমি হাঁসপাতাল থেকে ভেবে এসেছিলাম, তোমাকে আজীবন কারারুদ্ধ রেখে অথবা ফাঁসী দিয়েও আমার নষ্ট দৃষ্টি আর মুখশ্রী ত ফিরে পাব না!"

রহমান শঙ্করের এই কথা শুনতে শুনতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে বললে—"তোমার আশ্চর্য্য মহৎ চরিত্র! তোমার সাক্ষীতেই আমি বেঁচে গেলাম। তুমি যখন বললে,—তোমার চোখে অ্যাসিড পড়েছিল, তাই কে তোমায় অ্যাসিড দিয়েছিল, তা' তুমি দেখতে পাও নি, তখন আমার মন অনুতাপে, লজ্জায় ও কৃতজ্ঞতায় এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, আর একটু হ'লে আমি নিজের মুখেই দোষ কবুল ক'রে ফেলতাম। কিন্তু আমি আমার বিহ্বল মনের চিন্তা গুছিয়ে নিয়ে কিছু বলতে পার্‌বার আগেই ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে প্রমাণ অভাবে মুক্তি দিয়ে দিলেন। কিন্তু তোমার মহত্ত্বের দণ্ড বিচারকের দণ্ডের চেয়েও দুঃসহ হয়ে উঠেছে, আমি যে তোমার বন্ধুত্বের কৃতজ্ঞতা বরদাস্ত করতে পার্‌ছি নে!"

রহমান কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল।

শঙ্কর বললে,—"কেবলমাত্র বন্ধুত্বের টানেই আমি তোমাকে রেহাই দিই নি। তুমি সুন্দর সুপুরুষ; তোমার এই রূপে ভুলিয়ে তুমি একটি হিন্দুর বিধবাকে কুলত্যাগিনী ক'রে নিকা করেছ। তুমি জেল থেকে কুশ্রী হয়ে ফিরে এলে তোমার সেই নব-পরিণীতা প্রণয়িনী মনে ক্লেশ পাবে, এই চিন্তাও আমার মনে প্রবল হয়ে তোমাকে অব্যাহতি দিতে প্রবর্ত্তিত করেছিল।"

রহমান তখনও অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ক্রন্দন সংবরণ করতে পারেনি।

শঙ্কর বল্‌তে লাগ্‌ল—"যা হবার, তা হয়ে গেছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। আমি ত অন্ধ অকর্ম্মণ্য হয়ে রইলাম, জড়পিণ্ডের মত ঘরের কোণে প'ড়ে থাক্‌ব, আর কখনও তোমার চোখের সাম্‌নে পড়্‌বার সম্ভাবনা রইল না। তুমিও আমার কথা একেবারে ভুলে যেও......"

রহমান আবেগ-ভরা স্বরে ব'লে উঠল, "অসম্ভব! অসম্ভব! তোমার মহত্ত্ব আমার মনে আমরণ জাগরূক থাক্‌বে!"

শঙ্কর শুষ্ক স্বরে জোর দিয়ে বল্‌লে—"না। মিথ্যা ভাবুকতা ক'রে নিজের জীবনটাকে বিরস ক'রে রেখ না। আজ তুমি আমাকে একবার শেষ আলিঙ্গন ক'রে চিরবিদায় দিয়ে যাও......"

রূপকথার রাজপুত্তুর

[বসুমতী প্রেস]　　শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শঙ্করের কুৎসিত পোড়া মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তা'কে আলিঙ্গন কর্‌তে হবে ভেবে রহমানের দেহ ও মন ভয়ে ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে কেঁপে উঠল। শঙ্কর এতক্ষণ মুখের উপরে একটা পাতলা রঙীন রেশমের রুমাল ঢাকা দিয়ে কথা বল্‌ছিল, কিন্তু রহমান আদালতে একবার শঙ্করের মুখের যে ভয়ানক ছবি দেখেছিল, তা'র ছাপ সে কিছুতেই নিজের মনের উপর থেকে মুছে ফেল্‌তে পারেনি।

রহমানকে নিরুত্তর দেখে শঙ্কর বল্‌লে—"এখন ত রাত্রি হয়ে গেছে:.....ঘরে আলো জ্বল্‌ছে বোধ হয়......আলোর আভাও আমি আর অনুভব কর্‌তে পারি নে......তুমি আলোটা নিবিয়ে দাও......তা হ'লে আমার ভীষণ মূর্ত্তি তোমার চোখে পড়বে না, আমার কাছে আস্‌তে তোমার ঘৃণা বা ভয় হবে না......"

শঙ্করের কথা শুনে শঙ্করের মূর্ত্তির কদর্য্যতা আবার রহমানের মনে প'ড়ে গেল; সে আলো নিবিয়ে দিতে পার্‌লে না; ভূতের মত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি শঙ্করের সঙ্গে এক ঘরে অন্ধকারে থাক্‌তে তা'র গা ছম্‌ছম্‌ কর্‌ছিল, তা'তে আবার শঙ্কর তা'কে আলিঙ্গন কর্‌তে আহ্বান কর্‌ছে!

শঙ্কর যদিও আলোর অস্তিত্ব অনুভব কর্‌তে পারছিল না, তথাপি আলোক-নির্ব্বাণের কোন শব্দ শুন্‌তে না পেয়ে সে আবার বল্‌লে—"আলোটা নিবিয়েই দাও, ভাই। আমি আর আগেকার মত দর্শনযোগ্য নই, আমার চেহারা ভয়ঙ্কর রকমে বদ্‌লে গেছে। আমার সঙ্গে কোলাকুলি কর্‌তে তোমার কি ঘৃণা বা ভয় হচ্ছে?"

রহমান শুষ্ক কণ্ঠে বল্‌লে—"না না, এই ত আমি তোমার কাছে এতক্ষণ ব'সে আছি।"

শঙ্কর মৃদু স্বরে বল্‌লে—"আচ্ছা, আর একটু আমার কাছে স'রে এস .....তোমার হাতটা আমার হাতে দাও... হাঁ, সেই আমার বন্ধুর হাত!"

শঙ্কর এই কথা ব'লে রহমানের হাত একটু জোরে চেপে ধর্‌লে।

রহমান শঙ্করের হাতের চাপে তা'র বন্ধুত্বের প্রগাঢ় প্রীতি অনুভব ক'রে অনুতপ্ত স্বরে বল্‌লে—"আমি এই হাত দিয়ে আমার বন্ধু'কে চিরজীবনের জন্য বিশ্রী অন্ধ ক'রে দিয়েছি!"

শঙ্কর দৃঢ়মুষ্টিতে রহমানের হাত চেপে ধ'রে তা'কে নিজের দিকে আকর্ষণ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—"তোমার হাতের এই আঘাত আমার প্রাণের বন্ধুত্ব-প্রীতির পরিমাণ প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেছে! .. তোমার হাত কাঁপছে! .. আমরা—অন্ধরা চোখে না দেখেও স্পর্শ দিয়ে অনেক ভাব অনুভব কর্‌তে পারি।.....তোমার ভয় কর্‌ছে, বন্ধু? তা হ'লে আলোটা আমিই নিবিয়ে দিই, আলোটা আমার হাতের কাছেই আছে......"

শঙ্কর হাত বাড়িয়ে কেরোসিন-ল্যাম্পের প্যাঁচ ঘুরিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল। ঘর ঘন অন্ধকারে ভ'রে গেল।

শঙ্করের মুষ্টির মধ্যে রহমানের হাত আবার কেঁপে উঠল।

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। শঙ্কর ধীর স্বরে বল্‌লে—"ভয় নেই, বন্ধু, ভয় নেই, আমি তোমাকে বেশীক্ষণ ধ'রে রাখব না; তুমি আমাকে একবার আলিঙ্গন ক'রে চির-বিদায় দিয়ে যাও। ......ঘরটা বোধ হয়, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে, ...এখনও আমার অন্ধের অনুভবশক্তি সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি, কিছু দিন সময় লাগবে .... আমি যেন ছোটো শিশুর মত পৃথিবীর সঙ্গে নূতন পরিচয় স্থাপন করেছি .."

রহমানকে নীরব থাক্‌তে দেখে শঙ্কর স্বপ্নাবিষ্টের মত বল্‌তে লাগল—"তুমি যে দয়া ক'রে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছ, তা'তে যে কি সুখী হয়েছি, তা ব'লে বোঝাতে পার্‌ব না। তোমায় যখন ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তখন ভয় হয়েছিল, তুমি হয় ত আস্‌বে না। কিন্তু তোমাকে এক-বার বুকে চেপে ধর্‌বার জন্যে আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিল ...আমাদের এত কালের বন্ধুত্ব কি এত সহজে ভোল্‌বার! কিন্তু তোমাকে ডেকে এনে আমি ভাল করি নি......"

রহমান বিব্রত হয়ে প্রতিবাদের স্বরে ক্ষীণভাবে বল্‌লে, —"না, না... .."

অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মুখের উপর দিয়ে হাসি খেলে গেল। সে বল্‌লে—"অস্বীকার করা অনর্থক। আমার মুখ যে আর মানুষের মুখ নেই, তা আমি বুঝতে পারি। আমার বন্ধু তুমি, তুমিও আমার এই বিভী-ষিকা-মূর্ত্তি দেখে ভয়ে কাঁপছ! আমার এই বিভীষিকা-মূর্ত্তি ভূতের ভয়ের মত তোমাকে অনেক দিন পেয়ে থেকে পীড়া দেবে......এই সম্ভাবনাতেই আমার কষ্ট

হচ্ছে। · যাক্, আমার কথা আর না তোলাই ভাল।... আমার কাছে অন্ধকারে ব'সে থাকার দুঃখ চট্‌পট্‌ চুকিয়ে ফেল ..."

শঙ্কর রহমানের হাত ধ'রে নিজের দিকে আকর্ষণ কর্‌লে।

রহমান আবার কেঁপে উঠল।

শঙ্কর ব'লে উঠল—"ভয়ে কাঁপছ, দোস্ত?"

শঙ্করের কথার মধ্যে ঈষৎ বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়ে গেল।

রহমান তাড়াতাড়ি বল্‌লে—"না, না, আজকে আমার কেমন একটু জ্বরভাব হয়েছে ..."

শঙ্কর রহমানকে হাত ধ'রে এক টান দিয়ে নিজের বুকের উপরে এনে ফেল্‌লে। রহমানের সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। কিন্তু সে নিজের কৃত কর্ম্মের গ্লানিতে শঙ্করের প্রতি ঘৃণা ও ভয়ের ভাব ডুবিয়ে দিয়ে তার মুক্ত হাত দিয়ে শঙ্করকে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতির সহিত বেষ্টন ক'রে ধর্‌লে। কিন্তু যে-ই তা'র মনে হ'ল যে, শঙ্করের পোড়ামুখ তার মুখের অত্যন্ত নিকটে এসেছে, অমনই সে ভয়ে ও ঘৃণায় আবার কম্পিত হয়ে উঠল।

শঙ্কর রহমানকে খুব জোরে জড়িয়ে ধর্‌লে।

রহমান বলিষ্ঠ হ'লেও শঙ্করের আলিঙ্গনে নিপীড়িত হয়ে শ্বাসরুদ্ধভাবে বল্‌লে—"দোস্ত, হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে যে! এ যেন ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গন!"

শঙ্কর বল্‌লে—"দেখছ ত আমি তোমার চেয়ে ঢের বলবান্! সে দিন হঠাৎ তুমি বেকায়দায় অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে আমাকে কাবু করেছিলে!"

রহমান শঙ্করের আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌লে, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল।

শঙ্কর বিদ্রূপ-ভরা স্বরে বল্‌লে—"তোমাকে একবার বুকের কাছে যখন পেয়েছি, দোস্ত, তখন তোমাকে কি সহজেই ছেড়ে দেব?"

শঙ্কর রহমানের যে হাতটা আগে থাক্‌তে চেপে ধ'রেছিল, সেটাকে বগল-দাবা ক'রে চেপে ধ'রে তার অপর হাতটা সেই হাত দিয়ে আবার চেপে ধর্‌লে এবং তার অপর মুক্তহস্ত পকেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে একটা কাচের শিশি বা'র ক'রে আন্‌লে; শিশির কাচের ছিপি দাঁত দিয়ে খুলে ছিপিটা মাটীতে ফেলে দিলে। কাচের ছিপিটা মাটীতে ঠং ক'রে প'ড়ে দু'খণ্ড হয়ে গেল। শিশি খোলার ও ছিপি ভাঙার শব্দ শুনে রহমান চম্‌কে উঠল এবং চঞ্চল হয়ে শঙ্করের বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগল।

শঙ্কর প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে বল্‌লে—"চম্‌কো না, দোস্ত, ছট্‌ফট্‌ ক'র না। শিশিতে অন্য কিছু নেই, তোমার সেই সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডই একটুখানি, বন্ধুত্বের উপহার ব'লে সংগ্রহ ক'রে রেখেছি! বাল্য-বন্ধু আমরা, দু' জনের চেহারা হুবহু এক রকম হয়ে যাবে!...কাঁপছ?...ভয় কি? অল্প খানিকক্ষণ জ্বালা করবে! তা'র পর মুখের এক পর্দ্দা চামড়া উঠে গেলে আর চোখ দুটো গ'লে গেলে. তোমার আমার সমান দশা হয়ে যাবে!..."

রহমান ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে শঙ্করকে মিনতি ক'রে কি বল্‌তে গেল।

রহমানের কণ্ঠ থেকে অস্ফুট স্বর শুন্‌তে পেয়েই শঙ্কর দৃঢ়স্বরে হুকুম কর্‌লে—"খবরদার! মুখ বুজে থাক। তোমাকে আমি একেবারে মেরে ফেল্‌তে চাই নে! মৃত্যু হ'লে তুমি ত বেঁচে যাবে! এত সহজেই তোমায় অব্যাহতি দেব মনে করেছ!"

শঙ্কর রহমানকে বাঁ-হাতের কনুইয়ের ভাঁজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে চেপে ধ'রে বাঁ-হাতের আঙ্গুল দিয়ে তার মুখ চেপে ধর্‌লে এবং ডান-হাত দিয়ে শিশি ধ'রে রহমানের কপালে, চোখে ও গালের উপর আস্তে আস্তে অ্যাসিড ঢেলে দিল। সেই অ্যাসিডের ধারা গড়িয়ে এসে তার নিজের হাতেও লাগল। তথাপি সে মুক্তি-প্রয়াসী রহমানকে চেপে ধ'রে রেখে স্থির স্বরে বল্‌লে—"আর একটু সবুর কর। বড় জ্বালা কর্‌ছে, না? অ্যাসিড গায়ে পড়লে এই রকম একটু জ্বালা করে!...পশুর মত আমাকে কামড়াচ্ছ? তা'তে আর আমার এমন বেশী কি লাগবে, বন্ধু? তুমি কি মনে করেছ, তোমাকে জখম ক'রে জেল খাটবার জন্যে আমি বেঁচে থাকব?"

শঙ্কর এই কথা বল্‌তে বল্‌তেই শিশির অবশিষ্ট অ্যাসিড মুখ হাঁ ক'রে নিজের গলায় ঢেলে দিলে।

যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায় রহমান প্রাণপণ বলে শঙ্করের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তেই শঙ্করের প্রাণহীন

দেহের ভারে সে চৌকীর উপর থেকে গড়িয়ে মাটীতে প'ড়ে গেল এবং দারুণ যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। তখন রহমানের মুখখানা সম্ভ ছাল-ছাড়ানো রক্তাক্ত এক-ডেলা মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে!

রহমানের যখন চেতনা ফিরে এল, তখন সকাল। সে অনুভব কর্‌লে, শঙ্করের প্রাণহীন আড়ষ্ট দেহ তাকে তখনও মরণ-আলিঙ্গনে চেপে ধ'রে প'ড়ে আছে! সে নিজেকে মড়ার কঠিন আলিঙ্গন থেকে মুক্ত কর্‌বার অনেক চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু মড়ার বাহু-বন্ধন ছাড়াতে না পেরে ভয়ে সে আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

বিনা পয়সার ভোগ

"সাহেব" বিবি খাচ্ছে খানা—পান কর্‌ছে সুখে
তাঁ'দের কাছে মূল্য চাহ, ভয় নাইক বুকে?

পাত্র ভ'রে আচ্ছা ক'রে ঢাল আর এক ডোজ—
আমরা করি নিত্য এমন বিনা পয়সার ভোজ।

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতৃঘাতী

তক্ষশিলার বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ধনদাসের মর্ম্মরময় প্রাসাদের একটি বিলাসকক্ষে, বাসন্তী পূর্ণিমার নির্ম্মল চন্দ্রালোকিত রজনীতে ধনদাসের একমাত্র পুত্র রত্নদাস বৈশালীর যুবরাজকে আজ একটি প্রীতিভোজ দিতেছেন।

স্ফটিক-নির্ম্মিত আলোকাধারের মধ্যে গন্ধদীপ জ্বলিতেছে। কক্ষতলে মহার্ঘ গালিচা আস্তৃত হইয়াছে। তক্ষশিলার সাত জন প্রধানা নর্ত্তকী—রূপজীবিনী তথায় বসিয়া আছে।

বিলাসিনীদিগের বরাঙ্গে মণিময় উজ্জ্বল আভরণ, কিন্তু তাহাদের নয়নজ্যোতির নিকট উহারা নিষ্প্রভ। সুন্দরীদিগের প্রত্যেকেরই নয়নে তীব্র বাসনার মাদির স্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের অঙ্গভঙ্গী, দৃষ্টি, ইঙ্গিত ও বাক্যালাপে যেন স্বৈরাচার, বিষণ্ণতা ও অবজ্ঞা দেদীপ্যমান।

তাহাদের এক জনের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল, যেন সে বলিতেছে, "আমার রূপ দেখিয়া মুনিরও মন টলিয়া যায়।"

আর এক জন যেন বলিতেছে, "আমি রাত-দিন ভালবাসার স্বপ্নে বিভোর হইয়া মাতালের মত পড়িয়া থাকিতে ভালবাসি।"

আর এক জন এই কার্য্যে নূতন ব্রতী। সে যেন বলিতেছিল, "মাঝে মাঝে অনুশোচনায় আমার হৃদয় দগ্ধ হয়; কিন্তু আমি তাহাকে এতই ভালবাসি যে, তাহার জন্য নরকযন্ত্রণাও আমার কাছে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।"

অপরা বিলাসিনী চীনদেশীয় ফেনিলোচ্ছল মদিরা-পরিপূর্ণ একটি পেয়ালা তাহার বিম্বাধরপ্রান্তে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি চাই আমোদ। প্রতিদিন সকালবেলা উঠিয়াই পৃথিবীটাকে নিত্য নূতন স্বর্গ বলিয়া আমার মনে হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্য্যন্ত আমি সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িয়া থাকি।"

রত্নদাসের পার্শ্বে বসিয়া এক জন যুবতী বার বার শ্রেষ্ঠিপুত্রের মুখের দিকে লালসা-দীপ্ত ভাবময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল। সে কহিল, "আমার প্রণয়পাত্র যদি আমাকে ছাড়িয়া অন্য রমণীর ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে ছোরা মারিয়া খুন করিতেও আমার এতটুকু কষ্ট বোধ হয় না।" সে মুখে হাসিতেছিল বটে, কিন্তু মানসিক উত্তেজনাবশে সে একটি সুন্দর গোলাপফুলের তোড়া নখরাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফুলের দলগুলি দুই করে নিষ্পিষ্ট করিতেছিল।

ষষ্ঠ সুন্দরী যুবরাজের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া ছিল। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে রাজা হচ্ছেন, যুবরাজ?" রমণীর দন্তপংক্তিতে নরহন্ত্রীর শোণিতোন্মাদনা; তাহার নয়নে বাসনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

সপ্তম তরুণী লীলাচ্ছলে রত্নদাসের বুকে একটি ফুলের তোড়া ছুড়িয়া মারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ও বুড়ো বাপটি কবে খস্‌ছেন বল ত?" এই রমণী সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পা দিয়াছে। সে সরলা কিন্তু সর্ব্ববিধ সততা, শীলতা ও পুণ্যকার্য্যে অনাস্থাবতী।

রত্নদাস হাসিয়া উত্তর দিল, "যদি পৃথিবীতে অমর পিতা কাহারও থাকে, দুর্ভাগ্যক্রমে সে আমার।"

তরুণীরা ও যুবরাজ রত্নদাসের উত্তর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। তখন তাহাদের মস্তিষ্কে সুরার মাদকতা গোলাপী আমেজ দিতেছিল মাত্র, ভাল করিয়া জমে নাই। তাই দীপের আলো, মদিরার বাষ্প, ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য, রমণীর রূপ এ সকল সত্ত্বেও তাহাদিগের হৃদয়ের জন্মগত সংস্কারগুলি তখনও পর্য্যন্ত একবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই বিলাসকক্ষের কুসুমগুলি ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল, বিলাসী ও বিলাসিনীদিগের নয়ন বারুণী-রাগে অরুণিত হইয়া উঠিল। আমোদ ও নেশা দুই-ই যখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে, সেই সময় এক জন শুভ্রকেশ

ভৃত্য কম্পিতপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রত্নদাসের দিকে চাহিয়া নিবেদন করিল, "অন্নদাতা! আপনার পিতা মৃতপ্রায়; আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন।" রত্নদাস উঠিয়া দাঁড়াইল ও অতিথিগণের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ এই যে, "এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটে না। অপরিহার্য্য কারণে আমোদে বাধা পড়িল।"

মৃত্যু রূপজীবীদিগের মতই খামখেয়ালী; কিন্তু তাহাদিগের মত অনৃতের ভজনা করে না—সে সত্যবাদী। মৃত্যু কখনও মানুষকে প্রতারিত করে না।

রজনী ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন। বৃদ্ধ ভৃত্য দীপ হস্তে অগ্রে অগ্রে রত্নদাসকে পথ দেখাইয়া চলিল। নৈশ অন্ধকার, প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, বিপথগত ব্যসনাসক্ত রত্নদাসের মনে ঈষৎ অনুশোচনা জাগাইয়া তুলিল। সে একবার তাহার বিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন ঈষৎ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল।

রত্নদাসের পিতা শ্রেষ্ঠী ধনদাসের বয়স এখন পঁচাশী বৎসর। তিনি সারা জীবন ব্যবসায়ের গোলকধাঁধায় কাটাইয়াছেন; বহু দেশবিদেশ পর্য্যটন করিয়া প্রভূত ধনরত্ন ও ধনরত্নাদির অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু অর্থ অথবা অভিজ্ঞতা এতদুভয়ের কোনটিই এখন তাঁহার কাযে আসিতেছে না। এক ছড়া প্রকাণ্ড গজমতির মালার তুলনায় একটি দাঁতের আদর বেশী; রাশীকৃত অভিজ্ঞতার অপেক্ষা একটুখানি শক্তির প্রয়োজনীয়তা অধিক। বৃদ্ধ মাঝে মাঝে তাঁহার দন্তহীন পেশী বাহির করিয়া এই কথা বলিতেন, আর হো হো করিয়া হাসিতেন। ধনদাস রত্নদাসকে যেমন ভালবাসিতেন, কোনও পিতা পুত্রকে তদপেক্ষা বেশী ভালবাসিতে পারেন না। রত্নদাস যথেষ্ট অর্থ অপব্যয় করিত। বৃদ্ধ বলিতেন, "ছেলেমানুষ বুঝে না, বড় হ'লেই বুঝবে, সব সেরে যাবে।" প্রবীণদিগের মধ্যে শুধু ধনদাসই অন্য কোন লোকের যৌবন দেখিয়া কিছুমাত্র ঈর্ষ্যান্বিত হইতেন না। পুত্রের যৌবনসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতায় বৃদ্ধ ধনদাস কিছুমাত্র রাগ করিতেন না, বরং মনে মনে সন্তুষ্ট হইতেন। এরূপ অপত্যস্নেহও জগতে বিরল। ধনদাস ৬০ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রত্নদাসই ধনদাসের এই পরিণয়ের প্রথম ও শেষ ফল। রত্নদাসের বয়স যখন মাত্র ৫ বৎসর, সেই সময় ধনদাস বিপত্নীক হইলেন। পত্নীবিয়োগের দিন হইতেই ধনদাস সংসারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এক প্রকার বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কাহারও সহিত দেখাশুনা করিতেন না; রাত্রি-দিন নিজের মহলেই থাকিতেন। রত্নদাসেরও পিতার সহিত দেখাশুনা করিতে হইলে পূর্ব্বে তাঁহার নিকট খবর পাঠাইতে হইত। তবে রত্নদাসের পিতার সহিত সাক্ষাৎকারের বিশেষ প্রয়োজনই হইত না।

রত্নদাস তাহার পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অপরাধী যেমন ভয়ে কাঁপিতে থাকে, রত্নদাসও সেইরূপ কাঁপিতে লাগিল। ধনদাসের কক্ষে একটিমাত্র ক্ষীণ দীপ জ্বলিতেছিল। তাঁহার দেহ জরা ও রোগে শীর্ণ। তাঁহার শরীর আগাগোড়া একখানি সাদা চাদরে ঢাকা, কেবল মুখখানি বাহিরে ছিল। দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন একটি রক্তমাংসহীন নরকঙ্কাল শয্যার উপর চাদর ঢাকা পড়িয়া আছে।

রত্নদাসের গলদেশে তখনও সুন্দরী নারীর প্রদত্ত উপহার পুষ্পহার দোদুল্যমান। তাহার পরিচ্ছদে ও গাত্রে তখনও উৎসবের আতর-গোলাপের সৌরভ ছুটিতেছে। তাহার মুখ হইতে তখনও সুরা-সৌরভ বাহির হইতেছে। এইভাবে মরণোন্মুখ পিতার সম্মুখীন হইতে রত্নদাসের বিবেক বৃশ্চিক-দংশন করিতে লাগিল। সে অতিশয় লজ্জিত হইল। বৃদ্ধ ধনদাস তাঁহার পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমোদ করিতেছিলে?" এই সময়ে রমণীর কোমল কণ্ঠে গীত গানের ক্ষীণ তান ও এস্রাজের মধুর ঝঙ্কার সেই কক্ষে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। নেপথ্য হইতে প্রদত্ত ধনদাসের প্রশ্নের এই সুস্পষ্ট পাশবিক উত্তর রত্নদাস শুনিয়াও যেন শুনিল না।

স্নেহার্দ্র স্বরে ধনদাস কহিলেন, "পুত্র! আমি তোমায় দোষ দিতেছি না।"

পিতার এই করুণ স্বর পুত্রের বক্ষে তীক্ষ্ণ শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইল। রত্নদাস তাহার পিতার স্নেহের এই সূচীভেদ্য যন্ত্রণা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিল না।

পুত্র কহিল, "পিতা, আমার মন যে কি বিষম অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না।"

ক্ষীণ কণ্ঠে মরণোন্মুখ বৃদ্ধ কহিলেন, "আমি তাহা জানি,

পুত্র! আমি জন্মেও তোমার উপর এমন কোন নির্দ্দয় ব্যবহার করি নাই, যাহাতে তুমি আমার মৃত্যু কামনা করিতে পার।"

রত্নদাস কহিল, "আজ যদি আমার পরমায়ুর কিয়দংশ দিয়াও আপনাকে বাঁচাইতে পারিতাম, আমি তাহাতেও প্রস্তুত ছিলাম।" রত্নদাস মনে মনে হাসিল ও ভাবিল, "এক জনকে পরমায়ু প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি করাও যাহা, এক রাত্রির আলাপে এক জন গণিকাকে সসাগরা পৃথিবী দান করার প্রতিশ্রুতিও অনেকটা সেই প্রকার।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, পুত্র! জানি বলিয়াই আমি তোমার উপর এতটা নির্ভর করিতে পারিতেছি। সেই জন্য আমি সময় থাকিতে তোমাকে ডাকাইয়াছি। শুন রত্নদাস! আমি বাঁচিব। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আমার জীবনের জন্য তোমার পরমায়ু হইতে একটি দিনও ঋণ লওয়ার প্রয়োজন হইবে না।"

ধনদাস ভাবিল, পিতা বিকারের ঘোরে ভুল বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর অধিক বিলম্ব নাই। সে কহিল, "হাঁ পিতা, আপনি নিশ্চয় বাঁচিবেন। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন আপনি আমার স্মৃতিতে চির-জাগরূক থাকিবেন। লৌকিক জগতের নিকট মৃত হইলেও আপনি আমার নিকট জীবিতই থাকিবেন।"

বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "না বৎস! তুমি আমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না। আমি সেরূপ ভাবে জীবিত থাকার কথা বলিতেছি না। আমি সত্য সত্যই জীবিত থাকিব।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার লুপ্তপ্রায় শক্তির যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেই সবটুকুর সাহায্য লইয়া অতি কষ্টে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন ও করুণ স্বরে কহিলেন, "শুন, পুত্র! তুমি মদ্য প্রভৃতির উপর আসক্তি পরিত্যাগ করিতে যেমন প্রস্তুত, আমিও মরণের জন্য সেইরূপ প্রস্তুত।"

রত্নদাস ভাবিল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, বৃদ্ধ! সম্ভব হইলে এখনও তুমি শত সহস্র অথবা তদপেক্ষাও অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে প্রস্তুত আছ, তোমার এ কথা আমি খুব বিশ্বাস করি। সে প্রকাশ্যে কহিল, "আপনার কথা সত্য, পিতা! কিন্তু ভগবানের বিধান রহিত করা কাহার সাধ্য?"

ক্রুদ্ধস্বরে বৃদ্ধ কহিলেন, "ভগবান্ কে? আমিই ভগবান্।"

রত্নদাস কহিল, "ছিঃ পিতা! আপনি মরিতে বসিয়াছেন। ওরূপ পাপকথা মুখে আনিবেন না। তাহা হইলে অন্তিমে আপনার সদ্গতি হইবে না।"

ক্রোধে বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি পরুষস্বরে কহিলেন, "চুপ কর, পুত্র! আমি যাহা বলি, মনোযোগের সহিত শুন।"

রত্নদাস চুপ করিয়া রহিল। কক্ষমধ্যে ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। মুক্ত বাতায়নপথে বাসন্তী সমীরণে হিল্লোলিত হইয়া রমণীকণ্ঠের মধুর গীতধ্বনি ও এস্রাজের করুণ সুর ক্ষীণ উষার আলোকের মত ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। মরণোন্মুখ বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিলেন।

তিনি পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন,"তুমি আজ রাত্রিতে যে এই গান-বাজনা ও উৎসবের আয়োজন করিয়াছ, সুন্দরী ও যুবতীদিগকে আমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছ, প্রচুর আমোদের আয়োজন করিয়াছ, এই জন্য আমি আন্তরিক প্রীতি লাভ করিয়াছি। কারণ, আজই রাত্রিতে আমি আমার এই জরাগ্রস্ত পুরাতন জীবন ত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিব। বুঝিলে, রত্নদাস?"

রত্নদাস মনে করিল, অবস্থা সঙ্গীন! বিকার একবারে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ কহিলেন, "বিস্মিত হইও না, রত্নদাস! এই নব-জীবনলাভের উপায় আমার হাতের মধ্যে। যাও, এই চাবি লও, আমার শিয়রের ঐ আলমারীট খুল।"

রত্নদাস তাহাই করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, "দক্ষিণ দিকের কোণে একটি লুক্কায়িত টিপকল আছে, সেইটি টিপ। একটি দেরাজ বাহির হইবে। সেই দেরাজের মধ্যে একটি স্ফটিকের শিশি আছে। শিশিটি বাহির করিয়া লইয়া আইস।"

রত্নদাস যথাযথ পিতার আদেশ পালন করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, "আমি ২০বৎসর ধরিয়া হরিদ্বারে এক জন সাধুর সেবা করিয়া এই জিনিষটি পাইয়াছি।" এই সময়ে বৃদ্ধ যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলেন ও তাঁহার সমগ্র শক্তি সমবেত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এই শিশিতে যে ঔষধটি আছে দেখিতেছ, আমার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া

যাইলেই তুমি এই ঔষধে একখানি পরিষ্কার নেকড়া ভিজাইয়া লইয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া দিবে। তাহা হইলেই আমি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিব।"

রত্নদাস কহিল, "ঔষধ অতি অল্পই দেখিতেছি। সমস্ত গাত্রে লেপিতে কুলাইবে কি ?"

যদিও ধনদাসের বাক্‌শক্তি সেই মাত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি তাঁহার দর্শন, শ্রবণ ও বোধশক্তি তখনও পর্য্যন্ত হারান নাই। সেই একটিমাত্র কথায় ধনদাস তাঁহার বিশ্বাসঘাতক পুত্রের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। নিদারুণ নৈরাশ্যে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি রত্নদাসের প্রতি এমন রোষ-কষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, বজ্রানলেও ততটা ভয়ঙ্করী শক্তি নাই। নিমেষে বৃদ্ধের প্রাণবায়ুটুকু বাহির হইয়া গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনের শেষ ভ্রম, সেই একটিমাত্র ভ্রমও অন্তর্হিত হইল। বৃদ্ধের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পুত্রের হৃদয় দেবতার মন্দিরের ন্যায় শুচি, তিনি দেখিতে পাইলেন যে,তাহা পূতিগন্ধময় নরক অপেক্ষাও ন্যক্কার-জনক ও ঘৃণ্য। সেই জন্য মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘৃণায় ও রোষে তাঁহার মস্তকের কেশগুলি কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তাঁহার নির্নিমেষ নয়নের তারাদ্বয় যেন ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল ও তাঁহার পুত্রের শিরে অজস্র অভিশাপ বর্ষণ করিতেছিল।

রত্নদাস ভাবিল, "হাঁ! এইবার বৃদ্ধ নিশ্চয়ই মরিয়াছে।"

মাতাল যেমন আকণ্ঠ মদ্য পান করে ও মাঝে মাঝে বোতল আলোর কাছে ধরিয়া, বোতলে কতটা অবশিষ্ট রহিল, তাহাই দেখে, রত্নদাসও সেইরূপ শিশিটা আলোর নিকট ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মৃত পিতার মুখের উপর দীপের ক্ষীণ আলোক পড়িয়াছিল। শবের নিষ্প্রভ চক্ষুর্দ্বয় একভাবে ও একই দিকে নিবদ্ধ ছিল। রত্নদাস সেই চক্ষু দুইটি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি যাইয়া সেই চক্ষু দুইটির পাতা আঙ্গুল দিয়া নামাইয়া বুজাইয়া দিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চিন্তাকুলিতভাবে তাহার মৃত পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মরচে-ধরা পুরাতন স্প্রীং খুলিয়া গেলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ একটি শব্দ শুনিয়া রত্নদাস চমকিয়া উঠিল। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার হাত হইতে ঔষধের শিশিটি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার ললাট ও কপোল-দেশ হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই কক্ষে দেয়ালের গায়ে ঝুলান একটি সুন্দর বাজা ঘড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া, রং-করা কাঠের একটি কুক্কুটের মূর্ত্তি তিন বার ডাক ছাড়িল। ইহা আর কিছুই নহে, প্রভাতে গৃহস্বামীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবার জন্য ঘটিকা-শিল্পীর উদ্ভাবিত একটি কৌশলমাত্র। মুক্ত বাতায়ন-পথে উষার প্রথম আলোকরশ্মি আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। রত্নদাস পূর্ণ ছয় ঘণ্টা চিন্তামগ্নভাবে কাটাইয়াছে। এই পুরাতন জড় ঘটিকাটির কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যতদূর, রত্নদাসের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাহার লক্ষ ভাগের এক ভাগও নহে। কাঠ, রং, দড়ি ও চাকায় গড়া এই যন্ত্রটির মধ্যে যে প্রাণ আছে, কৈ, রত্নদাসের রক্ত-মাংসে গঠিত দেহের মধ্যে ত সেটুকু প্রাণ নাই! রত্নদাস ধীরে ধীরে সেই ঔষধপূর্ণ স্ফটিকের শিশিটি আলমারীর মধ্যে অতি যত্নে তুলিয়া রাখিয়া দিল। এই সময়ে রত্নদাসের বিলাস-কক্ষের দিক হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর, রুদ্ধ হাসির রোল, নরনারীর সন্তর্পণ পাদবিক্ষেপশব্দ ও রেশমী পরিচ্ছদের খস্‌খস শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ভোর হইয়াছে দেখিয়া যুবরাজ ও বিলাসিনীর দল প্রমোদকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

যুবরাজ রঙ্গিণী লক্ষহীরার কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "কে বলে রত্নদাস তাহার পিতাকে ভালবাসিত না ? ঐ দেখ, বেচারা পিতার শোকে কেমন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে।"

লক্ষহীরা কহিল, "উহার পিতাও উহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত।"

পিতার শেষ শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রত্নদাসের সেই নৈশ চিন্তা তাহার মুখে একটি নূতন ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। উহা দেখিয়া যুবরাজ ও সুন্দরীরা একটু বিস্মিত হইয়া গেল। যুবরাজ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রূপজীবিনীদিগের গণ্ডদেশ লজ্জায় ও অনুশোচনায় রক্তাভ হইয়া উঠিল। রত্নদাসও যখন দেখিল যে, ঐশ্বর্য্য, আমোদ, গান, যৌবন, সৌন্দর্য্য, শক্তি সমস্তই মৃত্যুর সম্মুখীন হইবামাত্র মলিন ও ভ্রষ্টশ্রী হইয়া

গিয়াছে, তখন ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অর্দ্ধ-দুঃখিত, অর্দ্ধ-উদাসীনভাবে যুবরাজ ও যুবতীরা রত্নদাসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। রত্নদাসের বিলাস-কক্ষ শূন্য হইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় যুবরাজ পত্রলেখার কানে কানে কহিল, "রত্নদাস যে তাহার পিতার উপর অশ্রদ্ধা দেখাইত, তাহা সত্য নহে। এখন দেখিতেছি, সে তাহার পিতাকে সত্য সত্যই ভালবাসিত।"

লক্ষহীরা কহিল, "বেচারার মুখ-চোখের চেহারা এক রাত্রির মধ্যেই কেমন হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলে ?"

পত্রলেখা তাহার আয়ত নয়নে একটি ভঙ্গী করিয়া ও বাসবদত্তার দিকে একটি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "বৃদ্ধ অনেক টাকা রাখিয়া গিয়েছে লো, অনেক টাকা।"

বাসবদত্তা কহিল, "তাহাতে আমার কি ?"

যুবরাজ কহিলেন, "তোমার কি ? অর্থশালিতার হিসাবে রত্নদাস এখন আমার চেয়ে অনেক বড়।"

এ দিকে ধনদাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। ও দিকে রত্নদাস মৃত পিতার কোমরের ঘুন্‌শী হইতে চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া একাকী যাইয়া মালখানায় প্রবেশ করিল ও তাহার পিতা কি পরিমাণ ধনরত্নাদি তাহার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই দেখিতে লাগিল। যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এত অর্থ!

মালখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রত্নদাস তাহার পিতার শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল ও পরিচারকদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া ভিতর হইতে ঘরের দরজা-গুলি অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। পরে আলমারীর ভিতর হইতে ঔষধের শিশিটি বাহির করিয়া লইয়া সে যাইয়া তাহার পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল ও মনে মনে কহিল, "এই-বার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক্।" অতি অল্পবয়স হইতে অধঃপাতের পথে যাইতে যাইতে রত্নদাস এখন এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল যে, ভয়, ভক্তি বা শ্রদ্ধা বলিয়া কোন বৃত্তির স্থান তাহার হৃদয়ে ছিল না। সে কোন কার্য্যে পাপের রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও পরামর্শ লইত না। তাহার পাপপ্রকৃতি যেন তাহার কানে কানে কহিল, "আগে একটা চোখের পাতার উপর লেপিয়া দেখ।"

রত্নদাস কৃপণের ন্যায় অতি সাবধানে এক টুকরা নেকড়াতে দুই ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার মৃত পিতার দক্ষিণ চক্ষুর পাতায় মাখাইতে লাগিল। চক্ষু মুদিত ছিল, নিমীলিত হইল।

রত্নদাসের মুখ হইতে ভয়ে একটি অস্ফুট চীৎকার বাহির হইল। শিশিটি পাছে তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে সেটিকে শক্ত করিয়া ধরিল।

বিস্ময়ের সহিত সে দেখিল যে, তাহার মৃত পিতার দক্ষিণ চক্ষুটি শবের চক্ষুর ন্যায় নিষ্প্রভ অথবা নিস্পন্দ নহে; ইহা শিশুর চক্ষুর ন্যায় সরলতাপূর্ণ ও হাসি-মাখান। সেই চক্ষুর উজ্জ্বল তারাটি যেন নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ সরোবরের মধ্যে নীলপদ্মের ন্যায় ভাসিতেছে। সেই চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইয়া যেন রত্নদাসকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে-ছিল। সেই চক্ষুটি যেন চিন্তা করিতেছিল, নালিশ করিতেছিল, বিচার করিতেছিল, দণ্ড দিতেছিল, ভয় দেখাইতেছিল, কথা কহিতেছিল। এই ক্ষুদ্র অঙ্গটুকুর মধ্যে এত বহুল পরিমাণে জীবনীশক্তি স্পন্দিত হইতেছিল যে, রত্নদাস তাহা দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সে চক্ষুটির দিকে চাহিয়া দেখিতেও রত্নদাসের আর সাহস হইতেছিল না। রত্নদাস যে দিকে চাহে, সেই দিকেই এই রহস্যময় অক্ষির হৃদয়বিদ্ধকারী দৃষ্টি দেখিয়া ভয়ে আত্মহারা হইয়া উঠিল।

সে ভাবিতে লাগিল, ঔষধটি বিধিমত লাগাইলে বৃদ্ধের পরমায়ু আরও কতকালের জন্য বাড়িয়া যায়, তাহার ঠিক কি ?

সহসা তাহার পিতার চক্ষু একবার মুদিত হইয়া আবার খুলিল; যেন সেটি ইঙ্গিতে রত্নদাসকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মনে যে ভাব হইতেছে, তাহার পিতার সেই নবীন চক্ষুর নিকট তাহার কিছুই অগোচর নাই।

রত্নদাস ভাবিল, "কি করি? কেমন করিয়া এই উৎ-পাতের হাত হইতে উদ্ধার পাই ?"

সাহসে ভর করিয়া সে আবার তাহার পিতার শবের নিকটে গেল ও আঙ্গুলের চাপ দিয়া সেই সজীব চোখটিকে বুজাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল।

তখন রত্নদাস ভাবিল, "চোখটাকে টানিয়া উগড়াইয়া

আয়োজন

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

ফেলি; আপদ চুকিয়া যাক্।" আবার তখনই তাহার মনে হইল, "পিতৃহত্যা মহাপাতক।"

রত্নদাসের পিতার সেই সজীব চক্ষুটিও ইঙ্গিতে জানাইল, "তাহাই বটে।"

রত্নদাস ভাবিল, "নিশ্চয় এটি ভৌতিক ব্যাপার। বুড়াকে দানোয় পাইয়াছে।"

সে তাহার পিতার চক্ষুটি উন্মূলিত করিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহার আরও কাছে সরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া শবের সেই সজীব চক্ষুটি ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে লাগিল। মুক্তার মত এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার মৃত্যুবিবর্ণ শীর্ণ গণ্ড বহিয়া রত্নদাসের হাতে পড়িল।

রত্নদাস অপর হাত দিয়া তাহা মুছিতে মুছিতে কহিল, "উহু! কি তপ্ত! আমার হাত যেন পুড়িয়া গেল!"

রত্নদাস তথাপি তাহার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইল না। সে মনে মনে কহিল, "শেষটায় রক্ত না বাহির হইয়া পড়ে।" সাহসে ভর করিয়া সে তাহার পিতার চোখটি সজোরে টানিয়া উপড়াইয়া ফেলিল। জীবনের যে স্ফুলিঙ্গটুকু শবের সজীব চক্ষুর মধ্যে দীপ্ত হইতেছিল, নিমেষমধ্যে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

সুপুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, সেইরূপ ভাবে রত্নদাস তাহার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিল। চিতাধূমের সহিত রত্নদাসের পিতার স্মৃতি শূন্যে লীন হইয়া গেল। কিন্তু কি জানি কেন, পিতার সেই অরুন্তুদ অন্তিম স্মৃতিটি রত্নদাসের মমতাহীন অন্তরাত্মাকে মাঝে মাঝে দারুণ পীড়া দিতে লাগিল।

যে অগাধ বিত্ত পিতা তাহার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, রত্নদাস তাহা অতি সতর্কতার সহিত নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিতে লাগিল। অর্থবলে কি না সম্ভবে? অর্থবলেই সে একটির পর আর একটি জীবনে অধিকার লাভ করিয়াছে। সে আত্মা ও জগৎ এই উভয় জিনিষেরই রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া অচিরে তাহাদের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া ফেলিল। ইতিহাস পাঠ করিয়া সে গত যুগের মানবের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। আদালতে ঘুরিয়া সে বর্ত্তমান যুগের মানুষের মনস্তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিল। সঙ্ঘারামে সঙ্ঘারামে ঘুরিয়া ও সন্ন্যাসিগণের আশ্রয় খুঁজিয়া সে অতি-মান যাহারা, তাহাদের রহস্যময় মনস্তত্ত্বগুলি আবিষ্কৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণকার যেমন সোনা খাঁটি করিবার জন্য একটি সম্পুটমধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহা হাপরে রাখিয়া উত্তপ্ত করে, রত্নদাসও সেইরূপ জড় ও অজড় উভয় জগৎ সম্বন্ধে তাহার সমস্ত অভিজ্ঞতা একই সম্পুটে আবদ্ধ করিয়া তাপ দিতে দিতে দেখিল যে, সম্পুট শূন্য। তখন হইতে রত্নদাস জগতের উপর আস্থাবিহীন হইয়া পড়িল ও নিঃশঙ্কভাবে আমোদের সাগরে ঝাঁপ দিল।

বয়সে যুবা, দেখিতে সুন্দর, জীবন-রহস্যে অভিজ্ঞ, সে অচিরেই সমস্ত জগৎকে নিজের করায়ত্ত করিয়া ফেলিল। ক্ষুধার সময় এক মুষ্টি অন্ন, পিপাসার সময় এক পাত্র সরবত, আকাঙ্ক্ষা-পরিতর্পণের জন্য এক জন সুন্দরী যুবতীর সঙ্গলাভ করিয়াই রত্নদাস তুষ্ট হইবার লোক ছিল না। ভোগ্য বস্তুর অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত চিবাইয়া না খাইয়া সে ছাড়িত না। নারীর উপর রত্নদাসের ভালবাসা ছিল না, তাহার ভালবাসা ছিল নারীত্বের উপর। জগৎকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখাই হইয়াছিল তাহার অভ্যাস। রমণীকে কি করিয়া বশীভূত করিতে হয়, সে কৌশল রত্নদাস বিশেষভাবে জানিত।

রত্নদাসের যতই বয়স হইতে লাগিল, ততই জগতের উপর তাহার অনাস্থা বাড়িতে লাগিল। মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া সে জানিল যে, জগতে সাহসিকতা হঠকারিতার, পরিণামদর্শিতা কাপুরুষতার, সদাশয়তা কূটনীতির, ন্যায়বিচার অন্যায়ের, সতর্কতা নির্ব্বুদ্ধিতারই অন্য নাম। সে আরও দেখিল যে, বিধাতার বিচিত্র বিধানে এ জগতে সদ্বিবেচক, সদাশয়, ন্যায়নিষ্ঠ ও সতর্ক লোকেরই অদৃষ্টে অন্ন জুটে না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রত্নদাস ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারাইল। সে পুরাদস্তর নাস্তিক হইয়া পড়িল।

দুইটি জীবন এখন রত্নদাসের হাতে। সে তাহার প্রথম জীবনটি অসংযমে কাটাইয়া, দ্বিতীয় জীবনটি সংযমীর ন্যায় কাটাইবে, এইরূপ মনস্থ করিল। সে ৬০ বৎসর বয়সে এক জন অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী শ্রেষ্টিকন্যার পাণিগ্রহণ করিল। কৈশোর হইতে প্রৌঢ়বয়স পর্য্যন্ত ভৃঙ্গের ন্যায় নানা ফুলে মধু পান করিয়া বার্দ্ধক্যে নিরুপদ্রবে এই অনাঘ্রাত কুসুমের মকরন্দ পান করিবার অভিসন্ধিই রত্নদাসের

এই বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিবার কারণ। বিধির নির্ব্বন্ধে বিবাহের বৎসর দেড়েক পরেই রত্নদাসের একটি পুত্র হইল। রত্নদাস তাহার নাম রাখিল জ্ঞানদাস।

বার্দ্ধক্যকে দূরে রাখিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াও কোন ফল ফলিল না। ধীরে ধীরে জরা আসিয়া রত্নদাসের দেহ অধিকার করিয়া বসিল। প্রথমে চুল পাকিল; একটি একটি করিয়া সবগুলি দাঁত পড়িয়া গেল; শরীরের চর্ম্ম লোল হইয়া আসিল। রত্নদাসের বয়স যখন প্রায় অশীতি-বৎসর, তখন সে বাতে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িল। রত্নদাস পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। সে তাহার সমস্ত ধন-রত্নাদি একটি গুপ্ত ধনাগারে সাবধানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। আর জ্ঞানদাসের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য সে তক্ষশিলার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের সর্ব্বপ্রধান ক্ষপণক ভিক্ষু ক্ষেমঙ্করকে শিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিল। ক্ষেমঙ্কর বয়সে যুবা হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ ছিলেন। পরন্তু তাঁহার সুন্দর আকৃতি ও মধুর প্রকৃতি তাঁহাকে রমণী-সমাজে সমধিক আদরণীয় করিয়াছিল। রত্নদাসের যুবতী পত্নী এই যুবক ভিক্ষুর এক জন একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মনুষ্য-চরিত্রে চির-অনাস্থাবান্ ও অবজ্ঞাশীল সূক্ষ্মদর্শী বৃদ্ধ রত্নদাস তাহার পত্নীর এই নিষ্ঠার মধ্যে ভক্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তির খেলা চলিতেছে বুঝিতে পারিয়া ঈর্ষ্যায় অধীর হইয়া পড়িত এবং সময়ে সময়ে কটূক্তি ও কর্কশ ব্যবহারে তাহার পত্নীর প্রতি বিরক্তির ভাব দেখাইতেও দ্বিধা বোধ করিত না। আবার সে তাহার নিজের জরা ও সহায়হীনতার কথা চিন্তা করিয়া নিজের ক্রোধ নিজের মনের মধ্যেই প্রশমিত করিয়া ফেলিত।

রত্নদাস যখন ৮২ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন সহসা এক শারদ সন্ধ্যায় তাহার নিজের মনের মধ্যে সে এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল ও সমস্ত জগৎ তাহার নিকট সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত ছবির মত বোধ হইতে লাগিল। রত্নদাসের যে অন্তিমকাল উপস্থিত, তাহা অনুমান করিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সে তাহার পুত্র জ্ঞানদাসকে তাহার নিকট থাকিতে বলিয়া অন্য সকলকে কক্ষান্তরে যাইতে বলিল।

সকলে চলিয়া যাইলে বৃদ্ধ তাহার পুত্রকে কহিল, "যাও, কক্ষের প্রবেশদ্বারগুলি সমস্ত অর্গলবদ্ধ করিয়া আইস, আসিয়া আমার কাছে উপবেশন কর।"

জ্ঞানদাস যথাযথ পিতার আজ্ঞা পালন করিল।

রত্নদাস তাহার পুত্রের হাতখানি নিজের জরাশীর্ণ হাতে ধরিয়া কহিল, "জ্ঞানদাস! পুত্র আমার! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত।" পিতার কথায় জ্ঞানদাসের দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

রত্নদাস কহিল, "পুত্র! শোক করিও না। জরা ও মৃত্যু জগতের অপরিহার্য্য নীতি। মনুষ্যের মরণে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এ কথা বলিতে সমর্থ কেবল তাহারা—যাহাদের জীবন পুণ্যময়। আমার পক্ষে মরণ বড় ভয়ানক। কারণ, আমি মহাপাপী। তবে এ কথা জানিও, পুত্র! যেমন প্রত্যেক ব্যাধির প্রতীকারের জন্য ভেষজ আছে, তেমনই প্রত্যেক পাপক্ষালনেরও উপায় আছে। বৎস! দ্রব্যগুণে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। তোমাকে আমার উদ্ধারের জন্য একটা কায করিতে হইবে।"

জ্ঞানদাস কহিল, "বলুন, পিতা, কি করিতে হইবে?"

রত্নদাস তাহার কোমরের ঘুন্‌শী হইতে একটি চাবি খুলিয়া জ্ঞানদাসের হাতে দিয়া কহিল, "পুত্র! আমার শিয়রের ঐ আলমারীট খুলিলে একটি স্ফটিকের শিশি দেখিতে পাইবে, সেই শিশিটি অতি সাবধানে আমার কাছে লইয়া আইস।"

জ্ঞানদাস তাহাই করিল।

রত্নদাস কহিল, "শুন, পুত্র! এই শিশির মধ্যে যে দ্রব্যটি দেখিতেছ, ইহা ব্রহ্মাণ্ড বিনিময়েও দুর্লভ। ভগবান্ তথাগত দ্বাদশ বৎসর কৃচ্ছ্রসাধনের পর যে দিন বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, সেই দিন তিনি পুণ্যতোয়া নিরঞ্জনায় অবগাহন করিয়া স্নান করিয়া উঠিলে এক জন ভাগ্যবান্ শ্রমণ তাঁহার সিক্ত বস্ত্রখানি নিংড়াইয়া এই সঞ্জীবনী সুধাটুকু সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আমার শরীরের উষ্ণতা লুপ্ত হইয়া না যাইতে যাইতে, ইহার দ্বারা তুমি আমার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া দিবে। দেখিও, যেন আমার দেহের কোন অংশ এই দিব্য সুধায় অস্নাত না রহে। পুত্র আমার! ভগবানের মহিমা অপূর্ব্ব, তাঁহার প্রভাব অসীম;

সুতরাং যাহা দেখিবে অথবা শুনিবে, তাহাতে বিস্মিত অথবা ভীত হইও না। গুরুর আদেশ এই যে, এই প্রক্রিয়াসাধন-কালে তুমি ভিন্ন অন্য কেহ তথায় উপস্থিত থাকিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। তোমার ভগবানের দিব্য, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না।" এই সময়ে রত্নদাস মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিল। গলায় ঘড়ঘড়ি উঠিয়া তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। শেষ নিশ্বাসের সহিত রত্নদাসের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

শোকে অধীর হইলেও পিতৃঘাতী জনকের পিতৃভক্ত পুত্র পিতার শেষ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল ও তাহার পিতার বুকের কাছে হাত দিয়া দেখিল যে, তখনও দেহের উষ্ণতা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি তাহার উত্তরীয়ের কোণ হইতে একটি টুক্রা ছিঁড়িয়া লইয়া তাহার পিতার বিধানমত শিশি হইতে একটু জল ঢালিয়া সিক্ত করিয়া লইল, পরে অতিশয় যত্নের সহিত সে সেই আর্দ্র-বস্ত্র-খণ্ডখানি তাহার পিতার মস্তকের চতুর্দ্দিকে ও মুখে-চোখে বুলাইতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ঘরে আলোক জ্বালা ছিল না। বাতায়নপথে যে ক্ষীণ চন্দ্রালোক কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাতে কক্ষের ভিতরের কোন জিনিষই স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল না। তাহা না হইলে জ্ঞানদাস তাহার পিতৃনির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়াসাধনে তাহার পিতার মৃতদেহে যে অলৌকিক ও অনৈসর্গিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। রত্নদাসের শুভ্র কেশগুলি ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার কুঞ্চিত ললাট ও গণ্ডযুগ অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রী ধারণ করিয়াছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় যৌবন-সুলভ দীপ্তিতে ও ব্যঞ্জনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তার ন্যায় শুভ্র ও সুচিক্কণ দন্তপংক্তি তাহার মুখের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞানদাসের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় ছিল না। সে একাগ্রচিত্তে তাহার পিতার শেষ আজ্ঞা পালন করিয়া যাইতেছিল। মস্তক ও মুখমণ্ডল অনুলেপন শেষ করিয়া জ্ঞানদাস তাহার পিতার দক্ষিণ হস্ত অনুলিপ্ত করিতে আরম্ভ করিল। নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাহুমূল পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই একটি সবল সুডৌল যুবকের বাহু জ্ঞানদাসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল। সেই বাহু আর কাহারও নহে—তাহার মৃত জনকের। জ্ঞানদাস বিকট চীৎকার করিয়া শয্যোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ঔষধের শিশিটি মর্ম্মরময় মেঝেয় পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। জ্ঞানদাসের মাতা ও ভিক্ষু ক্ষেমঙ্কর পার্শ্বস্থ কক্ষে বসিয়া তত্ত্বালোচনা করিতেছিলেন। রত্নদাসের কক্ষে বিকট চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া তাঁহাদের ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি রত্নদাসের কক্ষের দ্বারে যাইয়া দেখিলেন, সকল প্রবেশদ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। বার বার দ্বারে করাঘাত করাতেও যখন দ্বার খুলিল না, তখন নিশ্চয়ই কোন অত্যাহিত ঘটিয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়া সাবল ও কুঠারের সাহায্যে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। রত্নদাসের বাড়ীর মধ্যে চীৎকার ও কলরব শুনিয়া আশপাশের বাড়ীর লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজপথ হইতেও অনেক লোক-জন আসিয়া ভীড় জমাইল।

দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল বটে, কিন্তু কেহই সেই ভূতাবিষ্টের কক্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না।

ভিক্ষু ক্ষেমঙ্কর ভূতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিলেন, "আমিই যাইতেছি।"

ক্ষেমঙ্কর বামহস্তে একটি সামাদানে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা লইয়া ও দক্ষিণ হস্ত আশীর্ব্বাদকের ভঙ্গীতে উত্তোলিত করিয়া ধীরে ধীরে রত্নদাসের শয্যাপার্শ্বে যাইলেন। ব্যাপারটা কি, বুঝিবার জন্য যখন তিনি রত্নদাসের মুখের কাছে মুখ লইয়া ভাল করিয়া দেখিতে গেলেন, তখনই রত্নদাসের দক্ষিণ বাহু জ্ঞানদাসকে ছাড়িয়া ভিক্ষু ক্ষেমঙ্করের গলা সজোরে জড়াইয়া ধরিল ও একেবারে বত্রিশটি দাঁত বসাইয়া দিয়া ক্ষেমঙ্করের একটি কান কাটিয়া লইল। এই ব্যাপারে আর কেহই রত্নদাসের কাছে যাইতে সাহস করিল না।

মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ কাটিয়া গেল, রত্নদাসের মুখ ও দক্ষিণ হস্ত অবিকৃত রহিল দেখিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি অথবা পারলৌকিক কোন ক্রিয়াই করা হইল না।

* * * *

ভূগর্ভমধ্যে প্রোথিত প্রাচীন তক্ষশিলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন করিতে করিতে একটি অদ্ভুত শব প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসু খনিত্রের মুখে বাহির হইয়াছিল। বহু বহু যুগ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত থাকায় এই শবের আর

সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই গলিত ও লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার মস্তক ও দক্ষিণ হস্ত তখনও সম্পূর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে। এই অমানুষিক নরমুণ্ডের নয়নদ্বয় তখনও দীপ্তিপূর্ণ, ইহার অধরপ্রান্তে তখনও কুটিল শ্লেষ ও অবজ্ঞার হাসি। এই শবের পার্শ্বেই একখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে রত্নদাসের জীবনে সংঘটিত এই লোমহর্ষণ ঘটনাটি আদ্যোপান্ত উৎকীর্ণ ছিল।

শ্রীমনোমোহন রায়

কেতাব-কীট

রাত্রি-দিবা কেতাব কাটে—বিদ্যা মগজ ভরা,
উপকারের বিন্দু তা'তে পায় না শুধু ধরা।

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষ কথা

১

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।"

হারু সিং যখন দেশে ছিল, তখন দিন দুঃখে কাট্‌ছিল, কিন্তু এঁড়ে গরুর পিঠে চ'ড়ে ভগবানের সন্ধানে কলিকাতা সহরের দিকে এগিয়ে এসে সে খানিকটে সাম্‌লে নিয়েছিল।

কলিকাতায় তার মেস' মশাই জীবন্ত পাঁঠার ব্যবসা করে। ——নং রসা রোডে দেখতে পাবেন যে, একটা দোকান আছে, সেখানে মস্ত সাইনবোর্ড টাঙ্গানো,—

"এখানে কেবল জীওন্ত পাঁঠা ও খসি
বিক্রি হয়"

হারু গরুর পিঠে উত্তীর্ণ হওয়াতে আজ মেস' মশাই আনন্দে আটখানা! "এস, এস, বাবা হারাধন এস!"

"এস, এস, বাবা হারাধন এস।"

হারু। মেস' মশাই! আমি অনেক আশা ক'রে এসেছি আজ।

মেস' মশাই একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তাঁর সন্দেহ হ'ল যে, হারু তাঁর গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে এসেছে, তাই একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লেন, "দেখ বাবা হারু! সংসারে আমার কেউ নেই, তা ত জান? যা আছে, সবই তোমার। তবে আমার কিছুই নেই। আমি ফকীর, কেবল ভগবানের নাম ক'রে দিন কাটাই।"

হারু। মেস' মশাই! আপনার কিছু থাক্‌লেও যা, না থাক্‌লেও তা। যদি কিছু থাকে, আপনার সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নেই। যদি না থাকে, তবে আমি রোজগার ক'রে আপনার হাতেই দেব। আমি সে জন্য আসি নি, আমার আসল উদ্দেশ্য ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সকলে বলে, সেটা কল্‌কেতা সহর ছাড়া অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না।

মেস'। তা বাবা, ঠিকই বলেছ, নইলে আমি নিজেই কলকেতা ছেড়ে কোন্ কালে আজমীরে চ'লে যেতুম। ভগবানের-আদি নিবাস যেখানে থাক্ না কেন, এখনকার বাসস্থান কলকেতা। তার প্রমাণ, তিনি বলেছেন যে, বেদের মধ্যে তিনি সামবেদ, গাছের মধ্যে অশ্বত্থ এবং শেষে—সহরের মধ্যে তিনি কলকেতা। এটা যদিও পষ্ট ক'রে বলেন নি, কিন্তু তখনও কলকেতা সহর হয় নি। হ'লে নিশ্চয়

বলতেন। তাই টীকাকারের জন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন তুমি খানকতক লুচি ও পাঁঠার ঝোল খেয়ে একটু বিশ্রাম কর।

হারু হৃষ্টচিত্তে পাঁঠার ঝোলের সঙ্গে ঘৃতপক্ক আটার লুচি খেতে খেতে বল্লে,—"আমাদের দেশের ভুট্টার ক্ষেতটা বেচে ফেলেছি। দশ বিঘা ক্ষেতে কি দিন চলে? কেবল পরিশ্রম সার। রাত্রিতে একটু ঘুমোবার জো নেই, চোখের পাতা পড়লেই মহিষ এসে ক্ষেত চ'রে খায়।"

মেস'। বেশ করেছ, বাবা। চাষে কি পয়সা হয়? এখানে একটু ধাপ্পাবাজি শিখলে কথায় কথায় দশ বিশ টাকা!

হারু। তাতে ধর্ম্মের কোন হানি হবে না ত?

মেস'। তা কি কখন হয়? ভগবান্ যে সর্ব্বভূতে; অথচ, ধর্ম্মের বহির্ভূত ভগবান্। এইটুকু পরখ ক'রে দেখ।

২

অল্পদিনের মধ্যেই র'টে গেল যে, রসা রোডে এক জন নবীন সন্ন্যাসী এসেছেন, তাঁর পূর্ব্বপুরুষ ছিল মঙ্গলগড়ের রাজবংশ, তিনি ভগবানের দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে একটা পাঁচপেয়ে এঁড়ে গরুর পিঠে পৃথিবী ভ্রমণ কচ্ছেন।

হারুর চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে

হারুর চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে। অর্থাৎ সে মাথার চুল, ভ্রূ ও গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে, কেবল আছে পাঁচটা বিন্দুমাত্র। সেগুলি—কপালের সম্মুখে একটি, ভ্রূযুগে দুটো, গোঁফের স্থানে দুদিকে দুটো। এতে রুদ্রমূর্ত্তি না হয়ে যায় না। পরিধানে গেরুয়া খদ্দর, পায়ে খড়ম ও হাতে ত্রিশূল। তিনি কেবল আশীর্ব্বাদ করলেই মার্ যা কামনা সিদ্ধ হয়, রোগ সেরে যায় ও শোক-দুঃখ দূর হয়ে যায়।

দেখতে দেখতে দু'চার জন লোক জুটে গেল ও তারা অদ্ভুত গল্প রটিয়ে আরও দু'চার জনকে জুটিয়ে ফেল্লে। এইরূপ স্থলে মাড়ওয়ারীর দল খুব উৎসুক হয়ে আসে। বংশীলাল মাড়ওয়ারী তার মধ্যে এক জন।

বংশীলাল পুরুষানুক্রমে কাপড়ের ব্যবসা ক'রে এত টাকা রোজগার করেছিল যে, রাখবার স্থান নেই। সে স্বপ্ন দেখেছিল যে, রাজা হবে। তবে সেটা কেবল উপাধিস্বরূপ লাভ করবে, কিংবা কোন দেশ-বিশেষের রাজা হবে, তাহা স্বপ্নে ঠিক বুঝা যায় নি। সেইটে বুঝবার জন্য সে এক দিন পাঁপর, পেস্তার বরফি, দশ রকম আচার ও মোরব্বা প্রভৃতি থালে সাজিয়ে উপস্থিত!

সে একদিন পাঁপর, পেস্তার বরফি, দশ রকম আচার ও মোরব্বা প্রভৃতি থালে সাজিয়ে উপস্থিত

বংশীলাল। বাবাজি! আমি এক সময় পথের ভিখারী ছিলাম, এখন রাজা হ'তে চাই।

হারু। আমার পূর্ব্বপুরুষ সকলেই এক সময় রাজা ছিলেন, এখন আমি পথের ভিখারী।

বংশী। যাঁরা রাজবংশের, তাঁরাই রাজযোগের বলে রাজা হবার উপায় ব'লে দিতে পারেন। আপনি এক জন মহাপুরুষ।

হারু। অমন কথা বলতে নেই, আমি কেবল পৃথিবী ভ্রমণ করছি মাত্র। মনে করুন, পৃথিবী নিজেই সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ ক'রে তাঁর কোন সন্ধান পাচ্ছে না, আমি কোন্ ছার। আমার উদ্দেশ্য কেবল আবিষ্কার করা যে, কোন্ পথে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি কিংবা অন্ততঃ তাঁর একটা পা পৃথিবীর পিঠে আছে। পৃথিবী যখন থেমে যায়, তখন তিনি গুঁতো মেরে সেটাকে চালান। নচেৎ আপনি কি মনে করেন যে, পৃথিবী এত দিন চল্‌ত?

বংশীলাল। কখনই না।

হারু। অতএব ভেবে দেখুন যে, গুঁতো মারাই আসল তদ্‌বির। যে গুঁতো মার্‌তে জানে, সে-ই রাজা হয়।

বংশীলাল। কিন্তু অনেক সময় দেখেছি যে, গুঁতো মার্‌তে গেলে উল্টে দু ঘা খেতে হয়।

হারু। তারা রাজা হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আপনি রাজা হবেন, কেন না, আপনার পয়সা আছে। যারা গুঁতিয়ে ও জুতিয়ে পয়সা আদায় করে, তারা শেষ কালে রাজা না হয়েই যায় না। তবে এর মধ্যে হিক্‌মত আছে, সেটা বিজ্ঞতার ফল।

বংশীলাল। সেটুকু আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে। আপনি আমার গুরু।

হারু তখন গোটাকতক সারগর্ভ উপদেশ বংশীলালের কানে দিয়ে বল্লে, "চেষ্টা ক'রে দেখুন। আপনিই বংশীলাল রাজা।"

৩

দীক্ষিত হয়ে বংশীলালের দিব্যচক্ষু খুলে গেল। সে দেখতে পেল, তার অত বড় অট্টালিকার মধ্যে শাসনের লেশমাত্র নেই; যার যেটা খুসি, তাই কচ্ছে!

প্রথমতঃ বাড়ীর তেত্রিশ জন চাকর। কেউ কারও তোয়াক্কা রাখে না। নিজের খাবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। তাদের বিশ্বাস যে, মুনিব খাবার জুটিয়ে দেবে, তারা ব'সে খাবে।

সকলের চেয়ে পুরানো চাকর গরভুলাল। বংশীলাল তাকে ডেকে বল্লে,—"দেখ গরভু! সকলকে ব'লে দেও যে, চালাকি চলবে না। তেত্রিশ ছিলিম তামাক, অর্থাৎ—ঘণ্টায় তিন বার, এগার ঘণ্টায় সেজে দিতে হবে আমাকে। যখন প্রত্যেকে আসবে, তখন আমি হিসাব নেব, কে কি কায কল্লে।"

গরভু। প্রভু! ভারতবর্ষে ত এমন কথা কেউ এ পর্য্যন্ত শোনে নি। চাকর নিজের মনে কায ক'রে যাবে, তার আবার হিসাব কি?

বংশীলাল। তোমাকে বলছি শোন। ভারতবর্ষের পতন দুটো কারণে। প্রথমতঃ—স্ত্রীলোকের জন্য, দ্বিতীয়তঃ—চাকর ও সৈন্য-সামন্তের জন্য। সকলেই একেবারে অপদার্থ। তোমরা যদি এত দিন লড়াই শিখতে কিংবা অন্ততঃ পরিশ্রম কত্তে, তবে ভারতবর্ষ স্বাধীন থেকে যেত। সে ত দূরের কথা, আপাততঃ তামাক সেজেও দেখিয়ে দাও যে, তোমাদের শরীরে একটু বল আছে, নচেৎ ঠিক বলছি, চাবুক খাবে।

সেটুকু হাতে-কলমে দেখাবার জন্য বংশীলাল একটা পুরানো লাঠি নিয়ে দু' চার জন চাকরের পিঠে গুঁতিয়ে দিলেন। তারা কলের তলায় গল্প কচ্ছিল, মনিবের রুদ্রমূর্ত্তি দেখে মনে হ'ল যে, তাঁ'র মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ঘোড়ার সহিস পর্য্যন্ত দানা চুরী বন্ধ ক'রে কর্ত্তার গতি লক্ষ্য কচ্ছিল।

দ্বিতল হ'তে গৃহিণী জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ব্যাপারখানা কি?"

সহিস। মাইজী! শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ুন, কালীঘাটে পূজো না দিলে কর্ত্তার মাথা ঠাণ্ডা হবে না।

গৃহিণী। শীগ্‌গির গাড্ডি জোত।

বংশীলাল। কখনও গাড্ডি জুততে পারবে না। যত দিন স্ত্রীলোক মাথা নীচু ক'রে না থাকবে, তত দিন দেশের মঙ্গল হবে না। এ বিষয়ে ইতিহাস প'ড়ে দেখ, বিশ্বাস না হয় ত—

এই কথা ব'লে বংশীলাল বন্ বন্ শব্দে লাঠি ঘোরাতে লাগল, এমন কি, তড়িদ্‌বেগে দোতলায় উঠে গিয়ে দু'চার

তড়িদ্‌বেগে দোতলায় উঠে গিয়ে দু'চার জন স্ত্রীলোকের মাথায় দু'চার ঘা লাগিয়ে দিয়ে—

হারু এসেছিল ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। মোটরখানা ডাক্তারের। এঁড়ে গরুটা ছিল ব্যাক্‌সীটে শুয়ে। সেটা তাচ্ছীল্যভাবে শুয়েই থাক্‌ল। গুরুজীকে দেখে দরওয়ান সসম্ভ্রমে ফটক খুলে দিলে। মেয়েরা গুরুর রুদ্রমূর্ত্তি দেখে স'রে পড়ল।

বংশীলাল শয্যা হ'তে উঠে সসম্ভ্রমে হারুকে নমস্কার ক'রে বল্লে, "গুরুজী! কায অনেকটা এগিয়েছে। এখন জন স্ত্রীলোকের মাথায় দু'চার ঘা লাগিয়ে দিয়ে আবার দুম্ দুম্ শব্দে নীচে পালিয়ে এসে হাঁফ ছাড়ল। বেগতিক দেখে গৃহিণী নীচে নেমে এসে একটু গোলাপজল স্বামীর মাথায় ঢেলে দিলেন এবং বিনীতস্বরে বল্লেন, "একটু ঠাণ্ডা হও।"

বংশীলাল। কখনও হব না।

গৃহিণী। তবে আমি কালীঘাটে যাই।

বংশীলাল (উচ্চৈঃস্বরে) দরওয়ান! ফটক বন্ধ ক'রে দেও।

আপনিই ভগবানের স্বরূপ; বল দিন আমাকে।"

কতদূর বল বর্দ্ধিত হয়েছে, তাই নির্ণয় করবার জন্য ডাক্তার হার্ট পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, "খুব সন্তোষজনক উন্নতি। হার্ট এতদূর ডাইলেট হয়েছে যে, ভগবান্‌কে পাবার সময় খুব সন্নিকট।"

বংশীলাল। কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে যে, শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে।

দরওয়ান ফটকে চাবী দেওয়াতে বংশীলাল অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে ব'সে পড়ল এবং ক্রমে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়াতে শোবার উপক্রম কচ্ছিল, তাই দেখে গৃহিণী বল্লেন, "তোমরা সব এঁকে উপরে নিয়ে এস, অনেকটা মৃগী রোগের মত বোধ হচ্ছে।"

তেত্রিশ জন চাকর ও আঠার জন স্ত্রীলোক একচল্লিশখানা হাতপাখা নিয়ে বংশীলালকে উদ্দেশ্য ক'রে পরস্পরের ঘর্ম্ম দূর কচ্ছিল, এমন সময় বহির্দ্বারে হারু নিজেই উপস্থিত।
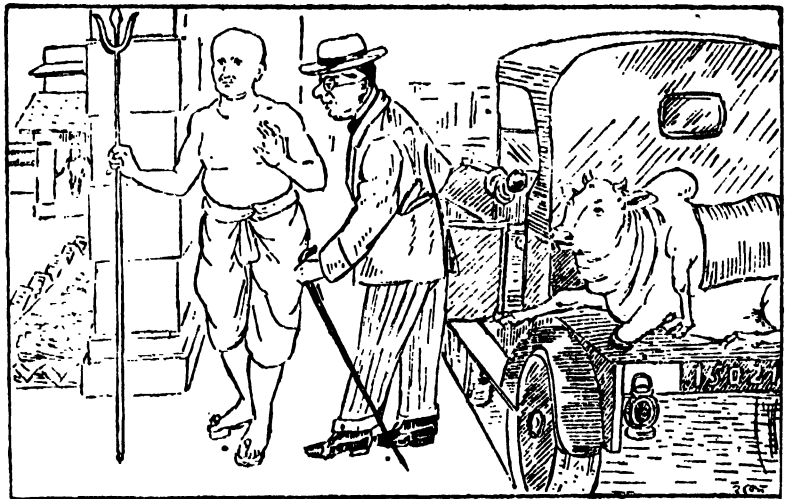
হারু এসেছিল ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। মোটরখানা ডাক্তারের এঁড়েগরুটা ছিল ব্যাকসীটে শুয়ে

হারু। ওটা কসরত-সাপেক্ষ। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনেরও ঐ রকম 'হার্টফেল' হবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু ভগবান্ কেবল উপদেশ দিয়ে সেটা সাম্‌লে নিয়েছিলেন। ডাক্তার কি বল?

ডাক্তার। কলকেতায় 'হার্টফেল' হ'তে পারে না, যদি ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পথ ধরা যায়। এত অনুপান আছে, ওষুধেরও দরকার হয় না। তেলের মধ্যে আছে নাজানাকুসুম, কুন্তলনাশ। গন্ধের মধ্যে কুমকুম্, চম্পক। রূপলাবণ্য-বৃদ্ধির জন্য ধরফ স্নো। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের জন্য রোগ-বিলাস। খাবারের মধ্যে কিন্‌ফুড, বাগবাজারের রস-গোল্লা, বউবাজারের সন্দেশ। সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে চান, তবে দিগ্‌গজ সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী। কিন্তু এগুলো সবই সসীম। ইন্দ্রিয়ের যত বিস্তার হবে, ভগ-বান্‌কেও তত শীগগির আঁকড়ে ধরতে পারবেন। ভগবান্ কি ছোট-খাট জিনিষ রে বাপু? তিনি অসীম। আমি এমন ওষুধ দেব আপনাকে যে, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো অসীম হয়ে পড়বে; ইলেক্‌ট্রিক লাইট মিট্‌মিটে প্রদীপের মত বোধ হবে; তোপের শব্দ পটকার ন্যায় শোনাবে; অত্যন্ত কঠিন জিনিষ বোধ হবে অতি কোমল; খুব তীব্র এসেন্স-গুলো টগরফুলের মত মিইয়ে যাবে, গন্ধ বোধ হবে না; বি-হাইভ ব্রাণ্ডিগুলো বোধে হবে, ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটারের মত।

বংশীলাল। আপনি যে ভাল জিনিষগুলোর কথা বল্লেন, সেগুলো আমি কাল হ'তেই ব্যবহার ক'রে দেখব। ইস্তক লাগায়েত আমি আচার, পাঁপর ও কড়ুয়া তেল দিয়ে দিন চালিয়েছি।

হারু। রাজা হ'তে গেলে প্রথমতঃ রাজভোগ দরকার। তবে সেগুলো পরখ করবার জন্য। এক একটা জিনিষ পরখ ক'রে ফেলে দেবেন, স্ত্রীলোকরা পরখ ক'রে দেখবে। স্ত্রীলোকরা পরখ ক'রে সাধ মেটালে—চাকর-চাকরাণী দেখবে। তা'দের পরখ শেষ হ'লে চাষাভুষো দেখবে। তা'রা দলে দলে কলকেতায় এসে পরখ কর্‌বে। ক্রমে সকলের ইন্দ্রিয় অসীম হয়ে দাঁড়ালে বিশ্বচৈতন্য ত নখ-দর্পণের মধ্যে!

বংশীলাল আশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠে বসল।

ডাক্তার। আজ থেকে আপনি কেবল বংশীলাল নয়, বংশীলাল ভগবান!

বংশীলাল। আমাকে একটা ফর্দ্দ ক'রে জিনিষগুলো আনিয়ে দিন। দশ বিশ হাজার যা লাগে, ভাবনা নেই। ওষুধটা কবে দেবেন?

ডাক্তার। আজকেই লিখে দিচ্ছি।

বংশী। ক' দাগ খেতে হবে রোজ?

হারু। এ ওষুধ খেতে হয় না, কেবল দিনরাত তার নামটা পড়তে হয় ও মধ্যে মধ্যে শুঁকতে হয়। এই রকম কসরৎ করলে ক্রমে নিদ্রা বাড়বে ও সংসার আপনাকে রাজা ব'লে স্বীকার করবে।

ডাক্তার তখন একটা কাগজে লিখে দিলেন,—

"রিহ, রিহ, রহ, রহ"

এক আউন্স।

৫

কল্‌কেতার ইন্দ্রিয়োপযোগী জিনিষগুলোতে বাড়ী ছেয়ে গেলে বাড়ীর মেয়েছেলে ও দাস-দাসী সেগুলো নিয়ে ঘুঁটতে লাগলো। যাদের মাথায় টিকি ছিল, তারা সেটার মাপে মাথার খুলির উপর ও পশ্চাতে চুল বাড়িয়ে ফেল্লে, ও কানের দু' পাশে ও ঘাড়ের দিকের চুলগুলি একেবারে ধ্বংস ক'রে সুন্দর-বনের 'ব'-দ্বীপের আকারে পরিণত কর্‌লে। স্ত্রীলোকরা রাখল কেবল জুল্‌ফি—মেম সাহেবদের মত। সকাল হ'তে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের ছড়াছড়ি।

মেয়েরা পান ছেড়ে দিয়ে চা ধর্‌ল ও চাকরগুলো তামাক ছেড়ে দিয়ে ধর্‌ল সিগারেট। সকালে ভৈরবী রাগিণী হ'তে আরম্ভ ক'রে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বেহাগের সুরগুলো সক-লের গলায় গজাতে লাগল চট্‌পট্ ক'রে। এক দিকে চাকরদের তান, অন্য দিকে মেয়েদের গান।

বংশীলাল ভগবান্ তার মধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ান হয়ে 'রিহ' 'রিহ' ও 'রহ' 'রহ' 'রহ' কর্ত্তেন। পাড়া-প্রতিবেশী বল্‌ত যে, বংশী বাবুর ঘুমন্ত রোগ (Sleeping Sickness) হয়েছে, কারণ, লক্ষ্মীদেবী (বংশীলালের গৃহিণী) জাঁতাপেষা ও চর্খা ছেড়ে দিয়ে এখন অনন্তশয্যায় স্বামি-ভগবানের চরণ সেবা কচ্ছেন।

বংশীলালের চরণযুগল রাজসেবা পেয়ে নড়াচড়া বন্ধ ক'রে দিল। হাত দুটোও প্রায় নিঃসাড়। তবে মুখ দিয়ে ঔষধিমন্ত্রটা বেরুত অহরহঃ।

এক দিন সকলের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বংশীলাল গৃহিণীকে বল্লে,"দেখ, প্রিয়ে! আমি একটা মতলব এঁটেছি। তুমি কল্কেতায় আমার দোকান ও কুঠী চালাও, আমি একটা তপোবনে গিয়ে তপস্যা করি। টাকা ক্রমেই বাড়ছে, জানি নে, ভগবানের এত কৃপা কেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বাড়ছে। কল্কেতা একটা ছোট যায়গা, তার মধ্যে এত বড় মন আঁটে না। আমার বোধ হয়, পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যে বাস করলে মন প্রসারিত হবে।"

গৃহিণী লক্ষ্মীদেবী সেই কথাতে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন। তাই দেখে বংশীলাল ভগবান্ বল্লেন, "কেঁদ না, প্রিয়তমে! দেখ, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের মত অবতাররাও এই পথে গিয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডবরাও পাহাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছেন। তবে তাঁদের ভুল হয়েছিল দ্রৌপদীকে সঙ্গে নেওয়া। মনে কর, দ্বাপরের সেরা স্ত্রীলোক যখন হিমাদ্রি লঙ্ঘন করতে পারেন নি, তখন তোমার মত ক্ষীণজীবী একটা লোক রাস্তা হাঁটতে পারবে কেন? মোটরকারে সেখানে এগোন অসম্ভব। এরোপ্লেনে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য স্বর্গে যাওয়া নয়। একটা নিরিবিলি যায়গাতে গিয়ে দিন কাটাব।"

গৃহিণী বাটীর সকলকে বল্লেন, "কর্ত্তার মত সম্বন্ধে আপনারা কি বলেন?"

বংশীলাল ভগবানের আত্মীয়-স্বজন বুঝিয়ে দিলেন যে, জীবের জীবলীলা সাঙ্গ হবার পূর্ব্বে একটা ইচ্ছা হয়, সেটা রোধ করা মহাপাপ এবং রোধ করতেও কেউ পারে না। ওঁর যে রকম অবস্থা এখন, তাতে বানপ্রস্থে যেতে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে গুরুজীর মত জানা আবশ্যক।

বংশীলালের ছেলের বয়সও প্রায় সতের বৎসর ও বেশ ইংরাজী শিখেছে। সে বল্লে, "বাবা তপস্যা করুন গে, আমি গদি চালাব। গুরুজীরও মত তাই, ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।"

কথাটা শুনে লক্ষ্মীদেবী আশ্বস্ত হলেন।

৬

মেস' মশাইয়ের খাসির দোকান চলছিল ভাল ও বংশীলালের টাকার জোরে দোকান আরও ফেঁপে উঠল।

মেস'। হারু, তোর ভগবান্ পেতে আর দেরি কত?

হারু। ভগবান্ ত পেয়েছি, এখন তাঁকে নিয়ে কল্কেতা সহর হ'তে স'রে পড়তে চাচ্ছি; নচেৎ ভগবান্ এখানেই মারা যাবেন। ডাক্তারেরও তাই মত। একবার তাঁকে দেখতে হবে।

এই ব'লে হারু এঁড়ে গরুর পিঠে চ'ড়ে বংশীলাল ভগবানের কুঠীতে উপস্থিত। দুর্ভিক্ষে ও অন্যান্য বাবদে পাঁচ দশ লাখ টাকা দিয়ে বংশীলাল ডাক্তারের সাহায্যে রাজা খেতাবও পেয়েছে। সকলই গুরুর কৃপা!

গুরুসন্দর্শনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বংশীলাল বল্লে, "প্রভু! এ দিকে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি, কিন্তু আসল কথা কি জান, পুঁজিপাটার শেষ অবস্থা! ছেলেটা আবার আমার মত চেষ্টা করলে বাপের নাম রাখবে, কিন্তু আমার দ্বারা আর চলা অসম্ভব; কারণ, আমি রাজা হয়েছি।"

হারু হেসে বল্ল—"টাকাকড়ি রোজগার-সাপেক্ষ, আর রোজগার করা না করা দৈবঘটনা। কারও হয়, কারও হয় না। কিন্তু মুক্তি নিজের হাতে। সে মুক্তি পেতে হ'লে রাজর্ষি জনকের মত হওয়া চাই। সে মুক্তিতে দেশেরও মুক্তি হয়।"

বংশীলাল। সে কি রকম?

হারু। সেটা চাষ করলে হয়। রাজর্ষি জনক চাষ করতেন এবং সেই চাষের ফলে সীতাদেবীর জন্ম এবং সীতাদেবীর জন্ম হবে ব'লেই ভগবান্ রামচন্দ্রের আবির্ভাব। ভগবানের আবির্ভাবের কারণ, দশটা ইন্দ্রিয়ধারী দশাননের দমন। ফল কথা, চাষের চেয়ে বাড়া জিনিষ নেই। চরকা স্ত্রীলোকদের জন্য। চাষ পুরুষদের জন্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যত দিন হস্তিনাপুরে ডিপ্লোমাসি খাটাচ্ছিলেন,বলরাম সে সময়টুকু লাঙ্গল দিয়ে পৃথিবী চাষ কচ্ছিলেন। তা না হ'লে ভারতবর্ষ টিকত? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রাজারাজড়াও অক্কা পেয়ে গেল, ধর্ম্ম করলেন স্বর্গারোহণ, যদুবংশ গেল ধ্বংস হয়ে, নারায়ণ গাছে চ'ড়ে ব্যাধের হাতে আত্মহত্যা করলেন, তবে থাকল কে?

বংশীলাল। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ভগবান্ চাষিরূপেই জগৎ ধারণ করতে পারেন। অন্য উপায়ে পারেন না।

হারু। এইবার সার বুঝেছ। এইবার পাততাড়ি গুটিয়ে এক জোড়া বলদ কিনে স্বদেশে চল। সেখানে সকলে রাখালরাজার জন্য হাঁসফাঁস করছে। যেখানে

কেবল ফক্কিকারী ও ধড়িবাজী, সেখানে কি কেউ রাজা হয়? শেষে দাঁড়াবে কি? রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থাৎ বিপ্লব। মুখে সর্ব্বেসর্ব্বা, কিন্তু কেউ কারও নয়। কেবল পরমাণুর তাণ্ডবনৃত্য। রোগ, শোক, জরা ও বিভীষিকা মাত্র!

বংশীলাল্। কিছু মূলধনের দরকার হবে?

হারু। পরিশ্রমের চেয়ে মূলধন আর কি আছে? পরিশ্রমের চোটে রোগ-শোক পালাবে, পরিশ্রমে লুপ্ত বুদ্ধি বাড়বে, ব্যাধি তাড়াবার উপায় ভগবান্ অন্তর হ'তে ব'লে দেবেন।

গুরুজীর উৎসাহ দেখে বংশীলাল বল্‌ল, "চল।"

গুরুজীর উৎসাহ দেখে বংশীলাল বল্‌ল, "চল।" তখন দু'জনে এঁড়ে গরুর পৃষ্ঠে কলিকাতা মহানগরী পশ্চাতে রেখে, গোধূলির সময় নীরবে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে কেবল তাঁরই শরণাগত হয়ে একছুটে বেরিয়ে পড়ল।

কথামালার ভাষ্য

কথামালা বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইহা বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল ও অন্যান্য যাহার নাম আমি অবগত নহি, তাহাদের সার। ইহা জ্ঞানের খনি। ইহার মধ্যে ভক্তিবাদ, জ্ঞানবাদ, মুক্তিবাদ, যুক্তিবাদ, এমন কি, শূন্যবাদ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। ইহার মধ্যে গোটা বেদান্ত-দর্শন প্রচ্ছন্নভাবে আছে। শঙ্কর যে ইহার ভাষ্য কেন না করিয়া আমার জন্য রাখিয়া গেলেন, বুঝিতে পারি না। মহাপুরুষদের লীলা কে বুঝিবে? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রন্থের মূল্য বুঝিয়াছিলেন, তাই ইহা প্রকাশ করিয়া ভারতের মুক্তি কোন্ পথে, ইঙ্গিতে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষকে কোটি কোটি প্রণাম করি।

মুকুন্দ সচ্চিদানন্দকে স্মরণ করি। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। ভাষ্য সংস্কৃতেই লিপিবদ্ধ করিতাম, তবে আমার সংস্কৃত মৃত অপ্রচলিত ভাষার সহিত মিলিবে না, সাধারণে বুঝিবে না এবং তাহা অনুবাদ করিবার জন্য মহারাজ মহাতাপচাঁদ কিংবা কালী সিংহ জীবিত নাই, এই সকল কারণে ও বিষয়ে ক্ষান্ত দিলাম।

আর এক কথা, আমার জননী বিশ্ব-বিজয়িনী বঙ্গভাষা—যাঁহার স্নেহের সরিতে স্নান করিয়া আহারাদি করি, তাঁহাকে অবহেলা করি কি করিয়া?

জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনে অর্থ চাহিনে মান,
যদি দেহ তব অমল-কমল ও দুটি রাতুল চরণে স্থান।
কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ন-নীরে
সে যে আমার জননী রে।

সুতরাং বঙ্গভাষাতেই ভাষ্য লেখা ঠিক করিলাম।

প্রথমে 'নাম'—কথামালা বিশ্বের জন্য সাধারণভাবে এবং বাঙ্গালার জন্য বিশেষভাবে রচিত। বাঙ্গালী নাম-মাহাত্ম্য জানে, নামে রুচি তাহার গুরুর দত্ত প্রথম দীক্ষা, সে নামের কাঙ্গালী, তাই ইহার মধুর 'কথামালা' নাম গ্রন্থকার দিয়াছেন। বাঙ্গালী মিষ্ট নামের বড়ই পক্ষপাতী, নামের সত্যই একটা শক্তিও আছে, দেখুন, রবীন্দ্রনাথের নাম যদি গোবর্দ্ধন হইত, তাহা হইলে তিনি কি 'মানসী' বা 'গীতাঞ্জলি' লিখিতে পারিতেন? কবি বলিয়াছেন—

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

নামের প্রতাপ কবি চণ্ডিদাসও স্বীকার করিয়াছেন।

কথামালা নামের গভীর একটি অর্থ আছে। গ্রন্থকার জানিতেন, বাঙ্গালী কায অপেক্ষা কথা ভালবাসে, কথা-সরিৎসাগর তাহার প্রিয় গ্রন্থ। হরিকথা শুনিতে সে আত্মহারা, তাহার কবি এত কবিত্বপূর্ণ নাম থাকিতে নিজ পুস্তকের নাম রাখিলেন, 'কথা ও কাহিনী।' কবিতা লিখিলেন, 'কথা কও' কথা কও' 'হে অনাদি হে অতীত কথা কও।' তাহার পাখী ডাকে 'বৌ কথা কও' 'বৌ কথা কও।' 'বৌ গান গাও', 'বৌ পিয়ানো বাজাও', 'বৌ নভেল পড়' বলে না। বলে, 'বৌ কথা' কও 'কথা' এমনি তাহার প্রিয়। 'মালা'—উহার কথা অধিক কি বলিব। ভগবান্ হইতে প্রেমিক-প্রেমিকা, এমন কি, শিশু পর্য্যন্ত উহার প্রলোভন এড়াইতে পারেন না। ফুলমালা, গুঞ্জামালা, বনমালা, স্ফটিকমালা, তুলসীমালা, পলার মালা সকলের সমভাবে প্রিয়। দেশভেদ, জাতিভেদ, বয়সভেদ নাই। কাযেই কথামালা নামটি যে অর্থপূর্ণ, ইঙ্গিতপূর্ণ, সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ হইয়াছে, সে বিষয়ে বিদগ্ধজন একমত।

কথামালার প্রথম মহাশিক্ষা—এ জগৎ পশুশালা

আমরা পশু বই আর কি? অনিবার যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, কাটাকাটি লইয়া আছি, এ সব পশুবৃত্তি ভিন্ন আর কি? ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি মারিতেছি, তুচ্ছ বিষয় লইয়া রক্তারক্তি করিতেছি, পশুতে অধিক কি করে বলুন। গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় আমাদের পশুত্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, আমরা যে পশুর জাতি, তাহা ত ডার-উইন "সাহেব" বহু দিন প্রমাণ করিয়াছেন। সে বংশলতিকা কে দেখেন নাই? ভগবান্ ও তাঁহার আদেশ ভুলিয়া যাহারা পশুজীবন যাপন করিতেছে, তাহারা কি?

পশুর মুখে ভাষা দিবার উদ্দেশ্য:—কবি রবীন্দ্রনাথ

বলিয়াছেন—'এই সব মূক মুখে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে ভাষা' এই dumb millionএর লক্ষ মূকের মুখ ফুটাইতে হইবে। Englishman, Statesman প্রভৃতি মহানুভব ভারতবন্ধুরা ভারতের অবনত জাতির—অস্পৃশ্য জাতির অজ্ঞাত বেদনার বাণী প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদের মর্ম্মবীণায় সুর দিতেছেন, কিন্তু এখনও তাহাদের উর্দ্ধদৃষ্টি হয় নাই। জলচর, খেচর, ভূচর বহু প্রাণী আছে, 'বদন থাকিতে না পারে বলিতে তাই সে অবলা নাম,' এখন সব জীব সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন। এক Prevention of Cruelty to Animals পশু-নির্দ্দয়তাবিঘাতিনী সমিতি ভিন্ন অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাও মানবজাতি করেন নাই। কিন্তু কথামালাকারের হৃদয় নিরপেক্ষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিরহিত। তাঁহার সদয় প্রাণ কাঁদিয়াছিল, পশুদের জন্য। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে বা পরে এত বড় বিরাট প্রাণ আর জন্ম-গ্রহণ করে নাই।

সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।

ব্যাঘ্রের নিকট মেষশাবকের কাকুতি, বৃদ্ধ প্রভুভক্ত প্রাচীন শীকারী কুকুরের শীকার ধরিতে অপারগ হইয়া প্রাণ-কাঁদান উত্তর, ভারবাহী গর্দ্দভের জ্বলন্ত আত্ম-ত্যাগ আমাদের হৃদয়কে দয়া ও সহানুভূতিতে ভরপূর করিয়া তুলে—'তাদের লাগি চোখের কোণে জল আসে।'

অন্যদিকে গর্ব্বিত দাঁড়কাকের ভাড়াটে ময়ূরপুচ্ছের অহঙ্কার, লাঙ্গুলহীন শৃগালের উপদেশ, কচ্ছপের উড্ডয়নানুরাগ মানব-সমাজকে নির্ম্মম কশাঘাত করে। গ্রন্থকার নীরবকে মুখর করিয়াছেন, বেদনাকে কণ্ঠ দিয়াছেন, জ্ঞানকে জিহ্বা দিয়াছেন।

আমরা প্রথম উপাখ্যানটির ভাষ্যই এখন প্রকাশ করিলাম। রসিক সমাজের উৎসাহ পাইলে অগ্রসর হওয়া যাইবে।

আঙ্গুর ও শৃগাল

প্রথমেই ফলের কথা, ফল হইতেই Fall অর্থাৎ পতন। বাইবেলের প্রমাণ। ভগবান্ বলিয়াছিলেন, 'তোমরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইও না।' গীতা বলিতেছেন—'মা ফলেষু কদাচন।' আর কথামালাকার বলিয়াছেন—'আঙ্গুর ফল টক।' তিনি ইঙ্গিতে বলিয়াছেন কি, তাহা কি বুঝাইতে হইবে? কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপর কথামালাকারের প্রভাব কত নিবিড়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে না, দেখুন তিনি লিখিয়াছেন—

'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জে
গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল—'

পরিপূর্ণ বেদনার ভারে রসপূর্ণ ফলগুলি ফাটিয়া পড়িতেছে, তবু কবি কাহাকেও খাইতে ডাকেন নাই, বিলান নাই কেন? তিনি শৈশবে মহাশিক্ষা লাভ করিয়াছেন—'আঙ্গুর ফল টক।' বিশ্বকবি জানেন, তাঁহার স্বদেশবাসী বড় কাঙ্গাল, বড় লোভী, পুঞ্জ পুঞ্জ সুপক্ক ফল পরস্মৈপদী পাইলে অত্যন্ত অধিক খাইবে, টক জিনিষ অত্যন্ত আহার করিলে জ্বর হইবে, তিনি ডাক্তার ইহা জানেন; কাযেই কাহাকেও আহ্বান করিলেন না। কথামালাকারের শিক্ষায় মহাকবি কেমন অনুপ্রাণিত!

এই সুজলাং সুফলাং বঙ্গভূমিতে আম, আমড়া, তেঁতুল, কাগজী পাতি গোড়া লেবু, কয়েতবেল,আনারস প্রভৃতি এত ফল থাকিতে গ্রন্থকার আঙ্গুরের নাম করিলেন কেন এবং তাহা টক বলিলেন কেন? হায়, হতভাগ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এ যে সেই গৌরবময় বৈদিক যুগের কথা—যখন

'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য-কাহিনী।'

এ সেই যুগের কথা, যখন হোমগন্ধে দিগ্বিদিক্ আমোদিত হইত। লোধ্র-কর্ণিকার-পিয়াল-রেণুর কণা মাখিয়া সমীরণ পম্পা-সলিলে সাঁতার কাটিত, ঋষি-কন্যার অতি-পিনদ্ধ বল্কলে ঝাপটা মারিত। যখন 'বালামের' স্থান নীবার অধিকার করিত, সুরভি তৈলের পরিবর্ত্তে ইঙ্গুদী ব্যবহৃত হইত, মালিনীতীরে বেতসকুঞ্জে মিলনানন্দের উৎসব বহিত। যখন সোমরস পান করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আনন্দে বিভোর হইতেন। সেই পবিত্র সোমরস যে আঙ্গুর-জাত। উহা তখন ম্লেচ্ছভূমির সম্পত্তি ছিল না।

ত্রিকালদর্শী ঋষি জানিতেন, এই আঙ্গুরই কাল হইবে। ইহা ভ্রান্তির স্রষ্টা হইবে, প্রতি সাময়িক পত্রে উহার লোভনীয় বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া যুবগণকে আকৃষ্ট করিবে, তাই

পুস্তকান্তে সাবধান করিয়া লিখিলেন, 'আঙ্গুর ফল টক', তোমরা উহা স্পর্শ করিও না।

তিনি জানিতেন, আঙ্গুরে লোভ করিলে উহার ব্যবসায় করিতে পেশাওয়ার হইতে গুণ্ডা আসিতে পারে, কাবুল হইতে কাবুলী আসিতে পারে। তিনি জানিতেন, এই লইয়াই হয় ত হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিবে। সেই ঠন্‌ঠনের কালীবাড়ী, সেই দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদ, সেই সাজোয়া গাড়ী, সেই গুর্খা ও ইংরাজ সৈন্য, সেই পুলিসকোর্ট, সেই ১৪৪ ধারা, সেই লালবাজার পুলিস আফিস, সেই মোটর গাড়ী, সেই মীনা পেশাওয়ারী সমস্তই তাঁহার যোগনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি বিড়ালের গলায় বাঁধিবার জন্য 'ঘণ্টার' উল্লেখ করিয়াছিলেন, ঢাক, ঢোল, সানাই, দগড়, ড্রাম কিছুরই উল্লেখ করেন নাই, তিনি যে ত্রিকালদর্শী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি উপায় আছে? তিনি জানিতেন, বিড়াল সর্ব্বত্রগামী, সে যে নাখোদা মস্‌জেদে যাইবে না, এমন কোনও মুচলেখাই দেয় নাই। যদি সে নামাজ বা বে-নামাজের সময় সেখানে যায় এবং গলায় ঢোল কিংবা ঢাক বাঁধা থাকে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ, পুনরায় লড়াই—হিন্দুমুসলমানে রক্তারক্তি। বিড়াল যে ষষ্ঠীর বাহন, কে না জানে? বাদ্যভাণ্ড করিয়া নামাজের বিঘ্ন করা এবং তথা 'লাট সাহেবের' ফতোয়া পদ-দলিত করা যে তাহার অভিপ্রায়, তাহা কে অবিশ্বাস করিবে? সেই কারণে, তিনি ঘণ্টার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কারণ, উহা তত মারাত্মক হইবে না। গ্রন্থকার কত বড় ভবিষ্যৎদর্শী ছিলেন, তাহা দেশ বুঝিল না। আমরা এমনই অন্ধ যে, তাঁহার 'আঙ্গুর ফল টক' যে কত বড় উপদেশ, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না।

উপদেশের আধ্যাত্মিকতা:—শৃগাল অর্থে মায়ামোহ-জড়িত অবিদ্যা-ঘনে আচ্ছাদিত বুদ্ধিসম্পন্ন মানব। শৃগাল বুদ্ধিবৃত্তির প্রতীক। এই নলিনীদলগতজলমিব তরলং, ক্ষণবিধ্বংসী, আপাতমধুর, পরিমেয় সাংসারিক সুখ আঙ্গুরের সহিত উপমিত হইয়াছে। ভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'একটুকু রসে ভরা চাহি না আঙ্গুর।' 'নাল্পে সুখমস্তি' 'নাল্পা স্ফুরস্তি।' আঙ্গুরের ক্ষণিক সঙ্কীর্ণ রসে মজিও না, উহা টক। যিনি রসো বৈ রসঃ, সেই রসময়ের অপার প্রেমে মজ। সেই ভূমানন্দে মনকে ডুবাও। অন্য ফলের আকাঙ্ক্ষী হইও না, মোক্ষফলের অনুসন্ধান কর।

ভক্ত হনুমান বলিয়াছিলেন,—

'আমার কি ফলের অভাব
তোরা এলি বিফল ফল দেখাতে।'

শ্রীরামচন্দ্রের চরণতলে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারি ফল মিলে, তাহা কি জান না?

আবার সাধক রামপ্রসাদ সাধা গলায় গাহিয়াছেন,—

'আয় মন বেড়াতে যাবি,
কালী কল্পতরুতলে, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।'

এ সংসার টক আঙ্গুর, ইহা ত্যাগ করিয়া তোমরা অমৃতস্য পুত্রা অমৃত ফলের আকাঙ্ক্ষী হও। অমৃতের অধিকারী হও। ইহাই গ্রন্থকারের নিবেদন। বাহুল্যেন অলম্—

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ,
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।

শ্রী[signature] (কপিঞ্জল)

বুদ্ধিমন্ত *
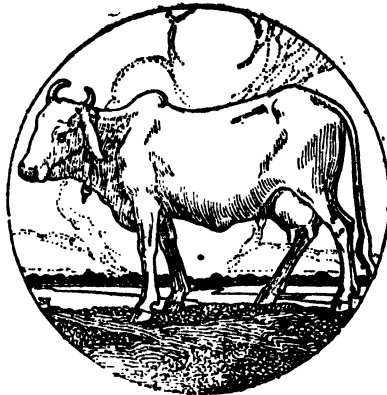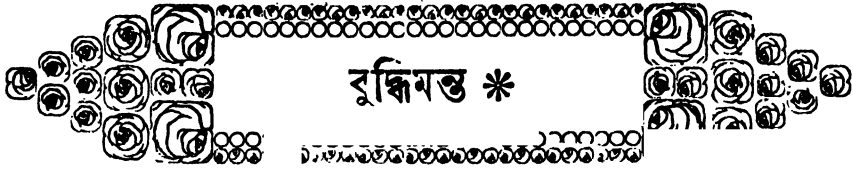
[গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত প্রহসন]

প্রথম দৃশ্য

গৃহ-প্রাঙ্গণ

বুদ্ধিমন্ত জনৈক মধ্যশ্রেণীর অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। ইনি অতিশয় সংশয়-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ইঁহার পত্নী শুচিমণি এক জন শুচি-বায়ুগ্রস্তা রমণী। ইঁহাদের অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের সম্মুখভাগে দর-দালান। তৎপশ্চাতে শয়নকক্ষ, তাহার দ্বার মুক্ত। ঐ মুক্ত দ্বার দিয়া একখানি খাটের কিয়দংশ এবং একটি দেরাজওয়ালা আলমারীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। উঠানের বাম পার্শ্বে রন্ধনশালার প্রবেশদ্বার। তাহার সন্নিকটে কলতলা ও নিকটেই গঙ্গাজলের বড় গামলা। দক্ষিণ পার্শ্বে গোশালার দ্বার, তাহার এক পার্শ্বে ঘুঁটে-ঘর, অপর পার্শ্বে তুলসীমঞ্চ। বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। বাড়ীর ঝি ছটাকী জ্বালানী কাষ্ঠের মুটে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর-প্রবেশপথ দিয়া উঠানে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"কাঠ কোথায় রাখবো গো? এক একখানা ক'রে রান্নাঘরের কোণকে তুলে রাখবো কি?"

অমনই গোময়মিশ্রিত জলের ঘটী হস্তে শুচিমণি গোয়ালঘর হইতে ব্যস্তসমস্তে বাহির হইয়া বলিলেন, "ওরে না—না, সর্ব্বনাশ করিস নে! আগে এক একখানা ক'রে ধো, তার পর রান্নাঘরে তোল; দেখিস যেন কিছু থাকে না, বেশ ক'রে ধুস। উনুনটে একটু গঙ্গাজল দিয়ে সাফ-সুতরো ক'রে দে,—এড়া ডালের খোসাটোসা যদি থাকে।"

ছটাকী। কোথায় ডালের খোসা গো? এই যে ভোরকে উঠে চুলো নিকিয়ে এলুম।

শুচি। তা দেখ, তুই একবার এ পাশ ও পাশ জল ঢেলে উনুনটা ধুয়ে আয়।

ছটাকী। এখন ধুলে রাঁধবে কখন্ গো?

শুচি। আমি এই কড়িতে জল তওড়া দিয়ে নাইতে যাব। কাল এইখানে এক পাল আর্সোলা বসেছিল,—ততক্ষণ শুকিয়ে যাবে। নেয়ে এসে রাঁধবো।

ছটাকী। সে হবে নি গো—হবে নি।

শুচি। না হয় নেই হবে! এড়া উনুনে রাঁধবো কি ক'রে?

ছটাকী। তুমি তো রাঁধবে নি, আমরা খাই কি?

শুচি। তুই আর ফেলারাম,—আমি এক কুন্‌কে চাল দেব এখন, আর দু' আনা পয়সা দিচ্ছি, চাল ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খাস্। আর বাসি রুটী ক'খানা রয়েছে, আমি কাল রাত্রে খাইনি। ঢাকা খুলতে যাচ্চি—ফর্‌ফর্ ক'রে একটা আর্সোলা উড়ে রুটীগুলো ডিঙ্গিয়ে গেল—কি জানি, ঢাকার উপর কি প'ড়লো—তাই আর খাইনি।

ছটাকী। কর্ত্তাবাবু কি খাবে গো?

শুচি। ওর আর এ বেলা কিছু খেতে হবে না। ওর সব ইয়ারবক্‌সি এসেছে, দেরাজ খুলে টাকা নিয়ে গেল, খাওয়াদাওয়া সব হবে। তুই, মা, রুটী ক'খানা নিয়ে ঘরটা ভাল ক'রে নিকিয়ে আয়।

ছটাকী। সে ত রুটী বার্‌কে এনে, ঘর ত তোমার সাম্‌নে নিকিনু।

শুচি। যা বাছা, আর একবার হাতটা বুলিয়ে আয়।

[ছটাকীর প্রস্থান।

(ফেলারাম ভৃত্যের প্রবেশ)

ফেলা। ও মা-ঠাকুরুণ, এ র‍্যাকাব-গেলাসগুলো কুন্‌খানকে রাখবো?

শুচি। দাঁড়া, বাছা, দাঁড়া, সর্ব্বনাশ করিস্ নি! বাবুদের ওতে বাজারে খাবার দিয়েছিলি ত?

ফেলা। না গো, ও কেলো ময়রার দোকানের সন্দেশ, আর উড়ের দোকানের মুড়ি, আর সেদো মুদিনীর দোকানের ঘি আর লঙ্কা এনেছিলুম।

শুচি। ও মা, কোথা যাব গো! ঐ উড়ের দোকানের মুড়িগুলো খেয়েছে! তারা যে হাতে মাটী করে না রে! আর ঐ মুদি-মাগীর ঘি মেখেছে! সর্ব্বনাশ করলে—আর জাত-জন্ম রাখলে না!

---

* কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ফেলা। এখন এগুলো রাখি কোন্‌খানকে বলো ?

শুচি। নে বাছা, তিন দিন গোবরগাদায় গুঁজড়ে রেখে দে। তার পর তিন দিন এই গঙ্গাজলের গামলায় ডুবিয়ে রাখিস্। তার পর গঙ্গা-মাটী দিয়ে মেজে-ঘ'ষে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে ঘুঁটে-ঘরের এক পাশে রেখে দিস্। না না, যদি ঘিয়ের দাগটাগ থাকে —ঐ চোরকুঠরীর এক পাশে রেখে দি গে। না, ওখানে কাঠ রাখতে হয়।—আমার মাথামোড় খুঁড়তে ইচ্ছে কচ্ছে—কি করি বল্ দেখি—সৃষ্টি জজাবে! নে নে, বা'র-বাড়ীতে এক যায়গায় ফেলে রাখ গে যা। কাঁসারী এলে ও জিনিষ বদ্‌লে নিস্। না,—জিনিষপত্র আর কর্‌বো না, মাটীর ভাঁড় রাখবো, পোড়া কলাপাতাই ঘরে আন্‌বো কি ক'রে—কাগে হাগে!

ফেলা। আমি আর দাঁড়াতে লার্‌বো। আমার কাপড় কোঁচাতে আছে,—ঐ গোবরগাদায় ফেলে চল্লুম।

[প্রস্থান।

শুচি। যাঃ—ও গোবরে আর ঘুঁটে দেওয়া চল্‌বে না।

(সংশয়-বাতিকগ্রস্ত বুদ্ধিমন্তের হন্ হন্ করিয়া প্রবেশ ও শয়ন-কক্ষাভিমুখে গমন)

কোথা যাও—কোথা যাও,—দাঁড়াও দাঁড়াও—সৃষ্টি জজিয়ো না।

বুদ্ধিমন্ত। কি সৃষ্টি জজাবো না! আমি বোধ হয় টাকার আলমারীর চাবি দিয়ে যাই নি।

শুচি। ওগো, দিয়েছ গো—দিয়েছ। তেরবার টানাটানি ক'রে বাইরে গেলে।

বুদ্ধি। না না, বুঝি ভুলে খুলে রেখে এয়েছি, ওর ভেতর নোট আছে।

শুচি। ওগো, দাঁড়াও দাঁড়াও, জুতো পায়ে দিয়ে ঘরে উঠো না। কাপড় ছাড়ো, গঙ্গাজল স্পর্শ করো—

বুদ্ধি। এই নাও—এই জুতো ছাড়ছি—

শুচি। ওগো, দাঁড়াও দাঁড়াও, ঘরময় সগ্‌ড়ি রয়েছে, এক-বার বই গোবর দেওয়া হয় নি।

বুদ্ধি। না হয়েছে, নেই নেই—

ছটাকী। ও ছটাকী—ছটাকী! খিল দিয়ে ঘর নিকো—

ছটাকী। (ঘর হইতে) কি বল্‌ছ গো ?

বুদ্ধি। সর্ব্বনাশ! দেরাজ খোলা—ছটাকী ঘরে আছে!

শুচি। ওরে, দে দে, শীগ্‌গির খিল দে, মিন্‌ষে ঘরে ঢুক্‌তে যাচ্ছে! ওগো, যেও না, যেও না—

[বুদ্ধিমন্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শুচিমণির প্রস্থান।

(এক দিক্ দিয়া ছটাকী এবং অন্য দিক্ দিয়া ফেলারামের প্রবেশ)

ছটাকী। ঐ আবার বাধলো!

ফেলা। কি রে, কি ?

ছটাকী। এখন কি কর্‌বি কর্। আজ আর ভাত রাঁধবে নি, এখন কি খাবি ?

ফেলা। তুই কি খাবি ?

ছটাকী। তোর গতর খাব, মড়া! আমি কি খাব—পাটালি সন্দেশ বনাচ্ছে, তাই খাব।

ফেলা। ময়দা এনেছিলুম না, আয় রুটী খাবি আয়—

ছটাকী। রুটী তোর জন্যে গড়্‌চ্ছে!

ফেলা। আরে শোন্ না। ওরা দু' জন লাগে কেন্ না। বলবি ময়দায় কাগে মুখ দিয়েছে, তাই ময়দা বাইরে এনে ফেলা করেছিস্। নিয়ে আয়—ইঁটের উনুনে সেঁকে খাই গে আয়।

ছটাকী। আর গিন্নী এখনই যে ডাক্‌বে।

ফেলা। আ মর্ মাগী, আজ দিন-রেতে কোন্দল মিট্‌লে ত ডাকা কর্‌বে! ঐ দেখছিস্—গলা শুন্‌ছিস্? দু' জনে ধেই ধেই লাচবে;—তুই আয়—ময়দা লিয়ে আয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয়ন-কক্ষ।

এক পাশে খাট-বিছানা, মাঝখানে দেরাজওয়ালা আলমারী। অপর পার্শ্বে আলনায় বুদ্ধিমন্তের জামা-কাপড়। ঘরের এক কোণের দিকে শিকেয় ঝোলান শুচিমণির দুইখানি বস্ত্র।

(বুদ্ধিমন্ত দেরাজের ভিতর হাত দিয়া তাঁহার রক্ষিত নোট আছে কি না দেখিতেছিলেন। শুচিমণি দ্রুত প্রবেশ করিয়াই বলিলেন)—"ওগো, ম্লেচ্ছগিরি কর্‌তে হয়, বাইরে গিয়ে করো। এ যে সম্ব সগ্‌ড়ি মাড়ালে ?"

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্যে]

প্রার্থনা

[শিল্পী—শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী।

বুদ্ধি। (দেরাজে চাবি দিতে দিতে) খুব করেছি—মাড়িয়েছি। বন্ধ ঠিক করেছি, একবার টেনে দেখি?

শুচি। ওগো, পা'টা ধুয়ে ফেলো—

বুদ্ধি। তুমি ধোও গে—(স্বগত) কলটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছে! না, চাবি ঠিক পড়েছে। নোট ক'খানা গোণা হলো না ত! (পুনরায় দেরাজ খুলিয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া) এই একখানা—

শুচি। এই পায়ে জল দিই—

বুদ্ধি। খবরদার, খবরদার বল্‌ছি—পায়ে জল দিও না!

শুচি। না, দেব না!—(এক পায়ে জল দেওন)

বুদ্ধি। বটে, এই আমি ফের মাড়ালুম!

শুচি। দাঁড়াও দাঁড়াও—ও পায়ে জল দিই—

(বুদ্ধিমন্তের পা উঁচু করিয়া ছুটিয়া বেড়ান, ঘটী-হস্তে শুচিমণি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা। বহুক্ষণ পরে পায়ে জল ছড়াইয়া দেওন; বেগে বুদ্ধিমন্তের খাটের উপর উঠিয়া পড়ন)

শুচি। সর্ব্বনাশ কর্‌লে গো—সর্ব্বনাশ কর্‌লে!—বিছানা-মাদুর সব গেল!

বুদ্ধি। সব গেল কি?—এই কাপড়ে পা পুঁছি—

শুচি। বটে, থাক্ আমার ভাতার-ঘর করা!—এই নাও তোমার চাবি, চল্লুম আমি বাপের বাড়ী—

বুদ্ধি। যেও না, যেও না! ও ফেলা, ও ছটাকী—ধর ধর! দেখ দেখি কি কেলেঙ্কার! বাপের বাড়ী চল্লো! ও ছটাকী ফেলার কর্ম্ম নয়, আমিই ধ'রে আনি। (ছুটিয়া যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া) ঐ যা, নোট ক'খানার যে হিসেব হ'ল না। গুণে রেখে যাই,—এই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—ঠিক আছে। (চাবি দিয়া দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া) এ্যাঁ! দশ টাকার নোট ত ওর সঙ্গে গুণলুম না?

(ফেলারামের প্রবেশ)

ফেলা। বাবু, মা ঠাকরুণ এক বিগে চ'লে গেল।

বুদ্ধি। ছটাকীকে ধরতে বল্লি নে কেন?

ফেলা। ছটাকী ধর্‌তে গেল, মার্‌তে ঝাঁক্‌লে।

বুদ্ধি। যা যা, কোথা গেল দেখ। আমি দেরাজটা বন্ধ ক'রেই যাচ্ছি।

[ফেলারামের প্রস্থান।

ধোঁকা হচ্ছে—দশ টাকার নোট ত একশো টাকা ব'লে শুনলুম না? (পুনরায় দেরাজ খুলিয়া) ধরো না কেন, যদি কেউ একশো টাকার নোট একখানা সরিয়ে দশ টাকার নোট একখানা গুঁজে রেখে দেয়। এই একশো টাকা এক খানা—

নেপথ্যে ফেলারাম। বাবু, মা-ঠাকরুণ হন্ হন্ বেরিয়ে পড়চে—

বুদ্ধি। দাঁড়া দাঁড়া—যাচ্ছি। মাথা ঠিক না ক'রে কি গোণা হয়? এই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—হয়েছে। এইবার চাবি দিই। চাবি ঠিক পড়লো কি? টেনে দেখি। (চীৎকার করিয়া) ফেলা, ফেলা, যেতে দিস্‌নি—যেতে দিস্‌নি,—আমি যাচ্ছি। দেরাজটা বন্ধ করতে ভুললুম না ত? (ভুলক্রমে দেরাজটা খুলিয়া—সবেগে টানিয়া ধরণ ও চীৎপাত হইয়া পতন)—ঐ যা! নোটগুলো ত ছড়িয়ে পড়লো না? (উঠিয়া পিট ঝাড়িয়া পুনরায় নোট গুণিতে আরম্ভ করণ)

(ছটাকীর প্রবেশ)

ছটাকী। বাবু, মা ঠাকরুণ বাপের ঘরকে চ'লে গেল।

বুদ্ধি। বটে, থাক্ নোট গোণা! ফেলাকে ডাক্—সব ঘরে থুথু দে! সদর দোরে ময়লা রেখে আয়,—বাড়ী যেন আর না ফেরে! দেখি, কত দিন বাপের বাড়ী থাকে।

ছটাকী। বাবু, আজ কি খাওয়া-দাওয়া কর্‌বেন?

বুদ্ধি। দাঁড়া, আগে উনুনে গয়ের ফেলি গে! খবরদার, আর বাড়ী ঢুকতে দিবি নে।

[ছটাকীর প্রস্থান।

আর দেখতে হবে না, করেছি বন্ধ। ঘরে শিকলি দিই, তালা দিই। তালাটা ত ঠিক আছে? আছে—আছে—শক্ত আছে। যাক্—আজ পাঁওরুটী একখান এনে খেয়ে প'ড়ে থাকি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দর-দালান।

পতি-পত্নীর মনোবিবাদের পর দুই দিন অতীত হইয়াছে। শুচিমণি এখনও পিতৃগৃহে। গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং দর-দালানে দাঁড়াইয়া তাঁহার ভ্রাতৃজায়া অনঙ্গমঞ্জরীর সহিত সুখদুঃখের কথা হইতেছে।

শুচি। জ্বালাতন করেছে, ভাই, জ্বালাতন করেছে!—আমার অপরাধ কি, তা ত শুনলি? সব কথা যদি শুনিস ত কানে আঙ্গুল দিবি। জিনিষপত্র কিছু থাক্‌বার যো নেই, সব জব্দাবে। সে দিন তোর ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলুম। বারাণসী কাপড়-খানা, দেখেছিস্ ত কত দামের? আমিও বাড়ী গিয়ে পৌঁছন,—কি খাচ্ছিল না—কি কচ্ছিল,—অমনি গালে হাত দিয়ে সোহাগ কর্‌লেন,—"এই যে বেশ সেজেছ!"

অনঙ্গ। এঁ্যা, বলিস কি লো! কাপড়খানা কেচে দিলি নি?

শুচি। কেচে দিলুম না! গোবরজলে না কেচে সে কাপড় ঘরে তুলতে পারি, ভাই!

অনঙ্গ। তা ত বটে, তা ত বটে!

শুচি। সব শোন আগে, কি জ্বালাতন হই, আগে শোন! কুলুপটা একটু শক্ত হয়েছে, চাকররা তেল মেখে বাটি ফেলে গেছে, সেই তেলে চাবি ডোবালি!

অনঙ্গ। তোর, বোন্, বড় সহ্যি! সে তালা ফেলে দিলি নি?

শুচি। ফেলে দিলুম না? ফেলে দিয়ে তবে কায!

অনঙ্গ। সে কি লো!

শুচি। তা, বোন্, আর কি করবো বল! ভাতখেকো কাপড়ে বিছানায় গিয়ে শুলো—

অনঙ্গ। তুই আলাদা বিছানা ক'রে দিতে পারিস নি?

শুচি। পোড়া দশা, আমি ওর বিছানায় শুই কি না! আমি মেঝেয় আঁচল পেতে শুই।

অনঙ্গ। তা বেশ কল্লিস

শুচি। বেশ করি আর ছাই, দিদি! জানিস ত স্বভাব? রেতে উঠে একশোবার দেরাজ খুল্‌বে, সিন্দুক খুল্‌বে! তা খুলুক গে, ও আপনি না ঘুমোয় না ঘুমুক গে! কিন্তু আমার এড়ান নাই। সংসার-খরচের টাকা দিয়েছে, রাত-দুকুরে জিজ্ঞেস করে,—"টাকাগুলো বাক্‌সোয় তুলে রেখেছ?" যদি বলি রেখেছি, বলবে—"আর একবার খুলে দেখ না?"

অনঙ্গ। বলতে পারিস্ নি, আঁচলে বেঁধে রেখেছি।

শুচি। ও মা, তা হ'লে নিস্তার আছে? এক দিন আঁচলে বেঁধে রেখেছিলুম।—একশো আটবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তাতেও হলো না; আবার জিজ্ঞাসা কচ্চে, আমি চুপ ক'রে রইলুম। যেই ডেকে ডেকে সাড়া পেলে না, অমনি বিছানা থেকে নেমে এসে আমার গা ঠেলে জিজ্ঞাসা কচ্চে, "ওগো, টাকা ত ঠিক রেখেছ?"

অনঙ্গ। তার পর তুই কি কর্‌লি?

শুচি। কি আর কর্‌বো, বোন্? আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে কলতলায় বস্‌লুম। পোড়া কলে তখন জল নেই। ভোর হলো—কলের জলে গা মাথা ধুয়ে কাযকর্ম্ম কর্‌তে লাগলুম—আর কি কর্‌বো?

অনঙ্গ। তোর ত দেখছি নানান্ দিকে জ্বালা?

শুচি। কত বলবো বোন্—

অনঙ্গ। তা চল, খাবি চল, খেতে খেতে বলবি, শুন্‌বো।

শুচি। এই যাই, দিদি! গঙ্গা নেয়ে রাস্তা দিয়ে এলুম, একবার কলে মাথাটা দিয়ে খেতে বস্‌ছি।

অনঙ্গ। পাল্কীতে নাইতে গিয়েছিলি নয়?

শুচি। হ্যাঁ, বেয়ারা মড়ারা রাস্তায় কি মাড়িয়ে চ'লে এলো—

অনঙ্গ। হ্যাঁ হ্যাঁ, গা-মাথা সব ধুস্—

শুচি। তা ধোব বই কি, দিদি, তা ধোব বই কি!

অনঙ্গ। তবে যা, শীগ্‌গির শীগ্‌গীর সেরে আয়।

[শুচিমণির প্রস্থান।

(ছটাকীর প্রবেশ)

কি রে, তোর বাবু কি কচ্চে?

ছটাকী। এই তালা খুলচে, তালা দিচ্চে! রেতে উঠে ছাদে বেড়িয়ে চৌকি দিচ্চে, আর রেগে গর্‌ গর্‌ কচ্চে! এ ঘরকে থুক্ দিচ্চে, ও ঘরকে থুক দিচ্চে!

অনঙ্গ। কি রে, তোর বাবুর এখনও রাগ পড়েনি না কি ?

ছটাকী। রাগ পড়বে নি ক্যানে ? সারা রাত ঘুমুতে লারচে, গিন্নীমা'কে চোখের আড় করতে পারে !

অনঙ্গ। দুজনে পিরীতও যেমন, ঝগড়াও তেমনই। রেতে ঘুমুতে পারেন না—সোয়ামীর জন্যে। সমস্ত রাত ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদেন, কিন্তু মান ক'রে ব'সে আছেন, না সেধে পেড়ে নিয়ে গেলে যাবেন না।

ছটাকী। ওদিকেও তাই গো—ওদিকেও তাই। খাওয়া রোচেনি, ঘুম হয় নেই, এ দিকে ঝাঁজ কত! বলে "পায়ে এসে পড়ুক, তবে ঘরকে লিব।" তুমি একটা সলা করো।

অনঙ্গ। কি সলা করবো ?

ছটাকী। একটা গুণ-গান করলে হয় নি ?

অনঙ্গ। গুণ-গান কি রে ?

ছটাকী। ফেলা মোকে পাঠিয়ে দিলে। তোমায় নিরেলায় বলবো ব'লে এসেছি।

(শুচিমণির প্রবেশ)

অনঙ্গ। কি লো, খেতে গেলিনি ?

শুচি। না দিদি, কলের সরু ধারায় জল, পাঁচটার সময় জল এলে ভাল ক'রে নেয়ে খেতে যাব।

অনঙ্গ। সে কি লো, দুদিন ধ'রে ভাতে-হাতে কচ্ছিস, আর পাঁচটা পর্য্যন্ত টাঙিয়ে থাক্‌বি ?

শুচি। তাতে কিছু হয় না, আমার অভ্যেস আছে।

অনঙ্গ। তা ব'স, তোর ঝি'র সঙ্গে কথা ক'।

[প্রস্থান।

শুচি। হ্যাঁরে ছটাকী, কর্ত্তা খুব আমোদে আছে,—নয় ? কি কচ্চে ?

ছটাকী। এই ঘরে ন্যাতা বুলুচ্চে, উহুন পাড়চে, কাপড় কচলাচ্ছে—

শুচি। বটে, বটে, ঠেকে শিখেছে ! আমি করতুম কি না ! উঠোনে থুথু ফেলছে ?

ছটাকী। ও মা, থু ফেল্‌বে কি গো ! মুয়ে থুক এলে এক দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে থুক ফেল্‌ছে !

শুচি। কি লো, সদর্‌দোরে থুতু ফেলছে না কি ?

ছটাকী। তা কেন গো, মিত্তিরদের ভিটে পর্য্যন্ত দৌড়ছে—

শুচি। খায়দায় কি রে—খায়দায় কি ?

ছটাকী। ছলা ভিজুলে—চবালে—

শুচি। আমি ত চ'লে এসেছি, এখন বামুন আসুক না। আমি ত তার সঙ্গে লাগতে যাচ্চিনি। ভাত খেতে বলিস, ভাত খেতে বলিস—তা না হ'লে অসুখ করবে।

ছটাকী। সে খাওয়া-দাওয়া বিগে মন আছে কি গো! চোখ দিয়ে ধারা গড়ুচ্চে।

শুচি। তাই ত পোড়াচোখে কি প'ড়লো !

ছটাকী। গিন্নীমা, তুমি যে তেমন লয়, আমাদের গাঁয়ের ময়রা বউ হতো, গুণীন এনে পায়ে ধরা করাতো।

শুচি। না না, সোয়ামীকে পায়ে ধরাতে আছে! কি করেছিল রে—কি করেছিল ?

ছটাকী। তুমি যে সে মানুষ লয় গো, নইলে সে গুণীন আন্‌তুম।

শুচি। সে গুণীন কোথায় ?

ছটাকী। এই ঠায় গো। এখান থেকে দু'রশি ভুঁইও নয়।

শুচি। সে কি করে ?

ছটাকী। সিঁদুর পড়ে—চন্নন পড়ে। যদি একবার প'ড়ে দিলে, মরদকে ঘাড় নুইয়ে এসে বসতে হবে।

(অনঙ্গমঞ্জরীর পুনঃ প্রবেশ)

অনঙ্গ। ওলো, এইবার বুঝি জল এসেছে, এইবার নেয়ে নে।

ছটাকী। তা মাঠক্‌রুণ, লেয়ে লাও, লেয়ে খেয়ে দেয়ে ঘরকে চলো না !

শুচি। সে ঘর আর আমি করি ? মা'র পেটের ভাই ত বটে। হেলায় ছেদ্দায় দুটো অন্ন দেবে, মুখ বেঁকাবে না। আমায় যদি নিতে আসে—দেখা কর্‌বো ?

অনঙ্গ। তুই যা, দিদি, যা। আবার কলে জল থাক্‌বে না।

শুচি। যাচ্চি দিদি—যাচ্চি। ছটাকী, আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাস্ নি।

[শুচিমণির প্রস্থান।

অনঙ্গ। আচ্ছা, ছটাকী, সত্যি গুণীন আছে না কি রে ?

ছটাকী। গুণীন নেই ? তবে তোমার ঘরে সলা করতে এনু কি ?

অনঙ্গ। দেখ, তোর বাবুকে বুঝিয়ে বল্, সে একবার এলেই বাড়ী যাবে।

ছটাকী। হেঁ গো হেঁ,--সে এসছে! বালিসে মুখ গুঁজড়ে কাঁদ্‌বে, তবু নিতে এসবে নি। টঙ্ক কত।

অনঙ্গ। তা কি কর্‌বি?

ছটাকী। দাঁড়াও শুনি,—এসে কি বলে। তার পর তোমায় বল্‌ছি।

অনঙ্গ। দেখ, ব'লে কয়ে দুটি ব'সে খাওয়াস। আজ তিন দিন খায় নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বুদ্ধিমন্তের বাটী

বুদ্ধিমন্ত। ফেলা, কে মাগী তোর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিল?

ফেলারাম। ও রায়গিন্নী গো—রায়গিন্নী।

বুদ্ধি। রায়গিন্নী কে?

ফেলা। ও ভারী গুণীন গো।

বুদ্ধি। তুই জানিস নি, ও চোর।

ফেলা। এজ্ঞে না। মোর ভাগনেকে ফুলপড়া দিয়েছিল। ভাগনে-বউটো হুড়কো। আমার ভাগনা যেই ফুলপড়া নে শুঁক্‌লে, বউবেটী অম্‌নি গড়িয়ে এসে দু'টো পায়ে জড়িয়ে ধর্‌লে। আমি বলেছিলুম একটা টাকা দেব, তাই নিতে এসেছিল।

বুদ্ধি। কি রকম গুণীন্?

ফেলা। ও ভারি গুণীন। সর্ষে মুট্ ধর্‌লে, ফুঁক পাড়লে, আর বল্‌তা ক'রে ওড়ালে! কারু বৌ-বেটায় বনে নি, সিঁদুর পড়লে—অমনি গাঁটে-টাটে সিঁদুর ধর্‌লো।

বুদ্ধি। তুই আজ কি খেয়েছিস্?

ফেলা। খাব আর কি—এই ক'দিনই ত চাল চাবাচ্ছি।

বুদ্ধি। কেন, পয়সা দিচ্ছি, বাজার থেকে খাবার কিনে এনে খেতে পারিস নে কেন?

ফেলা। বাজারের খাবার খাব কি গো? মাঠাকুরুণ তা হ'লে কি ঘর ঢুক্‌তে দেবে?.বল্‌বে—ছোঁচ পড়েছে। তিন দিন গোবর খাওয়া করাবে।

বুদ্ধি। তাকে আর আমি বাড়ী আস্‌তে দিচ্চি নি। হ্যাঁ রে,—হ্যাঁ রে, ঐ কার নাম কর্‌লি? তোর ভাগনেকে কি করেছিল?

ফেলা। বাড়ীকে এলো,—এই কপালে সিঁদুর, এই রাঙ্গা পেড়ে সাড়ী, এই পা ঘুরে বুল্লে, এই ফুল পড়লে! ভাগনাকে বল্লে,—অঙ্গে নো রাখতে পাবিনে। ভাগনা চাবিকাটি ফেলালে,—তার হাতে ফু দিলে –

বুদ্ধি। ওরে, ওরে, দোরে চাবি দিয়েছিস্ ত? দাঁড়া, আমি দেখে আসি।

[বুদ্ধিমন্তের প্রস্থান।

ফেলা। আমি ত বাবুকে বাগাচ্চি, দেখি ছটাকী কি করে।

(বুদ্ধিমন্তের পুনঃ প্রবেশ)

বাবু, মাঠাকুরুণকে ঘরকে আনো কেন্ না?

বুদ্ধি। কি, আবার আমি তাকে বাড়ী আনবো? রাস্তায় হেঁটে বাপের বাড়ী গেল! কতটা অপমান হ'লো।

বুদ্ধি। যদি তোমার পায়ে এসে গোড়ায় গো?

বুদ্ধি। তা সে গড়াবে—তা সে গড়াবে!

ফেলা। গড়ুবে গো, তুমি রায়গিন্নীর ফুলপড়া লাও।

বুদ্ধি। না, তুই যে বল্‌ছিস্, নোয়া কাছে রাখতে দেবে না। চাবি কোথা রাখবো?

ফেলা। সে এমন রায়গিন্নীর গিন্নী লয়! চোর এসবে বল্‌ছ? ঘরবাড়ী বুলে এমন বাঁধন দেবে যে, চোর ঘরে ঢুক্‌বে কি অম্‌নি তার চোখ কাণা হবে। বাবু, আজকে শোয়া করো, দু'চার দিন ঘুমোও নি।

বুদ্ধি। না, আজকে শোব না, রাগে গা গর্ গর্ কচ্চে! ডাকিস্ ত, ডাকিস্ ত—রায়গিন্নীকে ডাকিস্ ত।

ফেলা। সে যে কাল ভোরকে গাঁয় চল্লো গো।

বুদ্ধি। তুই যা, যা,—ব'লে আয়, এই টাকাটা দিয়ে আয়, কাল সকালে নেই গেল। ও সব আমি মানি নি।

ফেলা। তবে তাকে ডাকৃছ কেন ?

বুদ্ধি। শুনি না—শুনি না, কি বলে, শুনি না। দেখ, একবার ছটাকীকে পাঠাস্ ত, কি ক'চ্চে, দেখে আসে। খুব জব্দ হয়েছে, জানিস্ ?

ফেলা। ছটাকীকে পাঠিয়েছিলুম।

বুদ্ধি। ছটাকী কি বল্লে—ছটাকী কি বল্লে ?

ফেলা। বল্লে, খুব লাকাল! এখন আর নায়নি, বাসি কাপড় কাচে নি। বলে, এই করেই কন্দল হয়েছে।

বুদ্ধি। জব্দ হয়েছে—জব্দ হয়েছে। ছটাকী বল্লে না কেন—"চলো না ?"

ফেলা। তা বল্লে, "যাব নেই।"

বুদ্ধি। তার পর ?

ফেলা। আর কাঁদ্‌তে লাগলো, আর কি।

বুদ্ধি। দেখ, ফের ছটাকীকে দিয়ে ব'লে পাঠাস্,—এবার যদি আসে, আমি মাপ কর্‌লুম।

ফেলা। সে এস্‌বে নি, না আনতে গেলে এস্‌বে নি।

বুদ্ধি। বটে—এখনও দম্ভ ভাঙ্গে নি। দেখ, রায়গিন্নীকে ডাকিস্, রায়গিন্নীকে ডাকিস্।—

ফেলা। আপনি এই যে মতলব বাগালেন—পাকা মতলব, —রায়গিন্নীর কাছে ফুলপড়া নাও।

বুদ্ধি। ফুলপড়া আবার কি—ফুলপড়া কি ? তুই তারে ডাকিস্—তুই তারে ডাকিস্। [প্রস্থান।

ফেলা। আমি ত বাগালুম, এখন দেখি ছটাকী কি কল্লে।

[প্রস্থান। *

* গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩১৮ সালের ২৫শে মাঘ তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি বড়দিন উপলক্ষে, মিনার্ভা থিয়েটারের জন্ত একখানি গীতিনাট্য ও একখানি প্রহসন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় কোনখানিই সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। প্রহসনখানি যতদূর লিখা হইয়াছিল, সযত্নে তাহা এত দিন রাখিয়া দিয়াছিলাম ; 'বার্ষিক বসুমতী'র পাঠকমণ্ডলীর প্রীতির নিমিত্ত অদ্য তাহা প্রকাশিত হইল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শিখ-গুরু

কাশ্মীর আর পঞ্জাবে যবে মোগল-অত্যাচার,
দুর্ব্বহ করি' তুলিল নিরীহ প্রজার জীবনভার।
ধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ যত না দেখি উপায় আর,
শিখ গুরুজীর দুয়ারে আসিয়া মাগিল শরণ তাঁর।

"প্রবল মোগল বাদসাহ ক্রূর নিঠুর নির্য্যাতন,
কেমনে রক্ষা পাইবে, হে দেব, দুর্ব্বল প্রজাগণ ?
ধন আর মান গিয়াছে সকলি তুচ্ছ সে ক্ষতি তবু,
ধর্ম্মের প্রতি অপমান প্রাণে কেমনে সহিব, প্রভু !"

কহিলেন গুরু তেগ বাহাদুর "অন্যায় অবিচার,
ঘুচাবার শুধু আছে এক পথ, জানিয়াছি আমি সার।
নিষ্পাপ সাধু যদি কেহ আসি প্রাণ করে বলিদান,
ধর্ম্মের তরে—অত্যাচারের হবে আশু অবসান।"

"কে আছে এমন সাধু দিবে প্রাণ ?" গুরু কহিলেন ডাকি',
ব্রাহ্মণদল রহিল দাঁড়ায়ে নির্ব্বাক্ নত-আঁখি।
"কোন্ সাধুজন বলি দিবে প্রাণ আর্য্য-ধর্ম্ম তরে ?"
সহসা বালক গোবিন্দ আসি' কহিল কোমলস্বরে—

"নিষ্পাপ সাধু তোমা সম, পিতা, হেথায় কে আছে আর,
তুমি বিনা কেবা লবে সনাতন ধর্ম্মরক্ষাভার ?"
প্রসন্নমুখে বালক পুত্রে বক্ষে লইয়া টানি,
কহিলেন গুরু "সংশয় মোর ঘুচাইল তোর বাণী।

জানিনু এখন আমি গেলে চলি' তুই র'বি যত দিন,
পঞ্চনদের শিখ-মণ্ডলী রহিবে না গুরুহীন।
প্রাণ দিতে বলি দিল্লীনগরে আমি চলিলাম তবে,
ধর্ম্মের জয় হবে—নাহি ভয়, ঘরে ফিরে যাও সবে।"

শ্রীসুধীরমোহন ঘোষ

মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল

যে কোন জাতির শিশুগণ ঐ জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ। মেরুদণ্ড জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইলে মানুষ যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ যে জাতির মধ্যে রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশুর সংখ্যা অধিক, সে জাতির ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ নহে। পুনশ্চ শিশুর স্বাস্থ্য মাতার স্বাস্থ্যের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, মাতৃকল্যাণ-সাধন ভিন্ন শিশু-মঙ্গল-সাধন করিবার আশা দুরাশা মাত্র।

শিশুজীবনের কল্যাণ-সাধনের জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই একটা মহতী চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি জেনিভা নগরে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পৃথিবীর সকল দেশের স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ডাক্তার সিকারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল কার্য্যের (Maternity and Child Welfare) সূচনা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিব।

আমাদের বহুমানাস্পদা ভারত-সাম্রাজ্ঞী এবং ভূতপূর্ব্ব বড়লাট-পত্নীদ্বয়ের (লেডী চেমস্‌ফোর্ড ও লেডী রেডিং) উৎসাহে, চেষ্টায় ও উদ্যোগে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত এবং শিশু-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত-সাম্রাজ্ঞী এই শুভানুষ্ঠানের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি এবং ইহার সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার আশাবাণী জ্ঞাপন করিয়া কর্ম্মিগণকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। ভারত-নারী ও ভারত-শিশু-সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদিগের এই সহানুভূতি, শুভ ইচ্ছা ও ঐকান্তিক চেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে অনেক বাধাবিপত্তি ও নিরাশার কারণ অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সকল বাধাবিপত্তি মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া যাইবে এবং এই শুভকার্য্যের ভিত্তি ভারতবর্ষে ক্রমে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়া এ দেশে শিশুজীবনের উন্নতি সম্বন্ধে অশেষ কল্যাণ-সাধন করিবে।

এই শুভ অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের শিশু-সন্তানগণকে রোগ ও অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ ও সবল করা এবং তাহাদের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি-সাধন করা।

এ কথা কাহারও অবিদিত নাই যে, ভারতবর্ষে শিশু-মৃত্যুসংখ্যা যত অধিক, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য-দেশে সেরূপ দেখা যায় না। জন্মের পর এক বৎসরের মধ্যেই আমাদের দেশে গড়ে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ জন শিশু নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতেও শিশু-মৃত্যুসংখ্যা অধিক ছিল। এক্ষণে শিক্ষার বিস্তৃতি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং শিশু-পালন ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন-সমাজের মধ্যে বিস্তৃত-ভাবে প্রচারিত হইবার ফলে বিলাতে শিশু-মৃত্যুর হার বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। এখন লণ্ডনে এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৮ জনের অধিক নহে, অর্থাৎ যে বয়সে ভারতবর্ষে ৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়, লণ্ডনে সেই বয়সে ১ জন মাত্র শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। লর্ড রোণাল্‌ড্‌সে (Lord Ronaldshay) এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, কলিকাতা সহরে প্রতিদিন ১৬ জন এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; চেষ্টা করিলে ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ ১৪ জনকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়।

মানুষের চেষ্টার দ্বারাই বিলাতে শিশুজীবনরক্ষা বিষয়ে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমরা চেষ্টা করিলে আমাদের দেশে কি ঐরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারি না? অবশ্যই পারি। মানুষের চেষ্টায় যাহা অন্য স্থানে সাধিত হইয়াছে, আমরা প্রকৃত পথ ধরিয়া যাইলে এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সেই কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিব। যে সকল কারণের সমবায়ে আমাদের দেশে এত অধিকসংখ্যক শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহাদিগের সমুচিত প্রতীকার করিতে পারিলেই দেশ হইতে এই অমঙ্গল একেবারে নির্ম্মূল না হউক, ইহা যে অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, শিশু-দিগের স্বাস্থ্যহীনতা, রোগপ্রবণতা ও অকালমৃত্যুর কি কি

কারণ আমাদের দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সে সকলের প্রতীকারের উপায়ই বা কি ?

এই অমঙ্গলের প্রথম ও প্রধান কারণ—দেশব্যাপী **অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার।** যেখানে অজ্ঞানতা, সেইখানেই কুসংস্কারের প্রবল আধিপত্য। বাস্তবিক, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার একত্র মিলিত হইয়া আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যে কি মহা অনিষ্টসাধন করিতেছে, তাহা স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে ক্ষোভ ও নিরাশায় হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। দেশে শিক্ষার সম্যক্ বিস্তার ভিন্ন এই অমঙ্গলনিরাকরণের প্রকৃষ্ট উপায় আর দ্বিতীয় নাই। এক জন গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালার প্রত্যেক রুগ্ন এবং প্রত্যেক মৃত শিশু আমাদিগের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার এবং জাতীয় অকর্ম্মণ্যতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শিশু-মৃত্যুর হার জাতীয় উন্নতি বা অবনতির পরিচায়ক, এ কথা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই।

ভারতবর্ষে শতকরা ৭ জন মাত্র লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে। আবার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ২ জন মাত্র লেখা-পড়া জানে, বাকী ৯৮ জন একেবারে নিরক্ষর। বিলাতে ও জাপানে শতকরা ৯৯ জন লোক শিক্ষিত-পদবাচ্য। যদি আমরা শিক্ষাকে আলোকের সহিত এবং মানুষকে গৃহস্থিত আলোকপ্রবেশ-দ্বারের সহিত তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষে শিক্ষালোক-প্রবেশের জন্য ১ শত দ্বারের মধ্যে কেবলমাত্র ৭টি খোলা রহিয়াছে, বাকী ৯৩টি দ্বার একেবারে রুদ্ধ। বিলাতে সেই স্থানে শিক্ষালোকপ্রবেশের জন্য ৯৯টি দ্বার উন্মুক্ত। ইহাতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, আমাদের দেশ শিক্ষার আলোক সম্বন্ধে কিরূপ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই শিক্ষার অভাবই আমাদের যত দুর্দ্দশার কারণ। শিক্ষার বিস্তারের সহিত আমাদের দেশের লোক (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ) স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রসূতিচর্য্যা ও শিশু-পালনের নিয়মাবলী যত অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারিবে, শিশুদিগের রোগ সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে এবং তাহাদিগের অকাল-মৃত্যু সেই পরিমাণে নিবারিত হইবে। অতএব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা যাহাতে শীঘ্র বিস্তার লাভ করে, তাহার সদুপায় অবলম্বন করা রাজা ও প্রজা উভয়েরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রচলন-ব্যবস্থার যে সূচনা হইয়াছে, তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে প্রভূত মঙ্গলের আশা করা যায়। তবে বালকদিগের ন্যায় বালিকাগণের মধ্যেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

দেশের সর্ব্বত্রই স্ত্রীশিক্ষার জন্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে আমরা যৎসামান্যমাত্র অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছি। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত ঔদাসীন্য এখনও লক্ষিত হয়। এখনও অনেকের ধারণা যে, স্ত্রীশিক্ষা একটা সৌখীনতার সামগ্রীমাত্র; পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার যেরূপ অবশ্য-কর্ত্তব্য, কন্যা সম্বন্ধে সেরূপ নহে। কন্যার শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা এখনও অনেকেই অপব্যয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অর্থাভাবে, নূতন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা দূরে থাকুক, যেগুলি আছে, তাহাদিগের কৃতকার্য্যতার সহিত পরিচালন অনেক স্থলে বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যালয়সমূহে বালক-বালিকাগণকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি শিক্ষা দিবার যথোচিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। কোমলমতি বালক-বালিকাগণের হৃদয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি অল্পবয়স হইতে বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহারা আজীবন তাহা পালন করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাদের সু-অভ্যাস তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যৎ বংশাবলীর উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিবে।

আমাদের প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের বালিকাগণ ১১।১২ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিয়া থাকে। বিবাহের পর প্রায় কোন বালিকাকে বিদ্যালয়ে যাইতে দেখা যায় না। সুতরাং এত অল্পবয়সের মধ্যে তাহারা যৎসামান্যমাত্র শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। বিবাহের পর অধিকাংশ বালিকার প্রকৃত শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়; কেবল অসার উপন্যাস ও নাটকাদি পাঠ করিয়া তাহারা সুশিক্ষার পরিবর্ত্তে কুশিক্ষা লাভ করে। এই জন্য আমাদের দেশে অন্তঃপুরশিক্ষার সুব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে আমরা এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে অতি অল্পই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছি। অন্তঃপুরশিক্ষা-বিস্তার

লাভ করিতে হইলে বহুসংখ্যক শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতের জন্য দেশে মালমসলা যথেষ্ট আছে। আমাদের দেশে অনেকানেক বিধবা স্ত্রীলোক অপরের গলগ্রহ হইয়া, আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া, অতি কষ্টে উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন। এই সকল অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া যদি সুশিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশে অন্তঃপুরশিক্ষার একটা সুব্যবস্থা সহজে হইয়া যায় এবং ইঁহারাও সম্মানের সহিত স্বাবলম্বন আশ্রয় করিয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন। সুখের বিষয় এই যে, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরে এই কার্য্যের সূচনা হইয়াছে। কলিকাতার "ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল" এবং "নারীশিক্ষা সমিতি" স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারকল্পে এবং অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী-গঠনে সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বালকবালিকাদিগের উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য এক দল উপযুক্ত শিক্ষকের আবশ্যক। শিক্ষক গড়িবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান (Training schools and colleges for teachers) আছে, তথায় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান "হাতে-কলমে" শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং প্রত্যেক শিক্ষক এই বিষয়ে যাহাতে পারদর্শিতা লাভ করেন, তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। সম্প্রতি শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃগণ বালক ও বালিকাদিগের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন। ইহাতে যে বিশেষ সুফল দর্শিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য অনেক উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। অনুপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-শিক্ষার ভার পড়িলে ফল নিতান্তই মন্দ হইবে। অতএব এই সময় হইতে কর্ত্তৃপক্ষগণের বিদ্যালয়সমূহে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য অধিকসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

সহজ এবং সরল ভাষায় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইলে বিশেষ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী, সেন্ট্রাল আন্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটী প্রভৃতি সমিতির দ্বারা বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। "স্বাস্থ্য সমাচার," "স্বাস্থ্য," "সোনার বাংলা" প্রভৃতি সুলভ মূল্যের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকাগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী দেশের লোকের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচার সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। এই কার্য্যের অধিকতর প্রসার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

জনসাধারণের মধ্যে ম্যাজিক্ লণ্ঠন সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষা, সংক্রামক রোগনিবারণ, প্রসূতি-পরিচর্য্যা, শিশুপালন প্রভৃতি সমাজরক্ষার অনুকূল বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহজ ভাষায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলে লোক-শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়। শুদ্ধ সহরে নহে, পল্লীগ্রামের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এবং গ্রামে গ্রামে এইরূপ জনশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ যাহাতে এই সকল বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা পান, তদ্বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত। এক্ষণে এ সম্বন্ধে দেশের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের ও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মহতী চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। "বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী," "আন্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটী" কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতাস্থিত স্বাস্থ্যসমিতিসমূহ এবং গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিভাগ এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহাদের উদ্যোগে দেশের লোকের হৃদয়ে স্বাস্থ্যবিবেক ক্রমশঃ জাগরূক হইয়া উঠিতেছে। দেশের নানা স্থানে মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর (Health Exhibition) যে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর প্রচার সম্বন্ধে সবিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

লেডী রেডিংএর নিখিল ভারতব্যাপী শিশুপ্রদর্শনীর (Annual Baby Show) ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য—শিশু-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রচার। এই উপলক্ষে শীতকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই প্রায় এক সপ্তাহকাল স্থানীয় শিশুসন্তানগণকে একত্র করিয়া সুস্থ ও সবল শিশুদিগের জননীগণের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হয় এবং তদ্ব্যতীত একটি স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষে ম্যাজিক্ লণ্ঠন সাহায্যে সহজ ভাষায় প্রসূতিপরিচর্য্যা, শিশুপালন, সংক্রামক রোগনিবারণ, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সহজ ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদেশপূর্ণ বক্তৃতার আয়োজন এবং চিত্র (Chart) ও মডেল্ (Models) সাহায্যে এই সকল বিষয়ে "হাতে-কলমে" শিক্ষা দিবার

ব্যবস্থা করা হয়। শিশুপ্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা হইবার পর দেশের মধ্যে মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল (Matenity & Child-welfare) সম্বন্ধে একটা নবজাগরণ উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে শিশুজীবনের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন বড় লাটপত্নী লেডী ডফরিণ এ দেশের মাতৃমঙ্গল অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ রোগ হইলে, বিশেষতঃ সন্তান প্রসবের সময়ে পুরুষ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে অনেক সময়ে একেবারেই সম্মত হয়েন না। ইহার ফলে অনেক স্ত্রীলোক সুচিকিৎসার অভাবে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইয়া থাকেন এবং অনেকে অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন। এই বিষম অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ইহার প্রতীকারের জন্য লেডী ডফরিণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভারত-রমণীর স্ত্রী-ডাক্তার সাহায্যে চিকিৎসার এবং স্ত্রীলোকগণের ডাক্তারী ও রোগীর শুশ্রূষা শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে বহুসংখ্যক ভারত-রমণী রোগের যন্ত্রণা ও অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে এবং প্রসূতি-পরিচর্য্যার সুবিধা হেতু প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর সংখ্যার হ্রাস হইতেছে। এই শুভানুষ্ঠানের জন্য লেডী ডফরিণের নাম ভারতের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ভূতপূর্ব্ব বড়লাটপত্নী লেডী হার্ডিঞ্জ দিল্লী সহরে স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিবার জন্য স্বতন্ত্র মেডিকাল্ কলেজ স্থাপন করিয়া দেশে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কার্য্য অগ্রসর হইবার পক্ষে সবিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

অনেক স্থলে **প্রসূতির স্বাস্থ্যহীনতার** জন্য শিশুসন্তানের অকাল-মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির দেহে রোগের সঞ্চার হইলে অথবা শরীর দুর্ব্বল থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় রোগ-প্রবণতা লইয়া দুর্ব্বল শিশুর জন্ম অবশ্যম্ভাবী এবং এরূপ দুর্ব্বল শিশু সামান্য রোগের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। গর্ভিণীর দেহ যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে এবং তাহার চিত্ত যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও উদ্বেগশূন্য থাকে, তদ্বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে, এ সম্বন্ধে আমাদের গৃহে অধিকাংশ স্থলেই অমনোযোগিতা ও নিতান্ত ঔদাসীন্য লক্ষিত হয়। গর্ভিণীর জন্য যথেষ্ট পুষ্টিকর এবং ভাইটামিন্-সংযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যের ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, এই সময়ে তাহার নিজের ও গর্ভস্থ শিশু-সন্তান, এই দুই প্রাণীর দেহরক্ষার জন্য আহার সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্তন্য দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিতে হয়। আমাদের অন্তঃপুরিকাগণ স্বভাবসুলভ লজ্জা ও প্রশংসনীয় আত্ম-বিস্মৃতি বশতঃ নিজেদের আহার সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন থাকেন এবং পুরুষগণও এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। গৃহে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্যের আয়োজন হয়, অনেক সময়ে তাহা পুরুষদিগেরই ভোগে আইসে। দৈবাৎক্রমে যদি কিছু উদবৃত্ত হয়, তবেই স্ত্রীলোকগণ তাহা আপনাদিগের মধ্যে যৎকিঞ্চিন্মাত্র বণ্টন করিয়া লইয়া থাকেন। ইহার ফলে উপযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যের অভাবে আমাদের নারীজাতি দিন দিন হীনশক্তি হইয়া পড়িতেছে এবং বন্ধ্যা প্রভৃতি কতিপয় রোগ (পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব যাহার উৎপত্তির সহায়তা করে) তাঁহাদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যাইতেছে। দুধ, মাছ, টাট্‌কা তরিতরকারী ও ফলমূল ইত্যাদি ভাইটামিনপূর্ণ আহার্য্য দ্রব্য গর্ভাবস্থায় এবং সন্তানপ্রসবের পর অন্ততঃ এক বৎসরকাল প্রসূতির খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা একান্ত আবশ্যক। আমাদের গৃহে ইহার যথোচিত ব্যবস্থা হইলে শিশুমৃত্যুসংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকা স্ত্রীলোকগণ কঠোর দেশাচার নিবন্ধন প্রকৃতির অযাচিত দান—বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক—যথেষ্ট সেবন করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন না। বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক জীব এবং উদ্ভিজ্জগতের জীবনস্বরূপ। ইহাদের অভাবে আমাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও জীবনীশক্তির বিকাশের সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। সূর্য্যকিরণসংস্পর্শে জীব ও উদ্ভিদ্‌দেহের মধ্যে পুষ্টি ও বৃদ্ধির অনুকূল ভাইটামিন্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। **অবরোধ-প্রথার** জন্য আমাদের গৃহে নারীগণ এই দুইটির মধ্যে কোনটিই অবাধে ভোগ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন না। ইহাতে তাঁহাদের দেহ সম্যক্ পুষ্টিলাভ

করে না, তাঁহাদের জীবনীশক্তি কমিয়া যায়, তাঁহাদের রক্তহীনতা রোগ (Anaemia) উপস্থিত হয়, তাঁহাদের রোগপ্রতিষেধক্ষমতার হ্রাস হয় এবং পুনঃ পুনঃ সন্তানের জননী হইবার জন্য তাঁহারা হয় সূতিকা, নহে ত যক্ষ্মারোগে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। বর্ত্তমান সময়ে সহর অঞ্চলে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। কলিকাতা সহরে যক্ষ্মারোগে স্ত্রীলোকের মৃত্যু-সংখ্যা পুরুষের মৃত্যুহারের প্রায় ৫ গুণ অধিক। **দুর্ব্বল দেহে পুনঃ পুনঃ গর্ভ-ধারণ** এবং **অবরোধ-প্রথার** দোষে উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক সেবনের অভাব ইহার অন্যতম কারণ। হিন্দু রমণী অপেক্ষা মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ঘটিতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সমাজে অবরোধ-প্রথার ব্যবস্থা অধিকতর কঠোর। যেখানে মুক্ত বাতাস ও সূর্য্যালোকের অবাধ সঞ্চার হয়, তথায় যক্ষ্মারোগের বীজ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, উহা শীঘ্রই মরিয়া যায়। প্রকৃতির এরূপ সুব্যবস্থা থাকিলেও অজ্ঞানতা ও অন্ধ দেশাচারের দাসত্ব নিবন্ধন কি অসুবিধা ও অমঙ্গলকে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া লইয়া আসি !

অনেক প্রসূতি প্রসবের পর "সূতিকা" রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। এই রোগে দেহ এরূপ কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া যায় যে, রুগ্না জননীর পক্ষে স্তন্যদান দ্বারা শিশুপালন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য অনেকানেক শিশু চির-রুগ্ন এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গর্ভাবস্থায় প্রসূতির দেহে অনেক উৎকট রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যথাসময়ে এই সকল রোগের চিকিৎসা না হইলে জননী ও শিশু, উভয়েরই দেহ চির-দিনের জন্য অপটু হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলে সামান্য রোগের আক্রমণে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের পর প্রসূতির যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলে অনেক প্রসূতি ও শিশুকে আমরা অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি। যাহারা অবস্থাপন্ন লোক, তাহাদের পক্ষে এ বিষয়ের ব্যবস্থা করা সহজ, কিন্তু অনেক সময়ে যথোচিত জ্ঞান ও দূর-দর্শিতার অভাবে তাহাদিগের গৃহেও ইহার প্রতীকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় না। সামান্য অবস্থার লোকে অর্থাভাবে ও অজ্ঞানতা নিবন্ধন ইহার ব্যবস্থা করিতে একেবারেই অসমর্থ। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান দেশের জন-সাধারণের মধ্যে যাহাতে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হয়, তাহার সুব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদিগকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে সরল উপদেশ, ম্যাজিক্ লণ্ঠন সাহায্যে সহর ও গ্রামের সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-বিষয়ক মূলতত্ত্বগুলির প্রচার, দেশের সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা, মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক নিযুক্তা শিক্ষিতা ধাত্রীগণ কর্ত্তৃক অন্তঃপুরমধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী সরল ও সহজভাবে বুঝাইয়া দেওয়া, দেশের মহিলা-সমিতি কর্ত্তৃক নারীসমাজমধ্যে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে আন্দোলন ও তাহার পালনের যথোচিত ব্যবস্থা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিলে জাতির স্বাস্থ্যবিবেক উদ্বোধিত হইবার আশা করা যাইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে এই সকল ব্যবস্থার সূচনা হইয়াছে এবং এই অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সুফল প্রসব করিয়াছে। দিন দিন যাহাতে এই সকল ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে দেশমধ্যে প্রচলিত হয়, গভর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রসূতি এবং সদ্যঃপ্রসূত শিশুর উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে অনেকানেক জননী ও শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অস্বাস্থ্যকর প্রসব-গৃহ, সাধারণ ধাত্রীর অজ্ঞতা ও অপরিচ্ছন্নতা, কতিপয় প্রাচীন কুসংস্কার ও কদাচারের দাসত্ব, প্রসবকালে বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত সাহায্যের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে অনেক প্রসূতি ও শিশুর সূতিকাগারেই অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্য পাইলে এই বিপদের হস্ত হইতে অনায়াসে রক্ষা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ধাত্রীর অজ্ঞতা নিবন্ধন নাড়ী কাটিবার দোষে ধনুষ্টঙ্কার রোগে অনেক শিশুর অকালমৃত্যু সংঘটিত হইত। উপদেবতার উপদ্রবে এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণ লোক ইহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলিত। শিক্ষিতা ধাত্রীর আবির্ভাবের সহিত এই রোগ এক প্রকার অদৃশ্য হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এই সকল বিপদ্ নিবারণের জন্য বড় বড় সহরে "প্রসূতি-আশ্রম" (Maternity Home) স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে প্রসূতিগণ অভিজ্ঞ মেয়ে ডাক্তার ও শিক্ষিতা ধাত্রীর দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া থাকে এবং রোগীর থাকিবার ব্যবস্থাও সুন্দর। আমাদের সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে প্রসবগৃহের অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং তন্মধ্যে কতিপয় কুসংস্কার-মূলক-ব্যবস্থার প্রভাবে অনেক জননী ও শিশুর উৎকট ব্যাধি উৎপন্ন ও অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রসূতি-আশ্রমে গমন করিলে এই বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। গরীব গৃহস্থ-ঘরের অনেক স্ত্রীলোক এক্ষণে প্রসবের পূর্ব্বে এই সকল প্রসূতি-আশ্রমে যাইয়া চিকিৎসিত হইতেছেন এবং এই কারণে কলিকাতায় জননী ও শিশুর প্রসবকালীন মৃত্যুসংখ্যা কতক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এক্ষণে অনেক বড় বড় সহরে এইরূপ আশ্রমের ব্যবস্থা করা হইতেছে; ইহাদিগের প্রসারে দেশের মধ্যে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুসংখ্যার যে সবিশেষ হ্রাস সংঘটিত হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কলিকাতার নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটে (দর্জ্জিপাড়া) একটি এবং ভবানীপুরে আর একটি প্রসূতি-আশ্রম কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দর্জ্জি-পাড়ার প্রসূতি-আশ্রমে এককালে প্রায় ৩০ জন প্রসূতির চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এক জন সুযোগ্য লেডী ডাক্তার এই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক ও চিকিৎসক। এই আশ্রমের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে এবং ইহার সাফল্য ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনেক প্রসূতি ও শিশু কঠিন রোগ ও অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে। কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে এইরূপ প্রসূতি-আশ্রমের অধিকতর বিস্তার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অবরোধপ্রথা নিবন্ধন যে সকল স্ত্রীলোক প্রসূতি-আশ্রমে আসিতে আপত্তি করিবে, প্রসবকালে তাহা-দিগের নিজ নিজ গৃহে বিনা খরচে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে ইহার সুব্যবস্থা কতক পরিমাণে হইয়াছে, কিন্তু ইহার যথেষ্ট প্রসার একান্ত প্রার্থনীয়। কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটী কয়েক জন অভিজ্ঞ লেডী হেল্‌থ ভিজিটার্ (Lady Health Visitor) এবং তাঁহাদিগের অধীনে কতকগুলি শিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া এই সহরের গরীব লোকদিগের অন্তঃপুরে গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল লেডী ডাক্তার ও ধাত্রীগণ গরীব গৃহস্থগণের অন্তঃপুরে গমন করিয়া গর্ভিণী স্ত্রীলোক-গণকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দেন, কোন রোগ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, প্রসবকালে উপযুক্ত সাহায্য এবং প্রয়োজন হইলে ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ অভিজ্ঞ ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। সদ্যঃ-প্রসূত শিশুর পরিচর্য্যা ও তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা সযত্নে সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদিগের জন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা তাঁহারাই করিয়া থাকেন। ইহার জন্য গৃহস্থের এক পয়সাও খরচ করিতে হয় না। যত দিন না প্রসূতি ও শিশু-সন্তান রোগমুক্ত ও সুস্থ হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তথায় আসিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এই সুব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া অবধি কলিকাতা সহরে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুসংখ্যা কতক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরে এত অধিক লোকের বাস যে, আরও অধিকসংখ্যক লেডী হেল্‌থ্ ভিজিটার্ এবং শিক্ষিতা ধাত্রীর এই কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। যাহাতে সহরের প্রত্যেক গরীব গৃহস্থ এই সুব্যবস্থার সুফল লাভ করিতে পারে, তদনুযায়ী ব্যবস্থা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে কাউ-ন্সিলরগণ জনসাধারণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবেন। ডাক্তার ক্রেক্ হেল্‌থ অফিসারের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই সকল সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ন্যায় মফঃস্বলের প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক শক্তি অনুসারে এইরূপ ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। দুই এক জন অভিজ্ঞ ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তত্তৎস্থানের প্রসূতি ও শিশুগণের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিলে অনেক জননী ও শিশুসন্তান

অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু শিক্ষিতা ধাত্রীর সংখ্যা এত অল্প যে, মফঃস্বলের সর্ব্বত্র উহাদিগের নিয়োগ এক প্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই জন্য আপাততঃ মফঃস্বলে যে সকল প্রাচীন প্রথার দেশীয় ধাত্রী আছে, তাহাদিগের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহারা উপযুক্ত ডাক্তার ও ধাত্রীর নিকট বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে কিছু দিনের জন্য জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা করিলে বর্ত্তমান অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে। যৎসামান্যভাবে স্থানে স্থানে এই শিক্ষা-কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা সহজেই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। যে সকল ধাত্রী শিক্ষার জন্য আসিবে, তাহাদিগকে মাসিক কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য করিলে তাহারা আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। শিক্ষা শেষ হইলে উপযুক্ত পরীক্ষার পর ইহাদিগকে প্রশংসাপত্র (Certificate) দেওয়া হইবে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে যে সকল ধাত্রী এইরূপ প্রশংসা-পত্র দেখাইতে পারিবে না, আইন-প্রণয়ন দ্বারা তাহাদের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিলে সমাজ অশিক্ষিতা ধাত্রীর বিপজ্জনক চিকিৎসা হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে।

যে সকল স্ত্রীলোক অবরোধপ্রথা পালন করেন না, তাঁহাদের জন্য সহরের স্থানে স্থানে "**প্রসূতি-পরি-দর্শনাগার**" (Antenatal Clinic) স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবের পর জননীগণ এই স্থানে আসিলে লেডী ডাক্তারের দ্বারা তাঁহারা পরীক্ষিত ও চিকিৎসিত হইবার সুবিধা পাইবেন এবং প্রয়োজন হইলে বিনামূল্যে তাঁহাদের ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করা হইবে।

শিশুদিগের স্বাস্থ্য-পরিদর্শন ও চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে **শিশু-পরিদর্শনাগার** ("বেবি ক্লিনিক্", Baby Clinic) স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের অনেকানেক বড় সহরে সম্প্রতি ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল স্থানে শিশুদিগকে স্নান করাইবার, পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিবার, তাহাদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার, তাহাদিগের ওজন লইবার এবং প্রয়োজন হইলে বিনামূল্যে তাহাদিগকে ঔষধ, পথ্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিশুদিগকে প্রয়োজনমত সপ্তাহে দুই তিন দিন তাহাদিগের মাতা বা অপর আত্মীয়স্বজন এই স্থানে লইয়া যায় এবং উপযুক্ত উপদেশ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করে। এই সকল প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমাদের দেশের শিশু-জীবনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতেছে। মফঃস্বলের প্রত্যেক সহরে এইরূপ ব্যবস্থার প্রচলন আবশ্যক। ইহা দ্বারা অনেক শিশু ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের আক্রমণ ও অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে।

আমাদের দেশে আর একটি দেশাচার শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ। হিন্দুসমাজে **বাল্যবিবাহ** প্রচলিত থাকার জন্য দেহ পূর্ণভাবে পরিপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই অনেকে একাধিক সন্তানের পিতৃমাতৃপদ-গৌরবের অধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষের পক্ষে ২৫ বৎসর এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্ততঃ ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে যথাক্রমে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের অধিকারী হওয়া পিতামাতা এবং সন্তান, সকলের পক্ষেই প্রভূত অনিষ্টকর। অপরিণতদেহ পিতামাতা হইতে সবল সুস্থ সন্তান কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ে যে উপদেশ থাকুক না কেন, ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদে এ সম্বন্ধে যে নীতি পালন করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌ভাবে পালন করিলে আমরা ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ মঙ্গলের অধিকারী হইব। সুশ্রুত এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছেন যে, ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত। তাঁহার মতে ইহার ন্যূন বয়সে সন্তান জন্মিলে ঐ শিশু গর্ভ-মধ্যেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অথবা অতি অল্পবয়সেই উহার মৃত্যু হয় কিংবা যদি ঐ শিশু বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে চির-দিন দুর্ব্বল দেহ ধারণ করিয়া রোগভোগ করিবে। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে স্বয়ংবর-প্রথা প্রচলিত ছিল। ইন্দুমতী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সংযুক্তা প্রভৃতি বরণীয়া আর্য্যা রমণীগণ বিবাহকালে যে দুগ্ধ-পোষ্যা বালিকা ছিলেন না, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। অপূর্ণ-দেহ পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততি দেহবিকাশসম্বন্ধে পূর্ণত্ব কখনই লাভ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের দেহ চিরদিন একটা দৌর্ব্বল্যের অধীন থাকে, যথাপরিমাণ জীবনীশক্তির অভাবে তাহারা সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে

শৈশব অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহলীলা সংবরণ করে। সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে পুত্র-কন্যার বিবাহের বয়স পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জনসাধারণের মধ্যে এই অনিষ্টকর দেশাচার এখনও প্রবলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার সংস্কার হইলে দেশে শিশু-মৃত্যুসংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। সে দিন দেশপূজ্য মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

পিতামাতার **সংযমের অভাব** শিশু-মৃত্যুর অপর একটি কারণ। অনেক স্থলে অল্পবয়স্কা জননীগণ প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে নিতান্ত হীনস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে গর্ভস্থ শিশু-সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল, এমন কি, বিকলাঙ্গ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পরিণতি ও জীবনীশক্তির অভাবে এই সকল দুর্ব্বল শিশু জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশেষতঃ সামান্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহে অধিকসংখ্যক সন্তান-সন্ততি জন্মিলে তাহাদিগের জন্য যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্য এবং শীতাতপনিবারণোপযোগী বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয় না। ইহার অভাবে হীনস্বাস্থ্য শিশু আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ বিষয়ে পিতামাতার গুরুতর দায়িত্বজ্ঞান পরিস্ফুট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর্য্য-ঋষিগণ-নির্দ্দিষ্ট সংযমের নিয়মাবলীর পালন অবহেলা করিয়াই আমরা আজ এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।

সহর অঞ্চলে যথোচিত পরিমাণ **বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব** শিশু-মৃত্যুর অপর একটি কারণ। গোদুগ্ধ শিশুর জীবন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতা সহরে গরীব লোকের পক্ষে শিশু-সন্তানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ দুগ্ধ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থলে অর্থব্যয় করিয়াও বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যায় না। দুগ্ধের অভাবে শিশু-সন্তানদিগকে বিবিধ অপুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময়ে নানাপ্রকার বিলাতী ও দেশী কৃত্রিম খাদ্য শিশুর জন্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুগ্ধের মধ্যে অন্যান্য সার-পদার্থের সহিত ভাইটামিন্ (Vitamine) যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। বিবিধ জাতীয় ভাইটামিন্ শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক। কৃত্রিম শিশু-খাদ্যজাতীয় পদার্থের মধ্যে ভাইটামিনের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং শিশুর জীবনরক্ষার পক্ষে উহাদিগকে এক প্রকার অসার খাদ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ দেশের মধ্যে যাহাতে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে অল্পমূল্যে উহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটী এবং দেশনেতৃগণ একত্র হইয়া এ বিষয়ের সুব্যবস্থা না করিলে সহজে এই অত্যাবশ্যক দুরূহ সমস্যার পূরণ হইবে না। সবল শিশুজীবন, ভবিষ্যৎ সবল সুস্থ ও কর্ম্মঠ জাতি-গঠনের ভিত্তি-স্বরূপ। উপযুক্ত আহারাভাবে আমাদিগের শিশুজীবন দুর্ব্বল হইলে আমাদিগের জাতিকে চিরদিন দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য জীবনের ভার বহন করিতে হইবে এবং জাতির মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যার হারও অধিক থাকিবে।

ভারতের অভাবনীয় **দারিদ্র্য** জননী ও শিশুদিগের জীবন-ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ। অর্থাভাবে অধিকাংশ লোক যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না, শীতাতপ নিবারণের জন্য উপযুক্ত বস্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত থাকে এবং অতি অপরিষ্কৃত স্থানে অস্বাস্থ্যকর বাস-গৃহমধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, শরীর দুর্ব্বল হয় এবং জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া তাহারা সহজে রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অমঙ্গল নিরাকরণের একমাত্র উপায়, দেশে অধিকতর অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করা।

দেশে অধিকতর অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে গতানুগতিক শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। যে শিক্ষা দ্বারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়, সেইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন না হইলে জাতীয় দারিদ্র্যের কোন কালে অপনোদন হইবে না। বাস্তবিক দেশের লোকের মতি-গতি এ দিকে না ফিরিলে আমাদের বাঁচিবার আশা নাই।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারের স্ত্রীলোকগণ নানারূপ গৃহ-শিল্প-কার্য্য করিয়া অল্পবিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাহাতে সংসারের ব্যয় সঙ্কুলানের সবিশেষ সুবিধা হইত এবং নিঃসহায়া দরিদ্রা রমণীগণ নিজেদের

অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইতেন। এখন সে সকল শিল্পের আদর বা প্রচলন না থাকাতে সাধারণ গৃহস্থ-রমণীগণ নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন এবং অনেকেই পরমুখাপেক্ষিণী হইয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। এখন পুরাতন কুটীর-শিল্প লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আধুনিক পছন্দের সীবন, বুনন, লেশ ও চিকণ প্রস্তুতকরণ, জরির কায, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ, তাঁতের কায ইত্যাদি গৃহ-শিল্পকার্য্য উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা সহরে ও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে এই সকল গৃহ-শিল্পশিক্ষার অল্পবিস্তর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'নারীশিক্ষা-সমিতি', 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি," 'মহিলা শিল্পাশ্রম' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীজাতির মধ্যে শিল্পশিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গৃহস্থ মহিলাগণ এই সকল শিল্প উত্তমরূপে শিক্ষা করিলে স্বাবলম্বনলাভ ব্যতীত পারিবারিক দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সমাজে সকল শ্রেণীর মধ্যে অকাল-মৃত্যুর হ্রাস হইবে।

কলিকাতা সহরের বস্তিগুলি নিতান্ত অপরিষ্কৃত ও অস্বাস্থ্যকর। অধিকাংশ গরীব লোক এই সকল বস্তির মধ্যে বাস করে। তাহাদের বাস-গৃহগুলি যেরূপ সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কৃত, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকেরও তদ্রূপ অভাব। বাসগৃহগুলি সর্ব্বদা আর্দ্র ও দুর্গন্ধপরিপূর্ণ থাকে। অবরোধপ্রথা বশতঃ প্রসূতি ও শিশুগণ সর্ব্বদা এইরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে আবদ্ধ থাকে, সুতরাং তাহারা যে দুর্ব্বল ও হীনস্বাস্থ্য হইবে এবং বিবিধ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া অকাল-মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট প্রতিষ্ঠার পর হইতে কলিকাতার বস্তি সম্বন্ধে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু এই সংস্কার-কার্য্য পূর্ণভাবে সম্পন্ন হইতে এখনও অনেক বাকী। এই সকল বস্তির স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর বিশেষ কোনরূপ পৃথক্ বন্দোবস্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল অস্বাস্থ্যকর বস্তি হইতেই কলিকাতা সহরে যাবতীয় সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হয় এবং উহা শীঘ্রই সহরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যালিটী যদি বস্তিগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগ দেন, তাহা হইলে কেবল যে বস্তির অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, তাহা নহে, সমস্ত কলিকাতাবাসী এই কার্য্যের সুফল ভোগ করিবে এবং সহরে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে এবং অনেক জননী ও শিশুসন্তান অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক নিযুক্তা ধাত্রী ও স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ এই সকল বাস-গৃহ ও বস্তি পরিদর্শন করিয়া, যাহাতে বাস-গৃহগুলি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকে, তৎসম্বন্ধে গৃহস্বামিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এবং তাঁহাদের উপদেশ যাহাতে (মিউনিসিপ্যালিটী নিজ হইতে খরচ ও লোকের ব্যবস্থা করিয়া) কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিলে **বাসগৃহ ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির সহিত শিশু-জীবনের উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সহরের প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে।**

বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা বোম্বাই অঞ্চলে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কার্য্য অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে অধিকতর অনুরাগ, প্রচেষ্টা ও কর্ম্মবাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই সহরে বিধবাদিগের বিবিধ শিল্পকার্য্য, ধাত্রী-বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিবার জন্য কতকগুলি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক ভদ্র-বংশীয়া মহিলা এই সকল আশ্রমে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব উপজীবিকা অর্জ্জনোপযোগী বিবিধ ব্যবসা শিক্ষা করিতেছেন এবং জনসেবাব্রতে (Social Service) দীক্ষিত হইতেছেন। পুনা সহরে "পুনা সেবাসদনসমিতি" নামক প্রতিষ্ঠানে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে অতিশয় তৎপরতা ও উদ্যমের সহিত কার্য্য চলিতেছে। কেবল বাঙ্গালা দেশে জনসাধারণের মধ্যে এই কার্য্যের জন্য যে পরিমাণ আন্তরিকতা, সহানুভূতি, উদ্যোগ, অর্থসাহায্য ও ত্যাগস্বীকার দেখিবার আশা করি, তাহা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

এই সহরের গরীব লোকরা শিশু-সন্তানের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। কলিকাতা সহরে শত সহস্র

প্রভৃত বিত্তশালী লোক আছেন। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে সহরের প্রতি পল্লীতে গরীব শিশুদিগকে বিনা মূল্যে দুধ ও অন্যান্য খাদ্য বিতরণ করিবার জন্য এক একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। যে সকল পিতা-মাতা নিতান্ত নিঃস্ব, তাহারা শিশু সন্তানগণকে এই স্থানে প্রত্যহ লইয়া আসিলে উপযুক্ত লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া এই আশ্রম হইতে তাহাদের জন্য যথোচিত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। কলিকাতায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের জন্য বহুবাজার ষ্ট্রীটে ১২১নং বাটীতে সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স সিষ্টার-দিগের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে এইরূপ একটি শিশুমঙ্গল আশ্রম (Baby clinic) স্থাপিত হইয়াছে। তথায় গরীব খৃষ্টান-জননীগণ শিশু সঙ্গে করিয়া প্রত্যহ উপস্থিত হয়েন এবং এখানে শিশু-সন্তানগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হইয়া বিনা মূল্যে তাঁহাদের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়। এই আশ্রমে জননী-গণের চা পান করিবার ব্যবস্থা আছে এবং তাঁহাদিগকে সেলাই ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য করিতে দিয়া পারিশ্রমিক-স্বরূপ তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্যও করা হয়। গরীব শিশুগণের জন্য এখানে প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুধ, সাগু, বার্লি, সুজী প্রভৃতি বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। সম্প্রতি জননী-দিগের চিকিৎসার জন্য এই আশ্রমে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইয়াছে। বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি সহরের বদান্য ভারতবাসিগণ গরীব শিশুসন্তানদিগের জন্য বিনা মূল্যে দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৈ, বাঙ্গালা দেশে এত ধনী লোক রহিয়াছেন, স্বজাতীয় গরীব শিশুমণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য কাহাকেও ত এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইতেছি না! কলিকাতার প্রতি পল্লীতে এত ধনী লোক আছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কোন এক জন মনে করিলে তাঁহার পল্লীতে এই সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। আশা করি, স্বজাতির মাতৃ ও শিশুকল্যাণের জন্য তাঁহাদের নিকট এই আবেদন নিষ্ফল হইবে না।

—শ্রীচুনীলাল বসু।

বংশের ধারা

১

"না, তা হ'তে পারে না। তুই দেখে নিস, আমি এ কখখনো হ'তে দেব না। শিউলীর বিয়ে রাধারমণের সঙ্গে? দূর, দূর!"

বিজন হাতের ছড়িটা সজোরে মেঝের কাঠের উপর ঠুকিয়া যখন এই কথাটা বলিল, তখন বন্ধু রমেন বিমর্ষভাবে বলিল, "তুই বল্লেই ত হবে না, কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম। কর্ত্তা এবার নিজে যখন রাধারমণের বাপকে নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছেন, তখন ত কথা ঠিক হয়েই রয়েছে। বিশেষ তিনি জমীদার—বছর-শালিয়ানা বিশ হাজার টাকা—"

বিজন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "রেখে দে তোর বিশ হাজার! পাড়াগেঁয়ে ভূত, পিলেরোগা, পেটে বোমা মারলে ক বেরোয় না! আমার বোন্কে তার হাতে দেব? জমীদার ত জমীদার, নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাতি হলেও দেব না।"

দুই বন্ধু গ্রীষ্মাবকাশে দেশে যাইতেছিল। বিজন ও রমেন একসঙ্গে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, একই গ্রামে উভয়ের বাস। বাল্যকাল হইতে উভয়ের মিশামিশি, খেলা-ধুলা, লিখা-পড়া। উভয়ে অবাধে উভয়ের বাড়ী যাওয়া-আসা করে। বাল্যকাল হইতেই রমেন শেফালীকে দেখিয়া আসিতেছে, কোলে-পিঠে লইয়াছে, পড়া শিখাইয়াছে, খেলা-ধুলা করিয়াছে। বড় হইলে শেফালী তাহার সম্মুখে কদাচিৎ বাহির হইত বটে, কিন্তু রমেন মনে মনে তাহাকে ভালবাসিত। এক দিন সে স্পষ্টই মুখ ফুটিয়া বন্ধুর নিকট শেফালীকে চাহিয়াছিল; বলিয়াছিল, শেফালীকে না পাইলে সে বিবাহই করিবে না। বিজনও ভগিনীর রূপে-গুণে আকৃষ্ট এই অকৃত্রিম বাল্য-সুহৃদকে ভগিনীর যোগ্য পাত্র মনে করিয়া তাহার হস্তে ভগিনীকে সমর্পণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। রমেন তাহাদেরই সমান ঘরের ছেলে; বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্। তবে তাহার এক দোষ ছিল,—সে দরিদ্রা বিধবা জননীর কুঁড়ে-ঘরের দরিদ্র সন্তান।

রমেনের দারিদ্র্যই তাহার কাম্যফলপ্রাপ্তির বিষম অন্তরায় হইয়াছিল। বিজনের পিতা ফুলবাড়ীর জমীদার। তিনি যখন পুত্রের প্রস্তাবের কথা শুনিলেন, তখন ঘৃণায় তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইল। এত বড় স্পর্দ্ধা দরিদ্রের সন্তানের?—ভিখারীর এ রাজতক্তের স্বপ্ন কেন? কিন্তু উপযুক্ত পুত্রকে প্রকাশ্যে অসন্তুষ্ট না করিয়া তিনি বলিলেন, "শিউলী ছেলেমানুষ, বড় হ'ক্, তখন বিয়ের কথা হবে।" এ দিকে ভিতরে ভিতরে তিনি শিউলীর বর ঠিক করিতে লাগিলেন। অধিক খুঁজিতে হইল না, তিনি শীঘ্রই অনন্তপুরের জমীদার কালীনাথের পুত্র রাধারমণের সহিত কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলিলেন; ভাবী বৈবাহিককে কিছু দিনের জন্য স্বগৃহে নিমন্ত্রণও করিলেন।

কলিকাতার হোষ্টেলে থাকিতেই বিজন পিতার পত্রে এই নিমন্ত্রণ ও বিবাহের সম্বন্ধের কথা অবগত হইয়াছিল। তাই দুই বন্ধু যখন শিয়ালদহের ষ্টেশনে দেশে যাইবার উদ্দেশে গাড়ী চাপিয়া বসিল, তখন বিজন দৃঢ়স্বরে বলিল, "তুই দেখে নিস্, রমা, আমার কথাও যে, কাযও সে, এ বিয়ে আমি হতেই দেব না।"

রমেনের বুকখানা নূতন আশার কথা পাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "জানিস্ ত, কর্ত্তার জেদ কেমন। একবার গোঁ ধরলে ফেরান শিবেরও অসাধ্য, তুই ত মানুষ।"

বিজন বলিল, "তা হ'ক্। আমাকে তুই কেঁওকেটা পেলি না কি? দেখ না, ঐ কালীনাথ বেটার উপর বাবাকে এমন চটিয়ে দেব যে, দু' দিনে পালাতে পথ পাবে না। আমায় চিনিস্ ত?"

"মেরেছ কলসীর কাণা,
তা ব'লে কি প্রেম দেবো না!"

শিল্পী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী
মহাশয়ের সৌজন্যে]

রমেন হাসিল। বস্তুতঃ তাহাদের হোষ্টেলে বিজনের মত ফন্দীবাজ যোগাড়ে ছেলে আর কেহ ছিল না।

ষ্টেশনে নামিয়া মালপত্র বাড়ী হইতে প্রেরিত ভৃত্য-পরিজনের জিম্মা করিয়া দিয়া এবং পিতার প্রেরিত পাল্কী ফিরাইয়া দিয়া বিজন বন্ধুর সহিত গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে আবার তাহার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিল, তাহার পর কি একটা কথা স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর একটা মজা হয়েছে, জানিস্? বিধুবাবুরও আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন হয়েছে যে।"

রমেন জিজ্ঞাসা করিল, "কো· বিধুবাবু?"

বিজন বলিল, "আরে, মুখার্জ্জি-ব্যানার্জ্জি এণ্ড সন্সের বিধুবাবু রে—ঐ যে আমাদের হোষ্টেলের নীচের তলায় যাদের বইয়ের দোকান।"

রমেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, বিধুবাবুর নেমন্তন্ন কেন?"

বিজন বলিল, "সে ঢের কথা। জানিস্ ত বাবার বাতিক। সেই বার ভূঁইঞার এক ভূঁইঞা?"

বলিয়া বিজন হো হো হাসিয়া উঠিল; রমেনও সেই হাসিতে যোগ দিল। বিজন বলিল, "বাবা বার ভূঁইঞার এক ভূঁইঞার বংশ-পরিচয় ছাপাবেনই। তাই আমায় কলকাতা থেকে মাইনে-করা এক জন পাবলিশার পাঠাতে লিখেছিলেন। ম্যাপ, ছবি, ভাল কাগজ, মলাট—তা'তে আগাম ২ হাজার টাকা দেবেন, আর ছাপা হ'লে ১ হাজার। তা ছাড়া যাওয়া-আসা আর খাইখরচ সব দেবেন। কাযেই বিধুবাবুর পোয়াবারো। আমি ওকেই ঠিক ক'রে দ্বিইছি কি না। এক মাস যাওয়া-আসা হচ্ছে, এখনও বইপড়া শেষ হয় নি বোধ হয়।"

রমেন বলিল, "এবার কদ্দিন নেমন্তন্ন?"

বিজন বলিল, "এবার সাত দিনের কড়ারে এয়েছে। বোধ হয় খুব বনেছে, নইলে সাত দিন ফুরিয়ে গেলেও রয়েছে কেন? যাক্ গে, ও বেলা তোদের ওখানে যাব'খন, অনেক কথা আছে।"

বিজন ছড়ি ঘুরাইয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া প্রফুল্লমনে শিষ দিতে দিতে বাড়ী চলিয়া গেল, রমেন মন্থরগমনে বিষণ্ণ-চিত্তে শেফালীর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে আপনার কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল।

২

বাড়ীর দেউড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বিজন শুনিল, বৈঠক-খানায় তাহার পিতা তাঁহার বার ভূঁইঞার এক ভূঁইঞা পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিকলাপের কথা পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। শ্রোতা কে, তাহা বুঝিয়া লইতে বিজনের বিলম্ব হইল না। বিজন মনে মনে হাসিল। বাবা! ফুলবাড়ীর জমীদার-ভবনের ভাঙ্গা শিং-দরজার ও জমীদার বার-ভূঁইঞাদের কম-বেশী ৫০ খানা ব্লক—ছয় খণ্ড কেতাব—তিনটি হাজারের কম ছাপাই বাঁধাইয়ে খরচ হইবে না,—এ লোভ কি মুখার্জ্জী-ব্যানার্জ্জীর নামজাদা বিধুবাবু ছাড়িতে পারেন? তাই যে তিনি নিবিষ্টচিত্তে ফুলবাড়ীর ভূঁইঞাবংশরূপ মহাভারতের কথা অমৃত সমান পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন, বিজন তাহা বুঝিতে পারিল।

পাঠে তন্ময়চিত্ত পিতাকে তখন বিরক্ত করা অশোভন মনে করিয়া, বিজন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তথায় পৌছিতে না পৌছিতেই শেফালী এক রাশ কাল চুল নাচা-ইতে নাচাইতে "দাদা কি এনেছ?" বলিয়া ছুটিয়া আসিল। বিজন এই বাল্যে মা-হারা ভগিনীটিকে বড় ভালবাসিত, তাই তাহাকে দেখিয়া আনন্দে পথশ্রম ভুলিয়া গেল, সস্নেহে তাহার মেঘের মত চুলের রাশির উপর টোকা মারিয়া বলিল, "যা এনেছি, তা দেখতে পেলে যে খুব খুসী হবি, তা কিন্তু আমি এখন থেকেই ব'লে দিতে পারি।" কথাটা বলিয়া বিজন হাসিতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে ধড়া-চূড়া ছাড়িতে লাগিল।

শেফালী কথাটা বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি এনেছ, দাদা?"

বিজন তাহার মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "রমেনকে এনেছি, বুঝলি?"

"যাও, তুমি ভারী দুষ্টু,"—বলিয়া আরক্ত মুখে শেফালী ছুটিয়া পলাইল। বিজন তাহাকে ডাকিয়া আর সাড়া পাইল না। সে কিন্তু মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিল। রমেনের নামে শেফালীর লজ্জার বিকাশ ও অনুরাগের অভিব্যক্তি দেখিয়া সে আরও দৃঢ় সঙ্কল্প আঁটিল যে, যেরূপেই হউক, এই সুবর্ণ-প্রতিমাকে কিছুতেই পাড়াগেঁয়ে পিলে-রোগা অশি-ক্ষিত জমীদারপুত্রের হস্তে সমর্পণ করা হইবে না।

শ্রান্তি দূর করিবার পর বিজন বাহিরের পুষ্করিণীতে

স্নান করিতে গেল। ধনবান্ পিতার পুত্র হইলেও সে প্রায় ভৃত্য-পরিজনের সেবা গ্রহণ করিত না। কাঁধে তোয়ালে ও গামছা ফেলিয়া বাগানে দাঁতন ভাঙ্গিতে গিয়া সে বিধুবাবুকে এক গাছতলায় দেখিয়া বিস্মিত হইল; বিধুবাবু তথায় আম্রবৃক্ষতলে একখানি গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিজন তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "কি দাদা, দুপুর রোদ্দুরে গাছতলায় কেন?"

বিধুবাবু তাহাকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "আরে, তুই কখন্ এলি রে? বাঁচালি, ভাই। ভাল যায়গায় পাঠিয়েছিলি বটে!"

বিজন বলিল, "কেন, কেন, এখানে কি কষ্ট হচ্ছে, যত্ন হচ্ছে না?"

বিধুবাবু বলিলেন, "আরে, তা কেন? বলি, শোন না। কর্ত্তা খুব ভাল লোক, আদর-যত্নের ক্রটি নেই। তবে —"

বিজন বলিল, "তবে কি?"

বিধুবাবু বলিলেন, "কি জানিস, এইছি পয়সা রোজকার করতে বটে, কিন্তু তা ব'লে পৈতৃক প্রাণটাও যাতে তৃপ্তি পায়, তাও দেখতে হবে ত। তা' বাবা, এখানেও সোয়াস্তি নেই, ভাল এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি —"

বিজন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল? পাগল কে?"

বিধুবাবু বলিলেন, "না হ'লে দুপুর রোদ্দুরে ঘর ছেড়ে গাছতলায় আসি? বেটা জমীদার হ'লে কি হয়, একেবারে বদ্ধ পাগল।"

বিজনের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল, বলিল, "কে, কালীনাথবাবু—অনন্তপুরের জমীদার?"

বিধুবাবু বলিলেন, "নয় ত কে? একে ত কর্ত্তার বার ভুঁইঞার ঠেলায় অস্থির, তার উপর আবার এই পাগলা জমীদারের ভাগবতের ব্যাখ্যা—প্রাণ যায় আর কি!"

বিজন হো হো হাসিয়া বলিল, "বটে? সেই বেহ্মদত্যির এস্রাজ শোনার যো হ'ল দেখছি যে!"

বিধুবাবু বলিলেন, "এ বেহ্মদত্যির বাবা। এই খানিক আগে কর্ত্তা বার ভুঁইঞা শোনালেন, তার পর যাই একটু দম ফেলব, অমনই তোমার জমীদার কালীনাথ ভাগবতের ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির—আমায় দেখে শাকের ক্ষেতের দিকে ছাগলের মত চাইতে সুরু করলেন। দেখেই গা-ঢাকা দিয়ে গাছতলায় হাজির। বাবা, আর দু' পাঁচ দিন যদি ভাগবত শুনতে হয়, তা হ'লে আমি নিজেই পাগল হয়ে যাব।"

বিজন যেন হঠাৎ অন্ধকারে আলোক খুঁজিয়া পাইল, বলিল, "তা পাগলের গুষ্ঠী—কত আর ভাল হবে!"

বিধুবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "গুষ্ঠী পাগল, বল কি?"

বিজন গম্ভীরভাবে বলিল, "না, ঠিক পাগল না, তবে ওর বাপকে বেঁধে রাখতে হ'ত, পিসীকে ত বহরমপুরেই পাঠাতে হয়েছিল।"

বিধুবাবু ভীত স্বরে বলিলেন, "এ্যাঁ, সত্যি না কি? তা হ'লে ত ওর সঙ্গে দাঁড়া বসা করা—"

বিজন বলিল, "আরে না না, দাদা, ও ত আর উন্মাদ পাগল নয়, বংশে একটু ছিট আছে, এই যা। তুমি একটু সাবধানে থেক, তা হ'লেই হ'ল। দেখ, এই নিয়ে গোলযোগ ক'র না। জান ত, বাবা ওকে কেমন খাতির করেন। এ সব কথা শুনলে রক্ষে রাখবেন না, তোমার পাবলিস বিসনেস মূলেই হাভাত হবে। দু' দিন সাবধানে থাক, তার পর কলকাতায় গেলে ওর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?"

বিধুবাবু বলিলেন, "ওঃ, তাই বটে, আমিই সাবধান হব। দেখ, এক দিন ওর ভয়ে সিঁড়ির নীচে চুণের গাদার পিছনে লুকিয়েছিলুম। এখন থেকে আরও সাবধান হব।"

বিজন হাসিতে হাসিতে পুকুরে যাইয়া নামিল। স্নানান্তে গৃহে ফিরিবার সময় সে আর বিধুবাবুকে গাছতলায় দেখিতে পাইল না।

অন্দরে বেশপরিবর্ত্তনান্তে ও জলযোগান্তে বাহিরে যাইবার পথে অতর্কিতভাবে জমীদার কালীনাথ বাবুর সহিত বিজনের সাক্ষাৎ হইল। সে নমস্কার করিতেই কালীনাথ ভাগবতের ব্যাখ্যার খাতাখানা বগলে লুকাইয়া বলিলেন, "কে ও, বিজন না? তুমি কখন্ এলে? বৈঠকখানায় বিধুবাবুকে দেখলে?"

বিজন বলিল, "না, বৈঠকখানায় দেখিনি বটে, তবে বাগানে গাছতলায় দেখে এসেছি।"

কালীনাথ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কোথায়, গাছতলায়? এই দুপুর রোদ্দুরে? তা হতেও পারে। দু' দিন আগে যা দেখেছি।"

বিজন বলিল, "কি দেখেছিলেন?"

কালীনাথ বলিলেন, "আরে, বল কেন? উপরতলা থেকে নীচে নামছিলুম। শেষ ধাপে পা দিয়ে দেখি, সিঁড়ির নীচে চুণের গাদার পিছন থেকে বেরিয়ে রয়েছে দুখানা পা! চোর-টোর ভেবে এগিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি, বিধু-বাবুর পা!"

বিজন অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তা এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, রায় মশাই। বংশে ছিট আছে, ওর দোষ কি বলুন?"

কালীনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বংশে ছিট? সে কি?"

বিজন বলিল, "ওরা যে শোধপুরের মুখুয্যে—বংশে ছিট আছে শোনেন নি?"

কালীনাথ বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়? তা, এমন লোককে তোমার বাবা এখানে এনেছেন কেন?"

বিজন বলিল, "না, তা কোন ভয় নেই। এ দিকে শান্ত শিষ্ট—তবে খুন চাপলে রক্ষে নেই, হয় আত্মহত্যা, না হয় খুন! ওটা ওদের বংশের ধারা। জানেন, রায় মশাই, ওর ঠাকুর্দ্দার পোদাদা গলায় ছুরি দিয়েছিল, ওর পোদাদা একটা চাকরকে—"

কালীনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "আরে বাপ রে! বড় অভাগা বংশ ত! তা ওদের ধ'রে রাখে না কেন?"

বিজন বলিল, "বললুম ত, বারো মাস ঠাণ্ডা, খুন না চাপলে ভয় নেই। কারুর উপর মন বিগড়োলেই সর্ব্বনাশ। আসল কথা, আপনি সাবধানে থাকবেন, ওকে জানতে দেবেন না যে, আপনি জানেন, ও পাগল, তা হলেই আপনার উপর বিগড়ে যাবে। বাবাকেও বলবেন না, কি জানি, তিনি যদি ওকে ব'লে ফেলেন!"

বিজন চলিয়া যাইলে জমীদার কালীনাথ কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। কায কি, এই পাগলের সঙ্গে একত্র বসবাস, কোন্ দিন কি হয় কে জানে! কিন্তু লোকটা বড় অভাগা। যত দিন এখানে থাকিবে, তত দিন উহার উপর নজর রাখিতে হইবে।

৩

বিধুবাবু ও কালীনাথবাবু প্রত্যহ অপরাহ্ণে গ্রামের পথে বেড়াইতে যাইতেন। বিধুবাবু কালীনাথবাবুর সঙ্গ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেন। আবার যে দিন হইতে বিজন তাঁহার কর্ণে বিধুবাবুর "বংশের ধারার" পরিচয় দিয়াছিল, সে দিন হইতে কালীনাথবাবুও ভ্রমণকালে একবারে তাঁহার সঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিধুবাবুও তাঁহার সঙ্গ দূরে পরিহার করিতেন।

এক দিন ভ্রমণের জন্য বাহির হইবার কালে বিজনকে দেখিয়া বিধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, বল্‌তে পার, তোমাদের জমীদারবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন কি না?"

বিজন বলিল, "না, এখনও বেরোন নি, তবে এখনই বেরোবেন বটে, আমি তাঁকে কাপড়-চোপড় পরতে দেখে এলাম। বল্‌ছিলেন, ষ্টেশনের দিকেই যাবেন।"

বিধুবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এঃ! আমিও মনে করেছিলাম, ষ্টেশনে যাব যে। নাঃ, তবে নদীর দিকেই যাই। যাবে হে, এস না।"

বিজন বলিল, "তুমি এগোও দাদা, আমি এলুম ব'লে। দেখ, সেই সাঁকোটার উপর জিরিও।"

বিধুবাবু চলিয়া গেলে বিজন কিছুক্ষণ অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। তাহার পর যখন জমীদার কালীনাথ-বাবুকে লাঠি হস্তে বাহির হইতে দেখিল, তখন বলিল, "কি রায় মশাই, ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছেন কি? তা হ'লে আমার এই চিঠিখানা ডাকঘরে ফেলে দিয়ে যাবেন দয়া ক'রে? এই মাত্র বিধুবাবু ষ্টেশনে গেলেন, তাঁকে চিঠি-খানা দিতে ভুলে গেলুম।"

কালীনাথবাবু মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "না হে না, আজ আর আমি ষ্টেশনে যাব না, নদীর দিকেই যাব মনে করছি।"

বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বিজন খানিকটা হাসিল, তাহার পর লোকের আনাচ-কানাচ দিয়া "মেঠো পথ" ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে নদীর দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সে জিলা-বোর্ডের সাঁকোর উপর বিধুবাবুকে বসিয়া থাকিতে দেখিল।

বিজন প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত

হইয়া বলিল, "দাদা! বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলে? বন্দুকের?"

বিধুবাবু বলিলেন, "কৈ, না। কেন?"

বিজন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "দাদা, গাছে চড়া আসে?"

বিধুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না, কেন বল দেখি?"

বিজন তখন অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা হ'লে আর দেরি কোরো না, শীগ্‌গির বাড়ী পালাও।"

বিধুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেন, কেন, পালাব কেন?"

বিজন বলিল, "যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, এখনই পালাও। আজ ক'দিন বাগদীপাড়ার দিকে একটা বুনো শূয়োর উৎপাত করছে, বিশে বাগদীর ছেলেটাকে সে দিন দাঁতে ক'রে চিরে ফেলেছে। তাই পুলিস-সাহেব সদলে শীকার করতে এয়েছেন। শুনে এলাম, বুনো শূয়োরটা ঘা খেয়ে ছুটে বেরিয়েছে—নদীর দিক থেকে গাঁয়ের দিকে তাকে বাগদীরা ছুটতে দেখেছে। আমি চললুম, গাছেই চড়ব; তুমি পালাও।"

বিজন কথাটা বলিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। বিধুবাবু কাতরকণ্ঠে শুষ্কবদনে তাহাকে এক বার ডাকিয়াই লাঠি ঘাড়ে তুলিয়া বাড়ীর দিকে দীর্ঘ পদবিন্যাস করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার ঘৃত-দুগ্ধ-রাবড়ীপুষ্ট পাবলিশারী দেহের অনুপাতে পাদচালনা যতটুকু সম্ভব, তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইল না। ঠিক সেই সময়ে নদীর দিক হইতে কঙ্করিত পথে খট্ খট্ আওয়াজ হইল। সে আওয়াজ কোন্ সূত্র হইতে উদ্ভূত হইতেছে, বিধুবাবুর তাহা ফিরিয়া দেখিবারও সাহস হইল না—তিনি সে সময়ে আওয়াজকে দূরে রাখিবার উদ্দেশে যে গতি পাদদ্বয়ে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, বারাকপুরের ঘোড়দৌড়-যাত্রী হাওয়াগাড়ীরও সে গতি সম্ভবে কি না সন্দেহ।

এ দিকে জমীদার কালীনাথবাবু ষ্টেশনের পথ বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া দ্রুতপদে নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এক এক বার তিনি পশ্চাতে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছিলেন, ষ্টেশনের দিক হইতে কেহ ফিরিয়া আসিতেছে কি না। একটা বাঁক ফিরিবার পর তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিলেন, "আঃ, বাঁচলুম, পাগলটাকে খুব ফাঁকি দিইছি আজ। ভাগ্যে ষ্টেশনের দিকে যাইনি। উঃ! তা হ'লে কি হ'ত!"

ঠিক সেই সময়ে আর একটা বাঁক ফিরিয়া সম্মুখে চাহিতেই রায় মহাশয়ের চক্ষু স্থির হইল, সমস্ত অঙ্গ হিম হইয়া গেল, চরণদ্বয় একেবারে গতিশক্তিহীন হইয়া থর থর কম্পান্বিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, নাতিদূরে ভীষণ যষ্টি উত্তোলন করিয়া, ঘূর্ণায়মান রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তাঁহার ভয়ের কারণ বিধুবাবু তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন!

ভয়ে জমীদারবাবুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—যে পথে বাঘের ভয়, সেই পথেই কি সন্ধ্যা হয়? পরিণত বয়সে স্ফীতোদর বহন করিয়া দ্রুত পথাতিক্রমের ফলে বিধুবাবুর শ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্ত, আরক্ত বদনমণ্ডল হইতে বিস্ফারিত রক্তবর্ণ লোচনদ্বয় ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, বিশাল বিস্তৃত নাসারন্ধ্রদ্বয় হইতে অজগরের মত শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝড় বহিতেছিল,—দূর হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া জমীদার কালীনাথবাবুর মনে হইতেছিল, বুঝি বা সেই মুহূর্ত্তের উদয় হইয়াছে, যখন শোধপুরের মুখুয্যেবংশের ধারা অনুসারে খুন চাপিয়া থাকে!

মুহূর্ত্তমধ্যেই কালীনাথবাবু পশ্চাৎ ফিরিয়া গৃহাভিমুখে রওনা দিলেন। প্রথমে দীর্ঘ দীর্ঘ পদবিন্যাস, তাহার পর যতই পশ্চাতে ফিরিয়া বিধুবাবুর কলেবরখানিকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখেন, ততই তাঁহার পদবিন্যাস দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকে। তাঁহার যতই মনে হইল, আজ কয় দিন তিনি 'ভাগবত' শ্রবণের বোঝা চাপাইয়া শোধপুরের মুখুয্যেবংশের বিগড়াইবার কারণ হইয়াছেন, ততই কে যেন তাঁহার পরিণত চরণদ্বয়ে পক্ষিরাজ অশ্বের চরণ-সংস্পর্শ আনিয়া দেয়। শেষে যখন সত্যই বিধুবাবু ক্রমে তাঁহার ও নিজের মধ্যস্থ ব্যবধানকে হ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, তখন কালীনাথবাবুর শরীরেও মত্ত হস্তীর বল দর্শন দিল, তিনি তখন রেলগাড়ীর গতিতে উধাও হইয়া খানা-খন্দ পার হইয়া ঝোপ-কাঁটাবন ডিঙ্গাইয়া আঘাটা-আগঙ্গা দিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

কর্ত্তাবাবু অপরাহ্নে উদ্যানে একখানা মর্ম্মরাসনে বসিয়া সান্ধ্য বায়ু সেবন করিতেছিলেন। হঠাৎ কোথা

হইতে ঝড়ের মত দৌড়িয়া আসিয়া জমীদার কালীনাথবাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তাবাবু দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। এ কি স্বপ্ন, না সত্য!

তাঁহার সে বিস্ময় অপসারিত হইতে না হইতে যেন ঠিক জমীদারবাবুকেই অনুসরণ করিয়া বিধুবাবু তেমনই অবস্থায় ঝড়ের মত গৃহে প্রবেশ করিলেন। এ কি! জগৎশুদ্ধ সকলেই পাগল হইয়াছে না কি!

ক্ষণপরে কর্ত্তাবাবু দেখিলেন, অদূরে তাঁহার পুত্র বিজনবিহারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। কর্ত্তা বিজনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

বিজন বলিল, "ও কিছু নয়। কালীনাথবাবুর বংশের ধারা।"

কর্ত্তাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বংশের ধারা? সে কি?"

বিজন বলিল, "কেন, আপনি জানেন না? ও যে ওদের বংশের ধারা। ছিট মাঝে মাঝে দেখা দেয়। আজ ছিট দেখা দিয়েছিল—ক'দিন থেকে বিধুবাবু আর আমি লক্ষ্য করছি কি না। কেবল বলে, ভাগবত শুনতে। কেউ না শুনলেই ক্ষেপে যায়। আজ নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। ভাগ্যে বিধুবাবু ছিল।"

কর্ত্তাবাবুর নয়নদ্বয় অসম্ভবরূপ বিস্ফারিত হইল। ক্ষণপরে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "যত সব গাঁজাখুরি কথা! কালীর বংশে ছিট?—আমি জানি নি!"

বিজন বলিল, "ওহো, তাও বটে, আপনাকে যে বলা হয় নি। ওঁর মাতামহগুষ্ঠী থেকে যে ওঁরা ছিট পেয়েছেন, এ ত সবাই জানে।"

কর্ত্তাবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, ছিট না মাথা! আমি না জেনে শুনে ওদের ঘরে মেয়ে দিচ্ছি কি না? যা, যা।"

বিজন যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেল, "তাই হবে বটে, ও সব গাঁজাখুরিই বটে। তবে—তবে বিধুবাবু বলছিলেন, কালীবাবু তাঁর উপর চড়াও হয়েছিলেন, তাই বা অবিশ্বাস করি কি ক'রে?"

বিজন চলিয়া গেলে কর্ত্তাবাবু কেবল মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, বিধুবাবুর কথা অবিশ্বাস করা যায় কি করিয়া?

৪

পরদিন যখন বিজনের সহিত জমীদার কালীনাথবাবুর সাক্ষাৎ হইল, তখন কালীবাবু বলিলেন, "উঃ, কাল খুব বেঁচে গেছি, বিজন। কাল পাগলের হাতে প্রাণ গিয়েছিল আর কি!"

বিজন যেন কিছুই জানে না, এইরূপ ভাণ করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

কালীনাথবাবু তখন পূর্ব্বদিনের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "দূর থেকে আমায় দেখে যখন লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছিল, তখন যদি তার চোখের ভাব দেখতে! ওরে বাপ রে! যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে!"

বিজন বলিল, "আপনি কি করলেন?"

কালীনাথ বলিলেন, "আমি? আমি আর কি করব? প্রাণটি হাতে নিয়ে আঁদাড়-পাঁদাড় ভেঙ্গে একবারে ভোঁ ভোঁ দৌড়। আর একলা বেড়াতে যাচ্ছি নি, বাবা। বিয়ের কথাটা পাকাপাকি করেই স'রে পড়ছি শীগ্‌গীর।"

বিজন বিষণ্ণভাবে বলিল, "কি জানেন, ওকে দোষ দেওয়াও যায় না। এক রাত্তিরে যদি স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ে সব মারা যায়, তা হ'লে আপনি কি করেন? আপনিও কি পাগল হয়ে যান না?"

কালীনাথ বলিলেন, "এঁ্যা, সে কি?"

বিজন বলিল, "হাঁ, সত্যি কথা। কলেরা, একেবারে বিষম কলেরা! সেই অবধি থেকে মাথাটা একবারে বিগড়ে গেছে, তার পর বংশের ধারা ত আছেই।"

কালীনাথ সমবেদনার সুরে বলিলেন, "আহা হা, বড় অভাগা ত! তা হ'লে এখন থেকে ওর উপর একটু নজর রাখাও ত উচিত। কি জানি, কখন্ কি ক'রে বসে।"

বিজন বলিল, "হাঁ, আত্মহত্যাও ক'রে ফেলতে পারে। কি জানেন, বংশের ধারা! এই ভাল আছে, এই বিগড়ুচ্ছে।"

কালীনাথবাবু বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, "তাই ত, লোকটা এ দিকে এত গুণী—আমার ভাগবত ব্যাখ্যার এমন সমজদার! যাক্, এখনই আমার অনন্তপুরের বিরাজ কবিরাজকে পত্র লিখে দিচ্ছি। পাগলের ওষুধ সে খুব ভাল জানে। পত্রখানা ডাকে পাঠিয়ে দিও ত, বাবা।"

কালীনাথবাবু পত্র লিখিতে চলিয়া গেলেন। বিজন

আপন মনে খানিকটা হাসিয়া বাগানে যাইয়া দেখিল, বিধুবাবু পূর্ব্বের মত এক গাছতলায় বসিয়া একখানা হস্তলিখিত পুথি পাঠ করিতেছেন।

বিজন তাঁহাকে দেখিয়াই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচলুম! তুমি, দাদা, আবার এমন ক'রে ব'সে কেতাব পাঠ করবে, তা আর মনে ছিল না। উঃ, খুব বেঁচে গেছ, দাদা!"

বিধুবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি বেঁচে গেছি? ওঃ, বুনো শূয়োরের তাড়া থেকে, না?"

বিজন বলিল, "না, না, তা কেন? সে ত তোমাকে আমি আগে থেকেই সরিয়ে দিয়েছিলুম। তা না, জমীদার-বাবুর তাড়া থেকে। ভাগ্যে তুমি লাঠি ঘাড়ে নিয়ে চোখ-মুখ পাকিয়ে ছুটে আসছিলে, না হ'লে ও ত মোরিয়া হয়ে ছুটছিল তোমাকে খুন করতে।"

বিধুবাবুর মুখ শুকাইল, "এ্যাঁ, সে কি? কেন, আমায় খুন করতে কেন? আমি ত ওর কিছু করিনি।"

বিজন বলিল, "করেছ কি না, তুমিই জান। আচ্ছা, তুমি কি খুব হাই তোল?"

বিধুবাবু বলিলেন, "কেন, কেন বল দেখি? হাই ত আমি তুলিই।"

বিজন বলিল, "ও যখন ভাগবত ব্যাখ্যা করে, তখন হাই-টাই তুলেছিলে কখনও?"

বিধুবাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হুঁ, তুলেছি বৈ কি—অনেকবার। কেন, তাতে কি হয়েছে?"

বিজন বলিল, "সর্ব্বনাশ! বলে কি না, তাতে কি হয়েছে! আরে ঐখানেই ত রোগ। ওর কেতাব না শুনে হাই তুলেছ তুমি? তবেই খেয়েছে!"

বিধুবাবু বলিলেন, "বটে! হাই তুললে ক্ষেপে না কি? না, বাবা, কলকাতায় পালাই।"

বিজন বলিল, "আচ্ছা, রাত্তিরে দরজায় খিল দিয়ে শোও ত?"

বিধুবাবুর মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। নিতান্ত কাতর স্বরে তিনি বলিলেন, "কেন, তাতে ভয় আছে না কি? যে গরম, দোর দিয়ে শোয়া যায় কি?"

বিজন বলিল, "কি জান, পাশাপাশি ঘর—কখন্ কোন্ অবস্থায় থাকে—তার উপর হাই তোলা—"

বিধুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কলকাতার গাড়ী ক'টায় বলতে পার?"

বিজন বলিল, "না, কলকাতায় পালাতে হবে না, আর ত দু' চারটে দিন। তার চেয়ে দোর দিয়ে শুয়ো, বিধু-দা। বাবা তোমায় ডাকছিলেন, একবার যেও। আমি চললুম, কিন্তু রাত্তিরে দোর দিয়ে শুয়ো।"

বিজন চলিয়া গেল। বিধুবাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি কুক্ষণেই তিনি বার ভূঁইঞার এক ভূঁইঞার বংশ-পরিচয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন! দূর তোর পয়সা! আর একবার অন্য এক জমীদারের বংশ-পরিচয় ছাপিবার ভার লইয়া তিনি হাজার কাপির মধ্যে মবলক ৩৩ কাপি পুস্তক বিক্রয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জমীদার তাঁহাকে খরচার উপরে অনেক পোষাইয়া দিয়াছিলেন; নিজের লোক দিয়া তাঁহার দোকান হইতে ঐ ৩৩ কাপি কিনাইয়া ছিলেনই ত, পরন্তু অবশিষ্ট দপ্তরীর ঘরে মজুত থাকিয়া কীটদষ্ট হইলেও তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য ২ হাজার টাকা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। এবারও লোভে লোভে তিনি ফুলবাড়ীর জমীদার-ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে যে প্রাণ যায়! কেন মরিতে হাই তুলিয়াছিলেন? প্রাণ গেলে টাকা কি করিবে?

বিধুবাবু এই সকল কথা মনে তোলাপাড়া করিতে করিতে কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

৫

রাত্রিতে কালীনাথবাবু আপনার শয়নকক্ষে বসিয়া ভাগবত ব্যাখ্যার পাতা উল্টাইতেছেন, আর নীল পেন্সিলে এক এক স্থান মার্কা করিতেছেন অথবা কাটিয়া ছাঁটিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে সোনা খানসামা আসিয়া তাঁহাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানা উটপেন্সিলে লিখা; লিখিতেছে বিজন:—

"বড় তাড়াতাড়ি, এখনই একবার নলকোড়ার পিসী-মা'র বাড়ী যাইতে হইতেছে, তাঁর খুব অসুখ। আজ বিধুবাবুর মাথাটা বড় বিগড়াইয়াছে। আজ তাঁর ঝোঁক—খুব সম্ভব আত্মহত্যা। না হইলে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানে তাঁহাকে রামদাখানা শাণ দিতে দেখিব কেন? ওখানা সে

বাবার ঘর হইতে লুকাইয়া চুরি করিয়া আনিয়াছে। আমি থাকিলে ওখানা যেমন করিয়া হউক কাড়িয়া লইতাম-- হাজার হউক, একটা মানুষের প্রাণ ত! যাহাই হউক, আপনি আজ রাত্রিতে সাবধান হইয়া থাকিবেন। ইতি--বিজন।"

পত্রখানা কালীনাথবাবুর হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল, তাঁহার চক্ষু স্থির হইল। কি সর্ব্বনাশ! আত্মহত্যা! না, এখনই এ বাড়ী ছাড়িয়া অনন্তপুর রওনা হওয়াই ভাল। কিন্তু আত্মহত্যা--একটা জলজীয়ন্ত মানুষ গলায় কাটারী দিয়া মরিবে, আর তিনি জানিয়া শুনিয়া চোরের মত লুকাইয়া পলায়ন করিবেন! এই কি তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যার ফল? না, না, তাহা হইতেই পারে না। বিজন না থাকে, তিনি ত' রহিয়াছেন, লোকটাকে কিছুতেই আত্মহত্যা করিতে দেওয়া হইবে না। রামদা! উঃ বাপ রে রামদা!

কালীনাথবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পা টিপিয়া টিপিয়া বিধুবাবুর কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে মৃদুস্বরে আঘাত করিলেন। বিজন সাবধান করিয়া দেওয়ার পর হইতে বিধুবাবু এই দারুণ গ্রীষ্মেও দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতেন।

ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "কে?"

কালীনাথবাবু বলিলেন, "আমি। একটু দরকার আছে।"

বিধুবাবু ভিতর হইতে বলিলেন, "কেন? কি দরকার?"

কালীনাথবাবু সরলভাবে বলিলেন, "কর্ত্তার রামদাখানা এই ঘরে আছে, নেবো। একবার দোরটা খুলুন।"

ভিতর হইতে কম্পিত আওয়াজ আসিল, "কিখানা?"

কালীনাথবাবু বলিলেন, "রামদা, রামদা—কর্ত্তার রামদাখানা, বুঝলেন?"

ঘরের ভিতরটা একেবারে নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং!—কোনও সাড়া-শব্দ নাই।

কালীনাথবাবু পুনরায় একটু উচ্চ স্বরে বলিলেন, "শুনলেন, কর্ত্তার রামদাখানা —"

উচ্চৈর্ব্বাচ্যোঃ! মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু এক প্রচণ্ড ঘড়-ঘড় শব্দে সমস্ত বাড়ীটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। কালীনাথবাবু বুঝিলেন, "উন্মাদ" বিধুবাবু একটা কাঠের সিন্দুক টানিয়া আনিয়া দরজার গায়ে লাগাইয়া দিতেছেন। কি সর্ব্বনাশ! নিজে নিজেকে রক্ষা করিবে না, পরকেও করিতে দিবে না!

আজ এ বাড়ীতে আত্মহত্যা হইবেই হইবে। হায় কর্ত্তার রামদা—হায় বংশের ধারা!

কালীনাথ বাবু একবার শেষ চেষ্টা করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বিধুবাবু মশাই? বিধুবাবু মশাই?"

বিধুবাবু বোধ হয় তখন তাঁহার ভাগবতব্যাখ্যা পাঠকালে হাই তোলার কথা ভাবিতেছিলেন, আর যতই ভাবিতেছিলেন, ততই সিন্দুকটাকে দ্বারের উপর চাপিয়া ধরিতেছিলেন।

কালীনাথ অনন্যোপায় হইয়া নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি ভাগবতব্যাখ্যায় অভ্যস্ত মস্তিষ্ককে নিশ্চেষ্ট রাখিলেন না। তিনি ভাবিলেন, প্রথম রাত্রিতে খুন-খারাপি প্রায় হয় না, বিধুবাবু যদি আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে শেষ রাত্রিতেই করিবে। কাযেই এখন হাঁকাহাঁকি করা বৃথা, মধ্যরাত্রিতে নিজের ঘর হইতে পশ্চাতের বারান্দা দিয়া বিধুবাবুর ঘরে যাইয়া কার্য্য সমাধা করিলেই হইবে।

কালীনাথবাবুর পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেলে এবং তাঁহার কক্ষের দ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইবার পর বিধুবাবু প্রকাণ্ড এক নিশ্বাস ফেলিয়া বুকের পাষাণ-চাপটা হাল্কা করিয়া ফেলিলেন। সে রাত্রিতে তিনি আহারাদি করিবেন না বলিয়া দিয়াছিলেন, কেন না, সে দিন অতিরিক্ত বেলায় জমীদার-গৃহে গুরুভোজন হইয়াছিল। কাযেই রাত্রিতে আর দ্বার খুলিতে হইবে না, এইটুকু খুব বড় রকমের সান্ত্বনা।

বিধুবাবু নিঃশব্দে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তিনি জমীদার কালীনাথের যে জিঘাংসার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে সুনিদ্রা তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত। মানুষটা একবারে বদ্ধ পাগল! পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া কেমন অম্লানবদনে তাঁহার নিকট রামদা চাহিল! ভাগ্যে দ্বার রুদ্ধ ছিল!

নিদ্রা আর আইসে না। যদি এই মুহূর্ত্তে পাগলাটা আর একখানা রামদা সংগ্রহ করিয়া ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে? বিধুবাবু শয্যায় জড়সড় হইয়া চক্ষু মুদিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন---সেই দারুণ গ্রীষ্মেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ১১টা বাজিল। না, এইবার নিদ্রার চেষ্টা করা যাউক। কিন্তু নিদ্রা হইবে কি? -

একে কালীবাবুর ভয়, তাহার উপর অবেলায় ভুক্ত অজীর্ণ পোলাও-কালিয়ার উপকরণগুলা সূচের মত বুকের পাঁজরায় খোঁচা মারিতেছে। বিজন যে হজমী গুলীর কৌটা দিয়াছিল, তাহা হইতে দুইটা বড়ী খাইলে হয় না? যেমন চিন্তা, অমনই কায। বিধুবাবু উঠিয়া কৌটা খুলিয়া দুইটা বড়ী খাইয়া ফেলিলেন।

১২টা বাজিয়া গেল। দূর ছাই! তবুও নিদ্রা হয় না। কি করি! কি করি! পাইচারি করিব? বিধুবাবু কত কি ভাবিতে লাগিলেন। পাগলটা, বোধ হয়, এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে। ঐ ১টা বাজিল। না, এইবার একটু চোখ বুজি।

বিধুবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সবেমাত্র সামান্য একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, অমনই বারান্দার দিকের জানালার আওয়াজ হইল, খুট্! বিধুবাবুর বুকের মধ্যেও হাতুড়ির ঘা পড়িল—ঠক্! তন্দ্রা ছুটিয়া পলাইল, তিনি কাঠ হইয়া শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুনরায় আওয়াজের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবার—আবার সেই 'খুট', 'খুট।' বিধুবাবুর কর্ণে যেন সেই রব শত বজ্রের নির্ঘোষে বাজিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, সমস্ত জানালা দরজায় যেন আওয়াজ হইতেছে—খুট, খুট!

বিধুবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একবার চক্ষু মেলিয়া মাথা তুলিয়া জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। ফুটফুটে চাঁদনী রাত সেই জ্যোৎস্নার আলোয় স্নাত হইয়া জমীদার কালীনাথবাবুরই মত মূর্ত্তিবিশিষ্ট একটা প্রাণী খোলা জানালা টপকাইয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতেছে! তাঁহার কেশরাশি সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিল, ফোঁটা ফোঁটা স্বেদাশ্রু কপালে ফুটিয়া উঠিল, চোখ দুইটা ঠিক্‌রিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। তিনি চীৎকার করিতে গেলেন, কিন্তু কে যেন তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল!

মূর্ত্তি কক্ষে পদার্পণ করিয়াই নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল, বোধ হয়, মূর্ত্তির অধিকারী কালীনাথবাবু পরীক্ষা করিতেছিলেন, শয্যায় শায়িত বিপুলবপু বিধুবাবু নিদ্রিত কি না।

যখন দেখিলেন, কোনও সাড়াশব্দ নাই, তখন চারি হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়া অতি সন্তর্পণে তিনি দেওয়ালের দিকে অগ্রসর হইলেন। জ্যোৎস্নার আলোক জানালার মধ্য দিয়া ঘরখানির অভ্যন্তরাংশ উদ্ভাসিত করিয়াছিল; সেই আলোকে দেওয়ালে লম্বিত রামদাখানি চকচক করিতেছিল। সেই দিকে হামাগুড়ি-পরায়ণ মূর্ত্তির দৃষ্টির গতি নিবদ্ধ দেখিয়া বিধুবাবুর কি অবস্থা হইল, সহজেই অনুমেয়। তাঁহার বিশাল বপু বেতসপত্রের মত কাঁপিয়া উঠিল, হাত-পায়ে খিল ধরিবার উপক্রম হইল, হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল।

বিধাতার বিধান, অতি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড-লয়কারী বৃহৎ ঘটনার উদ্ভব হয়। রাজা পুরুর হস্তিযূথ ক্ষেপিয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া পুরু-সেনার শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করিলে আলেকজান্দার জয় লাভ করিতে পারিতেন না, ভারতে গ্রীক প্রভাবও বিসর্পিত হইত না। নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র জুতার পাটি উল্টাইয়া দিবার লোক ছিল না বলিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে বন্দী হইতে হইয়াছিল। কক্ষের মধ্যস্থলটা অন্ধকারে আবৃত ছিল; কালীবাবুর মূর্ত্তি হামাগুড়ি দিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে গিয়া সেই অন্ধকারে এক চৌকীর সহিত ধাক্কা খাইল, চৌকী সশব্দে পড়িয়া গেল। রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে ঐ শব্দ কামান-গর্জ্জনের মত অনুমিত হইল।

তখন আর লুকোচুরি চলে না। চারি চক্ষুর মিলন হইল! কি মধুর সে মিলন! যেন জগৎসিংহের কারা-কক্ষে ওসমান-আয়েষার চারি চক্ষুর মিলন!

বিধুবাবুর বিরাট বপুর তিন চারি মণ রক্ত জল, বিরাট অঙ্গও হিম-নীল! তাঁহার ভয়ত্রস্ত চকিত নয়ন—আর কালীনাথবাবুর ক্রূর হাস্যবিজড়িত ভ্রূকুটি-কুটিল ভীষণ নয়ন! কি চমৎকার যোগাযোগ!

কালীনাথ দেওয়ালে বিলম্বিত রামদাখানি হস্তগত করিবার উদ্দেশে যেমন হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, অমনই বিধুবাবুও বিকট চীৎকার করিয়া লম্ফ দিয়া বালিস হস্তে শয্যা হইতে অবতরণ করিয়াছেন। চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে কালীনাথবাবু রামদাখানি হস্তগত করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই নিমিষে অন্তর্দ্ধান। তাঁহার ক্রূর হাস্যে ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। বিধুবাবু সেই হাস্যে ও চকিত অন্তর্দ্ধানে প্রায় মূর্চ্ছাগত হইবার উপক্রম করিলেন। সে সময়ে তাঁহার উদরের পরিধি অন্যূন ৫।৬ ইঞ্চ হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পল্লী-প্রাণ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে

শিল্পী— শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

৬

সকালে কর্ত্তাবাবু বিধুবাবুকে ডাকিতে ভৃত্যকে পাঠাইলেন, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, তিনি মোটঘাট বাঁধিতেছেন, আজই কলিকাতায় রওনা হইবেন। কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন। এ হঠাৎ যাত্রার অর্থ কি? কাল ত কোন কথা হয় নাই। তিনি পুনরপি বিধুবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বিধুবাবু আসিলে কর্ত্তা মুরুব্বীয়ানা স্বরে বলিলেন, "কি হে, ব্যাপার কি? এখনও বার ভুঁইঞার শেষ দুটো চ্যাপ্টার বাকী রয়েছে পড়তে --"

বিধুবাবু একটু রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "রেখে দিন মশাই, বার ভুঁইঞা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম "

কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন। প্রৌঢ়বয়স্ক পাবলিসার ব্যবসাদার বিধু মুখুয্যে পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়া এমন কথা বলিতে পারে?"

"বলি হয়েছে কি হে বিধুবাবু, ঘরে ডাকাত পড়েছিল না কি?" কর্ত্তাবাবু হাসিয়া এই কথা বলিলেন।

বিধুবাবু বলিলেন, "ডাকাত পড়া এর চেয়ে ভাল। জলজীয়ন্ত বদ্ধপাগলকে এনে ঘরে পুষবেন, আর আশা করেন যে, কোন ভদ্রলোক তার সঙ্গে আপনার বাড়ীতে বাস করবে?"

কর্ত্তাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আঃ, বিজনের সেই গাঁজাখুরী গল্প ত! তুমি কোন্ আক্কেলে বিশ্বেস করলে?"

বিধুবাবু বলিলেন, "গাঁজাখুরী! না মশাই, আপনি আপনার সখের বেয়াই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করুন, এ গরীব বেচারাদের ছুটী দিন, আবার এক সময়ে আসব।"

বিধুবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, কর্ত্তাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "আহা, যাবেই ত—এত সকালে কি কলকাতার গাড়ী আছে তাই যে ছুটে চলেছ? ব'স, ব'স, কি হয়েছে বল দেখি। ওরে, এখানে চা, হালুয়া নিয়ে আয়, আর দাদাবাবুদেরও ডেকে দে। হাঁ, ব্যাপার কি, বল ত।"

অগত্যা বিধুবাবু বসিলেন, বলিলেন, "বসছি, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে থাকাও ত বিষম বিপদ।"

কর্ত্তাবাবু বলিলেন, "কেন, কেন?"

বিধুবাবু বলিলেন, "রাত দুপুরে আপনার ঘরে কোন পাগল যদি চোরের মত ঢুকে রামদা নিয়ে বিছানার দিকে এগোয়, তা হ'লে আপনি কি করেন?"

কর্ত্তাবাবুর বিস্ময় আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, "তা হ'লে—তা হ'লে বিজন যা বলছিল—"

বিধুবাবু কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, "কাল রাতে জানালা টোপকে রামদা বাগিয়ে---"

কথাটা শেষ করা হইল না, অদূরে দালানে যাঁহার রামদা বাগানর কথা হইতেছিল, তিনি বিজনের সহিত সশরীরে দেখা দিলেন। খানসামারা সেই সময়ে চা, জলখাবারও দিয়া গেল। কর্ত্তাবাবু বিধুবাবুকে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "যাক্, যা হয়ে গেছে, এদের সামনে আর উচ্চবাচ্য ক'র না। এস, চা খাও।"

বিধুবাবু হাত নাড়িয়া বলিলেন, "চা? বাপ রে! রাতে হজম হয় নি, এখনও চোঙ্গা ঢেঁকুর উঠছে। ওঃ হো হো! সকালে দুটো বড়ী খাওয়া হয় নি যে এখনও।"

বিধুবাবু যখন এই কথা বলিয়া পকেট হইতে 'অজীর্ণ-চূরমার' বটিকার কৌটা বাহির করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বিজন কালীনাথবাবুর হস্তখানি টানিয়া ধরিয়া দারুণ উৎকণ্ঠা ও ভয়ের সহিত বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! যা বলছিলুম, তাই হ'ল। কাল রামদা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আজ তাই বিষবড়ীর কৌটো খুলছে---এই চায়ে মেশালে ব'লে!"

কালীনাথবাবুর চক্ষু দুইটা কেবল বিভীষিকা-মিশ্রিত আকুল উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিল, কণ্ঠ কোনও রব নির্গত করিল না। কালীনাথবাবু কক্ষমধ্যে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন, হতভাগ্য বিধুবাবু উদাস মনে কৌটা হইতে সেই সর্ব্বনেশে বিষবড়ী বাহির করিতেছেন! হয় ত পর-মুহূর্ত্তেই অভাগা ঐ বড়ী বদন-বিবরে ফেলিয়া দিয়া সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? মানুষ ত!

ভীষণ শব্দে দুইখানা চৌকী ও একটা ফুলের টব ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া কালীনাথবাবু এক লম্ফে বিধুবাবুর সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন এবং সবলে তাঁহার হস্ত হইতে বিষবড়ীর কৌটা ছিনাইয়া লইয়া চীৎকার করিয়া কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন---তাঁহার সেই রুদ্র তাণ্ডবে জমীদার-ভবন কম্পিত হইয়া উঠিল।

* * * *

"তার পর?"

"তার পর আর কি? বাবা মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম, বিধুবাবু মালপত্র না নিয়েই বাগান ভেঙ্গে ষ্টেশন-মুখো ছুট, আমি ত হেসে অজ্ঞান, দম ফেটে যাবার মত হ'ল। একলা আর কত হাসব?"

যে দিন প্রাতঃকালে এই কাণ্ড ঘটে, সেই দিন সন্ধ্যার পর রমেনদের কুটীরে বিজন ও রমেনে কথা হইতেছিল।

রমেন বলিল, "তোর পেটে এত সয়তানীও খেলে!"

বিজন বলিল, "করি কি বল। না খেল্‌লে তোরাই বা দাঁড়াতিস কোথা? জমীদার কালীনাথবাবু ঘরে ফিরে আস্‌তেই বাবা একবার ওর দিকে তাকান আর অস্থির হয়ে 'ওরে বিজন কোথা গেলি' ব'লে ডাকেন। আমি তখন পাশের ঘরে গিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করছিলুম। জমীদার-বাবু বল্‌লেন, 'আজই অনন্তপুর চল্‌লুম, আর এক দণ্ড থাক্‌লে মাথা বিগড়ে যাবে। চোখের সামনে জলজীয়ন্ত মানুষ আত্মহত্যা করবে, তা দেখতে পারব না।' বাবা না রাম না গঙ্গা ব'লে আমায় আরও কাছে স'রে দাঁড়াতে বল্‌লেন। জমীদার কালীনাথ আপনিই বিদায় হলেন। কেমন, যা বলেছিলুম হ'ল? এইবার আমায় কি দিবি বল। বাবা, আর ওদের ঘরে শিউলীর বিয়ে কখখনো দেবেন না।"

রমেন তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "ভাই, তোকে দেবার মত এ গরীবের কি আছে?"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

টাকার গরম
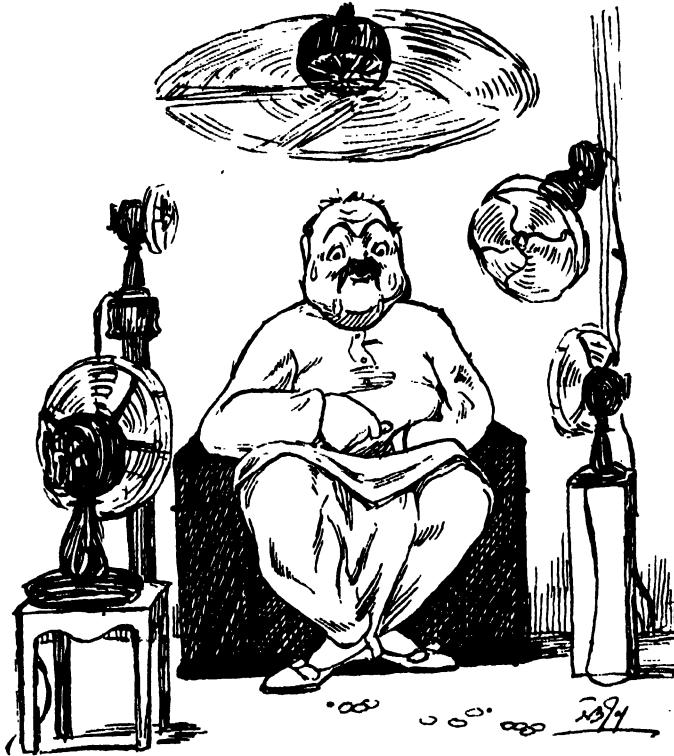
কলিতে নাই ভালমানুষ, সকল বেটাই কু,
তাতেই আমার নাম রেখেছে 'শাইলক্ দি জু।'

পাঁচদিকে পাঁচখানা পাখা চল্‌তেছে হু হু,
তবু গরম কাটচে না ত—উঃ কি গরম উঃ।

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

নদী-কূলে ঢাকা

ঢাকা

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে সকল বিষয়ে পথিপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আজ বাঙ্গালী জীবনযাত্রার বিভিন্ন বিভাগে—সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যবসা-বাণিজ্য—সকল বিষয়ে আপনার উপযুক্ত স্থান করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। দীর্ঘ দিনের আলস্য ও জড়তা যে জাতিকে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছিল, আত্মসংবিৎ লাভ করিলেই জীবন্ত জাতির মত সকল বিষয়ে তাহার অগ্রগতি দ্রুত হইতে পারে না। কিন্তু তথাপি সে আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে, জড়তা পরিহার করিয়া জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল—ইসলামপুরের বড় চৌকী

বাঙ্গালী ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বপুরুষগণের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোন সন্ধানই রাখিত না; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর হৃদয়ের তীব্র আক্ষেপোক্তির পর হইতে বাঙ্গালী ইতিহাসচর্চ্চায় অবহিত হইয়াছে; দেশের গৌরবোজ্জ্বল যুগের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া আপনাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। তাই এখন আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ঢাকার ইতিহাস, যশোহর-খুলনার ইতিহাস ও ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া অতীত যুগের কীর্ত্তি-কলাপ, সামাজিক, রাজনীতিক প্রভৃতি ঘটনার কথা জানিতে পারিতেছি। শুধু তাহাই নহে, কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ গ্রাম ও নগরের ইতিহাস সঙ্কলনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহা যে আশার কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিষময় ফলে আজ বাঙ্গালা দেশে যে শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, প্রত্যেক বাঙ্গালী সে জন্য মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দেশহিতকামী ব্যক্তি সোনার বাঙ্গালার এই পরিণতি দেখিয়া কখনই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। কলিকাতা

মিছিলে নবাবপুরের বড় চৌকী

হইতে পাবনা, পাবনার পর ঢাকায় এই শোচনীয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বিসর্পিত হইয়া যে মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

যাঁহারা ঢাকা জিলার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, ঢাকার ইতিবৃত্ত—কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহারা অভিজ্ঞ। তথাপি এই সময়ে ঢাকানগরীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, দেশের কাহিনী পুরাতন হইলেও পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনায় কিছু সার্থকতা আছে।

সমগ্র ঢাকা জিলা সম্বন্ধে আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে বলিয়া আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঢাকানগরীর সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলিব।

বর্ত্তমান ঢাকা বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। যাঁহারা বর্ষাকালে ঢাকায় গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, বর্ষাধারাস্ফীতা বুড়ীগঙ্গার বক্ষের উপর দিয়া ষ্টীমার, নৌকা সবই চলিতেছে; কিন্তু নিদাঘকালে তথায় ষ্টীমার চলে না, শুধু নৌকাই মাল ও যাত্রী বহন করিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে রেলে গোয়ালন্দে যাইয়া তথায় পদ্মাবক্ষে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া নারায়ণগঞ্জে যাইতে হয় এবং তথা হইতে রেলে অল্পসময়মধ্যেই ঢাকায় পৌছিতে পারা যায়।

এই প্রাচীন নগরীর একটা বিস্তৃত ইতিহাস আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বহু পরিশ্রম সহকারে সেই ইতিবৃত্ত সংগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু সকল ঘটনাই যে সকল গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, এমন না-ও হইতে পারে; কারণ, সে কায সহজসাধ্য নহে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল য়ুরোপীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই "বাঙ্গালা" ও ঢাকাকে একই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক টেলারও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আবার কোন কোন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকের মতে ঢাকা ও বাঙ্গালা এক নহে। সে যাহাই হউক, ঢাকানগরী ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান নবাবের রাজধানী হইবার পূর্ব্বেও যে বিশিষ্ট নগরীরূপে বিরাজিত ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঢাকা রাজধানী হইবার পূর্ব্বেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

মোগলসম্রাট আকবরের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মহাবীর মানসিংহ কয়েক বৎসর বাঙ্গালার শাসনদণ্ড আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঢাকায় তিনি অবস্থান করিতেন। তাহার পর ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। ঢাকানগরীর নামকরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নানাবিধ কাহিনী প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীনকালে এই স্থানে প্রচুর "ঢাক" বৃক্ষ ছিল, তাহা হইতেই ঢাকা নামের উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন যে, ইসলাম খাঁ নগরীর যে সীমা, উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, নদীকূলের সেই সীমা হইতে ঢক্কানিনাদ হইলে তাহা কাহারও শ্রুতিগোচর হইত না। আর এক দল বলেন, মহারাজ বল্লাল সেন ঢাকেশ্বরী নাম্নী কালীমূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নামানুসারে নগরীর নাম ঢাকা হইয়াছিল।
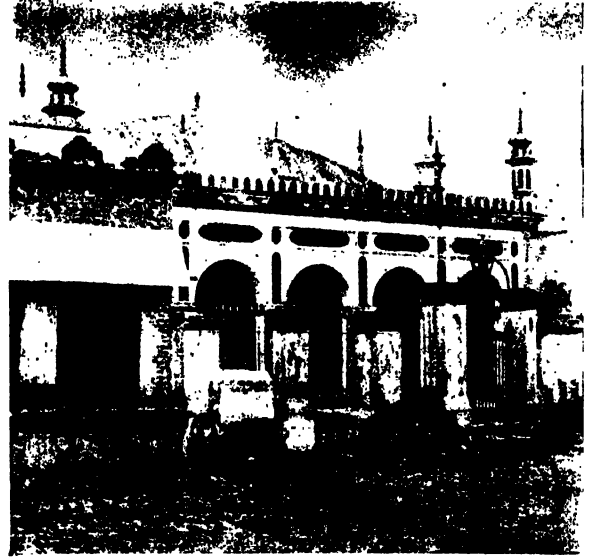
চুড়িহাট্টার মসজেদ

১৬০৮ হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। কিন্তু ইহার পর আবার রাজমহলে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা রাজধানী লইয়া যায়েন। সে সময়ে ঢাকা পরিত্যক্ত হইলেও তাহার গৌরবের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। রাজমহল একবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার শাসকানুগ্রহলাভে ধন্য হইয়াছিল। মীর জুম্লা যখন বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে তিনি পুনর্ব্বার ঢাকা নগরীকে রাজধানীর গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলেন। সেই সময় হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকা নগরীর সুখ-সম্পদের সীমা ছিল না। সেই সময় নগরীর সীমা পূর্ব্বদিকে ৫ ক্রোশ এবং উত্তরে প্রায় সাড়ে ৭ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, তখন নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ হইয়াছিল। অবশ্য তন্মধ্যে সেনাদল ও নবাবদরবারে সুযোগ ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য যাহারা বিদেশ হইতে উপস্থিত হইত, তাহাদের সংখ্যা

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায়ের সৌজন্যে]

যথেষ্ট ছিল। ঐতিহাসিকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে নগরী প্রায় বস্ত্রাবাসেই পূর্ণ থাকিত।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দের পর রাজধানী মুরশিদাবাদে উঠিয়া যায়।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পর্য্যটক টাভার্নিয়ার ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, সে যুগে নগরীর আয়তন দৈর্ঘ্যে বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং বুড়ীগঙ্গার তীরেই প্রত্যেকে গৃহ নির্ম্মাণ করিত।

ইটালীয় পর্য্যটক মেন্নুসী, টাভার্নিয়ারের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন। ঢাকা সম্বন্ধে তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত টাভার্নিয়ারের বিবরণের অনেক স্থানে ঐক্য আছে। তিনি বলেন যে, ঢাকার অধিকাংশ গৃহই তখন তৃণনির্ম্মিত ছিল। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে ঢাকানগরীতে বহুসংখ্যক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বাসের উল্লেখ আছে।

১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন বোরে (Bowrey) ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে ঢাকায় সৌধমালার সৌন্দর্য্য ও জনসংখ্যার প্রাচুর্য্য নগরীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সময়ে বৃহৎ সেনাদল তথায় অবস্থিতি করিত। শিক্ষিত রণহস্তীর দলও প্রাসাদের সন্নিহিত স্থানে সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিত। ধনী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণও সে সময়ে হস্তিপোষণ করিতেন। কিন্তু ৫ শত অশ্বারোহী সৈনিক প্রয়োজনকালে যিনি নবাবের সাহায্যার্থ সর্ব্বদা নিয়োগ করিতে সমর্থ না হইতেন, তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পাইতেন না।

ঢাকা প্রাচীন যুগ হইতেই ব্যবসায়ের কেন্দ্র বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে ঢাকাই মসলিনের জন্য ঢাকা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা যখন বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল, তখন ঢাকা ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। মসলিন, চাউল, চিনি, লবণ, সুপারি, তাম্রকূট, শাঁখা, প্রবালের অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য ঢাকা তখন সুপ্রসিদ্ধ। ছোলা, মটর, যব, গম প্রভৃতি উত্তরভারত হইতে বিক্রয়ার্থ ঢাকার বন্দরে নীত হইত। আসামের রেশমও ঢাকার বাজার না হইলে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ও ইংরাজ ব্যবসায়িগণ ঢাকায় কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ইংরাজের মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বেশী ছিল না। সে সময়ে বৈদেশিকগণ ইচ্ছামত সুবিধা করিয়া ব্যবসায়-কার্য্য চালাইতে পারিতেন না। প্রতিযোগিতায় দেশীয়গণ তাঁহাদিগকে অনেক সময় হটাইয়া দিতেন।

মোগল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে ঢাকানগরীতে উৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত হইত। সম্রাট্ ও তাঁহার পরিবারবর্গের ব্যবহারের জন্য ঢাকার তন্তুবায়গণ যে সকল মসলিন প্রস্তুত করিত, তাহার তুলনা হয় না। ঢাকার বয়নশিল্প দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে সুদূর প্রতীচ্য জগৎও এক দিন বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর কেমন করিয়া বাঙ্গালার এই বিশিষ্ট শিল্পটি প্রতিযোগিতার প্রভাবে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহার ইতিহাস আলোচনার স্থান ইহা নহে। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের অগোচর নাই।

বর্ত্তমান ঢাকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার প্রয়োজন নাই। শুধু এই প্রাচীনা নগরীর বক্ষোদেশে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি আজিও পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি মানবচিত্তে জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদেরই উল্লেখ করা যাইতেছে।

ঔরঙ্গাবাদ বা লালবাগ কিল্লা।—সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মহম্মদ আজম বঙ্গদেশ শাসনের ভার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ঢাকা রাজধানীতে অবস্থানকালে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দুর্গটি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঔরঙ্গজেব পুত্রকে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সেনাদলসহ উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। শায়েস্তা খাঁর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া মহম্মদ আজম দক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। সেই সময়ে তিনি শায়েস্তা খাঁকে উল্লিখিত দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করিতে অনুরোধ করিয়া যায়েন। শায়েস্তা খাঁ শাহজাদার ইচ্ছানুসারে দুর্গনির্ম্মাণে অবহিত হয়েন; কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার প্রাণাধিকা দুহিতা, মহম্মদ আজমের পত্নী পরীবিবি অকালে ইহলোক ত্যাগ করায় শায়েস্তা খাঁ দুর্গনির্ম্মাণের সঙ্কল্প
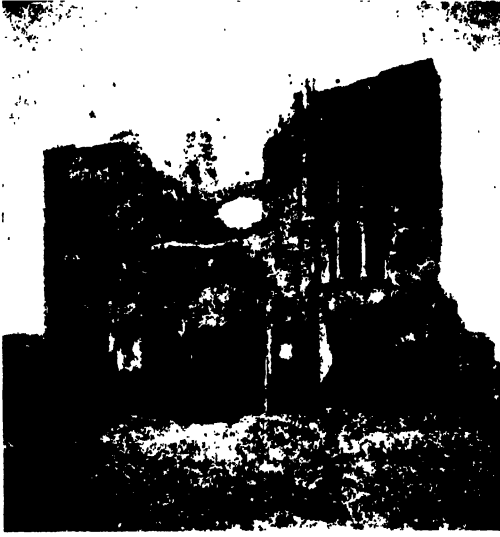
লালবাগ কিল্লা

লালবাগ কিল্লার ধ্বংসাবশেষ

পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, দুর্গভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর যখন তাঁহার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, তখন ঐ দুর্গনির্ম্মাণ কখনই শুভফলদায়ক হইবে না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি অসমাপ্ত অবস্থায় দুর্গটি রাখিয়া দেন। বর্ত্তমানে দুর্গটির অবস্থা অতি শোচনীয়।

দুর্গের পরিধি দৈর্ঘ্যে ২ হাজার ফিট এবং প্রস্থে ৮ হাজার ফিট। ইদানীং উহার দক্ষিণ ও উত্তরদিকে দুইটি অতি উচ্চ তোরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ তোরণের সন্নিকটস্থ প্রাকারসংলগ্ন কতিপয় প্রকোষ্ঠের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। দুর্গের অভ্যন্তরে একটি সুবৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপ আছে। তন্মধ্য দিয়া তিনটি সুড়ঙ্গ বিদ্যমান। সম্ভবতঃ ভূগর্ভে কোন প্রকার প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সুড়ঙ্গপথে তাহাতে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু ভূগর্ভস্থ কোনও কক্ষ এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই স্থানে শায়েস্তা খাঁর দুহিতা পরীবিবির যে মকবরাটি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে উক্ত সমাধি গয়ার কৃষ্ণপ্রস্তর, চুনারের ধূসর শিলা এবং জয়পুরের শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত হয়। সমাধি সৌধটি ৯টি কক্ষবিশিষ্ট। মধ্যস্থ কক্ষের আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৯ ফুট হইবে। একটি শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত আধারের মধ্যে শাহজাদা মহম্মদ অজমের প্রণয়িনীর মৃতদেহ রক্ষিত। এই কক্ষের প্রাচীরও মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত। প্রত্যেক কক্ষের প্রাচীরগাত্রে ভাস্কর্য্যের লীলাচাতুর্য্য প্রকটিত। কৌতূহলের বিষয় এই যে, মকবরার ছাত হিন্দুস্থাপত্য

লালবাগ কিল্লার ভূগর্ভস্থ পথ

লালবাগ কিল্লার ধ্বংসাবশেষ—অপর দৃশ্য

প্রথা অনুসারে নির্ম্মিত। উহার উর্দ্ধদেশে যে ১০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট গুম্বজ দৃষ্ট হয়, তাহা তাম্রমণ্ডিত।
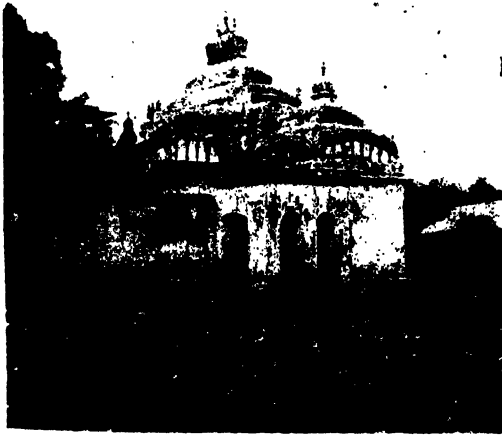
ঢাকেশ্বরী কালীর মন্দির

ঢাকেশ্বরী কালী।—ঢাকা নগরীতে যে সকল দেববিগ্রহ আছে, তন্মধ্যে ঢাকেশ্বরী কালী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দু জনসাধারণ এই কালীমূর্ত্তিকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর মহারাজ বল্লালসেন অরণ্যমধ্যে পরিভ্রমণকালে এই কালীমূর্ত্তির আবিষ্কার করেন। যে স্থানে এই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, বল্লালসেন ঠিক সেই স্থানেই বহুব্যয়ে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন; তাহার পর সমারোহ সহকারে ঐ কালীমন্দিরে কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। অম্বরপতি মান-সিংহ ঢাকায় অবস্থানকালে মন্দিরটিকে ধ্বংসমুখে পতিত দেখিয়া একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু কালের প্রভাবে উহা জীর্ণ হইয়া আসিলে কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকের চেষ্টায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়।

জয়কালী-মন্দির

জয়কালী।—ঢাকার অন্তর্গত টেটারী বাজারে অবস্থিত ৩টি মন্দিরের মধ্যে ১টিতে জয়কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। অপর ২টির মধ্যে একটি পঞ্চচূড়—পঞ্চরত্ন।

জয়কালীমূর্ত্তি অতি প্রাচীন। মন্দিরত্রয়ও দীর্ঘকালের নির্ম্মিত। কিন্তু কে বা কাহারা উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জয়কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ যাবৎ কেহ তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

ঢাকা নগরীর অন্তর্গত রমনা নামক প্রান্তরমধ্যে আর একটি কালীমূর্ত্তি আছে। উহাকে জনসাধারণ "রমনার কালী"

জয়কালীমূর্ত্তি
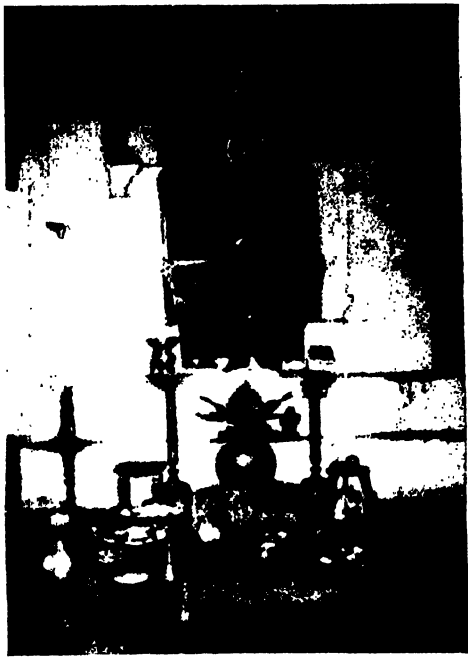
বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই মন্দিরের শিখর-দেশ সু-উচ্চ এবং রমনার কালী জাগ্রত বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

বড় কাটরার গেট

বড় কাটরা।—শাহজাদা সুজা যখন সুবে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্তা, সেই সময় তাঁহার আদেশ অনুসারে দেওয়ান মীর আবুল কাশিম খাঁ বুড়ীগঙ্গার উত্তরতীরভূমিতে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বড় কাটরা নির্ম্মাণ করেন। এই সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ ভবনটি কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন হেতু জানা নাই। শাহজাদা সুজার কিন্তু উহা মনোনীত না হওয়ায় তিনি ভবনটি মীর আবুল কাশিম খাঁকে প্রদান করেন। তিনি উহাকে পান্থনিবাসে পরিণত করিয়াছিলেন।

রমনা কালীমন্দির
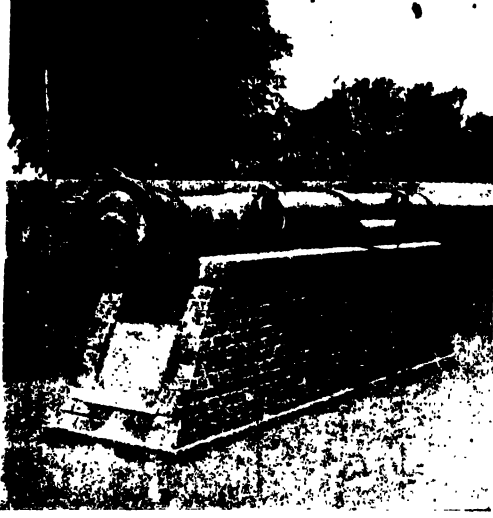
ছোট কাটরা

"কালাঝমঝম" কামান

বড় কাটরার তোরণ ব্যতীত ইদানীং অন্য বিশেষ কোন অংশ বিদ্যমান নাই। "কালাঝমঝম" নামক যে একটি প্রাচীন তোপ এখন নদীতীরে পরিলক্ষিত হয়, একদা উহা এবং উহারই সদৃশ আর একটি কামান বড়কাটরার তোরণ-সম্মুখে স্থাপিত ছিল।

ছোট কাটরার ধ্বংসাবশেষ

ছোট কাটরা।--১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খাঁ ছোট কাটরা নির্ম্মাণ করেন। উহা বুড়ীগঙ্গার উত্তরতীরে ইমামগঞ্জের নিকট অবস্থিত। ছোট কাটরার অধিকাংশই ধ্বংস পাইয়াছে, শুধু নদীর তীরবর্ত্তী তোরণ এবং ভবনের কিয়দংশমাত্র অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। সম্ভবতঃ
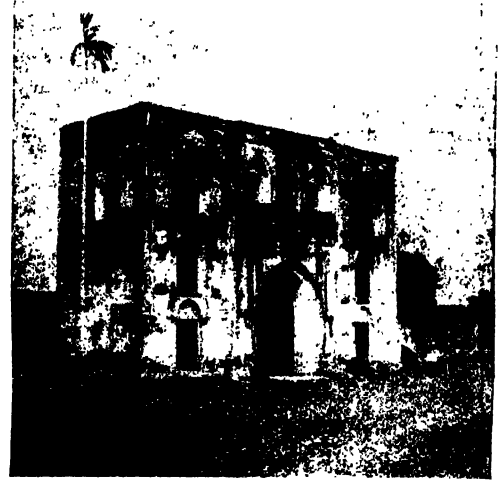
নিমতলীর নবাবী মহল

ইহাও পান্থনিবাসরূপে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নিমতলীর নবাবী মহল।--১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ঢাকার নবাব জসরত খাঁর জন্য নিমতলীতে একটি মহল নির্ম্মিত হয়। সেই সময় হইতে তাঁহার পরবর্ত্তী পঞ্চম পুরুষ গাজীউদ্দীন হায়দর বা পাগলা নামে খ্যাত ঢাকার শেষ নবাব পর্য্যন্ত উক্ত মহলে বাস করিয়াছিলেন।

জাঞ্জিরা

জিঞ্জিরা মহল

কদম-রসুল দরগা

পূর্ব্ব বর্ণিত মহলের তোরণ ও বারদরী ব্যতীত এখন আর কোন অংশই বিদ্যমান নাই। অধুনা বারদরীটি ঢাকার মিউজিয়ম এবং তোরণটি মিউজিয়মের কার্য্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

জিঞ্জিরা মহল।—বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণতীরবর্ত্তী জিঞ্জিরা নামক গ্রামের মধ্যে যে ভগ্ন নিকেতনটি পরিলক্ষিত হয়, উহা প্রায় ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ ফতেহজঙ্গ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে যুগে একটি কাষ্ঠসেতুর দ্বারা ঢাকা ও জিঞ্জিরা গ্রাম সংযুক্ত ছিল বলিয়া একটা জনশ্রুতি আছে; কিন্তু অনেকে ইহা বিশ্বাস করেন না। কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজদ্দৌলার পরিবারবর্গকে না কি উল্লিখিত জিঞ্জিরা মহলে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। অবশেষে মীরন বন্দীগণকে মুর্শিদাবাদে লইবার ছলে ধলেশ্বরীতে নৌকা ডুবাইয়া দিয়া তাঁহাদের ভবযন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়।

সাত-গুম্বজ মসজেদ

সাত গুম্বজ মসজেদ।—ঢাকা নগরীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী জাফরাবাদ নামক স্থানে সপ্তগুম্বজবিশিষ্ট উক্ত মসজেদ শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই ভজনালয়টি অত্যন্ত সুদৃশ্য। যখন উল্লিখিত মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সময়ে নদী উহার তলপ্রবাহিণী ছিল; কিন্তু স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অধুনা নদী ১ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। বর্ণিত মসজেদের প্রায় ২ শত হস্ত দূরে শায়েস্তা খাঁর ২ কন্যার মকবরা বা সমাধি বিদ্যমান।

দেওয়ান ইশা খাঁ নামক জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান স্বাধীনভাবে সোনারগাঁ শাসন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত রাজা মানসিংহ যুদ্ধোদ্যম করেন। পরাজিত ইশা খাঁ দিল্লীতে প্রেরিত হয়েন। তাঁহার প্রপৌত্র মনুব্বর আলী উল্লিখিত দরগা নির্ম্মাণ করেন। কালক্রমে দরগা জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইলে ঢাকা জিলার মুসলমানগণ ও সেখ গুলাম্ নবী নামক ত্রিপুরা জিলার জনৈক জমীদারের সমবেত চেষ্টায় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তনে উক্ত দরগাটি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনর্নির্ম্মিত হয়।

হাজিগঞ্জের কিল্লা। নারায়ণগঞ্জের অন্তঃপাতী হাজিগঞ্জ গ্রামে শীতললক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। আরাকানী জলদস্যুগণের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য মীরজুম্লা উহা নির্ম্মাণ করেন। অধুনা ইহার অধিকাংশই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

হাজিগঞ্জ কিল্লা

কদম্‌রসুল দরগাহ।—নারায়ণগঞ্জের পার্শ্বদেশপ্রবাহিত শীতললক্ষ্যা নদীর পূর্ব্বদিকে এই সুপ্রসিদ্ধ দরগা অবস্থিত। ইহার মধ্যে এক প্রস্তরখণ্ড বিদ্যমান। তাহার উপর যে পদচিহ্ন আছে, উহা ইস্‌লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের বলিয়া মুসলমানগণ শ্রদ্ধাসহকারে উহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

সোনাকান্দা দুর্গের ভগ্নাবশেষ

হাজিগঞ্জ কিল্লার ফটক

যে নগরী এক দিন বাঙ্গালার গৌরবস্থল ছিল, যেখানে বাঙ্গালীর শিল্পকলা, বাণিজ্যশক্তি এক দিন সমগ্র বঙ্গদেশের, তথা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল, বল্লালের বহু কীর্ত্তি যাহার অঙ্গে অঙ্গে জড়িত, মুসলমান শাসকগণের বহু কীর্ত্তিকাহিনী যাহার হর্ম্ম্যমালার বক্ষোদেশে উজ্জ্বল হইয়া আছে, যে স্থানে বহু মনীষী বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতির দ্বারা সমগ্র দেশের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার সেই

প্রাচীন নগরীর আলোচনায় আজ হৃদয় বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে!

আজ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দাবানল বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া যেন দগ্ধ করিতে চাহিতেছে। বাঙ্গালার পৌরুষশক্তি দেশের অগ্রগতিতে যোগ না দিয়া আত্মবিগ্রহে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বীভৎস দৃশ্যের কাহিনী কখনও লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না, তাই আজ এই সৌধমালাময়ী নগরীর প্রাচীন কীর্ত্তি-কাহিনীর স্মৃতিবিজড়িত বাঙ্গালার অতীত যুগের সাধের রাজধানীর কথা মনে করিয়া অশ্রুভারে নয়ন ভরিয়া আসিতেছে!

জন্মাষ্টমীর প্রসিদ্ধ মিছিল

অতীত যুগের যবনিকা সরাইয়া দিয়া কর্ম্মপ্রাণ শক্তিশালী পুরুষদিগের স্মৃতি মানসপটে ভাসিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী কর্ম্মী, বাঙ্গালী সাহিত্যিক, বাঙ্গালী রাজনীতিক, দেশগতপ্রাণ যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ এই দেশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাই আজ বারংবার মনে পড়িতেছে।
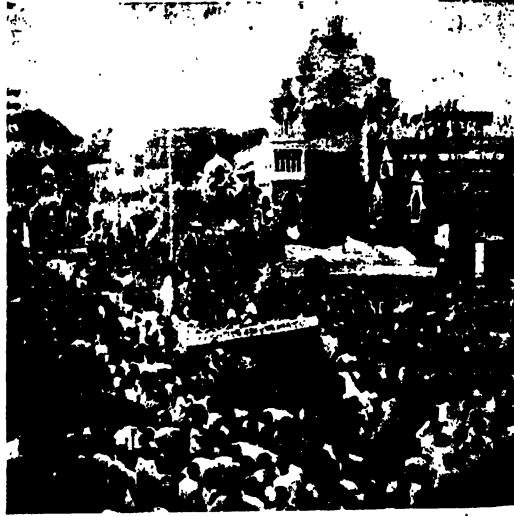
বাঙ্গালী দেশকে চিনিতে শিখিতেছে, মাতৃভূমিকে ভালবাসিতে শিখিতেছে; কিন্তু প্রেমের শিক্ষায়, কর্ম্মের প্রেরণালাভে নরনারী যখন ধন্য হইবে, সেই সময়ই সাম্প্রদায়িক হলাহল তাহার জীবনী শক্তিকে এমন নির্ম্মমভাবে অভিভূত করিয়া তাহাকে কোন্ ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে, ইহা ভাবিয়া কোন্ বাঙ্গালী না পরিণামশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিবে?

শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

ত্রিপুরার বড় ঠাকুর বাহাদুর।

জেলের মেয়ে

১

"নতুন, তোর না কি বিয়ে ?"

"কে বল্‌লে ?"

"যে-ই বলুক, ঠিক কি না বল।"

"হ্যাঁ, ঠিক।"

"জয়ীর সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ।"

"জয়ীকে তোর পছন্দ হয় ?"

নতুন হঠাৎ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না। সে মুখ নত করিয়া তাহার বাঁখের দড়ি আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল।

"বল্‌ না, নাগর মাঝির মেয়ে জয়ীকে তোর মনে ধরেছে ?"

"না।"

"তবে কেন বিয়ে করবি ?"

নতুন চুপ করিয়া রহিল।

নতুন জেলের ছেলে; ময়না জেলের মেয়ে। রূপনারায়ণের তীরে দাঁড়াইয়া দু'জন কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। নতুনের যুবা বয়স, বলিষ্ঠ গঠন, ডাগর ডাগর চোখ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে একখানি শক্ত বাঁখ। শেষ রাত্রিতে জেলেরা মাছ ধরিতে গিয়াছে, সেই সব নৌকা ফিরিলে, মাছের ঝুড়ি বাঁখে করিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইবে বলিয়া সে ঘাটে আসিয়া বাঁখ হস্তে অপেক্ষা করিতেছে।

ময়না স্নান করিয়া উঠিয়া গামছা নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে নতুনকে তাহার বিবাহের পাত্রী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিল। ময়না নতুনের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। আর্দ্র চুলে তাহার পিঠ ঢাকিয়া গিয়াছিল। তাহার কপালে দুইটি ভুরু যেন কেহ তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। এমন ভাবে ভুরু দুইটি কপালের ঠিক মাঝখানে মিশিয়াছে যে, একবার দেখিলে আবার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ঢল ঢল করিতেছে।

এক দিন তাহারই সঙ্গে নতুনের বিবাহের কথা হইয়াছিল। ছেলেবেলা হইতে ইহারা একসঙ্গে খেলা করিয়াছে, একসঙ্গে বেড়াইয়াছে। নদীর ধারে বালুর মধ্যে দুইটি শিশু যখন মাটীর ঘর-বাড়ী, রান্না-বাড়া করিয়া খেলিত, তখন পাড়াপড়শীরা তাহাদের লইয়া কত দিন কত হাস্যপরিহাস করিয়াছে। ছেলেবেলা হইতেই নতুন জানিত, ময়না তাহার স্ত্রী হইবে; ময়না জানিত, নতুনই তাহার বর।

জেলেদের এই ছোট পল্লীতে ছেলে-মেয়ে ছিল কম। যে সব ছেলে-মেয়ে বিবাহযোগ্য হইত, তাহাদের পিতামাতার মধ্যে মনের মিল থাকিলে বিবাহ হইতে বাধা হইত না। পল্লী ছাড়িয়া এই গরীব গৃহস্থরা দূরে গিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতান বড় একটা পছন্দ করিত না।

নতুনের সঙ্গে ময়নার বিবাহ হইতে পারিত; কিন্তু ময়নার পিতা সুন্দর মাঝি নতুনের পিতা গঙ্গারামের সহিত বনিবনাও করিয়া চলিতে পারিল না। সুন্দরের অবস্থা এক দিন ভাল ছিল, সে গ্রামের মধ্যে কুলীন ছিল। "পাড়ুই" বলিয়া তাহার যে কুলমর্য্যাদা, তাহা ঐ ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই পলায়মান হইল। সুন্দর সে কথা বুঝিল না; সে ভাবিল, এই নদীতে যেমন ভাঁটার পর জোয়ার আইসে, তেমনই অবস্থা ফিরিতে কতক্ষণ! কুলমর্য্যাদা দু'দিনের জিনিষ নহে, অবস্থার হেরফেরে তাহা

খোয়া যাইতে পারে না। এমনই একটা ধারণা সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল। কাযেই তাহার কন্যার বিবাহ দিতে ক্রমেই বিলম্ব পড়িয়া যাইতে লাগিল।

গঙ্গারামের অবস্থা ভাল। তাহার তিনচারিখানা নৌকা, অনেক লোকজন খাটে। বেলডাঙ্গার হাটে গঙ্গা মালোর যেমন ইজ্জত, এমন আর কাহার? সে সুন্দরের কুলীন-গিরি সহ্য করিতে পারিল না। সুন্দরের যে নৌকা একখানা ছিল, তাহা গঙ্গা কর্জ্জা টাকার জন্য আবদ্ধ রাখিয়াছে, সামান্য যে জোতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সে কিনিয়া লইয়া সুন্দরকেই "বরগা" দিয়াছে। কাযেই সুন্দরের উচিত, তাহার নিকট হাত যোড় করা। কিন্তু সুন্দর বলিয়া বসিল, মর্য্যাদা না দিলে সে গঙ্গার ছেলের সঙ্গে তাহার কন্যার বিবাহ দিবে না। মর্য্যাদাও কম নহে—দুই কুড়ি টাকা। গঙ্গার টাকা দিতে অসুবিধা নাই, কিন্তু অতখানি মাথা হেঁট করিতে হইবে, কেন? সে কিছুতেই রাজি হইল না।

এক দিন এই ময়না না থাকিলে নতুন মালো ডুবিয়া মরিত। সে দিন খেলিতে খেলিতে তাহারা রূপনারায়ণ পাড়ি দিবার সঙ্কল্প করিল। আগে কতবার তাহারা দু'জনে মিলিয়া সাঁতার কাটিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু এ দিন মাঝগাঙ্গে বড় তুফান উঠিল। ভাঁটার খর টান তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা কূলের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নতুন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখনও সিকি নদী পাড়ি দিতে বাকী। নতুন বুঝিল, পাড়ি আর জমে না; তাহার হাত-পা ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সঙ্গিনী কিছু দূরে। তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতেও লজ্জা করে। ময়না দেখিল, নতুনের হাত বড় নিকটে নিকটে পড়িতেছে। তখন সে জোর সাঁতার দিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "কি রে, হয়রাণ হলি না কি রে?"

নতুন উত্তর করিতে পারিল না; দু'ঢোক জল খাইল। ময়না তাহার ছোট কাপড়খানি আরও শক্ত করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল; বলিল—"ধর্ আমার হাত। হাল্কা, খুব হাল্কা দে।"

ময়নাও ক্লান্ত হইয়াছিল। কিন্তু "বর"কে বাঁচাইতে হইবে, এই ভাবনা তাহার শরীরে দ্বিগুণ বল আনিয়া দিল। ময়না শরীরিক বলের জন্য তাহাদের জাতির মধ্যে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি পাইত। যে সকল নৌকা পুরুষরা ডাঙ্গায় তুলিতে হয়রাণ হইয়া যাইত, ময়না তাহা হেলায় টানিয়া তুলিয়া উবুড় করিয়া দিত।

কূলে উঠিয়া নতুন চরের উপর একেবারে শুইয়া পড়িল। ময়না কোলের উপর তাহার মাথা অতি যত্নে তুলিয়া আঁচল নিঙড়াইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিল।

নতুন একটু চোখ চাহিতে ময়না বড় আদর করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কি হয়রাণ হয়েছ, মণি?"

এত স্নেহ ময়নার হৃদয়ে কোথা হইতে আসিল, তাহা নতুন জানে না। আজ এই তেপান্তর মাঠে নিরালা নদীর কিনারায় এই দুইটি কিশোর ধীবর-সন্তান কিসের টানে পরস্পরের এত নিকটে আসিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? অপরাহ্নের সূর্য্য-কিরণ বিস্তৃত মাঠের শ্যামশস্পরাজিতে সোনার ঢেউ খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, নদীর জলে পড়িয়া শত শত চুমকী চমকাইয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, আর ময়নার কোলে অসহায় যুবকের আর্দ্র দেহ অসীম নির্ভরে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। কত যে সোহাগে আদরে ময়না তাহার মস্তক কোলে করিয়া বসিয়াছে, তাহা কেবল তাহার অন্তর্য্যামী ভিন্ন অন্য কেহ দেখিল না। নতুন কি কিছু বুঝিল? সেই নিবিড় আলিঙ্গন, সেই উন্নমায়মান বক্ষের কঠিন স্পর্শ, মুখের উপর সেই উষ্ণ মৃদু শ্বাস—সে কি নতুন বুঝিল? তাহা সে-ই জানে। ময়না দেখিল, তাহার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত। বুকখানি কেবল থাকিয়া থাকিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।

একবার গভীর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া নতুন উঠিয়া বসিল। তখনও ময়না তাহার কেশপুঞ্জের মধ্যে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নতুন বলিল, "হাতে খিল ধরেছিল। বেশী কিছু না।"

ময়নাও তাহাকে সপ্রতিভ করিবার জন্য বলিল—"ও, বেশী কিছু না। এখুনি ঝেড়ে কেটে উঠবি। তবে আর একটুখানি আমার কোলে মাথা রেখে শো—"

কোলে মাথা রাখার কথা বলিতে গিয়া ময়নার মুখ লাল হইয়া উঠিল। নতুন তাহার চোখে চোখে মিলিতেই একটু হাসিল; বলিল, "বিয়ে আগে হ'ক্।"

"দূর, আমি বুঝি তাই বল্‌ছি? তুই ভারি দুষ্টু—"

নতুন ভাবিতে লাগিল। স্বপ্নের মত মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অনুভূতি তাহার জীবনের পরতে পরতে যেন মধুর কণা মাখাইয়া মিষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহার মনে ছিল শুধু সেই মিষ্টতা, আর কিছুই ভাল মনে আসিল না। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার পিতা কি সুন্দরের মেয়ের "মান" দিতে প্রস্তুত হইবে?

এক ঝাঁক পাখী কলরব করিতে করিতে তাহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। নতুন চমকিয়া উঠিল, ময়না তাহার আরও কাছে সরিয়া বসিল।

একটু পরেই যখন বেলা ঢলিয়া পড়িল, তখন ময়না উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "এখন পারবি?"

"পারে যেতে?"

"হ্যাঁ; পারে যেতে নয় ত কি?"

"যদি না-ই পারি।"

"তবে কি সারারাত এইখেনে থাক্‌বি না কি?"

"মন্দ কি? চাঁদনী রাত আছে।"

"দূর পাগল, তা কি হয়?"

"কেন হয় না বল্‌।"

"বিয়ে হয় নি যে।"

"হবে ত বিয়ে এক দিন।"

ময়নার মুখখানি সিন্দুরের আভায় রাঙ্গিয়া উঠিল। নতুন জোরে তাহার হাত মুচড়াইয়া দিয়া বলিল, "না, আজ আর নয়। আয় ঘরে ফিরে যাই।"

"পাড়ি দিতে পারবি? খিল ধরবে না ত?"

"না, তুই আয়।"

"না থাক্‌, আর একটুখানি থাকি।"

"কেন রে?"

"বড় ভাল লাগছে।"

"কি ভাল লাগছে রে?"

"তা কি জানি?"

"বল্‌বি না?"

"না।"

"তবে চল্‌।"

"চল যাই"—বলিয়া ময়না তাহার আলুলায়িত কেশ-কবরী রচনায় প্রবৃত্ত হইল। তখনও কেশের ভিতর হইতে বিন্দু বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে উঠিতেই কবরী খুলিয়া পিঠের উপর ঝাঁপিয়া পড়িল। নতুন সে কেশরাশি হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না।

আবার যখন দুই জনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল, তখন জলে সন্ধ্যার ছায়া ম্লান হইয়া আসিতেছিল। এবার ময়না নতুনকে ছাড়িয়া দূরে গেল না। মাঝে মাঝে তাহাকে আল্‌গা দিতে বলিয়া স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে দুই জনে ভাসিয়া ভাসিয়া কূলের দিকে আসিতে লাগিল।

নতুনের কাছে পাড়ার সকলে শুনিল যে, নদী পাড়ি দিতে গিয়া সে প্রায় ডুবিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল; ময়না না থাকিলে সে ডুবিয়াই মরিত। নতুনের মা'র নিকট গঙ্গারাম সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইল। শেষে কি দুই কুড়ি টাকা দিয়া সুন্দরের মেয়ের পা-পূজা করিতে হইবে?

নাগর মাঝির মেয়ে জয়ী ও ময়নার কীর্ত্তির কথা শুনিল। সে-ও বালিকা; ভাবিল, ময়না-দির সঙ্গে নতুনের বিয়ে হইলেই ভাল হয়। ময়নার যেমন চেহারা, এমন আর কাহার? নতুন যেমন সুশ্রী, এমন আর কে? সে যখন তাহার কোঁকড়া চুলে টেড়ি কাটিয়া, কানে চাঁপা-ফুল গুঁজিয়া বেড়ায়, তখন তাহাকে যেমন দেখায়, এমন আর কাহাকে? নতুন আর ময়না; ময়না আর নতুন। জয়ী ভাবে, ইহাদের মিলন হইলেই চমৎকার হয়। তখনও তাহার সঙ্গে নতুনের বিবাহের সম্বন্ধ হয় নাই।

২

গঙ্গারাম যখন দেখিল, সুন্দর মাঝি ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিয়াছে যে, "মান" না পাইলে সে তাহার সঙ্গে কিছুতেই কাম করিবে না, তখন সে অন্য মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সুন্দর যে তাহার অপমান করিল, তাহা ভুলিল না।

জয়ী ময়না অপেক্ষা বয়সে তিন চারি বছরের ছোট। সে কেবল যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে। তাহার গঠন নিটোল, মুখখানি ভরা ভরা। কিন্তু ময়নার মত কালো হরিণ-চোখ তাহার নাই। তাহার কেশরাশি ময়নার মত পিঠ ঝাঁপিয়া পড়ে না। তাহার চলনে রাজহংসীর মত দোলনী কোথায়? নতুন তাহার দিকে ফিরিয়াও দেখে না।

এক দিন সাঁঝের বেলা কলসী কাঁখে জয়ী ও ময়না

একই ঘাটে জল লইতে নামিতেছিল। বালুর চড়ায় জেলের নৌকা দুই তিনখানি পড়িয়া ছিল। তাহারই আড়ালে বসিয়া নতুন ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল। ময়না বা জয়ী কেহ প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাইল না।

সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ায় ময়নার অলকদাম দুলিয়া উঠিতেছিল। নতুন আড়াল হইতে একদৃষ্টে তাহা দেখিতে-ছিল। জয়ীও ময়নার মুখের দিকে অনিমেষে তাকাইয়া ছিল। ময়না একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ক'রে কি দেখছিস্ রে পাগলী?"

জয়ী সরলভাবে বলিল, "দেখছি—দেখছি তুমি কি সুন্দর!"

"দূর পাগলী; ও ঐ সিন্দুরে মেঘের রঙ মুখে পড়েছে ব'লে। তোর মুখখানি যে কত সুন্দর দেখাচ্ছে, তা ত তুই দেখতে পাচ্ছিস নে।"

সত্যই পশ্চিমাকাশে সিন্দুরে মেঘ উঠিয়া আকাশে বাতাসে লাল রঙের তুলি বুলাইয়া দিয়াছিল। ময়নার কথা শুনিয়া জয়ী পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিল—যেখানে নীলের কোলে লাল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জলে নামিয়া দুই জন গাত্রমার্জ্জনা করিতে করিতে, ময়-নার চোখ হঠাৎ নতুনের দিকে পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠিল। জয়ী তখনও তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ময়না একদৃষ্টে নতুনের দিকে চাহিয়া রহিল। সিন্দুরে মেঘের লোহিত আভা নতুনের চোখে মুখে পড়িয়া তাহাকে আজ বুঝি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল! ময়না চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না।

খানিক পরে জয়ী সে দিকে ফিরিল; তখন নতুন হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া লইল। জয়ী বুঝিল, ময়না এতক্ষণ নতুন-কেই দেখিতেছিল। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু ভ্রূকুটি করিল। ময়না তাহার গাল টিপিয়া দিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে নতুনকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ দেখ তোর বর।"

জয়ী একটু অভিমানের স্বরে বলিল, "আমার না তোমার!"

"না, তোর।"

"না, তোমার।"

ময়না স্বর আর একটু উঁচু করিয়া বলিল, "আয় রে নতুন, তোর বউ দেখবি আয়।"

নতুন শুনিল। সে তাহার ছিপ-বঁড়শী ফেলিয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। ময়না উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। জয়ী সে হাস্যে যোগ দিতে পারিল না।

ময়না বলিল, "রাগ করিস নি, ভাই। তোর খুব ভাল বর হবে—নতুন বড় ভাল রে, বড় ভাল!"

কি যে বিষাদের সুর এই কয়টি কথার মধ্যে গুমরিয়া উঠিতেছিল, তাহা কেবল ময়না আর তাহার অন্তর্য্যামীই বুঝিল। তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। সে তাড়া-তাড়ি কলসীতে জল ভরিয়া উঠিয়া পড়িল।

জয়ীও তাহার অভিমানের জ্বালা লইয়া বাড়ীতে ফিরিল। নতুন যে তাহাকে মোটেই পছন্দ করে না, এই দারুণ অভিমান তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। বাড়ী গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া শুধু এইটুকু বুঝিল যে, জয়ী আর ময়না দুই জনে বিবাহের কথা লইয়া আজ ঝগড়া করিয়াছে।

গঙ্গা বাড়ী আসিলে তাহার স্ত্রী তাহাকে নানামতে বুঝাইল যে, সুন্দর মাঝির কন্যা আজ জয়ীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। নতুন সেখানে উপস্থিত ছিল; তাহারই সম্মুখে ময়না জয়ীকে অপমান করিয়াছে। গঙ্গারাম রাগিয়া গেল এবং সে একবার দেখিয়া লইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

ময়না তখন নতুনের স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে জানিত যে, জয়ীর সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিদ্রাদেবী একখানি জরীর বুটী-দেওয়া নীল শাড়ী দিয়া সে সত্যটুকু ঢাকিয়া দিলেন। তাহার মনে রহিল কেবল তারার দীপ্তি, নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ আর নতুনের কিশোর কান্তি। তাহারই অঙ্গস্পর্শটুকু সেদিনকার মত —যে দিন সে তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়াছিল—সেই সেদিনকার মত তাহার প্রাণে প্রাণে পুলকের আবেশ ছিটাইয়া দিতেছিল!

দিনের মধ্যে যত বার নতুনের সঙ্গে দেখা হয়, তত বারই ময়না আকুল নয়নে চাহিয়া থাকে। বড় আদরের জিনিষ যতই অপ্রাপ্য বলিয়া মনে হয়, ততই কি তৃষ্ণা বাড়ে? দিবসে শতবার সে মনকে বুঝায়, "আর নয়, এই শেষ! দু' দিনে ত সে পর হইয়া যাইবে; তবে কেন এ মমতার বন্ধন?" তাহার মন কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। শত

পাকা দেখা

শিল্পী—শ্রীবীরেশ্বর সেন

শাসনের মধ্যেও সে চোখের কোণে অবারিত-স্নেহতরল দৃষ্টিতে এক বার নতুনের মুখখানি দেখিবেই দেখিবে।

এখন ময়নাকে শাসন করিবার বড় কেহ নাই। তাহার মা কিছু দিন হইল মারা গিয়াছে; বাবাও রোগগ্রস্ত। কাল-বৈশাখীর মত তাহার ভাগ্যগগনে জমাট বান্ধিয়া মেঘ উঠিতেছিল। কিন্তু ক্রীড়াচপল বালিকা তাহার কিছুই ধার ধারে না।

গঙ্গারামের দেনার জন্য ময়নাদের নৌকাখানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সুন্দর যখন রোগশয্যায়, তখন জোত-জমাটুকু গঙ্গারাম অন্য লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছে। অভাবের প্রথম দম্‌কা হাওয়ায় তাহার স্ত্রী চলিয়া গিয়াছে। তবুও দিন কোনরূপে কাটিয়া যাইতেছিল।

ময়না তাহার রুগ্ন পিতাকে যথাসাধ্য শুশ্রূষা করে, তাহাকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ায়। রাত্রিতে যখন সে নিদ্রা যায়, তখনও ময়না জাগিয়া থাকে; দাওয়ায় বসিয়া জাল বুনিতে বুনিতে কত কি কল্পনার জাল বুনিয়া ফেলে। বর্ষাকালে রূপনারায়ণের ডাক গভীর রাত্রিতে বাড়িতে থাকে, সে ভাবিতে ভাবিতে তাহা শুনে। নদীর ডাকের সঙ্গে স্তব্ধ নিশীথের ঝাঁ ঝাঁ রব তাহার বড়ই মধুর লাগে। আর মধুর লাগে, দূরের আড়বাঁশীটি। সেই বাঁশীর গান শুনিবার জন্য সে কান পাতিয়া থাকে। এমন মধুর বাঁশী! নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে তারাগুলির মত যেন বাঁশীর সুরগুলি বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়া বেড়ায়! এমন পাগল করিয়া দেয় কেন, ঐ বাঁশী?

এক দিন সুন্দর হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বলিল—"এখনও ব'সে আছিস্, ময়না! তোর চোখে কি ঘুম নেই?"

"না বাবা, একটু বুন্‌ছি—"

"বুনছিস্ না আমার মাথা কচ্ছিস্; নতুনের বাঁশী শুনছিস্—"

সুন্দরের স্বরে যে একটু বিরক্তি, একটু বিষাদের আভাস ছিল, তাহা ময়না বুঝিল। সে মিথ্যা কথা বলিতে পারিল না।

সুন্দর কোনও জবাব না পাইয়া বলিল,—"বল্, ঐ বাঁশী শোনবার জন্যে রোজ তুই এত রাতে বাইরে ব'সে থাকিস্ কি না?"

ময়নার চোখ যেন হঠাৎ ছল ছল করিয়া আসিল। সে কিছু বলিতে পারিল না, তখনও যে বাঁশী বাজিতেছিল,—বড়ই কোমল, বড়ই মধুর!

ময়না ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুন্দর তাহার কাছে বসিয়া তাহার মস্তক নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল,—"ছি ময়না! কাঁদিসনে মা। তোর মা চ'লে গেছে, আমিও যেতে বসেছি। আর ক'দিন। গঙ্গা মালোই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আমার এ অবস্থা কা'র জন্যে? আজ যে দু'টি অন্নের জন্যে আমি কাঙ্গাল, এ কা'র জন্যে? ছি ময়না, তুই তা'র ছেলের জন্যে এমন ক'রে ভেবে ভেবে সারা হবি? মান বড়, না ঐ বাঁশী বড়? ছি ময়না, ছি ময়না!"

সুন্দরের চোখ অন্ধকারেও জ্বলিতে লাগিল। ময়না ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

৩

সুন্দর চলিয়া গিয়াছে। বড়ই অভাবের মধ্যে তাহার শেষ দিনগুলি কাটিয়াছিল। কিন্তু সে নীরবে সকল সহিয়া গিয়াছে। সে ইচ্ছা করিলে সবই অন্যরূপ হইতে পারিত। কিন্তু "মান" ছাড়িয়া কি বাঁচিয়া থাকা যায়? গ্রামের মধ্যে তাহার বাপ-ঠাকুরদা'র যে মান ছিল, তাহা অন্য সকলে ভুলিয়া যাইতে পারে, সুন্দর ভুলিতে পারে না। এক দিন ছিল, যখন তাহাদের তাঁবে কত মাঝি খাটিত, কত নৌকা চলিত, কত লোক তাহাদের কৃপায় "জাত" হারাইয়া আবার "জাত" পাইয়াছে; সে দিনের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? ঐ গঙ্গা মালোর পিতা তাহার বাপের শ্রাদ্ধে একটি লোকেরও পা ধুইবার জল দিতে পারিল না। সুন্দর মাঝির বাপ তখন তাহাকে "জাতে" তুলিয়াছে। আর সেই গঙ্গা কি না তাহার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে চায় বিনা "মানে?" এ দুঃখ রাখিবার যায়গা সুন্দর পাইল না। ফলে, তাহার কোপে পড়িয়া সে সব হারাইল, পথে দাঁড়াইল, আর সমস্ত দেনা-পাওনার শেষ করিয়া যে দিন সে বিদায় লইল, সে দিনও তাহার কন্যার জন্য একটু আশ্রয়ভিক্ষা করিতে অগতির গতি কালী মা'র চরণ শরণ লইতে হইল। এই দিন-দুনিয়ার মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে, অন্তিম সময় সে তাহার কন্যার হাতখানি ধরিয়া বলিতে পারে, "এই রইল আমার অনাথা মেয়েটি, ওগো একে একটুখানি আশ্রয় দিও। আমার কথা মনে ক'রে এর

মুখপানে চেও !" এ কথা সে এক অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিতে পারিল না। একবার চেষ্টা করিয়াছিল, ময়নাকে বলে—"আমিও মরিলাম, তোকেও মারিয়া গেলাম।" কিন্তু সে কথা বলিতে গিয়া তাহার বুকের মধ্যে এমন ধড়ফড় করিয়া উঠিল যে, ক্রমেই তাহার হস্তপদ শীতল হইয়া আসিল। সে কেবল উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল,"মা কালী দেখবেন তোকে।"

সুন্দর মরিলে পঞ্চায়েৎ বসিল। প্রাচীন জেলেরা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত ঘোঁট করিল। স্থির হইল যে, গঙ্গা মালো সুন্দরের মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিবাহ দিতে বাধ্য। তাহা না হইলে বেচারী যায় কোথায় ? তাহার যে ত্রিসংসারে দাঁড়াইবার একটু স্থান কোথাও নাই ! গঙ্গারাম প্রথমতঃ একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল।

পরদিন নূতন বস্ত্র ও এক হাঁড়ি পাটালী লইয়া সে ময়নার দাওয়ায় রক্ষা করিল। তখন ময়না নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। সে যখন ফিরিল, তখন তাহার পরিধানে আর্দ্র বস্ত্র, গলায় জবাফুলের মালা, কানে দুইটি অপরাজিতা। সে আপন মনে বকিতে বকিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, গঙ্গারামের দিকে একবারও চাহিল না। গঙ্গা দেখিল, ময়না কি বলিতেছে, আর পুনঃ পুনঃ মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেছে। সে মনে করিল, ময়না পূজা করিতেছে—তাহার ব্রতভঙ্গ করিতে নাই। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন সে কোনও সাড়া পাইল না, তখন অগত্যা তাহার "তত্ত্ব" লইয়া সে ফিরিয়া গেল; মনে ভাবিল, সুন্দর মাঝির কন্যা "মানের" কথা ভুলিতে পারে নাই।

ময়নার অবস্থা দেখিয়া গঙ্গারামের কঠিন হৃদয়ও একটু গলিল ; সে ভাবিল, সুন্দর ত গিয়াছে, আর ঝগড়া-ঝাঁটি করিব কাহার সঙ্গে ? দুই কুড়ি টাকা যদি নিতান্তই "মানের" দায়ে দিতে হয়, তবে তাহা ত নতুনেরই থাকিবে। সুতরাং সে আর কয়েক দিন বাদে আবার 'তত্ত্ব' ও টাকা লইয়া ময়নার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। ময়না তখন "জালের" সূতা কাটিতেছিল। ছোট একখানি বস্ত্র তাহার উছলিত যৌবনশ্রীকে কোনও মতে আবরণ করিয়াছিল; সে বস্ত্রখানিও জীর্ণ। গঙ্গা যখন তাহার দাওয়ায় পাটালীর হাঁড়ি, নূতন বস্ত্র এক জোড়া ও একটি একটি করিয়া চল্লিশটি টাকা রাখিল, তখন ময়না হাসিয়া উঠিল, "আমায় বিয়ে করতে চায় ! হায় রে কপাল ! আমায় আবার বিয়ে করতে চায় !"

গঙ্গা চমকিত হইল। এমন হাসি ত সে তাহাকে হাসিতে দেখে নাই। তবে কি—

সে বলিল, "কেন, ময়না। বরাবরই ত তোমার সঙ্গে নতুনের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে—"

"হা—হা—হা, ঠিক হয়ে আছে—তবে হ'ল না কেন ?"

"তোমার বাপের জেদ।"

"আমার বাবা মরেছে !"—ময়নার চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

"তাই ত গাঁয়ের পাঁচ জন আমাকে ধরেছে যে, এই কায আমাকে করতেই হবে।—তা আমি কি তা'দের কথা ফেল্‌তে পারি।"

"আমার বাবা যখন না খেয়ে মলো, তখন পাঁচ জন কোথায় ছিল ? যখন তুমি তা'কে তিলে তিলে মেরে ফেল্‌লে, তখন পাঁচ জন কি মরেছিল ? তখন দেবতা কোথায় ছিল,—তখন ঝড় ছিল না আকাশে ? বন্যা ছিল না নদীতে ? বাজ ছিল না মেঘে ?"

ময়না এত কথা কহিতে জানিত না। আজ সে সমস্ত ভাষা মন্থন করিয়া কথা কহিতে চাহে। জ্বলন্ত কথায় আগুন লাগাইয়া সারা বিশ্ব দহিতে পারা যায় না ? আজ আমার পিতৃহীন নিরাশ্রয় অনাথ জীবনের দীর্ঘশ্বাসে তরুলতা শুকাইয়া উঠে না ? হৃদয়ের নিষ্ফল আবেগে সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কানে বাজিতেছিল শুধু—ছি ময়না ! ছি ময়না ! আর চোখে ভাসিতেছিল, তাহার বাপের কঙ্কাল-সার মুখখানি। সে "তত্ত্বের" কাপড় উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, পাটালীর হাঁড়ি আছাড়িয়া ভাঙ্গিল।

গঙ্গারাম বুঝিল, মেয়েটার প্রতি "উপরি দৃষ্টি" হইয়াছে। সে টাকা কয়েকটি ও কাপড় কুড়াইয়া লইয়া যত সত্বর সম্ভব প্রস্থান করিল।

* * * *

কিছু দিন পরে জয়ীর সঙ্গে নতুনের বিবাহ হইয়া গেল। ময়নাও সে সংবাদ পাইল: বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই তাহার মধ্যে মধ্যে চেতনা-লোপ হইতেছিল। পাড়ার সকল লোক তাহাকে দেখিতে আইসে। সে যখন মা কালীর

নাম করিয়া হাসে, কাঁদে, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া সকল সন্তানের মাতাই অশ্রু বিসর্জ্জন করে। সে যখন অজ্ঞান হইয়া পড়ে, মুখে ফেনা উঠে, তখন সকলে যত্ন করিয়া তাহার সেবা করে। মা কালীর "ভর" হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। অনেক রোগী "ভোগ" লইয়া আসিতে লাগিল। কাহারও অসুখ সারিল, কাহার সারিল না। যাহার সারিল না, তাহারও সারিয়াছে বলিয়া জনরব শতমুখে প্রচারিত হইল।

জয়ীর মাতা তাহার কন্যা ও জামাতাকে লইয়া "দর্শন" করিতে আসিল। ময়না তখন "গাছ"তলায় বসিয়া ছিল। বহুদূর হইতে গাছতলায় পূজা দিবার জন্য লোকসমাগম হইয়াছিল। নতুন ও জয়ী নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিল। সঙ্গে ভোগরাগ, বাদ্যকর ও পাড়ার মেয়েরা হুলুধ্বনি করিতে করিতে আসিয়াছিল। সেই সময়ে ময়নার কতকটা জ্ঞান ছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটি রক্ত জবার মত হইয়াছিল। এমন সময় জয়ীর মাতা তাহার কন্যা ও জামাতার হাত ধরিয়া লইয়া ময়নার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইতে বলিল। ময়না আপনার খোঁপা হইতে দুইটি জবাফুল লইয়া একটি নতুনের ও আর একটি জয়ীর মস্তকে রক্ষা করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। নববধূ-বরকে আশীর্ব্বাদ করা হইলে সে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল, আর বহুক্ষণ চেতনা হইল না।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

দাড়ির গরম

দাড়ীতে বুক মুখ ঢেকেছে, বাতাস নাহি লাগে,
তা'তে ঘামের কুটকুটুনি! ছিঁড়তেছি তাই রাগে।

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

আসা-যাওয়া

আসে না, জল আসে না—মাটীর অন্তরে দুঃখ লাগে! বয় না, নদী বয় না—উদাস মাঠ শূন্যমন আকাশে চায়!

শুকনো বালুচরে লুপ্ত ধারার শেষ চিহ্ন, বাতাস সেখানে ঘোরে ফেরে—হুতাশী বাতাস!

আকাশ যেন সে পিয়াসী চাতক—ক্ষণে ক্ষণে বলে জল!

সুদূরে সমুদ্র ডাকে—নদী নদী! হারানো ঝরণার পাতরে পাতরে পৌঁছয় সাগরজলের খেদ, পর্ব্বত প্রতিধ্বনি দেয়—নদী নদী!

যেন আচম্‌কা ঝড়ে বর্ষণের খবর আসে!—অরণ্যে লতা-পাতা দুলে দুলে ওঠে, বেণুকুঞ্জে কা'ন্না যেন আপন মনে গুণগুণিয়ে আলো-ছায়ার আল্‌পনা টেনে চলে ক্ষণিকের ভুলে, আবার হঠাৎ থামে একটুখানি নিশ্বাস ফেলে!

এই ভাবে দিন যায়, কাটে রাত—হাওয়ায় নতুন পরশ লাগে, আলো হয়ে আসে কাজলা-পাখীর বুকের পালকের মত কোমল! এল না, এল না, এই সুর তখন আর এক ছন্দে আলোকবীণার এলানো টানে মীড় দিয়ে বলে—এলো না কি?

উদ্‌গ্রীব হরিণ ডাগর চোখে চায়, মরু-পারে সজল মেঘের মরীচিকা দেখে ভোলে সে উন্মনা! না দেখা মেঘের ডাক শোনে—সহসা চমক লাগে ময়ূরের, অকারণে সে পাখনা মেলিয়ে দেয় সূর্য্যকিরণে—ইন্দ্রধনুর রঙ্গীন মায়া ধ'রে দীপ্তি পায় চকিত ময়ূরের হঠাৎ উল্লাস!

দিকে দিকে বাদল ঘনিয়ে আসে, ভিজে মাটীর সৌরভ বয়, বাতাস ভরে জল দোলে, জল দিকে দিকে, বৃষ্টি ঝরে দিনে রাতে, ধারাগৃহে মৃদঙ্গ বাজে, মন্দিরা বাজে, বেণু বাজে, বীণা বাজে, অশ্রুভরা বেদন জানায় কথা আর সুর—বাদল বেলায় ফুটে উঠা নীল দুটি রজনীগন্ধা তারা—যেন মনে পড়াতে আসে অবেলাতে শরতের আগমনী! শেষ বর্ষণে তখন কথা ভেসে যায়, সুর ভেসে যায়, বাদল শেষের উতল পাখী নীল আকাশে উড়ে উড়ে চলে সাদা মেঘের বাসার খোঁজে, ঘুরে ফিরে অনাহত সুরে বাজে কবির বীণায়—"এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে" মৌন রাত্রির বুকে বাজে নতুন পথিকের পদধ্বনি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

———

দাদাভায়ের দেয়ালা

আজ নবমীপুজোয় পাড়ার মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে ভয়ানক ধুম। বোমা, হুদমা, ঢাক, ঢোল, সানাই আর তিন দল ইংরাজী বাজনার বেজায় আওয়াজে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না।

রাত একটা কি দেড়টার পর বেশ একটু তন্দ্রা আসছিল। এমন সময় আমার কানের কাছে কে বল্লে, "কি ভায়া, আমায় চিন্‌তে পার?"

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি, আমাদের চৌতলার ছাতের বুড়ো ভোঁদড় খুব জমকাল মকমলের সাজ-গোজ প'রে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকচে।

অনেক দিন পরে তাকে দেখে বড় খুশী হলুম। একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "ভোঁদড়দাদা, এত রাত্তিরে সাজ-গোজ ক'রে কোথায় চলেছ—মল্লিক বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল বুঝি?"

বুড়ো সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে বল্লে, "ভায়া, তুমি ত বেশ জান যে, তোমার ঠাকুরদাদার আমল থেকে আমরা তোমাদের চৌতলার ছাতের একটা ভাঙ্গা পিল্‌পের ভিতর ঘর-দোর বানিয়ে এত কাল নিরাপদে বাস ক'রে আসছি—কিন্তু আজ সেখানে যা ভীষণ ব্যাপার হয়েছে, তা'তে ছেলেপিলে নিয়ে ওখানে থাকতে আর সাহস হয় না। তাই অসময়ে তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে হ'ল।"

আমি বললুম, "ব্যাপারখানা কি, শীগ্‌গির খুলে বল শুনি?"

বুড়ো বলতে লাগল, "রাত ১২টায় আহারাদি ক'রে আমার তাল-বেতালসিদ্ধ লাঠি ঘাড়ে বাড়ীর আলসের চার দিকে যেমন রোজ ঘুরে-ফিরে পাহারা দিয়ে বেড়াই, তেমনই আজও বেড়াচ্ছিলুম, এমন সময় হঠাৎ দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড কালো বেড়ালের মত জানোয়ার তোমাদের আঁতুড়-ঘর থেকে একটি কচি ছেলে চুরি ক'রে পালাচ্ছে। এই দেখে আমি লাঠি ঘুরিয়ে হার রে রে রে ক'রে হাঁক-ডাক ছেড়ে ছুটে গিয়ে যেমন তার পিঠে সজোরে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়েছি, অমনই সে খোকাকে টপ ক'রে আলসেতে ফেলে দিয়ে টিক্‌টিকির রূপ ধ'রে সড় সড় ক'রে ছাতে উঠে গেল। তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তা'র মায়ের কাছে শুইয়ে রেখে এক লাফ মেরে ছাতে গিয়ে দেখি, আমার ছেলে নিচুয়া একটা বিকটাকার জন্তুর সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার ঘুরিয়ে ভয়ানক রকম লড়াই করছে। আমায় দেখতে পেয়ে নিচুয়া চীৎকার ক'রে বল্লে, 'বাবা, অন্ধকারে তুমি এই জানোয়ারকে চিনতে পার নি? ও আমাদের চিরকালের শত্রু। সেই চুটুপালু বনের দু'মুখো রাক্ষস, এখন বেড়ালের রূপ ধ'রে সহরে উৎপাত করতে এসেছে।' নিচুয়ার কথা শুনে রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি আমার লাঠির কানে কানে বললুম, 'লাঠি ভায়া, দুষ্ট রাক্ষসকে একবার তোমার তাল-বেতালি কারদানিটা বেশ ভাল ক'রে দেখিয়ে দিয়ে চট্ ক'রে আমার হাতে ফিরে এস।' লাঠি অমনই আমার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে প'ড়ে ছাতে দু' চারটে ডিগবাজী খেয়ে তাল ঠুকে রাক্ষসের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল; তার পর নিচুয়াকে এক ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বনবন ক'রে যেমন রাক্ষসের চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলে, অমনই তার মাথা দিয়ে লাল নীল সবুজ রঙের আগুন দপদপিয়ে জ্ব'লে উঠল। এই রকমে রাক্ষসের চার দিকে একটা ভীষণ আগুনের বেড়াজাল সৃষ্টি ক'রে তার পালাবার পথ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে সে রাক্ষসকে নাস্তানাবুদ ক'রে তুললে। আর খানিকটা সময় পেলে রাক্ষসকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে আকাশে উড়িয়ে দিত, কিন্তু ঠিক সেই সময় হ'ল কি—দৈবাৎ লাঠির পায়ে একগাছা ঘুড়ির সুতো জড়িয়ে গেল। বেচারা ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে ছাতের মাঝখানে উলটে প'ড়ে চীৎকার করতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার পায়ের সুতো খুলে দিচ্ছি, এই সুযোগে রাক্ষস নিচুয়াকে বগলদাবা ক'রে এক লাফ মেরে তোমাদের তেঁতুলগাছের উপরে গিয়ে পড়ল—তার পর সেখান থেকে

বিকট রকম চীৎকার ক'রে হাসতে হাসতে আর এক লাফে একেবারে গঙ্গা পার হয়ে কোন্ দিকে চ'লে গেল—এখন আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, তাকে ধরতে পারলুম না।"

ভোঁদড়দাদার কথা শুনে আমি বললুম, "কি সর্ব্বনাশ! এত বড় কলিকাতা সহরের ভিতর রাক্ষসের উপদ্রব? এ রকম কথা আগে ত কখনও শোনা যায় নি। এখনই পুলিসের বড় 'সাহেবকে' টেলিফোনে একটা খবর দিলে হয় না?"

বুড়ো ঘাড় নেড়ে বললে, "না, পুলিসে-ফুলিসে খবর দেবার দরকার নেই। তারা সামান্য একটা চোর ধরতে পারে না, রাক্ষসকে ধরবে কি ক'রে? আমার সেনাপতিকে খবর পাঠিয়েছি, সে এখনই আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছাতে হাজির হবে। আজ রাত্তিরেই রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব স্থির করেছি।"

আমি বললুম, "আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেও—তোমার দলবল সব হাজির হ'লে আমায় একটা খবর দিও।"

ভোঁদড়দা আমার কথায় খুব খুসী হয়ে আমার সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু কি মনে ক'রে আবার চেয়ারে ব'সে বললে, "ভায়া, বড় একটা ভুল হয়ে গেছে, তোমার পরম বন্ধু বুদ্ধিমন্ত খরগোসকে খবর পাঠাতে ভুলে গেছি—এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল দাও দেখি, তাকে একখানা চিঠি লিখে দিই।"

আমি লেখবার বাক্স থেকে কাগজ আর ফাউন্টেন পেন বার ক'রে তার হাতে দিলুম।

বুড়ো ফস ফস ক'রে একখানা চিঠি লিখে তার তাল-বেতাল-সিদ্ধ লাঠির হাতে দিয়ে বললে, "চিঠিখানা শীগগির বুদ্ধিমন্তের বাড়ী নিয়ে যাও, তা'র সঙ্গে দেখা ক'রে বলবে, পত্রপাঠ তা'র দলবল নিয়ে এখনই যেন ছাতে হাজির হয়। আর ফেরবার পথে বেড়ালদের পাড়ায় একটা খবর দিয়ে এস।"

লাঠি চিঠি নিয়ে তেতলার জানলা দিয়ে লাফ মেরে এক তলায় প'ড়ে লাফাতে লাফাতে ফটক পার হয়ে কোন্ দিকে চ'লে গেল।

আমি লাঠির কাণ্ডকারখানা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "ভোঁদড়দা, এ রকম অদ্ভুত রকমের লাঠি কোথা থেকে সংগ্রহ করলে?"

বুড়ো চৌকী ছেড়ে উঠে বললে, "ভায়া, লাঠির বিবরণ এখন আরম্ভ করলে রাত কাবার হয়ে যাবে। লড়াই থেকে ফিরে এসে তোমায় লাঠির ইতিহাস এক দিন ধীরে-সুস্থে শুনিয়ে দেব।"

এই ব'লে বুড়ো চৌতলার ছাতে চ'লে গেল।

—*—

সে রাত্রিতে আমার আর ঘুম হ'ল না, হাতে মুখে একটু জল দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চৌকীতে ব'সে ঢুলতে লাগলুম।

এমন সময় পাড়ার মল্লিক বাবুদের বাড়ীর পাঁচতলার উপরের সেই পাগলা ঘড়ীটা তার একটা চোখ লাল ক'রে কটমট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছুড়ে ঢং ঢং ঢঙ্গা ঢং ক'রে বিশ পঁচিশটা বাজিয়ে দিয়ে ভাল মানুষটির মত ঘুমিয়ে পড়ল।

এ দিকে আমার সামনের বড় আয়নার ভিতর থেকে মোটা-সোটা হ্যাটকোট-পরা একটা কুকুর একটা লাল কাঠের ঘোড়ায় চ'ড়ে টগবগ বেরিয়ে আমার সামনে এসে রাশ টেনে তার ঘোড়া থামালে; তা'র পর মিলিটরী কায়-দায় মস্ত এক সেলাম ক'রে বললে, "আমার নাম বকমল, আমি ভোঁদড় মহারাজের প্রধান সেনাপতি—মহারাজার সৈন্যসামন্ত হাজির হয়েছে। তিনি আপনাকে খবর দিতে বললেন।"

এই ব'লে বকমল সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে আবার আয়নার ভিতর দিয়ে কোথায় চ'লে গেল।

আমি অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে চৌতলার ছাতে গিয়ে দেখলুম, হাজার হাজার ভোঁদড়, বড় বড় কেঁদো বেড়াল, নানা রকমের খরগোস আর কাঠ-বেড়ালীতে আমাদের ছাত একেবারে ভ'রে গেছে। সকলেরই সিপাইদের মত সাজ, লাল রঙের ইজের-কোর্ত্তা পরা, মাথায় নানা রকম রঙের পাগড়ী, কেউ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে, কারও হাতে তীর-ধনুক, আবার কেউ বা লাঠি-সোটা নিয়ে কাতারে কাতারে চুপ ক'রে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি বকমল সাহেব তা'র ঘোড়ায় চ'ড়ে ছাতময় ছুটোছুটি ক'রে তার সৈনিকদের তদারক করছিল।

ভোঁদড়দাদা আমায় দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললে, "ঐ দেখ, তোমার ছেলেবেলাকার টাট্টু ঘোড়াকে আনিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছি। তুমি ত হাঁটতে পারবে না, ওর পিঠে চ'ড়ে গেলে তোমার কোনও কষ্ট হবে না।"

এত কাল জানতুম, আমার সেই ছেলেবেলাকার টাট্টু ঘোড়া কোন্ কালে ম'রে ভূত হয়ে গেছে, কিন্তু আজ তা'কে হঠাৎ ছাতের মাঝখানে দেখতে পেয়ে খুশী হয়ে কাছে গিয়ে তা'র পিঠে হাত বুলতে লাগলুম। এক মাথা পাকা চুল নিয়ে আজ বুড়ো বয়সে ওর পিঠে চড়তে কেমন লজ্জাবোধ হ'তে লাগল। মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সেকালের কথা ভাবতে লাগলুম।

ভোঁদড়দা আমার মনের ভাব বুঝে আমার কাছে এসে বললে, "কি ভায়া, বুড়ো বয়সে খোলা ঘোড়ায় চড়তে লজ্জা হচ্ছে? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

এই ব'লে বুড়ো তা'র মকমলের কোটের পকেট থেকে একটা চমৎকার সোনার ডিবে বার করলে, তা'র পর তা'র ভিতর থেকে ডুমুরের মত কি একটা ফল নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও একটা বিজলে-বউল, বেশ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেল, তা'র পরে দেখা যাবে কি হয়।"

বিজলেবউল যেমন মুখে দেওয়া, আর অমনই দেখতে দেখতে আমি পাঁচ বছরের ছেলে হয়ে পড়লুম।

ভোঁদড়দাদা পকেট থেকে একটা ছোট আয়না বার ক'রে আমার সামনে ধরলে; তাতে দেখলুম, আমার সমস্ত পাকা চুল কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। মাথার টাকটা যে কোথায় পালিয়েছে, তার ঠিক নেই। আমার কামিজটা মেমেদের ঘাগরার মত অনেকটা আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে, আর তা'র আস্তীন দুটো পাখীর ডানার মত আমার কাঁধের দুদিকে হাওয়ায় উড়ছে। পায়ের তালতলার চটি জোড়া এত বড় হয়ে গেছে যে, তাতে ক'রে অনায়াসে গঙ্গা পার হ'তে পারি। আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে হতবুদ্ধি হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ভোঁদড়দাদা আমার হাত ধ'রে বল্লে, "আর আকাশের দিকে চেয়ে ভাবলে কি হবে? এখন চল, আমার বাড়ীতে তোমার কাপড় বদলে আনি গে—আমার কাপড় এখন তোমার গায়ে ঠিক হবে।"

ভোঁদড়দা'র সঙ্গে ভাঙ্গা পিলপের ভিতর দিয়ে অনেক-খানি নেমে গিয়ে তার বাড়ী দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম। এ রকম বাড়ী আগে কখনও দেখিনি। ঘোর নীল রঙের চক্চকে চীনেমাটীর সাতমহলা বাড়ী—চারিদিকে মস্ত বাগান, তাতে নানা রকম রঙিন কাগজের গাছে কত রক-মের শোলার ফুল যে ফুটেছে, তা'র ঠিকানা নেই। খিড়কীর পুকুরে এক পাল চীনেমাটীর রাজহাঁস সাঁতার কেটে খেলে বেড়াচ্ছিল। আর রাজবাড়ীর ফটকে খাড়া পাহারা দিচ্ছিল—টিনের বন্দুক ঘাড়ে রং-করা কাঠের সেপাইরা।

আমাদের দেখে এক জন সেপাই ছুটে বাড়ীর সদর-দরজা খুলে দিয়ে সেলাম ক'রে স'রে দাঁড়াল।

ভোঁদড়দাদা আমায় একটা আয়না-মোড়া ঘরে নিয়ে গিয়ে আলমারী থেকে ভাল ভাল পোষাক বা'র ক'রে আমার সাজিয়ে দিলে। কোমরে একটা চক্চকে তলোয়ার গুঁজে দিয়ে বল্লে, "এইবার চল্, গিন্নীর কাছে বিদায় নিয়ে আসি গে।"

একটা খুব সাজান ঘরে গিয়ে দেখলুম, ভোঁদড়-গিন্নী সোনার পালঙ্কে উবুড় হয়ে প'ড়ে কাঁদছেন, আর তাঁ'র দুই মেয়ে উমনো আর ঝুমনো তাঁ'র মাথার শিয়রে ব'সে পাখা করছে।

আমি গিন্নীর কাছে গিয়ে বল্লুম, "বৌ-ঠাক্রুণ, তোমার কোনও ভয় নেই, চেয়ে দেখ, আমরা সেজে-গুজে রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি—নিশ্চয় রাক্ষস ধরা পড়বে, এখন তুমি হাসিমুখে আমাদের বিদায় দিলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা কর্তে পারি।"

গিন্নী আমার কথায় মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে ব'সে বল্লেন, "একটু মিষ্টি মুখ ক'রে যেতে হবে—কত কাল পরে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছ, একটু কিছু মুখে না দিয়ে গেলে লোক কি বলবে? মহারাজ, তুমিও একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও।"

ভোঁদড়দা' গিন্নীর কাছে ব'সে বল্লে, "এখন ত খাওয়া-দাওয়া করবার সময় নয়, তা' ছাড়া তুমি বোধ হয়, জান না যে, আমি রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করেছি, রাক্ষসকে বধ না ক'রে জলস্পর্শ করব না।"

গিন্নী তখন তাঁ'র সোনার বাটা থেকে কতকগুলো তবক্‌মোড়া পান বা'র ক'রে আমাদের হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "তবে এখন এস, কিন্তু নিচুয়া ফিরে এলে এক দিন ধুমধাম ক'রে এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে; মনে থাকে যেন।"

আমরা পান চিবুতে চিবুতে রাজবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে প্রকাণ্ড এক অজাগর সাপের খোলকে প্রণাম ক'রে হু'খানা আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়ালুম—রাজ-পুরোহিত ইন্দুর মহাশয় সবুজ চেলীর জোড় প'রে সোনার থালায় ধান-দুর্ব্বা নিয়ে খুব ঘটা ক'রে আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে হাত যোড় ক'রে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগলেন—চাপকান-চোগাপরা দেওয়ানজী নেংটি বাহাদুর ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমাদের হু'জনের হাতে গোটা দুই ক'রে আক্‌বরি বাদাম গুঁজে দিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লে দিলেন, "পুরোহিত মহাশয়ের প্রণামী।" আমরা সেই পচা বাদাম দিয়ে পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই কোথা থেকে বেজি আচার্য্যি ছুটে এসে এক জোড়া মরা ব্যাং আমাদের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "মরা ব্যাঙ যাত্রাকালে বড়ই শুভলক্ষণ, অতএব মহারাজরা একটু বার এই দিকে দৃষ্টিপাত করুন, পথে কোনও অমঙ্গল হবে না।"

আচার্য্যি পেলেন রামচন্দ্রের আমলের এক টুক্‌রা পনীর।

—•—

ছাতে এসে এইবার ঘোড়ায় উঠ্‌লুম। ভোঁদড়দাদা কিংখাবের সাজ-পরান এক সাদা রামছাগলে চ'ড়ে রাজছত্র মাথায় দিয়ে, ঝম ঝম ক'রে আমার পাশে এসে ভোঁ ভোঁ ক'রে ভেঁপু বাজিয়ে দিলে।

সেনাপতি সাহেব তা'র ঘোড়া ছুটিয়ে ছাতের মাঝখানে গিয়ে একটা মস্ত পাঁচ-রঙা নিশেন নেড়ে চীৎকার ক'রে হুকুম দিলে, "মার্চ্চ।" অমনই চারদিক থেকে কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে লাগল, মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি করলে, আগে আগে কাঠবেড়ালীর দল ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চল্‌ল, তা'র পর খরগোসের দল তীর-ধনুক নিয়ে চলেছে, তা'র পিছনে লাঠি-সোঁটা নিয়ে এক দল কুণোবেড়াল মার্চ্চ ক'রে চ'লে গেল। সব শেষে আমরা। ভোঁদড় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাজনার তালে তালে "আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে—ঢাল মৃদং ঝাঁজর বাজে" এই জাতীয় সঙ্গীতটি গাইতে গাইতে কত রাস্তা, ঘাট, মাঠ পার হয়ে একেবারে কমলাপুলির ইষ্টিশনে এসে পড়লুম।

ষ্টেশন-মাষ্টার টিয়ে সাহেব, গার্ড টুনটুনি সাহেব আর টিকিট বাবুইরা সকলেই টেবলের উপর পা তুলে দিয়ে আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমরা কাউকে কিছু না ব'লে কুইক মার্চ্চ ক'রে প্ল্যাটফরমে আসবামাত্র ট্রেণ ছেড়ে দিলে।

বুদ্ধিমন্ত গম্ভীরমুখে ভোঁদড়দা'র কাছে এসে বললে, "মহারাজ, আজ আমাদের ট্রেণ মিস হয়েছে।"

এই নিদারুণ সংবাদে আমরা সকলে মাথায় হাত দিয়ে প্ল্যাটফরমে ব'সে পড়লুম।

কুণোবেড়ালের দল "বাবা গো, মা গো, কি হ'লো গো" ক'রে কান্না জুড়ে দিলে—সেনাপতি সাহেব ব্যতিব্যস্ত হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

এক দল চীনে সাহেব প্ল্যাটফরমের নীচে ঠুকঠাক ক'রে কি মেরামত করছিল। বুদ্ধিমন্ত তাদের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কি বকাবকি করলে, তা'র একটা কথাও আমরা বুঝতে পারলুম না, তা'র পর দেওয়ানজীকে ডাকিয়ে তাদের সকলের হাতে এক মুটো ক'রে মোহর গুঁজে দিতে—তখন চীনে সাহেবরা ছুটে গিয়ে কারখানা-ঘর থেকে কতকগুলো লোহার চাকা গড়িয়ে এনে প্ল্যাট-ফরমের হু'দিকে দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে বড় বড় পেরেক ঠুকে, স্ক্রু ক'সে দিয়ে বললে, "সব ঠিক হো গিয়া, যাও, আব ঘণ্টি মারো।"

বুদ্ধিমন্ত ছুটে গিয়ে ষ্টেশনের লোহার ঘণ্টা ঢং ঢং ক'রে বাজিয়ে একটা সবুজ রঙের নিশেন নাড়তে লাগল।

কমলাপুলির প্ল্যাটফরম এতক্ষণ মড়ার মত লম্বা হয়ে প'ড়ে ছিল, ঘণ্টার আওয়াজ পেয়ে ধড়ফড় ক'রে জেগে উঠে গড়গড় ক'রে ইষ্টিশান থেকে বেরিয়ে প'ড়ে ভয়ানক রকম তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে যুগ-যুগান্তর ছুটে চল্‌ল। আমরা যে যার বিছানাপত্র পেতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলুম। দু' দিকে কত ফুলের বাগান, কত ধানের আর পাটের ক্ষেত, পাহাড়-পর্ব্বত—কত কি দেখতে দেখতে চলেছি।

সূয্যিমামা ঠিক সেই সময় দিনের খাটুনির পর এক ধাপ

"কাঞ্চন বরণী, কে বটে সে ধনী,
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে,
নীল শাড়ী শোভে গায়॥"

এক ধাপ ক'রে মেঘের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ী যাচ্ছিলেন। আমাদের প্ল্যাটফরমের ভীষণ গর্জ্জন তাঁ'র কানে গেল, নীচের দিকে চেয়ে মনে করলেন, বুঝি একটা অজাগর সাপ তাঁ'কে গিলতে আসছে। ভয়ে তাঁ'র মুখ শুকিয়ে গেল—তাড়াতাড়ি একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে একখানা কালো মেঘের কম্বল মুড়ি দিয়ে ফুস ক'রে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। অমনই চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আমরা প্ল্যাটফরমে চ'ড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে একটা নিবিড় শালবনের ভিতর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছি। প্ল্যাটফরমের যাওয়ার শেষ নেই—কোথায় যে যাচ্ছি, তা'রও কোনও ঠিকঠিকানা নেই।

এমন সময় হলো কি, দৈবাৎ একটা প্রকাণ্ড বেগুন-গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কমলাপুলির প্ল্যাটফরম চুরমার হয়ে গেল! আমাদের সৈন্য-সামন্ত কে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, আজ অবধি তাদের খোঁজ কেউ দিতে পারলে না।

ভোঁদড়দাদা, আমি আর বুদ্ধিমন্ত, আদিম যুগের প্রকাণ্ড এক মহাবটগাছের তলায় ছিটকে পড়েছিলুম। তাড়াতাড়ি গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দেখলুম, বটতলার আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ো মস্ত একটা উইমাটীর ঢিপির উপর ব'সে কষ্টি-পাতরের খলে ওষুধ মাড়ছে—তা'র চারিদিকে সাজান রয়েছে ছোট বড় নানারকম রঙের ফুকো শিশি, কত রকমের ফলফুল আর এক রাশ শুকনো পাতা। বট-গাছের ঝোরা থেকে ঝুলছিল মেলা সোনা-রূপার নিক্তি।

আমরা বদ্দিবুড়োকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, "মশাই, দু'মুখো রাক্ষস কোন্ বনে থাকে, ব'লে দিতে পারেন?"

বদ্দিবুড়ো বললে, "রাক্ষস এই বনেই ত থাকে, কিন্তু আজ ক'দিন তা'র হাঁকডাক বড় একটা শুনতে পাইনি। তোমরা আমার নাৎনী জোটেবুড়ীর কাছে গেলে রাক্ষসের সব খবর জানতে পারবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, "জোটেবুড়ীমা'র বাড়ী কোথায়?"

বুড়ো বললে, "সে যে কখন্ কোথায় থাকে, তার কিছুই ঠিক নেই। তোমরা পুবমুখো সোজা চ'লে যাও—এখান থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের ধারে মস্ত একটা নীল পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের চূড়োর উপরে একটা পান্নার গাছে মাণিকের ফুল ফুটে আছে দেখতে পাবে। ঠিক সেই গাছতলায় জোটেবুড়ীর বাড়ীর সোনার দরজা আছে।"

বদ্দিবুড়ো এই ব'লে তা'র ঝোলার ভিতর থেকে মস্ত একটা সোনার চাবি বা'র ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও সেই দরজার চাবি, ভাল ক'রে রেখে দাও—সে দিন বুড়ী কি জানি কার জন্তে আমার কাছে ওষুধ নিতে এসে চাবিটা এখানে ফেলে গেছে। আর এই নাও এক মোড়ক সর্ব্বশঙ্কাহরণ বটিকা, পাঁচটা পাকা হরীতকী, দু'টো ডুমুরের ফুল, আর আধ সের স্বাতী নক্ষত্রের জল দিয়ে এই খলে বেশ ক'রে মেড়ে সকলে মিলে খেয়ে ফেল—এই বনে অনেক রাক্ষস বাস করে, তা'রা আর তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না।"

আমরা কোনও রকমে সেই ভয়ানক তিতো ওষুধ খেয়ে পুবমুখো চলতে লাগলুম।

—*—

বনের ঝোপ-ঝাপের আড়াল থেকে বিকটাকার রাক্ষসরা উঁকিঝুঁকি মেরে চীৎকার করতে লাগল, "হাঁউ-মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ," কিন্তু তা'রা আর আমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করলে না।

নিবিড় বন পার হয়ে একটা তেপান্তর মাঠ ভেঙ্গে চলতে চলতে এক পাগ্‌লা রাজার বাগানের সামনে এসে দেখলুম, সিংহীর মামা ভোম্বলদাস গণ্ডা দশ বাঘ মেরে রাস্তার ধারে ব'সে হাড় চিবুচ্ছে—আমাদের দেখতে পেয়ে হালুম হালুম ক'রে বললে, "এক কাহন সোনা না দিলে এ দিক দিয়ে যেতে পারবে না।"

আমরা পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, আমাদের সঙ্গে একটা কাণা-কড়িও নেই—কমলাপুলিতে পকেটকাটারা পকেট কেটে নিয়েছে।

এক পাল রাজহাঁস বুক ফুলিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে সেই দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল, তা'দের কাছে গিয়ে বললুম, "এক কাহন সোনা ধার দিতে পার?"

তারা প্যাঁক প্যাঁক ক'রে বললে, "আমাদের এখন বিরক্ত ক'র না, আমরা পিরীক্ষা দিতে যাচ্ছি।"

দূরে কলাবনে বীর হনুমান চক্ষু মুদে কা'র ধ্যান করছিল। তা'র কাছে এক কাহন সোনা চাইতে সে বললে, "আমি টাকা-কড়ির বড় একটা ধার ধারিনে,

তোমরা হাতী খুড়োর কাছে যাও, তা'র অনেক সোনা-দানা জমা আছে।"

হাতী খুড়ো সবে পুকুরে চান ক'রে একটা বটগাছের তলায় এসে গায়ে পাউডার মাখছিল। তা'র কাছে গিয়ে এক কাহন সোনা চাইবামাত্র সে তা'র পেটের ভিতর শুঁড় পুরে দিয়ে কতকগুলো সোনাদানা বা'র ক'রে আমাদের দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় কোথা থেকে ভোঁ ভোঁ ক'রে মোটরকারের ভেঁপুর আওয়াজ হ'তে লাগল।

আমরা পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, একটা টকটকে লাল রঙের মোটর হেড লাইট জেলে ভয়ানক রকম ধুলো উড়িয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসছে।

হাতী খুড়ো ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে আবার পুকুরে প'ড়ে শুঁড় দিয়ে চার দিকে জল ছিটুতে আরম্ভ করলে। আমরা তাড়াতাড়ি রাস্তার নালার ভিতর লাফিয়ে পড়লুম।

মোটরখানা সোঁ ক'রে আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল; তা'র পর বন্ বন্ ক'রে আম-বাগানের চার দিকে ঘুরে পাগ্‌লা রাজার বাড়ীর ফটকের আধখানা উড়িয়ে দিয়ে এঁকে বেঁকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। মোটরের সোফার গিরগিটী সাহেব তড়াক ক'রে নেমে দরজা খুলে পাশে দাঁড়াল—কমলাপুলির ষ্টেশন-মাষ্টার টিয়ে সাহেব, গার্ড টুনটুনি সাহেব আর দু'জন পাহারাওয়ালা একে একে টপ টপ ক'রে নেমে আমাকে ঘেরাও ক'রে দাঁড়াল।

টিয়ে সাহেব আমার কাছে এসে হঠাৎ আমার ঘাড় ধ'রে হুকুম দিলে, "এই দুষ্ট ছেলেকে থানায় নিয়ে যাও।"

এক জন ভুঁড়িদার ওস্তাদ পাহারাওয়ালা এগিয়ে এসে আমার পেটে রুলের গুঁতো মেরে ফস্ ক'রে আমার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দিলে।

আমি সাহেবকে বললুম, "সাহেব, আমায় শুধু শুধু থানায় নিয়ে যাচ্ছ কেন, আমি ত কিছুই করিনি।"

টিয়ে সাহেব ভয়ানক রেগে লালমোহনের রূপ ধারণ করলে; চীৎকার ক'রে বললে, "ফের মিথ্যে কথা! কাল রাত্তিরে কমলাপুলির প্ল্যাটফরম চুরি কোরে এনে ঐ শালবনে চুরমার ক'রে ভাঙ্গলে কে? তোমার নাম লেখা একখানা রুমাল ইটের গাদা থেকে পাওয়া গেছে।"

বুদ্ধিমন্ত টিয়ের সামনে এসে বলতে লাগল, "এই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী ভোঁদড় মহারাজের কুমার বাহাদুরকে চুটুপালু বনের যুগলানন রাক্ষস হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তদ্দর্শনে সৈন্য-সামন্ত লইয়া রাক্ষসের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিতেছিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে—"

ভোঁদড়দা এক ধমক দিয়ে বুদ্ধিমন্তকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "ক্ষান্ত হও বুদ্ধিমন্ত, সামান্য একটা টিয়েপাখীকে অত সাধু ভাষায় কৈফিয়ৎ দেবার কিছু দরকার দেখছিনে। ওকে ধ'রে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দাও গে, ওর প্ল্যাটফরমের দাম চুকিয়ে দেবে।"

ভোঁদড়দাদার দাঁড়াবার কায়দা, আর তা'র গলার গজমতিহারের বাহার দেখে টিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা সবুজ হয়ে তাড়াতাড়ি আমার হাতের হাতকড়ি খুলে দিয়ে ভোঁদড়দাদাকে সেলাম ক'রে বললে, "মহারাজ বাহাদুর, আমাকে মাপ কর, আমি না বুঝে তোমাদের অপমান করেছি। কিছু দিন আগে আমারও একটি ছেলে হারিয়েছে, পুলিসে খবর দিয়েছিলুম, কিন্তু তা'রা কিছু করতে পারেনি।"

ভোঁদড়দাদা বললে, "সাহেব, চল তুমি আমাদের সঙ্গে জোটেবুড়ীমা'র বাড়ী, সেখানে গেলে তোমার ছেলের সঠিক খবর পাওয়া যাবে।"

টিয়ে সাহেব তা'র গার্ড আর পাহারাওয়ালাদের কমলাপুলিতে ফিরে যেতে হুকুম দিয়ে বললে, "তা হ'লে চলুন, মহারাজ, আমার মোটরেই যাওয়া যাক, এখানে আর দেরি ক'রে কি হবে?"

বুদ্ধিমন্ত টিয়ে সাহেবের কাছে গিয়ে বললে, "সাহেব, তুমি ত বললে চলুন, কিন্তু যাই কি ক'রে? দেখছ না, ও দিকে কে আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে?"

সিংহীর মামাকে দেখে টিয়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চকচকে পিস্তল বার ক'রে দুমদাম আওয়াজ করতে লাগল। কিন্তু মামা সব বন্দুকের গুলী হজম ক'রে চার চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে সাহেবের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে দেখে বুদ্ধিমন্ত ছুটে ছুটে সাহেবের কাছে গিয়ে বললে, "সাহেব, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, দুমুখো রাক্ষস মায়াবলে সিংহীর মামার রূপ ধারন ক'রে আমাদের পথ আটকেছে। বদ্যিবুড়োর ওষুধের গুণে আমাদের গায়ে হাত দিতে

পারবে না, কিন্তু তোমায় এখনই কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। এই নাও সেই ওষুধ, খানিকটা আমার কাছে ছিল, শীগ্‌গির খেয়ে ফেল।"

তা'র পর বুদ্ধিমন্ত করলে কি! রাস্তা থেকে এক মুঠো ধুলো-মাটী কুড়িয়ে নিয়ে মন্তর প'ড়ে যেমন মামার গায়ে ছিটিয়ে দিলে, আর রাক্ষুসে মায়া টুটে গেল, কোথা থেকে একটা ঘূরণী হাওয়া এসে সিংহীরমামা ভোম্বলদাসকে ঘোরাতে ঘোরাতে আকাশের কোন্ দিকে যে নিয়ে গেল, তা'র ঠিক নেই।

—*—

আমরা মোটরে চ'ড়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে যেতে নীল পাহাড়ের চুড়োর উপরে সেই পান্নার গাছতলায় এসে পড়লুম।

মোটর থেকে নেমে সকলে মিলে পান্নার গাছতলায় সোনার দরজা খুঁজতে লাগলুম। কিন্তু সেখানে দরজার কোনও চিহ্নমাত্র দেখতে পেলুম না। খালি দেখলুম, দুটো তালপাতার সেপাই গাছের ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে বন্ বন্ ক'রে তালপাতার রং-করা ঢাল-তলোয়ার ঘোরাচ্ছে। এত জোরে তলোয়ার ঘোরাচ্ছিল যে, আমরা কেউ তাদের কাছে যেতে সাহস করলুম না, মনে কেমন ভয় হ'তে লাগল।

টিয়ে সাহেব মস্ত একটা পাতর কুড়িয়ে নিয়ে তাদের ছুড়ে মারলে, কিন্তু পাতরটা তালপাতার সেপাইয়ের ঢালে ঠিকরে এসে সাহেবেরই কপালে এসে লাগল, বেচারার কপাল ফুলে ঢোল হয়ে উঠল।

টিয়ে সাহেব ভয়ানক রেগে গিয়ে বললে, "আমার কাছে খানিকটা বারুদ আছে, তোমরা সকলে যদি অনুমতি দাও, তা হ'লে বারুদ দিয়ে তালপাতার সেপাইদের এখান থেকে উড়িয়ে দিতে পারি! কত বড় বড় পাহাড় উড়িয়ে দিয়েছি, আর সামান্য দুটো তালপাতার সেপাই উড়িয়ে দিতে পারব না?"

এমন সময় একটা ল্যাজ-ঝুলো শেয়াল ঢোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে আমাদের কাছে এসে বললে, "তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি?"

টিয়ে সাহেব বুক ফুলিয়ে বললে, "ভাবছি, তালপাতার সেপাই দুটোকে বারুদ দিয়ে এখান থেকে উড়িয়ে দেব।"

শেয়াল হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "তোমাদের সাধ্য কি যে, ওদের এখান থেকে নড়াতে পার! ওরা কত কাল ধ'রে ঠিক ঐ যায়গায় দাঁড়িয়ে ঢাল-তলোয়ার ঘোরাচ্ছে, তা'র ঠিক নেই। আমার ঠাকুরমা'র কাছে শুনেছিলুম, অনেক দিন আগে ঐ বনের রাক্ষসরা ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল, কিন্তু কেউ ওদের কাছে ঘেঁসতে পারে নি। তাঁ'র কাছে শুনেছি, ময় নামে এক দানব এই তালপাতার সেপাই দুটোকে তৈরী ক'রে এইখানে দাঁড় করিয়ে গেছেন।"

শেয়ালের কথা শুনে আমরা গালে হাত দিয়ে একটা পাতরের উপর ব'সে ভাবতে লাগলাম, কি করা যায়।

ভোঁদড়দাদা মুখ শুকিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে, "এত কষ্ট ক'রে সৈন্য-সামন্ত সব হারিয়ে এত দূরে এসে শেষে কি শুধু হাতে বাড়ী ফিরতে হবে? তোমাদের যাদের ইচ্ছে হয়, ফিরে যাও, আমি ঐ সমুদ্রের ধারে তুষানলে প্রাণত্যাগ করব স্থির করলুম।" তা'র পর বুদ্ধিমন্তর কাছে গিয়ে তা'র হাত ধ'রে বললে, "বুদ্ধিমন্ত, তোমার প্রভুর এই শেষ কাযটার বন্দোবস্ত ক'রে দিলে সুখে মরতে পারি।"

তা'র পর আমার কাছে এসে ভোঁদড়দা' বললে, "ভায়া, আমি মরবার পর আমার মাথায় যে দুটো সাপের মাথার মণি দেখছ, ও দুটো উমনো আর ঝুমনোকে দিও, আর এই গজ-মতির হারছড়া গিন্নীকে দিয়ে বোলো"—এইটুকু ব'লে ভোঁদড়দাদা আর কথা বলতে পারলে না, মুখে রুমাল দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

আমি বুদ্ধিমন্তর কাছে গিয়ে বললুম, "এস, সকলে মিলে একসঙ্গে তুষানলে প্রাণত্যাগ করা যাক্। বাড়ী ফিরে আবার বড় বড় পণ্ডিত মশাইদের হাতে পড়ার চেয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে প্রাণত্যাগ করা ঢের ভাল মনে করছি।"

বুদ্ধিমন্ত আমার কথা শুনে বললে, "আমি ত ভাই মরেই আছি, আমার বাঁচা-মরা দুই-ই সমান। কোন্ দিন শেয়াল ভায়াদের হাতে প'ড়ে প্রাণটা যাবে, তা'র চেয়ে বন্ধু-দের সঙ্গে একসঙ্গে প্রাণত্যাগ করা খুবই ভাল, আমার মনে হয়। টিয়ে সাহেব, তুমি কি করবে?"

সাহেব বুক ফুলিয়ে বললে, "আমি মরতে ভয় করি নে। কিন্তু পুড়ে মরতে পারব না; কারণ, সেটা আমাদের ধর্ম্ম

নয়, আমার এই পিস্তলের গুলী খেয়ে মরতে আমি রাজি আছি।"

এই কথা ব'লে সাহেব বুদ্ধিমন্তর হাতে পিস্তল দিয়ে একটু দূরে গিয়ে একটা পাতরে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল, তা'র পর পকেট থেকে একটা লাল রঙের রুমাল বার ক'রে নিজের দুই চোখ বেশ ক'রে বেঁধে চীৎকার ক'রে বললে, "আমি প্রস্তুত! তাক ক'রে ঠিক আমার বুকে মারো।"

শেয়াল ভায়া আমাদের সকলের রকম-সকম দেখে হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, "আচ্ছা, তোমরা প্রাণত্যাগ করবার জন্য হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন, বুঝতে পারছি নে। আগে আমি কি বলি শোন, তা'র পর যা ইচ্ছে হয়, তাই ক'রো।"

এই ব'লে শেয়াল আমাদের সামনে একটা পাতরের উপর ব'সে বলতে লাগল, "আমাকে প্রায় রোজ রাত্তিরে এই যায়গাটা দিয়ে আনাগোনা করতে হয়—সে দিন রাত্তিরে আমার বাড়ী ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তখন রাত প্রায় চার প্রহর হবে। এই যায়গাটায় আসবামাত্র সে দিন আমার গা কেমন ছম্-ছম্ ক'রে উঠল। এ রকম ছম্‌ছমে ভাব আগে আমার কখনও হয় নি। মনে করলুম, সকালে নাপিত ভায়া আমায় কামাতে কামাতে আমার নাক কেটে দিয়েছিল, তাই বুঝি এমন গা ছম্‌ছম্ করছে। এমন সময় হঠাৎ দেখলুম, একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে সমস্ত পাহাড় আলো ক'রে এই দিকে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি ঐ ঝোপের ভিতর লুকিয়ে দেখতে লাগলুম, এত রাত্তিরে সে এখানে এসে কি করে। মেয়েটি একটা সাদা বেড়াল কোলে ক'রে তালপাতার সেপাইদের সামনে এসে দাঁড়াল; তা'র পরে বেড়ালের কানে কানে কি ব'লে দিয়ে এই পান্নার গাছতলায় ছেড়ে দিলে। বেড়ালটা দুধের মত সাদা; খালি তা'র কপালে ছিল একটি লাল দাগ। তোমরা যদি আমার কাটা নাক জোড়া দিতে পার, তা হ'লে আমি ব'লে দেব, বেড়াল তালপাতার সেপাইদের এখান থেকে কি ক'রে সরালে।"

ভোঁদড়দাদা রুমাল মুখে দিয়ে সব শুনছিল, তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে এক শিশি বিশল্যকরণীর আরক বার ক'রে বেশ ক'রে শেয়ালের নাকে লাগিয়ে দিলে, আর অমনই তা'র নাক বেমালুম জোড়া লেগে গেল।

শেয়াল দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বললে, "তোমাদের যা'র কপালে রাজটীকা আছে, সে যদি পান্নার গাছে উঠে দুটো মাণিক-ফুল পেড়ে এনে সেপাই দুটোর গায়ে ফেলে দেয়, তা হ'লে ওরা এখান থেকে স'রে যাবে।"

এই ব'লে শেয়াল ঢোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে নাপিত ভায়ার বাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

---*---

বুদ্ধিমন্তর কপালে একটি লাল দাগ দেখতে পেয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার কপালে ওটি কিসের দাগ?"

সে বললে, "অনেক কাল আগে আমি কুসুমবতী নগরীর রাজা ছিলুম। আমার চার মহিষী ছিল। জগদীশ্বর আমাকে নানা জনপদের অধীশ্বর ক'রে অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিতচিন্তার ভার দিয়েছিলেন।"

আমি বুদ্ধিমন্তর কাছে একটু স'রে ব'সে বললুম, "তার পর?"

বুদ্ধিমন্ত বলতে লাগল, "তার পর এক দিন কি কুক্ষণে আমার মাথায় এক খেয়াল উদয় হ'ল, আমার প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে বললুম, 'মন্ত্রী, আমি সাহেনশা বাদশা হারুণ-অল-রসিদের মত ছদ্মবেশে আজ রাত্তিরে আমার নগরীতে কোথায় কি হচ্ছে, দেখতে ইচ্ছা করি। তুমি, সেনাপতি আর নগরপাল ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে থাকবে। আমি রাত্তিরে আহারাদি ক'রে আমার প্রমোদকাননে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব, সেইখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'র, এখন যাও, তা'র সব বন্দোবস্ত কর গে—দেখ এ কথা কেউ যেন জানতে না পারে।"

আমি বুদ্ধিমন্তর কাছে আরও একটু স'রে ব'সে বললুম, "তা'র পর কি হলো?"

ভোঁদড়দাদা বিরক্ত হয়ে বললে, "ভায়া, এখন 'তার পরে'র আর সময় হবে না, আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, প্রায় অন্ধকার হয়ে এল, বাড়ী ফিরে এক দিন তোমায় খর-গোসের কাহিনী শুনিয়ে দেব—এখন শেয়াল যা ব'লে গেল, সেটা সত্যি কি মিথ্যে, এক বার দেখা দরকার।"

টিয়ে সাহেব খুব গম্ভীর হয়ে একটু মুচকে হেসে বললে, "মাণিকের ফুল বাজারে বেচলে অনেক দাম পাওয়া যাবে, কিন্তু তালপাতার সেপাইদের গায়ে ছুঁইয়ে দিলে ওরা এখান থেকে যে নড়বে, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।"

বুদ্ধিমন্ত সাহেবের কথায় ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, "তুমি এই বিংশ শতাব্দীর শুক পক্ষী হয়ে এ রকম কথা কি ক'রে যে বললে, বুঝতে পারলুম না। আমাদের বাপ-পিতামহরা কি কখনও বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষ জটায়ুপক্ষীর মত আকাশে উড়তে পারবে—সামান্য একটা কাচের ভিতর দিয়ে মাছিকে হাতীর মত বড় ক'রে তা'র হাজার হাজার চোখ দেখতে পাবে—আর সেই একই কাচে চন্দ্র-সূর্য্যকে ঘরের কাছে তা'র ভিতরে কি আছে দেখে কেতাবে লিখে রাখবে—আজকাল ঘরে ব'সে সকলেই ত আকাশে কান পেতে দেশ-বিদেশের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েদের গান শুনচে—সে দিন এক মহাপুরুষের বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম, তাঁ'র বাগানের গাছপালারা ভূষো-মাখান কাচে তা'দের জীবন-চরিত লিখছে। অতএব কিসে কি হয়, তা কি কেউ বলতে পারে?"

এই ব'লে বুদ্ধিমন্ত তরতর ক'রে পান্নার গাছে উঠে পড়ল, ছুটো মাণিকের ফুল পেড়ে এনে সেই তালপাতার সেপাইদের গায়ে ফেলে দিলে, অমনই তা'রা এ দিক ও দিকে স'রে গেল, আর সেই সোনার দরজা আমাদের সামনে বেরিয়ে পড়ল।

—*—

বদ্দিবুড়োর সোনার চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখলুম, প্রকাণ্ড একটা লাল পাতরের কূয়ো—আর তার ভিতরে সাদা পাতরের সিঁড়ি ঘুরতে ঘুরতে নেমে গেছে।

আমরা সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম, এক ধাপ নামতেই উপরের সোনার দরজা দড়াম ক'রে আপনি বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়িতে কোন রকম আলো ছিল না, কিন্তু কোথা থেকে যে একটা ঝাপসা আলো আসছিল, বুঝতে পারলুম না। ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর মাটীর নীচে নেমে আবার উপরে উঠতে লাগলুম। এই রকম উঠা-নামা ক'রতে ক'রতে প্রকাণ্ড এক আকাশের মত নীল ঘরে এসে মনে হ'ল যেন আকাশের কোথায় এক যায়গায় এসে পড়েছি। সেই ঘরে জানালা, দরজা বা কোন রকম আসবাবপত্র নেই, খালি ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড পান্নার বেদীর উপরে চমৎকার একটি ছোট মাণিকের সিংহাসন, আর তা'র পাশে একটি পাখীর সোনার দাঁড়।

আমরা বেদীর সিঁড়ির নীচে ধাপে ব'সে আছি, এমন সময় আমার কোলে টপ ক'রে কি একটা পড়ল—সেটা হাতে নিয়ে দেখলুম, একটা সোনার কৌটো, কিন্তু কি ক'রে সেটা যে খুলতে হয়, বুঝতে পারলুম না। সকলেই সেটা খুলতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারলে না। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, সিংহাসনের তলায় একটি সাদা বেড়াল গুঁড়িশুঁড়ি মেরে ঘুমোচ্ছে—ভোঁদড়দাদা তা'র কাছে গিয়ে অনেক ঠ্যালাঠেলি ক'রে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ঘর থেকে কি ক'রে বেরুব, তা'র সন্ধান ব'লে দে।"

বেড়াল হাই তুলে "ফুঁ দাও, ফুঁ দাও" করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।"

আমরা ঘরের চারদিকে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে লাগলুম। ফুঁ দিতে দিতে আমাদের চোয়াল ধ'রে গেল, তবুও ঘর থেকে বেরবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল না।

টিয়ে সাহেব ভয়ানক বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে পিস্তল বার ক'রে বেড়ালের কানের কাছে দুম্-দাম্ ক'রে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগল। তখন বেড়াল ধড়মড়িয়ে উঠে বললে, "তোমরা অসময়ে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গালে কেন? আমি রাক্ষসের ছুটো জিব খেয়ে বেশ আরামে ঘুমোচ্ছিলুম।"

ভোঁদড়দা ভয়ানক চ'টে গিয়ে বললে, "তুই যে একটু আগে বললি, ঘরে ফুঁ দিতে—সেই অবধি ফুঁ দিয়ে দিয়ে আমাদের দম বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে, কিন্তু কৈ, কিছুই ত হ'লো না!"

বেড়াল এক গাল হাসি হেসে বললে, "ঘরের চারদিকে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে তোমাদের কে বললে? ঐ সিঁড়ির ধাপে ব'সে সোনার কৌটোয় একবার ফুঁ দিয়ে দেখ দেখি কি হয়।" এই ব'লে বেড়াল কোন্ দিকে চ'লে গেল।

আমি সিঁড়ির ধাপে ব'সে যেমন কৌটোতে ফুঁ দিয়েছি, অমনই তা'র ডালা আপনি খুলে গেল, আর তা'র ভেতর থেকে একটি ছোট নীল রঙের পাখী ফড়-ফড় উড়ে সেই সোনার দাঁড়ে গিয়ে ব'সে শিশ দিতে লাগলো। তা'র একটু পরে জোটেবুড়ীমা কি জানি কোথা থেকে এসে সিংহাসনে বসলেন। বুড়ীমা'র আজকের সাজ দেখে আমরা অবাক্ হয়ে গেলুম।

তাঁর পরনে একখানি যুঁইফুলের সাড়ী, তা'তে চন্দ্রমল্লিকার

পাড় বসান—গলায় শিউলীফুলের সাতনহর, মাথায় নব-দূর্ব্বাদলের চমৎকার একটি মুকুট, তা'তে ফোঁটা ফোঁটা শিশির প'ড়ে হীরের মত চিক্‌চিক্ করছে, দুই কানে সদাসোহাগিনী ফুলের কানবালা—আর কপালে জলজল জল্‌ছিল সন্ধ্যা-তারার একটি টীপ।

এই সাজে বুড়ীমা সিংহাসনে বসতেই সমস্ত ঘর একটা নূতন রকমের আলোয় ভ'রে গেল।

আমরা তাঁ'কে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে জোড় হাতে তাঁ'র সামনে দাঁড়ালুম।

বুড়ীমা আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌তে লাগলেন, "মহারাজ, তোমার ছেলে নিচুয়া ভাল আছে। সে সাত দিন সাত রাত হুমুখো রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই ক'রে রাক্ষসকে বধ ক'রে তা'র দুটো জিভ কেটে নিয়ে আমার বেড়ালকে খাইয়েছে। তা'র সাহস দেখে খুশী হয়ে তা'কে চুটুপালু বনের রাজা ক'রে দিয়েছি, এখন সে সোনার সিংহাসনে ব'সে রাজ-ছত্র মাথায় দিয়ে সুখে রাজত্ব করছে। টিয়ে সাহেব, তোমার ছেলেও খুব সাহস দেখিয়েছে—সে বরাবর নিচুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল, আমি তাকে নিচুয়া মহারাজের মন্ত্রী ক'রে দিয়েছি। এখন তোমরা আহারাদি ক'রে আজ রাত্তিরে আমার এখানে থাক। কাল সকালে আমার পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে তোমাদের চুটুপালু বনে নিচুয়া মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখে আসব।"

বুড়ীমা এই ব'লে অন্তর্দ্ধান হলেন।

আমরা আহারাদি ক'রে সেই নীল পাখীর গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়লুম।

এমন সময় কে ব'লে উঠল, "হুজুর, চা ঠিক হয়েছে।"

চমকে উঠে চেয়ে দেখি, দোতলার বারান্দায় একটা চেয়ারে ব'সে আছি। আমার সামনের টেবলে সকালে চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে ফকির এক পাশে দাঁড়িয়ে আর পাড়ার বুড়ো পূর্ণবাবু হুঁকো হাতে আমার সাম্‌নে একটা চেয়ারে ব'সে খবরের কাগজ কোলে ক'রে ঢুলছেন।

অমানিশার অশ্রু

অন্ধকারের চোখের জল
ঝরছে অবিরল।
অশ্রুকণার আছে না কি গান?
ড্রিম্-ড্রিম্ ঝিম্-ঝিম্ ও গীত কাহার,—
পরশিছে নীরবে পরাণ?
মুখটি ও যে নত ক'রে
নীরবেতে গাইছে আপন মনে;
ওর সকল ব্যথা নিছি আমি কেড়ে
আমার এ অন্ধকারের প্রাণে
আপন-হারা শাঙন-ধারা,—
সে আমার বুকের মাঝে;
পাষাণ-টোটা নিঝর ছোটা,
সে-ও এখানে রাজে।
পদ্মকলির বুকের মাঝে;
ব্যথার আঁখি-জল?
আমার এই বুকেতে লুকিয়ে আছে
তরল মুক্তাফল।

গৃহিণী-রোগ

আফিস থেকে ফিরতে প্রত্যহই ছ'টা বাজে। আবার যে দিন কায চেপে পড়ে, সে দিন আটটা সাড়ে আটটাও হয়। যাঁ'রা নিম্ন কর্ম্মচারী, তাঁ'রা বলেন, আফিসের বড়বাবু, মাস গেলে চার শ'খানি টাকা পান—খাটবেন না? আমাদের যেমন দান, তেমনই দক্ষিণা; দশটা পাঁচটা কাঁসি বাজাই—চল্লিশ পঞ্চাশ যা' পাই, বহুৎ আচ্ছা!

এই ত গেল আফিসের কথা। বাড়ীর অবস্থা আরও সঙ্গীন। সে কেমন শুন্‌বেন?

এক দিন একটু সকাল সকাল অর্থাৎ অপরাহ্ণ সাড়ে ছ'টার সময় বাড়ী এসে দেখি, উপরে আমার শয়ন-ঘরে আমার গৃহিণী শুয়ে আছেন, মাথার উপরে হু হু ক'রে পাখা চল্‌ছে! বুড়ো ঝি শ্যামার মা গৃহিণীর পায়ের কাছে ব'সে আছে।

আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই শ্যামার মা অতি কর্কশ স্বরে ব'লে উঠল—"যা হ'ক, বাবুর ঘরে আসবার সময় হয়েছে, সে-ও ভাল।"

আমি এমন সুমিষ্ট সম্ভাষণের কোন কারণ না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে? উনি শুয়ে রয়েছেন যে? অসুখ—"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই শ্যামার মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"শুয়ে থাক্‌বে না, কি নেচে বেড়াবে? এই যে এত দিন থেকে বাছার আমার অসুখ, তা'র কি খোঁজ নেওয়া আছে?"

শ্যামার মা অনেক দিনের ঝি। সে আমার স্ত্রীকে "মানুষ" করেছিল। তাহার পর তিনি যখন আমার গৃহিণী হয়ে এলেন, তখন তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে এই ঝি-টিকেও ফাউ পাওয়া গিয়েছিল; শ্যামার মা বল্‌তে গেলে, সেই থেকেই এ বাড়ীর অভিভাবিকা,—তা'র উপরে কথা বলে, এমন সাহস কারু হয় না। আর হবেই বা কা'র? বাড়ীতে আমি, আর আমার স্ত্রী। একটি মেয়ে, তা'কেও বছর দুই হ'ল তালতলার ঘোষেদের বাড়ী বিয়ে দিয়েছি; সে সেখানে বেশ সুখে আছে। সুতরাং শ্যামার মা'র ক্ষমতা অব্যাহতই আছে।

শ্যামার মা যে গুরু চার্জ্জ আমার উপর করল, তা' অস্বীকার ক'রে আরও গোলমাল না বাধিয়ে, আমি নিতান্ত ভালমানুষের মত বল্‌লাম, "এমন অসুখ, তা' আমাকে আফিসে খবর পাঠালেই আমি তখনই ছুটে আস্‌তাম, এত দেরী হ'ত না।"

শ্যামার মা উত্তর দিল, "অসুখ কি আজই হয়েছে? এই মাসখানেক ধ'রেই অসুখ। সেই যে বেলা ১১টার সময় দুটো ভাত মুখে দিয়ে—আহা, বাছার আমার কি সে খাওয়া আছে? ঐ নামমাত্তর পাতের কাছে ব'সেই উঠে এসে সেই যে বিছানায় পড়ে, আর ৫টার আগে উঠতে পারে না। সেই যে ৫টার সময় কষ্ট ক'রে উঠে, তাই কি সাধ ক'রে? শুয়ে থাকৃতে বল্‌লে বলে, 'না, না, বাবুর আসার সময় হ'ল। তাঁ'কে আমি না দেখলে কে দেখবে?' বাবুর ত সে দিকে দিষ্টি কত! বাছার আমার শরীরে কি পদাথ আছে!"

অসুখ যে কি এবং তাহা যে কেমন গুরু, শ্যামার মা'র এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার ত কোন হদিশই পেলাম না। এত দিনের মধ্যে কোন দিন কোন কথা শুন্‌তেও পাইনি, দেখতেও পাইনি। কিন্তু আজ যে প্রকার গুরু ব্যাপার, তা'তে সে কথা ত বলা যায় না। সুতরাং নিতান্ত বিনীতভাবে অপরাধ স্বীকার ক'রে যতখানি সহানুভূতি সংগ্রহ করা যেতে পারে, তাই ক'রে বল্‌লাম—"তাই ত, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। সেই গাধার খাটুনী খেটে সন্ধ্যার পর এসে আর কোন দিকে চাহিবার শক্তি থাকে না। তা'রই জন্য ওঁর অসুখ এমন বেড়ে উঠেছে। আমারই অমনোযোগে এমন হয়েছে। যাক্, সে কথা ব'লে দুঃখ ক'রে এখন আর কি হবে। আমি এখনই যাই, ললিত ডাক্তারকে ডেকে আনি।"

গৃহিণী এতক্ষণ নীরবই ছিলেন, ললিত ডাক্তারের নাম করতে যেন তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠলেন, মুখখানি যথাতিরিক্ত বিকৃত ক'রে বল্লেন, "ললিত ডাক্তার কেন, শ্রীচরণ কম্পাউণ্ডারকে ডেকে আনলেই হবে। আমার যেমন পোড়া কপাল!"

এই নেও! চার শ' টাকা মাইনের আফিসের বড় বাবুর একমাত্র সহধর্ম্মিণীর এমন দারুণ অসুখ, আর আমি কি না ডাকতে চাইলাম পাড়ার ললিত ডাক্তারকে! যা'র মোটর দূরে থাক, গাড়ী-ঘোড়াও নেই, যে এক টাকার বেশী ভিজিট নেয় না, হয় ত পায়ও না, আমি কি না আমার মহামহিমময়ী গৃহিণীর চিকিৎসার জন্য তা'কে ডাকবার প্রস্তাব করলাম। কি ধৃষ্টতা আমার!

আমি তখন আমার নির্ব্বুদ্ধিতার কৈফিয়ৎস্বরূপ বললাম, "আরে, ললিতকে কি আর চিকিৎসার জন্য ডাক্তে চাইছি। তোমার যে রকম ভয়ানক অসুখ, তাতে বাড়ীতে এক জন ডাক্তার সর্ব্বদার জন্য রাখা দরকার। তাই তা'কে পাঠিয়ে দিয়ে আমি এক জন বড় ডাক্তার আনতে চাচ্ছি। তোমার চিকিৎসা ললিতকে দিয়ে করাব—আমি কি পাগল হয়েছি?" মনে মনে কিন্তু যা' বল্লাম, তা' আর লিখে কায নেই।

কি আর করি? সেই সন্ধ্যাবেলাতেই আফিসের কাপড় না ছেড়েই এক জন ভাল ডাক্তারের খোঁজে বা'র হলাম, কিন্তু যাই কা'র কাছে? ডাক্তার নীলরতন সরকার কি বিধান রায়ের কাছে গিয়ে আমার গৃহিণীর এবংবিধ দারুণ অসুখের কথা বল্লে তাঁ'রা তখনই হয় আমাকে পাগল ব'লে তাড়িয়ে দেবেন, আর না হয়, দয়া-পরবশ হয়ে আমাকে পাগ্‌লা গারদে পাঠাবার জন্য পুলিসের জিম্মা করিয়ে দেবেন।

শেষে মনে পড়ল, ডাক্তার বোসের কথা। শুনেছি, তিনি না কি এই রকম রোগীর চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তাঁ'র সঙ্গে ত আমার তেমন আলাপ-পরিচয় নেই। দুই তিন বার বন্ধুদের বাড়ীতে দেখা হয়েছিল মাত্র। তিনিও আমার নাম জানেন, আমিও তাঁ'র নাম জানি। পথে-ঘাটে দেখা হ'লে আজকালকার ভদ্রতাসঙ্গত "নমস্কার মশাই" "ভাল ত" এই রকম মামুলী সম্ভাষণের অধিক কোন কথা কোন দিন হয় নি—ঘনিষ্ঠতা ত দূরের কথা। তবে অনেকের কাছে তাঁ'র প্রশংসা শুনেছি। ডাক্তারও বেশ নামওয়ালা। সুতরাং তাঁ'র কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।

ডাক্তার বোসের বাড়ী আমার জানা ছিল। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌লাম, তিনি বাড়ীতেই আছেন। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করবার পরই ডাক্তারবাবু উপর থেকে নেমে এলেন এবং আমাকে দেখে সহাস্য মুখে বল্লেন, "এই যে বিজয় বাবু! আসুন, আমার বসবার ঘরে।"

তাঁ'র রোগী দেখবার ঘরের মধ্যে গিয়ে আমাকে বসিয়ে বল্লেন, "তা'র পর এ অসময়ে একেবারে আফিসের ড্রেসে এসে উপস্থিত, ব্যাপার কি?"

আমি বল্লাম, "ব্যাপার কিছু সঙ্গীন না হ'লে কি এ সময় আপনাকে বিরক্ত করতে আসি? আপনার সময় হবে ত? সব কথা বল্‌তে হয় ত দশ মিনিট লাগবে।"

ডাক্তার বল্লেন, "আমি এখন আর কোথাও বেরুব না, যথেষ্ট সময় আছে। কেউ 'ডিস্‌টার্ব্ব' না করে, দুয়ারটা বন্ধ ক'রে দিই।" এই ব'লে তিনি ঘরের প্রবেশ-দ্বার বন্ধ ক'রে বিজলী বাতি ও পাখা খুলে দিলেন। তা'র পর বল্লেন, "এখন বলুন, আপনার ব্যাপারটা কি?"

আমি বল্লাম—"আমার স্ত্রীর না কি ভয়ানক অসুখ!"

ডাক্তার হেসে বল্লেন—" 'না কি' কথাটা ত বুঝতে পারলাম না বিজয় বাবু।"

আমি বল্লাম—"কি যে অসুখ, তা আমি জানিনে। প্রত্যহ সাড়ে ৯টায় আফিসে যাই, সাড়ে ৬টা ৭টায় বাড়ী ফিরি। আমার স্ত্রীকে কোন দিনই অসুস্থ দেখিনে। আজ আঠারো বছর যেমন দেখে আস্‌ছি, তাই-ই দেখি। শরীরেও কোন বৈলক্ষণ্য দেখিনে। বাড়ীতে ছেলে-পিলেও নেই যে, হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। একটিমাত্র মেয়ে, তা'রও দুবছর হ'লো বিয়ে দিয়েছি। সে কখনও এক-আধ বেলার জন্য আসে, আবার চ'লে যায়। বাড়ীতে চাকর, ঝি, বামুন, সইস-কোচোয়ান সবই আছে। গিন্নীকে শ্রমসাধ্য কোন কাযই করবার দরকার হয় না। এই ত অবস্থা। আজ এই একটু আগে বাড়ী এসে দেখি, তিনি শুয়ে আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করতেই তাঁ'র বাপের বাড়ী থেকে আমদানী বুড়ো ঝি শ্যামার মা একেবারে রেগে অস্থির। তাঁ'র বাছার না কি 'গুরুতর' অসুখ; আর আমি না কি কোন দিন সে দিকে 'দিষ্টি' দিইনে। আমি ত

মশাই, মহা সঙ্কটে পড়লাম। শেষে, অনেক বক্তৃতা ও অনেক ভর্ৎসনার পর শ্যামার মা রোগের যে বিবরণ দিলেন, তা' থেকে আমি এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। আপনি শুনেছি মনস্তত্ত্ববিৎ চিকিৎসক, আপনি যদি কিছু বুঝতে পারেন। শ্যামার মা বল্‌ল যে, তাঁ'র বাছা অর্থাৎ আমার স্ত্রী বেলা ১১টার সময় প্রত্যহই পাতের কাছে বসেন মাত্র, তার পর উঠেই যে শয্যাগ্রহণ করেন, বিকেলে ৫টার পূর্ব্বে আর সে শয্যা ত্যাগ করতে পারেন না, এমনই তিনি কাতর। আমি ৬টার পর বাড়ী আসি, তখন আর কিছু দেখতেও পাইনে, জান্‌তেও পাইনে; গৃহিণীও কিছু বলেন না। আজ ৫টার পরেও তিনি শয্যা ত্যাগ করতে পারেন নি। এই পর্য্যন্তই আপনাকে বল্‌তে পারি, ডাক্তার বাবু! কাযেই আমাকে ডাক্তার ডাকৃতে ছুটে আস্‌তে হ'ল।"

ডাক্তার বোস আমার কথা শুনে হেসে বল্‌লেন—"আপনাকে আর বল্‌তে হবে না, আমি আপনার গৃহিণীর ও আপনার অসুখের কথা বুঝতে পেরেছি।"

আমি সবিস্ময়ে বল্‌লাম—"আমার অসুখ! আপনি কি এতক্ষণ সব কথা শোনেন নি? অসুখ আমার স্ত্রীর, আমার নয়। আমি বেশ সুস্থ আছি।"

ডাক্তার বললেন—"সে পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন আমাকে কি করতে বলেন? এখনই কি আপনার রোগীকে দেখতে যেতে হবে?"

আমি বল্‌লাম—"সর্ব্বনাশ! আপনি এখনই যাবেন কি! তা হ'লে কি গৃহিণী আপনাকে আমল দেবেন, না আপনার ব্যবস্থামত ঔষধ ব্যবহার করবেন? তিনি অমনই ব'লে বসবেন, বড় ডাক্তার, না ছাই; ওর মোটেই পসার নেই; বড় ডাক্তারদের কি ডাকৃবামাত্রই পাওয়া যায়? আপনি পণ্ডিত হয়ে কথাটা বুঝতে পারেন নি! আপনি আস্‌ছে কা'ল একটা সময় ব'লে দিন; সেই সময় যাবেন। আমি বাড়ী গিয়ে আপনার এখন সময় হ'ল না, আর আপনার ভয়ানক পসারের কথা সত্য-মিথ্যা বানিয়ে তাঁ'কে ব'লে আপনার উপর তাঁ'র শ্রদ্ধা বাড়িয়ে রাখব। তবে ত এ রোগের চিকিৎসা ঠিক হবে। কি বলেন, ডাক্তার বাবু, আমার কথা সঙ্গত কি না?"

ডাক্তার বাবু বললেন—"সত্যিই আমি অতটা ভেবে দেখিনি, বিজয় বাবু। আপনি দেখছি মনস্তত্ত্ববিষয়ে আমার অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী। যাক্, তা হ'লে আমি কা'ল সাড়ে ৯টায় আপনার বাড়ীতে যাব; ঠিকানাটা লিখে রাখছি।"

আমি বললাম—"আর একটু আগে কি সময় হ'তে পারে না, ডাক্তার বাবু? সাড়ে ৯টায় গেলে, হয় কা'ল আমাকে আফিস কামাই করতে হয়, আর না হয় 'লেট' হয়। তা'তে কাযের ভারি অসুবিধা হবে।"

ডাক্তার বাবু একটু চিন্তা ক'রে তাঁর ডায়েরি বইখানি নেড়ে চেড়ে বল্‌লেন—"বেশ, এক ঘণ্টা আগে, সাড়ে আটটায় যাব। কেমন, তা হ'লে ত আপনার অসুবিধা হবে না?"

আমি বল্‌লাম—"না, কোন অসুবিধা হবে না; ঠিক সাড়ে ৮ টাতেই যাবেন। ১০ মিনিট আগে গিয়ে যেন না ওঠেন, বরঞ্চ ২ মিনিট দেরী হ'লেও কোন ক্ষতি হবে না। আগে গেলে কি হবে বুঝেছেন ত? গৃহিণী অমনই মনে করবেন, এ ডাক্তারের হাতে তেমন রোগী নেই।"

ডাক্তার বললেন—"আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বেশ বিবেচনা ক'রে কায করব; আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

আমি বললাম—"ডাক্তার বোস, কিছু যদি মনে না করেন, তা হ'লে আর একটা কথা বলতে চাই।"

তিনি বললেন—"সে কি কথা; আপনি বলুন না।"

আমি বললাম—"দেখুন, আমি অনেক দিন দেখেছি, আপনি সকালে বা বিকেলে যখন রোগী দেখতে আপনার মোটরে চ'ড়ে যান, তখন আপনার পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, আর কাঁধের উপর খদ্দরের চাদর দেখতে পাই। পায়ে কি দেন, দেখতে পাইনে, হয় ত চটিই হবে। ও যে শ্বশুরবাড়ী নেমন্তন্নে যাবার পোষাক। ও প'রে আমার বাড়ীর রোগিণীকে দেখতে গেলে তিনি আপনাকে আমলই দেবেন না। আপনাকে একেবারে ফিট্‌ফাট 'সাহেব' সেজে যেতে হবে, তিনটা বাঙ্গালা কথার সঙ্গে দশটা ইংরাজী কথা বলতে হবে। তবে ত রোগীর মনে হবে, হাঁ, ডাক্তার বটে। কি যে বিপদে পড়েছি, ডাক্তার বোস, তা আমার এই সব ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কথা থেকেই আপনি বুঝতে পারছেন। আমি ফিরে গিয়ে আপনার

সম্বন্ধে যে সব কথা তাঁকে ব'লে তাঁ'র শ্রদ্ধা বাড়িয়ে রাখব, কা'ল তা'র কিছু গলতি হ'লে কি আর আমার বাঁচোয়া থাকবে! তাই এত কথা বলতে হ'ল; আমার অবস্থা বিবেচনা ক'রে ক্ষমা করবেন।"

ডাক্তার বাবু বললেন—"ও সব কিছু মনে করবেন না; আমাদের অনেক রকম রোগী নিয়ে কারবার করতে হয়, বিশেষ মাথা-পাগলা রোগী নিয়ে আমাকে অনেক সময় থাকতে হয়। তা'দের কথার কাছে, আপনার কথাগুলো তেমন বেশী অসংলগ্ন নয়। বিশেষতঃ, আপনাকে যে রোগী নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে, তাতে আপনাকে যে বিশেষ সতর্ক হ'তে হয়, এ ত জানা কথা। তা হ'লে আপনি আসুন, আমি কা'ল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ৮টায় যাব, আর যা যা করতে হয়, করব। কোন রকম ভুলের জন্য আপনাকে বিব্রত হ'তে হবে না।"

আমি বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি বিনীত ভাবে বললাম—"আর একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। বড়ই বিরক্ত করছি, ডাক্তার বোস, ক্ষমা করবেন।"

ডাক্তার হেসে বললেন—"আবার কি ভুল হ'ল, বলুন।"

আমি বললাম—"রোগী দেখে আপনি যখন উঠবেন, আমি তখন আপনাকে ষোলটি টাকা ফি দেব; আপনি অমনি ব'লে বসবেন, আপনার ফি ষোল নয়, বত্রিশ টাকা। বুঝলেন? এটাও দরকার, ভুলবেন না।"

ডাক্তার উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন—"বিজয় বাবু, আপনি দেখছি, এ সব রোগের আমার অপেক্ষাও পাকা চিকিৎসক। বেশ, বেশ, তাই হবে; আমি বত্রিশ টাকাই চাইব।"

ডাক্তার বোসের নিকট বিদায় নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। এসে দেখি, গৃহিণী শয্যাত্যাগ ক'রে ঘরের মেঝেতে বসেছেন; বামুন-ঠাকুর এক বাটি দুধ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, আর শ্যামার মা দুধটুকু খাবার জন্য গৃহিণীকে জেদ করছেন। আমাকে দেখেই শ্যামার মা বল্‌ল—"ডাক্তার আসছে না কি?"

আমি বল্‌লাম—"জান ত কলকাতা সহরে বলামাত্রই বড় ডাক্তার মেলে না।"

আমার গৃহিণী বল্‌লেন—"সে ত ঠিক কথা; বড় ডাক্তারদের কত রোগী। তিন দিন ঘুরে তবে এক জনকে পাওয়া যায়।"

মিথ্যা কথা বল্‌তে কোন দিনই আমার বাধে না। তা' যদি হ'ত, তা' হ'লে আর ত্রিশ টাকার কেরাণী থেকে চার শ' টাকার বড় বাবু হ'তে পারতাম না। সুতরাং গৃহিণীর অনুকূল মন্তব্য শুনে আমার মিথ্যার ভাণ্ডার একেবারে খুলে গেল। আমি আফিসের কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বল্‌লাম—"বুঝলে, এই কলকাতা সহরে বড় ডাক্তার হঠাৎ পাওয়া যে কি মুস্কিল, তা' আজ আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। এই ধর না, এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে ত ঠিকই করতে পারি নে, কা'র কাছে যাই। শেষে ভাবলাম, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? এই কথা মনে হ'তেই একেবারে ছুটে গেলাম নীলরতন সরকারের বাড়ী। সেখানে গিয়ে শুনি, তিন দিন থেকে তিনি অসুস্থ; নীচেও নামেন না, রোগীও দেখেন না। তখন আর কি করি, দৌড়োলাম বিধান রায়ের বাড়ী। গিয়ে দেখি, তিনি ব্যাগ সাজাচ্ছেন। কি ব্যাপার! না, এখনই তাঁকে কোন্ নরসিংগড়, না প্রতাপগড়ে যেতে হবে; মোটর প্রস্তুত। এক ঘণ্টা পরেই হাবড়ায় ট্রেণ। কি করি, সেই গোলমালের মধ্যেই তাঁকে রোগীর অবস্থা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন—এক কায করুন। যে রোগের কথা বল্‌লেন, তা'র চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার বোস খুব উপযুক্ত; তাঁকেই নিয়ে যান। আমি যদি থাক্‌তাম, তা হ'লেও তাঁ'কে নিয়ে যেতেই আপনাকে পরামর্শ দিতাম।' সেখান থেকে ছুটলাম ডাক্তার বোসের বাড়ী—বিলম্ব ত করা যায় না। তাঁ'র বাড়ী ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলাম। তিনি রোগী দেখ্‌তে বেরুচ্ছেন; মোটরে এক পা দিয়েছেন; সেই সময় গিয়ে আমি উপস্থিত। তিনি আর ঘরে ফিরলেন না; তাঁ'র খুব তাড়াতাড়ি কোথায় যেতে হবে। আমি আমার বিপদের কথা বল্‌তে তিনি বল্‌লেন—'তাই ত বিজয় বাবু, এখন ত যেতেই পারব না। এত রোগী আমার হাতে যে, বাড়ী ফিরতে সেই রাত ১১টা। তখন ত আর যাওয়া যায় না। আচ্ছা দেখছি।' এই ব'লে তাঁ'র নোটবুক খুলে দেখে বল্‌লেন, 'কা'ল বেলা ১টার পূর্ব্বে আর আমার যাওয়ার সুবিধে হ'বে না।' তখন কি করি, অনেক সাধ্য-সাধনা করলাম, যা চাইবেন, তাই দিতে স্বীকার করলাম। তবুও আজ রাত্তিরে তিনি সময় করতে

পারবেন না, বল্‌লেন। অনেক অনুরোধের পর তিনি কা'ল ঠিক সাড়ে ৮টার সময় আসতে স্বীকার ক'রে সেই কথা নোটবুকে লিখে নিলেন। একবার মনে হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করি, ফি কত দিতে হবে। তখনই ভাবলাম, টাকা আগে, না প্রাণ আগে? যা চাইবে, তাই দেব। কি বল?"

এইবার গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটল। তিনি বল্‌লেন, "আহা, বড় কষ্ট ত হয়েছে। ও রাধি, ও ঠাকুর, বাবুর হাত-মুখ ধোয়ার ঠিক ক'রে দেও। যাও ঠাকুর, এত রাত্তিরে আর জলখাবার দিয়ে কায নেই, শীগ্‌গির একেবারে খাবার ঠিক ক'রে দেও।"

যাক্‌, মিষ্ট কথায় পেট না জুড়োক, শরীর ত জুড়িয়ে গেল। আমি তখন সাহস পেয়ে বল্‌লাম—"হাঁ, ডাক্তার বটে বোস। দেখ দেখি কি পসার, রাত ১১টা পর্য্যন্ত রোগী দেখতে হয়। কা'ল ৯টার আগে আসতে পারবে না ব'লে বসল। শেষে অনেক ক'রে ব'লে তবে সাড়ে ৮টা করলাম। এ ত আর আমাদের ললিত ডাক্তার নয়, এ একেবারে সাহেব; বাঙ্গালা কথা বড় একটা বলেই না। আর কি প্রকাণ্ড মোটর!"

গৃহিণী বল্‌লেন—"তা আর হবে না! অত বড় ডাক্তার যে পাওয়া গিয়েছে, এই আমার সৌভাগ্য।"

যাক্‌, এতগুলো মিথ্যা কথা একেবারে বৃথায় যায় নি, কায হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

পরদিন ৮টা বাজতেই গৃহিণী মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন —"ওগো, তুমি নীচের বৈঠকখানায় গিয়ে থাক। কি জানি, বলা ত যায় না। ডাক্তার সাহেব যদি সাড়ে ৮টার আগেই এসে পড়েন।"

আমি বল্‌লাম—"তুমি বল কি? এ কি যে-সে ডাক্তার যে, আধঘণ্টা আগে এসে ব'সে ব'সে গল্প করবে? ডাক্তার ঠিক সাড়ে ৮টায় আসবে, দু' মিনিট আগে আস্‌বারও তা'র সময় হবে না।"

গৃহিণী উল্লসিত হয়ে বল্‌লেন—"তা কি আর আমি জানি নে, তবুও তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষাই কর না।"

আমি ত সবই ঠিক ক'রে এসেছি; তবুও গৃহিণীর আদেশে নীচে যেতে হ'ল।

পূর্ব্বের ব্যবস্থামত ডাক্তার সাড়ে ৮টার সময় এলেন— একেবারে আঠারো আনা "সাহেব।" এসেই তাড়াতাড়ি রোগী দেখতে চল্‌লেন। মুখে একটাও বাঙ্গালা কথা নেই —খাঁটি বিলাতী বুলি। গৃহিণী প্রস্তুতই ছিলেন। ডাক্তার তখন বুক-পিঠ পরীক্ষা করলেন; কতক কথা বাঙ্গালাতেই রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতক বা আমাকে ইংরাজীতে বল্‌লেন। আমি আবার সেই সব কথা তর্জ্জমা ক'রে উত্তর শুনিয়ে দিলাম। ডাক্তারের সে সব জেরার কথা আনুপূর্ব্বিক ব'লে আর কায নেই। অবশেষে তিনি বল্‌লেন, "রোগ কঠিনই বটে। তবে আমি ঠিক এই রকম একটা রোগীকে মাসখানেক আগে ৩ দিনে আরাম করেছি—ছয় ডোজ ওষুধ দিয়ে। এঁকেও বোধ হয়, ৩ দিনেই সারাতে পারব। সেই রোগীর জন্য ব্যবস্থা লিখে দিলাম; তারা কোন দোকানে সে ওষুধ পেলে না। শেষে কি করি, আমাকেই বেরুতে হ'ল। একটা 'সাহেবের' দোকানে এক শিশিমাত্র ওষুধ ছিল। দশ টাকা দিয়ে তাই নিয়ে এলাম। ছয় ডোজে ছয় ড্রপমাত্র খরচ হ'ল; বাকীটা আমার কাছেই আছে। আপনাকে বেলা সাড়ে ১০টায় একবার আমার বাড়ী যেতে হচ্ছে। আমি এখন বাড়ী ফিরতে পারছি নে। আপনার ওষুধ দেওয়ার জন্যই সাড়ে ১০টায় আমি পাঁচ মিনিটের তরে বাড়ী ফিরব। ছয় দাগ ওষুধ দেব। রোজ সকালে-বিকালে এক দাগ খাওয়াতে হবে। আজ এ-বেলা ওষুধ এনেই এক দাগ খাইয়ে দেবেন। তা'র পর পথ্যের কথা। এ রোগে পথ্যই হচ্ছে প্রধান। তা'র একটু গোল হ'লেই সব মাটী হবে, রোগীকে বাঁচান দায় হবে। সুতরাং পথ্য দেওয়ার ভার আপনাকে নিতে হবে; চাকর-দাসী বা আর কারও উপর সে ভার দিলে আমি চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারব না। এ ৩ দিন আপনাকে আফিস কামাই করতে হবে শুধু রোগীর পথ্যের ব্যবস্থার জন্য। পথ্য হচ্ছে, বেলা ১২টার সময় ছয় আউন্স ডাবের জল; বেলা ৩টার সময় চার আউন্স ঘোল, আর রাত সাড়ে ৭টার সময় ছয় আউন্স ছানার জল। মেজার গ্লাসে মেপে খাওয়াতে হবে, একটু কম-বেশী হলেই বিপদ; কাযেই এ ভার আপনাকে নিতে হবে, আর কারও উপর নির্ভর করবেন না। এই ঔষধ আর এই পথ্য আজ, কাল দু' দিন চল্‌বে। পরশু আমি এসে পুনরায় পরীক্ষা ক'রে যদি অন্য কোন ব্যবস্থার দরকার হয়,

তা' করব। আপনি পরশু সকালে খবর দিতে পারেন ভাল, না হয় আমিই আসব। আমি আর বসতে পারছি নে, অনেক যায়গায় যেতে হবে।" এই ব'লে ডাক্তার যেই উঠবেন, আমি অমনই তাঁকে ১৬টি টাকা দিলাম। তিনি টাকার দিকে চেয়েই বল্লেন—"আমার এ সব 'কেসে' ফি ৩২ টাকা।"

আমি তখনই আর ১৬ টাকা দিয়ে বল্লাম—"আপনি ৩২ কেন, তার ডবল চাইলেও দিতাম।"

ডাক্তার বল্লেন—"কোন ভয় নেই, ৩ দিনেই রোগ সেরে যাবে।" এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।

কি করি—আফিস কামাই করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ১০টার সময় পাশের বাড়ী থেকে আফিসে বড় 'সাহেবের' কাছে টেলিফোন ক'রে আমার বিপদের কথা জানালাম এবং আমার সহকারী বিধু বাবুকে একবার আমার বাড়ীতে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলাম। 'সাহেব' সব কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং ৩ দিনের ছুটী মঞ্জুর করলেন।

সাড়ে ১০টার সময় গিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ছয় দাগ ঔষধ নিয়ে এলাম। দাম দিতে চাইলাম, তিনি নিলেন না। যেমন যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই ভাবে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া গেল। কোন রকমে দিনমান কেটে গেল, কিন্তু রাত আর কাটে না। ছয় আউন্স ডাবের জল, চার আউন্স ঘোল, আর ছয় আউন্স ছানার জল খেয়ে কি মানুষ দিন-রাত কাটাতে পারে? গৃহিণী সন্ধ্যার পর থেকেই ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন; কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তারের নিষেধ!

কোন রকমে রাত কেটে গেল। ভোরে উঠেই আমাকে পাঠালেন ডাক্তারের কাছে। ব'লে দিলেন যে, কা'ল দু' দাগ ওষুদ খেয়েই তাঁ'র অসুখ সেরে গেছে, ভয়ানক ক্ষুধা হয়েছে; পথ্যের অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে।

ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে সব কথা বল্‌তে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন,—"ওষুদে যে ফল হয়েছে, তা' বেশ বুঝা যাচ্ছে। যিনি আহারের সময় পাতের কাছে ব'সেই অমনই উঠে পড়তেন, তাঁ'র যে যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, এ খুব শুভ লক্ষণ। কিন্তু তাই ব'লে আজই ঔষধ বা পথ্যের কোন পরিবর্ত্তন করতে পারছি নে। আজ ঐ ব্যবস্থাই চলবে; কা'ল গিয়ে, পরীক্ষা ক'রে দেখে, যা' ভাল হয়, করা যাবে।"

আমি বললাম—"আপনি ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, এ দিকে বাড়ীতে যে আমার তিষ্ঠান ভার হবে, তা'র উপায় কি?"

ডাক্তার হেসে বল্লেন—"এ পাপের শাস্তি আপনাকে ভুগতেই হবে।" কি করব, বাড়ী ফিরে এসে গৃহিণীকে সমস্ত কথা বললাম। তিনি ত রেগেই অস্থির! সুধু ডাবের জল আর ছানার জল খেয়ে কি মানুষ থাকতে পারে?

উপায় কি? চিকিৎসক যা' বলেছেন, তা' প্রতিপালন করতেই হ'বে! সে দিন যে কি কষ্টে গেল, তা' আর কহতব্য নয়।

পরদিন ঠিক সাড়ে ৮টার সময় ডাক্তার এলেন; পূর্ব্বের মত পরীক্ষা করলেন; তাহার পর আমাকে বল্লেন, —"বৈঠকখানায় চলুন; বিশেষ বিবেচনা ক'রে ব্যবস্থা করতে হবে।"

বৈঠকখানায় এসে ডাক্তার বাবু বললেন—"বিজয় বাবু, আপনার গৃহিণীর আর অসুখ হবে না। এই দু' দিনেই তাঁ'র যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তাঁ'কে আর ওষুধ খেতে হবে না, অর্থাৎ অকারণ জল খেতে হবে না; তিনিও আর পাতের কাছে বসেই উঠবেন না। কিন্তু, একটা গোল রইল। আপনার রোগ যে সারল না? আপনার গৃহিণী যদি মাসের মধ্যে দু' বার ক'রে এই ভাবে অসুস্থ হতেন, আর আপনাকে আফিস কামাই করতে হ'ত, খরচের কথা না হয় না-ই ধরলাম, তা হ'লে এই ভাবে মাস ছয়ের মধ্যে আফিস কামাই করলে মনিবরা বিরক্ত হয়ে আপনাকে চাকরী থেকে তাড়িয়ে দিতেন, তা হ'লে হয় ত আপনার রোগ সারত। কিন্তু, এই দুই দিনে আপনার গৃহিণী যে শিক্ষা পেয়েছেন,তা'তে তাঁ'র আর কোন দিন এ রকম অসুখ হবে না, আপনাকেও আফিস কামাই ক'রে চাকরী হারাতে হবে না; সুতরাং আপনার গুরু রোগ থেকেই গেল।"

আমি বললাম,—"আপনি কি বলছেন? আমার ত কোন রোগই নেই।"

ডাক্তার বাবু হেসে বললেন,—"আপনি রোগের কথা জানবেন কি ক'রে? আমরা ডাক্তার, আমরা মানুষ দেখ-লেই তার কি রোগ হয়েছে, তা বলতে পারি। আপনার

রোগের ইংরাজী নাম তেমন নেই; তবে আমাদের আয়ু-র্বেদ শাস্ত্রে একটি রোগের কথা আছে, তা'র সমস্ত লক্ষণই আপনাতে বিদ্যমান। সে রোগের নাম গৃহিণী-রোগ! আপনার সেই রোগ হয়েছে; কিন্তু তা'র চিকিৎসা-পদ্ধতি আমি জানিনে, বুঝেছেন? ও কি, আজ বত্রিশও নয়, ষোলও নয়—আজ আমি ফি নেব না। নমস্কার!"

শ্রী জলধর সেন

পাগলের গান

আগমনী

১

পাগল আমি উদাস ভোলা
সব অভাবে হেলা ফেলা,
কিছুই চাহি না?
যা পাই ভাল, না পাই যদি
ক্ষতি মানি না
ওগো, কাঁদন গাহি না!
আমি যে দুনিয়া-ছাড়া,
সঙ্গিহারা একেলা,
উষা নিশা সকাল সন্ধ্যা
বেলা কিংবা অবেলা—
আমার কাছে সব-ই সমান
প্রভেদ-বিহীনা!

২

লোকালয় নয় আলয় আমার
থাকি নিরজনে,
কভু বিজন আঙ্গিন্-তলে
কভু গৃহকোণে।
আপন মনে গাহি গান
সঙ্গে তোলে সমতান
জীবন-শরণী মোর সহচরী বীণা!

৩

মূর্চ্ছনা গমক রাগে, ছন্দঃ লয়ে উঠে সুর,
ক্ষুদ্র প্রাণের মাঝে বিশ্বরূপ ভরপূর!
আচম্বিতে এ কি ভুলে
নিমীলিত আঁখি খুলে
চেয়ে দেখি দ্বার-মূলে
সে আসিছে কি না?

৪

ঐ যে শ্রবণে পশে ঝুম্ ঝুম্ ঝিনি ঝিনি!
নূপুর মধুর সুর কঙ্কণ কিঙ্কিণী!
কে এলো? নির্ম্মম—
হারানো রাগিণী মম?
সৃষ্টি বেসুরো সম,
একটি দৃষ্টি বিনা!

৫

এলো না সে সব ভুল! এ যে বজ্র-গরজন!
ভূষণ-শিঞ্জন নহে; ঝর ঝর বরষণ!
হাতের বাঁধন টুটে
হায় রে! পড়িল লুটে
কখন্ বীণাটি ভূমে—
জানি না ত তা জানি না!

৬

নিমেষে ভাঙ্গিল মোহ তুলিনু তাহারে বুকে,
রাগে অভিমানে সখী কেঁদে কেঁদে কহে দুখে!
"না না ছাড়, মহাশয়,
এ কায তোমার নয়!
বন্ধ কর গীত গান ছুঁয়ো না হে জালিও না!"

৭

উথলে নিশ্বাস তপ্ত কম্পিত প্রদীপশিখা!
করুণ সুবাস ঢালি কহি উঠে শেফালিকা;—
"তা হবে না গাও কবি,
নব নব গন্ধ লভি;
তোমার প্রসাদ-বরে মোরা চির-যৌবনা!"

৮

সাড়া দিয়া কহে বায়ু দূর হ'তে আসি কাছে;
"তেয়াগিতে গীতবাদ্য তোমার কি সাধ্য আছে?
গাও তুমি গাও ভাই
তোমা ছাড়া গতি নাই—
যে যাহা বলুক, বন্ধু, থেমো না হে থামিও না!"

৯

সহসা নীরদমালা উড়ে গেল দূরান্তরে;
ফুটিল চাঁদিনী হাসি ত্রিভুবন আলো ক'রে।
ঘুচিল বীণার মান;
খুলি দিয়া মনঃপ্রাণ—
ঝঙ্কারিল আগমনী মিলন-আনন্দ-লীনা।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

প্রেমের ডাক

১

নিঃশেষপীত সিগারটা কক্ষকোণে ফেলিয়া দিয়া সুকুমার উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না। বিয়ে তোমায় কর্‌তেই হবে। আমাদের সকলের অনুরোধ তুমি রাখবে না কেন বল ত?"

গিরিজাপ্রসন্ন বন্ধুর উত্তেজনাচঞ্চল আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃদু হাস্যে বলিল, "তুই যে সত্যি সত্যি ক্ষেপে উঠলি, ভাই!"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া, দণ্ডায়মান সুকুমার বলিল, "এ অবস্থায় মানুষ না ক্ষেপে উঠে পারে? সংসারে বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, সম্পদ্ সবই যার আছে, সে বিয়ে করবে না কেন? তোমার এই উদাসীনতায় আত্মীয়-স্বজন সকলেই দুঃখিত। বড়দা জব্বলপুর থেকে আমাকে বারংবার লিখে পাঠাচ্ছেন। অমন বাপের মত বড় ভাই, তাঁকে অসুখী করা কি তোমার উচিত?"

গিরিজাপ্রসন্নের সুন্দর প্রসন্ন আনন করুণা-মাধুর্য্যের রসধারায় অভিষিক্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। সে অবিচলিত মৃদু স্বরে বলিল, "দাদার সব আদেশ আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু বিয়ের জন্য তোমরা এত ব্যস্ত কেন? আমি বেশ আছি। তাঁকে লিখে দিও, আমার কোন অসুবিধা নেই।"

সুকুমার প্রচণ্ড তার্কিক—যুক্তি-তর্কে বন্ধুমহলের কেহই তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার যুক্তি যেমন অমোঘ, তর্কের ধারাও তেমনই বেগবতী ছিল; কিন্তু কোনও মতেই সে তাহার স্বল্পভাষী বাল্য-বন্ধুটিকে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। গিরিজাপ্রসন্ন উত্তেজিত বন্ধুর সকল কথার একই উত্তর দিত, "বেশ আছি।"

আজ সুকুমার স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে, গিরিজাপ্রসন্নকে বিবাহে সম্মত করাইয়া তবে সে বাড়ী ফিরিবে। যাহার গৃহে ইন্দিরা অচলা, দেবী ভারতীর কৃপায় যে নানা বিদ্যার অধিকারী, অটুট স্বাস্থ্য এবং অনুপম সৌন্দর্য্য যে দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছে—কোনও বিষয়ে যাহার বিন্দুমাত্র অভাব নাই, সে ব্যক্তি কেন চিরকুমার থাকিবে, ইহার কোনও সঙ্গত কারণ সুকুমার খুঁজিয়া পায় নাই।

আশৈশব সুকুমার গিরিজাপ্রসন্নের সহচর, সতীর্থ ও বন্ধু। প্রশংসার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিরিজাপ্রসন্ন যখন বিলাতে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য গমন করিয়াছিল, সেই কয় বৎসর সুকুমার ও গিরিজার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল; কিন্তু প্রতি ডাকে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ পত্রের বিনিময় হইত। সুতরাং বন্ধুর মনের গতির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই। সে জানিত, বিলাতে গিয়া গিরিজাপ্রসন্ন শুধু বিদ্যা অর্জ্জনের সাধনা ব্যতীত বিষয়ান্তরে কোনও দিন মন দিতে পারে নাই। এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় বিশেষ যশোলাভ করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন অন্যান্য আরও কতিপয় বিদ্যায় উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিল। তাহার মত মেধাবী ছাত্র বিলাতে অতি অল্পই আসিয়া থাকে, এ অভিমত তত্রত্য অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হইয়াছিল। তাহার কর্ম্মশক্তি ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া কোনও প্রসিদ্ধ কারখানায় তাহাকে কিছু দিন উচ্চপদে নিযুক্ত করাও হইয়াছিল, এ সকল সংবাদ সুকুমার ভালরূপই অবগত ছিল। ভারতবর্ষে কোনও সরকারী বিভাগে তাহাকে মোটা বেতনে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন, এ সংবাদও সুকুমার বন্ধুর নিকট হইতে অবগত হইয়াছিল; কিন্তু দাসত্বের দ্বারা জীবিকার্জ্জনে গিরিজাপ্রসন্নের আদৌ স্পৃহা ছিল না বলিয়া দুর্লভ পদমর্য্যাদার মায়া সে অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিল।

বিলাত হইতে গিরিজা যে দিন ফিরিয়া আসিল,

অভ্যর্থনাকালে সুকুমার সে দিনও দলের অগ্রেই ছিল। তাহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সুহৃদকে ফিরিয়া পাইয়া সে বুঝিয়াছিল যে, সে পূর্ব্বের মতই সরল ও সুন্দর চরিত্রটি লইয়া আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। শুধু স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায় বন্ধুর স্বাধীন চিত্তটি আরও সুস্থ ও সবল হইয়াছে।

গিরিজার পিতা বার্দ্ধক্যের রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া পিতৃগতপ্রাণ পুত্র প্রবাসে আর বেশী দিন থাকিতে চাহে নাই। মাতাকে সে বাল্যকালে হারাইয়াছিল, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে কোনও দিন সে অভাব বুঝিতে দেন নাই। গিরিজার জ্যেষ্ঠাগ্রজ তখন মধ্যপ্রদেশের কোনও জিলার ভারপ্রাপ্ত হাকিম।

সুকুমার এই পরিবারের সহিত এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল যে, বাহিরের লোক তাহাকে গিরিজার ভ্রাতা বলিয়াই মনে করিত। সুকুমার বন্ধুর পিতার পীড়ার সময় পুত্রের ন্যায় তাঁহার সেবা করিত, অনেক সময় আপন গৃহে তাঁহাকে রাখিয়া গিরিজার অভাব তাঁহাকে বুঝিতে দিত না। বৃদ্ধ অনেক সময় গিরিজার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আবেগের সহিত বলিয়া ফেলিতেন, "ওর উপর আমার বড় বিশ্বাস, তোমরা দেখো, ওর দ্বারা দেশের ও দশের অনেক কায হবে।" বন্ধুর সম্বন্ধে এই বাণী শুনিয়া সুকুমারের হৃদয় গর্ব্বে, আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া গিরিজাপ্রসন্ন স্বাধীন-ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সরকারী, বে-সরকারী অনেক কার্য্য সে এমন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, পূর্ত্তকার্য্যসংক্রান্ত কোনও জটিল বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন হইলে সরকারপক্ষ হইতেও তাহার অভিমত এবং সাহায্য গ্রহণ করা হইত। সুতরাং ভাগ্যলক্ষ্মী অল্পদিনেই তাহার মস্তকে মুক্তহস্তে আশীর্ব্বাদ-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুকুমার এ সকল বিষয় ভালরূপেই জানিত।

পুত্রকে গৃহী করিবার পূর্ব্বেই পিতা মহাপ্রস্থান করিয়া-ছিলেন। কিছু দিন গিরিজা পিতৃশোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। তখন সেই গভীর শোকে অভিভূত বন্ধুর সান্নিধ্য সুকুমার মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করে নাই। সে জানিত, তাহার এই প্রিয়দর্শন, স্বল্পভাষী, কোমলহৃদয় বন্ধুটি বাল্যকালে মাতৃহারা হইয়া মনে মনে জননীর জন্য একটা তীব্র অভাব অনুভব করিত। পিতৃবিয়োগের পর তাহার নারীর ন্যায় কোমল অন্তর তাঁহাদের চিন্তায় কিরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সুকুমার ছাড়া অন্য কেহ বুঝিতে পারে নাই। গিরিজাপ্রসন্নের বাহিরের আচরণ দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না, তাহার অন্তর কিরূপ স্নেহপ্রবণ ও কোমল।

যে বন্ধুর অন্তর বাহির সুকুমারের নখদর্পণে ছিল, সে কেন বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে না, আত্মীয়স্বজনকে সুখী করিবে না? ইহার কারণ সে কোনমতেই বুঝিতে পারিত না।

কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় তাহার সকল যুক্তিকে মানিয়া লইয়াও মৃদুহাস্যে গিরিজা যখন বলিল, "বিয়ে না করলে অর্থ, সম্পদ, যশ, প্রতিভা নিষ্ফল হবে, এমন কথা বলা তোমার মুখে শোভা পায় না, ভাই।" তখন সুকুমার সত্যই অত্যন্ত চটিয়া গেল। কারণ, এক দিন সে-ই কোন সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন মহানুভব, পরার্থে উৎসৃষ্টজীবন, চিরকুমারের উল্লেখ করিয়াছিল।

মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও সে বন্ধুর বিবাহে এরূপ নিস্পৃহতার কোনও সঙ্গত হেতু নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। উত্তেজনার প্রভাব হ্রাস পাইলে সে বলিল, "তবে দাদাকে লিখে দিই, আমার চেষ্টা নিষ্ফল?"

স্নিগ্ধহাস্যে অবিচলিতকণ্ঠে গিরিজা বলিল, "সেই রকমই ত বুঝ্‌লে।"

২

নিন্দকের রসনা ও সন্ধুক্ষিত বহ্নির জিহ্বা দিকে দিকে সহস্রভাবে প্রসৃত হয়, যাহা কিছু সম্মুখে পায়, দহন করে, ধ্বংস করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। দেশের ও দশের কাছে পরিচিত, অনতিক্রান্তযৌবন গিরিজাপ্রসন্ন চিরকৌমার্য্যকে বরণ করিয়া অজস্র অর্থ, যশঃ ও সম্ভ্রম অর্জ্জন করিতেছে, ইহা কখনও সমালোচনার অতীত হইতে পারে না। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্র পরিবার এই প্রার্থনীয় পাত্রটির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া অবসরের প্রতীক্ষায় ছিলেন—চেষ্টার

ক্রটিও হয় নাই, কিন্তু কোনও "চার" এই মাছটিকে প্রলুব্ধ করিয়া কাছে আনিতে পারিল না। অতল জলের বৃহদায়তন মৎস্যটি ছিপ, সূতা ও বঁড়শীর ধার দিয়াও গেল না। বৈঠকে বৈঠকে সমালোচনার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে সৃষ্টিকর্ত্তারা এমন সরস বিচিত্র গল্প রচনা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সাহিত্যিক থাকিলে মাসিক পত্রের গল্প-দৈন্য অনেকটা দূরীভূত করিতে পারিতেন।

কোনও বৈঠকের সরস গল্প পল্লবিত হইয়া ভিন্ন বৈঠকে সংক্রমিত হইত, আবার সেখান হইতে নানা আকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত। বিবাহ-সভায়, টি-পার্টিতে, খোসগল্পের আসরে গল্পগুলি বেশ জমিয়া উঠিত।

কিন্তু যাহার সম্বন্ধে এত আলোচনা, তাহার আহার, নিদ্রা বা কর্ম্মের তাহাতে কোনও ব্যাঘাত হইত না। সে তখন বালীগঞ্জে নব-নির্ম্মিত সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত অট্টালিকায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিল। প্রবাস হইতে আত্মীয়-স্বজন আসিলে তাহার গৃহে সমাদরে অভ্যর্থিত হইতেন, আতিথ্যের কোনও বিঘ্ন ঘটিত না, কিন্তু তথাপি সমালোচনার বিরাম ছিল না।

সমালোচনার আরও একটা হেতু ছিল। নিজের কায-কর্ম্ম লইয়া গিরিজাপ্রসন্ন এত ব্যস্ত থাকিত যে, সাধারণতঃ কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে সে প্রায়ই যোগ দিতে পারিত না। এ জন্য আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় তাহার উদাসীনতাকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। সংসার ও সমাজের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, যে অরণ্যবাসী অথবা নিভৃতগুহাচর সন্ন্যাসী নহে, সে তাহার সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিবে না কেন? সকলেই প্রত্যাশা করিত, গিরিজাপ্রসন্ন বিবাহ না করিলেও তাহার অবশ্যপালনীয়, মানবের করণীয়, আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে না। গিরিজাপ্রসন্ন এ প্রশ্নের উত্তরে বলিত যে, আমোদ-প্রমোদ অথবা ক্রিয়াকর্ম্মের ভোজসভায় উপস্থিত থাকিয়া সামাজিক কর্ত্তব্যপালনের অবসর তাহার নাই, কিন্তু যে ক্ষেত্রে তাহার কর্ম্ম-বিজ্ঞানের সহায়তার প্রয়োজন হইবে, গিরিজাপ্রসন্ন কোনও আত্মীয়-স্বজনকে সে বিষয়ে বঞ্চিত করিবে না।

অবশ্য এ বিষয়ে তাহার কোনও আত্মীয় কখনও সাহায্য চাহিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হয়েন নাই। কাহারও কোনও গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে হইবে—কি প্রণালীতে তাহা অল্পব্যয়ে এবং সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হইতে পারে, গিরিজাপ্রসন্ন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিত। এ সকল বিষয়ে তাহার কর্ত্তব্যে সে কোনও দিন বিরক্তি প্রকাশ করে নাই।

তাহার বিরুদ্ধে আরও একটা গুরু অভিযোগ ছিল। অনেক দরিদ্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাহার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেন; তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহাদের অবস্থার কথা জানিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গিরিজাপ্রসন্ন তাঁহাদের অভাবমোচনে অগ্রসর হইবে, কিন্তু এ বিষয়ে গিরিজাপ্রসন্নের তরফ হইতে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাইত না। অথচ এমন সংবাদও সকলে পাইতেন যে, সে গোপনে অনেক দরিদ্র ছাত্রের অধ্যয়নে সাহায্য করিয়া থাকে, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় হইলেও ব্যাধি-পীড়িত, অভাবগ্রস্তের দুর্দ্দশামোচনে তাহার কার্পণ্য নাই। আত্মীয়-স্বজন ইহাতে তাহার উপর যে মনে মনে বিশেষ প্রসন্ন হইতেন, তাহা বলা যায় না।

তবে এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, গিরিজাপ্রসন্ন কোন কোন ক্ষেত্রে এমন মত প্রকাশ করিয়াছে, সকলের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তাহার সন্ধান রাখিবার অবকাশ নাই। যাঁহার যাহা অভাব, তাহাকে জানাইলে, সে সাধ্যমত প্রতীকার করিতে কোনও দিন ত অসম্মত নহে। অন্তর্য্যামীর মত সকল কথা আপনা হইতে জানিয়া, অভাব-মোচনে অগ্রসর হইবার মনোবৃত্তি ও শক্তির অভাব সে অস্বীকার করে না। কিন্তু যাঁহারা ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়, তাঁহারা তাহার এই যুক্তিকে নিতান্ত অসার বলিয়া মনে করিতেন। সুশিক্ষিত, সর্ব্ববিষয়ে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বর-পুত্রের নিকট হইতে অযাচিত সাহায্যই তাঁহারা প্রত্যাশা করিতেন। ভিখারীর নিবেদন লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে, ইহার অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ আর কি হইতে পারে? যাহার পিতা সারাজীবন ধরিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থ আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তের সাহায্য-কল্পে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিয়মিতভাবে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, কাহাকেও কোনও দিন সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয় নাই, সেই

আদর্শের ছায়াতলে মানুষ হইয়া গিরিজাপ্রসন্নের পক্ষে এমন ভাব প্রকাশ করাও যে মনুষ্যত্বের—ভারতীয় ভাবধারার পরিপন্থী !

সুতরাং আত্মীয়স্বজনের তরফ হইতে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা দিন দিনই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

৩

"গিরিজা বাড়ী নেই ?"

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য গোষ্ঠ বলিল, "না, দাদাবাবু।"

সুকুমার কার্য্যোপলক্ষে কাশী গিয়াছিল। তিন মাস কলিকাতায় ছিল না। ইতোমধ্যে নানারূপ অশিষ্ট, অপ্রীতিকর জনরব এমনই ভাবে সহস্রফণ বাসুকির মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, কলিকাতায় আসিয়া সুকুমার তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

"কবে ফির্‌বে, কিছু ব'লে গেছে ?"

গোষ্ঠ মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে তাহা জানে না।

"কোথায় গেছে, তাও ব'লে যায় নি ?"

না, তাহাও সে জানে না। তবে মাঝে মাঝে যে ছোট দাদাবাবু এমনই ভাবে চলিয়া যায়েন এবং দশ পনের দিন পরে ফিরিয়া আইসেন, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। কয় বৎসর ধরিয়া এমনই ব্যাপার চলিতেছে।

হাঁ, সুকুমারও পূর্ব্বে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তরে গিরিজা তাহাকে বলিয়াছিল, বাহির হইতে নূতন কাযের অর্ডার আসিলে, তাহার পক্ষে তথায় না যাইলে কায করা চলে না। সে ত সত্য কথা। কিন্তু ইদানীং তাহার অনির্দ্দেশ যাত্রার পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কণ্ট্রাক্টরী কাযে তাহা ত হইবারই কথা। তবে এ বিষয় লইয়া লোক এত মাথা ঘামায় কেন ? গিরিজার কায ত শুধু কলিকাতার মধ্যে নিবদ্ধ নাই। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতেই তাহার ডাক আইসে। সুকুমার নিজেই ত তাহার সঙ্গে কয়েকবার বোম্বাই ও গুজরাটে গিয়াছিল।

কিন্তু - কিন্তু নারী-সংক্রান্ত এই অতি কুৎসিত জনরবটা ! লোক যাহা বলিতেছে, তাহা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা ? না, না, সুকুমার কখনই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। অমন আদর্শচরিত্রা জননী, অমন পুণ্যবান্ পিতা, অমন নিষ্কলঙ্কচরিত্র অগ্রজ যাহার, যে বংশের রক্তে এতটুকু নীচতার সংস্রব নাই, চরিত্র-গৌরবে যে বংশ পুণ্যতোয়া জাহ্নবীধারার সহিত তুলনীয় ও পবিত্র, সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সুপণ্ডিত গিরিজাপ্রসন্ন, তাহার আবাল্যের সহচর, সখা, সতীর্থ—এক কথায় তাহার সোদরাধিক প্রিয় বন্ধু, নারীর অবৈধ প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ? ইহা যে স্বপ্নেরও অগোচর। বিবাহ-বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইতে যাহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই—শত শত প্রার্থনীয়া, বিদুষী সুন্দরী যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে কি না—

মিথ্যা কথা ! এই জনরব অমূলক ; শুধু দুষ্ট লোকের হিংসা, পর-শ্রীকাতরতা হইতেই এই সকল কুৎসিত নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে।

সুকুমার বন্ধুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। ভৃত্য সুইচ খুলিয়া দিল, বৈদ্যুতিক আলোকে সে দেখিল, কিছু দিন পূর্ব্বে দুই বন্ধু মিলিয়া এই ঘরখানি যে সকল মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সে কক্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। শুধু এক পার্শ্বে শয্যা, একটি আলমারী, একটি টেবল ও চেয়ার এবং প্রাচীর-গাত্রে গিরিজার পরলোকগত পিতা ও মাতার তৈল-চিত্র বিলম্বিত।

সুকুমার এই পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইল। গিরিজা দাম্পত্যজীবনে বিগতস্পৃহ হইলেও বিলাসিতার সখ যে তাহার অন্যের অপেক্ষা কম ছিল, তাহা নহে। গোষ্ঠকে প্রশ্ন করিয়া সে জানিতে পারিল যে, ত্রিতলের একটি নির্জ্জন কক্ষ যাবতীয় বিলাস উপকরণের দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে এবং সেই গৃহে গিরিজার শয়নকক্ষের মূল্যবান্ আসবাবপত্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সুকুমার শুধু বিস্মিত নহে, বিচলিতও হইল। সে অধীর আগ্রহে বলিল, "চল ত গোষ্ঠ-দা, ঘরটা একবার দেখে আসি।"

গোষ্ঠ জানাইল যে, ত্রিতলের সিঁড়ির ঘরের চাবী এবং ঘরের চাবী তাহার কাছে নাই ; ছোট দাদাবাবু সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। সে ঘরে তিনি কাহাকেও যাইতে দেন না ; এমন কি, গোষ্ঠও সে ঘরে কখনও প্রবেশ করিতে পায় নাই।

সুকুমারের আননে ছায়া পড়িল। তাহার হৃদয়ে একটা সন্দেহের তাড়িত-প্রবাহ বহিয়া গেল। এই গোপনতার উদ্দেশ্য কি ? সে যাহা শুনিয়াছে, তাহা কি তবে সত্য ?

দাদাবাবুর জন্য এক পেয়ালা গরম চা ও কিছু আহার্য্য

আনিয়া গোষ্ঠ টেবলের উপর রাখিল। গৃহিণীশূন্য—নারীবিবর্জ্জিত গৃহে গৃহিণীর ন্যায় গৃহস্থালী কার্য্যে দক্ষ গোষ্ঠের সমকক্ষ লোক অতি অল্পই পাওয়া যায়। এই সংসারে কায করিয়া তাহার মাথার কেশ শুক্ল হইয়াছিল। গিরিজার এই বৃহৎ ভবনে পরিচারকের সংখ্যা কম ছিল না, গোষ্ঠ তাহাদের কর্ত্তা। সুকুমারের সহিত গিরিজার কি সম্বন্ধ, তাহা সে ভালরূপই জানিত। ছোট দাদাবাবুর পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিয়া সে সুকুমারকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত।

কথায় কথায় সুকুমার গোষ্ঠের নিকট হইতে জানিতে পারিল, কিছু দিন পূর্ব্বে সত্য সত্যই এক জন মহিলা, সুন্দরী যুবতী বালীগঞ্জের এই বাড়ীতেই আসিয়াছিলেন। তিনি এখানে ৩ দিন বাস করিয়া গিয়াছেন; বেশভূষায় তিনি বাঙ্গালী মহিলা নহেন, এইটুকুই সে জানে। ত্রিতলের উক্ত ঘরটিতেই তিনি থাকিতেন, কাহারও সাক্ষাতে তিনি বাহির হইতেন না। গিরিজাপ্রসন্নই তাঁহার পরিচর্য্যার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল।

তবে যাহা রটে, তাহা বটে! জনরব মিথ্যা নহে!

স্তব্ধভাবে সুকুমার অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। বন্ধুর এই অধঃপতনের সংবাদ শুনিবার পূর্ব্বে—ছিঃ! ছিঃ! এই কি তাহার শিক্ষার ফল! এই তাহার পৌরুষ! দাম্পত্য-বন্ধনের পবিত্রতাকে পদাঘাত করিয়া ব্যভিচারের আশ্রয় লইয়া কাপুরুষের মত ইন্দ্রিয়চর্চ্চাই যদি করিবে, তবে এত অভিনয় করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যে জ্ঞানী, যে শিক্ষিত, তাহার পক্ষে এরূপ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। সুকুমারের আজন্মের বিশ্বাসকে এমনই করিয়া গিরিজা চূর্ণ করিয়া দিল! স্নেহময় উদারহৃদয় ভ্রাতৃগতপ্রাণ জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে এই সংবাদ যে শেলাঘাতের অপেক্ষাও ভীষণভাবে বাজিবে! নিষ্কলঙ্ক বংশে গিরিজাপ্রসন্ন এ কি অভিশাপ বহন করিয়া আনিল? তাহার দাদা ত বলিয়াই দিয়াছিলেন, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, ইংরাজ যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী নারীকে সে বিবাহ করিতে চাহে, তাঁহার আপত্তি নাই, শুধু সে গৃহী হইলেই তিনি সুখী হইবেন।

তবে এই হীন প্রতারণা কেন? এইরূপ জঘন্যভাবে অন্য নারীকে তাহার বিলাসসামগ্রী করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল?

বিদীর্ণ হৃদয়ে সুকুমার সে স্থান ত্যাগ করিল। সত্যই তাহার হৃদয়মধ্যে ক্রন্দনের সমুদ্র যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।

৪

"সুকু, ভাই!

"কি?"

"চল না দিনকতক বেড়িয়ে আসি।"

সুকুমার নিরুত্তরে বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল। তাহার হাতের চুরুট হাতেই রহিয়া গেল।

"কোথায় যেতে চাও?"

"ভয় নেই, ভাই, খারাপ যায়গায় তোমায় নিয়ে যাব না। আমাকে বিশ্বাস করতে পার।"

সুকুমারের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইল। গিরিজার মনে হইল, তাহা হাস্য নহে ক্রন্দনেরই রূপান্তর। সে বিস্মিত হইল। প্রাচীরবিলম্বিত গিরিজার পিতার আলেখ্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীরভাবে সুকুমার বলিল, "তুমি ওঁরই ছেলে!"

প্রসন্ন হাস্যে গিরিজা বলিল, "কেন? এ বিষয়ে সন্দেহ হয়?"

সুকুমার এতক্ষণ বন্ধুর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। গিরিজা প্রায় ১৫ দিন পরে আজ ফিরিয়া আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া, তাহার সহিত বুঝা-পড়া করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। সে দেখিল, গিরিজার আননে শ্রান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট; কিন্তু তাহাতে একটা তৃপ্তি ও আনন্দের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যভিচারীর আননে অবসাদ থাকিতে পারে, কিন্তু এমন বিমল মাধুর্য্যধারা!—না, মনস্তত্ত্বের কোনও পুথিতে এ কথা ত লিখে না!

এমন অভিনয়নৈপুণ্য কি গিরিজা বিলাত হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে?

নির্ব্বাপিত চুরুটে সে অন্যমনস্কভাবে কয়েকবার টান দিয়া বিরক্ত হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে চুরুট ধরাইয়া লইয়া সে বলিল, "ও কথা ব'লে আমায় অপরাধী ক'র না। আমি বলছিলাম, ঐ দেবতার মত পুণ্যবান্ পিতার পুত্র হয়ে—"

তাহার কণ্ঠ ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিল। চুরুটে টান দিয়া সে বক্তব্য অসমাপ্তই রাখিল।

উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করিয়া গিরিজা বলিল, "কি বলছিলে, শেষ ক'রে ফেল।"

তাহার প্রসন্ন আননের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সুকুমার বলিল, "তুমি আমার আশৈশবের বন্ধু, আমার জীবনের কোন কথা আজ পর্য্যন্ত তোমার কাছে গুপ্ত নেই। তুমি কি তোমার জীবনের সব কথা আমাকে বলেছ?"

গিরিজা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুগঠিত সুন্দর ঋজু দেহ বন্ধুর পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোমার মত প্রিয় জগতে আমার বড় কেহ নেই। আমার জীবনের সব কথাই তুমি জান—শুধু একটি ছাড়া। সেই কথাটা জানাবার জন্য তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আজ সেটা বলবার দিন এসেছে।—যাবে?"

বন্ধুর কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিক আগ্রহের ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

সুকুমার বলিল, "যাব।"

"তবে চল, আমি প্রস্তুত।"

সবিস্ময়ে সুকুমার বলিল, "এখনই যেতে চাও না কি, এই রাত্তিরে? এখন যে ৭টা বাজে!"

"তাতে কি? মোটরে যাব, ট্রেণেও যাওয়া যায়; কিন্তু তাতে দেরী হবে। ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব, কোন ভয় নেই। তোমাকে আজই নিয়ে যাব ব'লে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। তুমি না এলে আমি নিজেই তোমার ওখানে যেতাম।"

* * * * *

রেলপথ বামে রাখিয়া মোটর রাজপথে দ্রুত ছুটিয়া চলিল। চন্দ্রালোকদীপ্ত পল্লীপথের ধারে কোথাও কসাড়-বনের গাঢ় অন্ধকার, কোথাও ঘন-সন্নিবিষ্ট লীলায়িতশীর্ষ বাঁশঝাড়, আবার কোথাও বা দামপূর্ণ, শৈবালাচ্ছন্ন, দুর্গন্ধ-সলিলা পুষ্করিণী। জ্যোৎস্নাপুলকিত শারদরজনী, বিলুপ্তশ্রী অর্দ্ধসুপ্ত গ্রামগুলির শোচনীয় দুর্দ্দশায় যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল।

ব্যথিত কণ্ঠে সুকুমার বলিল, "এই আমাদের পল্লীমা'র দশা!"

"বিদ্যুতের আলো, বিজলী পাখা, ট্রাম, মোটর বাস, জুড়ী-গাড়ী, কলের জল, মসৃণ রাজপথ—সহরের সহস্র-বিলাস-উপকরণ! সেই বিলাসসাগরে ভাসতে ভাসতে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের অন্তরালে সমস্ত দেশের এই রূপকল্পনা কর্‌তে আমরা পারি কি, ভাই?"

বন্ধুর গাঢ় স্বরে যে বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, সুকুমারকে তাহা যেন স্পর্শ করিল। পল্লীর সহিত তাহার কোনও দিন সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল না। চিরদিনই সে সহরের বক্ষে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভেঁপু বাজাইয়া পল্লীর গাঢ় নীরবতা ভঙ্গ করিতে করিতে সোফার দ্রুত বেগেই মোটর চালাইতেছিল। পথের যেন শেষ নাই! কত মোড় বাঁকিয়া, কত পল্লী প্রান্তর পশ্চাতে ফেলিয়া—নদীর সেতু অতিক্রম করিয়া—ঝঞ্ঝার ন্যায় বেগে চলিতে চলিতে মোটর যেন নৈশ অভিসারে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

চন্দ্র তখন নীল সাগরের মধ্যস্থান ছাড়াইয়া একটু ঢলিয়া পড়িয়াছিল। দূরে একটা নদীর রেখা দেখা যাইতে-ছিল। গিরিজা বলিল, "ঐ নদীর পারেই আমাদের গন্তব্য স্থান।"

সেতু অতিক্রম করিয়া মোটর যখন একটা গ্রামের পথে আসিয়া পড়িল, মুগ্ধ বিস্ময়ে অকস্মাৎ সুকুমার বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!"

নাতিপ্রশস্ত কঙ্করাকীর্ণ পথটি যেন সযত্ন-নির্ম্মিত। পথি-পার্শ্বস্থ জলাশয়গুলি স্বচ্ছসলিলা, দামবর্জ্জিতা। পথের ধারে বাগান, ক্ষেত বিদ্যমান, কিন্তু নিবিড় ছায়া-ঘন অপ্রীতিকর জঙ্গলের অস্তিত্ব যেন কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ডস্পর্শে অন্ত-র্হিত হইয়া গিয়াছে! পল্লীকুটীরগুলি শ্রীসম্পন্ন—জ্যোৎ-স্নালোকে যেন হাসিতেছে। চারিদিক হইতেই পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছলতার মাধুর্য্য যেন সাদরে অভ্যাগতকে অভিনন্দিত করিতেছে!

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুকুমার বলিল, "পল্লীশ্মশানে এ সোনার পারিজাত কে ফোটালে, ভাই?"

স্মিত হাস্যে গিরিজা বলিল, "চল, নামি—আমরা এসেছি।"

সুরচিত উদ্যানের মধ্য দিয়া, কঙ্করাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া, মোটর তখন এক নাতিবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে থামিয়াছিল।

৮

"এর মধ্যে এত ক'রে ফেলেছিস্, ভাই! ঘুণাক্ষরেও কিছু আগে জান্তে পারি নি ত!"

প্রজ্বলিত লণ্ঠন জ্বালিয়া ভৃত্য অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল। তাহার হাত হইতে আলোকাধার লইয়া গিরিজা তাহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করিল। তাহার পর বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষের দিকে সে অগ্রসর হইল।

"এ বাড়ীটা যেখানে তৈরী করেছি, এখানে আমার মা'র পিতৃভবন ছিল। আর ঐ দূরে যে ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে, আমার বাবা সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"

সুকুমার অবাক্ বিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ঠাকুর্দ্দা পশ্চিমে থাক্‌তেন; বাবার জন্ম এই গ্রামে হলেও তিনি বড় হয়ে কখনও এখানে আসেন নি। খুব ছোট বেলায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল—কলকাতায়। মাও তার পর, গ্রামে আসেন নি; বাবার সঙ্গে পশ্চিমের সহরে সহরেই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এ গ্রামের প্রবীণরা এখন আর বেঁচে নেই। যাঁরা আছেন, বাবার নাম তাঁরা কেউ হয় ত শুনে থাক্‌বেন, কিন্তু আমাদের কেউ চেনে না। তাই বেনামীতে এই গ্রামের মালিকান স্বত্ব যখন কিনে ফেললাম, আমার অস্তিত্ব কেউ জান্‌তেও পারে নি।"

সুকুমার বলিল, "কিন্তু এত গোপন করবার তোমার কি দরকার হয়েছিল, তা ত বুঝলাম না।"

"সেই কথাটাই তোমায় আজ বলব। তোমার নামে এই গ্রাম কেনা হয়েছে। রাস্তা-ঘাট মেরামত, স্কুল লাইব্রেরী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা সবই যেন তোমার আদেশেই তোমার অর্থে হচ্ছে, গ্রামের লোক তাই জানে। আমার এটর্ণী তাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, গ্রামের উন্নতির সম্বন্ধে খবরের কাগজে যদি তারা আন্দোলন করে, তবে সব বন্ধ হয়ে যাবে। তারা সুখে থাক্‌তে চায়, সুতরাং বেশী হুজুগ তারা করে নি। তারা তোমায় চেনেও না, তোমার ঠিকানাও তারা জানে না। সুতরাং ৫ বছর ধ'রে নিরাপদে গ্রামখানাকে এমনই ক'রে তৈরী করা গেছে।"

একটা মন্দিরাকৃতি ঘরের সম্মুখে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইল। অট্টালিকার এক প্রান্তে উহা অবস্থিত। তাহার পরই বিস্তৃত উদ্যান তাহার পার্শ্বে নদী বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

"আমি মাঝে মাঝে রাত্রিতে মোটরে এখানে আস্‌তুম, দশ পনের দিন ধ'রে এখানে থাকতুম, কিন্তু আমার কড়া হুকুমে চাকররা কোন লোককে আমার কাছে আন্‌তে পারত না। কোন দিনই এই গ্রামের কোন লোক আমাকে দেখতে পায় নি। গভীর রাত্রিতে আমি এখান থেকে চ'লে যেতাম। কেন? বলছি।"

মন্দিরের দ্বার খট্ করিয়া খুলিয়া গেল। সুকুমার বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া ধীরে ধীরে বন্ধুর সহিত ভিতরে প্রবেশ করিল। কক্ষমধ্যে একটি ঝাড় ঝুলিতেছিল। গিরিজা দীপশলাকা বাহির করিয়া বাতিগুলি জ্বালিয়া দিল। উজ্জ্বলালোকে ঘর ঝলসিয়া উঠিল।

গিরিজা বলিল, "এই ঘর বা মন্দির—যা-ই বল, এর মধ্যে আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি আজ তুমি এলে। আজ কয় বৎসর ধ'রে আমি যা সাধনা করেছি, তোমাকে তাই দেখাব। তা হ'লে তুমি বুঝতে পারবে, আমার এই সব খেয়াল অহেতুক নয়।"

ধীরে ধীরে কক্ষের মধ্যস্থলে অগ্রসর হইয়া অতি সন্তর্পণে সে একখানি বস্ত্রখণ্ড অপসৃত করিল। দুইটি মর্ম্মরক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তি উজ্জ্বলালোকে প্রদীপ্ত হইয়া সুকুমারকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া দিল।

একটি মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুকুমার শ্রদ্ধানম্রকণ্ঠে বলিল, "মা'র মূর্ত্তি!"

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া গিরিজা বলিল, "হাঁ।"

"আর—আর ঐটি?"

"আমার সমস্ত কর্ম্মশক্তির উৎস—আমার জীবনগতির পথিপ্রদর্শিকা এক বিদেশিনী কুমারী।"

সুকুমার চমকিয়া উঠিল। বন্ধুর করপল্লব চাপিয়া ধরিয়া গিরিজা বলিল, "বিলাত হইতে ফিরবার পথে জাহাজে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। ইটালীতে চিত্রবিদ্যা শিখবার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁর রূপ ও আলাপব্যবহারের বিশিষ্টতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। জলযাত্রার নিরবচ্ছিন্ন অবসরে আমার চিত্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল; কিন্তু তখন প্রকাশ করতে সাহস হয় নি।"

সুকুমার সাগ্রহে মর্ম্মররচিত সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল, শিল্পী অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত

মূর্ত্তির আননে যে ভাবাবেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহাতে শুধু স্নিগ্ধ পবিত্রতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও স্নেহ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। মনে মনে সে শিল্পীর নিপুণতায় ধন্যবাদ প্রদান করিল।

"তিনি জাতিতে ইহুদী। তুমি জান, আমি কাযের অজুহতে অনেকবার বোম্বাই গিয়েছিলাম। তুমিও সঙ্গে ছিলে। শেষবার গিয়ে মনের অবস্থা আর তাঁর কাছে গোপন রাখতে পারিনি। তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন, জান?"

সুকুমার বন্ধুর দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

জানালাগুলি গিরিজা ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া দিল। রজত-জ্যোৎস্নাধারা কক্ষমধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া গৃহস্থিত আলোকধারার সঙ্গে মিশিয়া গেল।

মৃদুস্বরে গিরিজা বলিল, "তিনি বলেছিলেন, অস্থি-মেদমজ্জানির্ম্মিত দেহের ভোগাকাঙ্ক্ষা তাঁহার পক্ষে এ যাত্রা রুদ্ধ—তাঁহার দেহ ও মন যে দয়িতের উদ্দেশে তিনি উৎসৃষ্ট করেছেন, মনোমন্দির ছাড়া অন্যত্র তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগও ইহজগতে আর নেই। দরিদ্র ব'লে তাঁর পিতা তাঁর দয়িতের প্রার্থনা পূর্ণ করেন নি। ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য তিনি বিদেশে কোথায় আত্মগোপন করে-ছেন, তা জানা যায় নি। নিজেকে যোগ্য ব'লে প্রতি-পন্ন করতে না পারলে তিনি তাঁর জীবনাধিক প্রিয়তমার কাছে আসবেন না—তাঁর পাণিপ্রার্থনা করবেন না। চিত্রবিদ্যায় তাঁর আসক্তি ছিল। অনেক দিন পরে এই বিদুষী সুন্দরী তরুণী পিতৃহীনা হন। তখন তিনি নিজের মালিক। সন্ধান ক'রে দয়িতকে বার করবার জন্য তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী গিয়েছিলেন। নিজেও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করবার অবকাশে দয়িতের জন্য প্রাণপণ অনুসন্ধান করেছিলেন।"

সুকুমার রুদ্ধনিশ্বাসে ব'লিল, "পরিণাম কি হ'ল? তাঁকে পেয়েছিলেন?"

"না; দেশে ফিরে এসে কত অনুসন্ধান করেছেন! শেষে সংবাদ পান, তিনি এ জগতের সুখ-দুঃখের বাইরে গেছেন।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া গাঢ়স্বরে গিরিজা বলিল, "তাঁর এই নীরব প্রেম-ভক্তি ও একান্ত নিষ্ঠার কথায় আমার মনের গতি ফিরে গেল। তার পর অনেকবার তাঁর সঙ্গে নানা স্থানে দেখা করেছি। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ অভিভূত আমি দেখলাম, নারী শুধু ভোগের সামগ্রী নয়। তাঁর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করতে করতে আমি যথার্থ প্রেমমন্দাকিনীর সন্ধান পেলাম। নারীত্ব ও মাতৃত্ব যে অভেদ, ক্রমে তা বুঝতে পারলাম। তাঁর ব্যবহারে আরও সবটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।"

কক্ষতলে তখন সূচিপতনশব্দও শ্রবণশক্তিকে প্রতা-রিত করিতে পারে না, এমনই স্তব্ধতা জমাট বাঁধিয়া উঠিল। সুকুমার বলিল, "ভাই—"

হস্তেঙ্গিতে তাহাকে থামিতে বলিয়া গিরিজা বলিয়া উঠিল, "তিনি কিছু দিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন। আমার বাড়ীতে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নির্জ্জনে রেখেছিলাম। এখানকার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা ছিল। তাঁর আগমন কেন প্রকাশ করিনি, বুঝতে পারছ? মানুষের রসনায় বড় ধার, বড় বিষ—সমালোচনার আঘাত বড় তীব্র। আমাদের এ সম্বন্ধ—আমি যে তাঁকে ভগিনী, কন্যা, মাতার স্থানে বসাতে পেরেছিলুম, তা কেউ বিশ্বাস করতে পারত না। তরুণী সুন্দরী ও চিরকুমার আমি—কেনই বা মানুষ তার সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের বিচার করবে না? তাই কোন লোকের কাছে তাঁকে প্রকাশ হ'তে দেইনি। কিন্তু তবু—"

সুকুমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কর, ভাই!"

স্নিগ্ধ মধুর হাস্যে গিরিজা বলিল, "এই কয় বছর ধ'রে আমার সঙ্কল্পমত মা ও তাঁর মর্ম্মরমূর্ত্তি নিজের হাতে সঙ্গোপনে এখানে গ'ড়ে তুলছিলাম। গত কল্য তাঁর মূর্ত্তি শেষ হয়ে গেছে। পনের দিন আগে—সকালের ডাকে তাঁর মহাপ্রস্থানের সংবাদ পেয়েই এখানে ছুটে এসেছিলাম। ভীষণ রোগ হ'তে কোন ডাক্তারই তাঁকে আরোগ্য করতে পারেন নি। প্রফুল্ল শতদল জীবনমধ্যাহ্নে শুকিয়ে গেছে।"

গিরিজা প্রসন্ন স্থির দৃষ্টিতে মর্ম্মরক্ষোদিত মূর্ত্তি-যুগলের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুকুমার যুক্তকরে সেই মূর্ত্তি-যুগলের সমীপে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠ তখন রুদ্ধপ্রায়।

গিরিজা বলিল, "আমার নিবেদিত প্রেম, বোধ হয়, তাঁর চরণতলে পৌঁছেছিল। কর্ম্মপ্রবাহের অন্তরাল হ'তে একটা

আহ্বানধ্বনি সর্ব্বদা শুনতে পাচ্ছিলাম। আজ মা'র পাশে—আমার চিরারাধ্যা জননীর পাশে, এই কুমারীকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমার প্রাণের একটা প্রবল সাধ বোধ হয় কতকটা মেটাতে পেরেছি।"

সুকুমার বন্ধুর পার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া স্নেহোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম ব'লে আমাকে ক্ষমা কর, ভাই! কেন তুমি বিয়ে করতে চাও নি, আজ বুঝতে পাচ্ছি।"

"তিনি বলেছিলেন, বিয়ে না হলেও ভালবাসা একবারই হয়। সেই এক ভালবাসার ঢেউ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এখন বুঝতে পাচ্ছি, বৈষ্ণব কবির কথিত প্রেম জিনিষটা কত বড়, কত মহান্, কি পবিত্র! জানি নে, জীবনে মহাপ্রেমের আহ্বানে সত্যি সত্যি সাড়া দিতে পারব কি না; তবে আমার বাবা ও মা'র জন্মস্থানে—এই পবিত্র তীর্থে মাঝে মাঝে মন দুর্ব্বল হয়ে পড়লে, ছুটে এসে শক্তি সঞ্চয় ক'রে যাব। তাই এখানে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি।"

সুকুমার বলিল, "তোমার বাবার ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হবে। তিনি বলেছিলেন—"

বাধা দিয়া গিরিজা বলিল, "যদি তা পারি, তখন—তখনই বাবার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করবার সময় হবে। তিনি আমার কি ছিলেন, তুমি তা জান, সুকু।"

মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া গিরিজা নিমীলিতনেত্রে কি ধ্যান করিতে লাগিল। তাহার নয়ন বহিয়া দর্ দর্ ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। সুকুমারের নয়নও শুষ্ক রহিল না।

যে মহাপ্রেমের আকুল-করা আহ্বান সমগ্র বিশ্বে অনুরণিত হইতেছে, গিরিজাপ্রসন্নের হৃদয়ে কি সত্যই তাহার উদাত্ত সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

পার্ব্বতী

চায় নাকো যে, সেই ভিখারী,
দিতে কেবল তারেই পারি।
আমি পাষাণ-রাজকুমারী,
নিঠুর বিরচন;
তার কোথায় আগা কোথায় গোড়া,
কোথায় যে সে সৃষ্টিছাড়া,
নাইক সাড়া, ঘুরে ঘুরে
ক্লান্ত দু'চরণ।

যে ভিখারী চায় না নিতে,
আমার তনু মন,
করি তারেই সমর্পণ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী

কবিরা মানুষকে লইয়া যতই ব্যস্ত থাকুন, পাখীকে একেবারেই বাদ দিতে পারেন নাই। বহু পূর্ব্বে কোনও দার্শনিক পণ্ডিত না কি বলিয়াছিলেন, মানুষের আসল আলোচ্য বিষয় মানুষ; —তাই বলিয়া তিনি এমন কথা বলেন নাই যে, বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিয়া শুধু মানবের বিষয় চিন্তা করিলেই আমাদের জীবন সফল হইবে। আনন্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কামনা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, —বৈদিক যুগ হইতে এই কথা শুনিয়া আসিতেছি। সেই আনন্দ, সেই কাম মানব জীবনে যে চরিতার্থতা লাভ করে, তাহার আলোচনা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, ভাস্কর, চিত্রকর নানা ছন্দে নানারূপে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যস্ত। কিন্তু আমাদেরই চারিদিকে, গৃহ-প্রাঙ্গণে, বৃক্ষ-শাখায়, সরোবর-তীরে, দিগন্ত-প্রসারিত ধান্যক্ষেত্রে, আকাশে, বাতাসে যে বিহঙ্গ-জীবন কলোচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে, তাহার "আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন-গর্জ্জন"-মুখরিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে এ দেশের কোন দার্শনিক বা শিল্পী বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নাই। প্রেম কি শুধুই নর-নারীর মধ্যে আবদ্ধ? যে কামনা, যে আনন্দ প্রেমের ভিতর দিয়া রূপে ও রসে হিল্লোলিত হইয়া উঠে, সেই হর্ষ, সেই কাম মানবেতর কোন জীবে লক্ষিত হয় না কি? যৌন-নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কি তবে কেবলমাত্র আসুরিক বল-প্রয়োগ? কোনও উদ্দাম আবেগ কি পুং-স্ত্রী মিলনের সহায়তা করে না? সঙ্গলাভেচ্ছা, সঙ্গমলিপ্সা পাখীর দেহে, রূপে ও বর্ণে ফুটিয়া উঠে না কি? কেন শুধু মানুষের কথাই ভাবিব? কবি লিখিয়াছেন

"ভালবাসিলে ভাল যারে দেখিতে হয়,
সে যেন পারে ভালবাসিতে,
মধুর হাসি তার দিক সে উপহার
মাধুরী ঝরে যার হাসিতে।
যার নবনী-সুকুমার কপোলতল
কি শোভা ধরে প্রেম লাজে গো
যাহার ঢল ঢল নয়ন-শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।"

মানুষের বেলা সুকুমার কপোলতল অনুপম শোভা ধারণ করে, নয়ন-শতদল আঁখিজলে ঢল ঢল হইয়া অপূর্ব্ব লাবণ্যের সৃষ্টি করে, মধুর হাসির উপহারে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে চরিতার্থ করে, —হয় ত ভালবাসিলে সাধারণতঃ পরস্পর পরস্পরের চোখে ভালই দেখিতে হয়। মানবেতর কোনও জীবে প্রেম কি এইভাবে রূপে ফুটিয়া উঠে না? ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন —

"In the spring the wanton Lapwing
gets himself another crest"

তিনি পুনশ্চ লিখিয়াছেন—

"In the spring a golden iris changes
on the burnished Dove
In the spring a young man's fancy
lightly turns to thoughts of love."

বসন্তের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কবির মনে স্বতঃই উদিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজ কবি যে তরুণ যুবকের কথা বলিতে গিয়া পাখীর কথাও একটু ভাবিয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া অনুধাবনযোগ্য। তবে তাঁহার উক্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসাপেক্ষ কি না, অভিজ্ঞ পক্ষিতত্ত্ববিৎ সমর্থন করিবেন কি না, তাহা অবশ্যই বিবেচ্য। Lapwing স্বভাবতঃ বসন্তাগমে wanton এই অপবাদ, বোধ হয়, কোন পক্ষিতত্ত্ববিৎ দিতে প্রস্তুত হইবেন না। ঘুঘুর iris বসন্ত-সমাগমে

রূপান্তরিত হয় কি না এবং তাহার সহিত প্রিয়-সঙ্গমের ঔৎসুক্য কত দূর জড়িত, তাহাও আমাদের কৌতূহলোদ্দীপক।

যে সঙ্গলিপ্সা আদিম জীবধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, তাহা বিহঙ্গজীবনে কি ভাবে ক্রিয়া করে, তাহার আলোচনা করিলে বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা থাকিবে না। নিসর্গ-ক্রোড়লালিত বিহঙ্গজাতির সহিত আমাদের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাহাদের জীবনযাত্রা এত রকমে আমাদের চোখে পড়ে যে, আমরা অনেকটা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি, বৎসরের কোন্ ঋতু তাহাদের প্রজননকাল। বসন্ত কি বর্ষা যে ঋতুই হউক, তাহা উপলক্ষ-মাত্র, বিহঙ্গ-প্রণয়প্রসঙ্গের স্নিগ্ধ পটভূমিকামাত্র। সে তখন আপন রসে আপনিই বিভোর হইয়া নিজের চারিদিকে যে আনন্দ, যে সৌন্দর্য্য বিকীরিত করে, তাহা এতই মনো-মুগ্ধকর যে, আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অকবিরও হৃদয় তাহাতে চঞ্চল হইয়া উঠে। কোন্ নিগূঢ় শক্তির প্রেরণায় Bower-Bird বিচিত্র কুঞ্জভবন রচিত করে? তখনও দয়িতার দর্শনলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। হয় ত মাসাধিককাল পরে প্রিয়াসমাগমে এই কুঞ্জবন অলঙ্কৃত হইবে। কিন্তু এখন হইতেই একটি প্রকাণ্ড পাদপের চারিদিকে খানিকটা স্থান গোলাকারভাবে সে পরিষ্কার করিয়া লয়; খড়, কুটা, পাতা, শিলাখণ্ড—সমস্ত সরাইয়া ফেলিয়া নিপুণভাবে লতা-পাতায় একটি নিকুঞ্জ রচিত করে। এই পত্রগুলির তলদেশ রূপার মত সাদা হওয়া চাই। কুঞ্জ রচিত হইলে পাখীটি গাছের উপর বসিয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করে। যদি কোন পাতা উড়িয়া যায়, অথবা রূপালি দিক্‌টা ওলট-পালট হইয়া যায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা পুনর্ব্বার সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে। কখনও কখনও কোথা হইতে একটা স্ত্রী-পক্ষী আসিয়া ঐ কুঞ্জভবনের অংশবিশেষের রচনায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু দেখিলে কিছুতেই মনে হয় না যে, কোনও নিগূঢ় যৌন আকর্ষণে চালিত হইয়া সে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে—পুং-পক্ষী সম্বন্ধে সে এতই উদাসীন। রচনাকার্য্য সমাপ্ত হইবার পর ঐ বৃক্ষেরই শাখান্তরে সে উপবেশন করে। কোনও প্রণয়-প্রার্থীর আগমনের প্রতীক্ষায় সে বসিয়া থাকে কি না, তাহা কিছু দিন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য না করিলে নিশ্চিত বুঝা যায় না। এ ত গেল Scenopoecte কুঞ্জ-রচয়িতার কথা। আর একটি কুঞ্জরচয়িতা, Ptilonorhynchus, প্রথমতঃ জমীটুকু পরিষ্কার করিয়া তাহার উপরে কাঠি-কুটার এক অনুচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করে। সেই বেদীর উপরে তোরণাকারে একটি সুলম্ব মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়, তাহা আগাগোড়া লতাপাতায় আবৃত। প্রবেশ-পথের সম্মুখে শুভ্র অস্থিখণ্ড, শম্বুকাবরণ ও বর্ণোজ্জ্বল পতত্রের অপরূপ সমাবেশ! মণ্ডপটি এত লম্বা যে, তাহারই মধ্যে নায়িকার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইলে নায়ককে অনেক দূর উড়িয়া যাইতে হয়। কচিৎ নৌকার মত আকারবিশিষ্ট একটি কুঞ্জগৃহ আমাদের নয়ন-পথে পতিত হয়; তাহার চারি দিকে ছোট ছোট ঝোপের এবং লতিকার একটি নৈসর্গিক প্রাচীর। ইহারও প্রবেশপথের সম্মুখে শুভ্র অস্থিখণ্ড, শম্বুকাবরণ, নীল শুষ্ক পতঙ্গ, লাল কাচখণ্ড এবং দশ পনরটি ভায়লেট ফুল সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত। কোনও ধনী গৃহস্থ এরূপ বিলাস-ভবন দয়িতার জন্য রচনা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। একটি পাখীর নাম দেওয়া হইয়াছে নিউটনের কুঞ্জবিহঙ্গ, Prionodura। ইহার অদ্ভুত কারুকার্য্য নিতান্ত স্বল্পপরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। দুইটি বড় বড় গাছকে অবলম্বন করিয়া কাঠি-কুটি, শ্বেত শৈবাল, লতা-পাতা-ফুলের সাহায্যে সে একটি প্রকাণ্ড কুঞ্জগৃহ রচিত করে। তাহা দশ বার ফুট উচ্চ এবং আট নয় ফুট প্রশস্ত, মধ্যস্থলটি ঢালু Coneএর মত। ইহার আশে-পাশে ছোট ছোট কুটীরের সমাবেশ থাকে। ইহাদের রচিত আশ্রমগুলি আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এত বড় ঘর আর কোন Bower পাখী নির্ম্মাণ করিতে পারে না। নিউগিনিতে এক জন নিসর্গতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একটি কুঞ্জভবন দেখিতে পায়েন, সৌন্দর্য্যসমাবেশে ও শিল্পনৈপুণ্যে তাহা অতুলনীয়। এই কুঞ্জটির চিত্র দেখিলে মনে হয় যে, পাখীটি শুধু আশ্রমরচয়িতা নহে, সেই আশ্রম-টিকে উদ্যানের সুষমায় মণ্ডিত করিতেও সমর্থ। মিঃ প্র্যাট্ (A. E. Pratt) ইহাকে gardener ও architect আখ্যা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ঘন-বিন্যস্ত শ্বেত শৈবাল ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া Coneএর আকারে মধ্যস্থিত স্তম্ভকে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সরু সরু সরল বৃক্ষ-শাখা বরোগার অভাব পূর্ণ করে; মিহি চুলের মত লতা-তন্তুর সাহায্যে সঞ্চিত কাঠিকুটিগুলাকে পরস্পর ঘন-সন্নিবদ্ধ

Amblyornis কুঞ্জরচয়িতার প্রমোদ-ভবন

করা হইয়াছে, প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটি কোমল শৈবালাস্তরণ,—ঘাস, শুষ্ক পত্র, উপলখণ্ডাদির চিহ্নমাত্র তথায় নাই। এই সুন্দর হরিৎ আস্তরণের উপর বিবিধ বর্ণের ফুল ও ফল এমন ভাবে সজ্জিত যে, সমস্তটা একটি সুন্দর ক্ষুদ্র উদ্যান বলিয়া মনে হয় যাহা কিছু শুষ্ক, ম্লান, প্রাণহীন, তাহার স্থান সেখানে নাই, সমস্তই সরস, সতেজ, সজীব। এই আনন্দ মুখর উদ্যান ও কুঞ্জবাটিকা ইহার উপযুক্ত বিলাসনিকেতন।

এ রহস্যময়ী নিসর্গশক্তির প্রেরণায় এই বিহঙ্গটি ঋতুবিশেষে এইরূপ শিল্প-নিপুণতার পরিচয় দেয়, তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা Argus Pheasant বিহঙ্গেও দেখিতে পাই। কেমন করিয়া সে বুঝিতে পারে যে, প্রজনন ঋতু আসন্ন, তাহার আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সহসা সে তাহার জাড্য পরিহার করিয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে খানিকটা খোলা যায়গা আবিষ্কার করে, সে স্থানটি সে সহজে পরিত্যাগ করে না, শুষ্ক পত্র ও কাঠিকুটা সরাইয়া সাত আট গজ পরিমিত ভূমি এমন সুপরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, সেই ঘন বনের মধ্যে মুক্ত আকাশ তলে সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকু একটি অভিনব ব্যাপার বলিয়া মনে হয় তখন সে অরণ্যের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাহার স্বর-লহরীতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলে,—হাউ, হাউ, হাউউ, হাউউ উউউ। যেন সে জানাইতে চাহে, তাহার হৃদয়ের বেদনা, ওগো আমি আসিয়াছি, তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি, দীর্ঘ দিনযামিনী বাসর জাগিয়া বসিয়া আছি, তুমি এস, হাউ হাউ উউ। সেই করুণ আহ্বানে দয়িতার আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু তাহাদের মিলন সহজে সংঘটিত হয় না। সহসা কোথা হইতে হয় ত আর একটা পুং-পক্ষী আসিয়া পড়ে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া হয় ত

Prionodura নবপরিণীতার বিলাসভবন

তাহাকে দয়িতা লাভ করিতে হয় দয়িতা যদি বিমুখ হয়, তবে সঙ্গীতে, নর্ত্তনে, প্রসারিত-পতত্র-কম্পনে উড্ডীন ভঙ্গীতে তাহার মনোহরণের চেষ্টা করা হয় ময়ূরীর সম্মুখে ময়ূর কেমন স্পর্দ্ধার সহিত পুচ্ছবিস্তার করে, তাহা আমাদের

দেশে অনেকের নিকট সুপরিচিত। যে কলাপ সে বিস্তার করে, তাহাকে ঠিক তাহার পুচ্ছ বলা চলে না; তাহার অধঃপৃষ্ঠপ্রচ্ছদ বিচিত্র পালকসমষ্টি মাত্র. যখন সেগুলি উর্দ্ধে উন্নত হয়, শিখী তাহার দেহটিকে পুরোভাগে মুক্ত ভাবে এরূপ প্রসারিত করে যে, উভয় পার্শ্বের ডানাগুলি তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন ইহাকে সম্মুখ হইতে দেখিলে কেবলমাত্র ইহার মস্তক ও গলদেশ দৃষ্টিগোচর হয়, দেহের অবশিষ্টাংশ এই বিচিত্র পর্দ্দায় ঢাকা পড়িয়া

পিকক্ ফেজেন্ট (Peacock Pheasant)এর প্রেমাভিনয়

যায়; শিখী মন্থর গতিতে শিখিনীর সম্মুখীন হইয়া প্রথমে পালকগুলি প্রসারিত করে; পরক্ষণে সে পিছু হটিতে হটিতে তাহার দয়িতার নিকটবর্ত্তী হয়। তাহার দেহের মত কিছু বর্ণচ্ছটা শিখিনীর দৃষ্টিগোচর হইল না। সহসা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে তাহার সম্মুখীন হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্যের স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টিতে ময়ূরীকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। কলাপীর পালকগুলির দ্রুত কম্পনে বৃক্ষপত্রের উপর বারি-বর্ষণের মত একটা শব্দ উত্থিত হয়। মস্তক অবনমিত করিয়া শিখিনীর সম্মুখে তাহার দেহসুষমার উপঢৌকন লইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে বটে, কিন্তু শিখিনী এমন ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, এমন অন্যমনস্কভাবে খাদ্য আহরণচেষ্টায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, যেন তাহার প্রেমপ্রার্থী কেহ সে অঞ্চলেই নাই

বার্ড অফ প্যারাডাইসের আনন্দোচ্ছ্বাস ঋতুবিশেষে বন-ভূমিকে মুখরিত করিয়া তুলে। অরণ্যের প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখায় পুং-পক্ষীগুলি উপবেশন করে; সংখ্যায় তাহারা ১০।২৫টি হইবে; তাহাদের নর্ত্তন ও উল্লম্ফনের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ হইতে "ওয়াক্" "ওয়াক্" ধ্বনি নিঃসৃত হয়। তখন তাহারা উভয় পার্শ্বের ডানাগুলি প্রসারিত করিয়া পুচ্ছটিকে পুরোভাগে অবনমিত করিতে করিতে দেহপার্শ্বস্থ উজ্জ্বল

স্বর্ণাভ স্বচ্ছ সূক্ষ্ম পালকগুলিকে উর্দ্ধদিকে এবং সম্মুখ-ভাগে এমনভাবে সঞ্চালিত করে যে, তাহাদের পৃষ্ঠের উপর যেন একটি আবর্ত্তিত শুভ্র জলপ্রপাত ঝরিয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। অল্পক্ষণ পরে তাহারা প্রত্যেকেই বৃক্ষ-শাখার উপর উদ্দাম গতিতে নাচিতে থাকে এবং "কা" "কা" রবে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করে। কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে স্থির থাকিয়া তাহারা চঞ্চুদ্বারা বৃক্ষশাখার ত্বক্ ঘর্ষণ করে। তখন তাহাদের পৃষ্ঠদেশ বর্ত্তুলাকারে স্ফীত; মাঝে মাঝে তাহারা পিঠের দিকে পায়ের তলায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। ক্রমশঃ এই উত্তেজনার বেগ প্রশমিত হইলে তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কয়েকটি পাখীর কিঞ্চিৎ বর্ণনা-প্রসঙ্গে যৌন-সম্পর্কের সংমামান্য আলোচনা করা হইল বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, এইরূপ ব্যবহার কেবল পক্ষিবিশেষের নিকট হইতে আশা করা যায়। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে পক্ষি-জগতে যৌনমিলনের অভিনয় সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে গুটিকতক পাখীর ভিতরে নিবদ্ধ বলিয়া মনে হইবে না। ময়ূরের নাম করা গেল, কিন্তু Peacock Pheasantএর সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারা তাহার বর্ত্তুল দেহস্ফীতি, তাহার ভূ-সংলগ্ন দেহাবয়বের উপর বিচিত্র পক্ষবিস্তার ও পুচ্ছ উন্নমন দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ডুবুরীর (Great-crested Grebe) প্রেমালাপ-কাহিনী অধ্যাপক জুলিয়ান হক্সলী সরসভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাহার কম্পন, স্পন্দন, নর্ত্তন, অকস্মাৎ জলমধ্যে নিমজ্জন, চঞ্চুপুটে জলজ কিসলয় লইয়া উপঢৌকন দান,—এই সমস্ত বিচিত্র ভঙ্গী ও অনুষ্ঠান যেন নায়ক-নায়িকার হৃদয়কে অচ্ছেদ্য সূত্রে নিবদ্ধ করে, ইহাই অধ্যাপক হক্সলীর সুচিন্তিত মন্তব্য।
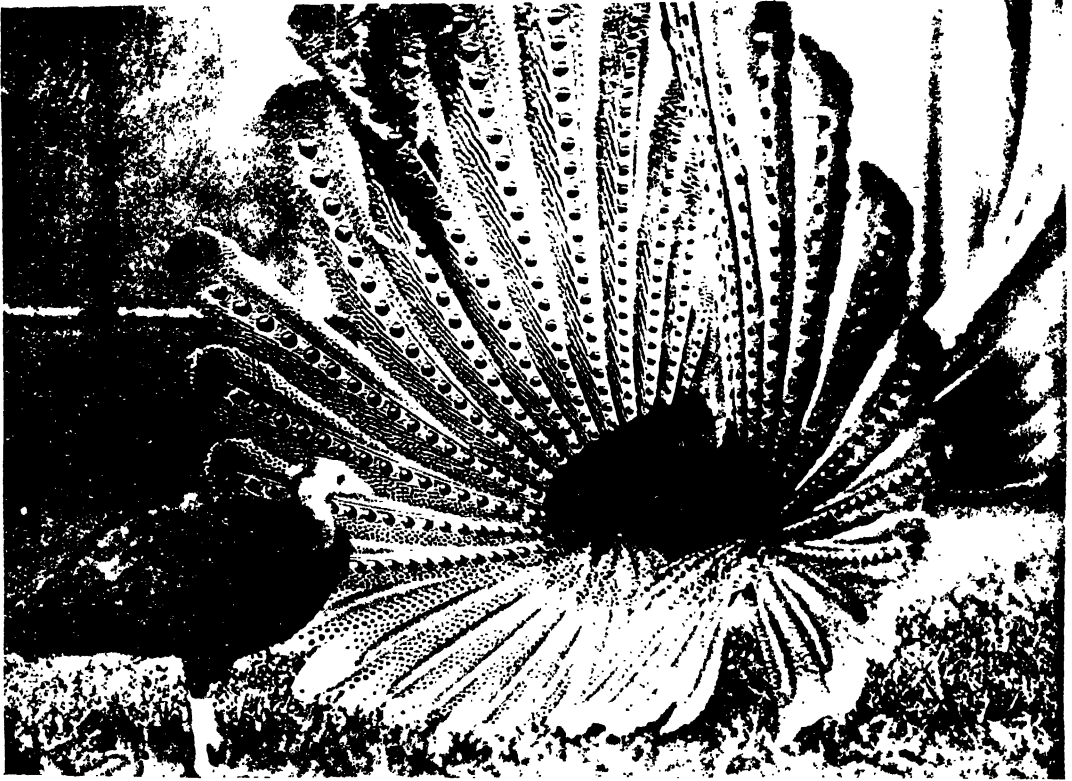
আর্গস্ ফেজেণ্ট (Argus Pheasant)এর প্রেমলীলা

মানুষের পক্ষে এই অপূর্ব্ব বিহঙ্গ-কাহিনী প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুসরণ করা একান্ত কঠিন নহে। যে কেবলমাত্র নাগরিক, বিষয়াসক্ত, সমাজের কৃত্রিম পরিবেষ্টনের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, প্রকৃতির ক্রোড়

হইতে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহার পক্ষে এই কাহিনী হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। কিন্তু বাঙ্গালার পল্লী-সন্তানের কাছে ইহা বিশেষ অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। কবির "one touch of Nature makes the whole world kin" উক্তিটির প্রকৃতি-তত্ত্বের দিক হইতে যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, তাহা অনুধাবনযোগ্য। পক্ষি-জীবন নিতান্ত হেয় নহে, তাহার আনন্দ, তাহার ক্রোধ, তাহার গৃহস্থালী, তাহার প্রসাধনচেষ্টা, তাহার বেশভূষা, তাহার বিলাসবিভ্রম, তাহার নিপুণ শিল্প, তাহার সঙ্গীত, তাহার প্রেমিক হৃদয় তাহাকে মানুষের অত্যন্ত কাছে টানিয়া আনে। তাহাদের চালচলন, অঙ্গভঙ্গী, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বুঝিতে কষ্ট হইবে কেন? প্রেমের রসে বিভোর হইয়া সে যখন স্বীয় রূপে ও শব্দে আরণ্য প্রকৃতিকে চঞ্চল করিয়া তুলে, সেই চাঞ্চল্যের ঈষৎ স্পন্দন যে আমাদের হৃদয়েও অনুভূত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। মানুষকে একেবারে সৃষ্টিছাড়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। যদিও তাহার অসংখ্য সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা তাহাকে নৈসর্গিক জীবন-রেখা হইতে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে, তথাপি যে সূক্ষ্মসূত্রে

বার্ড অফ প্যারাডাইস

সে জীব-জগতের সহিত গ্রথিত, তাহাতে বিহঙ্গের প্রেমানন্দে বিচিত্র কম্পন তাহার হৃদয়েও সঞ্চারিত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। কামের প্রাবল্য, অসংযত উদ্দাম চিত্তবৃত্তি যতই নীতিশাস্ত্র-বিগর্হিত হউক না কেন, উহা হইতেই জীবনের রেখাপাতের আরম্ভ, জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে উহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না,—সমগ্র জীব-জগতের ইতিহাস এই মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পাখীর এই প্রমোদ-গৃহ রচনার পশ্চাতে আমরা এই বিচিত্র সূত্রটির সন্ধান পাই। এত প্রাণ, এত গান, এত আনন্দোচ্ছ্বাস, এমন নবীন বর্ণচ্ছটা, এমন সৌন্দর্য্যসমাবেশ, ইহাদের কোনটাই একেবারে অর্থহীন নহে। পুং-পক্ষীর এই হাব-ভাব-বিলাস, পতত্রের বর্ণচ্ছটায় এই নবীন গৌণ লক্ষণ-প্রকাশ (Secondary Sexual characters), হরিণের শিং, সিংহের কেশর, শিখীর কলাপ পুং-স্ত্রী-সম্মিলনে যে দৌত্যের কার্য্য করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুতরাং পাখীর প্রমোদ-ভবন আলোচনা করিতে বসিয়া তাহার দেহগত গৌণ লক্ষণগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বারংবার এই প্রশ্ন উত্থিত হয়,—

কেন এই গৌণ লক্ষণের প্রকাশ? একটা জাতি বা বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রকৃতির উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে এই লক্ষণগুলি সহায়ক, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও স্ত্রী-পুং-মিলন ব্যাপারটিকে এমন ভাবে রূপে ও রসে মণ্ডিত করা হইল কেন? এই "কেন"র উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ নহে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য যাহাই হউক, পুং-পক্ষী বংশরক্ষার জন্য প্রজননব্যাপারে আদৌ লিপ্ত হয় না, কামের উত্তেজনা তাহাকে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্ত্রীলাভের দিকে প্রধাবিত করে। ডারুইন্ ইহার মধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন পুং-স্ত্রী-সম্মিলন ঘটাইতে পারে না; আর একটা শক্তির খেলা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, পণ্ডিতগণ তাহার যৌন-নির্ব্বাচন আখ্যা দিয়াছেন। ঐ যে গৌণ লক্ষণের উল্লেখ করা গেল, উহার কতটুকু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনসঞ্জাত, কতটুকুই বা যৌন-নির্ব্বাচন হইতে সম্ভূত, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে এখনও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। উদ্‌ভ্রান্ত পুং-পক্ষীর দেহান্তর্গত কয়েকটি প্রণালীবিহীন গ্রন্থির মধ্যে এক প্রকার রস সঞ্চিত হয়, পণ্ডিতরা তাহার নাম দিয়াছেন হর্ম্মোণ (Hormones)। এই রসসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে কামের উদ্রেক এবং তাহারই ফলে স্ত্রী-পক্ষীর সম্মুখে হাব-ভাব প্রকাশ, বিচিত্র পক্ষবিস্তার, নর্ত্তন, সঙ্গীতোচ্ছ্বাস, পালকের মর্ম্মরধ্বনি, চঞ্চুপুটে উপঢৌকনের আদান-প্রদান ব্যাপারে তাহার সমস্ত শক্তিনিয়োগ। অথচ স্ত্রী-পক্ষীকে সে সহজে বশ করিতে পারে না। পুরুষপরম্পরাগত এইরূপ চেষ্টার ফলে না কি পুং-পক্ষীর পতত্রে নবীন বর্ণচ্ছটা দেখা দেয়। মিঃ হাওয়ার্ড (H. Eliot Howard) এইরূপ মন্তব্য বৈজ্ঞানিক হিসাবে সমীচীন মনে না করিলেও পুং-পক্ষীর এই গৌণলক্ষণ প্রকাশের অন্য কোন হেতু সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলিয়া এখনও মনে করা যায় না। মিঃ হাওয়ার্ড বলেন—পাখীর হাবভাবভঙ্গী, নায়িকার সম্মুখে রূপের গৌরব ফুটিয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহা হইতে তাহার দেহে বর্ণবৈচিত্র্য সংঘটিত হয়, ইহা সপ্রমাণ করা কঠিন। যে কয়েকটি পাখী লইয়া তিনি বিশেষভাবে নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহাদের বিলাসবিভ্রমে, হাবভাবে, রূপের গৌরবে কিছুমাত্র ন্যূনতা লক্ষিত হয় না; অথচ আজ পর্য্যন্ত পুং-পক্ষীর পতত্রে কোনও নূতন বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিল না। এই উক্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে, মিঃ হাওয়ার্ড কেবলমাত্র Warbler বংশের কয়েকটি পাখী লইয়া গবেষণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সামান্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যদি বিচিত্র বর্ণস্ফুরণের আভাস না পাওয়া গিয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। ব্যাপক-তর ভূয়োদর্শনের ফলে অন্যান্য পণ্ডিতরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ইহার দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইতেছে না। দীপ্তোজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট পুং-পক্ষীর সহিত আভাহীনা বিবর্ণা স্ত্রী-পক্ষীর পুনঃপুনঃ মিলনের ফলে যে কস্মিন্‌কালেও উজ্জ্বলতর বর্ণবিশিষ্ট পুং-পক্ষীর উদ্ভব হইতে পারে না, মিঃ হাওয়ার্ড তাহা কেমন করিয়া জানিলেন? বস্তুগত্যা ফেজাণ্ট (Pheasant), ময়ূর, বার্ড অফ প্যারাডাইস্ (Bird of Paradise) বিহঙ্গে বর্ণোজ্জ্বলতার বৃদ্ধি পুং-সন্তানে সংঘটিত হইয়াছে। মিঃ হাওয়ার্ড একটু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। হীনবর্ণা স্ত্রী সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লয়, ইহাই যৌনসম্মিলনের গোড়ার কথা; যদি এই নির্ব্বাচনব্যাপার একটু অন্যপ্রকার না হয়, অর্থাৎ স্ত্রীটিও যদি উজ্জ্বলবর্ণা না হয়, তাহা হইলে এরূপ মিলনের ফলে বর্ণের উজ্জ্বলতা কোনও সন্তানে সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই মিঃ হাওয়ার্ডের ধারণা। অর্থাৎ তিনি বুঝাইতে চাহেন যে, যৌননির্ব্বাচন শক্তি এই হিসাবে পঙ্গু। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শিখী ও বার্ড অফ প্যারা-ডাইস মিঃ হাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে এবং সে সাক্ষ্য কোনও বৈজ্ঞানিক জীবতত্ত্ব অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। এমন কি, ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত প্রবল পুং-পক্ষী দুর্ব্বলা স্ত্রীতে উপগত হইলে পুং-সন্তানেরই স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব পুং-সন্তান লইয়াই প্রকৃতির এই লীলাখেলা। মিঃ হাওয়ার্ডের নিজস্ব একটি থিওরি আছে। জননী-জঠরে ভ্রূণাবস্থায় ভবিষ্যৎ পুং-সন্তানের পতত্রে বর্ণচ্ছটার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। ইহার স্বপক্ষে জোর করিয়া বিশেষ কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ তিনি যখন বলেন যে, জননীর প্রভাবে ভ্রূণের এই পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, জননী কেমন করিয়া ভ্রূণের পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব উপলব্ধি করিতে পারে? আর তাহাই যদি না পারে, তবে পুং-স্ত্রী উভয় সন্তানের দেহে একই প্রকার জননীপ্রভাব

হইবে না কেন? অর্থাৎ একই প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হইবে না কেন?

তাই আধুনিক পণ্ডিতগণ একেবারে বীজকোষে গিয়া সন্ধান লইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, বীজের ধর্ম্ম অনুধাবন করিলে এই রহস্যের কিছু কিনারা হইতে পারে। পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে সেইখানে, সেই কললে বা Germ plasm এ। সেই পরিবর্ত্তন বাহিরে ফুটিয়া উঠে, গৌণ লক্ষণগুলিতে (Secondry sexual characters) যদি পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সম্পূর্ণ অনুকূল হয়। এই যে বিকাশ, ইহাও সম্ভাবিত হইত না, যদি আমাদের সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রণালীবিহীন গ্রন্থি (Ductless glands) মধ্যে হর্ম্মোণ রসসঞ্চার না হইত। ঐ রসই দেহের বর্ণে ও গঠনে প্রধান সহায়।

বিহগ-বিহগী-মিলনব্যাপারে নৈসর্গিক নির্ব্বাচনের ও যৌন-নির্ব্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া বোধ হয় আর কোনরূপ তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন হইতেছে না। যে গৌণ লক্ষণগুলি লইয়া প্রধানতঃ এই সকল আলোচনা করা হয়, সেগুলি যে যৌন-নির্ব্বাচন-সম্ভূত নহে, যৌন-নির্ব্বাচনের সহচরমাত্র, ইহাই অনেকটা সপ্রমাণিত হইতেছে। আসল জিনিষ ঐ কলল বা germ plasm; দেহগত লক্ষণগুলি তাহারই বহিঃপ্রকাশ। সেখানে যখন পরিবর্ত্তন আরব্ধ হয়, তখন যৌন-নির্ব্বাচনের সূত্রপাতও হয় নাই। যখন সূত্রপাত হইল, তখন লক্ষণগুলিও ফুটিয়া উঠিল। তাই মিঃ পাইক্রাফ্ট বলিতেছেন, "Such ornamental features then are the concomitants not the results of sexual selection.

শ্রীসত্যচরণ লাহা

পদের গরম

লাট সাহেব যে, আমার কথা
শুন্‌তে তাকেও হয়,
আইন দেখাও তুমি—
তুমি কে গো মহাশয়!

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

চন্দ্রকেতুর গড়

চন্দ্রকেতুর গড়—প্রাকার ও পরিখা

বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণ ধার জলময় ও বনময় ছিল এবং অতি অল্পকাল পূর্ব্বে মানবের বাসভূমি হইয়াছিল, ইহাই ভূ-তত্ত্ব-বিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত। ভূ-তত্ত্ববিদ্ লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন, শতাব্দ বা সহস্রাব্দ তাঁহার নজরে আইসে না। ভূ-তত্ত্ববিদ্ যে স্থানে মেদিনীর ইতিহাস শেষ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক সেই স্থান হইতেই মানবজাতির ইতিহাস আরম্ভ করিয়া থাকেন, সুতরাং ভূ-তত্ত্ববিদের মতে যে কাল অত্যন্ত আধুনিক, ইতিহাসের তাহাই প্রাচীনতম যুগ। বাঙ্গালার ব-দ্বীপ ভূ-তত্ত্ববিদ্ নূতন বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকটে তাহা অতি পুরাতন। এই ব-দ্বীপের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ, উত্তরে বর্ত্তমান নূতন পদ্মা এবং পুরাতন পদ্মা, পশ্চিমে ভাগীরথী ও সরস্বতী। ব-দ্বীপে মানুষের বাস কত দিন, তাহা বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ রাজমহল ও সাঁওতাল পরগণার পার্ব্বত্য-প্রদেশে মানুষের বসতি হইবার হাজার হাজার বৎসর পরে নদীর পলিমাটী জমিয়া ব-দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ব-দ্বীপে মানুষের বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও নোয়াখালি জিলাগুলি এই ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ মনে করেন যে, পাবনা ও বগুড়া জিলা করতোয়ার গতি পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এই ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব-দ্বীপের মধ্যে যতগুলি পুরাতন স্থান আছে, সে সকলের মধ্যে চব্বিশ পরগণা জিলার বসিরহাটের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রকেতুর গড় সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়াই অনুমান হয়। মুর্শিদাবাদের মহীপাল ও রাঙ্গামাটী; নদীয়ার বল্লাল দীঘি; হুগলীর সপ্তগ্রাম ও মহানাদ; যশোহরের ভরতভায়না; ঢাকার সাভার, ধামরাই, রামপাল ও সোনারঙ্গ প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের তুলনায় চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতুর গড় অতি প্রাচীন স্থান। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভূ-তত্ত্ব বিভাগের চিত্রকর নৃপেন্দ্রনাথ বসু আমাকে সর্ব্বপ্রথম চন্দ্রকেতুর গড়ের অস্তিত্বের কথা জানাইয়াছিলেন এবং ঐ বৎসর আমি আমার পার্শী শিক্ষক মৌলবী খয়র-উল্-আনাম্ ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্তের সহিত চন্দ্রকেতুর গড়

দেখিতে গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে বারাসত-বসিরহাট রেলে অতি সহজেই চন্দ্রকেতুর গড়ে যাওয়া যায়। বেড়াচাঁপা ষ্টেশনে নামিয়া এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে যাইলেই চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পৌঁছান যায়। দুই একটি পুরাতন পুষ্করিণী এবং কতকগুলি মাটীর ঢিবি ব্যতীত চন্দ্রকেতুর গড়ে দেখিবার জিনিষ কিছুই নাই। কিন্তু স্থানীয় লোকের নিকট হইতে নৃপেন্দ্রনাথ বসু যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকল অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ও পুরাতন।

যায়। সিংহদ্বারের ধ্বংসাবশেষের নিকট হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছোট বড় ঢিবি দেখিলেই অনুমিত হয় যে, চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষ বহুদূর বিস্তৃত ছিল। বেড়াচাঁপা ও বসিরহাট অঞ্চলের অধিবাসিগণ রাজা চন্দ্রকেতু ও তাঁহার ধ্বংস সম্বন্ধে যে সমস্ত অলৌকিক কাহিনী বলিয়া থাকেন, সে সকল একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যতদূর স্মরণ হয়, চন্দ্রকেতুর কাহিনী কোন না কোন মাসিক-পত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। গড়ের অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা "ধনপোতা" নামে পরিচিত। প্রবাদ,

চন্দ্রকেতুর গড়—ধনপোতা

যে স্থানটি এখন চন্দ্রকেতুর গড় বলিয়া পরিচিত, তাহা দূর হইতে দেখিলে একটি পুরাতন পুষ্করিণীর পাড় বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু নিকটে যাইলে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহা যে একটি অতি পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাচীন দুর্গ বা নগরের প্রাকার এক অংশে মহাকায় অশ্বত্থ ও বটে আচ্ছন্ন। এই অংশে এক স্থানে দুর্গের প্রধান বা সিংহদ্বারের চিহ্ন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহার নিকটেই অনেকটা উচ্চ ভূমি আছে। নিকটে যাইয়া দেখিলে তাহা কোনও প্রাচীন প্রাসাদ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বুঝিতে পারা

মুসলমানদিগের আক্রমণের সময়ে চন্দ্রকেতু এই স্থানে তাঁহার ধনরত্ন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। দীর্ঘিকাটি এখন ভরিয়া আসিয়াছে এবং পরিখার ন্যায় ইহার গর্ভেও আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা স্থানে লোক নানাবিধ পুরাবস্তু পাইয়া থাকে। বেড়াচাঁপা ষ্টেশনের নিকটে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একটি চাউল ছাঁটিবার অথবা পাট বাঁধিবার কলে তিনটি অতি পুরাতন নিদর্শন দেখিয়া আসিয়াছিলাম; প্রথমটি—একটি চতুষ্পদ পাতরের চৌকী। বিহারে ও মধ্যপ্রদেশের এই জাতীয় পাতরের চৌকীর নাম "গোরেয়া।" নালন্দ রাজগৃহ হইতে

তক্ষশিলা পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন স্থানে খননকালে এই জাতীয় "গোরেয়া" আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহামের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কার্য্যবিবরণীতে এই জাতীয় "গোরেয়ার" বিবরণ নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সার জন্ মার্শল এলাহাবাদ জিলায় "ভিটা" নামক স্থান খননকালে যে সমস্ত "গোরেয়া" আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। চন্দ্রকেতুর গড় ব্যতীত বাঙ্গালাদেশের অন্য কোনও স্থানে "গোরেয়া" আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। ছবিতে "গোরেয়ার" উপরে যে ছোট মূর্ত্তিটি আছে, তাহা অত্যন্ত পুরাতন। এই জাতীয় মূর্ত্তিও বাঙ্গালাদেশের আর কোন স্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা মৃন্ময়ী "মাতৃ-মূর্ত্তি।"। কৌশাম্বী, সঙ্কাশ্য, কান্যকুব্জ প্রভৃতি যুক্ত-প্রদেশের প্রাচীন স্থানে এই জাতীয় অনেক মৃন্ময়ী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌর চিত্রশালায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই জাতীয় মূর্ত্তি ভূমধ্যসাগর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত মাতৃমূর্ত্তি-রূপে পূজিত হইত। মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায় এই জাতীয় প্রাচীনতম মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। "গোরেয়ার" দক্ষিণদিকে যে কাল পাতরের থামটি দেখা যাইতেছে, তাহা বহুমূল্য Black chlorite নির্ম্মিত একটি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত স্তম্ভটি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, উহা Black chlorite। স্তম্ভটিতে সুন্দর পালিশ আছে এবং এই পালিশ দেখিতে অশোকের স্তম্ভগুলির পালিশের মত। নৃপেন্দ্রনাথ বসু চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাবস্তু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, ১৩১৩ অথবা ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত অনেকগুলি পুরাবস্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্য খরিদ করা হইয়াছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার আমি যে তালিকা রচনা করিয়াছিলাম, তাহাতে এই সমস্ত পুরাবস্তুর বর্ণনা আছে—(Descriptive List of Sculpture and Coins in the Museam of the Bangiya Sahitya Parishad ইহার মধ্যে একটি রূপার পাত্রের টুক্‌রা, একটি তামার পাত্রের টুক্‌রা ও একটি শীল-মোহর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাচীন। শীল মোহরটি ছোট ও বহুমূল্য,হরিদ্বর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত একটি মৃৎখণ্ডে (Terracotta plaque) একত্র বদ্ধ শঙ্খগুচ্ছ ছিল। মৃন্ময় দুইটি শঙ্কু (spindle whorl) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটি নিকট-বর্ত্তী গ্রামের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ পরিষদে উপহার দিয়াছিলেন এবং অপরটি আমার শিক্ষক মৌলবী শ্রীযুক্ত খয়র-উল-আনাম আমাদের সঙ্গে চন্দ্রকেতুর গড়ে বেড়াইতে যাইয়া কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে চন্দ্রকেতুর গড়ে সংগৃহীত এই সকল পুরাবস্তু সাহিত্য-পরিষদে ছিল। কিন্তু সেগুলি এখন পরিষদের চিত্রশালায় আছে কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩২৯ বঙ্গাব্দে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পরিষদের চিত্রশালার যে নূতন তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,
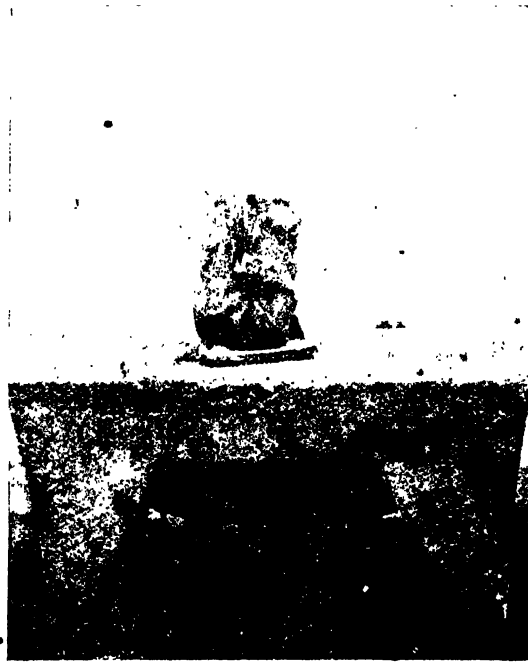
গোরেয়া, মাতৃমূর্ত্তি ও মর্ম্মরস্তম্ভ

তাহাতে এই চন্দ্রকেতুর গড়ের ঐ সকল পুরাবস্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না (Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya-Parishad, Calcutta, 1922)।

চন্দ্রকেতুর গড়ের যে সমস্ত অতি প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, স্থানটি ভারতবর্ষের অতি পুরাতন স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহার নিকটে দুই স্থানে মুসলমানী আমলের ইমারতে হিন্দু আমলের যে সমস্ত মাল-মাসলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ এই চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত। চন্দ্রকেতুর গড় বা বেড়াচাপা হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত হাড়োয়া গ্রামে পীর গোরাচাঁদের যে দরগা আছে, শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে হিন্দু মন্দিরের মাল-মসলা আছে। আমি নিজে পীর গোরাচাঁদের দরগা দেখি নাই, সুতরাং তাহার ছবি দিতে পারিলাম না। কিন্তু চন্দ্রকেতুর গড়ের নিকটবর্ত্তী বসিরহাটে শালিক বা শাহী মসজেদে হিন্দু মন্দিরের মাল-মসলা অনেক আছে। বসিরহাটে অনেক সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশজাত মুসলমানের বাস আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ১৯০৮ কিংবা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার জজ আদালতে চাকরী করিতেন। তাঁহারই অনুরোধে আমি ও আমার শিক্ষক মৌলবী খয়র উল-আনাম্ চন্দ্রকেতুর গড়ে বেড়াইতে যাইবার কিছু দিন পরে বসিরহাটে গিয়াছিলাম। সম্প্রতি 'বঙ্গবাণীতে' শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বসিরহাটের মন্দির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। রায় চৌধুরী মহাশয় যদি আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালার মুসলমানদিগের রাজত্বে ক্রমবিস্তারের মধ্যে বসিরহাটের এই মসজেদ দ্বিতীয় স্তরের। মুসলমানী আমলের মসজেদগুলিতে যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি সর্ব্ব প্রাচীন—(১) হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই উপর মসজেদ নির্ম্মাণ, যথা কাশী-রাজঘাটের মসজেদ, দিল্লীর কুবৎ-উল্-ইসলাম মসজেদ, আজমীরের আড়াই-দিন্‌কী ঝোপড়া মসজেদ।

বসিরহাটের শাহী মসজেদের অভ্যন্তর—হিন্দু মন্দিরের স্তম্ভ

(২) মসজেদ নির্ম্মাণকালে নিকটের সমস্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহার মাল-মসলা দিয়া নূতন মসজেদ তৈয়ার করা—যথা ত্রিবেণীতে জাফরখাঁ গাজীর মসজেদ,

খম্বায়তে (Camboy) জামী মসজেদ, দিল্লীর আলাই-দরওয়াজা।

(৩) মাল-মসলা আবশ্যক না থাকিলেও হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবমূর্ত্তি মসজেদে আনিয়া গাঁথিয়া রাখা। যথা—বড় পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজেদ, বিজাপুরের জামী মসজেদ ইত্যাদি।

রায় চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, বসিরহাটের মসজেদেও একটি পাতরের চৌকাঠ ও দুইটি পাতরের থাম কোনও হিন্দুর মন্দির হইতে আনিয়া ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। থামের মাথাগুলিতে এখনও প্রত্যেক বাহুতে এক একটি গণের মূর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বসিরহাটের ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানরা তাঁহাদিগের এই প্রাচীন উপাসনাগারে পৌত্তলিকতার চিহ্ন যথাসম্ভব ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং যে কয়টি গণের মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায়, তাহাতে চূণ লেপিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বসিরহাটে এই প্রাচীন মসজেদের যে ফটো লইয়াছিলাম, তাহা এত দিন পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। চন্দ্রকেতুর গড়ের

চন্দ্রকেতুর গড়—প্রাসাদের (?) ধ্বংসাবশেষ

করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাকী ইমারতটা সমস্ত ইষ্টক-নির্ম্মিত। রামপালের নিকটবর্ত্তী কাজী কশকগ্রামে বাবা আদমের প্রসিদ্ধ মসজেদ এইরূপে নির্ম্মিত। বসিরহাটে এই মসজেদ এখন যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, সে স্থানে সম্ভবতঃ কোনও হিন্দুর মন্দির ছিল না, অন্য স্থান হইতে হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া পাতরের চৌকাঠ, পাতরের থাম দুইটি ও তাহার মাথাল (Capital) আনা হইয়াছিল। পাতরের মসলায় কুলায় নাই বলিয়া নির্ম্মাতাকে বাধ্য হইয়া প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক ব্যবহার বিবরণ উপলক্ষ করিয়া তাহা প্রকাশিত হইল। শাহী মসজেদের খিলানের উপরে যে প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মাণের তারিখ দেওয়া আছে, তাহা একটি দেবমূর্ত্তি। তখনকার রীতি অনুসারে দেবমূর্ত্তি বিকলাঙ্গ করিয়া তাহার পশ্চাতে কোরাণের একটি শ্লোক ফাঁদিয়া নির্ম্মাণের তারিখজ্ঞাপক লিপি লিখিয়া রাখা হইত। এইরূপ বিকলাঙ্গ দেবমূর্ত্তির পশ্চাতে আরবী শিলালিপি হুগলী জিলার ত্রিবেণী ও ছোট পাণ্ডুয়ার মসজেদে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বসিরহাটের মসজেদের নাম যাহাই হউক, ইহা

চন্দ্রকেতুর গড়—অপেক্ষাকৃত নীচ ঢিপি

বসিরহাটের শাহী মসজেদ—বাহির হইতে

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটি পুরাতন মসজেদ এবং ইহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় এই যে, মসজেদের অধিকারীরা যখন ইহা মেরামত করাইয়াছিলেন, তখন বুদ্ধির দোষে অথবা শিক্ষার অভাবে চূণ ও সিমেণ্ট লেপিয়া এবং ইংরাজী ফ্যাশনের দরজা-জানালা লাগাইয়া ইহার পুরাতন শিল্প-সৌষ্ঠব একেবারে বিনষ্ট করিয়াছেন।

চন্দ্রকেতুর গড় যে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই স্থান খনন করিলে বহু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে। উত্তরবঙ্গে শ্রদ্ধেয় কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির সাহায্যে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি স্থাপন করিয়া যে ভাবে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জিলায় সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐতিহাসিক সন্ধান আরম্ভ না করিলে আমাদের দেশের লুপ্ত প্রাচীন ইতিহাস সহজে উদ্ধার হইবে না।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল-বিধবার পূজা

শরতের সুপ্রকাশ, সুপ্রসন্ন নীলাকাশ,
সমুজ্জ্বল তারকার পাতি,
হাসে নিরমল চাঁদ, কি তার মোহন ছাঁদ,
জোছনায় ঢল ঢল রাতি।

সুনির্ম্মল ছায়াপথ বাহিয়া মায়ের রথ
নামিতেছে ধরণীর পানে,
তাই ত সকলে সুখে· "জয় মা জননী" মুখে
রত শক্তিরূপিণীর গানে।

ধুইবে মা পদতল তাই শত শতদল
সরসীতে উঠিছে ফুটিয়া,
তাঁর পদ পূজা তরে নীরবে শেফালি ঝ'রে
ভূমিতলে পড়িছে লুটিয়া।

কুলু কুলু নদী বয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসময়,
অবিরাম কি বা দিবা-রাতি,
তুষিতে মায়ের নেত্র হরিত শস্যের ক্ষেত্র
রয়েছে পড়িয়া বক্ষ পাতি'।

আমি পতিহীনা বালা, কি দিয়া পূজার ডালা
সাজাইব, কি আছে তেমন,
নিঙাড়ি নিঙাড়ি হিয়া, নয়নের বারি দিয়া
ধোয়াইব মায়ের চরণ॥

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মাধুর্য্য-মহিমা

ব্রজ ত্যজি', ব্রজনাথ, যা'বে চলি' মথুরায় !
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য হ'তে এত কি উজল ভায় ?
মাতৃ-স্নেহে স্নেহবতী পা'বে কি মা যশোমতী ;
শ্রীদাম সুদাম সখা- -গোষ্ঠে তব পথ চায় ?
সেথা কি তোমার বেণু শুনিয়া আসিবে ধেনু ?
পুলিনে তমালকুঞ্জে সেথা কি কোকিল গায় ?
সেথা কি যমুনাজলে নীলাকাশ ভাসি' চলে ;
মাধবীমুকুল সঙ্গে রঙ্গে খেলে মৃদু বায় ?
ব্রজ ত্যজি', ব্রজনাথ, যা'বে চলি' মথুরায় ?

ব্রজ ত্যজি', ব্রজনাথ, মথুরায় যা'বে চলি',
ব্রজগোপীপ্রেমপুষ্প নিঠুর চরণে দলি' ?
সেথা কি পিয়ালশাখে শিখী কেকারবে ডাকে ;
মধুপ-গুঞ্জন-গানে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে কলি ;
লবঙ্গ-লতিকাঘ্রাণে, লালস-বিবশ প্রাণে,
কুঞ্জে গুঞ্জি পড়ে অলি মধুপানে ঢলি' ঢলি' ;
প্রাবৃটে তমালশিরে শ্যাম মেঘ আসে ঘিরে',
নিদাঘে দিনান্তমেঘে সুধাধারা পড়ে গলি' ?
ব্রজ ত্যজি' কোথা যাবে, রাধা-শতদল অলি ?

সেথা কি শরতে, শ্যাম, রসরাসপূর্ণিমায়,
উছল যমুনা সম প্রেমস্রোত বহি' যায় ;
বাঁশরীসঙ্কেত, হরি, গোপিকার মোহ হরি'
সকল ভুলায়ে তা'রে আনে তব রাঙ্গা পায় ?
সেথা কি বিপিনমাঝে, ঝুলন-উৎসব রাজে,
রাধাসাথে শ্যাম দুলে নীপশাখে দোলনায় ;
আবির-রঞ্জিত বারি আনন্দের পিচকারী
দোলে কি অশোক শোভে ফুল্ল ফুলে রক্তকায় ?
ব্রজ ত্যজি', ব্রজনাথ, যা'বে চলি' মথুরায় !

যা'বে চলি' মথুরায় বৃন্দাবনে অবহেলি' ?
গোপিকার প্রেম, শ্যাম, চলিবে চরণে ঠেলি' ?
শুনিতে যে বাঁশীরব নিবারিয়া কলরব
যমুনা উজান বহে, সে বাঁশরী যা'বে ফেলি' !
ব্রজে র'বে অন্ধকার, গোপিকার হাহাকার ;
কালিন্দী কাঁদিয়া যা'বে স্মরি' জলে জলকেলি !
নিখিলের চিত্তচোর, ছিন্ন করি' মোহডোর- -
ব্রজ-হৃদি লয়ে যা'বে, হে নিঠুর, খেলা খেলি !
সে প্রেম কোথায় পা'বে, যা'বে যাহা অবহেলি ?

রাধা-হৃদি-বৃন্দাবনে প্রণয়-যমুনাকূলে,
দ্বিভুজ মুরলীধর বিকায়েছ বিনামূলে।
রাধা—রাধা—রাধা—রাধা, সে নামে বাঁশরী সাধা ;
সে বাঁশী কি বাজে কোথা বিনা বংশীবটমূলে ?
চলিতে যমুনাজলে পুলিনে তমালতলে
কোথা আর হেরে গোপী তোমারে সকল ভুলে',
অন্তরে বাহিরে তা'র তুমি ছাড়া নাহি আর,
ভকতি-চন্দন মাখি' পূজে তোমা প্রেমফুলে ;
রাধাপ্রেমে বাঁধা তুমি, সে কথা কি গেছ ভুলে

ব্রজরজ বিনা আর কোথা সে মাধুরী ফুটে - -
স্পর্শে যা'র ঘুচে ধন্দ মোহবন্ধ যায় টুটে ?
সে প্রণয়ে লাজ-ভয়, ও চরণে পায় লয়,
ভক্তি-অর্ঘ্য আনে গোপী তোমা তরে হৃদি-পুটে ;
সে প্রেম-যমুনা-বারি, নিখিলের দুখহারি,
ইহকাল পরকাল যা'র দুই কূলে লুটে ;
সে প্রেমে করিলে স্নান, মোহ হয় অবসান,—
তপ্ত মরু স্নিগ্ধ করি' শান্তি-উৎস-বারি ছুটে ;
ব্রজরাজ বিনা আর কোথা কি সে প্রেম ফুটে ?

ব্রজ বিনা কোথা প্রেম পা'বে আর গোপিকার—
মথুরার রাজপাট লুটায় চরণে যা'র ?
হৃদি-গোষ্ঠে, হে রাখাল, নিত্য সত্য চিরকাল
তুমি যা'র, কোথা প্রেম পা'বে সেই রাধিকার ?
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' সে প্রণয় পান করি'
তবু কি মিটেনি আশা, প্রেমতৃষা আছে আর ?
বিন্দুবারি মথুরার, মিটাবে কি তৃষা তা'র—
মিটে নাই তৃষা যা'র পান করি পারাবার ?
অকূল গোকুল-প্রেম তীর তল নাহি তা'র।

ব্রজ ত্যজি ব্রজনাথ, কোথা যা'বে মথুরায় ?
"ভুলি' যা'ব" বলিলে কি প্রেম কভু ভুলা যায় ?
সে প্রেমের মকরন্দ, গন্ধে ঘুচে মোহ-অন্ধ,
সে প্রেম তোমায় বিনা কা'রে আর শোভা পায় ?
সে প্রেম ক্ষীরোদ-সিন্ধু, বিনা তুমি পূর্ণ ইন্দু
কে তা'রে উজল করে উছলিত মহিমায় ?
নিখিলের ভালবাসা, তোমায় করিছে আশা ;
হৃদি-গোষ্ঠে তিষ্ঠ, হরি, বামে লয়ে রাধিকায়।
গোপীপ্রেমে ধন্য কর, রাখি' তব রাঙ্গা পায়।

দেবতার ভর
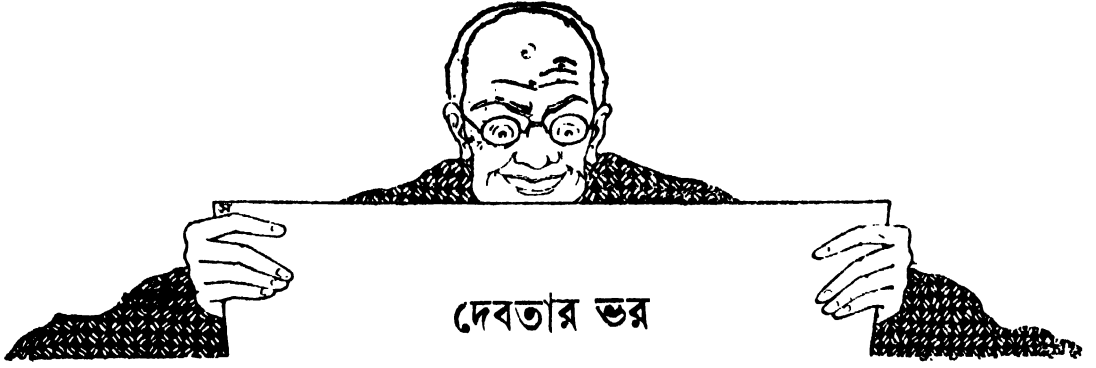
১

দেওয়ানগঞ্জের জমীদার ভবকিঙ্কর চৌধুরী কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পৈতৃক জমীদারীর আয় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, এ জন্য দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের জনসাধারণের ধারণা হইয়াছিল, যদি কিঞ্চিৎ 'গোবারস' কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যের পেটে পড়িত, অর্থাৎ ইংরাজী বিদ্যায় তাঁহার একটু দখল থাকিত, তাহা হইলে তিনি সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় বা রাজীবলোচন রায় অপেক্ষাও অধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন; এমন কি, তাঁহার জমীদারকে ডিঙ্গাইয়া সেকাল-দুর্লভ "রায় বাহাদুর" খেতাবও লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মনিবের ও সেই সঙ্গে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রজাপীড়নের এরূপ নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসন ও শোষণ দক্ষতার পরিচয় পাইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহার মনিবকে "জুলুমবাজ" জমীদার নামে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট খুসী হইয়া তাঁহাকে "স্পেশাল কনষ্টবলে"র পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনিবের আয়বৃদ্ধির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিলেও স্বকীয় স্বার্থের প্রতিও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং এই জন্যই এক শত টাকা মূল্যের দেওয়ান হইয়াও তিনি বার্ষিক ছয় হাজার টাকা মুনফার ভূ সম্পত্তি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। "বিদ্যাসাগর" বলিলে যেমন দয়ার সাগর, "কাঙ্গাল-বিধবাবন্ধু অনাথের গতি" প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝাইত, সেইরূপ "দেওয়ান" বলিলে এ অঞ্চলে কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যকেই বুঝাইত। তাঁহার বাসগ্রাম গোবিন্দপুরে এখনও তাঁহার বাসভবন "দেওয়ানবাড়ী", তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অধুনা জীর্ণ ও বিবর্ণ ভগ্নচক্র কাঠের রথ "দেওয়ানের রথ," তাঁহার সুবিস্তীর্ণ আম-কাঁঠালের বাগান "দেওয়ানের বাগান" এবং তাঁহার গৃহবিগ্রহ 'রাধামাধব' "দেওয়ানের ঠাকুর" নামে পরিচিত হইয়া অর্দ্ধশতাব্দী পরেও গ্রামবাসিগণের নিকট তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কথিত আছে, কৃষ্ণনাথ দেওয়ান ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া একবার এক জন নিষ্ঠাবান্ পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ প্রজাকে তাঁহার দেবার্চ্চনার সময়, পূজা সমাধা করিবার অবসর না দিয়াই এক জন পাইক পাঠাইয়া গলায় গামছা দিয়া জমীদারী কাছারীতে হাজির করিয়াছিলেন; ইহাতে অপমানিত মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণ উপবীত স্পর্শ করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, "তুমি নির্ব্বংশ হও, দুশ্চিকিৎস্য রোগে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তিল তিল করিয়া যেন তোমার প্রাণ-বিয়োগ হয়।"

ব্রাহ্মণের এই অভিসম্পাত সফল হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্রাদি সকলের মৃত্যুর পর দুশ্চিকিৎস্য রোগে দীর্ঘকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি "সাধনোচিত ধামে" প্রস্থান করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেওয়ানজী জীবিত অবস্থায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা দেওয়ান-পত্নী যে কয়েকটি বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদেরও কেহই জীবিত রহিল না! দেওয়ানজী মৃত্যুর পূর্ব্বে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বগৃহে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি রাধামাধবের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকরা বলিয়া থাকে, ইহাও দেওয়ানজীর একটি "চাল!" তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা।

২

দেওয়ানজীর মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী শ্যামাসুন্দরী রাধামাধবের সেবাইতরূপে জমীদারী পরিচালিত

করিতে লাগিলেন। শ্যামাসুন্দরীর বয়স এখন আশী বৎসর। বপুখানি এরূপ স্থূল যে, তিনটি পরিচারিকার সহায়তা ব্যতীত তিনি নড়িয়া বসিতে পারেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, পূর্ব্বজন্মে তিনি অহল্যা বাঈ বা মীরা বাঈ ছিলেন, শাপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালীর ঘরে তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে! ২০ বৎসর পূর্ব্বে ছানি পড়িয়া তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল; আর একটি চক্ষুতেও বার্দ্ধক্য-জনিত দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ তিনি প্রায় কিছুই দেখিতে পায়েন না। তাঁহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিতে পারিলে উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হইবে বুঝিয়া তাঁহার নায়েব জহরলাল নাগের পরামর্শে তাহার অনুগৃহীতা ও তাঁহার পেয়ারের পরিচারিকা খুদী ঘোষাণী প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষুতে এক প্রকার আরোক দুই এক ফোঁটা ঢালিয়া দিয়া, পাখার বাতাসে তাঁহার সন্তাপ হরণের চেষ্টা করে। সুতরাং তাঁহার নিঃশেষিতপ্রায় দৃষ্টিশক্তির পর-মায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতেছে। রাম, শিব, লক্ষ্মী, কালী এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া প্রতি মঙ্গলবারে রাত্রিকালে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবারণ করেন! ইহার ইতিহাস পরে বলিতেছি।

দেওয়ানজীর মৃত্যুর পর শ্যামাসুন্দরী স্বয়ং জমীদারীর পরিচালনভার গ্রহণ করিলেও তাঁহার স্বামীর আমলের নায়েব হারাধন চাটুয্যেকে পদচ্যুত করেন নাই; কিন্তু হারাধনের কর্ত্তৃত্বে গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুরী অনন্ত অধিকারীর উপরি আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাহারা হারাধনের বিরুদ্ধে এরূপ ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিল যে, কিছু দিনের মধ্যেই তাহার অন্ন উঠিল। হারাধনকে বরখাস্ত করিয়া পদা গাঁড়াল ও অনন্ত অধিকারীর উপর আদেশ জারী হইল,—তাহাদিগকে অবিলম্বে একটি সুদক্ষ বিশ্বাসী এবং দুর্দ্দান্ত প্রজাদের শাসনে রাখিতে পারে, এরূপ নায়েব সংগ্রহ করিয়া হুজুরে হাজির করিয়া দিতে হইবে।

অন্যান্য জমীদারের তহশীলদারী, গোমস্তাগিরী বা আমীনী করিয়া জমীদারী কার্য্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, এরূপ অনেক লোক এই "লুঠের" মহালটির প্রতি লুব্ধদৃষ্টিপাত করিলেও তাহাদের কেহই এই কুড়ি টাকার নায়েবী পদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না; কারণ, গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুরী অনন্ত অধিকারী বুঝিতে পারিল—তাহাদের কাহাকেও এই পদে নিযুক্ত করিলে উপরিলাভের পথ রুদ্ধ হইবে; তাহারা গাছেরও পাড়িবে, তলারও কুড়াইবে, কেবল আমড়ার আঁটিগুলি গোমস্তা ও মুহুরীর জন্য রাখিয়া দিবে! এ অবস্থায় গোমস্তা ও মুহুরীর সহিত "কাঁধে মেলে" এরূপ লোকের অনুসন্ধানে তাহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইল।

খুদী ঘোষাণী দেওয়ান-গিন্নীর চক্ষুতে আরোক দিতেছে

জহরলাল বহুদিন পুলিসে চাকরী করিয়াছিল; সে ফরিদসিংহ জিলায় পুলিসের হেড কনেষ্টবলের পদে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে তাহাকে চাকুরী হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। পুলিসের অনেক কর্ম্মচারীই এই কার্য্যটি করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের চাকরী যায় না; কিন্তু জহরলালের অপরাধ কিছু গুরুতর। সে পুলিস "সাহেবের" বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল।

পুলিস "সাহেবের" জন্য মুরগী ও মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া ইন্স্পেক্টরের নিকট সে তাহার মূল্যের "বিল" দিয়াছিল; সুতরাং জিলা-পুলিসের ধারণা হইয়াছিল, লোকটি অকর্ম্মণ্য। এই ঘটনার কিছু দিন পরে তাহার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়; এই জন্যই তাহার চাকরী খসিতে বিলম্ব হয় নাই।

জহরলাল গোবিন্দপুরে আসিয়া চাকরীর উমেদারীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু খুদী ঘোষাণীর প্রতিবেশীরা প্রায় প্রতিদিনই প্রত্যূষে তাহাকে খুদীর ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিত। খুদী দেওয়ান-গিন্নীর "ন্যাড়া" মাথায় তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে জহরলালকে নায়েবী দেওয়ার জন্য সুপারিস করিতে লাগিল। জহরলালও দুই এক দিন পদা গাড়াল ও অনন্ত অধিকারীকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল; তাহারা জহরলালের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল, জহরলালই দেওয়ানজীর "ষ্টেটে" নায়েবী করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। একে খুদী চাকরাণীর সুপারিস, তাহার উপর পদা গাড়াল ও অনন্ত অধিকারী যখন দেওয়ান-গিন্নীকে বলিল, জহরলাল পুলিসের ফের্ত্তা লোক, "দারোগাগিরী" করিয়া বিস্তর আসামীকে জেলে পুরিয়াছে, সে দুর্দ্দান্ত প্রজাদের উপযুক্ত মুগুর হইবে; বিশেষতঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মত তাহারও একটি চক্ষু নাই, সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র; তাহাকে নায়েবী পদে নিযুক্ত করিলে "ষ্টেটের" কায সুন্দররূপে চলিবে এবং জমীদারীর উন্নতি হইবে, দেওয়ান-গিন্নী তখন তাঁহার দরবারে জহরলালকে হাজির করিতে আদেশ করিলেন।
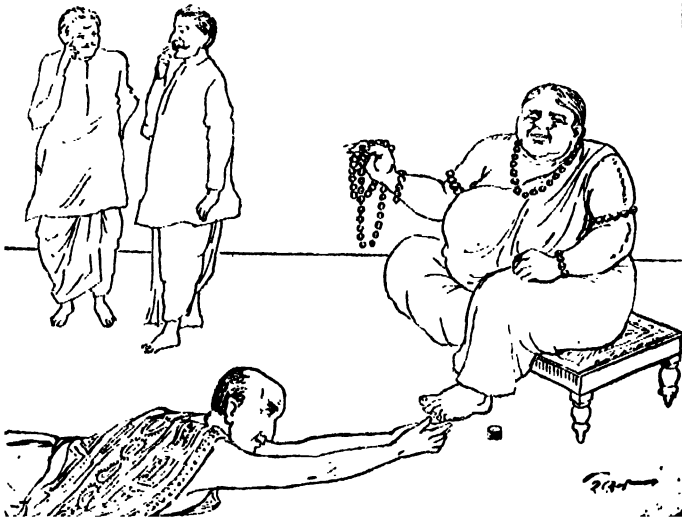
জহরলাল পরদিন অপরাহ্ণে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা জড়াইয়া, নামাবলী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়া পদা গাড়াল ও অনন্ত অধিকারীর সঙ্গে দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে দেখিল, দেওয়ান-গিন্নী একটি পাকা হেঁড়ে তাল দ্বারা আবৃত জলের জালার মত সুগুরু দেহভার একখানি সুপ্রশস্ত জলচৌকীর উপর সংস্থাপিত করিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার উভয় প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা বলায়াকারে সংরক্ষিত, বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের তাগা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ-খচিত স্বর্ণহার, পরিধানে লোহিত গরদ।

জহরলাল দেওয়ান-গিন্নীর পদপ্রান্তে লম্বা হইয়া পড়িল

জহরলাল দেওয়ান-গিন্নীর পদপ্রান্তে লম্বা হইয়া পড়িয়া, জলচৌকীর সম্মুখে পাঁচ টাকা প্রণামী দিল এবং গদ্গদ-কণ্ঠে বলিল, "কি রূপ দেখালে মা! না জানি, কোন্ পুণ্যে তোমার শ্রীচরণ দর্শন ঘটলো! মা, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শাপভ্রষ্টা, 'কাশীতে অন্নদা তুমি, কৈলাসে ভবানী।' মা অন্নপূর্ণা! এই অধম সন্তানের অন্নকষ্ট নিবারণ কর; যে ক' দিন বাঁচি, যেন তোমার 'ছিরিচরণে'র ছায়ায় বঞ্চিত না হই।"—তাহার কাণা চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি বিগলিত হইয়া সিমেণ্টের মেঝের উপর লবণাম্বুর স্রোত বহিল!

পদা গাড়াল ও অনন্ত অধিকারী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া একচক্ষু জহরলালের অভিনয়-পারিপাট্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। পদা অনন্তকে বলিল, "দাদাঠাকুর, লাগ মোশায় আমাদের চেয়েও সরেশ যাবে বোধ হচ্ছে! উনি পূবে, চাকরী করবার সময় কি কোন সখের যাত্রা-দলে 'এ্যাক্টো' করত?"

অনন্ত বলিল, "পুলিস-ফেরতা লোক ! কিছু দিন এ সরকারে চাকরী করলে ঠিক গিন্নীর হাতে খোলা দিতে পারবে। শেষে আমাদের রুটী মারা না যায় !"

পদা বলিল, না, সে ভয় নেই। কলকাঠী আমাদের হাতেই আছে ; দেখে নেবেন, দাদাঠাকুর !"

দেওয়ান-গিন্নী জহরলালের যোগ্যতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া, হাতের ঝুলিটি ললাটস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ওঠো বাবা ! তুমি এক চক্ষু দিয়ে দেখে আমাকে যতখানি চিন্‌তে পেরেছ, এ সংসারের লোক দুই চক্ষুতে দেখেও তা পারে নি, তুমি আমার জমীদারী রক্ষে করতে পারবে। তোমাকেই নায়েবীতে বহাল করা গেল।"

৩

সেই দিনই জহরলাল নাগ দেওয়ানজীর জমীদারী সেরেস্তায় নায়েবের পদে নিযুক্ত হইল। সে অল্পদিনেই দেওয়ান-গিন্নীর মহালের সুবন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। রথ, ঝুলন, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, রাস প্রভৃতি পার্ব্বণ-গুলি বেশ সমারোহেই সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। বিদ্রোহী প্রজারাও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

কিছু দিন পরে দেওয়ান-গিন্নী নায়েবকে বলিলেন, "দেখ বাবা, কাল রাত্তিরে রাধামাধব স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে বড় রাগ করছিলেন। তিনি বললেন, 'বেটী, তুই আমার জমীদারী ভোগ করছিস্, আর আমাকে একখান পচা ঘরে ফেলে রেখেছিস ! তোর লজ্জা হয় না ? তিন মাসের মধ্যে মন্দির গড়িয়ে দে, আমি মন্দিরে বাস করব।' তুমি বাবা রাজমিস্ত্রী ডাকিয়ে বাইরের উঠোনে আমার রাধামাধবের মন্দির তৈয়েরী করিয়ে দাও।"

নায়েব মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাই ত মা ! মন্দির গড়তে যে বিস্তর ইটের দরকার ; সে দিন মহামায়ার পূজোয় মবলগ টাকা খরচ করতে হয়েছে, তবিলে টাকা নেই, ইটের জোগাড় করি কি দিয়ে ?"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "ধার-কর্জ্জ ক'রে কায আরম্ভ কর, পরে কোন রকমে দেনা শোধ ক'রো। রাধা-মাধবের হুকুম ত আর অমান্যি করা যায় না।"

নায়েব বলিল, "বেশ, তাই করা যাক। রাধামাধবের হুকুম, তাঁর দেনা তিনিই শোধ করবেন।"

গ্রামের এক জন জমীদার—ভজহরি ঘোষাল একটি বৈঠকখানা নির্ম্মাণের জন্য লাখখানেক ইট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। ইটের পাঁজা অব্যবহার্য্য অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়িয়া ছিল এবং তাহার উপর কতকগুলা লাল ভেরেণ্ডা ও কালকাসিন্দে গাছ জন্মিয়া এক দল শৃগালকে আশ্রয় দান করিতেছিল। রাধামাধবের মন্দিরের জন্য এই ইট ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইল। ধর্ম্মপ্রাণ জমীদার বিনা লাভেই রাধামাধবের জন্য ইষ্টক বিক্রয়ে সম্মত হইলেন। দেওয়ান-গিন্নীর বাড়ীতে প্রত্যহ তিন গাড়ী ও নায়েবের বাড়ীতে পাঁচ গাড়ী ইট পড়িতে লাগিল। নায়েব খড়ের বাড়ীতে বাস করিত, এত দিন পরে রাধামাধব তাহাকে ইষ্টকালয় নির্ম্মা-ণের সুযোগ দান করিলেন। মন্দির-নির্ম্মাণ-খরচের খাতায় উভয় স্থানের ইট জমা হইতে লাগিল। পদা গাড়াল ও অনন্ত অধিকারী বখরায় বঞ্চিত হইয়া নায়েবের বিরুদ্ধে একটা ষড়-যন্ত্রের সূত্রপাত করিতেই নায়েব তাহাদিগকে বলিল, "একটা গোলমাল বাধিয়ে দেবতার কাযটি নষ্ট ক'র না, ভাই ; ইট-গুলা 'পড়তা দরে' আট টাকা হাজার পাওয়া গিয়েছে, এখন ইটের বাজার-দর বারো টাকা। বাজার দরেই জমাখরচ করবে, হাজার-করা ঐ চার টাকা তোমরা বখরা ক'রে নিও।" সুতরাং গৃহ-বিচ্ছেদের আর কোন কারণ রহিল না।

রাধামাধবের মন্দির-নির্ম্মাণ এবং নায়েবের গৃহ-নির্ম্মাণ একসঙ্গেই আরম্ভ হইল। কিন্তু দ্বার, জানালা, কড়ি-বরগা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নায়েব কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইল, তবে রাধামাধবের অনুগ্রহে তাহার অগাধ বিশ্বাস, সে হতাশ হইল না। অবশেষে সুযোগ বুঝিয়া এক দিন সে কর্ত্রীকে "যুড়ি দুই পাণি" নিবেদন করিল, "রাধামাধবের কৃপায় মাথা রাখবার জন্যে একখান ছোটখাট ইমারৎ আরম্ভ করেছি, কিন্তু দুয়োর-জানালার অভাবে ঘরখানা শেষ করতে পারছিনে। সে দিন কাঁঠালবাগানের জঙ্গল কাটাতে গিয়ে দেখলাম, গোটা দু'তিন কাঁঠালগাছ শুকিয়ে গিয়েছে, আপনার হুকুম পেলে সেই গাছ ক'টা কাটিয়ে থানকতক দুয়োর-জানালা বরগা-টরগা করি। এ জন্যে যদি কিছু প্রণামী দিতে হয়, তাতেও রাজী আছি। দেবতার জিনিষ, 'মাঙনা' নেওয়া উচিত হবে না, আর তা'তে পাঁচ জন দশ কথা বল্‌তেও পারে কি না !"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "বেশ ত, শুক্‌নো কাঁঠাল-গাছ ক'টা কাটিয়ে নিও; রাধামাধবের ভোগের জন্য পাঁচটা টাকা দিও, তা হ'লেই দোষটুকু কেটে যা'বে।"

দুই সপ্তাহের মধ্যে নায়েবের বাড়ীর আঙ্গিনায় ছয় সাত হাত বেড়ের পাঁচটি কাঁঠালের গুঁড়ি আসিয়া পড়িল। তাহার আগাগোড়া কাঁচা সোনার মত সার। গোকুল মিস্ত্রী (ছুতোর) সেই কাঠ দেখিয়া অতি কষ্টে লালা সংবরণ করিয়া বলিল, "নায়েব মোশাই, দেওয়ানজীর বাগান থেকে কি জবর জবর হেতেরই কাটিয়েছ! এক একটা গুঁড়ি আমি তিন কুড়ি ট্যাকায় কিন্‌তে পারি।" নায়েব মোটামোটা ডালগুলি চৌকাঠ-বরগার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট কাঠ জ্বালানী কাঠের দরে তুষ্টু সেখকে ষাট টাকায় বিক্রয় করিল। তুষ্টু জ্বালানী কাঠের গাড়ী গ্রামস্থ গৃহস্থগণের নিকট আড়াই টাকা হার মূল্যে বিক্রয় করিয়া নায়েবকে ষাট টাকা দিল ও স্বয়ং ত্রিশ টাকা লাভ করিল। রাধামাধব নায়েবের কপাট, চৌকাঠ, কড়ি-বরগার কাঠ জোগাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, করাতী ও ছুতোর মিস্ত্রীর খরচ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

কিন্তু ভজহরি ঘোষালের ইট কিনিয়া দেওয়ান-গিন্নী বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ভজহরি পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়া টাকা আদায় করিতে পারিলেন না; তখন দেওয়ান-গিন্নীকে তিনি উকীলের চিঠি দিলেন।

নিরুপায় হইয়া নায়েব জহরলাল ভজহরি ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু নগদ টাকার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিল না। দেওয়ানজী বহু দিন পূর্ব্বে চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রামের বাহিরে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। দেওয়ানজী এই পুষ্করিণীর জন্য যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন; তাহার জল নির্ম্মল ও গভীর ছিল, এ জন্য তিনি যখন-তখন বলিতেন, "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।" তিনি যে পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, এই পুষ্করিণীটিই তাহার অব্যর্থ প্রমাণ। এই পুষ্করিণীটির প্রতি অনেক দিন হইতেই ঘোষাল মহাশয়ের লোভ ছিল। তিনি নায়েবের নিকট প্রস্তাব করিলেন, এই পুষ্করিণীটি পাইলেই তিনি ইটের মূল্যের দাবী ত্যাগ করিবেন।

নায়েব আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "বলেন কি ঘোষাল মশায়! আপনার ষাট আর ত্রিশ এই নব্বুই হাজার ইটের দামের বদলে পাঁচ হাজার টাকার অত বড় একটা পুকুর—দীঘি বল্লেই চলে, আপনাকে বিক্রী-কোবলা লেখাপড়া ক'রে দিতে হবে? বিশেষতঃ এ রাধা-মাধবের সম্পত্তি; কর্ত্রী শুন্‌লে কি বল্‌বেন?"

ঘোষাল বলিলেন, "কিছুই বল্‌বেন না, কারণ, তাঁর টাকা দেওয়ার শক্তি নেই, আর ঐ পুকুরেরও অন্য কোন খদ্দের নেই। রাধামাধবের মন্দির, আর তাঁর মুখ্য সেবাইৎ-'দেওয়ান-ইন্-চার্জ্জোর' 'গ্রেভ' নির্ম্মাণের জন্য যে নব্বুই হাজার ইট খরিদ হয়েছে, তার দেনাটা ঠাকুরের জলীয় সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে পরিশোধ করলে গিন্নী দুঃখও করবেন না, রাগও করবেন না।"

নায়েব বলিল, "কিন্তু আমার ত একটা দায়িত্ব আছে। সম্পত্তির মূল্য যে চার পাঁচ হাজার টাকা!"

ঘোষাল বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু পেটে খেলে পিঠে সয়। না হয়, রাধামাধবের প্রণামী ব'লে আরও একশ' এক টাকা নিও।"

নায়েব বলিল, "আজ্ঞে, এ যে পুকুর চুরী! একশ' টাকার কর্ম্ম নয়! পাঁচশ টাকার কম আমি এ 'প্রেস্তাব' মুখেই আন্‌তে পারব না।"

"অৰ্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—বৈষয়িক কার্য্যে মহাপণ্ডিত জহরলাল অবশেষে আড়াই শ টাকায় রাজী হইয়া মনিব-বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

৪

নায়েবকে হাসিমুখে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া দেওয়ান-গিন্নী গালা ঘুরাইয়া বলিলেন, "কোন সুবিদেটুবিদে ক'রে আস্‌তে পারলে? ঘোষাল মিন্‌ষে কি বল্‌লে?"

দেওয়ান-গিন্নীর মুখখানি একে ত কালী-পড়া তোলো হাঁড়ির মত কৃষ্ণবর্ণ, গোল ও গম্ভীর; তাহার উপর প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তাঁহার মুখে সজারুর ছোট ছোট কাঁটার মত কতকগুলি গোঁফ গজাইয়াছিল! সেই মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিবার সময় নায়েবের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিত; কিন্তু সে দিন তাহার দৌত্য সফল হইয়াছিল, এই জন্য সে নিঃশঙ্কচিত্তে বলিল, "শাস্তর কি মিথ্যে হবার যো আছে, মা! শাস্তরেই ত আছে—'জয়ন্তে পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ' একে আপনার মত

সাক্ষেৎ অন্নপুন্নোর আশীর্ব্বাদ, আর তার ওপর শ্রীরাধামাধবজীর কায ; সে কায কি পণ্ড হয় ? ঘোষাল ত' নালিশ করতে উদ্যত, আর্জ্জি পর্য্যন্ত লেখা শেষ ; সোমবারেই তা আদালতে দাখিল করতো। আমি তার হাতে পায়ে ধ'রে এক রকম আপোষ ক'রে এসেছি, কেবল আপনার হুকুমের প্রতীক্ষে।"

গিন্নী বলিলেন, "বটে ? কি সর্ত্তে আপোষ করলে ?"

নায়েব বলিল, "ঐ যে ছুঁচোমারীর মাঠে আমাদের একটা এঁদো পুকুর আছে, টোপা-পানায় আর শ্যাওলায় পুকুরের জল চোখে দেখবার যো নেই, আবার জলেরই বা কি 'সৈরভ', মুখে দিলে অন্নোপেরাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠে যায় ! পুকুরে কর্ত্তার আমলের দু পাঁচটা মাছ ছিল শুনেছি, কিন্তু ঢেঁকির মত সাতটা কুমীর সেই পুকুরে বাসা নিয়েছে, মাছগুলো তারাই সেবা করেছে। সেই পুকুরটা ঘোষালকে বিক্রী-কবলা ক'রে দিয়ে, ইটের দেনা পরিশোধের 'প্রেস্তাবে' তাকে রাজী ক'রে এসেছি। শুধু কি তাই ? রাধামাধবজীকে সে পঞ্চাশ টাকা প্রণামী দিতেও রাজী হয়েছে। এত সহজে কার্য্য-সিদ্ধি হবে—সে আশা ছিল না; কিন্তু শ্রীরাধামাধবজীর ইচ্ছেয় কি না হয় ?" (উদ্দেশে প্রণাম)

গিন্নী খুসী হইয়া বলিলেন, "বেশ, ভালই করেছ। কোবলা রেজেষ্ট্রীর খরচটা কিন্তু ঘোষালের কাছেই আদায় করা চাই।"

দেওয়ান-গিন্নীর মেজাজ ভাল আছে বুঝিয়া নায়েব মাথা চুল্কাইয়া বলিল, "এ হাঙ্গামাটা ত কোন রকমে চুকলো, কিন্তু ও দিকে যে আর এক বিপদ্ উপস্থিত ! লাটের খাজনা দাখিলের সময় হয়েছে, অথচ তবিলে টাকা নেই ; মহালের তৌশীলদার বেটারা লিখেছে—এবার কোন প্রজা ধান পায় নি, চোতেনী ফসল উঠবার আগে তারা একটি পয়সাও দিতে পারবে না। আমি বলি কি—বাজারের পাশে আমাদের যে দৌড়ঘরটা প'ড়ে আছে, কর্ত্তার আমলে দোলে, রথে, 'পুজো-পাব্বণে' যাত্রাওয়ালাদের সেই ঘরে বাসা দেওয়া হ'তো। এখন মেরামতের অভাবে ঘরখানা ভেঙ্গে পড়ছে, সাপ, ছুঁচো আর চামচিকের আড্ডা হয়েছে ; ভাঙ্গা ইমারত, মবলক টাকা খরচ ক'রে মেরামত করিয়েই বা ফল কি ? ঐ সাপের পুরী কেউ ভাড়া নিতে চায় না। এক দিন দুয়োর খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে, ওরে বাপ রে ! সাপের কি ফোঁসফোঁসানি ! পালিয়ে এসে বাঁচি। তা বাজারের ঐ কেঁয়ে বেটা,—সাগরমল হনুমানজী—ঐ ঘরখানা পাটের গুদাম করবার জন্যে কিন্‌তে চায় ; সে ছ'শো টাকা দর বলেছে। পাগলের মত কথা !—আমি বলেছি, 'হাজার রূপেয়ার এক আধেলা কম্‌তি হোগা নেই।' বেটার ভারী গরজ, ঠিক ঐ টাকাতেই রাজী হবে। ঐ ঘরখানা বিক্রী করলে এবারকার লাটের হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়েও তবিলে কিছু জমে,—তা আপনার মত না জেনে ত সেই মেড়ো বেটাকে কথা দিতে পারছি নে।"

গিন্নী বলিলেন, "হাজার টাকার ওপরে উঠবে না ?"

নায়েব বলিল, "রাধামাধব ! ঘরের যে অবস্থা, পাঁচ ছ শো টাকার বেশী দিয়ে কেউ কিন্‌তো না। গরজে প'ড়ে মেড়োটা কিছু বেশী দিতেই রাজী হবে। কিন্তু হাজার টাকার ওপরে উঠবে না।"
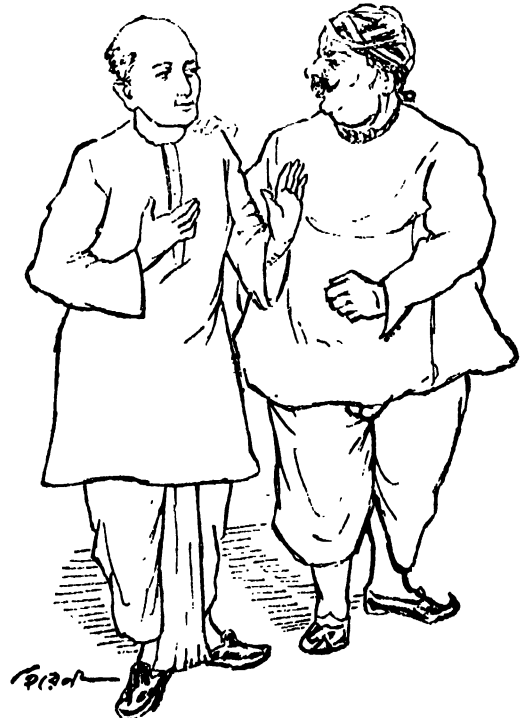
নায়েব জহরলাল ও সাগরমল হনুমানজী

গিন্নী বলিলেন, "টাকার দরকার, ভাঙ্গা ঘরের মায়া ক'রে আর কি হবে ? হাজার টাকাতেই রাজী হয়ো।"

নায়েবের মনে হইল,"সে দিন সে শিয়াল বাহাতি" করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। সাগরমল হনুমানজী নগদ

দেড় হাজার টাকায় সেই অট্টালিকা ক্রয় করিতে সম্মত হইল। কিন্তু জহরলালের সহিত বন্দোবস্ত হইল—দলীলে হাজার টাকার উল্লেখ থাকিবে। অবশিষ্ট পাঁচ শত টাকা সে 'মফস্বলে' লইবে।

পুষ্করিণী ও 'ইমারত' বিক্রয় করিয়া এক মাসে কাণা নায়েবের সাত শত টাকা উপরি আদায় হইল। সে ভাবিল, রাধামাধবের দয়ায় তাহার ধূলামুঠা সোনামুঠা হইতেছে!

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে মুন্সেফী আদালত হইতে দেওয়ান-গিন্নীর নামে এক নিমন্ত্রণপত্র আসিয়া হাজির! তিনি নায়েবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কি বাবদ নালিশ রুজু করেছে, নায়েব?"

কাণা চসমার ভিতর দিয়া এক চক্ষুতে বাদীর আর্জ্জির নকলখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিল, "এ একটা উড়ো ফ্যাসাদ! আনন্দনগরের মাঠে আমাদের সত্তর আশী বিঘে খড়ের জমী আছে, কর্ত্তা ওয়াষ্টিন কোম্পানীর কাছে ওটা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিলেন; বছরে যে টাকা খাজনা দিতে হয়, খড় বিক্রী ক'রে তার অর্দ্ধেক টাকাও ওঠে না! বছর বছর কেবল লোকশান দিয়ে আসতে হচ্ছে। বাকী খাজনা বাবদ সায়েব কোম্পানী ১৬৫৷৴১৭৷৷০ টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করেছে। আমি বলি কি, ও লোকসানী জমা রেখে দরকার নেই। ওটা এক তরকা নীলাম হয়ে যাক, আমাদেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ুক।"

দেওয়ান-গিন্নী বলিলেন, "বছর বছর লোকসান দিয়ে ও খড়ের জমী রাখ্‌বার দরকার দেখিনে। খাজনার টাকা আমি ঘর থেকে দিচ্ছিনে, কিন্তু কম টাকায় নীলেম হ'লে আমাকে আবার বাকী টাকার জন্যে দায়িক হ'তে হবে না ত?"

নায়েব মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে আমি দেখে নেব। নীলেমে বাকী খাজনার টাকা উঠ্‌বে। খড়ের জমী কি না, ওর ওপর অনেকেরই 'ঠোক্' আছে।"

যথাসময়ে খড়ের জমী নীলাম হইল। জহরলাল তাহার পুত্র পান্নালালের বেনামীতে দুই শত টাকায় নীলাম ডাকিয়া লইল। এই জমীর খড় কোন বৎসর সাত শত, কোন বৎসর আট শত টাকায় বিক্রয় হইত। কিন্তু কাণা নায়েব খাতাপত্রে ক্রমাগত লোকসান দেখাইয়া আসিয়াছে। বার্ষিক গড়ে ছয় শত টাকা আয়ের সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে তাহার হস্তগত হইল। রাধামাধবের প্রতি তাহার ভক্তিও ক্রমে দুই কূল ছাপাইয়া উঠিল।

৫

কিন্তু এত বড় একটা কাণ্ডও দেওয়ান-গিন্নীর গোমস্তা পদা গাঁড়াল ও মুহুরী অনন্ত অধিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিবে—তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তাহারা এক দিন মুখ ভার করিয়া কাণা নায়েবকে বলিল, "দাদা, সেই কালেই বলেছিলাম, শেষ রক্ষে করতে পারবে না। আমরা দুজনে চার চক্ষুতে যা দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, তুমি এক চক্ষুতে তা দিব্যি দেখ্‌তে পাচ্ছ, আর দুই হাতে কুড়িয়ে নিয়ে কোঁচড়ে গুঁজছো, এ কি ভাল হচ্ছে? আমরা শালারা কি বানের জলে ভেসে এসেছি! পূজোপাব্বণগুলো ত আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। একটি উপরি পয়সার মুখ দেখ্‌বার যো নেই; আর তুমি ষোল আনার ওপর আঠার আনা পুষিয়ে নিচ্ছো। বেশ, আমরাও দেখে নেব।"

কাণা নায়েবের একটু ভয় হইল। সে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তোমাদের কথা কি আমি ভুল্‌তে পারি? এ ত মূলোর ক্ষেত নয়, বেগুণের ক্ষেত; হপ্তায় হপ্তায় তোমাদের হাতেও কিছু কিছু যাতে আসে, আমি তার ব্যবস্থা না ক'রেই কি চুপ ক'রে ব'সে আছি?"

পদা গাঁড়াল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ব্যবস্থাটা কি শুনি!"

অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের পরামর্শ চলিল; পরামর্শ শেষ হইলে পদা ও অনন্ত উভয়েই উৎফুল্ল হইল।

* * * * * *

পরদিন প্রভাতে নায়েব দেওয়ান-গিন্নীর চরণবন্দনা করিয়া বলিল, "কাল রাত্তিরে বড়ই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি! সে কথা মনে হওয়ায় সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে! কাল চার প্রহর রাত্তিরে রাম, শিব, লক্ষ্মী, কালী—এই চার জন দেবদেবী স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে বল্লেন, 'দেওয়ান-গিন্নী পূর্ব্বজন্মের তপিস্যের জোরে ভক্তিডোরে আমাদের বেঁধে রেখেছে। কিন্তু এ জন্মে সে রাধামাধবের পূজো-আর্চ্চা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, বিস্তর টাকা খরচ ক'রে সে রাধামাধবের মন্দির 'পিত্তিষ্টে' করল।

নায়েব জহরলাল ও দেওয়ান-গিন্নী

শয়নকক্ষে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিল; প্রকাণ্ড ধুনুচিতে ধূপ জ্বলিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল; বিভিন্ন পাত্রে ভোগের উপকরণ সজ্জিত হইল; কোনও পাত্রে ক্ষীর, কোনও পাত্রে ছানা, গোল্লা, রসগোল্লা, গাওয়া ঘিয়ে ভাজা রাশি রাশি ফুলকো লুচি। আয়োজন দেখিয়া পদা গাড়াল ও অনন্ত অধিকারীর লালা সংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল!

পদা গাড়াল দ্বারপ্রান্তে বসিয়া মন্দিরা বাজাইতে লাগিল, অনন্ত অধিকারী একখানি আসনে বসিয়া বিড়-বিড় করিয়া নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিল,

কিন্তু আমরা যে তার ভক্তি-ডোরে বাঁধা আছি, সে কথা সে ভুলে গিয়েছে! কথাটা কালই তাকে স্মরণ করিয়ে দিবি। সে হয় ত তোর কথা বিশ্বেস করবে না; কিন্তু আমরা প্রতি মঙ্গলবারে রাত্রিকালে তাকে দেখা দিয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ করব। তোরাও সেখানে উপস্থিত থাকিস্; আর আমাদের ভোগের আয়োজন ক'রে রাখতে বলিস্।' মা, কাল মঙ্গলবার। কাল থেকেই আপনার উপর দেবতাদের ভর হবে।"

দেওয়ান-গিন্নী রোমাঞ্চ-দেহে এই অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "বাধা পড়েছে! তাই ত বলি, আমার এত দিনের তপিস্তে কি বৃথা হবে? বাবা জহর, দেবদেবীরা আসবেন, তাঁদের ভোগের আয়োজনে যেন ত্রুটি না হয়। ক্ষীর, ছানা, লুচি-সন্দেশের, নানারকম ফলফুলারীর যোগাড় করবে। টাকার জন্যে ভেব না, টাকার অভাব হয়, আমার ছোট বাগানখানা বিক্রী করবে।"

পরদিন রাত্রিকালে দেওয়ান-গিন্নীর

তাহা রামের স্তব কি ষষ্ঠীপূজার মন্ত্র, তাহা কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না। দেওয়ান-গিন্নী একখানি কুশাসনে বসিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এসো রাম, সীতাপতি রামচন্দর এসো! একবার দেখা দাও, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তুমি গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছ, পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করেছ; বাঞ্ছাকল্পতরু!

সেই ধূমপূর্ণ কক্ষে জটাবল্কলধারী রামচন্দ্রের আবির্ভাব হইল

একবার তোমার দাসীকে দেখা দাও।" গিন্নীর আকুল কণ্ঠের প্রার্থনায় সেই কক্ষ পূর্ণ হইল।

দপ করিয়া একটা নীল রঙ্গের দিয়াশালাই জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইবামাত্র সেই ধূমপূর্ণ কক্ষে জটা-বল্কল-ধারী রামচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। নূপুরের শব্দে দেওয়ান-গিন্নী বুঝিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। রাম দেখা দিতে আসিয়াছেন।

"এসেছিস্ বাপ! আয়, একবার কোলে আয়, আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর্।" কাণা নায়েবই রাম সাজিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। গিন্নীর এই আকুল আহ্বানে সে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার কোলের উপর বাখারীর ধনুক ও কঞ্চির বাণটি নিক্ষেপ করিল। দেওয়ান-গিন্নী তাহা মস্তকে স্পর্শ করিলেন; কিন্তু ধূমান্ধকারপূর্ণ কক্ষে দৃষ্টির ক্ষীণতা বশতঃ একটা আবছায়া ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

রামচন্দ্র অদৃশ্য হইলে পদা গাড়াল মন্দিরা ফেলিয়া উঠিয়া গেল। দেওয়ান-গিন্নী এবার 'বাবা ভবতারণ! বাবা হরিতারণ!' বলিয়া শিবকে আহ্বান করিলেন। কয়েক মিনিট পরে পদা গাড়াল মুখে দাড়ি-গোফ ও মাথায় সুদীর্ঘ জটা বাঁধিয়া, নূপুরধ্বনি করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অনন্ত অধিকারী 'জয় শিব শম্ভু! বোম্ বোম্ মহাদেব' শব্দে শিবের অভ্যর্থনা করিয়া দেওয়ান-গিন্নীকে বলিল, "মা, তোমার ভবতারণ এসেছেন।" তৎক্ষণাৎ শিবের জটা চাবুকের মত গিন্নীর হাতে পড়িল। গিন্নী জটা টিপিতে লাগিলেন, জটা হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতে লাগিল। পতিতপাবনী গঙ্গা জটায় লুকাইয়া আছেন, মনে করিয়া দেওয়ান-গিন্নী জটানিংড়ানো জল ভক্তিভরে মাথায় লইলেন।

শিবের অন্তর্দ্ধানের পর অনন্ত অধিকারী লক্ষ্মীর স্তব আরম্ভ করিল। দেওয়ান-গিন্নী ব্যাকুল স্বরে লক্ষ্মীকে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্ত অধিকারী দেওয়ান-গিন্নীর প্রতিবেশী, একটি প্রাচীরমাত্র ব্যবধান! অনন্তের স্ত্রী গুঞ্জমালা কক্ষান্তরে অপেক্ষা করিতেছিল; সে নূপুর বাজাইয়া দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং তাঁহার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলাইয়া, একগোছা ধানের শীষ তাঁহার মুখে বুলাইয়া দিল; তাহার পর বিকৃত স্বরে বলিল, "তোর ভক্তিতে আমি চিরদিন তোর ঘরে বাঁধা আছি মা!" মুহূর্ত্তমধ্যে 'লক্ষ্মী' অদৃশ্য হইলেন।

অতঃপর অনন্ত অধিকারী কালীর স্তব আরম্ভ করিল। দেওয়ান-গিন্নী "কোথায় মা কালী! এসো মা কালী! তোমার দাসীকে দেখা দাও" বলিয়া কালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পদা গাড়ালের ভগিনী সুনন্দাও যথা-সময়ে আসিয়া অন্য কক্ষে বসিয়াছিল। সে এলোচুলে, গলায় মাটীর মুণ্ডমালা পরিয়া, আধ হাত জিহ্বা বাহির করিয়া দেওয়ান-গিন্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাহার হাতের খাঁড়া তাঁহার কোলে রাখিল। খাঁড়ায় খানিক 'খুনখারাপি' রঙ্গ মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দপ্ করিয়া লাল দেশালাই জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে দেওয়ান-গিন্নী এক চক্ষুতে মা কালীর নৃমুণ্ডমালিনী-মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি খাঁড়ায় হাত দিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি, খাঁড়া ভিজে কেন?"

গিন্নী এক চক্ষুতে মা কালীর নৃমুণ্ডমালিনীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন

অনন্ত অধিকারী বলিল, "ম্লেচ্ছদেশে যুদ্ধ চলছে কি না। মা যবন বধ করছিলেন, আপনার আহ্বানে আর স্থির থাকতে না পেরে সেই খাঁড়া হাতে নিয়াই চ'লে এসেছেন। খাঁড়ায় সেই রক্তই লেগে আছে!"

দেওয়ান-গিন্নী সভয়ে বলিলেন, "যবনের রক্ত! তাজা রক্ত যে! নাঃ, বেটী দেখছি এই রাত্তির কালে স্নান না করিয়ে ছাড়লে না!" তাঁহাকে দাসীরা স্নান করাইয়া দিল। তাহার পর প্রসাদবিতরণ আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, প্রসাদের অধিকাংশ পদা গাঁড়াল, অনন্ত অধিকারী ও কাণা নায়েব বাড়ী লইয়া গেল। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিতে দেওয়ান-গিন্নীর উপর দেবতাদের ভর হইতে লাগিল। ভোগরাগের আয়োজনে সেই রাত্রিতে পনের ষোল টাকা ব্যয় হইতে লাগিল বটে, কিন্তু অর্থাভাব হইল না। দেওয়ান-গিন্নী আম-কাঁঠালের ৪০ বিঘার বাগান পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় করিলেন। কাণা নায়েব তাহা তাহার রক্ষিতা এবং দেওয়ান-গিন্নীর পরিচারিকা খুদী ঘোষাণীর বেনামীতে কিনিয়া লইল। সেই বাগানের মূল্য হাজার টাকারও অধিক!

৬

পল্লীগ্রামে কাহারও সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল হইলে দরিদ্র আত্মীয় প্রতিবেশীরা তাহার মুখাপেক্ষী হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দেওয়ান-গিন্নীরও মুখাপেক্ষিণী সধবা বিধবা প্রতিবেশিনীর অভাব ছিল না। দেওয়ান-গিন্নীর উপর দেবতার ভর হইয়াছে শুনিয়া প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাঁহার গৃহে আট দশটি প্রতিবেশিনীর সমাগম হইতে লাগিল। দেওয়ান-গিন্নী কি ভাবে প্রতারিত হইতেছেন, তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু প্রসাদের লোভে ও স্বার্থের অনুরোধে কেহই এই প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিল না। সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবতী পুণ্যবতী তপস্বিনী বলিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

দেওয়ান-গিন্নির কুল-পুরোহিত 'বিশু চাটুয্যে' অর্থাৎ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শিব আছেন, কালী আছেন, লক্ষ্মী আছেন, তাঁহাদের আবাহনের জন্য অনন্ত অধিকারী মন্ত্র পাঠ করে, আর কি না কুল-পুরোহিত মহাশয় তাঁহার ভাগ্যবতী পুণ্যবতী যজমানটির অসাধারণ সৌভাগ্য ও পুণ্যপ্রভাবের পরিচয় পাইলেন না! ইহা ভাবিয়া দেওয়ান-গিন্নীর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুরোহিত মহাশয় এক মঙ্গলবার নিশাকালে দেওয়ান-গিন্নীর গৃহে আহূত হইলেন।

পুরোহিত সকলই প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং কাণা নায়েব, মূর্খ গোমস্তা ও প্রতারক মুহুরী ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার যজমানটিকে 'জেরবার' করিতে উদ্যত হইয়াছে অথচ এই হুজুগে পূজাপার্ব্বণাদি হ্রাস হওয়ায় তাঁহার উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং জহরলাল, পদা ও অনন্তকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, তাহাদের এই বুজরুকি 'ফাঁস' করিয়া দিবেন, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবেন। নায়েব ও গোমস্তা তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "ঠাকুর মশায়, আপনি রাগ করবেন না, শীঘ্রই আপনার প্রাপ্তির ব্যবস্থা কচ্ছি।"—পুরোহিত মহাশয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, ক্রোধটাও তিনি তখনকার মত মুলতুবী রাখিলেন।

দুই দিন পরে নায়েবের উপদেশে খুদী ঘোষাণী এক পোয়া দধির সহিত অল্প হলুদ মিশাইয়া সেই পীতাভ তরল পদার্থ রাত্রিকালে গিন্নির বিছানায় ঢালিয়া দিল।

দেওয়ান-গিন্নীর মস্তিষ্ক এতই বিকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, শিশু যেমন রাত্রিকালে মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, তাঁহার রাধামাধবও সেইরূপ রাত্রিকালে মন্দির ত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করেন, এবং প্রত্যূষে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই নিঃশব্দে উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি নিদ্রাঘোরে কোন কোন দিন রাধামাধবের নূপুরধ্বনি শুনিতে পান। সুতরাং পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে তিনি তাঁহার শয্যায় সেই হরিদ্রাভ দ্রব পদার্থ লিপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার রাধামাধবের আমাশয় হয়েছে, বিছানা নষ্ট ক'রে গিয়েছে, এখন উপায়?"

পদা গাঁড়াল বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "এ ত ভারী মুস্কিলের কথা হ'ল! আমাদের চিন্তাহরণ ডাক্তারকেই ডাকি, না ভগবতীচরণ কবরেজ মশায়কে খবর দিই?"

কাণা নায়েব বলিল, "এ কি তোমার আমার আমাশা যে, ডাক্তার-কবরেজের ওষুধে আরাম হবে? এ দেবতার

রোগ—দৈবকার্য্য করতে হবে। চাটুয্যে মশায়কে খবর দাও—তিনি শান্তিকার্য্য করুন।"

পুরোহিত বিশু চাটুয্যে মহাশয় তালপাতের পুথি হাতে দর্শনদান করিলেন। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি পুথির পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, "শান্তিপ্রকরণে দেবতার আমাশয়াদি রোগের ঔষধের ব্যবস্থা আছে। শান্তি-ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এ জন্য রাধামাধবের মুরলীর অনুরূপ একটি সোনার মুরলীর প্রয়োজন। দুই ভরি সোনাতেই ঐরূপ মুরলী প্রস্তুত হইবে।"

তাহাই হইল। সেইরূপ সোনার বাঁশী নির্ম্মিত হইল, পুরোহিত মহাশয় তদ্দ্বারা শান্তি-কর্ম্ম শেষ করিলেন। দুই ভরি স্বর্ণ ও শান্তি-কর্ম্মের বিবিধ উপকরণ হস্তগত হওয়ায়, রাধামাধবের আমাশয়ের ও পুরোহিতের ক্রোধের শান্তি হইল; তাহার পর তিনিও দলে ভিড়িলেন।

কয়েক দিন পরে গভীর রাত্রিতে দেওয়ান-গিন্নীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি শয্যা হাতড়াইয়া রাধামাধবকে পাইলেন না, "রাধামাধব, রাধামাধব! বাবা, কোথায় তুমি!"—বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন।

পদ্মা গাঁড়াল পাশের ঘরে শয়ন করিত; সে উঠিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "যা বেটী! আর তোর ভালবাসা জানাতে হবে না। আমি শীতে থর্-থর্ কাঁপছি, তোর ঘরে বাক্স-বোঝাই শাল-আলোয়ান। কোন দিন একখান গায়ে দিতে দিয়েছিস্?"

দেওয়ান-গিন্নীর বড়ই অনুতাপ হইল। পরদিন প্রভাতে তিনি খুদী ঘোষাণীকে চাবি দিয়া বাক্স খুলাইলেন এবং তাঁহার স্বামীর ক্রীত একখানি অব্যবহৃত মূল্যবান্ কাশ্মীরী শাল বাহির করিয়া রাধামাধবের ব্যবহারের জন্য পদ্মা গাঁড়ালের হাতে দিলেন।

পদ্মা সুযোগ বুঝিয়া তাহা বাড়ী লইয়া গেল। সেই শাল ব্যবহার করিলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে বুঝিয়া, এক দিন সে তাহা গোপনে 'বিক্রমপুর' প্রেরণ করিল। কিন্তু কাণা নায়েবের মুখ চুলকাইতে লাগিল!

৭

আর একটু বাকী আছে। শারদীয়া উৎসবের সময় সরস উপসংহারটুকু বাদ দিয়া রসভঙ্গ করিব না।

আশ্বিনমাস আসিল। দেওয়ান-গিন্নী প্রতি বৎসর মহামায়াকে মহাসমারোহে ঘরে আনেন; কিন্তু সে বার

দুই ভরি সোনাতেই ঐরূপ মুরলী প্রস্তুত হইবে

অর্থকষ্টে বিব্রত হইয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন, দুর্গোৎসব বন্ধ রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে কেবল কুমারীপূজা করিবেন। অল্পব্যয়েই তাহা সুসম্পন্ন হইবে।

তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া পুরোহিত চাটুয্যে মহাশয় মুখ ভার করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চিরহিতৈষী নায়েব, গোমস্তা ও মুহুরীও প্রমাদ গণিল! মহামায়া ঘরে আসিলে, তাঁহার আশীর্ব্বাদে বিলক্ষণ দশ টাকা ঘরে উঠিত; 'সে গুড়ে বালি' পড়িবার সম্ভাবনায় তাহারা ম্রিয়মাণ হইল। তাহার পর পুরোহিত মহাশয়ের সহিত বকুলতলায় দাঁড়াইয়া তাহাদের কি পরামর্শ হইল, বলিতে পারি না।

প্রতিমা-নির্ম্মাতা মালাকরের নাম ফটিকচাঁদ। ফটিকচাঁদই প্রতি বৎসর দেওয়ান-গিন্নীর চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গা-প্রতিমা

নির্ম্মাণ করিত। সেবার দুর্গোৎসব হইবে না, কুমারী-প্রতিমা নির্ম্মাণের জন্য সে মাটীতে জল ঢালিল।

মুহূর্ত্ত পরেই ফটিক মালাকর আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল, সবেগে হাত-পা ছুড়িতে লাগিল, তাহার পর চীৎকার করিয়া বলিল, "মেরো না বাবা নন্দী! ভৃঙ্গী মশায়, দোহাই তোমার, আমাকে সিঙ্গী লেলিয়ে দিও না, ওরে বাবা, মস্ত দাঁত! খেয়ে ফেল্লে!"—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূর্চ্ছা!

ফটিকচাঁদকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সকলে মহাকলরব আরম্ভ করিল। দেওয়ান-গিন্নী অন্দর হইতে সেই চীৎকার শুনিয়া, ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। তাঁহার আদেশে মূর্চ্ছিত ফটিক অন্দরে নীত হইল। পদা ও অনন্ত তাহাকে ধরিয়া রহিল।

নায়েব ও গোমস্তার বহু চেষ্টায় ফটিকের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। দেওয়ান-গিন্নী তাহার আর্ত্তনাদ ও মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে হাত-যোড় করিয়া বলিল, "আমি কুমারী-প্রতিমের জন্যে মাটীতে জল ঢেলেছি,- আর অমনই মা দুর্গা সিঙ্গীর পিঠে চেপে আমার সাম্‌নে এসে দশ হাত নেড়ে বল্লেন—'কি, গিন্নীর এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার পুজো বন্ধ রেখে তার কুমারীপুজোর সখ! নন্দী, লাগাও সাট; ভৃঙ্গী, ওকে ধ'রে আমার সিঙ্গীর মুখে ফেলে দাও';-বল্‌তে না বল্‌তে সঙ্গীটা মূলোর মত লম্বা দাঁতগুলো বের ক'রে—" কথা শেষ না করিয়া ফটিক আসন্ন-ম্যালেরিয়ার রোগীর মত প্রচণ্ডবেগে কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ান-গিন্নী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হাসিমুখে নায়েবকে বলিলেন, "জহর, বেটী আমার বাড়ী এবারও পূজো না খেয়ে ছাড়বে না, তা' বুঝলে ত?—কুমারীপূজো মুলতুবী থাক; দুর্গোৎসবেরই আয়োজন কর। সকলকে ছেড়ে বেটী আমার কাঁধে ভর করেছে!"

নায়েব মাথা নাড়িয়া বলিল, "ধন্য আপনি! মহামায়ার এ অনুগ্রহ কি আর কারও ওপর হয়? অবিশ্বাসী, পাষণ্ড, নাস্তিক বেটারা তবু বলে - গিন্নী-মায়ের ওপর দেবতার ভরটর সব মিথ্যে! মিথ্যে কি সত্যি, তা এক দিন তিনি জানিয়ে দেবেন।"

পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল। নায়েব ষষ্ঠীর কয়েক দিন পূর্ব্বে পূজার বাজার করিতে কলিকাতায় যাত্রা করিল। ঘি, ময়দাও সে কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিল এবং এক টিন ঘিয়ের পরিবর্ত্তে এক টিন তেল কিনিল। পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে—সেবার কুসুম-বীজের তেল খাইয়া কলিকাতার অনেক লোক ভেদবমিতে মৃতকল্প হইয়াছিল। জহরলাল সস্তায় কিস্তী পাইয়া সেই তেল এক টিন কিনিয়াছিল। তৈলের ঐরূপ অসাধারণ গুণের কথা সে তখন জানিত না।

মূর্চ্ছিত ফটিক অন্দরে নীত হইল

মহাষ্টমীর দিন দেওয়ান-গিন্নী গ্রামের বহু লোককে মহামায়ার প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কাণা নায়েব ক্যানেস্তারার ঘিয়ের সঙ্গে সেই তেল সমপরিমাণে মিশাইয়া তদ্দ্বারা লুচি ভাজাইল। ডাল, তরকারী, আলুর দম প্রভৃতিতেও সেই তৈল ব্যবহৃত হইল।

যথাসময়ে গ্রামস্থ ভদ্রলোকরা মহামায়ার প্রসাদ পাইলেন; কিন্তু আহারান্তে কাহারও মুখ ধুইবারও তর সহিল না। অনেকে পথের ধারেই বমি করিতে বসিয়া গেল। বড় বড় উকীল, মোক্তার, ডাক্তার কাছা হাতে

অনেকেই পথের ধারেই বমি করিতে বসিয়া গেল

করিয়া বাড়ীর দিকে দৌড়াইলেন; কিন্তু বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে হইল না। চতুর্দ্দিকে বমনের মিশ্রতান!

দেওয়ান-গিন্নী হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, "জহরলাল, এ কি ব্যাপার? এ যে বড়ই সর্ব্বনেশে কাণ্ড!"

জহরলাল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "কিছু না। যে সকল অবিশ্বাসী নাস্তিক আপনার উপর দেবতার ভরের কথা অবিশ্বাস করে, মা মহামায়া তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—দেবমহিমায় অবিশ্বাস করলে কি শাস্তি হয়!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

বিজয়া *

তুমি সর্ব্ব তপস্যার শেষ পুণ্যফল,
বীরবিদ্যাবিনোদিতা তুমি দীপ্ত অসি,
যেখানে প্রকাশ তব, অয়ি মহীয়সি,
বীর তীর্থ সেই ভূমি গৌরবে উজ্জ্বল।

স্বাধীন সাম্রাজ্যসৃষ্টি তোমার প্রতাপে,
ঘুচে দাসত্বের দৈন্য, কুণ্ঠা যায় দূরে,
জলে নব স্বর্ণ-দীপ, নব বীর-পুরে
বীর-বন্দনার গানে—ত্রিভুবন কাঁপে।

তুমি কর সুপ্ত প্রাণে তেজের সঞ্চার,
পরাও বীরের ভালে রুধির-তিলক,—
তোমার প্রভাবে লুপ্ত কামের নরক
ফুটে পৌরুষের প্রভা—ঘুচে অন্ধকার।

বাণীপুণ্যপাণিপদ্মে বেজে ওঠে বীণা,
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ফুটে সুন্দর মন্দার,
মুদিতা উদিতা ভাবি আনন্দ অপার,
বিহঙ্গিনী গায় গান মঞ্জুশাখাসীনা।

মুক্তামৌলি কলাপীর কলাপে কলাপে
বাণীর আনন্দ-স্বপ্ন ফুটে হর্ষভরে,
গম্ভীর জলদনাদ স্ফুরে চরাচরে,
হেরি বর্ণবিন্দুময় চারু ইন্দ্রচাপে।

লক্ষ্মীর আসন পাতে বধূ শুভাননা,
ফুটে ওঠে কমলার সোনার কমল,
ধন-ধান্যে পুণ্যশোভা মধুর উজ্জ্বল,
শঙ্খনাদে কি উৎসাহ কি পুণ্য প্রেরণা।

* গত বর্ষের বার্ষিক বসুমতীর জন্য এই কবিতাটি লিখিয়া দুই দিন পরেই কবিবর মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার স্মৃতিপূত এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি এ বর্ষে বার্ষিক বসুমতীর গ্রাহকগণকে উপহার দিলাম।

তোমার রুধিরযজ্ঞে জবারক্তভূমি,—
করে আজো শূরত্বের গৌরব-ঘোষণা,
জাগে ভাবুকের মনে নব উদ্দীপনা
বীর-খড়্গ, রাজস্বপ্ন দেখাও মা তুমি।

ধূপধূমে পরিব্যাপ্ত মন্দির-ভবনে
হেরি মাতৃপাদপদ্ম আনত-নয়নে,
দেখি শিখাদীপ্ত অসি আনন্দ-স্বপনে
ভাবি মোর খড়্গ কোথা লুকাল কেমনে?

বীর রাজলক্ষ্মী তৃপ্ত রাজ-তপস্যায়,
হাতে তুলি দেন খড়্গ শান্তির সুদিনে,
কেমনে পাইবে অসি রাজসেবা বিনে,
পৌরুষ পরমা তৃপ্তি পাইবে কোথায়?

মহারণ-যজ্ঞস্মৃতি এখনো তরুণ;—
সেই য়ুরোপের বুকে রণবহ্নি-দাহ!
রাখিতে রাজার মান বীরের উৎসাহ,
স্নেহ-দৃপ্তা মাতৃ-আঁখি অশ্রুতে করুণ।

সে দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীর বীর্য্য-বহ্নিকণা
সহসা ফুৎকারে যেন উঠিল জ্বলিয়া,
রাজদত্ত বীর-খড়্গ গৌরবে ধরিয়া,
গেল দূর যুদ্ধক্ষেত্রে,—সে কি উদ্দীপনা!

পরীদের স্বপ্নরাজ্যে—গোলাপে গোলাপে
যথা কামরাগ আর প্রেমগীতি লেখা,
কটাক্ষে সম্ভোগ-স্বপ্ন, নিতি দেয় দেখা,
গজমতি গাঁথা নারী-কুন্তল-কলাপে;—

রত্ন-অলঙ্কার-দ্যুতি হেরামে হেরামে,
হেনার সুরভিভরা—মন্থর পবন,
হাসি গানে মনোহরা রমণী-রতন
রতি ডাকে বাহুপাশে মোহনিয়া কামে।

সেই কামস্বর্গে যবে অসির ঝঞ্ঝনা
জাগিল বিপুল তেজে, বহিল রুধির,—
রক্ত বিদ্যুতের মত রক্তাক্ত অসির
শোণ-স্নানে ফুটেছিল ধন্য বীরপণা।

কত শতাব্দীর পরে সে দুর্লভ ক্ষণে
অসিজয়গর্ব্বহীন কুণ্ঠিত বাঙ্গালী,
দেখাইল বীরপণা হৃদি-রক্ত ঢালি',
রাখিল দেশের মান ভয়হীন রণে!

তার পর ফিরি যবে এল তারা ঘরে,
উঠিল বাঙ্গালা জুড়ি পৌরুষবন্দনা,
'মুছিয়াছে বীরপুত্র ললাট-লাঞ্ছনা,
বাঙ্গালী মরিতে জানে, সমরে না ডরে।'

সেই পুণ্য শুভক্ষণে দেখেছিনু আমি,—
নব অর্থ-ভরা এক অদ্ভুত স্বপন,
উষারুণ-রত্নাঙ্কিত সুনীল গগন
আম্রকুঞ্জে হীরাপুঞ্জ চন্দ্র অস্তগামী।

দেখিনু আকাশে খড়্গ রুধিরে আপ্লুত,
প্রবালবিন্দুর মত রক্তবিন্দু ঝরে
মন্দার-সুন্দর জ্যোতি মন্দির-শিখরে
কভু শ্লথ মন্দগতি কভু চলে দ্রুত।

অসিধারে মৃদুহাসি—চোখে যেন দয়া,
স্বর্ণপাণিপদ্ম শোভে খড়্গের মুষ্টিতে,
জিজ্ঞাসিনু, 'কে গো তুমি?' বিস্মিত দৃষ্টিতে
শুনিনু "প্রতাপ-খড়্গ,—আমি রে বিজয়া!"

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ
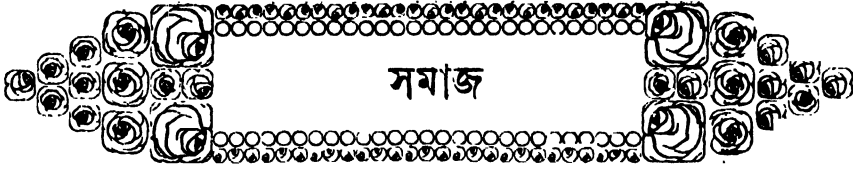
হিতাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ দিল—"কুম্ভে যাও, নিশ্চয়ই সেখানে পাবে।"

কিছু কাল ধরিয়া হাওয়ায় হাওয়ায় একটা গুজব ফিরিতেছিল, রমার স্বামীকে না কি কেহ কেহ দেখিয়াছে, চিনিয়াছে—সন্ন্যাসীর বেশে। সে ১০ বৎসর নিরুদ্দেশ। রমা ছিল তখন পনের, আজ পঁচিশ। রমা যদি বা স্বামীকে চিনিতে পারে, রমাকে তাহার স্বামী না চিনিতেও পারেন—রমার এ সন্দেহ এক বারও জাগিল না। সে সন্ন্যাসীর অরণ্যে যাত্রা করিল, সঙ্গে রহিল কিশোর দেবর টুলু। জানা-শুনা এক জনরা কুম্ভে যাইতেছেন, রমা ও টুলু তাঁহাদের সঙ্গ লইল। তাঁহারা কনখলে এক ধরমশালায় নামিলেন। রমাও সেইখানে আশ্রয় লইল।

ভোর ৩টা হইতে জাগরণের পালা আরম্ভ হইল। 'হর হর মহাদেব', 'পতিতপাবনী গঙ্গে', 'বোম ভোলা' 'বোম ভোলা' শব্দে মুখরিত প্রকোষ্ঠের এক প্রান্তে ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া রমা ও টুলু গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া আসিল। তাহার পর সেই ভোর হইতে দুই জনে খুঁজিতে আরম্ভ করিল—যদি কোন ভস্মাচ্ছাদিত, কোন জটাজুটান্বিত, কোন গৈরিকাবৃত মানুষের মধ্য হইতে তাহার দশ বৎসর নিরুদ্দেশ স্বামী বাহির হইয়া পড়ে। যেখানে দলে দলে সন্ন্যাসীরা জটলা করিয়া আছে দেখে, সেখানে দলের ব্যূহভেদ করিয়া ঢোকে; যেখানে একা একা কেহ গাঁজা টানিতেছে বা আসন লাগাইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে দেখে, সেখানেও পাশে গিয়া দাঁড়ায়। কেহ বা গালি দেয়, কেহ একবারমাত্র তাহার মুখপানে তাকাইয়া স্ব স্ব কার্য্যে পুনর্ব্যাপৃত হয়, কেহ ভিক্ষা চায় এবং কেহ আধখানা আশীর্ব্বাদী ফল হাতে তুলিয়া দেয়। সে দিন সারাটা পূর্ব্বাহ্ণ কনখল হইতে ভীমগোডা পর্য্যন্ত এইরূপে ঘুরিয়া কাটিল। রমার আঁচলে কিছু পয়সা বাঁধা ছিল। মধ্যাহ্নে হর-কি-পৌরীর কাছে একটা দোকান হইতে পুরি-তরকারী লইয়া তাহারা আহার করিল। আধঘণ্টা গাছতলায় বিশ্রাম করিয়া আবার চলিল। ভীমগোডায় এক সন্ন্যাসিনীর আড্ডা দেখিল। তাহাদের নেত্রী পুরুষবেশিনী। তাঁহার মাথা মুণ্ডিত, কপালে ফোঁটা বিলম্বিত, গেরুয়া ধুতির উপর গেরুয়া পাঞ্জাবী পরা, দেখিলে পুরুষই মনে হয়, শুধু বক্ষের প্রসারে মাতৃজাতিত্ব ধরা পড়ে। তাঁহার কথাবার্ত্তাও পুরুষালী, পার্শ্বোপবিষ্ট কাহারও সঙ্গে ঘোর বৈদান্তিক তর্ক করিতেছেন। রমা অগ্রসর হইতে ভয় পাইল, কিন্তু তাঁহার কাছাকাছি একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী দেখিয়া ভরসা হইল। দূর হইতে নমস্কার করিলে নেত্রী বলিলেন, "আও বেটী, আও।" কণ্ঠে স্নেহের অমৃত ভরা—বেদান্তের বিরসতা তর্ক-যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

সারা সকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্তপদে এই নারী-মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই রমার বুকের বাঁধ ভাঙ্গ-ভাঙ্গ হইয়াছিল, তাহার উপর মাতাজীর স্নেহ-স্নিগ্ধ আহ্বানে বাঁধ আর থাকিল না। চোখের জলের প্লাবনে তাহার মুখখানি ভাসিয়া গেল। সে দুই হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া অশ্রু গোপন করিতে চাহিল। আঙ্গুলের ছিদ্র দিয়া টপ-টপ করিয়া ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু বাহির হইয়া আসিল। মাতাজীর বাঙ্গালিনী শিষ্যা তাহার পাশে আসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কোথা থেকে আসছ, মা?"

সে বেলাটা রমা ও টুলু সেইখানেই রহিল, এই সন্ন্যাসিনীর দলটি স্নেহ দিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিল। দলনেত্রীর নাম স্বামী আশানন্দ। সাধারণতঃ লোক তাঁহাকে আশামায়ী বলিয়া থাকে। রমা কতকটা আশ্বস্থ হইলে তিনি তাহার আত্মকাহিনী শুনিলেন।

গোয়ালন্দের কাছে চণ্ডীপুর গ্রামে তাহাদের বাড়ী ছিল। তাহার স্বামী নীরদ লাহিড়ী গোয়ালন্দ ষ্টীমার-ঘাটে চাকরী করিত। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিত। শনিবার সকাল হইতে সে গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। শনিবার রাত্রিটুকু বাড়ীর লোকের সঙ্গে কাটাইয়া, রবিবার ভোর হইতে নীরদ গ্রামের সেবায় নিযুক্ত থাকিত। তাহার এক অভিন্নাত্মা বন্ধু ছিল নসীর—গ্রামের বৃদ্ধ মৌলবী কবি হবিবুল্লার পুত্র। দুই জনে মিলিয়া গ্রামে একটি ব্রতী দল গঠন করিয়াছিল; তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, চামার, চাঁড়াল, বালক, বালিকা সকলকেই সামিল করিয়াছিল।

রবিবার সকালে তাহাদের ড্রিল করাইত, ড্রিলের পর একত্র বসিয়া জলযোগ হইত। তাহার পর গত সপ্তাহের কার্য্যের রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া ও আগামী সপ্তাহে গ্রামে কয়টি গৃহে রোগীর সেবা প্রয়োজন, গ্রামস্থ কোন্ বিপন্নের আর কিরূপ সাহায্যের আবশ্যক, তাহার একটি ফর্দ্দ লইয়া এবং ব্রতী দলের মধ্যে আগামী সপ্তাহের জন্য কার্য্য বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিত।

দুই প্রহরে সে নিজে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী দেখা করিয়া কুশল, অকুশল বার্ত্তা জানিয়া আসিত; যাহার যেটি প্রয়োজন, সেটি প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিত। কিন্তু নসীরের সহিত খোলাখুলিভাবে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসায় গ্রামের দুই একটি বিজ্ঞ পুরুষ তাহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহাকে জাতে ঠেলিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির বিপক্ষে যাহারা বাধা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা গ্রামের নারী-রাজ্য হইতে। ঘরে ঘরে গৃহিণীরা নীরদ ও নসীরের সেবামুগ্ধ, গ্রামের নারীমতকে তাহারা নিজের ইচ্ছামত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল।

সে গ্রামে এবং তাহার আশপাশের কতিপয় গ্রামেও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারা পাশাপাশি নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছিল। নীরদ ও নসীরের প্রযত্নে তাহাদের প্রীতিসম্বন্ধ আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। কবি হবিবুল্লার গান গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার বাঙ্গালা লাইব্রেরী গ্রামের সকলের উপজীব্য ছিল। নসীরের মাতা হামিদা বিবি গ্রামের হিন্দু-গৃহিণীগণের 'দিদি।' হঠাৎ কিছু দিন হইতে সে গ্রামে দুই জন অপরিচিত মুসলমানের গতিবিধি আরম্ভ হইল। তাহারা মুসলমান-গৃহে অনাহূত আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, প্রতিদানস্বরূপ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজ বপন করিতে চেষ্টা করে। দুই চারি বার এইরূপ চেষ্টার পর প্রত্যাখ্যাত হইয়া চলিয়া যায়।

ইহার পর এক সোমবার রাত্রিতে নীরদ বাড়ী নাই, রমা, টুলু ও তাহার শাশুড়ী সকাল সকাল দরজায় খিল দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ একটা আলোর ঝাপটায় রমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিতেই দেখে, ঘরভরা লোক, এক জনের হাতে মশাল, দুই জন তাহার পা চাপিয়া ধরিয়াছে, আর এক জন তাহার মুখে কাপড় গুঁজিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য রমার মনে হইল, স্বপ্ন দেখিতেছে। পরমুহূর্ত্তে উঠিবার চেষ্টা করিতেই আর দুই জন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। ইতোমধ্যে টুলুও জাগিয়াছে। শাশুড়ী পাশের ঘরে ছিলেন, কিছু জানিতে পারেন নাই। টুলু ধড়মড় করিয়া তাহার দিকে আসিতেই একটা লোক রমাকে উঠাইয়া কাঁধে ফেলিল, মশাল নিবিয়া গেল, এবং টুলুর মাথায় একটা বাড়ির শব্দ শুনা গেল। তাহার পর তাহাকে কাঁধে করিয়াই তাহারা অন্ধকারে নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই রাত্রির পর ছয় মাসের ঘটনা সে নিজমুখে বর্ণনা করিতে পারিবে না। ছয় মাস অন্তে নসীর ঠাকুরপো হঠাৎ আসিল। কি কৌশলে তাহাকে উদ্ধার করিল, বলিতে পারে না, নসীর তাহাকে বাড়ী লইয়া গেল, এই জানে। বাড়ীতে গিয়া দেখে, শাশুড়ী ও টুলু আছেন, নীরদ নাই। নীরদের গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণের ইতিহাস সে পরে শুনিল।

যে দিন বালক টুলু আহতাবস্থায় গোয়ালন্দে গিয়া নীরদ ও নসীরকে খবর দিয়া ডাকিয়া আনিয়াইছিল, সেই দিনই নসীর সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিয়াছিল, হয় রমাকে খুঁজিয়া আনিবে, নচেৎ গ্রামে আর মুখ দেখাইবে না।

নসীর চলিয়া গেল, নীরদ গ্রামে রহিল। এক দিন গ্রামের এক জন মুরব্বী নীরদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়া ইঙ্গিত করিলেন—"এ কায নসীরেরই, রমাকে খুঁজিয়া আনিতে যাওয়া ছলমাত্র।"

তাহার পর হইতে গ্রামে এই সন্দেহটা নানা আকারে, নানা ইঙ্গিতে, নানা ভাষায় ব্যক্ত হইতে থাকিল। হামিদা বিবিরও কানে গেল।

নীরদ আজকাল কোথাও যায় না, বাড়ীতেই থাকে। হামিদা বিবি এক দিন নীরদের গৃহে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"বাবা, তুমিও কি এই জঘন্য সন্দেহ কর?"

নীরদ বলিল, "না, মাসী! যে দিন এমনতর কুশ্রী সন্দেহ আমার মনে. আসবে, সে দিন নিজের প্রতিও বিশ্বাস হারাব।"

হামিদা বিবি বলিলেন, "একে তোর এই বিপদ, বৌমা না জানি কি কষ্টেই আছেন, তার উপর নসীরের নামে এই

কলঙ্ক, আমরা ম'রে আছি বাপ। মৌলবীসাহেব আর গান গান না।"

সে দিন নীরদ হবিবুল্লার কাছে গেল। বৃদ্ধ তাহাকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। পিতার কোলে শিশুর মত নীরদ তাঁহার কোলে লুটাইয়া পড়িল। যে অশ্রু নিজের মা'র কাছে রোধ করিয়াছে, তাহা আজ অবারিত ধারায় ছুটিয়া বৃদ্ধের বুকের বসন সিক্ত করিল।

গ্রামের হিন্দু ও গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু অলক্ষ্যে একটা মনান্তরের প্রাচীর গাঁথিয়া উঠিতে থাকিল। এ গ্রামের মুসলমানরা সম্পূর্ণ নিরীহ, অথচ অন্য গ্রামের দুর্বৃত্তদের অপরাধে হিন্দুরা কেন তাহাদেরই শ্রেষ্ঠ এক জনকে অপরাধী করিতেছেন, তাহার উপর অযথা সন্দেহ করিয়া সে গ্রামের সমস্ত মুসলমানকে কলঙ্কিত করিতেছেন। নীরদ ও নসীরের গঠিত ব্রতী দল ভাঙ্গিয়া গেল, গ্রাম্যশ্রী গ্রামকে পরিত্যাগ করিলেন।

নীরদ কিছু দিন ধরিয়া এই অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিল, কিন্তু অবশেষে পরাভব মানিল। তাহার নিজের মা তাহার বিরোধী।

এক দিন মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বৌকে যদি ফিরে পাই, বৌকে ঘরে নেবে ত?"

মা বলিলেন, "সে কি হয়, বাছা!"

"কেন হয় না? তাহার কিসের অপরাধ? স্বেচ্ছায় ত যায় নি সে।"

"না-ই যাক্, জাত ত গেছে তার। তাকে ঘরে নিলে যে সমাজে আমরা জাতে ঠেলা হব।"

"তা হলুমই বা। না হয় একঘরে হয়ে থাক্‌ব।"

"ষাট্ ষাট্, এমন কথা বলে! তোর আবার বিয়ে দিয়ে নতুন বৌ ঘরে তুলে নেব, সুখে ঘরকন্না করবি। বাপ-দাদার ভিটেয় একঘরে হয়ে থাক্‌বি কেন? তাঁরা ছিলেন সমাজপতি, তুই হবি পতিত? বালাই!"

নীরদ সে দিন হামিদা বিবির কাছে গিয়া মা'র সঙ্গে কথোপকথনের মর্ম্ম শুনাইয়া বলিল, "মাসী, যদি বৌ ফিরে আসে, তাকে তোমার কাছে রেখো। আমার সমাজে, আমার গৃহে, আমার বাপদাদার ভিটেয় তার আর স্থান নেই। নেই, আমারও আমি এ ঘৃণিত সমাজ ছেড়ে চল্লুম।"

হামিদা বিবি বুঝাইলেন, "সমাজ কেন ছাড়বে, বাপ! সমাজ যদি বিগড়ে থাকে, তার সংস্কার কর, ত্যাগ করো না।"

অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে নীরদ বলিল, "সে বল আমার নেই। এই গলিত শবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা আমার সাধ্যাতীত। এত দিন সেবা দিয়ে তাকে উঠাতে চেয়েছিলুম, পারলুম না। এবার অপমান দিয়ে তাকে ক্ষুব্ধ করব—প্রতিশোধ নেব। যে সমাজ আমার নিরপরাধিনী স্ত্রীকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে, সে সমাজ আমার ত্যাজ্য। তাকে সংস্কারের দুরাশা আর রাখিনে, তাকে সংহার করব। মরাকে আরও মারব। বৌকে ফিরে নিলে, সমাজের বিরুদ্ধাচার ক'রে না কি আমি পতিত হব—আচ্ছা, সমাজানুমোদিত পথেই পতিত হই, তাতে মা'র অসন্তোষ হবে না। মা আমার সমাজ লইয়া থাকুন; তাঁর বিচারবুদ্ধি—মানবপ্রেমিকতাকে শত কোটি প্রণাম।"

হামিদা বিবি নীরদকে কোলে টানিয়া বলিলেন,—"পাগলামী করিসনে, বাছা! সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বৌকেও ত্যাগ করবি? বৌ যে দিন ফিরবে—কার আশায় প্রাণ ধ'রে থাক্‌বে?"

"বৌ ফিরবে না, মাসী, সে বৌ এ পৃথিবীতে—নয় ত এত দিনে ফিরত।"

বলিতে বলিতে নীরদ পাগলের মত ছুটিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই দিন হইতে সে নিরুদ্দেশ।

রমা গ্রামে ফিরিলে শাশুড়ী তাহার মুখ দেখিলেন না। সে হামিদার কাছেই রহিল। স্বহস্তে পাক করে, ইষ্ট-দেবতার পূজা করে, সমস্ত হিন্দু আচারই রক্ষা করে। কিন্তু গ্রামের হিন্দুরা তাহার খবর লয়েন না। টুলু মধ্যে মধ্যে মাকে লুকাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। নসীর রমাকে গ্রামে পৌঁছাইয়াই আবার নীরদকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। হামিদা চিঠি দিয়া রমার মাকে আনাইলেন, তাঁহার সঙ্গে রমাকে কাশীতে পাঠাইলেন। হপ্তাখানেক পরে টুলু বাড়ী হইতে পলাইয়া কাশীতে যাইয়া জুটিল, সে কিছুতেই বৌদিদির কাছ-ছাড়া হইবে না। দশ বৎসর তাহাদের কাশীতে কাটিয়াছে। লোকমুখে শুনা যায়, নীরদ সন্ন্যাসী হইয়াছে। তাই কুম্ভের সন্ন্যাসিমেলায় তাহার দর্শন আশায় তাহারা বাহির হইয়াছে। নসীরের আর সেই পর্য্যন্ত কোন খবর নাই।

আশাময়ী রমার কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া

বলিলেন, "এখানে লক্ষ লক্ষ সাধুর মধ্যে এক জন বাঙ্গালী সাধুকে খুঁজিয়া পাওয়া তোমার দুষ্কর হইবে। এক জন আছেন সত্যানন্দ স্বামী, তাঁর কাছে সন্ধান পাইলেও পাইতে পার। তাঁর বহু শিষ্য। আনন্দবাগে তাঁর ডেরা লাগিয়াছে, এখান হইতে বেশী দূর নয়। তাঁর কাছে যাও।"

তখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই। টুলু ও রমা আনন্দবাগের দিকে চলিল। সত্যানন্দ স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া যথাস্থানে উপনীত হইল। এক বৃহৎ আটচালায় শতাধিক সন্ন্যাসী বিরাজমান। কেহ পাঠ করিতেছেন, কেহ ধূমপানের আয়োজন করিতেছেন, কেহ গল্প করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষায় মাঝে মাঝে কথোপকথন শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু হিন্দীরই প্রাবল্য। একটা ত্রিপলের পর্দ্দা দিয়া আটচালার একাংশ বিভক্ত করা হইয়াছে। পর্দ্দার ওধারে বিনা হুকুমে যাইবার যো নাই। মহারাজ সত্যানন্দ সেখানে বিরাজ করেন। এক জন শ্মশ্রুগুম্ফাবৃতবদন বাঙ্গালাভাষী সাধুর পাশে গিয়া রমা সসম্ভ্রমে বলিল, "মহারাজের দর্শনে এসেছি, দর্শন হবে কি এখন?"

সাধু তাহার দিকে দৃক্পাতমাত্র না করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, "এখন হবে-টবে না।"

রমা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া আর একটি সাধু দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "তুমি বসো এখানে, আমি দেখে আসছি।"

সাধু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, তাঁর কাছে এখন লোক আছে।"

রমা ও টুলু সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পর্দ্দা তুলিয়া একটি স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিল। পূর্ব্বোক্ত সাধু বলিলেন, "এইবার তুমি যেতে পার।" টুলুও সঙ্গে যাইতেছিল, সাধু বলিলেন, "এক জন এক জন ক'রে যাবার হুকুম।"

রমা থমকিয়া গেল। পর্দ্দার ভিতরে একা যাইতে তাহার পা অগ্রসর হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া টুলুকে বলিল, "আচ্ছা, তুই বোস, আমি হয়ে আসি।"

পর্দ্দা তুলিয়া ভিতরে প্রথমটা অন্ধকার পাইল। তাহার পর চোখ অভ্যস্ত হইয়া আসিলে দেখিল, ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর এক জন সন্ন্যাসী অর্দ্ধশায়িত, তাঁহার মুখ স্পষ্ট লক্ষ্য হইল না। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রমা এক পাশে বসিল। সাধু অর্দ্ধশয়ান অবস্থাতেই বলিলেন, "কি চাই তোমার?" রমার যে কি চাই, তাহা বলিতে সাহসে কুলাইল না। এত বড় সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যে সে শুধু একটি নিরুদ্দেশ মানুষের সন্ধান জানিতে আসিয়াছে, তাহা বলিতে বাধিল। সে বলিল—"অনুগ্রহ ক'রে যদি কোন মন্ত্র দান করেন।"

সাধু বলিলেন, "মন্ত্রের মূল্য দিতে পারবে?"

রমা বলিল, "যদি শক্তিতে কুলায়! আদেশ করুন, কি মূল্য।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "হিন্দুর মেয়েকে তাও বল্‌তে হবে? জান না, গুরুর পদে তনু, মন, ধন না বিকোলে মন্ত্রলাভ হয় না, লাভ হলেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না? তোমার ধরম, করম, সরম, ভরম সব গুরুকে দিতে পারবে? গুরুই তোমার ইষ্ট হবেন। গুরুর প্রতি অনন্যভক্তি হবে?"

রমা নিজের অন্তরে ডুব দিয়া দেখিল, সেখানে স্বামী ছাড়া আর কোন ইষ্ট নাই, থাকিতে পারে না। উত্তর দিল, "যদি না পারি?"

"তবে মন্ত্র পাবে না।"

রমা বলিল, "মন্ত্র চাই না।"

"তবে কি চাও?"

"মন্ত্রণা।"

"কিসের?"

"আমার নিরুদ্দেশ স্বামিলাভের।"

সত্যানন্দ উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামীর নাম কি?"

"তাঁর নাম ত লইতে পারি না, গ্রামের নাম বলতে পারি।"

"তাই বল।"

"চণ্ডীপুর।"

পাঁচ মিনিট একটা নিস্তব্ধতা যেন পাখা বিছাইয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন রাখিল। হঠাৎ দুই হাতে যেন সেই নিস্তব্ধতা ঠেলিয়া তাহার চিরপরিচিত স্বরে সত্যানন্দ ডাকিলেন, "রমা।"

সেই স্বরে রমা কাঁদিয়া উঠিল; সত্যানন্দর পায়ে লুটাইয়া বলিল, "তুমি?"

এখনও গৃহে আধো আলো, আধো ছায়া, কেহ কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না।

যখন কথা কওয়ার অবস্থা হইল, সর্ব্বপ্রথমে রমা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন চ'লে এলে? আমার জন্যে অপেক্ষা করলে না কেন?"

"সমাজকে শাস্তি দিতে।"

"সমাজের কি শাস্তি হ'ল?"

"আমার মত সেবককে হারালো। তা'র চেয়ে বেশী শাস্তিও দিয়েছি, নিজেকে পতিত করেছি। চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিয়েছি।"

"কেমন ক'রে?"

"যে সমাজ নিরপরাধিনীকে শাস্তি দিতে অদ্বিতীয় পটু, আর ধর্ম্মের আড়ে অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতে যার অগাধ পাণ্ডিত্য, তার হাড়ে হাড়ে দুর্নীতির বিষ ঢেলে দিতে সহায়তা করেছি। একটি সতী নারীর প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গুরু সেজেছি, গুরুর ভেকে গুরুবাদ প্রচার ক'রে শত শত হিন্দু নারীর সতীত্ববুদ্ধি নষ্ট করেছি। হা-হা-হা! তাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয়নি। সেই সকল লুপ্তবুদ্ধি নষ্টধর্ম্ম নারীরা আধ্যাত্মিকতার চরমে চ'ড়ে সমাজে নির্ব্বিবাদে বাস করছে, আমার মত পাপিষ্ঠ সমাজের প্রণম্য হচ্ছে, আর তোমার মত সতী সাধ্বী সমাজের ত্যাজ্যা। আমার সন্ন্যাসগ্রহণের গুরু সাজার কারণই এই ছিল—প্রতিশোধস্পৃহা। তা খুব চরিতার্থ হয়েছে।"

সত্যানন্দ পাগলের মত হাসিয়া উঠিল।

স্বামীর আত্মকথা শুনিয়া রমার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া বলিল—"যা হয়েছে, হয়েছে। এখন তোমার এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমি সতী, তোমায়, প্রভু, সৎ হ'তে হবে। হবে?"

সত্যানন্দ বলিল,—"হব!"

"কি করবে?"

"তুমি আসার আগেই স্থির করেছিলুম, কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন ক'রে এ পাপজীবন ধৌত করব—আর উঠব না।"

রমা বলিল,—"আমিও যাব, দু'জনে একত্রে ডুবব।"

"হাঁ, দু'জনে একত্রে, রাত দু'টোয় যাত্রা করব, এস তুমি।"

রমা উঠিল। টুলুকে লইয়া আশামায়ীর আশ্রমে ফিরিয়া গেল। টুলুকে কিছুই বলিল না। আশামায়ীকে জানাইল, "স্বামীর সঙ্গে কাল মিলন হবে, মহারাজ আশা দিয়েছেন। আমি একা যাব, টুলু আপনার কাছে থাকবে।"

পরদিন কুম্ভস্নানের প্রধান দিন। রাত্রি দুইটা হইতে মুমুক্ষুগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের জন্য নিক্রান্ত হইয়াছে। এক দল হর কি-পৌরী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছে, আর এক দল স্নানে যাইতেছে। বাঁশের বেড়া বাঁধিয়া আগম ও নিগমের দুইটি বিভিন্ন পথ করা হইয়াছে। হঠাৎ কোন এক সময় বেড়া ভাঙ্গিয়া গেল। দুই দিকের দুই উত্তাল জনতরঙ্গের সংঘাত হইলে, একের উপর আর একটি আসিয়া পড়িল। হাজার হাজার নর-নারী আহত, দলিত, মথিত হইল।

অন্ধকারে, নক্ষত্রালোকে প্রিয়জন প্রিয়জন হইতে বিচ্যুত হইল, শিশু মাকে খুঁজিতে লাগিল, মা শিশুকে খুঁজিতে লাগিল। স্বামী, সোদর, পিতা-মাতা, বন্ধু কেহ কাহার দিশা পাইল না। দলিতের আর্ত্তনাদে, বিচ্ছিন্নের ক্রন্দনরোলে আকাশ স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ঊষালোকে দেখা গেল, শত শত মৃত দেহ রাজপথে পড়িয়া আছে। যে যার হারানো স্বজনের সন্ধান করিতেছে।

সত্যানন্দের শিষ্যরা মহারাজকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা। তন্ন তন্ন করিয়া প্রতি শবদেহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে এক জন অবশেষে দ্বিপ্রহরে সহস্র মনুষ্যপদবিতাড়িত সত্যানন্দের লাস সনাক্ত করিল, তাঁহার পাশেই একটি রমণী চিরনিদ্রায় শায়িত, মহারাজের মুষ্টিতে তাহার মুষ্টি বাঁধা। সে তাঁহাদের উভয়কে চিনিল,—সে গৈরিকধারী নসীর।

শ্রী সরলা দেবী

যৌবনের বিদায়

জানি তুমি যাবে, ধরিয়া তোমারে যায় না রাখা,
এত তাড়াতাড়ি তবু যাবে ছাড়ি ভাবিনি ভুলে,
অসীমের পানে উড়িতে বিমানে মেলেছ পাখা
অশ্রু বৃথাই করে থই থই এ আঁখি-কূলে।
সুরু করেছিনু জীবন-যাত্রা যাদের সাথে,
এখনো তারা যে নিতি নব সাজে আমোদে মাতে;
সহসা ও হাত রাখিলে বন্ধ আমারি হাতে
বিদায়ের কথা মোরেই প্রথম বলিলে খুলে।
দেরী হয়ে গেল আয়োজনে, মোর জীবনপাতে
বহু বাকী তাই, তবু আঁখি তাই পড়িল ঢুলে।

ঝ'রে যায় ফুল, মৌমাছিগুলি সময় বুঝে
একে একে মধুচক্র ছাড়িয়া উড়িয়া যায়।
পাখীর কূজনে সে মাধুরী আর পাই না খুঁজে
জোছনা মলয়ে এ দেহ এখন পুড়িয়া যায়।
আনন-কাননে কুন্দের পাঁতি পড়িছে ঝ'রে,
তুষারে তুষারে গেল যে আমার এ শির ভ'রে
নয়ন-গগনে প্রখর দীপ্তি আসিছে ম'রে,
আত্মা আমার দেহের নিকটে হিসাব চায়,
দেনার তাগিদে ব্যাধিরা আসিয়া দাঁড়ায় দোরে
প্রেয়সী-অধরে সে মাধুরী আর মিলে না হায়।

যাবে চ'লে চোর, কত কথা মোর হয় নি বলা,
কত কাজ আমি করিয়াছি সুরু হয় নি সারা,
গেল যে সময় তন্ত্রী বাঁধিতে সাধিতে গলা,
কত গান গাওয়া হলো না, অগীত রহিবে তারা।
কত আশা মোর মুকুলে জেগেছে ফুটেনি ফুলে,
কত কল্পনা এখনো মানস-নয়নে দুলে,
পিয়াসা এখনো জ্বলিছে আমার কণ্ঠমূলে,
তুমি নিয়ে যাবে ভৃঙ্গার-ভরা সুধার ধারা,
হরি' নিলে জ্যোতিঃ, পৌরুষ, মতি কল্পকলা,
জীবনের গুরুভার শিরে এবে র'বে কি খাড়া?

কাঙালের ঘরে লভি আতিথ্য পেয়েছ হেলা,
রাখিতে পারি নি তোমারে এ গৃহে সগৌরবে,
মধুমাসে তব জমাতে পারি নি মোহনমেলা
মাতিতে পারি নি প্রাণ খুলে তব মহোৎসবে।
কমলা ভারতী শচী রতি সতী পূজায় তব
যোগাতে পারি নি ষোড়শোপচার নিত্য নব,
কতই চেয়েছ, পাওনি, —সে কথা কতই ক'ব?
তোমারে ধন্য তুষ্ট করিতে পেরেছি কবে?
না হ'তে সময় তাই কি অতিথি ভাঙ্গিয়া খেলা,
নিদয় হৃদয়ে এ দেহ হইতে বিদায় ল'বে?

দিয়াছিলে যাহা সবি ত আজিকে লইলে লুটে,
দাও নাই যাহা, ছাড়িলে না নিতে সে ধনগুলি!
ফুল ঝ'রে যায় ফল র'য়ে যায় বৃন্তপুটে,
কি ফল রাখিলে? বিফল ফুলের পরাগ-ধূলি?
ফাগে রাঙ্গা কেশ, ভাঙ্গা গলা শুধু রেখেছ বাকী,
আশা-হীন বুক, হাসি-হীন মুখ, অরুণ আঁখি,
খাঁচাটি রাখিয়া সাথে নিলে ঐ প্রেমের পাখী,
রঙ নিয়ে শেষে রেখে গেলে শুধু শুষ্ক তুলী,
রেখে যাহা গেলে, তা' নিয়ে বন্ধু কি ক'রে থাকি?
পঙ্গু লেখনী, প্রাণভরা মসী, স্মৃতির ঝুলি!

তুমি যাবে জানি মরণেরে মোর ডাকিয়া দিতে,
তোমার বিদায়ে গাই তাই আজ তাহারি জয়,
তুমি এলে, সব দিয়ে থুয়ে শেষে হরিয়া নিতে,
নিঃস্বের আজি বিশ্বে নাহিক দস্যুভয়।
তুমি চ'লে গেলে জীবনের সার মাধুরী হ'রে,
সে আসে আসুক, তার ভয়ে আর র'ব না ম'রে,
তোমার মতন একলা ফেলিয়া যাবে না স'রে,
সাথে নিয়ে যাবে জরা যন্ত্রণা করিয়া ক্ষয়,
তুমি দিলে জরা নবীন জীবন সে দিবে মোরে,
তোমার মতন মরণ এমন নিঠুর নয়!
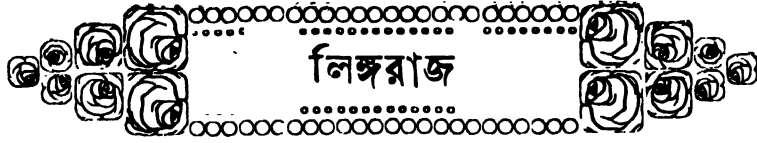
লিঙ্গরাজ

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির আর্য্যাবর্ত্তের শিখর-বিশিষ্ট বাস্তুশাস্ত্রোক্ত নাগর মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই মন্দিররাজ অপেক্ষা কোণার্কের মুখমণ্ডপ বা জগমোহন যে অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। তন্মধ্যে এক কারণ, কোণার্কের মুখমণ্ডপ সকলেই দেখিতে পারেন এবং চামড়াযুক্ত কেমেরার সাহায্যে তাহার ফটোও তুলিয়া আনিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু ভিন্ন আর কেহ লিঙ্গরাজের নিকট যাইতে পারেন না এবং চামড়াযুক্ত কেমেরা লইয়া যাইয়া ফটো তোলাও চলে না। সুতরাং লিঙ্গরাজের শিখর ভিন্ন অপর অংশ অনেক সমজদার লোকের নিকট একপ্রকার অপরিচিত। কোণার্কের মুখমণ্ডপের বিশেষ যশোভাগ্যের আর এক কারণ আছে—ইহার কোন প্রতিযোগী নাই—মূল মন্দির, ভোগমণ্ডপ কোনটিরই শিখর বিদ্যমান নাই, ভিত্তিরও অল্প অংশমাত্র অবশিষ্ট আছে; আশে-পাশে যত উপমন্দির ছিল, সব লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং কোণার্কের মুখমণ্ডপের স্বরূপ দেখিবার এবং তাহার সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার কোন বাধা নাই। পক্ষান্তরে, লিঙ্গরাজের স্বরূপ দেখিবার এবং উপভোগ করিবার পথে বহু বাধা আছে। তন্মধ্যে প্রথম বাধা মুখমণ্ডপ। কিন্তু মুখমণ্ডপ মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গের শোভা উপভোগে বাধা জন্মাইলে ও সুছন্দোবদ্ধ হইলে যুগল মন্দির ও মণ্ডপ আর এক প্রকার শোভা প্রকাশ করে। লিঙ্গ-রাজের মুখমণ্ডপের সহিত যথাক্রমে নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ যুক্ত হওয়ায় যুগল মন্দিরের শোভাও বিনষ্ট হইয়াছে। এই ত গেল সম্মুখভাগের দিকের কথা। মন্দিরের আর তিন দিকের তিনটি "নিশার" বা বড় কোটরের সম্মুখে ক্ষুদ্রতর আর তিনটি মণ্ডপ থাকায় সেই তিন দিকও ভাল করিয়া দেখিবার উপায় নাই। তাহার উপর লিঙ্গরাজের আশে-পাশে ছোট-বড়, ভালমন্দ উপমন্দিরের ত অভাবই নাই। সুতরাং যিনি লিঙ্গরাজের কাছে যাইতে পারেন, তাঁহার পক্ষেও মন্দিরের যে অংশ অর্থাৎ গর্ভগৃহের ভিত্তি, নিকটে যাইয়া দেখিবার জন্য অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহাও ভাল করিয়া দেখিবার উপায় নাই।

কোণার্কের মুখমণ্ডপের তুলনায় লিঙ্গরাজ উপভোগের আর একটি অসুবিধা ইতিহাসের অভাব। কোণার্কের মন্দির ও মণ্ডপ উড়িষ্যার কোন্ নৃপতি কখন্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং সেই নৃপতির অন্যান্য কার্য্যকলাপ কি, তাহা আমরা ভাল করিয়া জানি; কোন্ কারিগর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও কতকটা জানি। কিন্তু লিঙ্গরাজের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভুবনেশ্বরে একটি প্রবাদ আছে, লিঙ্গরাজের শিখরাগ্রে একটি শ্লোক অঙ্কিত আছে, তাহার মর্ম্ম—৫৮৮ শকবর্ষে রাজা ললাটেন্দু কেশরী এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এবার লিঙ্গরাজ মন্দির সংস্কার হইতেছে এবং তজ্জন্য শিখরাগ্র পর্য্যন্ত ভারা বাঁধা হইয়াছে। সে দিন ভুবনেশ্বরে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এবার এই ভারা বাহিয়া যাহারা মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন, তাঁহারা কেহই কোন লিপি দেখিতে পায়েন নাই। নাগর রীতির অন্যান্য যে সকল পুরাতন মন্দিরের নির্ম্মাণের কাল জানা আছে, তাহাদের আকারের ও অলঙ্কারের সহিত লিঙ্গরাজের আকার ও অলঙ্কার তুলনা করিলে মনে হয়, লিঙ্গরাজ এত পুরাতন হইতে পারে না। এইরূপ মনে করিবার কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

মন্দিরের আকার এবং মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত ভাস্কর্য্যের ঢঙ্গ বা রীতি হিসাব করিয়া পণ্ডিতগণ একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। পরশুরামেশ্বরের গর্ভগৃহের দ্বারের চৌকাঠের উপরের কাঠে নবগ্রহমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই নবগ্রহের প্রত্যেকের মূর্ত্তির নিম্নে প্রাচীন নাগর অক্ষরে ক্ষোদিত আদিত্য, সোম, অঙ্গারক ইত্যাদি নাম আমি লক্ষ্য করিয়াছি। যে প্রকার অক্ষরে এই সকল নাম অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দে প্রচলিত ছিল। সুতরাং পরশুরামেশ্বরের মন্দির খৃষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং লিঙ্গরাজ যে তাহার পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য।

ভুবনেশ্বরের তিনটি মন্দিরে শিলাফলকে ক্ষোদিত মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতার প্রশস্তি আছে বা ছিল। তন্মধ্যে

১নং চিত্র—লিঙ্গরাজের নিম্নার্দ্ধ
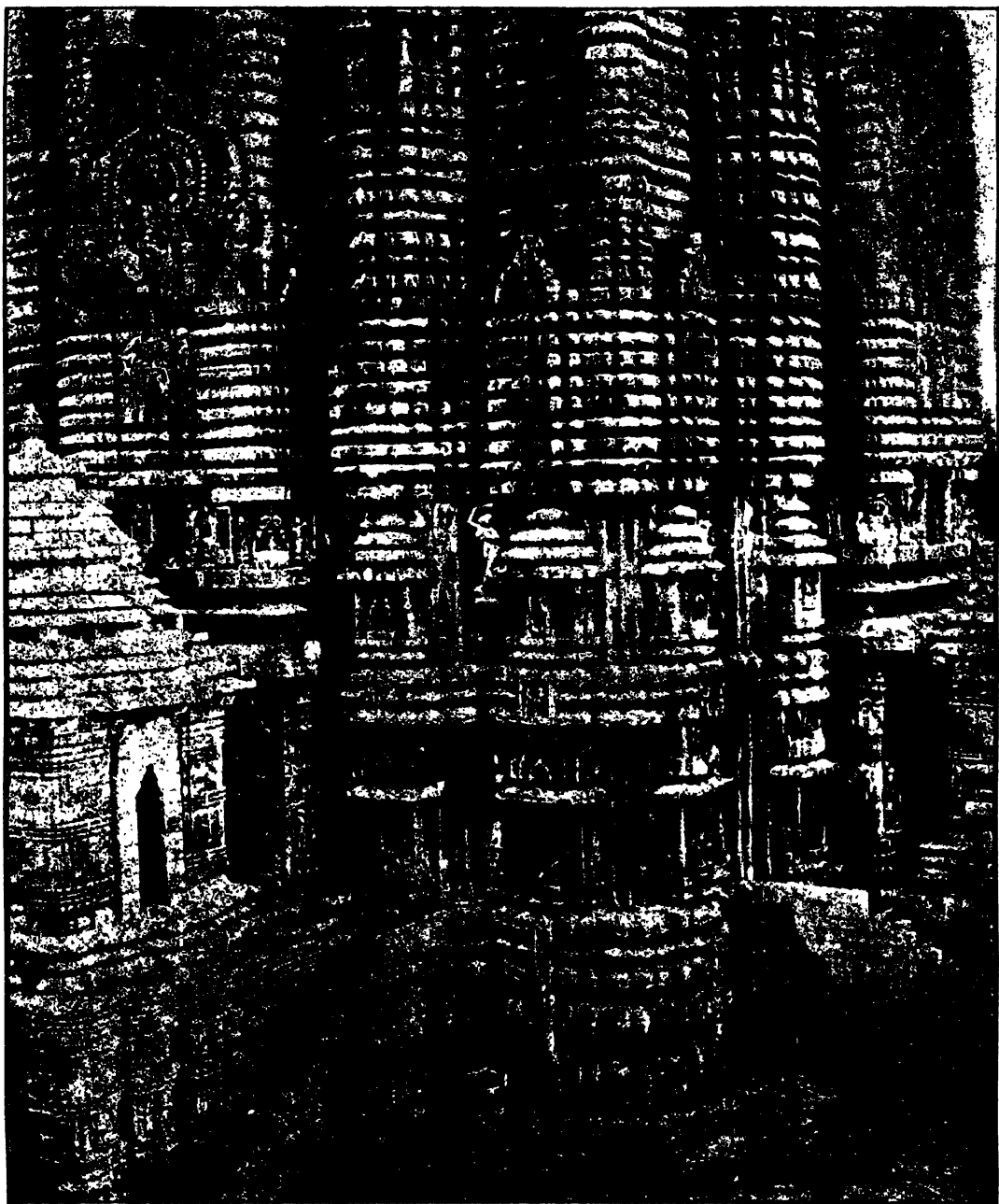
অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরের প্রশস্তিতে রাঢ়-বঙ্গের রাজা হরিবর্ম্মনের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের পরিচয় পাওয়া যায়। আর দুইখানিতে উড়িষ্যার রাজাদের বিবরণ আছে। বর্ত্তমানে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরের আঙ্গিনার প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন দুইখানি শিলালিপির মধ্যে একখানি ভবদেব ভট্টের প্রশস্তি। দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে দক্ষিণ-কলিঙ্গ হইতে আসিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরেও একখানি শিলালিপি ছিল এবং এই লিপিখানি এক সময় কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালের সপ্তম খণ্ডে মিষ্টার প্রিন্সেপ এই লিপির পাঠ, অনুবাদ এবং ছাপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মূল লিপিখানি এখন কোথায় আছে, তাহা কেহ জানে না। প্রিন্সেপের প্রকাশিত লিপির পাঠ হইতে জানা যায়, ত্রৈলিঙ্গ দেশের রাজা জনমেজয় উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। জনমেজয়ের পরে উড়িষ্যায় যথাক্রমে দীর্ঘরব, অপবার, বিচিত্রবীর, অভিমন্যু এবং চণ্ডীহর রাজত্ব করিয়াছিলেন। চণ্ডীহরের মহিষী মহারাণী কোলাবতী তাঁহার পুত্র উদ্যোতকেশরী রাজদেবের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খণ্ডগিরির গাত্রে ক্ষোদিত দুইটি মন্দিরে উদ্যোতকেশরীর রাজত্বের পঞ্চম ও অষ্টাদশ বৎসরের আর দুইখানি শিলালিপি পাওয়া যায়। এই উদ্যোতকেশরী খুব সম্ভব অ গ স্ত ব র্ম্ম ন-চোড়-গঙ্গ কর্ত্তৃক উড়িষ্যাবিজয়ের পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিদ্যমান ছিলেন এবং

২নং চিত্র—দিক্‌পাল বরুণ

দ্বিতীয় লিপি হইতে জানা যায়, উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজা অনিয়ঙ্কভীমের (অনঙ্গভীমের) সেনাপতি স্বপ্নেশ্বর মেঘেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অনিয়ঙ্কভীম ১১৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং মেঘেশ্বর আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ বলা যাইতে পারে। অনিয়ঙ্কভীমের পিতা অগস্তবর্ম্মন-চোড়-গঙ্গ খৃষ্টীয়

ঐ সময়ে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রহ্মেশ্বরের অলঙ্করণরীতির সহিত লিঙ্গরাজের অলঙ্করণরীতির যে যে অংশে সাদৃশ্য আছে, সেই সেই অংশে রাজারাণী, মুক্তেশ্বর, ভগবতী ও অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরের অলঙ্করণ-রীতির প্রভেদ আছে। ব্রহ্মেশ্বর দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন কতক পরিমাণে লিঙ্গরাজের অনুকরণে নির্ম্মিত ও

অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং এই হিসাবে সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্তি হয়, লিঙ্গরাজ উদ্যোতকেশরীর কোন পরাক্রান্ত পুর্ব্ব-পুরুষ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

লিঙ্গরাজের অভ্রভেদী শিখরের অনেক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং স্থাপত্যকলানুরাগী ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা কখনও ভুবনেশ্বরে গমন করেন নাই, তাঁহারাও সেই শিখরের সহিত সুপরিচিত। কিন্তু লিঙ্গরাজের নিম্নাংশ বা গর্ভগৃহ তত পরিচয় লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই। ১ নং চিত্রে লিঙ্গরাজের গর্ভগৃহের বহির্ভাগের এবং শিখরের নিম্নাংশের উত্তর-পশ্চিম কোণের প্রতিকৃতি আছে: আঙ্গিনা হইতে গর্ভগৃহ প্রায় ৩৩ ফিট (১১ গজ) উচ্চ। লিঙ্গরাজের গর্ভের এক পার্শ্ব পাঁচটি রথে বিভক্ত। এক একটি রথ এক একটি শিরার মত মন্দিরের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যের রথটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং উচ্চ। এই রথের নিম্নাংশে একটি বড় কোটর বা নিসা আছে। লিঙ্গরাজের গর্ভের পুর্ব্বদিকের নিসায় বিরাট গণেশমূর্ত্তি, উত্তরদিকের নিসায় বিরাট কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি, এবং পশ্চিম দিকের নিসায় বিরাট পার্ব্বতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যের রথের দুই পার্শ্বে যে দুইটি করিয়া রথ আছে, তাহা ক্রমশঃ নিম্ন। ১ নং চিত্রে লিঙ্গরাজের গর্ভের উত্তর পার্শ্বের তিনটি এবং পশ্চিম পার্শ্বের তিনটি রথ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিন পার্শ্বেরই মধ্যের রথের সম্মুখস্থিত মণ্ডপ এবং তাহার কদর্য্য সোপান মন্দিরের সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি করিয়াছে। ১ নং চিত্রে পশ্চিম পার্শ্বের মণ্ডপের কতক অংশ এবং সোপান দেখা যাইতেছে এবং উত্তর পার্শ্বের মণ্ডপের সোপানের কতক অংশও লক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যের রথ ব্যতীত অন্যান্য রথে দুই দুইটি করিয়া ফ্রেম অঙ্কিত আছে। ফ্রেমের চারি পার্শ্ব মনোরম কারুকার্য্যখচিত। গর্ভের চার কোণের দুই দিকের আটটি রথের নীচের ফ্রেমে অষ্টদিক্‌পালের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ ২ নং চিত্রে মকরবাহন পাশ-হস্ত বরুণের মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেওয়া গেল। ৩নং চিত্রে অপর একটি ফ্রেমের অন্তর্গত শিবপূজার চিত্র এবং ৫ নং চিত্রে গুরু শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন। তপঃক্লিষ্ট, প্রসন্ন, গম্ভীর এই গুরুমূর্ত্তি ভাস্কর্য্যের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গুরুর
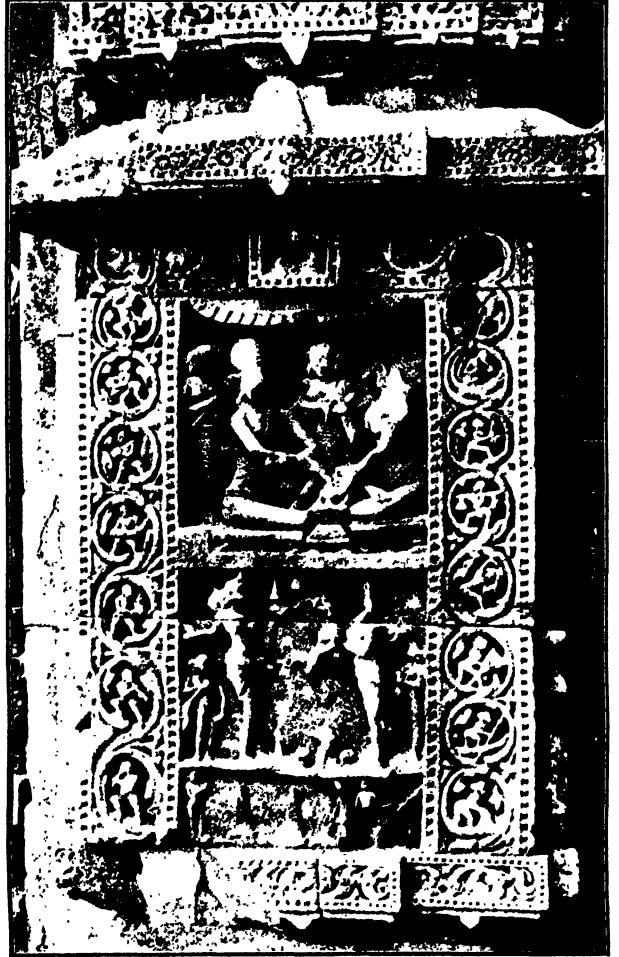
৩নং চিত্র—শিবপূজা

বসিবার ভঙ্গী স্বাভাবিক। তিনি যেন দক্ষিণ হাতখানি ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিয়া উপদেশ দিতেছেন। নিম্নে অঙ্কিত দুইটি শিষ্যমূর্ত্তিও সুন্দর। এই দুই জনের এক জন দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ফ্রেমের ভিতরে ছাড়াও রথের মধ্যে মধ্যে অনেক মনোরম চিত্র আছে। ৪ নং চিত্রে গোপালের মাখম-চুরীর চিত্রের একখানি প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। যশোদা দাঁড়াইয়া মাখম টানিতেছেন এবং গোপাল যে হাঁড়ি হইতে মাখম

চুরী করিয়া খাইতেছেন, তাহা চাহিয়া দেখিতেছেন। নন্দগোপ অপর দিকে বসিয়া নিবিষ্টভাবে গোপালের লীলা-খেলা দেখিতেছেন। নন্দ-যশোদা উভয়েরই মুখ আনন্দে ভরপূর। কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে পাছে গোপাল মাখমচুরী ছাড়িয়া "ভাল ছেলে" সাজিয়া বসে, এই ভয়ে উভয়েই যেন আনন্দের হাসি চাপিয়া রাখিয়া নির্নিমেষ নয়নে শিশুর দিকে চাহিয়া আছেন।

৪নং চিত্র—ননী-চুরি

লিঙ্গরাজের গন্ডের গাত্রে যে সকল চিত্র আছে, তাহার প্রত্যেকটির আশে-পাশে খানিকটা খালি যায়গা আছে—যেখানে কোন কারুকার্য্য নাই এবং কারুকার্য্যখচিত ফ্রেমে নিবদ্ধ চমৎকার চিত্র দেখিয়া যে দিকে তাকাইলে দর্শকের শ্রান্ত নয়ন সুখের পরম স্বস্তি লাভ করিতে পারে! মুক্তেশ্বর, রাজা, রাণী প্রভৃতি মন্দির দেখিবার সময় দর্শকের স্বস্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই; কেন না, এই সকল মন্দিরে কারিগররা দর্শকের নয়নের বিশ্রামলাভের উপযোগিভাবে অনালঙ্কৃত তিলমাত্র স্থানও রাখেন নাই। লিঙ্গরাজকে সাজাইবার জন্য যে সকল লতা-পাতা, ফুল-ফল, জীবজন্তু অঙ্কিত হইয়াছে, অলঙ্কারের হিসাবে মানুষ ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর আর কিছু কখনও আঁকিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। লিঙ্গরাজের গাত্রে অঙ্কিতমূর্ত্তিনিচয় উড়িয়া মূর্ত্তি-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সকল মূর্ত্তির গঠনে অনেক সময় কোমলতার অভাব থাকিলেও সজীবতার অভাব নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যশোদার মূর্ত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে (৪নং চিত্র)। যশোদার অঙ্গের গঠন কতকটা কঠোরতাব্যঞ্জক, কিন্তু হাত দুইখানি যেন অশ্রান্তভাবে দড়ি টানিতেছে এবং মুখের অর্দ্ধস্ফুট হাসির তুলনা দুর্লভ।

উপাস্য দেবতার বিগ্রহের রক্ষার জন্য মানুষ মন্দির রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আদৌ রক্ষার জন্য মন্দির গঠন করিতে আরম্ভ করিয়া মানুষ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিল, মন্দিরের বিগ্রহ-রক্ষা ব্যতীত আরও কিছু আদায় করা যাইতে পারে, মন্দির মানুষের শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। মন্দির মানুষকে কি শিক্ষা দান করিতে পারে? সুন্দর মহান্ মন্দির মানুষকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দান করে। ভয়ের ও লোভের বশীভূত হইয়া অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য মানুষ দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে আধ্যাত্মিক জগতের সীমান্তে বা সভ্যতার দ্বারদেশে পৌছিয়া তাহার ভিতরে

যখন মানুষ কতক দূর অগ্রসর হয়, তখন সে বুঝিতে পারে, যিনি উপাসনার চরম লক্ষ্য দেবাদিদেব, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ; তিনি সত্য, শিব ও সুন্দর; সুতরাং তখন ভক্তি আসিয়া তাহার হৃদয়ে ভয়ের স্থান অধিকার করে। ভক্তির প্রেরণায় মানুষ সৌন্দর্য্যের নিলয় আনন্দস্বরূপের আনন্দপ্রদ সুন্দর বিগ্রহ, সুন্দর প্রাসাদ বা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দু-সমাজে যে যুগে উপাসনার ক্ষেত্রে কর্ম্মকাণ্ডের বা জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য ছিল, সেই যুগের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সুন্দর মূর্ত্তির এবং সুন্দর মন্দিরের নিদর্শন দেখা যায় না, ভক্তিমার্গের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর মূর্ত্তি ও সুন্দর মন্দিরের অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন হিন্দুর জাতীয় হৃদয়ে ভক্তির প্রাধান্য ছিল, তত দিন সুন্দর মন্দিরের সৃষ্টি চলিয়াছিল। কোণার্কের ভগ্নাবশেষ সাক্ষ্য দান করিতেছে, উড়িস্যায় এই ভক্তির যুগ স্থায়ী হইয়াছিল—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

কোণার্কে যে ভোগমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহা মুখমণ্ডপের গাত্রসংলগ্ন নহে। মুখমণ্ডপ হইতে কিছু ব্যবধানে অবস্থিত। কোণার্কের পর যেন উড়িয়া জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল; ভয় ও লোভ ভক্তিকে বিদূরিত করিল; সৌন্দর্য্যবোধের শক্তি তিরোহিত হইল।

লিঙ্গরাজের মুখমণ্ডপের সংলগ্ন নাটমণ্ডপ এবং নাটমণ্ডপের সংলগ্ন ভোগমণ্ডপ এই অধঃপতনের যুগের সৃষ্টি। মুখমণ্ডপের সম্মুখে এই দুইটি মণ্ডপ যুক্ত হওয়ায় কি গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, ৬নং চিত্রে জগমোহনের পূর্ব্বপার্শ্বের প্রতিকৃতিতে তাহা দেখা যাইবে। এই যে একটি কদর্য্য প্রবেশপথ দেখাইতেছে, প্রথমে এ পথ ছিল না, ছিল বৃক্ষতলে নানা ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি-শোভিত এক সারি স্তম্ভ। এই স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তাহার ভিতর দিয়া জগমোহনে আলোক প্রবেশ করিত। এই সকল স্তম্ভের মধ্যে তিনটি এখনও বর্ত্তমান আছে এবং অপর কয়েকটি কাটিয়া ফেলিয়া প্রবেশের দ্বার করা হইয়াছে। নাটমণ্ডপ এবং ভোগমণ্ডপ যুক্ত হওয়ার পর সম্মুখস্থ প্রবেশের দ্বার দূরবর্ত্তী হওয়ায় লিঙ্গরাজের পূজারীরা কালাপাহাড়ী নীতি অবলম্বন করিয়া এই নূতন প্রবেশদ্বার খুলিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি বা সৌন্দর্য্যজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা কখনও এই দুষ্কার্য্য করিতেন না, লোভে তাড়াতাড়ি প্রণামী হস্তগত করিবার জন্য এবং আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এই দুষ্কার্য্য করিয়াছেন। মন্দিরের অপর তিন দিকে নিসামূর্ত্তিত্রয়ের সম্মুখে যে তিনটি মণ্ডপ রচিত হইয়াছে, তাহাও এক দিকে ভয়ের ফল,—ভয়, নিসামূর্ত্তিকে ফুল, চন্দন নৈবেদ্য দিয়া নিত্য পূজা না করিলে দেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন, আর অতিরিক্ত পুণ্য এবং অতিরিক্ত প্রণামী অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষার ফল। জাতীয় হৃদয় হইতে প্রকৃত ভক্তি তিরোহিত হওয়ায় সুন্দর মূর্ত্তি ও সুন্দর মন্দির গঠনের শক্তি এবং মূর্ত্তি ও
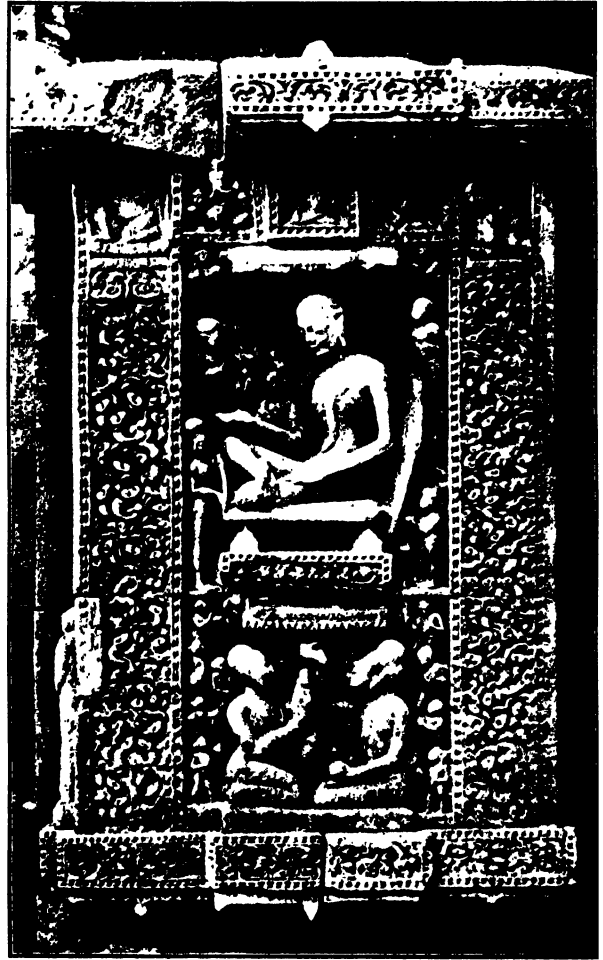
৫নং চিত্র—গুরু-শিষ্য

৬নং চিত্র---জগমোহন

মন্দিরের সৌন্দর্য্য উপভোগের শক্তিও তিরোহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কোণার্কের মন্দির নির্ম্মাণের ৩ শত বৎসর পরে প্রেমভক্তির অবতার চৈতন্য গাইয়া প্রেমভক্তির স্রোতে উড়িষ্যা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। চৈতন্যের প্রভাবে কত জনের হৃদয়ে যে প্রকৃত ভক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই ভক্তি উড়িষ্যার জাতীয় হৃদয়ে কতটা নব শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। অবশ্যই চৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সাহিত্যসৃষ্টিতে বহু জনের হাত আছে। একটা বড় মন্দির গড়িতে নানা শ্রেণীর বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন। সুতরাং মন্দিরে জাতীয় হৃদয়ের ভক্তি-শক্তির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যে তেমন পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দে উড়িয়া মজুর, উড়িয়া কারিগর, উড়িয়া স্থপতি যখন কোণার্কের বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তখন উড়িয়া সেনা সমগ্র রাঢ় জয় করিয়া গৌড়াধিপ মালিক তুগ্রিল তুমান খাঁর সেনাকে লক্ষ্মণাবতীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। স্থাপত্যের এবং যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে যেন একই শক্তির, জাতির চরিত্রবলের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। কোণার্ক-নির্ম্মাতা প্রথম নরসিংহদেবের রাজত্বের পর উড়িষ্যার অধঃপতন আরম্ভ হয়। তথাপি উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক হইতে অবিশ্রাম আক্রমণ সত্ত্বেও আরও ৩ শত বৎসরকাল উড়িষ্যা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যের ভক্ত গজপতি প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরই উড়িষ্যায় ঘোর অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হইল, এবং অচিরে উড়িষ্যার মন্দির কালাপাহাড়ের দ্বারা বিধ্বস্ত হইল, উড়িষ্যা পাঠানের পদানত হইল। যে চরিত্রবল এক দিন ভারতবর্ষের এক কোণের অধিবাসিগণকে কোণার্ক মন্দির নির্ম্মাণের এবং আত্মরক্ষার সামর্থ্য দান করিয়াছিল, সেই চরিত্রবল পুনরায় লাভ করিতে না পারিলে কিছুই করা এবং কিছুই গড়া সম্ভব হইবে না।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

হায় তুমি পুরুষ কি নারী!

(বাউল)

আমি জন্ম-অন্ধ, ঘুচাও দ্বন্দ, মনের সন্দ নিবারি,
তুমি হর কি হরি চিন্‌তে নারি কালা কি কালী,
বনমালী কখন হও নৃমুণ্ডমালী,
কভু ধর অসি, বাজাও বাঁশী, মজাও গোপের কুমারী।
তুমি অনঙ্গ কি অন্তরঙ্গ অরূপ কি সরূপ,
বিশ্বরূপ কি বহুরূপ বল হে স্বরূপ,
তুমি যে রূপেতে দাও হে দেখা সেই রূপই মনোহারী!
ধনুর্দ্ধারী রাম, কি তুমি বংশীধারী শ্যাম,
মদনমোহন সুঠাম হেরে ঝুরে মরে কাম,
তুমি কভু গৌর, কভু গৌরী ভক্ত-হৃদয়-বিহারী।
স্বরূপ কুরূপ সব অপরূপ রূপের মাধুরী,
বুঝতে নারি কোন্ ভাবে কার মন কর চুরি,
তোমার রূপটি যেমন নামটি তেমন
পিপাসী প্রাণের বারি।
তুমি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা ভক্তের ভগবান্,
বেদ-বেদান্ত ভেবে অন্ত পায় নাক সন্ধান,
পেয়ে পরম তত্ত্ব প্রেমে মত্ত ভাবে ভোলা ভিখারী।
তুমি ভাবের ভাবী যে তোমাকে যে ভাবে ডাকে
তেমনি ভাবে গুণমণি সদয় হও তাকে
আমার হৃদয়-মাঝে বিনোদ সাজে এস হে বংশীধারি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

তার সাড়া

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি দ্বার নাড়া,
পাই নি কি তার সাড়া ?
বাতায়নের মুক্ত পথে স্বচ্ছ শরৎরাতে
তার আলোটি মেশে নি কি মোর স্বপনের সাথে ?
হঠাৎ তারি সুরখানি কি ফাগুন হাওয়া বেয়ে
আসে নি মোর গানের পরে ধেয়ে ?

কানে কানে কথাটি তার অনেক সুখে দুখে
বেজেছে মোর বুকে।
মাঝে মাঝে তারি বাতাস আমার পানে এসে
নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আন্‌-মনাদের দেশে,
পথ-হারানো বনের ছায়ার কোন্ মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্যহীরার দলে !
বাসায় বইল পথের হাওয়া কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা ;
বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল মিলন ঘন রাতে
বাঁধনহারা শ্রাবণধারা পাতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
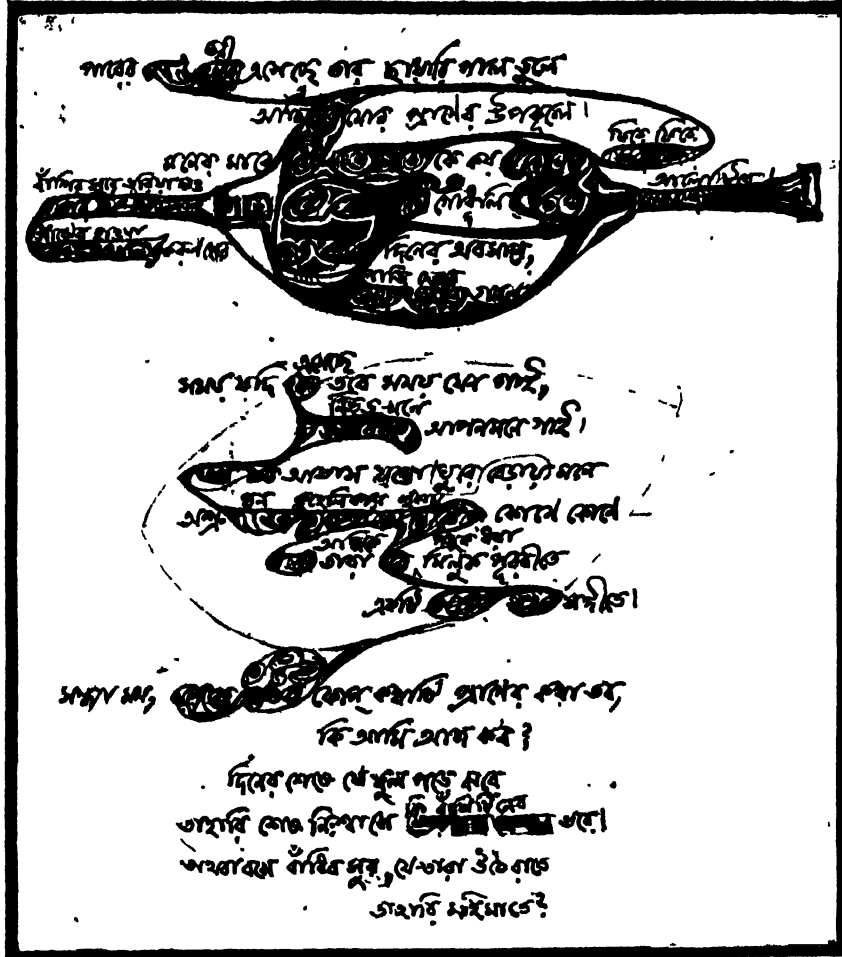
পারের তবী এসেছে তার ছায়ারি পাল তুলে
আজি এ মোব প্রাণের উপকূলে।
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে
বাঁশির সুরে ভরিয়া দাও গোধূলি আলোটিরে
সাঝের হাওয়া করুণ হেরি দিনের অবসানে,
পাড়ি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
নিভৃত খনে আপন মনে গাই।
আভাস যতো বেড়ায় ঘুরে মনে
অশ্রু ঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে

আজিকে তারা পড়ুক ধরা
মিলুক পুরবীতে
একটি সঙ্গীতে
সন্ধ্যা সম, কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব
কি আমি আজ কব?

দিনের শেষে যে ফুল পড়ে ঝরে
তাহারি শেষ নিঃশ্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে।
অথবা বসে বাঁধিব সুর, যে তারা উঠে রাতে
তাহারি মহিমাতে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন না কি?

১

পূজার ছুটীতে শিমুলতলায় বেড়াইতে আসিয়াছি। ভগিনী-পতি জীবনচন্দ্র সরকার এখানকার টেলিগ্রাফ আফিসের হেড বাবু। আজ তাঁহার ডিউটী রাতের বেলা, দিনের বেলা কোন কায-কর্ম্ম নাই। তাঁহার আশা ছিল, দিনটা আরামে ঘরে বসিয়া মাসিক কাগজগুলার পাতা উল্টাইবেন। কিন্তু আমাদের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহাকে সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইল। আমরাও কিছু দিন হইতে এই দিনটির মুখের দিকেই তাকাইয়া আছি। নিকটের পাহাড় হলদি-ঝোরায় গিয়া সে দিন বন-ভোজন করিব, ইহাই ছিল আমাদের সঙ্কল্প। অতএব তিনি রেহাই পাইলেন না। প্রত্যূষে আমরা রুটী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বেশ এক পত্তন ভোজন করিয়া লইলাম। তাহার পর দিদি বাঁশ-বাঁধা একটা ইজি-চেয়ারের ডুলীতে বাহক-স্কন্ধে উঠিলেন, আমরা তাঁহার প্রহরি-স্বরূপ পদব্রজে চলিলাম। পাহাড়টি যদিও বেশী উঁচু নয়, কিন্তু চড়াই-পথে উঠিতে নিতান্ত কম পরিশ্রম হয় না। ডুলীওয়ালারা স্থানে স্থানে বসিয়া, কোমরে বাঁধা থলি হইতে তামাকের পাতা বাহির করিয়া হস্ততালুকায় চুণের সহিত মলিয়া খৈনী প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা সেবনে প্রবৃত্ত হইল। আমরাও ইহাতে বিশ্রামের অবসর পাইয়া অসন্তুষ্ট হইলাম না। এইরূপ টিলা চালে চলিতে চলিতে আমরা যখন হলদিঝোরার নিকটে সমতল ভূমিতে পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় ৯টা। এখানে আসিয়াই দিদি রন্ধনে মনো-নিবেশ করিলেন। ভগিনীপতি নিকটে বসিয়া তল্পী-তল্পা খুলিয়া তাঁহাকে যোগাড় দিতে লাগিলেন। আমি পাশে বেকারভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, ভাগ্যিস্ মেয়েজাতটা এখনও নিছক মেয়েমানুষই আছে, তাই তবু এখনও একটু-আধটু সেবা-শুশ্রূষা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আজকাল মেয়েদের যে রকম পুরুষ গ'ড়ে তোলার প্রস্তাব হচ্ছে, তাহাতে ভবিষ্যৎটা একেবারেই তিমিরাচ্ছন্ন, পুরুষবংশটা তা হ'লে একেবারেই নির্ব্বংশ হবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। কিন্তু তা হ'লেই বা এমন কি ক্ষতি! এই ত জামাই বাবু দিদির পাশে ব'সে রান্নার ধোঁয়াটা চুরুটের ধোঁয়ার চেয়েও আরামে উপভোগ কচ্ছেন। তখন না হয় নিজের মুখের চুরুটটা ফেলে দিয়ে উনুনেই দিয়াশলাই ধরান যাবে।"

অতঃপর মনের ভাবটা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া দিদিকে বলিলাম, "চল না ভাই, দিদি, একবার একটু ঘুরে আসা যাক্।"

দিদি বলিলেন, "তা হ'লে রাঁধবে কে, মশায়?"

আমি বলিলাম, "জামাই বাবু রয়েছেন কি করতে? উনি ব'সে খিচুড়ীর হাঁড়িতে কাঠি দিন। তুমি এস, ভাই, বেড়াতে।"

ভগিনীপতি একটা কাষ্ঠদণ্ড আমার দিকে উঠাইয়া বলি-লেন, "বটে, খাওয়াচ্ছি তোমাকে ভাল ক'রে। একবার এ দিকে এস ত।" আমি হাসিয়া পলাইলাম।

তাঁহারা রান্না-বান্না লইয়া রহিলেন, আমি ঘুরিয়া অল্প একটু উপরে উঠিয়া ঝরণার পাশের একখানা পাতরের উপর বসিলাম। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে বনানীর কি শোভা! দুই দিকে লম্বা লম্বা তরুশ্রেণী কোথাও অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া-মিশিয়া, কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে বন-প্রহরীর ন্যায় নীল আকাশের অঙ্গে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মধ্য-ভাগে শিখরপ্রদেশ হইতে ঝরণার জলরাশি যেন মহাদেবের জটাজূটপ্রবাহিত গঙ্গাধারার ন্যায় কোথাও বা উৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসে, কোথাও বা ক্ষীণধারায় নীচের পাষাণদেহে পড়িয়া নিরুদ্দেশ প্রবাহে দূরদূরান্তরে যাত্রা করিতেছিল। এই বনস্থলের কোন্ অদৃশ্য স্থানে বসিয়া গৌরী তপস্যারত, কে জানে! কি রুদ্রগম্ভীর দৃশ্য! দেখিয়া মনে হইল, এমন মর্ম্মস্পর্শী শোভা বুঝি আর কখনও দেখি নাই। গত বৎসর দার্জ্জিলিংয়ে বার্চ্চহিলের রূপেও যে এইরূপ মোহিত হইয়াছিলাম, সে কথা এখন একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

হায় রে বিভ্রান্তচিত্ত মানব! কতক্ষণ আমি এইরূপ মুগ্ধ-চিত্তে বসিয়া ছিলাম, বলিতে পারি না। আহারের ডাকে হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। তখন দেখিলাম, বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, অবিলম্বে রন্ধনস্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম। দিদি আমার পাতে খিচুড়ী ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "দেখার সাধ মিটেছে ত? এবার ক্ষিদে মিটিয়ে ভাল ক'রে খা দেখি।"

এই সময় কাঠের বোঝা বহিয়া কতকগুলি বুনো মেয়ে কিছু দূরে একটা গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। জামাই বাবু বলিলেন, "দেখার সাধ না মিটে থাকে ত ঐ বনদেবী-দের একবার ভাল ক'রে দেখে নাও। দেশে গিয়ে এমন রূপ আর দেখতে পাবে না।"

আমি বলিলাম, "কেন, ওরা কি দেখতে মন্দ না কি? কেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ! আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে এক জনেরও যদি ও রকম চেহারা দেখতে পেতুম ত রাজার হালে বাজারে ব'সে স্বরাজ ঘোষণা করতুম। আহা, ক্যামেরাটা সঙ্গে না এনে বড় ভুল করেছি।"

জামাই বাবু খিচুড়ীর গ্রাস মুখে তুলিয়া বলিলেন, "বাস্ রে, শুনছ ত তোমার ভাইটির কথা। দেখো ভায়া, বনের মাঝে যেন মনটি হারিয়ে রেখে যেও না—তা হ'লেই সর্ব্বনাশ, এ আমি ব'লে খালাস।"

এইরূপ হাসাহাসি গল্পে আহারটি জমিল ভাল, কিন্তু খাওয়া শেষ করিয়াই ভগিনীপতি গৃহে ফিরিবার ধুয়া ধরিলেন। তখন মাত্র বেলা ২টা। পাহাড়ের দিগ্‌বিদিক্ সূর্য্যোজ্জ্বল, বনের ছায়াগুলাতেও সোনার রং ফুটিয়া উঠিয়া-ছিল। পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ই ত এই। আমি জিদ ধরিলাম, "তা হবে না। আর একটু ঘুরে ফিরে সেই ৪টার সময় বাড়ী ফেরা যাবে।"

জামাই বাবু কিন্তু নিজের মতলবে অটল থাকিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি তা হ'লে আর একটু থেকে যাও। মগরাকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম না করলে ত আমার চলবে না। আর পথে নারী বিবর্জ্জিতা করেও যেতে পারব না। দেখিস্ রে মগরা, বাবুকে ভাল ক'রে পাহাড় দেখিয়ে দিস্। তবে ফিরতে যেন রাত না হয়। তোদের এ ভুতুড়ে দেশ থেকে সন্ধ্যার আগেই নিশ্চয় বাড়ী ফেরা চাই।"

মগরা বলিল, "যে আজ্ঞে।" বহু দিন হইতে বাঙ্গালীর বাড়ী কায করিয়া সে বেশ এক রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা চলনসই বাঙ্গালা বলিতে পারিত।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি একটু এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া খানিকটা উপরে উঠিয়া ঝরণার ধারে বসিয়া খোস্-মেজাজে গান ধরিলাম—

"ওগো মানসপুরপ্রবাসী,
আঁখি তব দরশন-পিয়াসী—
আশার স্বপনে মিলায়ে,
থেকো না গো দূরে, ভুলায়ে
এস এ বক্ষ আলয়ে দুঃখ-কুয়াসা নাশি।"

গানের শেষ কথাটায় ই—ই করিয়া বেশ একটু টান দিয়াছিলাম। পিছনে হাসির রোল উঠিল; ফিরিয়া দেখি, হাসির আবেগে মগরার মোটা-সোটা শরীর কিম্ভূতকিমা-কার ভঙ্গীতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিতেছে। আমিও হাসি-লাম। না হাসিয়াই বা কি করিব? অসভ্য বুনো মগরা যে আমার গানের সমজদার হইবে, এরূপ মনে করাই ত বোকামী! স্বয়ং তানসেনও ইহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন না। তাই অক্ষুব্ধ চিত্তে বলিলাম, "ব্যাপারখানা কি? এত হাসি কেন তোর?"

মগরা। বাবুজীর গান শুনে বড় খুসী আসিল।

আমি। বটে, তা বেশ। আচ্ছা, তবে এবার তুই একটা গান শুনিয়ে আমার মেজাজটা খুসী কর্ দেখি।

মগরা। শুনবে, বাবুজী? তোমাদের রসিক বাবু আমার জন্য একটা গান বেঁধে দিয়েছে।

আমি। রসিক বাবু লোকটা কে?

মগরা। জান না বাবুজী?

সে খানিকটা হাসিল, তাহার পর বলিল, "রসিক বাবু, তিনি রসের কথা কন।"

আমি। আচ্ছা, কি গান বেঁধেছেন তিনি, আমাকে শুনিয়ে দে দেখি।

সে গাহিল:—

"তোম্ তোম্ তানা নানা তা ধিন্ ধিন্ তা ধিয়া।
আও রে মোর পিয়ারীজান্
আও রে পিয়ারীয়া।
তোঁরে গলায় দিব মটরদানা
কানে ঢেঁড়সিয়া।
তোরে খাইতে দিব মৌয়াপানা
কয়ব তোরে বিয়া॥

বাজবে মাদল ধুম্ ধুম্ গুম্ গুম্
ক্যা বাৎ কেক্কা হিয়া।
আও রে মোর পিয়ারীজান্
নাচ্ রে পিয়ারীয়া॥"

গান শুনিয়া আমারও অবস্থা তাহারই মত হইয়া পড়িল। হাসিতে যেন পাঁজরা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মগ্‌রার কিন্তু সে হাসির ছোঁয়াচ লাগিল না। সে গম্ভীরভাবে মৃদু হাস্যে বলিল, "বাবুজীর বড্ড হাসি লেগেছে।"

আমি বহু কষ্টে হাসি সামলাইয়া বলিলাম, "তোর পিয়ারীজান্ গান শুনে খুশী হয়েছিল ত?"

সে বলিল, "তা আর হবে না? ভারি নাচন নেচেছিল তানা।"

এই সময় নীচের রাস্তায় মেয়েলী গানের চীৎকার উঠিল। মগরা ত্রস্তে বলিল, "ঐ গো, সব ঘরে চলেছে, সাঁঝ আস্‌ছে। চল, বাবুজী, আর বিলম্ না।"

আমি চারিদিক্ চাহিয়া সাঁজের লক্ষণ কিছুই দেখিলাম না। চারিদিক্ তখনও বেশ উজ্জল। কেবল আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা ম্লানাভ বৃহৎ নক্ষত্রের প্রতি-বিম্ব দেখা গেল। ইহা সিরিয়াস বা বৃহস্পতি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করি নাই, বলিয়া আজ হঠাৎ মনে একটা আপশোষ জাগিয়া উঠিল। যাহা হউক, আমি মগ্‌রার কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়া চলিলাম। সে উপর হইতে নীচে তাহাদের ক্ষুদ্রগ্রামখানি আমাকে দেখাইয়া দিল। সেই দিকেই তখন কাষ্ঠবাহী নরনারী দ্রুত চলিতেছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ পাহাড়ের এক যায়গায় অদ্ভুত ত্রিকোণ চূড়া দেখিতে পাইলাম। মগ্‌রা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল; ভীত কটাক্ষে বলিল, "ওঃ, এ কোন্ পথে এসে পড়েছি! যে গান গাওয়ালে, বাবুজী, রাস্তা ভুল হয়ে গেল।"

আমি। কেন, এখানে কি?

মগরা। কথা কয়ো না মশাই, তফাতে চ'লে এস।

সে এমন হেঁচকা টানে আমাকে কতকটা দূরে আনিয়া ফেলিল যে, তাহার হস্তের ভর না পাইলে নিশ্চয়ই আমি পড়িয়া যাইতাম। সে সেই ত্রিকোণ প্রস্তরচূড়া ছাড়াইয়া পাশের বনের মধ্যে আসিয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিবামাত্র আমি একটা গুঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর কিছুক্ষণ দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত ভয় পেলি কেন?"

মগ্‌রা। ওটা ভূতের পাহাড়, মশাই।

আমি। দিনের বেলা ভূতের ভয় কি?

মগ্‌রা। সাঁঝ ত এল।

আমি। ঠিক যেন একটা কাটা গম্বুজের মত দেখতে। উপরে কি পথ আছে?

মগ্‌রা। নীচের দিক্ থেকেও একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে।

আমি। চল্ না একবার দেখে আসি।

সে সভয়ে বলিল, "ও যে ভূতের রাজ্যি। পুরান ছুট্ রাজার আমলে ওটা ছিল জেলখানা। উপর থেকে মানুষকে নীচে ফেলে দিত। আর এখন পাহাড়-পারের কবলা জাতরা এসে ঐখানে মানুষ বলি দিয়ে দেও-পুজা করে।"

হঠাৎ যেন একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুনিলাম, কল্পনা না কি? "শুন্‌ছিস্ মগরা?"

মগ্‌রা। চল মশাই, ওঠ; পা চালিয়ে চল।

আমি উঠিলাম। আবার সেই অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি! আমাকে তাহা নির্ভীক, সবল, সতেজ করিয়া তুলিল।

মগ্‌রা কাঁপিতে লাগিল। বলিল, "ও ভূতের ডাক মশাই—মানুষের কান্না নয়।"

আমি বলিলাম, "মানুষের স্বর এটা নিশ্চয়ই, ভয় কচ্ছিস্ কেন? চল্ আমার সঙ্গে।" আমি তাহার হাত ধরিলাম। এক টানে হাত ছাড়াইয়া চলিতে চলিতে সে বলিল, "ভূতের সঙ্গে লড়াই করব কি, মশাই, চ'লে এস আপনি।"

আমি তাড়াতাড়ি তাহার কোমরের কাপড় ধরিলাম, বাধা পাইয়া মুহূর্ত্তকাল সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আমি তাহার কোমরের ছোরাখানা টানিয়া লইলাম।

আবার সে দ্রুত চলিতে চলিতে বলিল, "থাম, মশাই, একটু সবুর কর। রাস্তা ছেড়ো না, আমি ওঝা নিয়ে আস্‌ছি।"

বলিতে বলিতে সে অন্তর্দ্ধান করিল।

২

পাহাড়ের কোন্ দিক্ হইতে অস্ফুট মনুষ্যনাদ উঠিয়া কোন্ দিকে যে মিলাইয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম না। মগরা থাকিলে তাহা বলিতে পারিত; কিন্তু সে ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ পাহাড়স্তম্ভের পাদমূলে সত্যই কি তবে কোন গুহা আছে না কি? আর সেখান হইতেই কি ঐ ধ্বনি উঠিল?

তখনও অন্ধকার হয় নাই। পড়ন্ত সূর্য্যালোকে

চারিদিক্ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি তরুপত্রঢাকা সেই পাহাড়তলে আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু কৈ, কোন শব্দই ত শুনিতে পাওয়া যায় না! ফিরিতে গিয়া হঠাৎ গাছের শিকড়ে পা বাধিয়া গেল, পা ছাড়াইতে গিয়া হোঁচট খাইয়া একটা পাতরের উপর বসিয়া পড়িলাম। কি আশ্চর্য্য! পাশেই কি ঐ একটা গুহার মুখ নহে? কে যেন পাতরখানা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল; বাহির হইবার সময় তাড়াতাড়িতে গুহামুখ বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। একটা উগ্র কৌতুহল আমাকে উদ্রিক্ত করিয়া তুলিল, আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, সত্যই ইহা একটা সুড়ঙ্গ-মুখ, মুখটা নিতান্ত ছোটও নহে! আমি আস্তে আস্তে মাথা ঢুকাইয়া ভিতরটা দেখিতে চেষ্টা করিলাম, স্থানটা খুব অন্ধকার মনে হইল না, পাশের একটা কোন্ ফাঁক দিয়া সেখানে আলো ঢুকিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার মৃদু মৃদু শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। কে জানে, এই শব্দই বা তখন গুহাগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া মনুষ্য-কণ্ঠের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল কি না! একবার মনে হইল, ফিরিয়া যাই, কিন্তু কি যেন একটা অলৌকিক শক্তি পিছন হইতে আমাকে গুহামধ্যে ঠেলিয়া দিল। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখের পরিসর নিতান্ত কম নহে, কিন্তু দাঁড়াইয়া চলিবার উপায় নাই—কারণ, পাহাড় মাথায় ঠেকে। যে পথে আলোক প্রবেশ করিতেছিল, আমি সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিলাম। একটা বাঁকা পথে ঢুকিতেই হঠাৎ উর্দ্ধদেশ যেন ফাঁক হইয়া পড়িল। আমি সহজভাবে দাঁড়াইয়া তখন আর মাথায় কোনও ঠোক্কর পাইলাম না। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, ইহা একটা ঝরণার ধার। উৎক্ষিপ্ত জলরাশির ছিটায় আমাকে এমন আর্দ্র করিয়া তুলিল যে, আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। কিন্তু ফিরিয়া পূর্ব্ব-বাঁকের পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে অপর একটা বাঁকপথে ঢুকিয়া পড়িলাম। সেখানকার দৃশ্য দেখিয়া চক্ষুঃ স্থির হইয়া গেল। পাহাড়গাত্র সত্যই মনুষ্যকঙ্কালে পরিপূর্ণ। এতক্ষণ পরে আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা আতঙ্ক-শিহরণ উঠিল। দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া একটা মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেলাম। কিন্তু ইহা কি মৃতদেহ? নহে ত; ইহার নিশ্বাসস্পর্শ যে অনুভব করিতেছি। এই ব্যক্তিই কি তখন আর্ত্তনাদ করিয়াছিল? কিন্তু এ ত আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া আছে! কোমরের ছোরাখানা লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধন কাটিয়া দিলাম, তাহার পর আর্দ্র উড়ানিখানা নিঙড়াইয়া তাহার মুখে চোখে জল দিতে লাগিলাম। হঠাৎ সে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল; ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া, ভূপতিত ছোরাখানা তুলিয়া লইয়া আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। তাহার দুর্ব্বল হস্ত হইতে সহজে যদি ছোরাখানা টানিয়া লইতে না পারিতাম, তাহা হইলে এই গুহাই যে আমার কবর হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সে আর এক বার ভীত কটাক্ষে আমার দিকে চাহিল, তাহার পর সন্ত্রস্ত-পদে উঠিয়া ঝরণার ধারের একটা গাছ ধরিয়া নামিয়া পড়িল। বাঁচিল কি মরিল, কে জানে? তাহার আতঙ্কদৃষ্টিতে বুঝিলাম, সে ভাবিয়াছিল, আমি তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছি।

সে চলিয়া যাইবার পর আমি মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম; তাহার পর উঠিয়া রুদ্ধশ্বাসে পূর্ব্বপথ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম, এবার আর কোন বাধা পাইলাম না। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, চারিদিক কুয়াসাচ্ছন্ন! অন্ধকারে তরুলতা প্রেতের আকারে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আমি নীরব স্তব্ধ হইয়া ভাবিলাম—এ স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? বেশীক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে থাকিতে হইল না—আবার জাগরণরাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম। মনুষ্যকণ্ঠস্বর—বনপ্রদেশ হইতে উঠিয়া আমার নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল, মনে হইল যেন, ডুলীবাহকদিগের চাপা মৃদুকণ্ঠ। ক্রমশঃ একখানা ডুলী বহন করিয়া চারি জন বাহক আমার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। ডুলীস্থিত রমণী, অনুচ্চ কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মা গো!" বুঝিলাম, ইহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি সহসা একটা অসীম বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলাম। আসি-বার সময় তাড়াতাড়িতে ছোরাখানা ফেলিয়া আসিয়া-ছিলাম। সেই স্থানে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিবামাত্র আত্মরক্ষার জন্য একটা শাখা ভাঙ্গিয়া হাতে লইলাম এবং সেই শাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভীষণ স্বরে বলিলাম, "ডুলী এইখানে রাখ।" ভীত ও আশ্চর্য্যভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে ডুলীখানা মাটীতে ফেলিয়া বাহকরা পলায়ন করিল। বাহকদের সঙ্গের

ভাবোন্মত্ত গোরা

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা।

দুই জন লোক আমাকে দেখিবামাত্রই নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

প্রতিপদের চাঁদ পাহাড়ের আড়াল হইতে উর্দ্ধদেশে উঠিয়া তাহার সমস্ত আলো রমণীর মুখে ঢালিয়া দিল। কে এ ভুবনমোহিনী প্রতিমা! কোন্ স্বর্গরাজ্য হইতে হঠাৎ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিল?

আমার বিস্ময়-মোহ না ভাঙ্গিতেই রমণী আবার অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মা গো!" কথার স্বরে মনে হইল, তাহার পূর্ণ সচেতন অবস্থা নহে, যেন একটা নেশার ঘোরে সে আচ্ছন্ন। আমি কি করিয়া তাহার চেতনাসঞ্চার করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উড়ানিখানা খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম, তাহাও গুহার মধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই সময় মগরা তাহার ওঝার সহিত আসিয়া হাজির হইল। আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম। আসিয়াই ইহাকে দেখিয়া মগরা সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি, বাবুজী? একে কোথায় পেলে?"

আমি। যেখান থেকেই পাই, এখন একে নিয়ে চল।

মগরা। কোথায় গো?

আমি। কোথায় আবার—বাড়ীতে।

মগরা। এ দেখছি, তবলাদের জিনিষ। আমরা নিয়ে যাব কি, বাবুজী? জান্‌লে আর রক্ষে রাখবে না।

আমি। সে ভাবনা তোর নেই। ডুলী ওঠা—

আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া সে বালিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,"নেশা ধরিয়েছে। নাক দিকে ধোঁয়া দিয়েছে।"

ওঝা তখন কি মন্ত্র পড়িয়া তাহার মুখে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্য! রমণী যেন চমকিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল; চারিদিকে চাহিয়া ভয়ে বিস্ময়ে বলিল, "কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?"

আমি বলিলাম, "ভয় নেই, তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। উঠা মগরা, দুই জনে বাঁশ ধর, শীগ্‌গির শীগ্‌গির চল।"

মগরা বলিল, "সেই ভাল। বাড়ী গিয়েই ঝাড়ফুঁক হবে। কেউ হঠাৎ যদি এসে পড়ে।" বলিয়া ভয়ে ভয়ে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সে ডুলীর এক পাশ ধরিয়া পরে ওঝাকে অন্য দিকের বাঁশখানা ধরিতে অনুরোধ করিল। যদিও রমণী তন্বঙ্গী বালিকা—নিতান্ত লঘুভার; আমার মনে হইতেছিল, আমি একলাই ইহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু ডুলী উঠাইয়াই মগরা গন্ গন্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপুনি ত হুকুম দিলে, শীগ্গির চল—চলি কি ক'রে, পথটা ত কম নয়।"

আমি বলিলাম, "আমিও কাঁধ দিচ্ছি, চল এখন।" পথের মধ্যে থামিয়া থামিয়া মগরা বলিল, "কি করলে, বাবুজী! এ যে কবলার জিনিষ, ভূতের খানা। সইবে না—তোমাকে গো সইবে না।"

৩

আমাদের ঘরে আসিয়া সেবা-যত্নে বালিকা যখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন তাহার মুখে শুনিলাম, তাহারা মাতা-পুত্রীতে কিছু দিন হইতে মাতুলাশ্রয় শিমুল-তলায় আছে। আমাদের বাড়ীর নিকটেই থাকে। মাতুল কার্য্যবশতঃ আপাততঃ কলিকাতায়; ভৃত্যেরাও সব সময় বাড়ী থাকে না; মাতা তখনও রন্ধনশালায়। মনোরমা দুপুরবেলা আহারের পর ঘরে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিল, হঠাৎ কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। স্বর পরিচিতের মত, কিন্তু তখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, ঠিক বুঝিতে পারিল না—কাহার গলা। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রাচীরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিবামাত্র হঠাৎ কে এক জন পিছন হইতে তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া কোলে উঠাইয়া একে-বারে বনপথে প্রবেশ করিল। তাহার পর কি হইল, সে কিছুই জানে না; কারণ, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

আহা! বালিকার মাতা কন্যাকে এতক্ষণ না দেখিয়া না জানি কিরূপ শোকোন্মত্ত অবস্থায় আছেন! দিদি মগরাকে কিছু বক্‌শিশ দিয়া সেই রাত্রিতেই তাহার মাতার নিকট কন্যার সংবাদ পাঠাইলেন; তিনিও ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মগরার সহিত এখানে চলিয়া আসিলেন।

শোকোচ্ছ্বাসের মতই সেই ব্যথাকাতর মিলনদৃশ্য আমাদিগকেও কিরূপ অভিভূত ও আনন্দপীড়িত করিয়া-ছিল, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম—কবি হইলে হয় ত বা পারিতাম। দুঃখের বিষয়, আমি কবি নহি; আর সুখের বিষয় এই যে, শোকের তীব্রতা কিংবা আনন্দের উগ্রতা মানুষের মনে চিরদিন সমভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। তাহা হইলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইত?

তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে সুস্থ অক্ষতভাবে চিতাগ্নি

হইতে যেন ফিরিয়া পাইয়াছেন, এই আশাতীত অসম্ভব ঘটনা যখন সত্য বলিয়া মাতার মনে প্রতীতি জন্মিল, তখন তাঁহার আনন্দও ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল এবং কন্যার অপহরণবৃত্তান্ত তিনি আমাদিগকে খুলিয়া বলিবার অবসর পাইলেন।

ইঁহার স্বামী হরনাথ মিত্র সুনামগঞ্জের জনৈক জমীদার; কয়েক বৎসর যাবৎ হৃদরোগে ভুগিয়া মাস কয়েকমাত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই তিনি বিষয়কর্ম্ম নিজে তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না, কিন্তু সে জন্য তাঁহার মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। তাঁহার আত্মসম্পর্কীয় প্রিয়-বন্ধু ঘনশ্যাম ঘোষের হস্তে এই ভার দিয়া তিনি খুবই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইঁহার উপর তাঁহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, উইলেও ঘনশ্যাম বাবুকে তিনি কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের দুইটি সন্তান;—একটি পুত্র ও একটি কন্যা। বিষয়ের অধিকারী পুত্রটি সম্প্রতি বিলাতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছে, ৩।৪ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু কন্যাকেও তিনি উইলে একখানি বাড়ী ও ৫০ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন; বিবাহের সময় সুদে আসলে যৌতুকস্বরূপ ইহা তাহার প্রাপ্য।

দিদি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "মেয়েকে ত মিত্র মশায় বেশ দিয়ে গেছেন।"

মিত্রাণী বলিয়া উঠিলেন, "আর যত অনর্থ ত এর জন্যই ঘটছে।"

দিদি বলিলেন, "ঘনশ্যাম বাবু তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে টাকাটা হাত করবার চেষ্টায় আছেন বুঝি? ছেলেটি কি সুপাত্র নয়?"

মিত্রাণী বলিলেন, "তা নয় গো তা নয়, তাঁর নিজের দৃষ্টিই এই দিকে পড়েছে।"

"তবে যে তুমি বল্লে, তোমার স্বামীর বন্ধু! তাই আমি ভেবেছিলুম, তিনি বুড় মানুষ।"

"বুড় নয় ত কি? নাতি-নাতনীতে ঘর ভরা। হালে পরিবার মারা গেছে, এখন আমার রত্নটি গ্রাস করবার চেষ্টায় আছেন।"

দিদি হাসিয়া বলিলেন, "সাবাস রে বুড়ো!"

মিত্রাণী বলিলেন, "তুমি ত ভাই হাসছ, কিন্তু সেই ভয়ে আমি দেশছাড়া হয়ে শিমুলতলার দাদার আশ্রয়ে পালিয়ে এসেছি; কিন্তু এখানেও নিস্তার নেই। আজ তোমরা রক্ষা না করলে আমাদের যে কি অবস্থা হ'ত, বল দেখি?"

আমি অদূরে নীরবে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম। মিত্রাণী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে প্রথমে আমার দিকে চাহিয়া পরে দিদির পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দিদি ব্যস্ত-সমস্তভাবে প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "ও কি কর ভাই! রক্ষা করেছেন ভগবান্, আমরা উপলক্ষমাত্র। কিন্তু তুমি কি মনে কর, ঘনশ্যাম বাবু সত্যই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত?"

"নিশ্চয়ই! তাতে কোন সন্দেহই নেই। সপ্তাহখানেক হ'ল, তিনি শিমুলতলায় এসে পূজোর সময় আমাদের দেশে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছিলেন। আমাকে কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে শেষে মেয়েকেই চুরি ক'রে নিয়ে গেলেন।"

"কিন্তু হল্‌দিঝোরাতে নিয়ে গেলেন কেন?"

"এটা আর বুঝ্‌লে না, দিদি! সোজা রাস্তায় গেলে যে লোকের নজরে পড়বে! তাই বনের মধ্যে খানিকক্ষণ লুকিয়ে রেখে রাতারাতি ষ্টেশনে নিয়ে যাবার মতলবে ছিলেন।"

এতক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "কিন্তু কোন ভদ্রলোক ত ডুলীর সঙ্গে ছিল না।"

"তা কেন থাক্‌বে? বুড়ো ষ্টেশনে অপেক্ষা কর্‌ছিল। অন্ধকারে রোগী ব'লে চালিয়ে রেলে তুলে দিত। কিন্তু এর পর যে কি করবে, সেই ভাবনাই এখন আমাকে পাগল ক'রে তুলছে, দিদি।"

দিদি বলিলেন, "যদি অবিলম্বে মেয়ের একটি বিয়ে দিয়ে দিতে পার, তবেই কিন্তু তিনি জব্দ হয়ে যান।"

"তা ত ঠিকই বলেছ, ভাই, আর দাদাও একটি সুপাত্র ঠিক করেছেন। ছেলেটি ওকালতী পড়ছে, মেজাজও ভাল মনে হয়; সে-ও শিমুলতলায় এসেছে আর মাঝে মাঝে দাদার বাড়ী আসা-যাওয়া করে, কিন্তু তবু তার প্রতি আমার মনটা কেমন প্রসন্ন নয়; ঘনশ্যামের সঙ্গে তার একটা কি রকম দূর-সম্পর্ক আছে—ভাইপো না কি হয়।"

দিদি বলিলেন, "এ ভাই তোমার অন্যায়। কথায় বলে কায়েতের কুটুম! সম্পর্ক ধরতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়!"

মিত্রাণী বলিলেন, "কিন্তু সে ছেলে সে দিন সকালে এসে ব'লে গেল যে, হল্‌দিঝোরা দেখতে যাচ্ছে, তার পর এই ৩।৪ দিনও আর তার দেখা নেই। সে-ও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত নেই ত?"

এই কথা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনে সেই যুবার কথা জাগিয়া উঠিল—যাহাকে আমি গুহার মধ্যে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলাম। এই ত সেই যুবা নয়! হয় ত বা পথের কণ্টক বিবেচনায় ঘনশ্যাম বাবুই ইহাকে এইরূপে সরাইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু এই অসম্ভব কল্পনা বেশীক্ষণ মনে স্থান পাইল না।

মিত্রাণী দিদির হাত ধরিয়া সকাতর অনুরোধে বলিলেন, "ভাই, একবার যাকে রক্ষা করেছ, আর তাকে বিপদের মুখে ফেলে রেখো না। তোমাদের বউ ক'রে একে ঘরে তুলে নাও।"

দিদি আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা মেয়ে ত অপছন্দের নয় - কি বলিস্ তুই?"

আমি মনে মনে বলিলাম, "অমৃতে অরুচি কার?" কিন্তু ইহা ত প্রকাশ করিয়া বলা যায় না, তাই মৃদু হাসিয়া মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলাম। ঘরে আসিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, "চেহারাখানা বড় বেমানান্ ব'লে মনে হচ্ছে। তা মন্দই বা কি? রাধা ত শ্রীকৃষ্ণের কালো রূপেই মজেছিলেন!"

"শুভস্য শীঘ্রম্" বলিয়া ভগিনীপতি কৃষ্ণপক্ষ পার হইতে দিলেন না। তাড়িতবার্ত্তা বহন করিয়া তাঁহার মেজাজটাই হইয়াছে ত্বরিতগতি; তাহার পর এ ক্ষেত্রে তিনি ঘনশ্যাম বাবুকে ব্যর্থ করিবার পক্ষে এই চালটাকেই অব্যর্থ জ্ঞান করিলেন। নবমী তিথিতে যে শুভলগ্ন পাওয়া গেল, সেই লগ্নেই তিনি মঙ্গল অনুষ্ঠান সমাধা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দিদির বাড়ীতেই বিবাহের আয়োজন—খুব চুপচাপে—পুরোহিত ও ২।৪ জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কাহাকেও বলা হইল না।

বৈকালে বরসজ্জা শেষ করিয়া দিদিরা ক'নে সাজাইতে গেলেন। আমি রাঙ্গাবস্ত্র ও ফুলচন্দন পরিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। তখনও সূর্য্যের আলো কনক-ঝরণায় দিগ্‌দিগন্তে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তার অভ্রগুলা দিবা-খদ্যোতের ন্যায় ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠিতেছিল; পাশের মাঠে কাশগুচ্ছের উপরে সূর্য্যের কনকাভা খেলিয়া যাইতেছিল। শিউলীফুলের সুগন্ধ শরৎকালে বসন্ত জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বর্ণের শোভায়, গন্ধের হিল্লোলে, চারিদিকে যেন সুখের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল! কিন্তু এই আলোকপুঞ্জ সম্মুখে রাখিয়া আমার মনে জাগিয়া উঠিল সেই অন্ধকার গুহার কথা। কে সে যুবক? হইতে পারে, ইহারই সহিত মনোরমা বাগদত্তা হইয়াছিল। বালিকা যে মনে মনে তাহাকে ভালবাসে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিবাহের মুহূর্ত্তে যদি সে আসিয়া উহাকে দাবী করে—তখন? বুদ্ধিতে বুঝিতেছিলাম যে, ইহা একটা আজগুবী অসম্ভব আশঙ্কা; কিন্তু ভূতের ভয়ের মত এই চিন্তা কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এই সময় রসিকদাদাকে আসিতে দেখিয়া মনটা খুসী হইয়া উঠিল। আসিয়াই তিনি বলিলেন, "এই শুভদিনে এমন গোমসামুখ দেখছি কেন, ভায়া? তা আমারও কিন্তু সে দিন মনটায় ভারী ভাবনা ধ'রে গিয়েছিল?"

"সে কোন্ দিন, রসিকদাদা?"

"এই তোমারই মত যে দিন সাজসজ্জা ক'রে বসিয়ে রেখেছিল। তার পর কিন্তু বাসরঘরে যেমনি কানের উপর টান পড়লো, অমনি প্রাণের গান আপনিই খুলে গেল।"

"আমার ত দাদা, গানটান আসে না; তুমি আমায় একটু তালিম দিয়ে দাও না।"

"তা বেশ ত, আমি সে দিন যে গানটা গেয়েছিলুম, সেই গানটাই শিখে নাও" বলিয়া রসিক-দাদা সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন—"তা না না না, আহা হা হা, উহু হু হু।

মরি মরি উহু উহু,
কুহু কুহু মুহু মুহু কোয়েলা বোলে!
বায়স বুলায় চঞ্চু বায়সী-গলে!
হায় রে হায়! প্রেয়সী বলে,
আমি আজ ঝাঁপ দিব জলে।
ঝলকে উঠবে চলকানো ঢেউ,
জানবে না গো শুনবে না কেউ,
তলিয়ে পড়বো চুপে চুপে অতল জলে।
হায় রে হায়! প্রেয়সী বলে,
আমি আজ প্রাণ ত্যজিব যমুনা-জলে!"

আমার কিন্তু গানটি শুনিয়া হাসি আসিল না ; যে অন্ধকার মন হইতে মিলাইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার ঘনাইয়া আসিল ; মুখে বলিলাম, "বেশ রসিকদাদা, বেশ ! এই গানটাই আমাকে আজ গাইতে হবে।"

হঠাৎ দেখিলাম, অনেকগুলি লোক বাড়ীর দিকে আসিতেছে। এ আবার কি ? ভগিনীপতি যে বলিয়াছিলেন, বেশী কাহাকেও বলা হইবে না। দেখিতে দেখিতে তাহারা কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। রসিকদাদার গানের তান একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ের দিনে এরা আবার কেন ? এ যে পুলিসের দল !" আমি বিস্ময়স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম।

নিকটে আসিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ?"

"রমাপ্রসাদ।"

"রমাপ্রসাদ বসু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

এক জন পাহারাওয়ালার হস্ত হইতে গুহা-পরিত্যক্ত আমার সেই উত্তরীয়খানা লইয়া আর এক জন তখন জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি আপনার ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনি কোথায় পাইলেন ?"

"আর এই ছোরাখানা ?" দেখিলাম, আমার বটে, কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

"দেখিতেছেন, ইহা রক্তমাখা ?"

দেখিলাম, বাস্তবিকই রক্তমাখা ; কিন্তু উহা দিয়া সে দিন যুবকের বন্ধনরজ্জু কাটিয়াছিলাম মাত্র, উহাতে রক্তের দাগ আসিল কিরূপে ? বুঝিলাম, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কি উত্তর দিব, স্থির করিতে না পারিয়া নীরবেই রহিলাম। দারোগা বাবু উগ্রস্বরে বলিলেন, "উত্তর দিন না, চুপ ক'রে রইলেন যে ?" আমি অপরাধীর মত আস্তে আস্তে বলিলাম, "ছোরাখানা আমার বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ও ছোরা দিয়ে ত আমি কোন দিন রক্তপাত করিনি।"

"রক্তপাত করেছেন কি না, সে কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি নে, সে সব কথা থানাতে হবে।" বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিবামাত্র এক জন পাহারাওয়ালা অগ্রসর হইয়া আমার হাতে খুনীর হাতকড়ি আঁটিয়া দিল।

বিবাহের দিনে আনন্দ-সঙ্গীতের পরিবর্তে শোকক্রন্দনে গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

* * * * *

বন্দী অবস্থায় যে আমার সময় কিরূপে কাটিয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল—বলিবার ক্ষমতাও নাই। সে নরক-যন্ত্রণার জ্বালা এখন ভাল করিয়া মনেও আনিতে পারি না, তাই নিষ্কৃতি ; নহিলে মুক্তিলাভেও প্রকৃত মুক্তির সুখলাভ করিতে পারিতাম না। সেই বিষম দুর্দ্দিনে বিধাতা পুরুষকে যন্ত্রণাকাতর প্রাণে অভিশাপ দিতে দিতে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, ফাঁসীদণ্ডেই জীবনের সমাপন হইবে ; কেন না, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সঙ্গীন—ঘনশ্যাম বাবু লাসকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়াই সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দৈব মানুষ অপেক্ষাও প্রবল ষড়যন্ত্রী।

* * * * *

আজ আমার বিচারের শেষ দিন। বিচারগৃহ লোকে লোকারণ্য। দুই পক্ষের উকীলের বক্তৃতা শেষ হইয়া গিয়াছে। জুরীগণ মতস্থির করিয়া নিজ নিজ অভিমত জজকে জানাইলেন ; জজ সাহেব কালো টুপী ধীরে ধীরে মাথায় পরিয়া রায় পড়িয়া শুনাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় আদালতের বাহিরে একটা বিষম কোলাহল উত্থিত হইল—কে যেন জোর করিয়া প্রবেশ করিতে চাহিতেছে অথচ বাধা পাইতেছে বলিয়া পারিতেছে না। দেখিতে দেখিতে ভিড় ঠেলিয়া সেই গুহার যুবা বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইল ও উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আসামী নির্দ্দোষ। আমি মরি নাই—জীবিত। এই যুবকই আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, নহিলে কুচক্রীর চক্রে আমার প্রাণ যাইত।" আমার কানের মধ্যে সমুদ্রের জলকল্লোল শুনিতে পাইলাম ; কি যে হইতেছিল, ঠিক বুঝিবার পূর্ব্বেই আমার সংজ্ঞালোপ হইল।

যখন চেতনা ফিরিয়া পাইলাম, তখন রসুনচৌকির মধুর তান আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এ কোথায় আমি ? মরণের পর কি স্বর্গরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি ! এ কি স্বপ্ন না কি !

বর্ষশেষের কৈফিয়ৎ

(Tony Revillon-র ফরাসী হইতে)

পাত্র পাত্রী

অম্বর ... মজুর।
জনা ... ... তার স্ত্রী।
অগস্ত্য ... ... তার ছেলে (কায শিখ্‌ছে)।
ননী .. ... তার মেয়ে, ৩ বছরের।

প্রথম দৃশ্য

অম্বর, জনা, ঘুমন্ত ননী।

[শনিবার, সন্ধ্যা ৭টা। অম্বর খিট্‌খিটে মেজাজে বাড়ী ফিরলে। হপ্তার মজুরী এম্‌নিভাবে টেবলের উপর ফেল্লে, যেমন ক'রে মানুষে পুরনো জুতো রাস্তায় ফেলে দেয়। স্ত্রীর দিকে যে ভাবে চাইলে, সে চাউনির অর্থ এই:—আমাকে কেউ কোন কথা বল্‌তে এস না, দেখি কেমন!—তার পরে ঘরময় পায়চারি কর্‌তে লাগল এবং মাঝে মাঝে থেমে কথা বল্‌তে লাগল।]

অ।—খাবার তৈরি নেই। এটা দেখছি অভ্যাসের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ন্যাকড়াকানিগুল দড়িতে ঝুল্‌ছে কি করতে? সমস্ত দিন ধ'রেও বোধ হয় এগুলো শুকোবার যথেষ্ট সময় হয় না! অগস্ত্য এখনো ফেরে নি। সে খুব সকাল সকালই ভবঘুরে হবার চেষ্টায় মন দিয়েছে দেখছি। সেটা তোরই দোষ! কোন জন্মে ত মাথায় একটা চাঁটি পড়ে না। তা হ'লে যে তার মাথাটি ভেঙ্গে যাবে!

জনা।—উনুনে চড়ানো হাঁড়ির প্রতি দৃষ্টি রেখে (স্বগত) —আমি উত্তরে আনায়াসেই ওকে এই কথা বল্‌তে পারি যে, যদি খাবার দিতে দেরি ক'রে থাকি ত তার কারণ, খুকীর অসুখ ব'লে তাকে এক ঘণ্টা ধ'রে আতু-পুতু কর্‌তে হয়েছে; যদি কাপড় না শুকিয়ে থাকে ত তার কারণ, আমার কাপড়-কাচা শেষ হ'তে বেলা একটা বেজেছে; আর যদি অগস্ত্য রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ত সেটা বেশির ভাগ তার মনিবের কাযে, নিজের কাযে নয়। কিন্তু আমি কিছুই বলব না। তার চেয়ে রাগের ঝড়টা বয়ে যেতে দেওয়াই ভাল মনে করি।

অ।—আজ তোর বকুনির ঝোঁকটা নেই দেখ্‌ছি। বেশ বোঝা যাচ্ছে,দোষ তোরই। যখন তোর কথাই ঠিক হয়, তখন স্বয়ং শয়তানও তোর মুখ বন্ধ রাখ্‌তে পারে না।

(সে একখানা চৌকি নিলে, নিয়ে তাকে উনুনের সাম্‌নে এমন ক'রে রাখ্‌লে যে, পায়াগুলো ক্যাঁচকোঁচ্‌ শব্দ ক'রে উঠল; তার পরে চৌকির উপর ঘোড়-সওয়ার হয়ে ব'সে, চৌকির পিঠে হাত রেখে, হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে, গুম্ হয়ে রইল। নিস্তব্ধ ভাব।)

জনা।—অম্বর!

অ।—(মাথা না তুলেই)। কি?

জনা।—তোমার হয়েছে কি?

অ।—কিছুই হয় নি।

জনা।—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

অ।—তবে হয়েছে, হ্যাঁ, হয়েছে; হয়েছে এই যে, বছর কাবার হতে চল্ল, আর কি ছাইভস্ম!

জনা।—কোন্‌টা ছাইভস্ম?

অ।—এই যে ভাবে আমি দিন কাটাচ্ছি, যত দিন থেকে বৎসর আরম্ভ আর শেষ হ'তে দেখেছি। আমি ভোর-বেলা উঠি; সমস্ত দিন ধ'রে গাধার খাটুনি খাটি, সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে এসে শুয়ে পড়ি। তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন ঘুরে-ফিরে সেই একই ব্যবস্থা। এমন লোকও আছে, যারা ভাল খানা খায়, যারা শীলমোহর-করা বোতলের মদ খায়, যারা তামাসা দেখতে যায়, দেশ দেখে বেড়ায়। আমি শুধু খেটে যাই। আর তার পর?—খেটেই যাই। আর চিরকাল?—খেটেই যাই। এতে তৃপ্তি কোথায়? তবু যদি মনে মনে বল্‌তে পারতুম, "ওহে ভায়া, এতে তোমার লাভ আছে; তোমার মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে বটে, কিন্তু তুমি টাকা জমাচ্ছ; যখন বুড়ো হবে, তখন বিশ্রাম করবে।" কিন্তু তা ত নয়। কায়ক্লেশে যত্র আয় তত্র ব্যয় করি মাত্র; আর যখন বৎসর আরম্ভ হয়,তখন প্রায়ই আমার পুঁজি-টিকে নিয়ে বন্ধক খালাস করতে হয়। এমন কি, আমার একটিবার অসুখ করবারও জো নেই। তা' হ'লেই ডেরাশুদ্ধ ক্ষিধেয় মারা যাবে। কি বলিস, সত্যি কি না?

জনা।—হ্যাঁ, কথা সত্যি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করবে বল? তুমি কি মনে কর,আমার ভাগে তার চেয়ে

ভাল কিছু পড়েছে? তুমি ভোরে ওঠ বটে, কিন্তু আমি তার আগেই উঠে খাড়া থাকি, তোমার খাবার সুরুয়া গরম ক'রে দেবার জন্যে। তুমি বেরিয়ে গেলে অগস্ত্যের পালা; তার পর ননীর; তার পর সংসারের কায। আমাদের গৃহস্থালী যে সুন্দর, তা' নয়; সেই জন্যেই আরও পরিষ্কার রাখা দরকার। আমি ধোয়াপাখ্‌লা করি, মেরামত করি, সেলাই করি, সমস্তই নিজের হাতে করি, তা ত তুমি দেখতেই পাও; তার উপরও সময় ক'রে মেঠাই তৈরীর কাযে দু'পয়সা রোজগার করি। তবুও তাতে কি আমার কোন ফায়দা হয়? আমার কি পরবার একখানা পোষাকী কাপড় পর্য্যন্ত আছে? আমি কি সারাদিন যাওয়া-আসা, রাঁধাবাড়া, তালিমারা নিয়ে বড় আমোদে কাটাই? আহা, ছোটবেলায় যদি জানতুম এই হবে!......

অ।—তা হ'লে তুই বিয়ে কর্‌তিস্ নে? সে এক রকম ভালই কর্‌তিস্।

জনা।—আমি তা বল্‌ছিনে। কিন্তু স্বীকার কর্‌তেই হবে যে,জীবনটা বড় ছার। যখন ছোট ছিলুম, তখন আমার ভাইদের কোলে নিয়ে বেড়াতে হ'ত; তারা ছিল আমার চেয়ে ভারি, আর যদি তাদের ফেলে দিতুম ত আমি মার খেতুম; যখন কায শিখতে আরম্ভ করলুম, তখন আমাকে পেট ভ'রে খেতে দিত না—

অ।—আমাকে ত লাথি খেতে হ'ত...

জনা।—আঠারো বছর বয়সে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। কুড়ি হ'তে না হ'তে অগস্ত্য কোলে এল। তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও ভালর মধ্যে কি দেখতে পাই? আমার প্রথম দীক্ষার দিন? সে দিন আমার পোষাকের আস্তিন ছিল বেশি ছোট। আমাদের বিয়ের দিন? সে দিন সকলে মিলে পিছনে লেগে আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল। তার পর থেকে—আমি কারও দোষ দিচ্ছিনে,—কিন্তু জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখটাই ওজনে ভারি হয়েছে।

অ।—আমি জানতুম, তুই আমারই মতে সায় দিবি। দেখ্ জনা, এ সংসারে টাকাই সব, কায কিছু নয়। কোন কোন রসিক লোক ব'লে থাকেন:—"হিসেব ক'রে চল, জীবনবিমা কর, বুড়ো বয়সের জন্যে সিন্দুকে টাকা তুলে রাখো।" কিন্তু টাকা তুলে রাখ্‌তে হ'লে প্রথমে ত টাকাটা থাকা দরকার, আর আমাদের যে দু'টো আনারও মুখ চাইতে হয়, তা' ত তুমি আমি দুজনেই বেশ জানি। যেমন ক'রেই ঘুরেফিরে দেখি, কোন দিকে কূল-কিনারা পাইনে। এ সব কথা ভাবাই উচিত নয়, মানুষ পাগল হয়ে যায়। এক এক সময় মনে হয়—চুলোয় যাক্ সব। আজ রাত্তিরে সেই রকম মনের ভাব হয়েছে। মনে হচ্ছে, একটু এদিক ওদিক হলেই দেখে আসি গে, নদীর তলায় কি আছে। এখনকার মত বেঁচে থাকার চেয়ে সেটা বরং কম গাড়ল-পানা হয়।

জনা।—আমারও উনুন থেকে ইস্ত্রী বের করবার সময় অনেকবার ঐ কথা মনে হয়েছে। তখন আগুনটা লাল থাকে, আর কয়লাটার গন্ধ ছোটে। আমার ইচ্ছে করে, জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে দিই, আর ননীকে কোলে নিয়ে খাটে শুয়ে পড়ি। সে বেচারা ত আমার চেয়ে বেশি সুখে থাকবে না। হয় ত কম সুখীই হবে।

অ।—একেই বলে, বেশ আমোদে বছর কাবার করা।

জনা।—সে ত আমাদের দোষ নয়, কি বল?—যদি কারো ভাগ্যে থাকে সব, আর কারও ভাগ্যে নবডঙ্কা। আমাদের ত নিজেকে গাল দেবার কিছু নেই।

অ।—তা'তে আমাদের লাভটাই বা কি?

২য় দৃশ্য

উক্ত পাত্র এবং অগস্ত্য।

(দৌড়ে প্রবেশ। মুখ লাল, হাঁফিয়ে গেছে। বাপমা'র মুখের ভাব দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে টুপী খুল্লে।)

অগস্ত্য।—বাবা, নমস্কার! মা, নমস্কার!

(আবার টুপী প'রে তাদের দিকে পিছন ফিরে ছোট বোনের দোলার কাছে গেল)

—ননী, নমস্কার!

ননী। (আচম্‌কা ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে কান্না)—ভ্যাঁ! ভ্যাঁ! ভ্যাঁ!

অগস্ত্য।—আহা হা, এত বড় হাবা মেয়ে যে কাঁদে! চুপ করবি কি না! এক্ষুনি হাসি-হাসি করবি কি না!

ননী।—(হেসে)—হি! হি! হি!

অগস্ত্য।—বাঃ! ঠিক হয়েছে! এই রকমই ত তোকে চাই—মস্ত মেয়ে, আর মজা বোঝে, হি! হি! হি! কেমন হাসে! ওর বয়সে আমি অম্‌নি ক'রে হাসতুম।

ছোট ছেলেগুলো ভারি বোকা।—ননীমণি! আমার নাম কি বল্ ত?

ননী।—তোমার নাম দাদু।

অগস্ত্য।—তা' ত নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার আর এক নাম?

ননী।—গৎ পালু।

অগস্ত্য।—অগস্ত্য পালের পক্ষে বড় মন্দ বলে নি! উন্নতি হয়েছে। ছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া যাক্। শ্রীমতী ননীবালা, আজ শনিবার, যারা মাইনে পায়, তাদের মাইনের দিনে আমার মনিব, যিনি আমাকে মাইনে দেন না, আজ আমাকে চার আনা দিয়েছেন। তা দিয়ে কি করেছি আন্দাজ কর ত?—প্রথমতঃ মা'র জন্যে একটা পয়সা রাখবার গেঁজে কিনেছি; কারণ, তাঁর সর্ব্বদাই হাতে খুব পয়সা থাকে। এতে তোর হাসি পাচ্ছে, বেদরদী কোথাকার! কিন্তু এখন মুখ বন্ধ, বুঝেছিস,—১লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত। তার পর যত ইচ্ছে হয় বকিস্। তোর কথাও ভুলিনি। দেখ্, তোর জন্যে কি এনেছি। (পকেট থেকে চার পয়সা দামের এক নাল-বন্ধের পুতুল বের করলে, তার বুকে গোঁজা রয়েছে হাতুড়ি, সেটা ইচ্ছেমত ওঠে নামে।)

ননী। (সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে)—আমাকে দাও।

অগ। যদি লক্ষ্মী মেয়ে হোস্।

ননী। আমি লক্ষ্মী হয়েছি। আমি ঘুমই।

অগ। আমি তোর কাছে অতটা আশা করিনে। একটা হামু দে। আমাকে ভালবাসিস্ ত?

ননী।—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব।

অগ।—তবে এই নে নালুকর্ত্তা, দেশের বড়কর্ত্তা, একমাত্র সবসেরা নালু! ইনি কাঠের তৈরী এবং জলের উপর চলেন! জলজেরান্ত ছবি! দাম:—চার পয়সা, এক আনা! দেখিস্, সাবধান, যেন ভাঙ্গে না! (খুকী খেলনাটি হাতে ক'রে মুগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কৌতূহলের বশে তার চোখ বড় দেখাতে লাগল। হঠাৎ সেটা সামনে নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে হাততালি দিতে আরম্ভ করলে; ভাইবোনে হাসাহাসি করতে লাগল। দু'জনেরই উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভাব।)

জনা। ওদের দেখছ?

অ। হ্যাঁ, বেচারা ছেলেগুলো কিছুরই ধার ধারে না। নিজেরাই আমোদ করে।

জনা। তবু মন্দের ভাল। ওরা পরস্পরকে এত ভালবাসে, সেটা আমাদের বড়ই সৌভাগ্য, না? তুমি বল্‌ছিলে অগস্ত্য একটা ভবঘুরে......

অ। আমি? কই, তা ত বলিনি। আমি বল্‌ছিলুম কি... যে পরে .....হয় ত......বলা যায় না। তাই বল্‌ছিলুম। যেমন তুই বল্লি যে, ছোটটার অসুখ করেছে। কেন, ওর শরীর ত দিব্যি রয়েছে। দেখ না ফুলো গালগুলো!

জনা। আর হাতগুলো! আর পাগুলো! যেন পরীটি, আমার সোনামানিক!

অ। সত্যি বলতে কি, মেয়েটা মন্দ নয়। তোর সঙ্গে ভাসা ভাসা আদল আসে।

জনা। ছেলেটাও তোমার মত, তবে আরও ভাল। আচ্ছা বেশ, খাবার তৈরী। অগস্ত্য, তোর ক্ষিধে পেয়েছে?

অগস্ত্য।—না, মা। তা হোক্, তবু সমানে খেয়ে যাব। আমি থালা নিয়ে খুকীর কাছে বসি গে, তা হ'লে সে কাঁদবে না।

জনা। আমি ত বল্লুম, ওরা এ ওকে চোখে হারায়! ভাই কাছে থাকলে তবে ও ঠাণ্ডা থাকে।

অ। (দোলনার সামনে হাঁটু গেড়ে)—সত্যি কিন্তু, নালবন্ধটা করেছে ভাল, চেহারাটা ঠিক হয়েছে। ওকে নাল বাঁধাবার জন্যে একটা ঘোড়া এনে দিতে হবে।

ননী। বাবা!

অ। অ্যাঁ? কেমন আমায় চেনে! দেখছিস্ জনা, কেউ বলতে পারবে না যে, দুধ দেবার সময় দাই এই মেয়েকে বদল ক'রে দিয়েছে। (হাস্য)

জনা। কি যে বল, তার ঠিক নেই! এখন ত বেশ আছ দেখছি! (হাস্য)

অ। এই ছেলেদের কল্যাণে!

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

সমালোচক

আমরা নবীন সমালোচক (দূরে) গলি থেকে দিচ্ছি সাড়া,
গুম্ফশূন্য গুম্ফদেশে বিজ্ঞভাবে দিচ্ছি চাড়া।
ক খ লেখা কর্চ্ছি সুরু কিন্তু আমরা গুরুর গুরু
(যাদের) পায়ে শিখ্‌তে পারি তাদের উপর তুল্‌ছি খাঁড়া।
(প'ড়ে) কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকিরে কর্চ্ছি জবাই
(প'ড়ে) বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব ধর্ম্মপ্রচার কর্চ্ছি সবাই ;
(মোদের) বিদ্যাবুদ্ধিভাণ্ড খালি আছে সস্তা কলম-কালি
গ্রাম্যভাষায় দিয়ে গালি গুলজার ক'রে তুলছি পাড়া।
লাগি না আর কোনো কাজেই তাইতেই আমরা সমালোচক,
গ্রাম্যভাষায় দিচ্ছি গালি নইলে হয় না মুখরোচক ;
মধু খায় ত মধুমাছি ব্রণের জন্য আমরা আছি
লক্ষ্মীর রাজ্যে আছি হায় গো আমরাই যত লক্ষ্মীছাড়া।

ইউরেকা

(নিছক নক্সা)

১
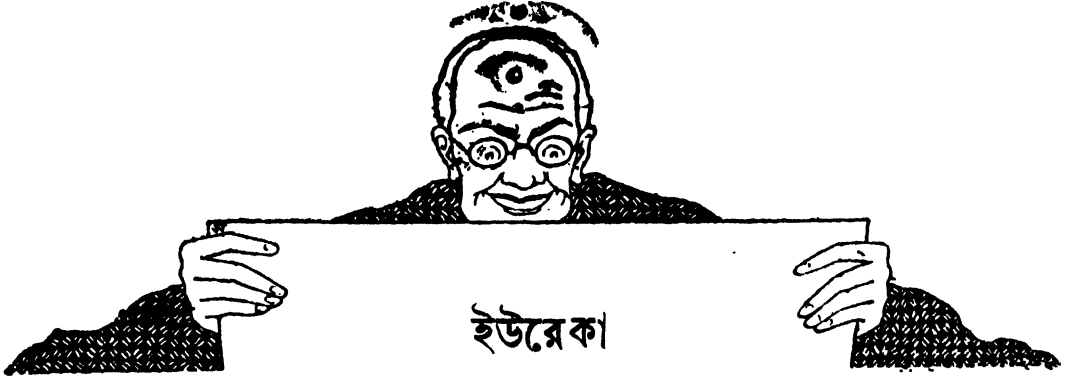
সর্দ্দি ও ক্ষুধা যেমন হৃদয়ের অবসাদক, দুরন্ত কাঠবিষ একোনাইটও সেরূপ নহে। এ মহাজনবাক্য সর্ব্বথা পালনীয়; অন্যথা, এক পক্ষের নাকের জলে ও অপর পক্ষের চোখের জলে বন্যা বহিয়া হাবুডুবু খাইতে হয়।

সিঁতির একখানি বাগানবাড়ীতে একটি মাধবী-ঝোপের অন্তরালে দুইটি যুবক অত্যন্ত চাপা গলায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

স্বরাজকৃষ্ণ ও সজনী

এক জন কহিল, "এই সময় যা না! পড়বার ঘরে একলা ব'সে আছে।"

অপর জন বলিল, "এখন থাক্, ভাই, বেজায় খিদে পেয়েছে!"

ইহারা দুই জনেই এক মেসে থাকে, এক ঘর অধিকার করে।

প্রথমের নাম রজনী, দ্বিতীয়ের রাজকৃষ্ণ। স্বরাজের ধুয়া উঠিলে ইনি পিতৃদত্ত নামের একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এখন সই করেন - স্বরাজকৃষ্ণ। ইহাতে রজনী ভাবিল, ইহা একটা তুক। সে-ও এখন হইতে 'রজনীর' পরিবর্ত্তে সজনী সই করিবে। ইহারা উভয়েই থার্ড ইয়ারে পড়ে। ইহাদের সঙ্গে একটি যুবতী পড়ে, নাম নবনলিনী। ইহার প্রতি পণ্ডিত মহাশয়ের একটু পক্ষপাত দেখিয়া উভয়েই ঠিক করিয়াছিল, তিনি এই যুবতীকে বার্ষিকী পরীক্ষার প্রশ্ন বলিয়া দিবেন। দুই জনে পরামর্শ আঁটিল, স্বরাজকৃষ্ণ কোর্টশিপ করিয়া ইহার পাণিপ্রার্থী হইবে। রজনীর এ দিক দিয়া কোন ভরসাই নাই। একে ত সে দেখিতে অতি কদাকার, তাহার উপর তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বরাজকৃষ্ণ অতি সুশ্রী। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই শাঁসে-জলে। ইহার পতি হইতে পারিলে কেবল বার্ষিকী সংস্কৃত পরীক্ষার নয়, জীবনের একটা গতি হয়। রজনী বিধিমতে স্বরাজকৃষ্ণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, "ও তোকে মনে মনে কামনা করে।"

"দূর!"

"দূর কি ? ওর মাঝে মাঝে আড়-চোখে চাওয়া দেখে বুঝতে পারিস নি ?

"চায় না কি ?"

"শুধু কি আড়চোখে চায় ? মনে প্রাণে চায়।"

স্বরাজকৃষ্ণ মুখে "দূর দূর" বলিলেও মনে মনে একটু গর্ব্বিত হইল। তাহার পর কেমন করিয়া নবনলিনীর সহিত পরিচয় এবং বাগানবাড়ীতে যাতায়াত সুরু হইল, তাহার কোন বিশেষত্ব নাই। যেমন করিয়া এ সব ঘটনা ঘটে, তেমনই করিয়া। তবে আজ যে সজনী পরিণয়-প্রস্তাব করিবার জন্য স্বরাজকে জেদ করিতেছিল, তাহার একটু কারণ আছে। সজনীর দেশ হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টি আসিয়াছে, তাহা তারিয়ে তারিয়ে নিঃশেষ করিতে গেলে স্বরাজের অনুপস্থিতি প্রয়োজন।

স্বরাজকৃষ্ণ পুনরায় বলিল, "আজ থাক্, ভাই, বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে।"

সজনী গম্ভীর হইয়া বলিল, "তবে থাক্ ! ওরে, মনে রাখিস, উদ্যোগী সিঙ্গীই ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে। পুরুষকার ! পুরুষকার ! তার পর কাল ওকে এক যায়গা থেকে দেখতে আসবে, জানিস ?"

"সত্যি না কি ?"

"না ত কি ! তোমার জন্যে প'ড়ে থাকবে ? আ মরি ! কি বুদ্ধি তোমার ! প্রণয়-নিবেদন ত হয়েছে ?"

"হাঁ, চিঠিতে। ভাই, বড় ভয় হয়েছিল, যদি পণ্ডিতকে দেখায় !"

সজনী হাসিয়া বলিল, "পাগল ! তবেই বোঝ, তোকে চায়। 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব'—অর্থাৎ বারুদ পলতে সব ঠিক্, এখন বাকী ফায়ার, কি না মুখাগ্নি ! একটি দেশালায়ের কাঠির ওয়াস্তা ! বস্, পতন ও মূর্চ্ছা !" বলিয়া সজনী স্বরাজের পিঠ চাপড়াইল। স্বরাজ পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তবে যাই ! দেখি, কি হয় !"

"এই ত মরদ্‌কি বাং !" বলিয়া আবার একবার স্বরাজের পিঠ চাপড়াইয়া সজনী মিষ্টান্নের হাঁড়ি নিঃশেষ করিতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

নবনলিনীর সে দিন বেজায় সর্দ্দি। সে পড়িবার ঘরে একা বসিয়া আছে—হাতে রুমাল, নাকে হাঁচি। সম্প্রতি পাচক আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "বাবুদিদা, আজ কি খাবে ?"

পাচকটির কোমল প্রাণ ! দিদিমণিকে অধিকতর আদর করিয়া বলে বাবুদিদা। লোকটি বোধ হয় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের। সেখানে দাদাবাবু দিদিবাবুর পরিবর্ত্তে বাবু-দাদা, বাবুদিদির প্রচলন। বাবুদিদা বলিল, "গরব্ গরব্ বোন্‌ভোগ, চিলি দিস্ ভাল ক'রে। বিষ্টি লা হ'লে খেতে পারব লা। আর দেখ, বেশী ক'রে বাদাব কিসবিস্ দিস্ আর বৌরি।"

পাচক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরই প্রবেশ করিলেন আমাদের স্বরাজকৃষ্ণ। ইংরাজী ভাষায় প্রণয়ি-প্রণয়িনীর মিষ্ট সম্ভাষণ—সুইট্ হার্ট (sweetheart)। স্বরাজ সেই নজির দেখাইয়া নবনলিনীকে পূর্ব্বে এক দিন পত্র লিখিয়াছিল, নব ! নলি ! লিনী ! তোমাকে যেরূপে ডাকি, তাই মিষ্টি ! ভাগ্যবান্ পাচক তোমাকে আদর করিয়া বাবুদিদা বলে। আমি এখন হইতে হৃদয়-সুধা বা শুধু সুধা বলিতে ইচ্ছা করি। নব-নলি-লিনী !

নবনলিনী ও স্বরাজকৃষ্ণ

সেই সামান্য অধিকারটুকু কি আমায় দিবে না? ক্লাসে তোমার হাসি—না না, মুক্তার ন্যায় দন্তপংক্তির ঈষৎ বিকাশ দেখিলেই বুঝিতে পারিব, আমার স্বর্গদ্বার মুক্ত হইয়াছে—ইত্যাদি।

আজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, "নব-নলি-লিনী! অভিভাবক বা অভিভাবিকার অভিমত না হ'লে পরিণয়-প্রস্তাব করা রীতি নয়। আমি তোমার দিদিকে জানিয়েছি। আমাদের মিলনে তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন। এখন তুমি এ হতভাগ্যকে শতভাগ্য ক'রে 'হাঁ' করলেই সব লেঠা চুকে যায়। সুধা! আমার দুর্দান্ত ক্ষুধা (এখানে অবশ্য হৃদয়ের। কিন্তু স্বরাজের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার হাত শূন্যোদর ছাড়িয়া বুকে উঠিল না) এ দুর্দান্ত ক্ষুধা কি মিটবে?"

"ও না করে, আমি তোমায় বে করব"

"হিঁচ্চো—"

স্বরাজ চমকাইয়া উঠিল; বলিল, "সুধা, বল বল, স্পষ্ট ক'রে বল, 'হিঁচ্চোতে' কিছু বুঝতে পারলুম না। আমার হৃদয়-সুধা, তোমার দেব-ভাষায় নয়, মানবের কথায় স্পষ্ট ক'রে বল, আমাদের ম্যাচ্ (match)—"

"ফ্যাচ—"

"ফ্যাচ নয়, সুধা, ম্যাচ্—অর্থাৎ পরিণয়—"

হাঁচি চাপিবার চেষ্টার মত হাস্যকর প্রয়াস আর কিছুই নাই, বিশেষ যদি তাহার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি সংলগ্ন থাকে।

"বল, সুধা, কোথা আমার স্থান? স্বর্গে না নরকে? কোথায়?"

"ঘুঁচ"—নব-নলিনী নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

"দুত্তোর প্রেমের নিকুচি করেছে" বলিয়া স্বরাজকৃষ্ণ আপাততঃ বিষম বিতৃষ্ণ হইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

কিন্তু বাগান হইতে বাহির হইবার সময় নবনলিনীর অভিভাবিকা তাহাকে আহ্বান করিলেন। ইস, এ যে গোলকধাঁধা, ঢুকলে শীঘ্র বেরুবার যো নেই। ধীরে ধীরে শুষ্কমুখে স্বরাজকৃষ্ণ অভিভাবিকার সম্মুখীন হইল। তিনি সাগ্রহে এবং সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন, "কি হ'ল? মুখখানি শুকনো ক'রে যাচ্ছ যে! রাজি হ'ল না বুঝি? এমন রূপ পছন্দ হ'ল না? বয়ে গেল! তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না! ও না করে, আমি তোমায় বে করব! তুমি আমার সহদেব হবে।" বলিয়া অভিভাবিকা হাসিলেন। স্বরাজের মনে হইল, অপ্রত্যাশিত মৃত্যু হঠাৎ যেন তাহার সম্মুখীন হইয়া দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছে!

স্বরাজকৃষ্ণ শিহরিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিল। অভিভাবিকার জীবনের ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি চতুর্থ পতির গতি করিয়া এখন পঞ্চমের অন্বেষণে ব্যাপৃতা। টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা, উদরী, বাদরী প্রভৃতি শিবের অসাধ্য রোগ-সকল এই "কাঁচাখেকো দেবতা"র পতিত্বের কাছে তুচ্ছ। প্রথম পতি যুধিষ্ঠিরের চক্ষুস্থির হইবার পর ভীম হিমসিম খাইল, তাহার পর অর্জ্জুন বেগুণপোড়া হইল, তাহার পর নকুল অকূলে ভাসিয়া গেল। এইবার সহদেবের পালা। পাড়ার লোক ইঁহাকে কলির দ্রৌপদী বলে। এখন হইতে আমরাও তাহাই বলিব।

স্বরাজের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, "ভয় কি?"

স্বরাজ মোরিয়া হইয়া কিছু না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া মেস্ অভিমুখে ছুটিল। সে কক্ষে আসিয়াই দেখিল, সজনীকান্ত একান্তচিত্তে হাঁড়ি হইতে কি বাহির করিয়া খাইতেছে এবং তাহার দুই কস্ বাহিয়া লালার সহিত রস গড়াই-তেছে! স্বরাজকে দেখিয়াই সজনী চমকিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি রে, এরই মধ্যে!" বলিয়াই দুই কর মেলাইয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিল।

স্বরাজ কেবলমাত্র "হুঁ" বলিয়া হাঁড়ির মুখ হইতে সজনীর হাত সরাইয়া সবলে চাপিয়া ধরিয়া টপাটপ আরম্ভ করিয়া দিল। সজনীর হাত দুইটা যেন জাঁতিকলে পড়িয়া ইঁদুরের মত ছটফট করিতে লাগিল। স্বরাজকে অন্যমনস্ক এবং কথা কহাইবার চেষ্টায় সে জিজ্ঞাসিল, "কি বল্লে রে?"

স্বরাজ বলিল—'হিঁচ্চো!'

সজনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "হিঁচ্চো কি?"

স্বরাজ নিরুত্তর; দরাজ হাতে মিষ্টান্ন সাবাড় করিতে লাগিল। সজনী বলিল, "তার পর?"

"ফ্যাঁচ্।"

"তার পর?"

"ঘুঁচ্!"

কৌশল নিষ্ফল হইলে সজনী একটু চটিয়া বলিল, "ও ত আর পালাচ্ছে না। কি হ'ল, খুলে সব বল না!"

স্বরাজ মিষ্টান্ন শেষ করিয়া এবং হাঁড়িতে চুমুক দিয়া রসটা নিঃশেষ করিয়া বলিল, "পালাচ্ছে না! হাঁড়ি নিশ্চয় ভর্ত্তি ছিল। আমি আসবার আগে আধ হাঁড়ি তবে গেল কোথা?"

সজনী চটিয়া বলিল, "চুলোয়! যাক্! এখন কি হ'ল, বল্ দেখি? ঘুঁচ্-ফ্যাঁচের মানে কি?"

স্বরাজ এক গ্লাস জল গড়াইয়া খাইয়া বলিল, "বুঝে নাও!"

"ওর আবার বুঝবো কি? তুই কি বুঝলি, বল?"

"আমিও তাই।"

সজনী বলিল, "আর কিছু বল্লে না?"

স্বরাজ কহিল, "ও কিছু বল্লে না। কিন্তু ওর বড় বোন্ বল্লে, সে যে করবে।"

"অ্যাঁ! তার বয়স যে চল্লিশের কাছাকাছি!"

মিষ্টান্নের জন্য সজনীর অন্তরটা তখনও রি-রি করিয়া জ্বলিতেছে। ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। "বলিল, "তোর বরাত ভাল!"

স্বরাজ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তার মানে?"

"চার জন স্বামীর চার চারটে বিষয় ভেসে এসে ঐ চড়ায় আট্‌কেছে!"

"ভোগ করবে কে?"

"যে পঞ্চম হবে।"

"বাঁচ্‌লে ত?"

"বলা যায় কি!"

স্বরাজ হাঁড়িতে চুমুক দিয়া রসটা নিঃশেষ করিল

"প্রত্যক্ষ দেখেও যদি বলা না যায়, তা হ'লে বলা-বলিতে দরকার নেই। ওখান্ থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল।"

"ভয় কি?"

"ভরসাই বা কি! প্রথমটি ত্রিপত্নীক, তিনটিকে খেয়ে ভেবেছিলেন, এঁকে চতুঃসাগরী মেল করবেন! তিনি এখন স্বর্গে গিয়ে এঁর প্রতীক্ষা করছেন! দ্বিতীয়টি দ্বিপত্নীক, দো-নলা বন্দুক ঠেসে এসেছিলেন। গুলিতার ফস্‌কালো! তৃতীয়টিও তাই। চতুর্থটি একপত্নীক। শুনেছি,

তার কোষ্ঠীতে প্রবল স্ত্রী-হন্তারক যোগ ছিল। একবারমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে দিলেন কালসাপের মুখে হাত! বস্! কুপোকাত!"

সজনী মুখ মচকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেশ ত! অপত্নীক এখনও বাকী!"

"তাই আমাকে দিয়ে পরীক্ষা হবে? না, ভাই, ও কথা নিয়ে ঠাট্টা করতেও ভয় হয়।"

"আ গেল! তুই যে ভয়েই গেলি! এমন বিষ নেই—যার ঔষধ নেই। বলে না—বিষকুম্ভপয়োমুখং? মারণ করলেই কাটান্ মন্তর আছে—আছেই আছে!"

স্বরাজ হাসিয়া কহিল, "কোথা আছে? তালগাছে, না পাকালমাছে?"

"যেখানেই থাক, আছে—অস্তু!"

"বেশ, স্বস্তু! আমার সঙ্গে তার কি?"

"ওরে মূর্খং, শোন্! দিন-কাল কি পড়েছে, দেখ্‌ছিস্ ত? বি, এ, এম-এ পাশ ক'রে দরখাস্ত হাতে এ আপিস সে আপিস ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে। জুড়ী চড়বি, মোটর চড়বি, তার ওপর একটি মুরুব্বী স্ত্রী পাবি। পায়ের ওপর পা, ব'সে ব'সে খা! একটা হিল্লে হবে, বাপের দেনাগুলি সব শোধ যাবে। কেন দুপুর রোদে পথে পথে বেড়াবি—ঘামে ধুলয় মুখে ফেঁকো উঠবে! আমার বাবা যে বাদ সেধে গেছে—তাড়াতাড়ি গলায় একটা ঘুঁটে-কুড়ুনী গছিয়ে দিয়ে! নইলে তোকে সাধাসাধি করি?"

"আমি মোটর চড়লে তোর লাভ?"

"এক আধ দিন চড়তে পাব। তার পর আমার কাছে মুখে এক রকম, পেটে এক রকম নেই। স্পষ্ট কথা! আমি প্রত্যক্ষে প্রিয় বক্তারং নই। আমি যে ঘটকালি করব, তার বিদায় দিতে হবে।"

"সে আবার কি?"

"এই মাস মাস কিছু চাঁদা।"

"চাঁদা! ভিক্ষে বল্।"

"আচ্ছা তাই। আমি একটু সভ্য ক'রে বল্‌ছিলুম, তুমি একেবারে নাড়ি-ভুঁড়ি বার ক'রে দিলে।"

স্বরাজ একটু চিন্তিত হইল। সজনী বুঝিল, ঔষধ ধরিতেছে।—খাও, চাঁদ, হাঁড়ি ওজড় ক'রে!

স্বরাজ কহিল, "সত্যি বল্‌ছিস্, তোর সুবিধে থাকলে ঐখানেই বে—"

"ঐখানেই কি? ওকেই—"

"বাবার দেনাগুলো শোধ যায়, এই একটু লোভ! কাটান্ মন্তরটা কি শুনি?"

"এ কি ফুস্ মন্তর যে, ফস্ ক'রে বল্‌ব? তুই রাজি কি না, আগে বল্!"

"ধর, নিমরাজি।"

"নিমরাজির কর্ম্ম নয়। পুরা-দস্তুর রাজি হওয়া চাই। বেশ ক'রে বুঝে দেখ! বাপের দেনা শোধ যাবে; তার পর যার জন্য তুই পাগল, দেশের কত কায করতে পারবি।"

"আচ্ছা, রাজি। কিন্তু মন্তরটা কি?"

"হাতে হাত দিয়ে তিন সত্যি কর, রাজি। আমাকে মাঝি হয়ে হাল ধরতে হবে। মাঝ-দরিয়ায় যে নৌকর তলা ফাঁসাবে, সে হবে না।"

স্বরাজ বলিল, "সত্যি-টত্যি আমি করতে পারব না। তবে রাজি।"

সজনী ভাবিল, বেশী টানাটানি করিলে হয় ত ছিঁড়িয়া যাইবে, কহিল, "আচ্ছা বেশ, তোর কথাই নিলুম।"

"কাটান্ মন্তর বল্।"

"যার কুষ্ঠীতে স্বামি-হন্তা যোগ নেই, আর নিকষার প্রমাই নিয়ে জন্মেছে, এমন মেয়ে দেখে আর একটা বে করলেই হ'ল। বস্! ও মারবে, এ বাঁচাবে! লাগুক দু'জনে ঝুটো-পুটি! মাঝখান থেকে তুই মজা ওড়া!"

"আগে কা'কে বে করতে হবে?"

"আগে অবশ্য দ্রৌপদীকে—বয়োজ্যেষ্ঠা—"

"যদি বাসর-ঘরেই সাবড়ায়?"

সজনী অনন্যোপায় হইয়া বলিল, "সে, ভাই, তোমার বরাত!"

স্বরাজও কিছুক্ষণ ভাবিয়া উৎসাহ সহকারে বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে ত ছিঁচোকেও বে করতে পারি?"

সজনী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "নিশ্চয়! এতক্ষণে তোর আক্কেল আসছে।"

"আর ও যদি না রাজি হয়?"

"কুছ্ পরোয়া নেই! আমি তবে মাঝি হব কি করতে? ওর চেয়ে ভাল পাব।"

"দরিয়ার তলা থেকে টেনে তুলবি না কি ?"

"দরিয়ায় ডুবতে হয় ডুববো, মাটী খুঁড়তে হয় খুঁড়বো—"

"তোমার ব্যাভারে ত ভাই তা মনে হয় না ! ছানাবড়াগুলো একা একাই সাবড়াচ্ছিলে !"

"তুই ত ভারি কুরুটে ! তোর বিশ্বাস বুঝি, তোর জন্মে রাখতুম না ? নিশ্চয় রাখতুম !"

"তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা আর চেষ্টা দেখে তা ত মনে হ'ল না। সত্যি কথা বলবো ! আর আমি প্রাণান্তেও তোমার সঙ্গ ছাড়ছি নি।"

"আচ্ছা, দাদা, এবার থেকে যখন আনাবো, দু' হাঁড়ি আনাবো।"

"এ খুব সদযুক্তি।"

"এখন তুমি ত রাজি ?"

"দু'দিন ভেবে দেখলে হয় না ?"

"কিছু ক্ষতি ছিল না ! কিন্তু চিল পড়েছে। কখন্ ছোঁ মারবে !"

"সে কে রে ? ওই ধামপালকে যে কর্‌তে চায় !"

"সেও একটা 'ব্যুঢ়োরস্কো বৃষ-—"

"তার মানে ?"

"বুড়ো রাস্‌কেল বৃষকাঠ। তুই ফকিরচাঁদের নাম শুনিস্ নি ?"

"সেই ভ্যালিচুডিনেরিয়ান্ (valetudinarian) চিররোগী, বিছানা ছাড়ে না ?"

"হাঁ হাঁ ! সে-ও বিছানা ছাড়ে না, আর ডাক্তারও তার বাড়ী ছাড়ে না।"

"সে ত ফকির নয়, আমীর ! তার ও টাকার কাঁড়িতে কি দরকার ?"

"আরে, তুই নেহাৎ ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি—না ভূত না মানুষ। ফকিরচাঁদ ত নয়; ফিকিরচাঁদ। কিসে দু'পয়সা আসবে, সেই ফিকিরে ফিরছেন। কি বলবো, বাবা যে নেহাৎ ঘাড়ে একটা 'ভার্য্যাং ফলতি সর্ব্বত্রং' ক'রে গেলেন।"

"না করলে কি করতিস্ ?"

"কি করতুম ! দেখতিস্, দেখতিস্ ! তা হ'লে একেবারে টোপর মাথায় দিয়ে 'বরমসিধারা নরকে বাসঃ !' বর হয়ে বসতুম।"

"ভাই, সংস্কৃতর দিন তোর পাশে আমার সীটটা জোগাড় ক'রে ফেল্‌তে হবে।"

"কেন, তুইও ত আজকাল খুব সংস্কৃত পড়ছিস্ !"

"আরে দাদা, পড়ব কি ? অক্ষরগুলো দেখলেই আমাদের পুকুরের সেই চিতি কাঁকড়া মনে পড়ে !"

"যাক্ ! তুই ত এখন রাজা ! তা হ'লে আমি মাঝি হয়ে হাল ধরি ?"

"তা ধর ! কিন্তু ভাই ছিঁচোকে চাই।"

"কেন বল দেখি, তার ওপর এতটা ?"

"তুই ত বলেছিলি, আড়চোখে চায় – ভালবাসে, কত কি ?"

"ঠিক্ ঠিক্ ! নিদেন সংস্কৃত কোয়েশ্চেন্‌গুলো ত জানা যেত !"

"তাতে লাভ ? উত্তর কর্‌তে পারা ত চাই।"

"খুব পারা যাবে—'অস্ত্যাস্তরস্ত্যাং !' স্ত্যাং দেখে বুঝতে পারিস্‌নি ?"

২

আমাদের দ্রৌপদী ঠাকুরাণী আলোকপ্রাপ্তা হিন্দু রমণী। ইঁহার চতুর্থ পতি সম্প্রতি সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। এখনও হবিষ্য চলিতেছে। কিন্তু মৎস্য-মাংস ব্যতীত ইঁহার স্বাস্থ্য একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। এক জন আলোকপ্রাপ্ত ডাক্তার আসিয়া বিধান দিলেন, রোজ এক ডজন করিয়া ডিম খাইতে হইবে।

দ্রৌপদী প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন—"ডিম ! না ডাক্তারবাবু, ডিম নয়, ডিম নয় ! (চক্ষুতে রুমাল দিয়া) এই সে দিন আমার নকুল অকূলে ভেসেছে। এখনও ঠিকানায় পৌঁছুতে পারে নি, ডাক্তারবাবু ! এরই মধ্যে ডিম !"

"আপনি এখনও ঐ সব কুসংস্কার মানেন ? বেশ ! আপনাদেরই বেদে লেখা আছে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' শরীরটা ত রাখা চাই ! আবার ত বিবাহ কর্‌তে হবে ? স্বাস্থ্য নইলে সব ব্যর্থ।"

"বেশ। আপনি যখন বল্‌ছেন, সেই আমার বেদবিধি ! তবু ডাক্তারবাবু ! আমি নারী, কলঙ্ককে ভয় করি। দুর্ম্মুখদের জানেন ত ? এরই মধ্যে পাড়ায় ষড়যন্ত্র চল্‌ছে, আপনি চার বার বে কর্‌লে আর বোন্‌টার এক বারও হ'ল না। খুবড়ো ক'রে রেখেছে। এবার যদি বোনের

বে না দিয়ে নিজে বে করে, ওর বাড়ীতে আমরা কেউ খাব না।"

"বেশ ত, আপনারই খরচ বেঁচে যাবে! কতকগুলো ভূত-ভোজন করানো বৈ ত নয়!"

"তা কি হয়!"

"যা বোঝেন! আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রে গেলুম! এখন আপনার ইচ্ছা।"

"রাগ কর্‌বেন না, ডাক্তারবাবু! মেয়েমানুষের পদে পদে বিঘ্ন। বলে, 'পুড়বে নারী, উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই!' আমি একবার টোলের বিধান জানি।"

"দোহাই আপনার, ঐ টিকি-ওয়ালাগুলোকে প্রশ্রয় দেবেন না।"

"না, না, তেমন ভট্‌চায ডাক্‌বো না। যারা রিফম্‌ড্‌ (Reformed) অর্থাৎ সংস্কৃত, টিকি ছেঁটেছে, উদার, তাদেরই ডাকাবো।"

"তা যা করুন, দেরী করবেন না" বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

পরদিনই হলঘরে বিচারসভা বসিল এবং পূর্ব্বপক্ষ হইল ডিম আমিষ কি না? দ্রৌপদীর কুল-পুরোহিত তাহার নেতা।

এ সভায় যিনি প্রধান পণ্ডিত, তিনি বলিলেন, "হংস যখন জলচর, তখন তাহার ডিম্বকে অবশ্যই আমিষ বলিতে হইবে। কেমন হে ভায়ারা?"

ধন্য, ধন্য! ন্যায়শাস্ত্র না পড়লে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় না। কি বিচারশক্তি! সকলে একমত হইল।

পুরোহিত বলিলেন, "তা ত হ'ল। কিন্তু ডিম ত এক-জাতীয় নয়। মুর্গীরও ডিম হয়, আপনারা জানেন ত?"

পণ্ডিতমণ্ডলী একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "জানি বই কি, জানি বৈ কি।"

পুরোহিত বলিলেন, "স্বীকার করি, মাছ যদি আমিষ হয়, তার ডিমও অবশ্য আমিষ। হাঁসের দেহে পঁওক আঁইষ না থাকিলেও সে জলচর, তার ডিমও আমিষ।"

এই দলে কেমন করিয়া একটি টিকিধারী জ্যেঠা ভট্টাচার্য্য ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "আহা!"

"কিন্তু ডিম ত কেবল হাঁসেরই হয় না।"

টিকিধারী বলিল, "হাঁ হাঁ, নিঃসন্দেহ! ঘোড়ারও হয়!"

পুরোহিত বলিলেন, "তুমি কে হে? যার টিকি আছে, তার হেথা অনধিকারপ্রবেশ!"

সভাপণ্ডিত বলিলেন, "বিরুদ্ধবাদী থাকা ভাল। নহিলে অপবাদ হইবে, একপক্ষ বিচার।"

"মুর্গী স্থলচর। কুক্কুট প্রভৃতি তার বহু নাম আছে, তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম—রামপাখী! বোধ করি, রামাবতারে ইহার পূজা করা হইত। মুর্গী সাক্ষাৎ নারায়ণ!"

"আর তার ডিম পতিতপাবন"—বলিয়া টিকিধারী ভাবে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দূর ক'রে দাও! দূর—দূর—"

সভাপতি বলিলেন, "বেল্লিকের মুখ দিয়াও কখন কখন সত্য বাহির হয়। বড় মিছে বলে নি, ভায়া! যাহা দ্বারা পতিত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়, সে পতিতপাবন নিশ্চয়।"

"এবং নিরামিষ।"

পুরোহিত বলিলেন, "তা হ'লে এই এ সভার মত?"

সকলে একবাক্যে নিশ্চয় নিশ্চয় বলিলেন। দ্রৌপদী এক দিকে নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বিপদ হইল তাঁহার সহোদরা নবনলিনীকে লইয়া। পাত্র আর তাহার পছন্দ হয় না। যে কোর্ট্‌শিপ করিতে চাহে, দ্রৌপদী সাদরে তাহাকে ভগিনীর নিকট পাঠাইয়া দেন। একে একে ধনীর দল নিষ্ফল হইলেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চরম সার্টিফিকেট পাইয়াছেন, এখানে তাঁহারা পাশ হইতে পারিলেন না! রূপও অকৃতার্থ হইল। এইবার আসিলেন, আর্টিষ্ট্‌ কলাবিদ্‌। কয়েকখানি চিত্র লইয়া প্রথম এক জন চিত্রকর দেখা দিলেন। তন্মধ্যে একখানি চিত্র সযত্নে নব-নলিনীর হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনিই প্রকৃত আর্ট-ক্রিটিক, শিল্পসমালোচিকা। দেখুন দেখি!"

নবনলিনী বহুক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিল, "এ কিসের ছবি?"

"বলুন না!"

"কেউটে সাপ চক্র ধ'রে রয়েছে?"

"ওঃ, বাঃ বাঃ! আপনি কেবল বিদুষী নন, এক জন কবি।"

"তা' ত হ'ল। ছবিখানা কি?"

"এখানি অপ্সরা মিশ্রকেশীর ছবি। ওটা কেউটে সাপ নয়, মোহন বেণী।"

"কেউটে সাপ চক্র ধ'রে রয়েছে"

পেণ্টার একটু চটিয়া বলিল, "যা হ'ক, একটা ওঠে ত ?"

"তা আপনার আঁকা এই কেশ শুদ্ধ বেণী দেখে ত পরচুলোর দোকানও মনে উঠতে পারে ? একটি ঘাস দেখে যে গরুর পাল মনে পড়বে, এমন কি লেখা-পড়া আছে ? আমার কলেজ যাবার বেলা হ'ল। মাপ করবেন," বলিয়া নবনলিনী নমস্কার করিল।

অপর এক দিন আসিলেন এক ফটোগ্রাফার, একেবারে স-ক্যামেরা। হাতেও একখানি আল্‌বাম্ (Album)।

নবনলিনী বলিল, "ওখানি কি ?"

"ও আমার সব তোলা ছবি।"

"কৈ দেখি, দেখি।"

"ও আর কি দেখবেন! চলুন, একেবারে আপনার ছবি তুলে দেখাই। আমার জীবন ধন্য করি।"

"এখন তার সময় হবে না। আমি টেনিস্ খেলতে যাব।"

"আচ্ছা, তবে দেখুন।"

নবনলিনী প্রথম চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে প্রশ্ন করিল, "এ স্ত্রীলোকটি গাউন্ প'রে একটা কুমড়ো ঘাড়ে ক'রে রয়েছেন কেন ?"

ফটোগ্রাফার হাসিয়া কহিল, "হা-হা-হা! আপনি খুব রসিকা! ওটা কুমড়ো নয়। ব্যারিষ্টারের স্ত্রীর ঘাড়ে কুমড়ো! তাঁর গণ্ডদেশে একটি আঁচিল ছিল। ছিল কেন, আজও আছে। ওটি সেই আঁচিল।"

"এত বড় আঁচিল!"

"আজ্ঞে না, অত বড় নয়। আঁচিল খুব ছোট।"

"তবে এত বড় হ'ল কি ক'রে ?"

"আমি ত আর ইচ্ছা ক'রে অত বড় করিনি। ক্যামেরাতে যা উঠেছে, তাই।"

"আপনার ক্যামেরার ভিতর কি সয়তান ঢুকে ব'সে আছে ?"

"বলেছি ত আপনি খুব রসিকা!"

"কি, ফটোগ্রাফ থেকে তোলা ?"

পেণ্টার বলিল, "বাঃ বাঃ! আপনি যেমন সমালোচিকা, তেমনই ভাবগদ্‌গদিকা। আবার তেমনই শ্লেষিকা। আপনার শ্লেষ্মা হয়েছে ব'লে বলছি না। মাপ করবেন! খুব শ্লেষ করতে পটু।"

"পটু ত পুংলিঙ্গ। বলুন পটিকা। তা যেন হলুম কিন্তু অপ্সরার হাত-পা, শরীর, মুখ সব কোথা গেল ?"

"আপনার কল্পনায় কি তা ফুটছে না ?"

"মোটে না।"

"কি জানেন, শ্রেষ্ঠ শিল্প বা কলা হচ্ছে সাগ্‌জেষ্টিভ্ (suggestive) সাঙ্কেতিক—অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবিশিষ্ট। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, হাঁ করলেই বুঝা যায়। শ্রেষ্ঠ কলার মিশন্ (mission) বার্ত্তা হচ্ছে, হাঁ করা। বোঝার ভার আপনাদের মত বিদুষীর। আমরা ইঙ্গিত করবো, আপনারা ফুটিয়ে তুলবেন। পায়ের একটি নখ দেখে যদি আপনার মত রূপ-লাবণ্যবতীর আকৃতি ফুটিয়ে তুলতে না পারা যায়, তা হ'লে চক্ষুই ত বৃথা!"

"সে আপনাদের মত 'রূপদক্ষ'র কায। আমাদের ক্ষিদে পেলে মনের ভিতর ডাল-ভাতই ফুটে ওঠে। ঐ পর্য্যন্ত, আর বেশী নয়।"

"এ ভদ্রলোকটির জুতোর ওপর পেট! তার ওপর মুখ। যেন জয়ঢাকের ওপর একটি মুণ্ডু বসানো। এর পা-ই বা কোথা গেল আর শরীরটাই বা কি হ'ল? এ কি সব হাসির ছবি? আপনার ক্যামেরা কি কমিক্ ক্যামেরা?"

"আজ্ঞে না, আটশ' টাকা দিয়ে আমি কি ছেলেখেলা কিনেছি? তা ভাববেন না।"

"আপনি কি নূতন ছবি তুলতে আরম্ভ করেছেন? এখনও ঠিক যায়গায় ফোকাস্ (focus) করতে শেখেন নি? এ কি, এত বড় নাক? একেবারে পেটের ওপর ঝুলে এসে পড়েছে? এ কি, এ বৃদ্ধাটি একটা কলা মুখে ক'রে ব'সে আছেন কেন?"

"আজ্ঞে, উটি বৃদ্ধাও নয়, কলাও মুখে ক'রে ব'সে নেই। ওটি আমার ছোট ভগিনী। কলা নয়, ঠোঁট্। দিন! আমার বেলা হ'ল।"

অতঃপর যিনি আসিলেন, তিনি এক জন সাহিত্যিক। আসিয়াই বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম, মহাশয়া! আপনি, শুনলুম, এক জন বিশুদ্ধা বিদুষিণী।"

নবনলিনী তখন পাঠনিরতা। সহসা সম্ভাষণে চকিত হইয়া বলিল, "কে বললে?"

"হুঁ হুঁ! কার্বলিকের গন্ধ কি লুকুনো যায়!"

"উঃ, আপনি এক জন মহাকবি!"

"ঠিক! আপনি বুঝদারিণী বটে!"

"আপনার কবিতা কোথায় ছাপা হয়?"

মহাকবি বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "কোথাও না! কেউ ছাপায় না! ছাপানো চুলোয় যাক্, কেউ শোনে না, মহাশয়া! শোনাবার জন্য পার্টি (Party) দিয়েছি। তা কৈ? খেয়েই গেছে। শোনে নি।"

"আপনার কবিতার কি ভাব?"

"আমি, মহাশয়া, প্র্যাক্‌টিক্যাল্ লোক, বস্তু-তান্ত্রিক, অর্থাৎ রিয়ালিষ্টিক্ (Realistic)। আমার কবিতায় ভাবও নেই, কল্পনাও নেই।"

"ছন্দ, মিল?"

"তাও নেই।"

"তবে আছে কি?"

"কেবল ভাষা, তাও ভাসা-ভাসা।"

"একটা শুনতে—"

"নিশ্চয়! শোনাতেই ত এসেছি। এই মনে করুন, কাট্‌লেট্ সম্বন্ধে—আমার বন্ধুরা যা ভালবাসে।"

"কাট্‌লেট্ সম্বন্ধে লিখেছেন?"

"নিশ্চয়! কেন লিখবো না? কাউকে যখন রেয়াত করি নি, তাকেই বা করবো কেন?"

"বাপ রে! তা কি করে! খামকা লোক বলবে—এক-চোখো। তা কি লিখেছেন?"

"কাট্‌লেট্ সম্বন্ধে?

এক দিন ছিলে তুমি মুর্গীর ঠ্যাং,

বেড়াতে পথে পথে।

আজ পেয়েছ উচ্চগতি।

টেবলের ওপরে ডিস্,

তার ওপোরে তুমি।

ত্যাগগুণে তোমার আদর,

যেমন দধীচি মুনি

আত্মদানে বৃত্রাসুরে বধ করে—

তুমি মারো ক্ষুধাসুরে।"

"বাঃ, চমৎকার!. জিবে লাল আসছে!"

মহাকবি উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আরও শুনুন! রাতাবি সন্দেশ—

আহা মরি, রাতাবি! বসেছ রেকাবিতে

যেন বাতাবি ঝোলে ডালে-

কচুরি সম্বন্ধে একটা শুনবেন? এটা আরও চমৎকার! লিখতে লিখতে আমার চোখে জল এসেছিল।

কচুরি রে! মন চুরি করিস তুই!

কিন্তু ঘৃত-খোলায় প'ড়ে,

অতিরিক্ত ঘি খেয়ে ফেঁপেছে তোর পেট!

দুরাশায় যেমন মানুষের।

এই ফাঁপা-পেটে যাবি তুই পেটে যার,

পেট ফাঁপবে তারও, ওজন বুঝে না খেলে।"

"আপনার কবিতাগুলি নীতিপূর্ণ। স্কুল-পাঠ্য হওয়া উচিত। খালি কি খাবার কবিতাই লেখেন?"

"কে বললে? আজ এখানে আসবার আগে একটা লিখেছি। এটার কিন্তু মিল আছে—

বধূর মধুর নাম নবনলিনী।

মধুর লোভে ধেয়ে আসে সব প্রবীণ অলিনী।"

"অলিনী কি ?"

কবি উচ্চহাস্ত করিয়া বলিলেন, "হা—হা হা—হা ! কথাটা আমার কয়েন্ (Coin) করা। দুটি ঘণ্টা লেগেছে, মহাশয়, কথাটা তৈরী করতে। অলিনী মানে ভ্রমরিণী।"

"নবনলিনী মনে মনে বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য! (প্রকাশ্যে) কিন্তু অলিনী ত স্ত্রীলিঙ্গ। খালি স্ত্রীলিঙ্গই আসবে ?"

"অলিও আসতে পারে। তা হ'লে কিন্তু আপনার নামটা নবনলিনী না ক'রে নব-নলি করতে হয়।"

"রোজ কত কবিতা লেখেন ?"

"আজ-কাল আর কবিতা লিখি না। নাটক লিখছি।"

"নাটক! কি, হাস্য না করুণ ?"

"হুঁ হুঁ! আপনাকে বলি। কারুর কাছে প্লটটা ভাঙবেন না। হাস্যও নয়, করুণও নয়। যেমন নরুণ।"

"উঃ, খুব উচ্চ আইডিয়া (Idea), কিন্তু বোঝা শক্ত! আমি ত পারলুম না।"

"নরুণ কি রকম জানেন, মহাশয়! নখ যদি ভালয় ভালয় কাটলো ত মুখে হাসি বেরুল। আর যদি বাধলো ত বস্—কান্না! আমার নাটক প'ড়ে তেমনই কেউ হাসবে, কেউ কাঁদবে!"

"হাসবে আপনার শত্রুপক্ষ ?"

"আপনি যথার্থ বলেছেন! আমার শত্রু অনেক! একটু ভাল লিখি কি না! হাসবে আমার শত্রু, আর কাঁদবে মিত্রপক্ষ।"

"কত দিনে লেখা হবে ? আমার যে ভারী কৌতূহল হচ্ছে।"

"আমি নায়ক-নির্ব্বাচন করেছি গরীব শ্রেণী থেকে। নায়িকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।"

"বেশ করেছেন।"

"শুনুন আগে। প্রথম অঙ্কে নায়কের গঙ্গা-স্নান ও স্নানার্থিনী নায়িকার সঙ্গে সাক্ষাৎ।"

"দ্বিতীয় অঙ্কে ?"

"দ্বিতীয় অঙ্কে নায়কের গা মুছিয়া ভিজা কাপড়ে গঙ্গা সাক্ষী করিয়া নায়িকাকে প্রেম-নিবেদন ও নায়িকার প্রত্যাখ্যান।"

"বাঃ বাঃ, আমার কৌতূহল আপনি বাড়িয়ে তুলছেন! তৃতীয়ে ?"

"তৃতীয়াঙ্কে প্রেম-নৈরাশ্যে ভাবিয়া ভাবিয়া নায়কের ডিস্‌পেপসিয়া (Dyspepsia) এবং মৃত্যু।"

"রোগটা ত বড়লোকের মত হয়েছে ?"

"তা হয়েছে বটে, কিন্তু মলেও কি তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না ? চতুর্থাঙ্কে নায়িকার বিরহ।"

"আপনি যে বল্লেন, নায়িকা নায়ককে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

"তা ত করেছে! দেখুন, ওর একটা সাইকলজি (Psychology) আছে।"

"থাক্! তার পর ?"

"তার পর পঞ্চমাঙ্কের ষোড়শ গর্ভাঙ্ক পর্য্যন্ত নায়িকার আরও বিরহ। তার পর সপ্তদশ গর্ভাঙ্কে 'হা নাথ!' ব'লে মৃত্যু।"

"এইখানেই যবনিকা ?"

"না, তা হ'লে আর্ট কি হ'ল ? অষ্টাদশ গর্ভাঙ্কে খাট আনা প্রভৃতি। ঊনবিংশ গর্ভাঙ্কে ফের সেই গঙ্গা।"

"এখনও বয়ে যাচ্ছে ? এখনও শুকায় নি ?"

"নিশ্চয়! বিংশ গর্ভাঙ্কে অন্তর্জ্জলি। কিন্তু যেই সকলে ধরাধরি ক'রে অর্দ্ধ-অঙ্গ জলে ডুবিয়ে দিলে, প্রেমিকা নায়িকা অমনই খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালো! এইখানে ড্রপ্ বা যবনিকা যা-ই বলুন।"

নবনলিনী স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, "কে উঠে দাঁড়ালো! সেই মড়া ?"

"আজ্ঞে হাঁ, সেই মড়া! উঠে দাঁড়ালো, তার আমি কি করবো বলুন! আমার কি হাত ?"

"আপনার কলম বুঝি পাগলা ঘোড়ার মত ছোটে ? হাত আপনি চলে ?"

"আজ্ঞে না। মিছে কথা বল্‌বো না। কলম চালায় ইন্‌স্পিরেসন্ (Inspiration) ঐ যাকে বলে দৈব-প্রেরণা।"

"ঠিক ত! বাঃ, চমৎকার আপনার কল্পনা!"

"কল্পনা আমার নাই।"

"তবে কি রিয়ালিষ্টিক্ ?"

"নিশ্চয়। সংসারে নিত্য এ ঘটনা ঘটছে, কিন্তু আমরা চোখ চেয়ে দেখি না। চোখ চেয়ে দেখি না যে—

যে—যে—যে—দেখি না যে—যে—যে—চোখ চেয়ে—যে—যে—"

"আমাকে একটু বেরুতে হবে।"

"যে আজ্ঞে। আমি আবার আসব।"

"এখন আমাদের পরীক্ষার সময়।"

"আচ্ছা" বলিয়া কবি বিষণ্ণ মুখে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু নবনলিনী বিবাহার্থীদের যতই প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল, দ্রৌপদীর মন ততই আকুল হইয়া উঠিল। এই সময় তিনি এক দিন শয্যায় শুইয়া ভাবিতেছিলেন, কত দিনে সহদেবকে লাভ করব, এ পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। হা সহদেব! কৈ সহদেব! কোথা সহদেব স্বপ্ন দেখিলেন, যেন পুষ্পকরথে চড়িয়া সহসা তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। একা, সঙ্গে কেহ নাই। ভয়ে ভয়ে চারিদিক্ চাহিতে চাহিতে চলিতে চলিতে দেখিলেন, একটি দীর্ঘাকার পুরুষ আসিতেছে, যেন চেনা-চেনা। কে এ? ওঃ, আমার সেই প্রথম পক্ষ—যুধিষ্ঠির না? ও আবার কি? স্বর্গে এ কি বিপদ!

এমন সময় যুধিষ্ঠির কাছে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আরে! তুমি কতক্ষণ?"

দ্রৌপদী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া কহিলেন, "এই আসছি।"

"এস! এস! আমি আর একা থাক্‌তে পারছিলুম না। তাই এক দিন মেজাজ বুঝে দেবরাজের কাছে আবেদন করলুম, দেবরাজ, আর একলা থাক্‌তে পারছিনি! দেবরাজ বললেন, একা থাক্‌বার জন্য কে তোমায় মাথার দিব্য দিচ্ছে? আমার এত অপ্সরা রয়েছে। আমি বললুম, অপ্সরা আমি চাইনি। যাকে আমি নিরন্তর ধ্যান করি, তার নাম আমার জপমালা—কি নামটি ভাই তোমার?"

দ্রৌপদীকে লজ্জায় জড়সড় দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিল, "তা তোমার নাম যা-ই হ'ক, তুমি আমার। দেবরাজ দয়া ক'রে আমার কামনার ধন আমায় এনে দিয়েছেন, আর বিচ্ছেদ হবে না।"

দ্রৌপদী শিহরিয়া উঠিলেন। আর বিচ্ছেদ হবে না! সে কি কথা! আমি যে বিষয়-আশয়ের কোন ব্যবস্থা ক'রে আসিনি! এখনও যে পাঁচটি পোরে নি! সহদেবকে লাভ করতে পারি নি। মুর্গীর ডিম কেনা প'ড়ে রয়েছে, কাল খাবো ব'লে! দ্রৌপদী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি বেড়াতে এসেছি!"

"যা করতেই এসে থাকো, আর আমি তোমায় ছাড়ছিনি!" বলিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর হাত ধরিল।

সেই সময় কে তাহার গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিয়া বলিল, "ছাড় বেটা!"

দ্রৌপদী মনে মনে বলিল, "আঃ! ভগবান্ রক্ষা কর্‌লেন।"

কিন্তু আগন্তুক দাঁতে দাঁতে পিষিতে পিষিতে বলিল, "শালা! আমার পরিবারকে বে-ইজ্জৎ! ছাড় ছুঁচো! নইলে ফের্ একটি চড় লাগাবো, একেবারে পাতালে গিয়ে পড়বি।"

দ্রৌপদী রক্ষাকর্ত্তার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিল, বিপদের উপর বিপদ, দেখিল—ভীম। ওঃ, এটা পৃথিবীতে বেজায় কাঠ-গোঁয়ার ছিল! মরেও কি সে স্বভাব যায় নি?

যুধিষ্ঠির বলিল, "কেন ছাড়বো? আমার পরিবার, তুই বেটা কে? পাজি বেটা, নচ্ছার বেটা! হাত ছাড়!" বলিয়া ভীমের ভীম ভুঁড়িতে এক লাথি!

এমন সময় অর্জ্জুন আসিয়া বলিল, "কি, কি, গণ্ডগোল কিসের? আরে কে ও? প্রিয়া! আহা, অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্! তোমরা কে হে বাপু! ছেড়ে দাও, ও আমার পরিবার! নইলে তোমাদের মত দুটোকে একসঙ্গে এক চড়ে "

দুই জনই একসঙ্গে বলিল, "কি করবি রে, বেটা, কি করবি?"

"দেখতে পাবি রে বেটারা, দেখতে পাবি—"

উভয়ে কহিল, "কখন্ রে বেটা, কখন্?"

যুধিষ্ঠির ও ভীম দুই জনে দুই হাত ধরিয়াছে, অর্জ্জুন ধরিল কেশে!

"আহা হা! ছাড়ো ছাড়ো! এ তোমাদের কি রকম আক্কেল! আমি এখনও মরিনি! আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?"

যুধিষ্ঠির বলিল, "মরেছ, প্রিয়ে, তুমি মরেছ! আমার বরাতে—"

ভীম। তোর কি রে শালা, আমার বরাতে!

অর্জ্জুন। চোপ্ বেটা, আমার! তবে রে বেটা, এ কি ছেলের হাতে মোয়া! চ'লে এস, তুমি!—বলিয়া দ্রোপদীর চুলে এক হেঁচ্কা।

দ্রৌপদী একান্ত বিপন্না। একটি ভদ্রলোক আসিতেছে দেখিয়া পরিত্রাহি চীৎকারে ডাকিল, "মশাই, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, স্ত্রী-হত্যা হয়।"

"কি হয়েছে, কি হয়েছে," বলিতে বলিতে লোকটি তাড়াতাড়ি কাছে আসিবামাত্র দ্রৌপদী দেখিল, সর্ব্বনাশ, এ যে নকুল!

নকুল বেশ করিয়া ঠাওরাইয়া দেখিয়া চিনিল দ্রৌপদী! দেখিল, দুই জনে তাহার দুই হাত, এক জন কেশে ধরিয়াছে। সে কণ্ঠলগ্ন হইয়া কহিল, "প্রিয়ে, বিধুমুখি, এত শীঘ্র যে তোমায় পাব, তা ত ভাবি নি!"

সে কণ্ঠলগ্ন হইয়া কহিল, "প্রিয়ে, বিধুমুখি ..."

নকুল বেচারী ক্ষীণ-জীবী; ভদ্রভাবে বলিল, "মশাইরা ছাড়ুন, ইনি আমার পরিবার। না ছাড়েন, আপনাদের নামে ফৌজদারী করব।"

এ দিকে দ্রৌপদীর সেই পরিত্রাহি চীৎকার দেবরাজের কানে পৌছিল। কি, স্ত্রী-হত্যা! আমার স্বর্গে! কের কি দানবাক্রমণ! তিনি বজ্র লইয়া ছুটিলেন। নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার?"

স্বর্গে লজ্জা নাই। দেবরাজকে দেখিয়াও যে যেমন ছিল, তেমনই রহিল, কেহ দখল ছাড়িল না।

দ্রৌপদী একটু সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসিল, "আপনি কে?"

"আমি দেবরাজ ইন্দ্র।"

দ্রৌপদী সসম্ভ্রমে বলিল, "আঃ, হাত ছাড়ো, দেবরাজকে একটা প্রণাম করি!"

চারি জনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "মাইরি আর কি!"

যুধিষ্ঠির কহিল, "দেবরাজ, ইনি আমার স্ত্রী। এরা জোর ক'রে দখল করতে চান!"

ভীমার্জ্জুন-নকুলও সেই দাবী, সেই অভিযোগ করিয়া বসিল।

যুধিষ্ঠির কহিল, "শচীপতে, ইনি জীবিতে আমায় বলেছিলেন, পরলোকেও আমাদের বিচ্ছেদ হবে না।"

ভীম বলিল, "তোকে কি? কেমন, প্রিয়ে, আমাকে এ কথা বলেছিলে কি না, বল?"

অর্জ্জুন-নকুলও একই কথা কহিল।

দেবরাজ বলিলেন, "নারি!" (হাল সাহিত্য হইতে ইন্দ্র এ সম্বোধনটি আত্মসাৎ করিয়াছেন) ইন্দ্র কহিলেন, "নারি! তুমি কার? তুমি কি এঁদের সকলকেই ঐ কথা বলেছ?"

দ্রৌপদী লজ্জায় অধোমুখ।

ইন্দ্র বলিলেন, "বল, বল্তে হবে। তোমার বিষম সমস্যা উপস্থিত, বিপদ্ও বটে। চার টুকরা হ'লে তোমার ত কিছুই থাক্‌বে না। আমাকেও মুস্কিলে পড়্তে হবে—ভাগ নিয়ে! কাকে কোন্ ভাগটা দেব।"

দ্রৌপদী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "দেবরাজ, রক্ষা করুন! আমি সব বল্ছি। দেব, মর্ত্তে এঁরা চার জনেই আমার স্বামী ছিলেন আর মোহে প'ড়ে আমি সকলকেই বলেছি, পরলোকেও আমাদের বিচ্ছেদ হবে না।"

ইন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, হায়, মানুষ, মোণ দেড়েক মাটীর ভিতর ঢুকে তুমি কি খেলাই খেল! কিন্তু এখন করা যায় কি? তাই ত, এখন কি করা যায়? আচ্ছা, এক চাল চালি। (প্রকাশ্যে) "নারি, সত্য বল। এদের ভিতর তুমি এখন কাকে চাও?"

"এঁদের ত দেখছি, ঈর্ষ্যা, রাগ, দ্বেষ, সবই রয়েছে। এরা স্বর্গে এলেন কিরূপে ?"

ইন্দ্র কহিলেন, "নারি! তুমি কার ?"

দ্রৌপদী বলিল, "এদের কাকেও চাইনি। এখন যাকে চাই, তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছিনি।"

দ্রৌপদীর চিত্ত সহদেবের জন্য হায় হায় করিয়া উঠিল। হা সহদেব! কৈ সহদেব! কোথা সহদেব! আর কি তোমায় পাবো ? "দেব। আর কি তারে পাবো ?"

"চার জনের ওপর আবার এক জন।"

"দেব! ত্রেতায় কে দ্রৌপদী ছিলেন ? পঞ্চস্বামী সত্ত্বেও তাঁর চিত্ত কর্ণকে কামনা করেছিল।"

"ভাগ্যিস্ এ কলিকালে তোমার জোড়া আর নেই! কেমন হে, তোমরা ত সব শুনলে ? কে একে নিয়ে ঘর করবে বল ?"

চারি জনেই দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি না, আমি না!"

দেবরাজ বলিলেন, "বাছা! তুমি এখন ফিরে যাও! যাকে কামনা কর, তাকে লাভ করবার চেষ্টা কর গে। ফিরে যখন আসবে, তোমাকে আমি অন্য স্বর্গে স্থান দেব।"

দ্রৌপদী বলিল, "দেব! একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

"বল, নারি!"

এবং জাগিতেই তাঁহার হৃদয় স্বরাজকৃষ্ণের জন্য হায় হায় করিয়া উঠিল। হা সহদেব! কৈ সহদেব! কোথা সহদেব! কেমন করিয়া তাহাকে লাভ করিব ? শ্রেয়োলাভে প্রবল অন্তরায় তাঁহারই সহোদরা নবনলিনী। পরদিন তাহার সহিত একটা খোলাখুলি বুঝাপড়া করিবার জন্য দ্রৌপদী স্থিরসঙ্কল্প হইলেন

পড়িবার ঘরে আসিয়া দ্রৌপদী সহোদরাকে বলিলেন, "হাঁ রে নলি, রূপ-গুণ নিয়ে এত লোক এল, তোর কা'কেও মনে ধরল না ?"

নবনলিনী বলিল, "দিদি, তুমি ও সব বুঝবে না।"

"শোন একবার আস্পর্দ্ধা! আমি চার চারটে পার করলুম, আমি বুঝবো না, আর তুই কালকের মেয়ে! মনে মনে কি ঠাউরেছিস্, বল দিকি ?"

"তবে শোন, দিদি! রূপ গুণ আমি চাই নি! আমি যাকে বে করবো, তার এমন একটা অসাধারণ কিছু থাকা চাই, যা কারুর নেই।"

"সৃষ্টিছাড়া আবদার! কোথায় পাবি ?"

"না পাই, আইবুড়ো থাকবো।"

৩

আমাদের সজনীকান্ত মনে মনে ঠাওরাইল, রঙ্গমঞ্চে স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে হইবে। নহিলে যাকে ভার দিব, সে-ই কায পণ্ড করিবে। হঠাৎ এক দিন দ্রৌপদীর কাছে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, "ব্যাপাদয়ামাস।"

"কি বললেন, আমি সংস্কৃত জানিনি। আর সকল ভাষাই কিছু কিছু জানি, ঐটি ছাড়া। ওটাকে দেব-ভাষা বলে কি না ? কাযেই মানুষের অপাঠ্য। তা আপনি কি বলছিলেন, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"বলছিলুম, ব্যাপাদয়ামাস—অর্থাৎ ব্যাপার বড় গুরুতর। তা দেখুন, আমি ছেলেবেলা থেকে সংস্কৃতই পড়েছি। যদি ছুটো একটা ফিনকি বেরিয়ে পড়ে, মাপ ক'রে নেবেন।"

"তা হ'ক! ব্যাপার গুরুতর কি ?"

"আজ্ঞে হাঁ, নিশ্চয় গুরুতর। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু— ঐ দেখুন, আবার! তর কেন বলি, গুরুতম।"

"কথাটা কি?"

"ওঃ, বল্‌তে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! স্বরাজকৃষ্ণ, হা স্বরাজকৃষ্ণ! স্বরাজকৃষ্ণ মরে!"

"কেন, কেন?"

"কেন? আপনার মত প্রেমিকা বল্‌ছেন, কেন? হা হতোঽস্মি! কেন, কেন মরে? নিশ্চয় মরে, আলবৎ মরে!"

"মশাই, শীঘ্র বলুন। নইলে আমিও যে মরি। কেন মরে?"

"মর্‌বে না কেন? অন্যচিন্তা চমৎকারা! অন্য এক জনের চিন্তা ক'রে।"

"কার?"

"কার? আপনি জানেন না কার?"

"না, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানিনি।"

"বিন্দু-বিসর্গ যদি না জানেন, তা হ'লে 'বিষস্য বিষমৌষধি' ক'রে দিন।"

"সে কি?"

"আপনি তাকে বল্‌লেন, ও না বে করে, আমি তোমায় বে কর্‌বো? কেন তার আশা জাগিয়ে দিলেন? আপনি কি জানেন না, 'আতপং তণ্ডুলং দৃষ্ট্বা ভেকো মক্-মকায়তে?' আলো চাল্ দেখলে ভেড়ার মুখে মুখ আসে—অর্থাৎ লাল পড়ে? সে মরে। আহা, বেচারীর একটি বৈ বাপ নয়, তাতে বুড়ো, তার দেনার দায় হাড়গোড় গুঁড়ো! সে-ও মরে, অথবা মর্‌বে! কিন্তু 'কা চিন্তা মরণে রণে'—মরুক! আপনার আশ্বাসবাক্য ব্যর্থ হ'ক। ওঃ।" (আবার রোদন)

দ্রৌপদী জিজ্ঞাসিল, "সে কি আমার জন্যই মরছে?"

"ইয়া! ঠিক অনুধাবন করেছেন! স্বরাজকৃষ্ণ মরে এবং আপনার জন্যেই মরে।"

"কি করলে বাঁচে?"

"আপাততঃ দেদার বেদানা আর আঙ্গুর। ডাক্তার বলেন, এর হতাশে মৃত্যু। বেদানার মত নৈরাশ্যের ঔষধ আর নাই! আহা হা! কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে প্রাণবায়ু বার ক'রে দিচ্ছে!"

দ্রৌপদী ব্যাকুলা হইয়া বলিল, "ভাই, আমি দরাজ হাতে খরচ করবো, বাপের দেনা শুধে দেব। আর আঙ্গুর বেদানা যত লাগে। তুমি স্বরাজকে বাঁচাও! আমি একবার যাব?"

সজনী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অমন কাযটি করবেন না। আপনাকে দেখলেই মর্‌বে। আপনার যাবার দরকার কি? যথা নিযুক্তস্য তথা করোসি। আমি আপনার প্রতিনিধি। আপনি একেবারে 'তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'—বরবেশে দেখবেন।"

"কিন্তু, ভাই, তাতে যে একটি বিঘ্ন। আমার বোন্ যে বে করতে চায় না!"

"কি, জন্মাবধিই বে কর্‌তে চায় না?"

"না। এটা তোমাদের কালেজে পড়ার ফল। বলে, অসাধারণ কিছু না দেখলে করবে না। যাকে বে করবে, তার অসাধারণ একটা কিছু থাকা চাই, যা কারুর নেই।"

সজনী উঠিয়া নিজের বুক চাপড়াইয়া বলিল, "ভারগ্রাহী জনার্দ্দন। সে ভার আমার।"

"তোমার?"

"হাঁ। মস্ত! আমি জোগাড় ক'রে দেব।"

"তা হ'লে, ভাই, দু'টো প্রাণীর প্রাণরক্ষা কর। তোমার বন্ধুর আর আমার।"

"এ আমায় করতেই হবে। কিন্তু বেদানা—"

"এই টাকা দিচ্ছি।"

টাকা লইয়া সজনী যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, ভার ত নিলুম। এখন? ঐ ফকিরের সঙ্গে 'হিঁচো'র যোগাযোগ? এই বুড়ীর সঙ্গে যুবা আর ঐ যুবতীর সঙ্গে বুড়ো? কিন্তু এখানে যেন স্বরাজের বন্ধু ব'লে জুটেছি, ওখানে? ফকিরের এক বিধবা বোন্ আছে, সে বড় বজ্জাৎ! আচ্ছা, দেখা যাক্।

সজনী খোঁজখবর লইতে লাগিল। তাহার পর এক দিন "মাসীমা, মাসীমা" বলিয়া উপস্থিত। মাসীমা পরিচয় লইয়া বলিলেন, "ও মা, তুই বিরাজীর ছেলে? তা' তোর মাসীই ত হই! গ্রাম-সম্পর্কে বিরাজী আমায় 'দিদি দিদি' করতো। তা তোর মা আছে কেমন?"

সজনী কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিল।

"মা মারা গেছে! তা বাছা, মা ত চিরদিন থাকে না।"

"মাসীমা, মরবার সময় তোমার কথা ব'লে গেছলেন। আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, ভয় কি, তোর মাসী রইল।"

"রৈলই ত বাছা। আমার কি আর মরণ আছে!"

সজনী পুনরায় চোখে কোঁচার খুঁট দিয়া বলিল, "মাসীমা, আবার কি আমায় মাতৃহীন করবে?"

এমনই আদরে, আপ্যায়নে, আহারে সজনী জমাইয়া তুলিল। বিদায় লইবার সময়ে বলিল, "হাঁ মাসি, মামাবাবুর না কি অসুখ? মাসি, আমি অনেক টোটকা জানি। কে বল্‌লে, কাদের পাঁদাড়ে কি গাছড়া আছে, সেটা কি রোগের ধন্বন্তরি! মামার অসুখটা কি?"

"আর বলিস কেন, বাছা! ঐ শিবরাত্রির সল্‌তে একটা ভাই, তা নিত্যি রোগ! কত ডাক্তার-কবরেজ এলো, টাকা নিয়ে চ'লে গেল, যেমন রোগ, তেমনই রৈলো। আমাকে রোগের কন্না করতে রেখে সতী-লক্ষ্মী চ'লে গেলেন!"

"অসুখটা কি?"

"তাই কি বল্‌তে পারলে!"

"পারলে না? আচ্ছা, কেমন না পারে দেখি! তুমি রজনীকে দেখাও! রোগ ধরতে অমন আর নেই। বিলাতী ডাক্তার হেরে যায়।"

"বলিস কি? তোর ভাই?"

"হাঁ গো। মায়ের সেই যে যমজ হয়েছিল। তা গেঁয়ো যোগী ভিখ্‌ পায় না।"

"সে কি ডাক্তার হয়েছে?"

"না, কব্‌রেজ, কিন্তু বিলিতী কবরেজ। লাট সাহেবের গিন্নীকে সেবার যে বাঁচালে গো!"

"তা বাছা, বেশ। কিন্তু এখন হুমোপাখির ওপর ঝোঁক পড়েছে, ঝাঁকেঝাঁকে হুমোপাখি আসছে। আমি এ ঝোঁকটা কাটিয়ে দেব, তার পর রজনীকে দেখাবো।"

সজনী বুঝিল, ফক্‌রে এই পাতানো মাসীর মুঠার ভিতর। বলিল, "তা মাসি, মামাবাবুকে একবার প্রণাম ক'রে যাব না?"

"ও মা, তা যাবি বৈ কি।"

রুগ্নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই সজনীর চক্ষুস্থির! শিবরাত্রির সল্‌তেই বটে! একেই আমি বলেছিলুম 'বৃষকাঠ'! এর সবই প্রকাণ্ড! হাত-পাগুলো গাছের গুঁড়ি, তার ওপর ভুঁড়ি, প্রায় কড়িকাঠে ঠেক-ঠেক! যেন একটা পাহাড় আড় হয়ে প'ড়ে আছে! সজনী ভাবিল, রোগের চাষ করেছে ভাল, খুব ফসল! সজনী পায়ের দিকে গিয়া পায় হাত দিয়া প্রণাম করিল। ভুঁড়ির আড়াল হওয়ায় ফকির তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসিলেন, "পায় সুড়সুড়ি দেয় কে, দিদি?"

দিদি বলিলেন, "ও মা, ও সেই বিরাজীর ছেলে।"

"কে বিরাজী?"

"সেই যে আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে 'দিদি দিদি' করতো।"
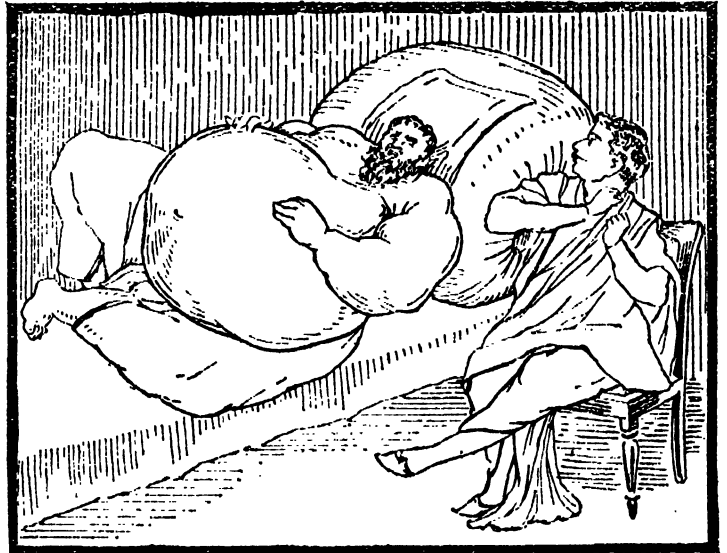
এই সময় সেই নূতন হুমোপাখী বা হোমিয়োপাথ আসিল। দিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু সজনী ফকিরের সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিবার জন্য রহিল।

যেন একটা পাহাড় আড় হয়ে প'ড়ে আছে

হুমোপাখী আসিয়া প্রথম নাড়ীতে ঠোকর দিলেন—তিনি মাংস-মেদ-পিণ্ড ভেদ করিয়া নাড়ী খুঁজিয়া পাইলেন

না। তাহার পর রোগীর শরীরের অনুপাতে একখানা মোটা বই খুলিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

"যন্ত্রণা কি ?"

"পেটের ভিতর কেমন একটা উত্তেজনা বোধ হয়।"

"পেটের ভিতর শব্দ হয় ?"

"হয়। যেন কি ডাক্ছে।"

"হুঁ" ! তাহার পর পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসিলেন, "ঘুম কেমন হয় ?"

"মন্দ নয়।"

"আচ্ছা, পেট ডাকে। নাক ডাকে কি ?"

"তা ত টের পাই না। আমি তখন ঘুমুই।"

"টের পেলে ভাল হ'ত ! একটা ওষুধ ছিল, এক ডোজে কিয়োর করতুম। যাক্, এতেও আরাম হবেন। স্বপ্ন দেখেন ?"

"কখন কখন।"

"আচ্ছা, স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমোন্, না, ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখেন ?"

"ছুই-ই একসঙ্গে।"

"চোখ চেয়ে স্বপ্ন দেখেন, না, চোখ বুজে ?"

"সেটা বড় ঠাওর পাই না।"

"তাই ত ! এরও একটা ছিল, এক ফোঁটায় আরাম করতুম। যাক্, এতেও আরাম হবেন। আচ্ছা, স্বভাবতঃ আপনার মনের গতি কোন্ দিকে ? বেশ ভেবে বলুন, আর ডাক্তারের কাছে কিছু লুকুবেন না।"

"না" বলিয়া ফকির ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "মনের স্বাভাবিক গতি আহারের দিকে। এর কোন ফোঁটা কি গুলী নেই ?"

"কি ? যাতে কমে ?"

"না, বাড়ে !"

"এখন কি রকম খান ?"

"সে যৎসামান্য ! তাতেতৃপ্তিহয়না। অল্পতেই পেটভ'রেযায়।"

"কি খান ?"

"সকালে ধরুন, গোটা ছয়েক বেদানা, গোটা ছয়েক নাসপাতী, এক থোলো আঙ্গুর, পোটাক পেস্তা, পোটাক বাদাম, আধপোটাক কিস্মিস্, মাখম মিছরি আধপোটাক, দুধ সের আড়াই। তার পর দুপুরবেলা প্রায় এক হাঁড়ী ঘি-ভাত, তার উপযুক্ত—"

"আরে উপযুক্ত কি, মশাই ? ঠিক্ ঠিক্ বলুন, আমায় চিকিৎসা করতে হবে।"

"আজ্ঞে, হকিম চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পাঁটার আর মাছের মুড়ো খেতে।"

"কটা ক'রে খান ?"

"গোটা চারেক ক'রে। তার ওপর সের দুই মাংস, খান দশেক মাছভাজা, সের দুই কালিয়া।"

"ডাল-চচ্চড়ি খান না বুঝি ?"

"আজ্ঞে না। হকিম সাহেব বারণ করেছিলেন।"

"তাঁর চিকিৎসা ছেড়েছেন, কিন্তু পথ্য বজায় আছে !"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"রাত্রে কি হয় ?"

"সে বেশী নয়। সের দুই ময়দার লুচি মাংসের কালিয়া দিয়ে।"

"সে কত ?"

"তাও প্রায় সের দুই হবে।"

"মিষ্টান্নে রুচি নেই, বুঝি ?"

"আজ্ঞে, তাও আছে। এক জন ডাক্তার বলেছিলেন, সন্দেশ খেলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, কেসিন্ (casein) না কি আছে বলে।"

"তার গুষ্টীর পিণ্ডি আছে। কটা ক'রে খান ?"

"এই বৈকালে সের খানেক।"

"এরও দেখছি পথ্য বজায় রেখে চিকিৎসা ছেড়েছেন। এর চেয়েও খাওয়া বাড়াতে চান ?"

"আজ্ঞে হাঁ। খেয়ে আমার তৃপ্তি হয় না, ডাক্তারবাবু। কেবল চোয়াল ধ'রে যায়, কাযেই বন্ধ করতে হয়।"

ডাক্তারের হাত হইতে পুস্তক পড়িয়া গেল।

ফকির চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কে কি ফেল্লে ! সব ভেঙ্গে চুরে একসা করলে।আমার শব্দ সয় না,ডাক্তারবাবু !"

"যাক্ ! এখন আপনার কি ইচ্ছা, বলুন ত ?"

ফকির বলিলেন, "এখন ইচ্ছা, একটি বিবাহ—"

"আপনি সপত্নীক, না বিপত্নীক ?"

"আজ্ঞে বিপত্নীক।"

"আচ্ছা, আপনার পূর্ব্বে কখন শক্ত পীড়া হয়েছিল ?"

"ওঃ ! সে মরণের দাখিল !"

"কি, আর একবার মরেছিলেন ? যাক্ ! আমাদের

সন্ধ্যা-তারা

বসুমতী প্রেস]　　　　শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওষুধ যদি খান ত খাওয়া কমাতে হবে। একে আপনার এই শরীর, তার ওপর ঐ খাওয়া! এক ফোঁটা ওষুধে কি করবে!"

"আপনি খাওয়ার ব্যবস্থা কি করবেন?"

"সকালে এক বাটি সাগু—"

রোগী অধীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা, সে ব্যবস্থা পরে হবে, যখন অষুধ খাবো। এখন আপনার কি নিন!"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সজনী বলিল, "মামা, এরা ডাক্তার নয়, যম। আপনি রজনীকে দেখান, সে এক মাসে আপনাকে সেরে দেবে?

"কে রজনী? কৈ নাম ত কখন শুনিনি?"

"কেমন ক'রে শুনবেন? তার প্র্যাক্‌টিস্ সায়েব-মহলে। জানেন না—আজকাল সায়েবরা যে মকরধ্বজ বল্‌তে অজ্ঞান! বলেন ত তাকে পাঠিয়ে দিই!"

"তাই দাও, বাবাজী! তোমরা না করলে আর কে করবে বল?"

সজনীর মুখে সমস্ত শুনিয়া মাসী বলিলেন, "তা হ'লে কালই রজনীকে সঙ্গে ক'রে আনিস্, বাছা।"

"আমি ত আস্‌তে পারবো না, মাসি! আমাদের যে কাল থেকে এগ্‌জামিন্ বস্‌বে। তা সে-ও ত তোমার পর নয়।"

"বালাই, পর কেন হ'তে যাবে? এত দিন দেখা-শুনা ছিল না, তাই। তা বাছা, তাই করিস।"

পরদিন কবিরাজ আসিয়া ডাকিল, "মাসী কৈ গো!"

মাসী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, হুবহু সজনী। এমন কি, অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে বলিয়াই ফেলিলেন, "হাঁ বাছা, তুমি সে, না, সে তুমি?"

কবিরাজ হাসিয়া বলিল, "ভাল ক'রে দেখ দেখি, মাসি, আমি না সে?"

মাসীর তখন মনে পড়িল, ইহারা দুই ভাই যমজ। ইহার গোঁফ আছে, তার নাই। বলিলেন, "তা বাছা, চ মামার কাছে নিয়ে যাই। দেখিস্, বাছা, আমার মুখ রক্ষা করিস্। বড় বড় সায়েব ডাক্তার সব এলে গেছে।"

কবিরাজ মাসীর পদধূলি লইয়া বলিল, "মাসি, তোমার ঐ পায়ের ধূলোর জোরে ঢের ঢের সায়েব দেখেছি। সঙ্কট রোগ হ'লে আমায় ডেকে পরামর্শ করে। মাসি, বড় বড় ডাক্তার সব 'মুষ্টিমেয়ং' আমার মুটোর ভিতর। এখন চল। গ্রহের ফের, তাই মামা এত দিন ভুগ্‌লেন! যাক্। এই বার গেরো কেটেছে।"

মামাকে প্রণাম করিতেই ভুঁড়ির আড়াল হইতে প্রশ্ন আসিল, "কে আবার পায় সুড়সুড়ি দেয়?"

"আমি কবিরাজ ভাগনে।"

"এস, বাবা, এস। একটু আস্তে কথা কোয়ো, বাবা। শব্দে আমার বুক ধড়ফড় করে।"

"তা ত করবেই, মামা! আমাদের শাস্ত্র বলেছেন, 'শব্দমত্যন্তগর্হিতম্!' অর্থাৎ শব্দ অত্যন্ত গর-হিত কি না অহিত করে। এখন যন্ত্রণা কোথায় বলুন।"

"যন্ত্রণা পেটে।"

কবিরাজ পেট টিপিয়া অনেকক্ষণ কান দিয়া শুনিয়া বলিল, "পেট ডাকে কি?"

"ডাকে, বাবা, ডাকে।"

কবিরাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "পেটে ভার ব'লে মনে হয়?"

"হয় বাবা, হয়।"

"মনে হয় কি যে, পেটের ভিতর যেন ভুড়ভুড়ি কাটছে?"

"ঠিক্ বলেছ, বাবা! মনে হয়, যেন নাড়ীগুলো সব নড়াচড়া করছে। মোচড় দিচ্ছে! কি লাফাচ্ছে!"

কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল, "বড় কাহিল হয়ে পড়েছেন। আহার কি হয়?"

আহারের তালিকা দেওয়া হইল। কবিরাজ বলিল, "আহার বাড়াতে হবে। 'বসন্তে ভীষণং পথ্য'—অর্থাৎ বসন্ত-কালে ভীষণভাবে খাবে। এখানে চড়ক, গাজন মায় বাণকট্ট যাঁর চলিত নাম বাণফোঁড়া, সব একমত।"

ফকির আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিলেন, "শুনছ, দিদি, সবাই বলে খাওয়া কমাও। আবার বলে, একাদশীর উপস করতে!"

"হা—হা—হা! কিছু জানে না। কিছু জানে না! উল্টে ঐ দিন একা দশ জনের আহার করতে হয়, তাই একাদশী বলে।"

"শোনো এক বার! আর কি করতে হবে, বাবা?"

"অথবা নিম্ব ভোজন।"

শুনিয়াই রোগীর মুখ বিকৃত হইয়া গেল। বলিল, "বাবাজী, ওটা কোন রকমে মাপ হয় না?"

"আছে, আছে, অনুকল্প বিধান আছে !"

রোগী সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "কি, বাবা, কি ?"

"বল্‌ছি। আগে সব শুনি। আচ্ছা, মামাবাবু, আপনি কখন কি পাড়াগাঁয় গিয়েছিলেন ?"

"হাঁ, বাবা ! ছেলেবেলা এক বার মা'র সঙ্গে মামার বাড়ী গেছলুম।"

"পুকুরের জল খেয়েছিলেন ?"

"তাও খেয়েছি।"

"ছেঁকে খেয়েছিলেন ত, কি গরম ক'রে ?"

"না, তা ত খাইনি। অমনি আঁজলা ক'রে খেয়েছি।"

"তা হলেই হয়েছে।"

"কি হয়েছে, বাবা ?"

"পুকুরের জল পান করেছিলেন, সেই সঙ্গে ব্যাঙের ডিম জঠরে প্রবেশ করে। ক্রমে বেড়েছে। শুন্‌তে পান না, বর্ষাকালেই আপনার পেট বেশী ডাকে। তার মানে কি ? ঐ সময় চারদিকে ব্যাং ডাকছে শুনে সে আর আহ্লাদে স্থির থাক্‌তে পারে না।"

"বেঁচে থাকবে কেমন ক'রে ?"

"কেন থাক্‌বে না ? ক্রিমি বেঁচে থাকে কেমন ক'রে ? পেটের ভিতর ছেলে বেঁচে থাকে কেমন ক'রে ?"

অকাট্য যুক্তিতে রোগী নিরুত্তর হইল; অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিল, "এখন উপায় ?"

"উপায় দুই প্রকার আছে। প্রথম হচ্ছে, একটা বঁড়শীতে কেঁচো গেঁথে আপনাকে খাইয়ে দেওয়া। সেই ব্যাংটা টোপ গিল্‌বে, অমনই মারো খ্যাঁচ ! তাকে উঠতেই হবে।"

"যদি না ওঠে ?"

"তা হ'লেই বিপদ্ ! হৃৎপিণ্ডে বঁড়শী আটকে গেলে তাও বেরিয়ে আস্‌তে পারে।"

ফকির কাতর হইয়া বলিল, "আমাকে রক্ষা কর, বাবা !"

"আর এক উপায় যুবতী ভার্য্যা। যুবতী ভার্য্যার সাহচর্য্যে ঐ ব্যাংটা কিছুতেই টিক্‌তে পারবে না। তাকে বেরিয়ে আস্‌তেই হবে।"

"বাবা, কার যুবতী ভার্য্যা আমাকে বে করবে ? পাবই বা কোথা ?"

"তার উপায়ও কি আমায় করতে হবে ? আচ্ছা, যখন হাত দিয়েছি—"

পুকুরের জল পান করেছিলেন, সেই সঙ্গে ব্যাঙের ডিম জঠরে প্রবেশ করে

"মামাবাবু, ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে আরাম করবো।"

"তা ত করবে, বাবা ! কিন্তু হয়েছে কি ?"

"আপনার পেটে ব্যাং হয়েছে।"

ভয়ে-বিস্ময়ে সেই জড় মাংসপিণ্ডও একবার লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল। কবিরাজ বলিল, "ভয় নেই ! আরাম হবেন।"

"পেটের ভিতর ব্যাং ! ব্যাং জন্মাবে কি ক'রে ? পেটের ভিতর বেঁচে থাক্‌বে কেমন ক'রে ?"

"পারবে, বাবা, পারবে ?"

"পারতেই হবে।"

"কিন্তু এই পাকা দাড়ি, লম্বা গোঁফ। গালে মাংস লেগে খানা-খোন্দল হয়েছে ব'লে ত কামাতে পারি না।"

"সে ভয় নেই, মামা ! বেদান্তে বলেছে—ওষ্ঠে গুম্ফতি লম্বা লম্বা, তস্মৈ দত্তা নিবিড়-নিতম্বা। আপনি রাজী ত ?"

"নিশ্চয়।"

"তবে দিন স্থির করুন। আমি এখন চল্লুম।"

"দেখো, বাবা, ভুলে থেক না।"

"মামা, বরযাত্র না গিয়ে কি ভুলবো ?"

কৃত্রিম গোঁফটি খুলিয়া সজনী দ্রৌপদীর কাছে যাইয়া বলিল, "নবনলিনীর বের দিন স্থির করুন। আপনারও ঐ সঙ্গে।"

"কি রকম হ'ল ?"

"কাল একখানা খবরের কাগজ পাঠিয়ে দেব, পড়লেই বুঝতে পারবেন। সে কাগজখানা আপনার ভগিনীকেও পড়াবেন।"

চীৎকার করিয়া উঠিল--"ইউরেকা !"

পরদিন পড়িবার টেবলে একখানি সংবাদপত্র পাইয়া নবনলিনী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে এক স্থানে পড়িল—"সাবধান ! না ছাঁকিয়া বা সিদ্ধ করিয়া কেহ পুকুর-জল পান করিবেন না। সিঁতি, দক্ষিণপাড়ার একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক বাল্যকালে এক আঁজলা পুষ্করিণীর জল খাইয়াছিলেন। ঐ সঙ্গে তাঁহার উদরে একটি ব্যাঙের ডিম প্রবেশ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ভেকপ্রবর আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া স্বচ্ছন্দে উদরে বাস করিতেছে ! পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা নূতন। যাহাই হউক, আমাদের পাঠকবর্গকে সাবধান করিয়া দিতেছি। ইংরাজ-রাজত্বে ব্যাঙের অভাব নাই। ব্যাঙাচী, ডিমও যথেষ্ট আছে। ইহারা সাধারণ স্থলে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার কোন প্রতীকার হয় না। আমাদের আপনাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।"

নবনলিনী সংবাদ পাঠ করিয়া বলিল, "পেটের ভিতর ব্যাং !"

আর্কিমিডিস্ দুরূহ সমস্যার সমাধান করিয়া আহ্লাদে আত্ম-হারা হইয়া বলিয়াছিলেন ইউরেকা ! পেয়েছি—পেয়েছি !

নবনলিনী ছুটিয়া আসিয়া কাগজখানা ভগ্নীর ক্রোড়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ইউরেকা (Eureka) !"

শ্রীরামকৃষ্ণ

নাথ নিরঞ্জন দীন-দয়াল।
রাজ-রাজ প্রভু পরম কৃপাল ॥

শান্ত শিবময়, পরম সুন্দর,
প্রাণ-প্রিয় সখা, অভয় নির্ভয়,
প্রেম-শান্তি-সুধা সিন্ধু উথাল।

ভীত জন-গতি, তাপিত আশ্রয়,
জ্ঞান ঘন জ্যোতি, মূরতি চিন্ময়,
সিদ্ধ যোগীজন মানস-মরাল ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

হাসির গান

বলি ত হাস্‌ব না হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে—
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় যে ক্ষেপে।
সাহেব-তাড়াহত থতমত অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূতভয়গ্রস্ত পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর,
যবে সব কলম ধ'রে গলার জোরে দেশোদ্ধারে ধায়,—
তখন তাই হাসির চোটে বাঁচাই মোটে হয়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে,
আর একটু 'গ্যানো' প'ড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে,

কর্ত্তে একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কেন ভায়া
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভ'রে
ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে,
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম তাতে গড়ে,
যবে কেউ প্রবীণ চণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা,—
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে হাসি চেপে
রাখ্‌তে পারে কোন্...

সুর ও কথা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্বরলিপি— শ্রীদিলীপকুমার রায়

II ... II

। । সা | সা সা -। | ধ্‌া সা সা | সা -। -। | গা -। রা | সা সা -। | ধ্‌া সা সা | সা
- - ব | লি ত — | হা স্‌ ব | না — — | — — ব | লি ত — | হা স্‌ ব | না

পা পা | পা -। ধা | পা -। পক্ষা | পা ধা -। | ধা -। না | পা -। -। | -।
হা সি | রা খ্‌ তে | চা ই ত | চে পে — | — — — | — — — | —

পা পা | পা পা ধা | ধা ধা -। | পা পা না | না ধা -। |
কি স্তু | ব্যা পা র | দে খে — | থে কে — | থে কে — |

। । পা | ধা না ধা | পা মা গা | রে সা -। II II
- - যে | তে হয় যে | ক্ষে পে ব | লি ত — (হাস্য)

। । | ।। সা | সা সা রা | গা গা -। | গা গা -। | গা গা -। | গা রা -। |
- - | - - সা | হে ব — | তা ড়া — | হ ত — | থ ত — | ম ত — |
- - | - - য | বে নি য়ে | উ ড়ো — | ত — র্ক | শা — স্ত্রি | ব — র্গ |
- - | - - য | বে কে উ | বি লে ত | থে কে — | ফি রে — | বেঁ কে — |

সা -। সা | গা -। রা | গা -। -। | । সা সা | সা রা -। | গা -। গা | রা রা -। |
অ — ঞ্চ | ল — স্থ | স্ত্রী — র | - ভূ ত | ভ য় — | গ্র — স্ত | প গা — |
টি কী — | দী — র্ঘ | না ড়ে — | - আর একটু | গ্যা নো — | প' ড়ে — | কে হ — |
প্রা য় — | শ্চি — ত্ত | ক রে — | - যবে কেউ | ম তি — | ভ্রা — ন্ত | ভে ড়া — |

সা -। সা | ধ্‌া -। সা | ধ্‌া -। সা | সা -। -। | ।পা পা | পা ধা -। |
র — স্থ | ম — স্ত | ম — স্ত | বী — র | যবে সব | ক ল ম |
চ ড়ে — | বি — জ্ঞা | নে — রি | ঘা ড়ে — | কর্ত্তে এক | ঘ রে র |
কা — ন্ত | ধ — র্ম্ম | ভা — ঙে | গ ড়ে — | যবে কেউ | প্র বী ণ |

র্সা র্সা -। | সা র্সা -। | র্সা র্সা -। | র্সা র্রা -। | র্সর্রা র্গা র্রা | র্সা -। -। |
ধ' রে — | গ লা র | জো রে — | দে শো — | দ্ধা — রে | ধা — য় |
ম — স্ত | ব — ন্দো | ব — স্ত | ব্য — স্ত | কো — ন | ভা য়া — |
ভ — ণ্ড | ম হা — | ষ — ণ্ড | প রে ন | হ — রির | মা লা — |

। পা পা | পা ধা ধা | ধা ধা -। | না না -। | ধনা ধা -। |
- তখন তাই | হা সি র | চো টে — | বাঁ চা ই | মো টে — |
- তখন আমি | হা সি — | জো রে — | গু — ম্ফ | ভ' রে — |
- তখন তাই | না হি — | ক্ষে পে — | হা সি — | চে পে — |

। । পা | ধা না ধা | পা মা গা | রা সা -। | II II
- - হ' | য়ে ও ঠে | দা য় ব | লি ত — | (হাস্য)
- - ছে | ড়ে প্রা ণের | মা য়া ব | লি ত — | (হাস্য)
- - রাখ্‌ | তে পা রে | কোন্ —— | — — — | (হাস্য)

কুকুর

প্রতীচ্যজাতি অন্যান্য গৃহপালিত জীব-জন্তুর উন্নতি-কল্পে যেরূপ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে, কুকুর সম্বন্ধেও তাহাদের প্রচেষ্টা অনুরূপ। প্রাচ্যজাতি অশ্ব, গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুর উন্নতি ও পালনের জন্য যতটা মনোযোগ দিয়াছিল, কুকুরের জন্য তাহার কিছুই করে নাই। প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যদেশের কুকুর সম্বন্ধে এই মনোবৃত্তির বিভিন্নতা কেন, এ পর্য্যন্ত তাহার বিশদ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। জীবতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ এবং মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের ইহা গবেষণার বিষয় বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্যদেশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে হিন্দুজাতি কুকুরকে অস্পৃশ্য জীবের মধ্যে কেন পরিগণিত করিয়াছেন, তাহার সঙ্গত হেতু নির্ণয় করা আয়াসসাধ্য হইলেও প্রয়োজনীয়।

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রস্থানের পথে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুকুররূপী ছদ্মবেশী দেবতাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। অস্পৃশ্য জীবকে এই ভাবে সমাদর করায় যুধিষ্ঠির প্রশংসাভাজন পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। যে কুকুর মানবের বহু উপকারে লাগে, যাহার প্রভুভক্তি, কর্ত্তব্যপালনস্পৃহা আদর্শ-স্বরূপ গৃহীত হয়, তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া প্রাচ্যদেশ কেন তাহার সমাদর করে নাই?

প্রতীচ্য জগতে কুকুরের স্থান গৃহ-স্বামীর শয়ন-গৃহে। কুকুর সে দেশের নরনারীর নিত্যসঙ্গী, অকৃত্রিম উপকারী সুহৃদ্। প্রত্যেক গৃহস্থেরই অন্ততঃ একটা কুকুর থাকিবেই। শুধু তাহাই নহে, কুকুরকে বলশালী ও মানবের বিবিধ প্রকার কর্ম্মে সহায় করিয়া লইবার জন্য সে দেশের লোক কত চেষ্টাই না করিতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কুকুরের সংমিশ্রণে অভিনব কুকুরের উদ্ভব হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রীতিমত কুকুরের চাষ সে দেশে হইতেছে। যে দেশে যে কুকুর আছে, প্রতীচ্যজাতি সেই দেশের সারমেয়কে স্বদেশে আনিয়া নানাপ্রকারে তাহার সাহায্যে উন্নততর শ্রেণীর কুকুর সৃষ্টি করিয়া লইতেছে। প্রতীচ্যের এই প্রচেষ্টা যে প্রাচ্যের অনুকরণীয় নহে, তাহা কোন ক্রমেই বলা যায় না।

প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ কুকুর সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যে কুকুরের স্থান সামান্য নহে। দৈহিক বিবরণী হইতে তাহাদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। মেটারলিঙ্ক কুকুর সম্বন্ধে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য। কুকুরের মধ্যে যতগুলি প্রশংসনীয় গুণ আছে, কোনও জীবের মধ্যে তাহা নাই।

বিশেষজ্ঞগণের মতে 'পয়েণ্টার' ও 'সেটার' জাতীয় কুকুরগুলিই প্রথম শ্রেণীর। পয়েণ্টার ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে যখন প্রান্তরমধ্যে প্রভুর জন্য শিকার অন্বেষণে ধাবিত হয়, তখন লক্ষ্যভূত শিকারকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই। ক্ষেত্রের শস্য বা ফুলের গন্ধ তাহার ঘ্রাণশক্তিকে প্রতারিত করিতে পারে না। সে যে জীবের সন্ধানে ধাবিত,
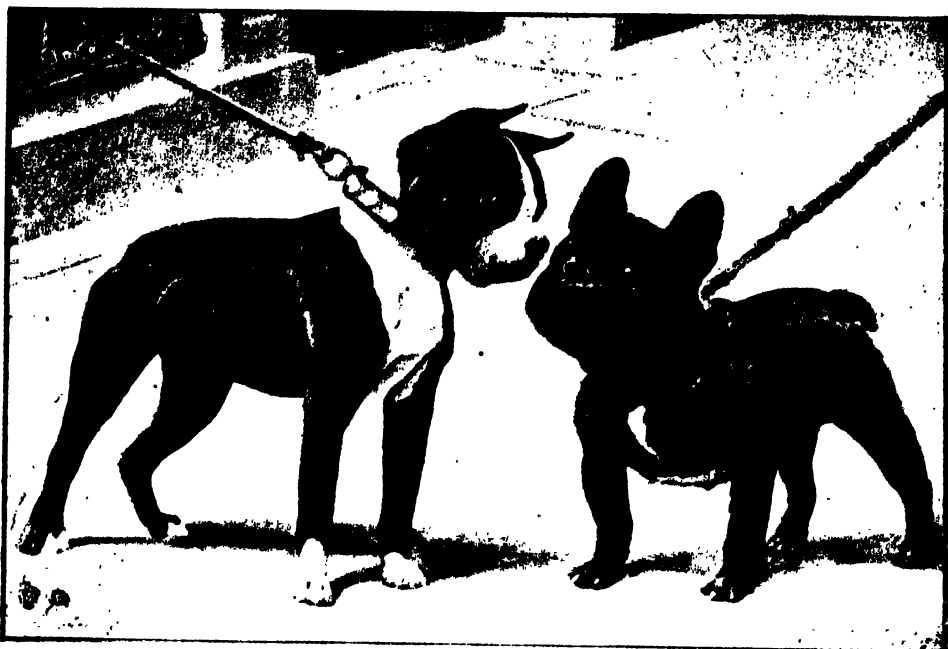
বোষ্টন টেরিয়ার

ফরাসী বুলডগ বা ডালকুত্তা
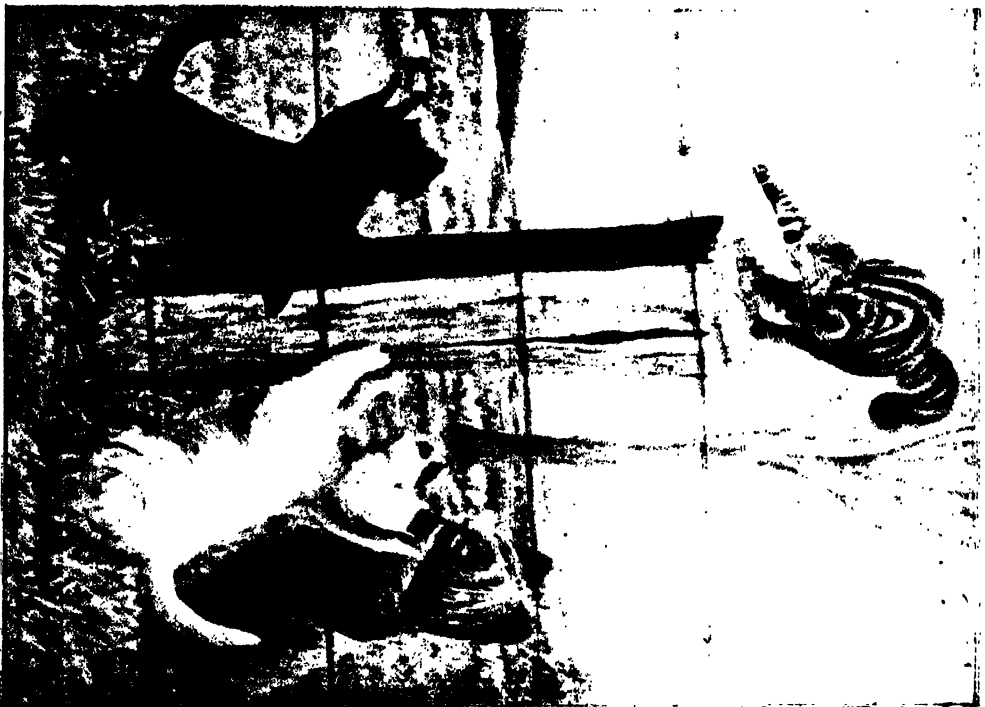
পগ্‌স

স্কটলাণ্ডের টেরিয়ার . শ্বেত টেরিয়ার স্কাই টেরিয়ার

শান্ত সেণ্ট বার্ণার্ড উগ্র সেণ্ট বার্ণার্ড

তাহার গাত্রগন্ধ ধরিয়া পয়েণ্টার অভ্রান্তভাবে দশ হস্ত বা তাহারও অধিক দূর হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। কোনও পক্ষীর দেহের গন্ধ ও তাহার পায়ের গন্ধে কি পার্থক্য, তাহাও এই জাতীয় কুকুর অনায়াসে ধরিয়া ফেলে।

কুকুর সম্বন্ধে এত গল্প প্রচলিত আছে যে, লিখিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন "স্পেক্‌টেটার" পত্রে কুকুরের সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। কাহিনীগুলি সত্যঘটনামূলক,—অতিরঞ্জনবর্জ্জিত। একটি গল্প এই :—একটি বুড়া মাষ্টিফ কুকুর তাজা ডিম খাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে একটি মুরগী ধরিয়া নিজের আবাসে লইয়া যায়। যতক্ষণ সে ডিম না পাড়িয়াছিল, সে তাহাকে মুক্তি দেয় নাই। এই ঘটনার পর হইতে কুকুর ও মুরগীর মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ববন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল।

আর একটি গল্প আছে ডাক্তার বারফোড নামক এক ব্যক্তির একটা কুকুরকে মুখ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু কুকুরটা কৌশলক্রমে মুখের বন্ধন খুলিয়া উহা লুকাইয়া ফেলে। জনৈক পুলিস-প্রহরী তাহাকে পথে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার মনিবকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। ডাক্তারের পরিবারস্থ বালকবালিকাগণ কুকুরটিকে তিরস্কার করিতে থাকে যে, তাহারই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সে তাহার মনিবকে এইরূপ হাঙ্গামার মধ্যে ফেলিয়াছে। তাহাকেও মোকদ্দমার দিন আদালতে হাজির হইতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে মোকদ্দমা হইল না, দিন পড়িয়া গেল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, কুকুরটি যথাদিনে আদালতে হাজির হইয়াছিল।

আর একটি গল্প আছে;—একবার একটি কুকুর কোনও জলনিমজ্জিত বালককে উদ্ধার করিয়াছিল বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ কিছু মিষ্ট পাইয়াছিল। লোভী কুকুরটি পুনরায় পুরস্কারের আশায় আর একটি বালককে জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিল।

এক জন ভদ্রলোক পর্য্যটনকালে একটি বাড়ীতে আশ্রয় লয়েন। সেখানে তিনি দিনলিপি ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। স্বয়ং সেই বাটীতে গিয়া বইখানি আনিবার সময় না পাইয়া তিনি তাঁহার হাতের দস্তানা কুকুরের নাকের কাছে ধরিয়া দিনলিপিখানি আনিবার জন্য তাহাকে আদেশ করেন। যথাসময়ে কুকুর প্রভুর বইখানি আনিয়া হাজির করিয়াছিল।

আর একটি মজার গল্প আছে। জনৈক হোটেল-রক্ষকের একটি বুল্‌ডগ ছিল। তাহার মনিব কোনও অস্ত্রচিকিৎসকের কার্য্যালয়ে গমন করে, তখন কুকুরটি সঙ্গে ছিল। সে দেখিল, অস্ত্রচিকিৎসক তাহার মনিবের ভগ্ন বাহুর চিকিৎসা করিতেছেন। কয়েক সপ্তাহ পরে চিকিৎসক তাঁহার দ্বারে শব্দ শুনিয়া উহা মুক্ত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উল্লিখিত কুকুরটি আর একটি সঙ্গী কুকুরকে আনিয়াছে। সে কুকুরটির একখানি পা ভাঙ্গা।

জনৈক ভদ্রলোক একটি গল্প লিখিয়াছেন। একদা একটি অষ্ট্রেলীয় 'কলি' কুকুর পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পায়। সেই কুকুরটি তাঁহার কোনও বন্ধুর। কুকুরটি তাঁহার হাত তাহার মুখের মধ্যে দৃঢ় অথচ সন্তর্পণে ধরিয়া তাঁহাকে যেন অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। মনে মনে বিরক্তি অনুভব করিলেও তিনি তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। সে তাঁহাকে নদীর তীরে পারঘাটায় লইয়া গিয়া কুকুরের ভাষায় যেন তাঁহাকে টিকিট কিনিবার অনুরোধ জানাইল। তাঁহাকে যে নদী পার হইতে হইবে, ভদ্রলোক তাহা বুঝিতে পারিলেন।

এইরূপে অসংখ্য কাহিনী হইতে কুকুরের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নানা উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়।

যুদ্ধের সময় কুকুরের প্রয়োজনীয়তার অন্ত নাই।

দৌত্যকার্য্য, প্রহরীর কার্য্য কুকুর যেরূপ ভাবে প্রতিপালন করিতে পারে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। বহুবার দেখা গিয়াছে যে, শত্রুর আগমনের সংবাদ 'কলি' কুকুরের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। বহুদূর হইতে কুকুর শত্রুর আগমনশব্দ জানিতে পারিয়া মনিবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে।

এক একটি কুকুর রণক্ষেত্রে সাহস ও বীরত্বের যেরূপ নিদর্শন দিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতেও মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মাইকেল নামক একটি কুকুর তাহার প্রভুর চেতনাহীন দেহ একাকী শিবিরে বহন করিয়া আনিয়াছিল। ভারডুনের যুদ্ধক্ষেত্রে লুজ নামক একটি কুকুর প্রহরীর কার্য্যে এমন দক্ষতা দেখাইয়াছিল যে, কর্তৃপক্ষ তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। ইপ্রেসের রণক্ষেত্রে নেলী নামক এক ফক্স টেরিয়ার প্রভুর সহিত গুলীবৃষ্টির মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিল। দুই বার সে গুলীর আঘাত পাইয়াও প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। বেলজীয়ান মিশন পরিশেষে কুকুরটিকে আমেরিকায় লইয়া আইসেন।

ফেও এল্ এয়ার নামক একটি সেটার-জাতীয় কুকুর তাহার মনিবের জীবনরক্ষাকার্য্যে যেরূপ অধ্যবসায় ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বিস্ময়াবহ ব্যাপার। অকস্মাৎ গোলা ফাটিয়া যাওয়ায় তাহার মনিব ঘর চাপা পড়িয়াছিল। কুকুরটি স্তূপ সরাইয়া তাহার প্রভুর সংজ্ঞাহীন দেহ উদ্ধার করিয়াছিল। তিন দিন তিন রাত্রি সে মনিবের পার্শ্ব ত্যাগ করে নাই। পরে লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। ফলেটী নামক একটি কুক্কুরী দশমসংখ্যক ফরাসী সেনাদলে ছিল। অগ্নিবৃষ্টির মধ্য দিয়া সে এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাহার দৌত্যকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিল। গুলীর আঘাতের ফলে ৫ দিন পরে তাহার মৃত্যু হয়।

ফাইলাক্স নামক একটি 'সিপ ডগ' নিউইয়র্কের কুকুর-প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয় নাই! এ জন্য তাহার মনিব তাহাকে যুদ্ধে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুকুরটি প্রায় ১ শত আহত ব্যক্তিকে রণক্ষেত্র হইতে হাঁসপাতালে লইয়া আসিয়াছিল।

রঙ্গমঞ্চেও কুকুরের অভিনয়কার্য্য প্রশংসনীয়। টেডী নামক একটি কুকুর এমন অভিনয়-কৌশল শিখিয়াছিল যে, তাহাকে যাহা করিতে আদেশ দেওয়া হইত, মানুষের অপেক্ষাও কৌশলে সে তাহা সম্পন্ন করিত। একাধিক কুকুর আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অপূর্ব্ব অভিনয়-কৌশল দেখাইয়া দর্শকের চিত্ত জয় করিয়াছে। তাহাদের বিবরণ দিতে গেলে এক খণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়।

দেশপর্য্যটন-ব্যাপারেও কুকুরের খ্যাতি কম নহে। অনেক কুকুর প্রভুর সহিত অথবা একাকী সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছে। প্রভুর ন্যায় পর্য্যটনের অশেষ ক্লেশ সহনে তাহারা অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে।

'ওনে' নামক একটি কুকুর দেশপর্য্যটনে পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় কুকুরের খ্যাতি বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে মার্কিণের রেলওয়ে পোষ্টাল কেরাণীরা এই কুকুরের মালিক। কুকুরটি দেশপর্য্যটনে আগ্রহান্বিত বুঝিয়া তাহার মনিবরা তাহার গলদেশে কাগজ বাঁধিয়া দিয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহাতে তাহার পরিচয় ও উদ্দেশ্য লিখা ছিল। কিছু কাল পরে দেখা গেল, কুকুরটি যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক বড় নগর পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। সে যেখানে যাইত, তত্রত্য লোকগণ তাহার গলবিলম্বিত কাগজে তাহার আগমনসংবাদ লিখিয়া দিত। মেডেল বা প্রশংসা পত্র ঝুলাইয়া দিত। ওয়াসিংটন হইতে কুকুরটি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে গমন করে। তথা হইতে ভিক্টোরিয়া জাহাজের অধ্যক্ষের অতিথিরূপে সে ইয়োকোহামা গমন করে। জাপান-সম্রাট তাহার গলদেশে নিজের নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিয়া দেন।
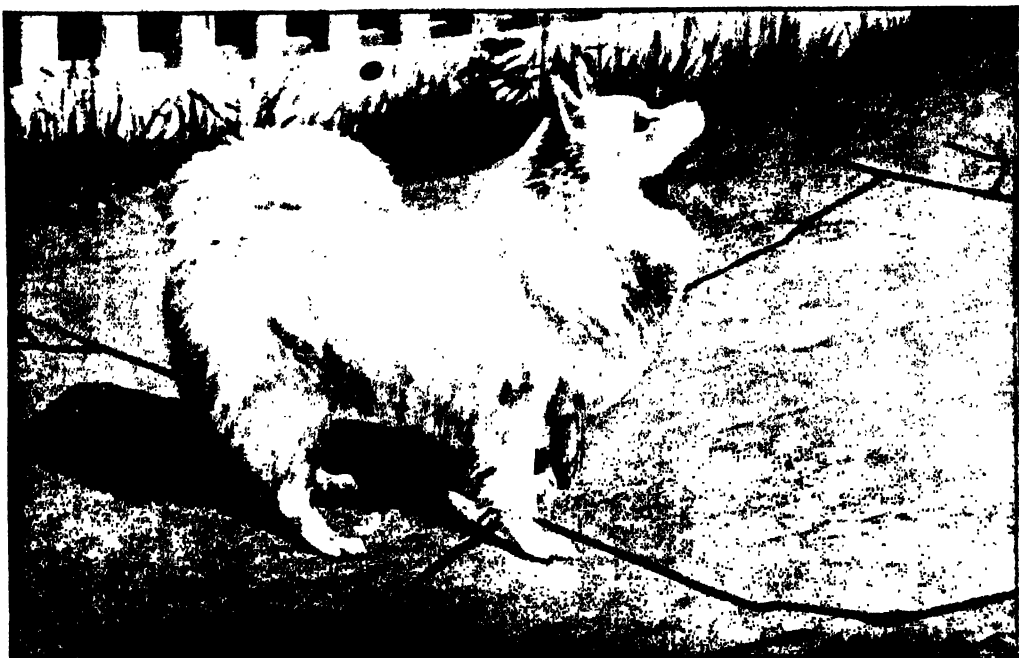
স্পিটজ

বুলটেরিয়ার　　　　ইংলণ্ডের বুলডগ

ফক্স টেরিয়ার আইরিশ টেরিয়ার দীর্ঘকেশ ফক্স টেরিয়ার ওয়েলস্ টেরিয়ার

কলি 'সিপ্‌ডগ্' শান্ত কলি

তথা হইতে সে কুচ যায়। 'ডেট্রয়' জাহাজে তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থিত করা হয়।

ওনে তাহার পর হংকং গমন করে। চীন-সম্রাট তাহাকে ছাড়পত্র দিলে সে সিঙ্গাপুর, সুয়েজ এবং পশ্চিম-য়ুরোপ যাত্রা করে। তৎপরে সে আমেরিকায় ফিরিয়া আইসে। ১ শত ৩২ দিনে সে ২ শত নূতন পদক, প্রশংসাপত্র প্রভৃতির অধিকারী হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে আমেরিকার প্রত্যেক পোষ্টাল কেরাণী তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিল। পোষ্ট আফিস বিভাগের মিউজিয়মে তাহার দেহ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রক্ষিত আছে; প্রশংসা-পত্র ও মেডেলগুলি তাহার গলদেশে দোদুল্যমান।

কুকুরের সম্বন্ধে বলিবার কথা যথেষ্ট বিদ্যমান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতিপয় প্রসিদ্ধ শ্রেণীর কুকুরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

স্পিটজ ঃ—

এই কুকুরের দৈহিক ওজন ১২ সের হইতে প্রায় ১৫ সের। বহুবর্ণের স্পিটজ দেখা গেলেও উৎকৃষ্ট জাতীয়গুলির বর্ণ সাধারণতঃ শ্বেত। নেকড়ে বাঘের সংমিশ্রণে এই কুকুরের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা। জর্ম্মণীতে এই কুকুরের বিশেষ সমাদর। ইহাদের মেজাজ সকল সময় ঠিক থাকে না বলিয়া মার্কিণগণ অধুনা এই কুকুরের তত ভক্ত নহেন।

বুলটেরিয়ার ঃ—

বুল্ ও টেরিয়ারের সংমিশ্রণে এই কুকুরের উৎপত্তি। ইহারা লড়াই করিতে অত্যন্ত দক্ষ। ইহাদের শক্তি প্রশংসনীয়। সহসা ইহারা ছুটিয়া আইসে না। বুদ্ধিশক্তিও ইহাদের মধ্যে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বুলডগ ঃ—

পশুর মধ্যে যেমন সিংহ, কুকুরজাতির মধ্যে তেমনই বুল্‌ডগ। ইহারা অত্যন্ত জেদী এবং যে বুল্‌ডগের ওজন ১৫ সের হইতে অর্দ্ধমণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের আকার ভীষণ হইলেও প্রকৃতি অত্যন্ত নম্র। কিন্তু একবার রাগাইয়া দিলে ইহাদের ক্রোধ সহজে শান্ত হয় না।

ফক্সটেরিয়ার ঃ—

ফক্সটেরিয়ারের মত স্নেহপ্রবণ কুকুর আর নাই। ইহারা দুই জাতীয়;—স্বল্প লোমবিশিষ্ট এবং অধিক লোমবিশিষ্ট। প্রকৃতিগত সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান। ইহাদের ওজন ৮ সের হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত। সাহসে ইহারা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে।

আইরিশ টেরিয়ার ঃ—

সাহসে ইহারা দুর্জ্জয়। কিছুতেই ইহারা ভয় পায় না। একবার কুকুরের দলের সাহায্যে আফ্রিকাতে এক সিংহ শিকারের আয়োজন হইয়াছিল। সিংহটা কোনও মতে তাহার গুহা ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। শেষে দেখা গেল, অকস্মাৎ সিংহটা বাহির হইয়া প্রান্তরের মধ্যে প্রাণপণে ছুটিতেছে, তাহার লাঙ্গুল সোজা হইয়া আছে। শিকারীরা দেখিল, সেই লাঙ্গুলের অগ্রভাগে একটা আইরিশ টেরিয়ার ঝুলিতেছে।

ওয়েলস্ টেরিয়ার ঃ—

এই জাতীয় কুকুর টেরিয়ারের বংশধর। দেখিতে টেরিয়ারের সহিত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। ইহারা অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং কর্ম্মঠ।

কলি ঃ—

এই কুকুর অত্যন্ত বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট এবং প্রিয়-দর্শন। অর্দ্ধমণ হইতে ৩০ সের পর্য্যন্ত ইহাদের দৈহিক ওজন দেখিতে পাওয়া যায়। মেষপালনে এই কুকুরের উপযোগিতা অধিক। প্রভুর কণ্ঠস্বর বা সিস্ শুনিতে পাইলেই কুকুরগুলি প্রান্তর অভি-মুখে ধাবিত হইয়া থাকে। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা

ইংরাজী 'শিপডগ' ;—

ইহারা মেষরক্ষা কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। সাধারণ কলি কুকুরের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য বিশেষ নাই। ওজনে ইহারা ৩০ সের হইতে ১ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রকৃতি অতি সুন্দর, রোমাবলী লীলায়িত। এই জাতীয় কুকুরের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

শান্ত কলি ;—

কলি কুকুরের সহিত গায়ের রেখাবলীতে এই জাতীয় কুকুরের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে ইহারা কলির সমতুল্য। এই জাতীয় কুকুর ইদানীং আমেরিকায় দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

বোষ্টন টেরিয়ার ;—

মার্কিন মুলুকে ইহাদের উদ্ভব। বুল্ ও টেরিয়ার উভয় প্রকার কুকুরের সংমিশ্রণে এই কুকুরের উদ্ভব ঘটে। ইহাদের ওজন ৭ সের হইতে প্রায় ১১ সের পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের বুদ্ধিশক্তি তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বপ্রকারে মানুষের কাজে লাগে।

ফরাসী বুলডগ ;—

আকৃতিতে বুলডগের মত দেখিতে হইলেও ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন। ফ্রান্সে এই কুকুরের আদর বেশী। ওজনে ইহারা ১০ সের হইতে ১৫ সের পর্য্যন্ত হয়। নাগরিক-জীবনে ইহারা বিশেষ অভ্যস্ত।

পগ্ ;—

পগ্ এক কালে মানুষের বড় প্রিয় ছিল; কিন্তু ইদানীং অন্যান্য কুকুর তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। আমেরিকায় এই জাতীয় কুকুর নাই বলিলেই চলে।

ইহাদের মুখ অত্যন্ত ছোট, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, স্কন্ধদেশ খর্ব্ব। গাত্রচর্ম্ম ঈষৎ লাল। ইহাদের চরণ ঋজু এবং অস্থিময়; কিন্তু ভারী নহে। চক্ষুযুগল পরস্পরের সান্নিধ্য হইতে কিছু দূরে অবস্থিত, কর্ণযুগল ক্ষুদ্র, পাতলা এবং কোমল। ইহারা পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে এবং সঙ্গে করিয়া বেড়াইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বুড়া হইলে ইহারা প্রায় হাঁপানী রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

স্কটিশ টেরিয়ার।—

এই কুকুরের আদি জন্মস্থান স্কটলাণ্ড হাইলাণ্ড। প্রভু বা প্রভুপত্নী ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিলে ইহাদের ব্যবহারে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। কোনও কারণে যদি সে তাহার মনিবকে ৫ মিনিট দেখিতে না পায়, তাহার পর দর্শনমাত্রই সে এমন অস্থির হইয়া পড়ে যে, কত কাল যেন তাঁহাকে দেখে নাই।

কুকুরের নয়নের দৃষ্টি এমন বিশ্বস্ততাপূর্ণ, ব্যবহার এমনই স্নেহপূর্ণ এবং প্রকৃতি ক্রীড়াচঞ্চল যে, তাহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করিবে।

শ্বেত টেরিয়ার ;—

বর্ণ ছাড়া আর সকল বিষয়েই এই জাতীয় কুকুর স্কটিশ টেরিয়ারের অনুরূপ। ইহাদের গাত্রবর্ণ শ্বেত এবং নাসিকা কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেত টেরিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয়, অনেকেই এই কুকুর পুষিতে ভালবাসে। ইহাদের স্বভাব খুবই সুন্দর।

স্কাই টেরিয়ার ;—

পূর্ব্বে শিকারব্যাপারে ঐ কুকুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল; কিন্তু ইদানীং ইহার কেশের দিকে মনিবদিগের লক্ষ্য অধিক হওয়ায় ইহারা কোলে কোলেই ঘুরিয়া থাকে। ইহারা এমনই লোমশ যে, চক্ষুর উপরিভাগ দীর্ঘ কেশজালে অনেক সময় আবৃত থাকে। ইহাদের উচ্চতা ৯ ইঞ্চি এবং ওজনে ইহারা ৮ সের হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত হয়।

অটার হাউণ্ড

পয়েণ্টার
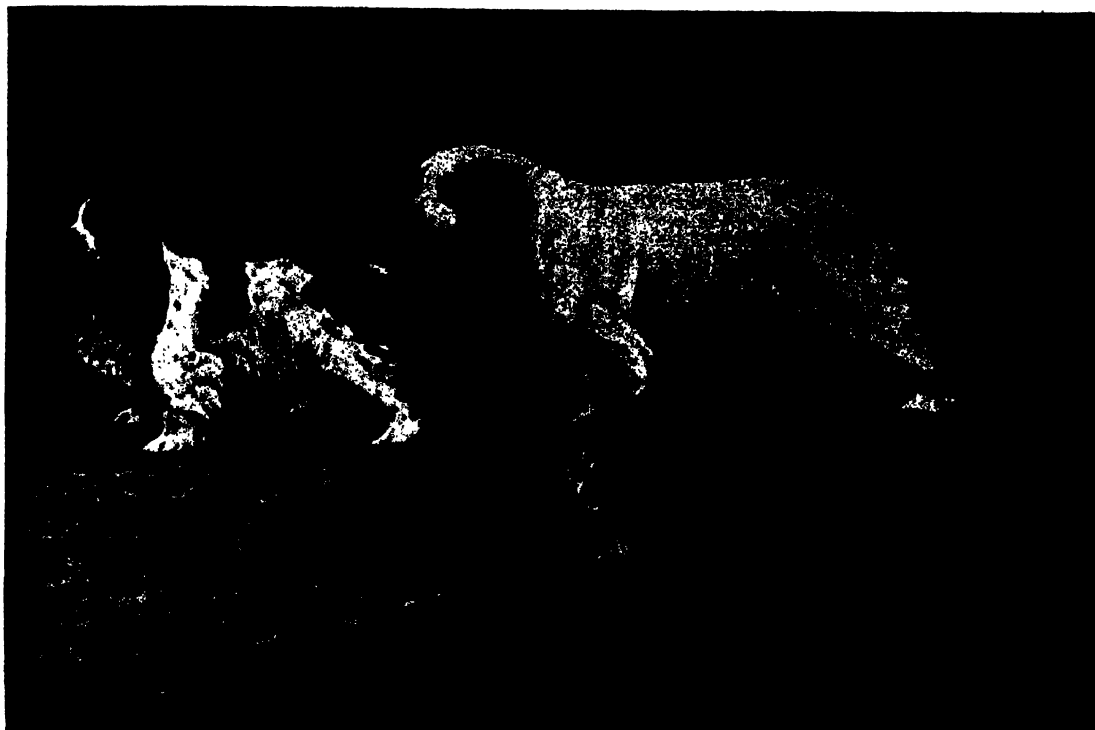
কফার স্প্যানিয়েল   ক্লম্বার স্প্যানিয়েল   ফিল্ড স্প্যানিয়েল

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড

সেণ্ট বার্ণার্ড :—

আলপস্ পর্ব্বতে—হস্‌পিস্ বার্ণার্ড মঠের সন্ন্যাসীরা মানবের জীবনরক্ষা-ব্রতে এই কুকুর নিযুক্ত করিতেন। তুষারপাতে কোনও লোক বিপন্ন হইলে এই কুকুর তাহাকে নিরাপদে মঠে লইয়া যাইত। ব্যারি নামক একটি কুকুর ৪০ জন বিপন্ন ব্যক্তিকে তুষারসমাধি হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বশেষের তুষারপীড়িত ব্যক্তি তাহাকে নেকড়ে বাঘ মনে করিয়া গুলী করে, তাহাতেই এই পরোপকারী সারমেয়ের জীবনান্ত হয়। এই কুকুরের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর। ইহারা আকারে বড় এবং অত্যন্ত শান্তস্বভাব। কষ্ট-সহিষ্ণুতায় ইহাদের সমকক্ষ কুকুর দুর্লভ।

চাউ :—

এই কুকুর চীনদেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে ও আমেরিকায় ইহাদের বড়ই আদর। প্রভুভক্তিতে এই কুকুর সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। মনিব ব্যতীত ইহারা সংসারে আর কিছুরই সন্ধান রাখে না। মনিবের আদেশ পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালন না করিয়া ইহারা ক্ষান্ত হয় না।

গ্রেট ডেন :—

গ্রে-হাউণ্ড, ডিয়ার-হাউণ্ড বা উলফ্-হাউণ্ডের ন্যায় দ্রুতগতিবিশিষ্ট না হইলেও ডেন কুকুর তাহাদের অপেক্ষা বলবান্। ভালরূপ যত্ন করিলে ইহার আকার খুবই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল হইতে এই কুকুরের সাহায্যে বন্য জন্তু শিকার করা হয়। জার্ম্মাণীতে ডেন কুকুর বন্যবরাহ শিকার করে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা মানব-সহচর এবং সম্পত্তিরক্ষক বলিয়া পরিগণিত।

দীর্ঘাকার কুকুরদিগের মধ্যে যে সকল দুর্ব্বলতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ডেন কুকুরের মধ্যেও তাহাই বর্ত্তমান। উত্তমরূপে প্রতিপালিত এই কুকুরের মূল্য অধিক। শিক্ষা পাইলে ইহারা অত্যন্ত কাযে লাগে। শৃঙ্খলমুক্ত থাকিলে অনেক সময় ডেন বড় ভয়ানক হয়। কারণ, যাহারা উহাদের প্রকৃতির সহিত পরিচিত নহে, তাহারা উহাদিগকে দেখিলে ভীত হয় এবং যদি কুকুরের উপর কোন অত্যাচার করিতে যায়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। উহারা আকারে যেমন দীর্ঘ, প্রকৃতিতেও তেমনই অসহিষ্ণু। শিশুদিগকে উহাদের কাছে নিরাপদে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

ডেন কুকুরের সঙ্গে চালাকী করিতে গেলে, ফল ভীষণ হয়। একবার এক তস্কর মিশোরী সহরে এক বাটীর জানালা বাহিয়া চুরী করিতে যাইতেছিল। বাড়ীর ডেন কুকুর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সে সাহস করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনই কুকুরটা তাহার কণ্ঠদেশে ঝম্পপ্রদান করিল। লোকটা কোনও মতেই তাহার কবল হইতে উদ্ধার পায় নাই।

ওটার হাউণ্ড :—

ওটার জাতীয় জীব গ্রেটবৃটেনের প্রত্যেক নদীর ধারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে শিকার করিবার জন্য ভিন্ন শ্রেণীর কুকুরের প্রয়োজন হওয়ায় ওটার হাউণ্ডের উদ্ভব। ওটার অত্যন্ত ধূর্ত্ত, পলায়নে এমন অভ্যস্ত যে, তাহাদিগকে শিকার করা অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত ঘ্রাণশক্তি এবং বিশেষ ধৈর্য্য ও সাহস না থাকিলে উহাদিগকে শিকার করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, অনেকক্ষণ ধরিয়া জলের মধ্যে থাকাও প্রয়োজন।

ওটার হাউণ্ড কুকুরের মধ্যে এই সকল গুণের সমাবেশ আছে। হাউণ্ড-জাতীয় কুকুরের যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন ইহাদের তাহা আছে। ইহাদের কর্ণ দীর্ঘ-বিলম্বিত, ঘ্রাঁ গভীর, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট।

গ্রেটবৃটেনের অধিবাসীরা এই কুকুরের বিশেষ

ভক্ত। কিন্তু আমেরিকায় এই জাতীয় সারমেয় কদাচিৎ দেখা যায়। শিকারে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে গৃহপালিত কুকুর হিসাবে রাখা যায় না। কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহারা বালক-বালিকাদিগেরও প্রিয় সহচর হইতে পারে।

পয়েণ্টার :—

এই জাতীয় কুকুর শিকারে ব্যবহৃত হইলেও, জীব ধরিয়া ইহারা তাহাকে মারিয়া ফেলে না, শুধু শিকারে সহায়তা করে। গন্ধ হইতে কোন্ স্থানে শিকারটি লুকাইয়া আছে, ইহারা শিকারীকে তাহা দেখাইয়া দেয় মাত্র। শিকারী অগ্রসর হইবামাত্র পাখী যেই আকাশে উড়িতে যায়, অমনই বন্দুকের সাহায্যে তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়।

পয়েণ্টার শিকারীদিগের অতি প্রিয় কুকুর। ইহাদের মাংসপেশী অত্যন্ত দৃঢ়, ওজনে ইহারা প্রায় ৩০ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

এই জাতীয় কুকুরের চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া সকল সময়েই 'পয়েণ্টার' কিনিতে পাওয়া যায়।

ককার স্প্যানিয়েল :—

আকারে তিন জাতীয় কুকুরের তুলনায় ইহা ক্ষুদ্র। আরণ্য কুক্কুট শিকারে ইহারা বিশেষ দক্ষ বলিয়া ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের ওজন ৯ সের হইতে প্রায় ১২ সের।

ক্লম্বার ফিল্ড ও ককার স্প্যানিয়েল :—

এই তিন জাতীয় স্প্যানিয়েল কুকুর পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। ক্লম্বার স্প্যানিয়েল আকারে বড়। ইহার ওজন প্রায় ৩০ সের পর্য্যন্ত হয়। সাধারণতঃ ইহাদের ওজন প্রায় ২৫ সেরই দেখা যায়। কাদাখোঁচা ও অন্যান্য ভূচর পক্ষী শিকারে স্প্যানিয়েল কুকুর বিশেষ উপযোগী।

ফিল্ড স্প্যানিয়েল :—

ককার অপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী। কিন্তু ককারের ন্যায় চঞ্চল নহে। ক্লম্বার অপেক্ষা ইহারা অধিক কর্ম্মপটু। এই কুকুর যেমন বুদ্ধিশালী, তেমনই আজ্ঞানুবর্ত্তী।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড :—

কঠোর শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা মাত্র দুই শ্রেণীর কুকুরের আছে। এক সেণ্ট বার্ণার্ড, অপর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড। এই উভয় প্রকার সারমেয় তুষার-সমাচ্ছিতপ্রায় মানবকে বহুবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-জাতীয় কুকুরের আর একটা বিশিষ্ট গুণ আছে। ইহারা সন্তরণে সুদক্ষ, বহুবার ইহারা মজ্জমান ব্যক্তিকে নিরাপদে কূলে টানিয়া আনিয়াছে। মার্কিন মুলুকে এই কুকুরের আদর কমিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড ও নিউজার্সিতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর এখনও বিদ্যমান। এই কুকুর অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত এবং নম্রস্বভাববিশিষ্ট। শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে ইহাদের তুলনীয় অন্য কুকুর নাই। ইহাদের ওজন প্রায় দেড় মণ হইতে ১ মণ ৩৫ সের। ইহাদের আকৃতি যেমন দৃঢ় ও শক্তিশালী, গতিভঙ্গীতেও তেমনই সুদর্শন এবং ক্ষিপ্র। ইহাদের গায়ের বর্ণ দুই প্রকার; এক শ্বেতবর্ণ—কর্ণ, চক্ষু এবং দেহের কোন কোন অংশ কৃষ্ণরোমাবলীবিশিষ্ট এবং অপর প্রকার শুধু কৃষ্ণবর্ণ।

ডিঙ্গো :—

এই জাতীয় কুকুর আকারে মধ্যম। ইহাদের শরীরের ওজন ৩০ সের হইতে প্রায় ১ মণ হইয়া থাকে। কুকুরের চরিত্রের ও দেহের গুণাগুণ ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান। ইহাদের মস্তক প্রশস্ত। দৃঢ়
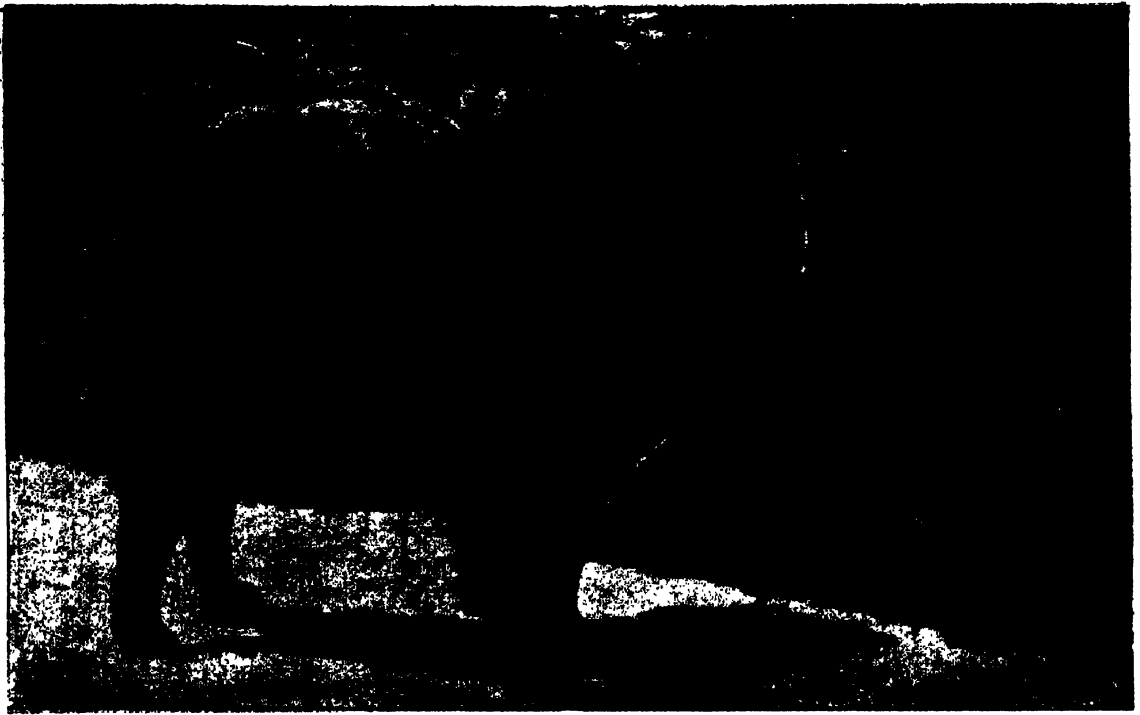
চৈনিক চাউ

বৃহদাকার ডেন্‌ কুকুর

ইংলণ্ডের ফক্স হাউণ্ড

ডিঙ্গো
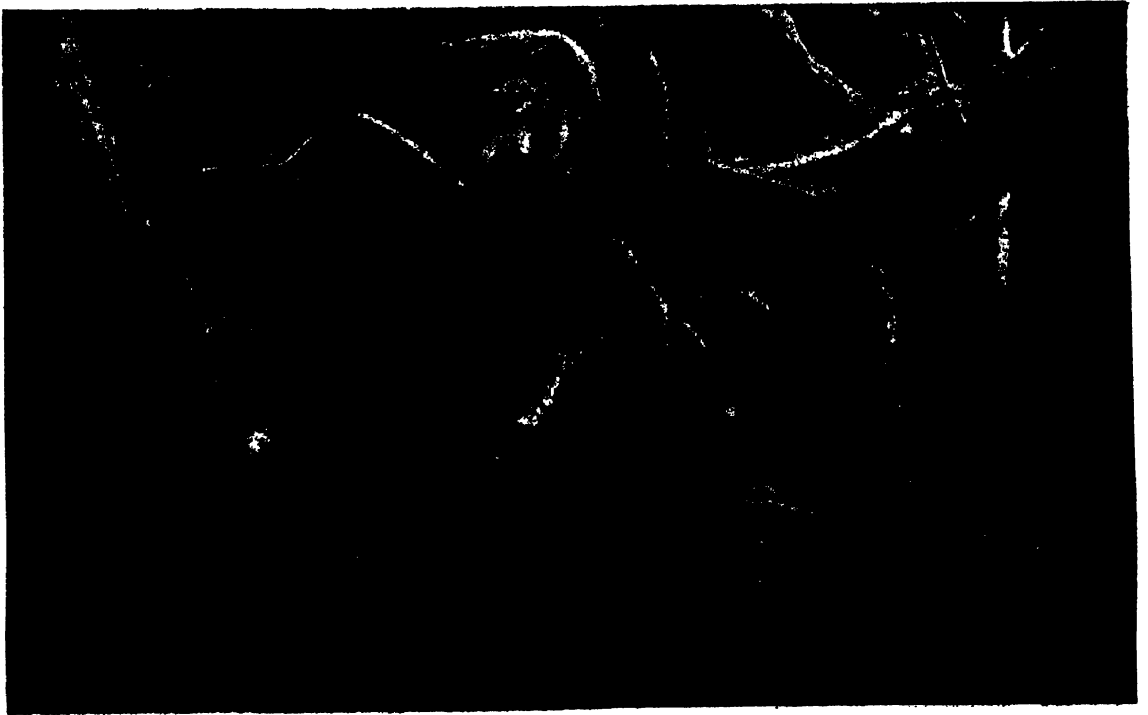
অস্থিসমন্বিত পদচতুষ্টয় এবং বক্ষোদেশ গভীর। ডিঙ্গো বহুক্ষণ দৌড়িয়াও ক্লান্ত হয় না। নেকড়ে বাঘের সহিত ইহার সাদৃশ্য শুধু লাঙ্গুলে। ইহাদের গাত্রবর্ণ রক্তাভ। এই জাতীয় কুকুর দেখিতে সুন্দর। অল্প চেষ্টাতেই ইহাদিগকে পোষ মানান যায়। সহচর হিসাবে ইহারা ভালই।

ফক্স হাউণ্ড :—

শৃগাল শিকারব্যবদেশে 'ইংলিশ ফক্স হাউণ্ড' প্রায় ৩ শত বৎসর ধরিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। দলবদ্ধ কুকুর শৃগালের পশ্চাতে তাড়া করে, তাহাদের প্রভু অশ্বারোহণে ধাবিত হয়।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ফক্স হাউণ্ড দেখিতে প্রায় একই প্রকার, তবে ইংলণ্ডের কুকুরগুলি যেন কিছু উগ্রপ্রকৃতির। আমেরিকার ফক্স হাউণ্ড-জাতীয় কুকুরের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি তত্রত্য দুই জন মার্কিণের চেষ্টায় হইয়াছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

ডেলী প্যাসেঞ্জার

শিল্পী—
শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়
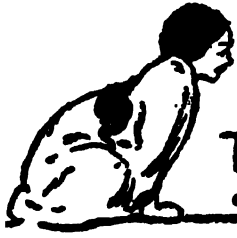
চিড়িয়াখানায় নাইকো স্থান।
আঁদাড় পাঁদাড় ঘোরে।
জেলেও যায়গা দেয় না আহা!
এ রকম সব চোরে॥

বসন্তের কোকিল

অনল-কবিতারসে বিহঙ্গ কোকিল।
ক্রমে ক্রমে হয়েছেন গণেশ উকীল॥
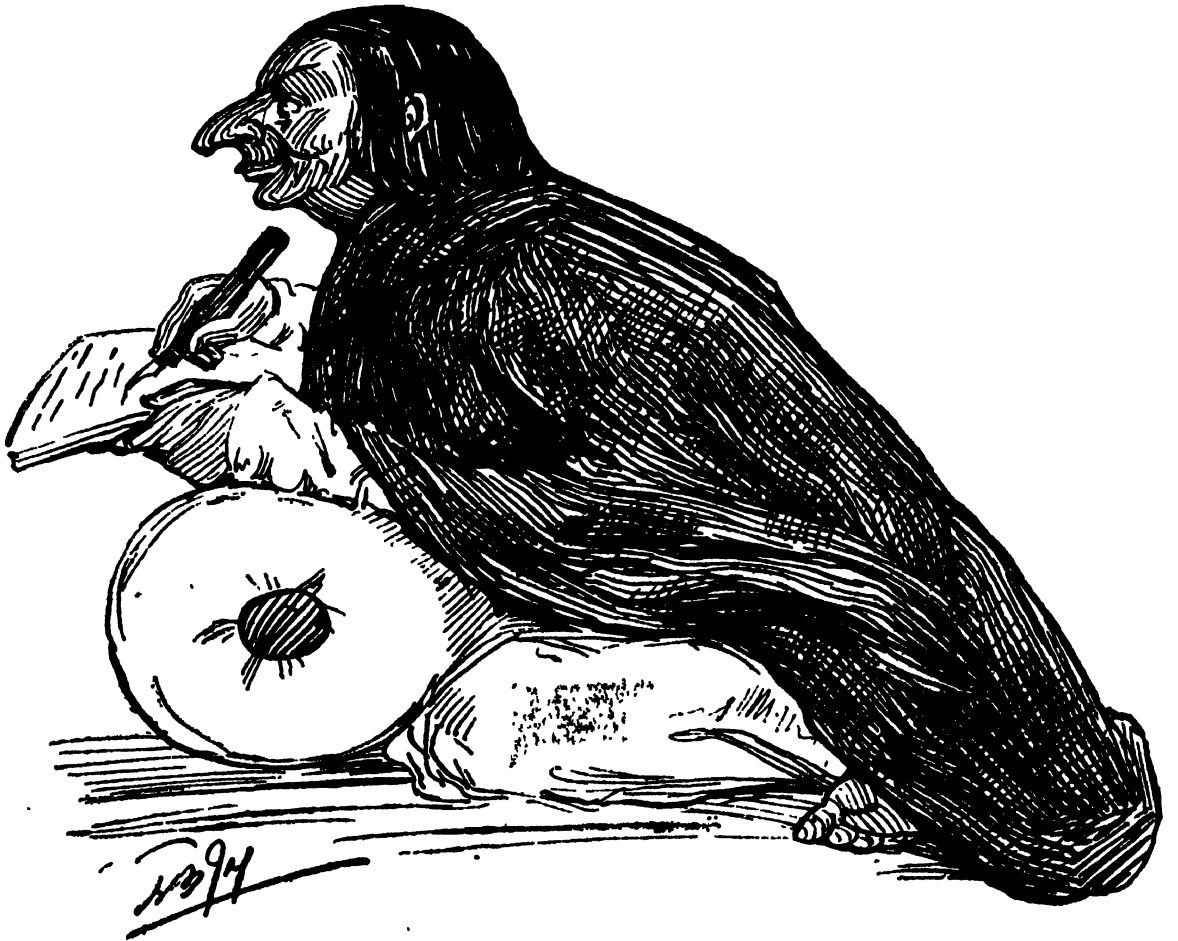
উল্লুক
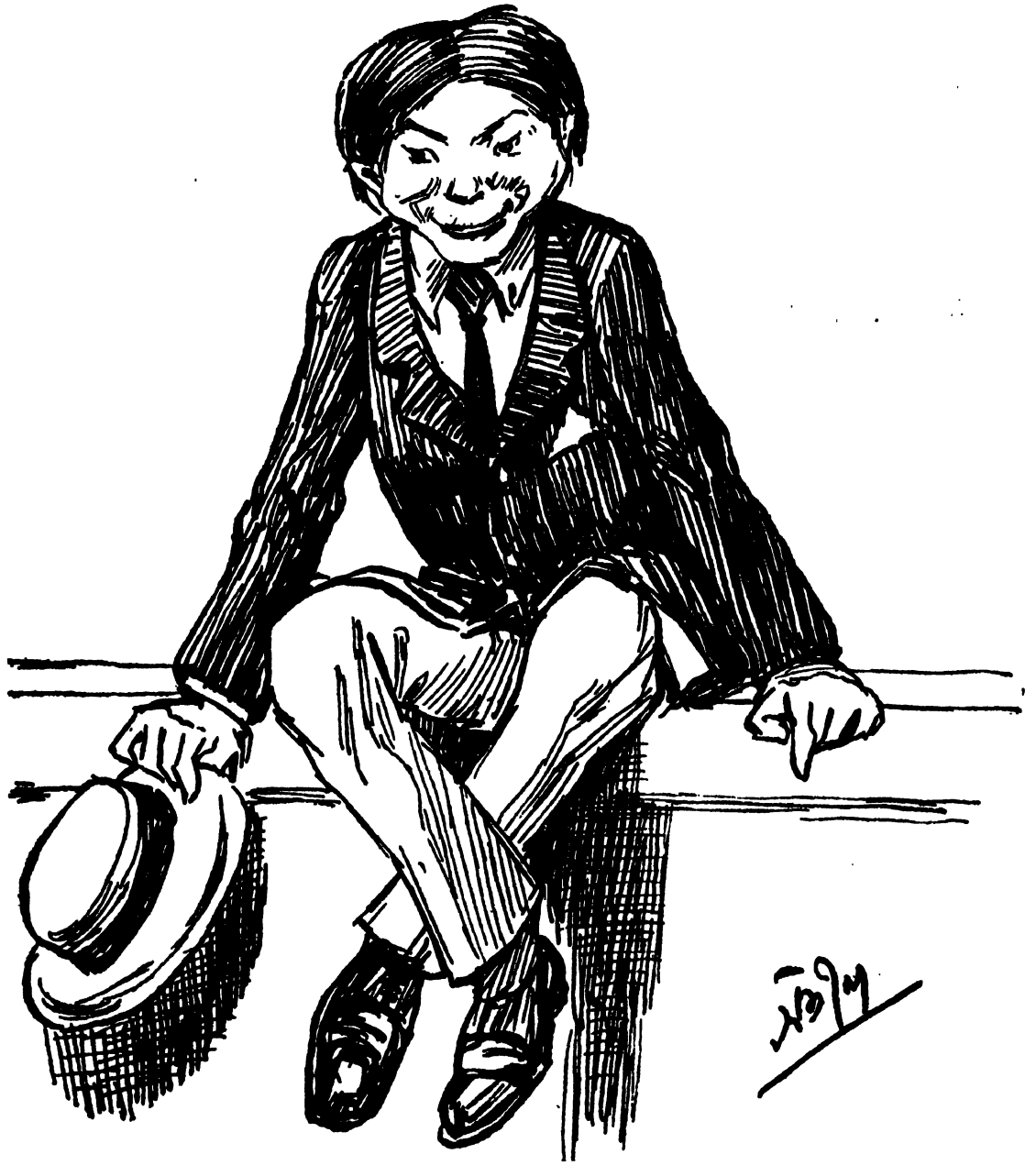
জাপানী জাপানী মুখ জাপান ঘুরে এসে।
ধানে গমে জোড় কলম বাঁধবেন এবার দেশে॥

চিতা

আঁধারে শীকার চুঁড়ে চরেন বাবাজী।
থাবাগেড়ে চিতেবাঘ সেজে আছে পাজি॥

গণ্ডার

গালি নিন্দা নাহি বিঁধে গণ্ডারের চর্ম্মে।
পরস্ব হরণে পটু স্থূলোদর ধর্ম্মে॥

রূপের প্রজাপতি

প্রজাপতি সেজে ছুতি জুতি পরে পায় ।
ওড়না উড়ায়ে পতি অন্বেষণে যায় ॥

তোতাপাখী
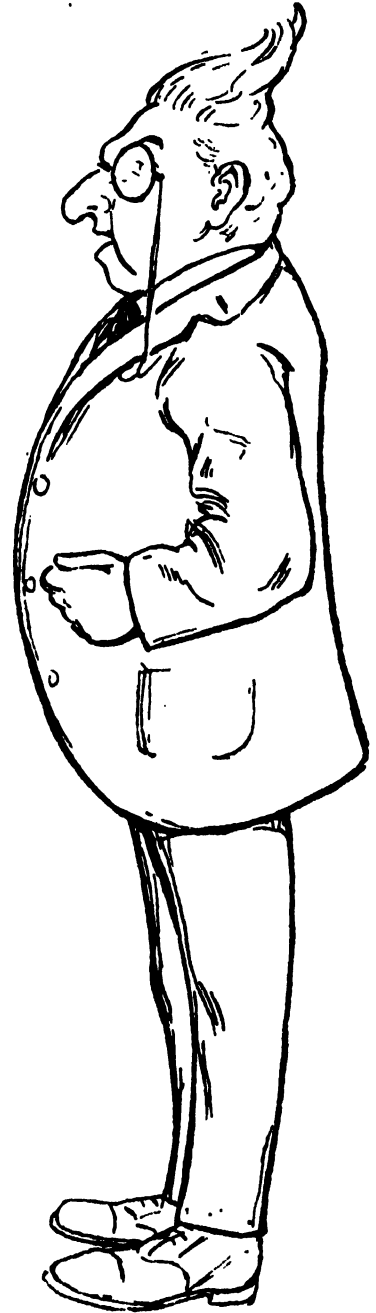
প্রফেসার বকেশ্বর জুড়ি পাবে কোথা ।
নোট কোট করা ইনি ভোঁতারাম তোতা ॥

মেড়া

কোন গুণ নাই শুধু ঢু মারিতে শক্ত।
বয়াটে বেয়াড়া ছোঁড়া মদ-গাঁজা-ভক্ত॥

শৃগাল

আঁধারে আঁধারে ঘুরে কাঁঠাল করে চুরি।
সেয়ানা শেয়াল প্রায় মোক্তার মুহুরী॥

ছুঁচো

কি সুন্দর ছুঁচুন্দর মুখের গড়ন।
দলাদলি ঠেলাঠেলি দালালী কোড়ন ॥

শূয়ার

ইজ্জৎ দৌলৎ মুখে কুড়ের আহার।
গলিৎ গালাজ গালি করে এ শূয়ার ॥

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

কুমার বাহাদুর !

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক রাত্রি

১

কলিকাতাভিমুখী দিল্লী এক্সপ্রেস যে সময় মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গাড়ী আজ আসিতে অসম্ভব বিলম্ব করিয়াছে। যাহার আসিবার কথা বেলা আড়াইটায়, সে ট্রেণ আসিয়াছে সাতটায়।

ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিবামাত্র সমস্ত জনতার ভিতরে একটা অসম্ভব রকমের সংক্ষোভ উপস্থিত হইল। মোগলসরায়ে প্রায় নিত্যই বহু যাত্রীর সমাগম হয়। আজ সমাগমটা কিছু বেশী।

ষ্টেশনের ভিতরে যথেষ্ট আলোক থাকিলেও বাহিরে বিশেষ অন্ধকার। ভাদ্রমাস—রাত্রিটা শুক্লপক্ষের হইলেও, এমন ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রিকেও পরাস্ত করিয়াছিল। তিথি ষষ্ঠী। আর এক মাস পরে শারদীয়া পূজা।

লোকসকল গাড়ীতে উঠিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর সম্মুখ দিয়া অনেক ভদ্রলোক—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, দুই এক জন সাহেব পর্য্যন্ত বহুবার যাতায়াত করিল। কিন্তু কাহারও সে গাড়ীতে উঠা হইল না। গাড়ীখানি রিজার্ভ করা। গাড়ীর ভিতরে একটি মহিলা ও একটি ১০ বৎসরের বালক। দ্বারের সম্মুখে প্লাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধ, কিন্তু বিশেষ বলিষ্ঠ, পশ্চিমা দরোয়ান।

সমস্ত গোলমালের একরূপ নিবৃত্তি হইয়াছে, গাড়ী ছাড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই, গার্ড প্রথম বাঁশী বাজাইয়াছে।

"আর দাঁড়াতে হবে না, মিশির, এইবারে তুমি নিজের গাড়ীতে যাও।"

"আউর যদি কোই আসে, দিদিমণি!"

"আর আস্‌বার সম্ভাবনা নেই, ভাই! গাড়ী ছাড়তে আর বড় জোর দু'মিনিট।"

বালক এই সময় বলিল—"আবার যদি কেউ গাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে আসে, মুখ বাড়িয়ে মিশির মিশির ব'লে চেঁচাবো।"

"বেশ, হামি ওই পাশের ইন্টিরে রইলো।"

মহিলা বলিলেন—"আচ্ছা।"

মিশির চলিয়া গেলে মহিলা বালকসঙ্গীকে বলিলেন—"ভাগ্যে সমস্ত গাড়ীখানা রিজার্ভ করা হয়েছিল, নইলে আজ কি মুস্কিলেই না পড়তে হ'ত, নিতু!"

"খুব মুস্কিল হ'ত, দিদি! সারারাত তা হ'লে আমাদের হয় ত ব'সে যেতে হ'ত।"

"তা হ'ত না, দুটো সিট ত অন্ততঃ আমরা রিজার্ভ করতুম, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারতুম না।" বলিয়া মহিলা নিতুকে দোরের কাছে ক্ষণেকের জন্য বসিতে আদেশ দিয়া ল্যাভেটারির ভিতর প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় বারের বাঁশী বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিল এক ভীম কোলাহল। "চোট্টা হ্যায়—চোট্টা হ্যায়—পাকাড়ো-পাকাড়ো।"

নিতু গবাক্ষের ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া ব্যাপার কি বুঝিতে না বুঝিতে, এক জন উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া সেই গাড়ীর দোর খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং কে সে, তাহা বুঝিতে না বুঝিতে লোকটা ভয়স্তম্ভিত বালকের সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া, ল্যাভেটারির দরজা খুলিয়া, ভিতরে চলিয়া গেল। নিতু চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদি, দিদি!"

২

সে যে কে, কি—পুরুষ কিংবা নারী, সে ঘরের ভিতরে তখন তাহার অবস্থা কি, সুতরাং কতটা যে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে, এ সমস্ত কিছুই বুঝিবার সামর্থ্য ঐ উন্মত্ত আগন্তুকের ছিল না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে সম্মুখস্থ বিস্মিত, স্তম্ভিত, অত্যন্ত ভয়ে বাক্‌শূন্য নিশ্চল মূর্ত্তির পদতলে পতিত হইল। বলিল—"আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। আজ যদি আপনি আমাকে রক্ষা কর্‌তে পারেন, প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যত দিন বাঁচবো, আপনার ক্রীতদাস হয়ে থাক্‌বো।"

কাহারও আর কোনও কথা কহিবার অবসর রহিল না। লোকটা মহিলার পদতলে মাথা রাখিয়া স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল।

মহিলাটি অবশ্য অনেকটা নগ্নভাবেই অবস্থিত ছিলেন। আগন্তুকের মুখ হইতে ঐ কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তিনি যথাসম্ভব সত্বর পরিধেয় বস্ত্রখানা গুছাইয়া লইলেন। এই বারে পদতলে পতিত, অর্দ্ধমূর্চ্ছিত শরণাগতকে দৃঢ়, অকম্পিত, ঈষদুচ্চ স্বরে শুনাইয়া বলিলেন—"যথাসাধ্য।"

বলিয়াই ত্বরিতপদে ল্যাভেটারির ভিতর হইতে বাহির হইয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। একবার ভিতরে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, লোকটির বস্ত্র রক্তাক্ত।

বাহিরে গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া বিষম ভীতি-ব্যাকুলতায় নিতুবাবু উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে-ছিল—"মিশির, মিশির!"

মহিলা ব্যস্ততার সহিত তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াই পৃষ্ঠে হস্ত দিলেন। নিতুবাবু মুখ ফিরাইতেই তিনি নিজের ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া তাহাকে নীরব হইবার ইঙ্গিত করিলেন।

বালক আর মিশিরকে ডাকিল না। সে মুখ ভিতরে আনিয়াই, যেন কোথাও কিছু হয় নাই, এমনই ভাবে উপবিষ্ট হইল। মহিলাও এইবারে স্থিরভাবে তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু মিশির আসিল। আসিয়াই খোকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইয়েছে, হুজুর?"

হুজুর আর তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া, দিদির মুখপানে চাহিল। মহিলা তাহার হইয়া উত্তর দিলেন—"কিছু হয়নি, ভাই, ও তোমার হুজুরের খেয়াল। চ'লে যাও, এখনই গাড়ী ছেড়ে দেবে।"

মিশির চলিয়া গেল।

গাড়ী কিন্তু ছাড়িল না। ছাড়িবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি গার্ডের শেষ সিটি বাজিল না। অথচ বাহিরে আর যে কোনও গোলমাল আছে, বুঝা গেল না। কেবল মাঝে মাঝে, 'পান-বিড়ি সিগারেট', 'হিন্দু চা'—কতকগুলা তারস্বর গাড়ীর এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত চলাচল করিতেছিল মাত্র।

মহিলা একবার তাঁহার রিষ্ট ওয়াচটা চোখের কাছে ধরিলেন।

বালক জিজ্ঞাসা করিল,—"কত বাজলো, দিদি?"

"আট্‌টা বাজতে পাঁচ মিনিট।"

"গাড়ী কখন্ ছাড়বে?"

"বুঝতে ত পারছি না, ভাই, ছাড়বার সময় অনেক-ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।"

ঠিক এমনই সময়ে পুলিসের বেশ-ধরা এক জন বাঙ্গালী গাড়ীর জানালার কাছে উপস্থিত হইয়া মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?"

মহিলা উত্তর করিলেন,—"করুন।"

"একটা লোক কি আপনার কামরাতে প্রবেশ করেছিল?"

"এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"জিজ্ঞাসা কর্‌বার প্রয়োজন হয়েছে। একটা চোর এই দিক্ পানে ছুটে এসেছে। আমরা তার পিছু নিয়েছিলুম। এই যায়গাটায় এসে সে অদৃশ্য হয়েছে।"

"আমি এ কামরায় কাউকেও প্রবেশ করতে দেখিনি।"

এ'কথাটায় উপর বেশ একটু জোর দিয়া মহিলা উত্তর দিলেন। কথাটা সত্যও বটে, সত্যের গোপনও

বটে। তিনি ত ল্যাভেটারির মধ্যে ছিলেন, সুতরাং আগন্তুককে কামরায় প্রবেশ করিতে তিনি ত দেখেন নাই!

পুলিস-কর্ম্মচারী কিন্তু সে কথা গ্রহণ করিল না। সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"এক বার পরীক্ষা করতে অনুমতি দেবেন কি?"

"আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হ'ল না?"

"বিশ্বাস হওয়া উচিত, কিন্তু কি করব ম্যাডাম, আমি পুলিস।"

"যে কামরায় সাহেব মেম আছে, সে কামরা কি পরীক্ষা করেছেন?"

"জিজ্ঞাসা করেছি, বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়নি। তাদের কামরায় প্রবেশ করলে, তারা পুলিসের হাতে তাকে না দিয়ে ছাড়তো না। আর তাদের কামরার দরজা বন্ধ—যেটা আপনার কামরাতে দেখতে পাচ্ছি না।"

নিতুবাবু ও তাহার দিদি এ কথার উত্তরে কেবল যে যাহার মুখের পানে অপ্রতিভের মত চাহিল। গাড়ীর দ্বার যে খোলা, ইহা তাহারা কেহই লক্ষ্য করে নাই।

"গাড়ী অত্যন্ত লেট হয়ে গেছে, আমি ত আর বিলম্ব করতে পারি না, ম্যাডাম।"

"আমার সারভেণ্ট বোধ হয় চ'লে যাবার সময় অন্যমনস্কে খুলে রেখে গেছে। আমরা লক্ষ্য করিনি।"

"তা হ'ক, আমি একবারমাত্র ল্যাভেটারিটা দেখতে ইচ্ছা করি।"

"তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে একটু অপেক্ষা করুন। আমি একটু আলগাভাবে আছি।"

"বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে না হ'লে বড়ই বাধিত হব। ট্রেণ আর ডিটেন করতে পারি না। অলরেডি পাঁচ ঘণ্টা লেট।"

কোনও কথা আর না কহিয়া মহিলা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত একটা ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একত্র বাঁধা এক তাড়া নোট বাহির করিলেন। বাক্স বন্ধ না করিয়াই পুলিস-কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন—"আসুন।"

সে ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মহিলা ল্যাভেটারির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

"আমাকে যাবার অবকাশ দিন।"

কোনও উত্তর না দিয়া মহিলা তাহার হাতে সেই নোটের তাড়া গুঁজিয়া দিলেন।

"কি এ ম্যাডাম?"

"One Thousand, (ওয়ান থাউজেণ্ড)"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে কেবল মহিলার মুখের পানে চাহিল।

"আর আপনি বিলম্ব করবেন না, ট্রেণ লেট হয়ে যাচ্ছে।"

অর্দ্ধবিজড়িতস্বরে কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল—"সে আপনার—"

কথা তাহার শেষ করিতে না দিয়াই মহিলা বলিলেন, "কেউ নয়। অথবা কেউ কি না, এখনও জানবার অবকাশ পাইনি। এখনও তার মুখ স্পষ্ট ক'রে দেখা হয়নি। সে আমার শরণাগত!"

কর্ম্মচারী কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।"

মহিলা আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "এক অপরিচিত শরণাগত ভাইয়ের রক্ষার জন্য অপর এক অপরিচিত ভাইয়ের আশ্রয় ভিক্ষা করছি।"

"কোনও সন্দেহ করবেন না আপনি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

"নিডন্‌ট্ মেন্‌সন্ ম্যাডাম।"

পুলিস-কর্ম্মচারী বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী চলিল। নিতু এতক্ষণ হতভম্বের মত দিদির কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। এই বারে সে কথা কহিল—

"তুমি কি করলে, আমি বুঝতে পারলুম না, দিদি?"

"রোস্ ভাই, গাড়ীখানা আগে প্লাটফরম্ ছাড়িয়ে যাক্, তার পর বুঝিস্।"

কিন্তু গাড়ী প্লাটফরম্ ছাড়িতে না ছাড়িতে তাহার জানালার ফাঁক দিয়া সেই নোটের তাড়া আবার ভিতরে ফিরিয়া আসিল।

তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিতে গিয়া মহিলা দেখিলেন—কেবল, বহুদূরস্থিত সতৃষ্ণনেত্র সেই পুলিস-কর্মচারীর মস্তকে করস্পর্শ।

আর একটু মাথা বাহির করিয়া ইঙ্গিতে মহিলা তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

৩

গাড়ী প্লাটফরম্ ছাড়াইয়া ক্রমে বিদ্যুতের বেগে পরবর্ত্তী ষ্টেশন পার হইয়া গেল। দিদির আদেশে শিষ্ট নিতু এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও কথা কহে নাই। এই বারে বলিল—"কি হ'ল, বল না দিদি!"

দিদি হাসিয়া বলিলেন,—"কেন, তুই ত সব দেখলি শুনলি, ভাই! ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে অত কথা হ'ল, তাতেও বুঝতে পারলিনি? তা' হ'লে এর পর কেমন ক'রে পাশ করবি?"

"ও কে?"

"এই ত শুনলি, ইন্‌স্পেক্টার বাবু বললে চোর।"

"চোরকে তুমি আশ্রয় দিলে কেন?"

"রোস্, ভাই, নোট ক'খানা আবার ট্রাঙ্কে পূরে রাখি।"

টাকা ট্রাঙ্কের ভিতরে ক্যাস-বাক্সের মধ্যে রাখিয়া তিনি আবার ভাইয়ের কাছে বসিলেন।

"তাই ত দিদি, টাকা সে নিলেই বা কেন, আবার ফিরিয়েই বা দিলে কেন?"

"পুলিসে টাকা নিয়েছিল, মানুষে ফিরিয়ে দিলে।"

মাথা নাড়িয়া নিতু বলিল,—"উঁহু!"

"উঁহু কি?"

"আমার অন্য মনে হচ্ছে।"

"ওকে ছেড়ে দেবে না?"

"নিশ্চয় দেবে না, আবার ওকে গ্রেপ্তার করবে!"

কথাটা নিতান্ত মূর্খের মত নহে। মহিলা একটু চিন্তিতার মত হইলেন।

"বেশ, সে ত নেক্‌স্‌ট্ ষ্টপেই বোঝা যাবে, ভাই।"

"তুমি চোরকে আশ্রয় দিতে গেলে কেন?"

"একটু আস্তে কথা কও, নিতু, লোকটা পাশের কামরায় রয়েছে, শুনতে পাবে!"

"চোরকে চোর বলব—"

ভগিনী তাহার কথার উৎস রুদ্ধ করিতে বলিলেন,—"ছি নিতু, তুমি ত বড় অশিষ্টতা দেখাচ্ছ! প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু মর্য্যাদাবোধ আছে।"

"তুমি যদি বিপদে পড়?"

"কোনও বিপদে পড়তে হবে না, ভাই! ওকে আর কেউ গ্রেপ্তার করতে আসছে না।"

"তোমার ঠিক বিশ্বাস?"

মহিলা কেবল মৃদু হাসিলেন। বালক তাহাতে তৃপ্ত হইল না। সে-ও হাসিতে হাসিতে বলিল,—"পুলিসকেও?"

"বিশ্বাস কাউকেও করি না, আবার সকলকেই করি। বিশ্বাসের একটা বাঁধা সুর আছে, ভাই!"

পরাস্ত হইয়া বালক এইবারে চুপ করিল।

গাড়ী আবার একটা ষ্টেশন পার হইয়া গেল। ইহার পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তাহা সামান্যমাত্র সময়ের জন্য থামিবে। নিতু এইবার যেন রুদ্ধনিশ্বাসে সেই থামার অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার দিদিও এই সময়টা কতকটা চিন্তান্বিতার মত বসিয়া রহিলেন। দৃষ্টি তাঁহার ছিল বাহিরের দিকে। সেখানে তাঁহার দেখিবার কিছু ছিল না। ঘন-মেঘগ্রস্ত ষষ্ঠীর দুর্ব্বল চন্দ্র আকাশের কোন্ প্রান্তে লুকাইয়া আছে। বুঝি অন্ধকারের মুখখানাই রমণীর আজ ভাল লাগিতেছিল।

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, আবার চলিল, তাহাদের আতঙ্কিত হইবার কোনও ঘটনা ঘটিল না।

এইবারে নিতু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার দিদিকে বলিল,—"তোমার কথাই ঠিক, দিদি, আর ওকে কেউ গ্রেপ্তার করতে আসছে না।"

"এইবারে, ভাই, তোমাকে একটি কায করতে হবে।"

"কি কায বল।"

"দেখতে হবে, লোকটা কি করছে।"

"আমি পারব না, দিদি!"

"কাউয়ার্ড—সাহস অর্জ্জন কর—যাও, দেখে এসো। সে কি ভাবে আছে, যখন জানি না, তখন আমার ওখানে কি যাওয়া উচিত?"

অন্তিমে দশরথ

বসুমতী প্রেস]
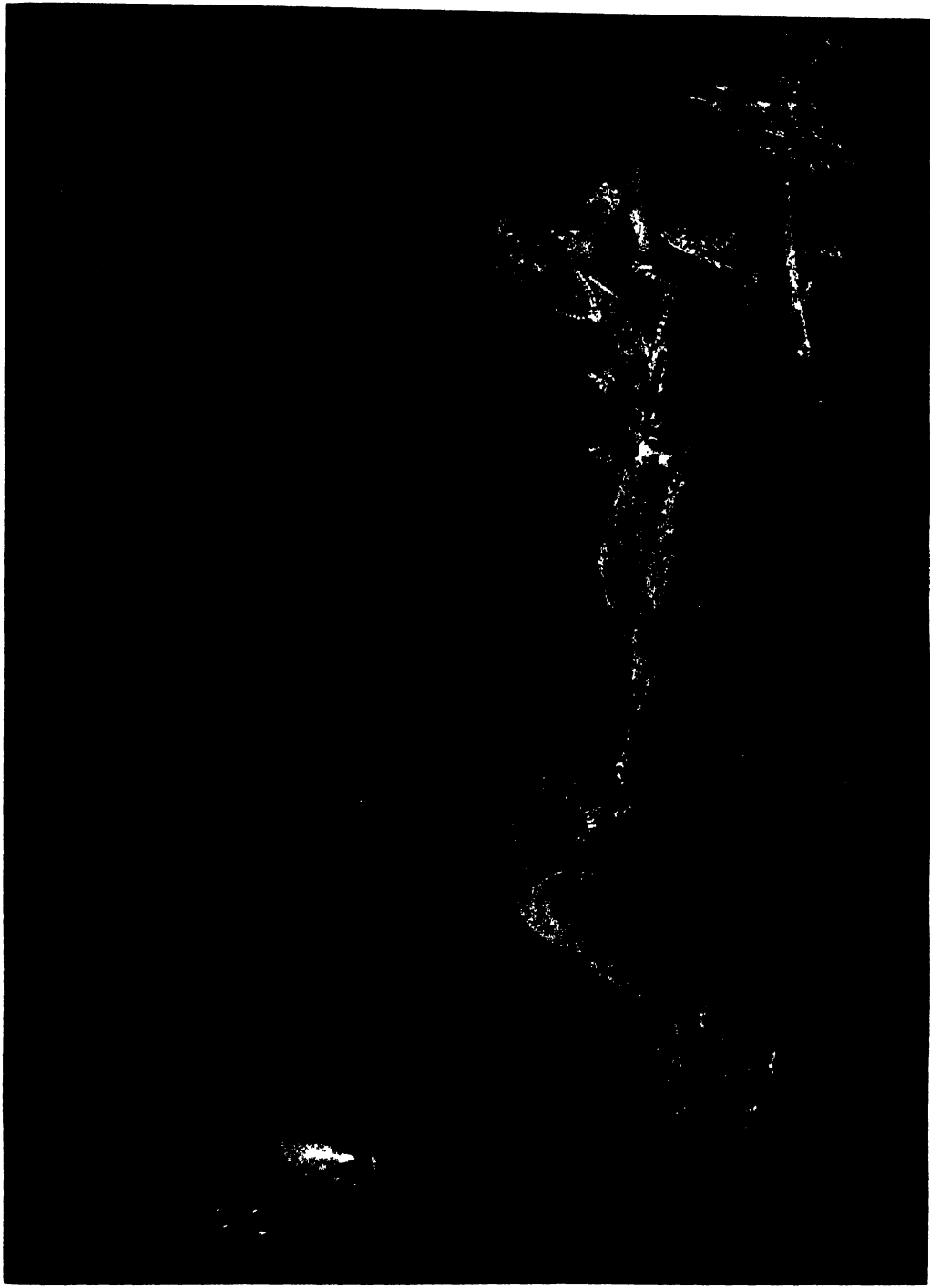
[শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা।

অগত্যা নিতুবাবুকে উঠিতে হইল। সে ত্রস্তের মত ধীরে ধীরে ল্যাভেটারির দ্বার ঈষৎ মুক্ত করিল। ভিতরটায় ছিল অন্ধকার, কিছু দেখিতে পাইল না। তখন দ্বারের ফাঁকে কান দিয়া সে জীবের অস্তিত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করিল।

"ও কি, foolএর মত কায করছ, নিতু, সুইচ্ টেনে ফেল।"

বাহির হইতে হাত বাড়াইয়া বালক সুইচ্ টিপিতেই কামরা আলোকিত হইল। সে দেখিল, লোকটা মৃতের মত কামরার এক কোণে পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে সে লোকটাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। এখন দেখিল, তাহার জামা-কাপড় রক্তমাখা। সে কপাট আবার বন্ধ করিয়াই অনুচ্চস্বরে ডাকিল—"দিদি!"

"কি? দিদি ব'লে চুপ করলে কেন?"

"তুমি একবার দেখ।"

"কেন?"

"বোধ হয়, ম'রে গেছে।"

"ধ্যেৎ বোকা; না দেখে, না পরীক্ষা করেই কন্‌ক্লুসন" বলিয়াই মহিলা উঠিলেন। তিনিও দ্বারের কাছে গিয়া প্রথমটা উঁকি দিয়া দেখিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার প্রবেশের কোনও বাধা নাই। লোকটা মৃতের মত পড়িয়া আছে বটে, কিন্তু অসংযতভাবে পড়িয়া নাই।

তখন ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সেই চোর আখ্যাধারী অজ্ঞাত-কুলশীলের সমীপস্থ হইলেন। নিতু বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

"ঘুমোচ্ছো না কি?"

সুপ্তোত্থিতের প্রথমটা চমক, তাহার পর উদাস দৃষ্টি। মহিলা সে দৃষ্টিতে ভয়ের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না।

"বা! তুমি ত চমৎকার মানুষ! এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছ!"

"আপনি যে আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছেন।"

"এইবারে উঠ্‌বে?"

"আপনি বল্লেই উঠি।"

"আচ্ছা, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমরা বন্যার পার হয়ে যাই।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া লোকটা দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া আবার শয়ন করিল।

ফিরিতে ফিরিতে মহিলা একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কোথায় আঘাত?"

"তা ত এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি—বোধ হয়, সর্ব্বাঙ্গে।"

"আর ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা। এখন—রাত হ'ল—৯টা। একটা বালিস দেবো?"

মাথা না তুলিয়াই, হাত নাড়িয়া সে নিষেধ করিল।

আলো নিবাইয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া মহিলা বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

৪

গাড়ী সেইরূপ বেগেই চলিয়াছে। ভাইভগিনী আবার পরস্পরের পার্শ্বে উপবিষ্ট। কোনও একটা নূতন কথার আলোচনা দুই জনের ভিতরে কাহারও যেন করিবার ছিল না। নিতুবাবুর ত ছিলই না, অবস্থার অনুরূপ একটা গভীর চিন্তায় ভগিনীর মস্তিষ্ক এমনই ভারাক্রান্ত হইয়াছিল যে, ভাইটির সঙ্গে কোনও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অবস্থার গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিতে তাঁহার সাহস হইল না। উভয়েই যেন বন্যারে পৌঁছিবার প্রতীক্ষায় রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়া আছে।

বহুক্ষণ নীরবে উপবিষ্ট থাকিয়া ভগিনী একবার বামহস্তের মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়ীটা দেখিলেন।

"আর আধ ঘণ্টা।"

"এখনও! ও বাবা!"—বলিয়া বালক সিটের গায়ে হেলিয়া পড়িল।

"ঘুমুবি?"

"না।"

"কিছু খাবি?"

"না।"

"ক্ষিদে পেয়ে থাকে যদি, কিছু খা না।"

"না—আগে বন্যার, তার পর খাবার কথা। হাঁ দিদি!" বলিয়া বালক ক্ষণেকের জন্য চুপ করিল।

"কি বলতে যাচ্ছিস্, বল্ না।"

"লোকটাকে কি বক্সারে নামিয়ে দেবে?"

"সে যদি স্বেচ্ছায় নেমে যেতে চায়।"

"নৈলে?"

"যত দূর যেতে চায়, সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"এই গাড়ীর ভিতরে?"

"আবার স্বতন্ত্র গাড়ীর ভাড়া দেবে কে? এ কামরায় এখনও আমরা তিন জনকে সিট্ দিতে পারি।"

"তার পর?"

"তার পর কি বল্।"

"যখন অগাধে ঘুমিয়ে পড়বে?"

"জিনিষপত্র চুরি যাবার কথা ভাবছিস্?"

"যদি নিয়ে যায়?"

ভগিনীর মুখ বালকের ঐ কথায় মধুর হাসিতে ভরিয়া গেল। অর্দ্ধশায়িত বালকের চিবুকে হস্ত দিয়া বলিলেন—"যদিই নিয়ে যায়, তা হ'লে কি তুই গরীব হয়ে যাবি, নিতু?"

নিতু মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

"অথচ ও লোকটার দুঃখু দূর হয়ে যাবে।"

"ঠিক বলেছ, দিদি! আমি এইবারে একটু ঘুমুই।"

"একটা কথার উত্তর দিয়ে ঘুমোও।"

"বল দিদি।"

"ঐ টাকা ক'টা ত জলেই ফেলে দিয়েছিলুম।"

"ওকে দেবে?"

"তোমার মত কি?"

"দাও, দিদি, আমি বড় খুসী হব।"

"এইবারে ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও—ও তোমার কিছু চুরি করবে না।"

সত্য সত্যই দেখিতে দেখিতে নিতুবাবুর নাসিকা হইতে নিশ্বাসের শব্দ উঠিল। একটা বালিস লইয়া ভগিনী তাহাকে সিটের উপর শয়ন করাইলেন।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ী বক্সারে পৌছিল।

৫

পুলিস-কর্ম্মচারীর আশ্বাসবাক্যে পূর্ণ আস্থা থাকিলেও গাড়ীর বেগ কমিবার সময়ে মহিলার মনে এখনও একটা আতঙ্ক উত্তরোত্তর বাড়িয়া, ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্ব ক্ষণে, তাঁহার হৃদয়টাকে অসম্ভবরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল। কিন্তু ষ্টেশনে পৌছিয়া, সেখানে আতঙ্কিত হইবার মত কোনও কিছু না দেখিয়া তিনি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইলেন। মিশির কেবল একবারমাত্র আসিয়া দিদিমণি ও দাদাবাবুর সংবাদ লইয়া চলিয়া গেল।

গাড়ী বক্সার ছাড়িল। প্লাটফরম্ পার হইবার আর বিলম্ব সহিল না, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই মহিলা আসন ত্যাগ করিয়া প্রথমে সমস্ত বাতায়ন রুদ্ধ করিলেন। তাহার পর নিতুকে ডাকিলেন। দুই তিন বারের ডাকেও যখন বালক উঠিল না, তখন জাগাইবার জন্ম তিনি তাহার গাত্রে করস্পর্শ করিলেন।

দুই তিন বার বালকের দেহ মৃদু আন্দোলিত করিতেই সে 'চোর চোর' বলিয়া উঠিয়া বসিল।

"ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্. কোথায় চোর?"

ভাঙ্গাঘুমে দিদিকে দেখিয়া সে আর কোনও কথা না কহিয়া অপ্রতিভভাবে দুই হাতে চক্ষু মার্জ্জিত করিতে বসিয়া গেল।

"আর কিছু খাবি?"

"আমরা বক্সারে এসেছি?"

"বক্সার ছেড়ে এসেছি। কিছু খাস্ ত বল্।"

"না দিদি, আর আমি কিছু খেতে পারব না।"

"তা হ'লে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ জেগে থাকতে পারবি—ঘণ্টাখানেক?"

"সে লোকটা?"

"তারই জন্ম—দুজনে মিলে তার শুশ্রূষা করতে হবে। পারবি জেগে থাক্তে?"

"খুব পারব।"

"সেই টিংচার আইডিনের শিশিটা?"

"ঐ বড় ট্রাঙ্কের ভেতরে।"

"দেখ্ ভাই, আনতে চাসনি ওটা সঙ্গে, কত উপকারে লেগে গেল। আমি শিশি বার করি, ততক্ষণ তুমি ওকে ডেকে তুলে দাও।"

ল্যাভেটারির দ্বার খুলিয়া, আলো জ্বালিয়া বালক ডাকিল—"ওগো, ওঠো।"

আগন্তুক দেহে এখন যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল। অনেকক্ষণ হইতেই তাহার ঘুম টুটিয়াছে। মাঝে মাঝে

মুখ হইতে তাহার মৃদু আর্ত্তনাদ বাহির হইতেছিল। তাহার দুই একটা পূর্ব্বেই মহিলার কানে গিয়াছে। উঠিবার কথা বলিতে না বলিতে সে উঠিয়া বসিল।

"উঠেছে, নিতু?"

আগন্তুক নিতুর পরিবর্ত্তে উত্তর দিল—"উঠেছি।" বলিয়া সে কামরার ভিতরে আসিতেছিল। মহিলা দেখিয়া বলিলেন—"বাথ-রুমে ব'স। আমরা যাচ্ছি।"

নিতু দিদির বলার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার ভগিনী সেটা লক্ষ্য করেন নাই। আগন্তুককে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি শিশি খুঁজিতে ব্যস্ত ছিলেন।

"কই রে শিশি?"

নিতু কাছে আসিয়া ট্রাঙ্কের সম্মুখ থেকেই তাহা বাহির করিয়া দিল।

তাই ত রে ভাই, সুমুখে রেখেছিস্, আর আমি চারদিক হাতড়াচ্ছি। কেন বল্ দেখি?"

প্রশ্ন করিয়াই মহিলা হাসিভরা মুখে বালকের মুখের পানে চাহিলেন।

প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া নিতু অতি মৃদুকণ্ঠে দিদিকে বলিল—"লোকটা চোর নয় গো দিদি!"

"কি ক'রে জান্‌লি?"

"ভদ্দর লোকের পোষাক। ভাল কাপড়—আদ্দির পঞ্জাবী, পায়ে পম্প্‌সু, আঙ্গুলে আবার আংটী!"

"তা হ'লে সে চোরই রে ভাই, তোর কথাই সত্যি।"

"কি ক'রে?"

"চোরগুলো রেলে gentlemanএর পোষাক প'রে চুরি করে।"

"কিন্তু দিদি, লোকটা বোধ হয় বাঁচবে না। তার সমস্ত কাপড় রক্তমাখা। লোকটা কাঁপ্‌ছে।"

"কাঁপুক, সে মরবে না। তুই আর একটি কায কর্, ভাই! আমার বাক্সের ভিতরে তোর দাদাবাবুর খান তিনেক কাপড় আছে, তার একখানা বার ক'রে নিয়ে আয়।"

নিতু কাপড় বাহির করিতে চলিল। মহিলা শিশি ও একটা জগ্ লইয়া বাথরুমের ভিতরে আবার প্রবেশ করিতে চলিলেন।

৬

আবার শুয়ে পড়লে যে?"

যদিও বুঝিয়াছেন, তাহার শুইয়া থাকার কারণ, তথাপি মহিলা তাহাকে উক্ত প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিলেন—"উঠে পড়।"

আগন্তুক আদিষ্টের মতই যেন উঠিল এবং মহিলার সম্মুখে অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

"ও রকম ওঠা নয়—দাঁড়াও। এই জগ্ নাও, তোয়ালে নাও। ট্যাপ খুলে প্যানে জল ভর। যেখানে যেখানে আঘাত, ধুয়ে ফেল। এর পর কাপড় দেবো, ছেড়ে ফেলো।"

উত্তর কিছু না দিয়া আনত মস্তকেই সে হস্ত প্রসারিত করিল। তাহার হস্তে উক্ত দ্রব্য দুইটি দিতে গিয়া মহিলা দেখিলেন, রক্তে তার মুখ একবারে যেন আচ্ছন্ন হইয়া আছে। দেখিয়াই শঙ্কিতার মত বলিয়া উঠিলেন—"ভুল হয়েছে, আর একটু অপেক্ষা কর।"

বলিয়াই যথাসম্ভব সত্বর একখানা সাবান পেঁটরা হইতে বাহির করিলেন। ইতোমধ্যে নিতু কাপড় বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে; দাঁড়াইয়া দিদির পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

ভাইয়ের হাত হইতে কাপড় লইয়া, তাহার হাতে সাবানখানা দিয়া মহিলা বলিলেন—"এইটে ওর হাতে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে এসো।"

দিদির আদেশ পালন করিয়া নিতু ভগিনীর কাছে আসিয়া বলিল—"হাঁ দিদি, লোকটা ভূত না কি?"

"কেন বল্ দেখি?"

"মুখখানা ঠিক ভূতের মত।"

"হয় ত হ'তে পারে। কিন্তু ভূতটা বুড়ো কি যুবা, বল্‌তে পারিস্?"

"তুমি ত দেখেছ?"

"দেখেছি, বুঝতে পারি নি। নিমিষের দেখা—বোধ হ'ল, বয়স হয়েছে।"

"আমার ত তা মনে হ'ল না দিদি। আমার মনে হ'ল, দাদাবাবুরই বয়সী। তবে বড় কাহিল—যেন কত কাল খায় নি।"

"তা হ'লে ও চোরও বটে, ভূতও বটে।"

উভয়ে আবার লোকটার প্রসাধন-প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট হইল। বসিয়া কাপড়খানা সিটের উপর রাখিতে রাখিতে মহিলা বলিলেন—"তা হ'লে টাকাগুলো দিয়ে লোকটাকে নেক্স্‌ট্‌ ষ্টেশনে নামিয়ে দেব না কি?"

"তা করলেই ভাল হয়, দিদি।"

"তাই করা যাবে, ভাই। বুঝতে পারছি, যখন লোকটা পুলিসের হাতে পড়বার আর ভয় নেই, তখন ওকে আমাদের সঙ্গে রাখা আর কর্ত্তব্য নয়। বিশেষতঃ তোমার দাদাবাবু যে রকম jealous."

"তা বটে।"

"যদি শোনে, reserved carriageএর ভিতরে এক জন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সারারাত কাটিয়ে এসেছি,—যার where-about কেউ জানে না, যে criminal হ'লেও হ'তে পারে—"

নিতু একটু আবেগভরেই বলিয়া উঠিল—"না দিদি, তুমি ওকে—next stationটা কি?

"বোধ হচ্ছে, আরা।"

"তুমি ওকে আরায় নেমে যেতে ব'ল।"

"এই শিশিটে তা হ'লে হাতে নাও। লোকটার গা ধোয়া সারা হ'লেই শিশি আর কাপড় তুমিই তার হাতে দিও। আমি ততক্ষণ ওটা বার করি।"

পেটরার ভিতর হইতে নোট কয়খানা আবার বাহির করিয়া ভাইটির পার্শে বসিয়া তিনি এইবার লোকটার দেহ-প্রক্ষালন-শেষের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

লোকটার বাহির হইতে বড়ই বিলম্ব হইতে লাগিল। এ বিলম্বটা নিতুর কেমন সহ্য হইতেছিল না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে ভগিনীকে বলিল—"হাঁ দিদি! লোকটাকে ডাকব?"

"আর একটু দেখ্‌ না।"

"গাড়ী ত আরায় এসে পড়ল।"

"আরা না হয়, দানাপুর। এর ভিতরে যদি না বেরোয়, দানাপুরে ও বেটাকে ঘাড়ে ধ'রে বা'র ক'রে দেব। তখন বুঝবো, ওর মতলব ভাল নয়।"

নিতু এ কথার কোন উত্তর দিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বালককে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্যই যেন মহিলা অন্য কথা পাড়িলেন—"হাঁ ভাই!"

নিতু অনাগত ভয়ের চিন্তায় অন্যমনস্কের মত বসিয়া ছিল। দিদির কথায় চমকিতের মত মাথা তুলিল।

"ভয় কি রে ভাই, আমিই বেটাকে গলা টিপে গাড়ী থেকে ফেলে দেবো। তুই যা বললি, তাই যদি ঠিক হয়, তা হ'লে ওর চেয়ে আমার দেহে ঢের বেশী muscle আছে। ইস্কুলে পড়বার সময় আমি রীতিমত exercise করেছি।"

"কি বল্‌ছিলে, দিদি?"

"বল্‌ছিলুম কি—যদি তোর দাদাবাবু সমস্ত টাকাই চায়—যা আমার বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন?"

"সব টাকাই চাইবেন?"

"আমার ত তাই মনে নিচ্ছে।"

নিতু কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

"তা হ'লে কি করা যাবে বল্‌ দেখি, ভাই?"

"সব টাকা দিতে হবে কেন?"

"শ্বশুরের তিন লক্ষ টাকা দেনা। না চেয়ে উপায় কি? মোটে হাজার ত্রিশেক টাকা সম্পত্তির আয়, তাতে অত দেনা। সে সম্পত্তি ত যাওয়ারই মধ্যে।"

"সব টাকা দেবার কথা কি দাদাবাবু লিখেছেন?"

প্রকাশ্যে লিখতে পারে নি। বিশেষ ক'রে লিখেছে, আমার বাবার কথা। শ্বশুর অসুখে শয্যাগত, তিনি আমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। তার মানে, কিছুই নয়, যেমন দেখা করব, অমনি আমার কাছ থেকে টাকাগুলি চেয়ে বসবেন। কিন্তু তাতেও ত সব দেনা শোধ হবে না, আরও এক লাখ টাকা বাকী থাকবে। যে রকম মামলা-মোকর্দ্দমা ওদের, তাতে ওই এক লাখ আবার তিন লাখ হ'তে কতক্ষণ?"

"তা বটে!"

"আরা—আরা—বাহির হইতে খালাসীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। মহিলা বুঝিলেন, তাঁহাদের অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়া গাড়ী আরায় থামিয়াছে।

৭

গাড়ী আবার চলিল। লোকটা কিন্তু বাহিরে আসিল না, অথবা ভিতর হইতে প্রস্তুত হইবার কোন নিদর্শন জানাইল না।

"তাই ত দিদি!"

নিতুর মুখে অঙ্গুলি দিয়া মহিলা তাহাকে আবার নীরব হইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং একরূপ তাহার কানে কানেই বলিলেন—"তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ভাই, যা বলেছি, দানাপুরে ঠিক তাই করব। দেখছি, পুলিসের হাতে পড়াই লোকটার অদৃষ্টে আছে।"

"আমি কতক্ষণ শিশি কাপড় নিয়ে ব'সে থাক্‌ব?"

"দাও আমার হাতে।"

আবার বালক-ভাইটিকে অন্যমনস্ক রাখিবার আলাপ।

"কি করা যায়, বল্‌লিনি ত নিতু!"

"তুমি কি কর্‌বে মনে করেছ, দিদি?"

"শুন্‌বি?"

"ওই দুলাখ টাকাই দেবে?"

"যদি শ্বশুর চান, তাই দেবো নিতু!"

"তার পর?"

"তার পর দেখবো, বাবা আমাকে সুখী রাখবার এত ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমার অদৃষ্টে কি আছে।"

"তোমার অদৃষ্টে আবার কি থাকবে? আমার ত অনেক টাকা, দিদি।"

"আমাকে দেবে?"

"সব চাও—সবই দেবো।"

"সে এখন বল্‌ছ, ভাই। বিয়ে হ'লে কি আর বল্‌তে পারবে?"

"বিয়ে করব না।"

নিতুর চিবুক দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিতে ধরিয়া চুম্বিত করিতে করিতে মহিলা বলিতে লাগিলেন—"ছি ভাই, বাবার একমাত্র বংশধর তুমি। চল না গিয়ে দেখি। আগে থাকতেই কল্পনায় সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছি আমি।".

"দাদাবাবু কি দিতে পারেন না? তিনি ত অনেক টাকা রোজগার করছেন!"

"ছাই রোজগার। তুই ও সব কথায় বিশ্বাস করিস্? ব্যারিষ্টারিতে মাসে চার পাঁচশো টাকা আয়ের মূল্য কি? আদব বজায় রাখতেই কুলোয় না। তার ওপর race খেলার নেশা। সে নিজেই হ্যাণ্ড্‌নোট্ কেটে বসেছে কি না, তারই ঠিক কি?"

ম্রিয়মাণ হইয়া নিতু যেন কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমের আবেশে মাথাটা তাহার টলিয়া গেল।

আর বেশীক্ষণ জাগা বালকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট-কর হইবে বুঝিয়া মহিলা তাহাকে শয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

অবশাঙ্গ বালক শয়ন করিতে না করিতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মহিলা ঘড়ী দেখিলেন,—১১টা বাজিতে আর সামান্যমাত্র বিলম্ব। দানাপুর পৌঁছিতেও বেশী দেরী নাই। অথচ লোকটা বাহির হইবার কোনও নিদর্শন এখনও দেখাইল না! তাঁহার তখন একটু চিন্তাও হইল, ভয়ও হইল!

একবার বাহিরের অবস্থাটা জানিবার ইচ্ছায় তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রবেশদ্বারের শার্সিটা খুলি-তেই বৃষ্টির একটা ঝলক তাঁহার মুখ, চোখ ভিজাইয়া দিল। বুঝিতে পারিলেন, একটা ঝড়ের মাথায় চাপিয়া বৃষ্টি গাড়ীর অনুসরণে কাশী হইতে বেহার পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

এইবারে ভয়টা তাঁহার গাঢ় হইল। সত্য সত্যই ভিত-রের লোকটা দুর্ব্বৃত্ত নয় ত? তাহা হইলে এই ঝড়বৃষ্টির মুখে পথের মাঝখানে তাঁহার আত্মরক্ষার উপায়? চলন্ত ট্রেণে ডাকাইতের কথা তিনি খবরের কাগজে অনেক পড়িয়াছেন।

শার্সিটা আবার বন্ধ করিয়া নিদ্রিত নিতুর পার্শ্বে, কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য তিনি কিছুক্ষণের জন্য বসিলেন। বাহির হইতে সে বাথরুমটা বন্ধ করিবার উপায় থাকিলে তাঁহার চিন্তার বিশেষ কারণ থাকিত না। সে কামরা ভিতর হইতে বন্ধ করিবার উপায় আছে।

বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ভিতরে একটা শব্দ উঠিল, একটা যেন গুরুভার বস্তুর পতন-শব্দ। শব্দটা বিশেষ গুরু না হইলেও, পূর্ব্ব হইতেই শঙ্কিতান্তরাকে চমক দিবার পক্ষে যথেষ্ট। চমকিতা হইয়াই মহিলা উঠিয়া

দাঁড়াইলেন এবং সত্বর বাথরুমের দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়া দুই হাতে হাতলটা টানিয়া ধরিলেন।

৮

উপস্থিতবুদ্ধি তাঁহাকে প্রথমে উক্ত কার্য্যেই প্রণোদিত করিয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন, এরূপ করিলে অন্ততঃ দানাপুর পর্য্যন্ত লোকটাকে তাঁহার কামরায় প্রবেশের বাধা দিতে পারিবেন। কিন্তু একটু পরেই বুঝিলেন, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, লোকটার বাহিরে আসার চেষ্টার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

তখন দ্বার ঠেলিতে গিয়া বুঝিলেন, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ধীরে ধীরে কবাটে এইবার তিনি অঙ্গুলি দিয়া আঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে কথা উঠিল,—"আর একটু অপেক্ষা কর, নিতুবাবু!"

"নিতুবাবু নয়—আমি।"

"আপনি? আর একটু অপেক্ষা।"

"কিসের শব্দ হ'ল?"

"হাত থেকে জগ্‌টা প'ড়ে গেল।"

"তা যাক্,—আর অপেক্ষা করা আমি ভাল মনে করছি না। আমি তোমাকে দানাপুরে নেমে যেতে দেখা ইচ্ছা করি।"

"যে আজ্ঞে!"

মহিলা দেখিলেন, কবাট ধীরে ধীরে ঈষদুন্মুক্ত হইল এবং তাহার ভিতর হইতে একটি হাতের কিয়দংশ বাহির হইল। দেখিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, হাতে একটি আঘাত-চিহ্ন। আর সে আঘাত নিতান্ত সামান্য নহে।

"একখানা কাপড় যে আমাকে দেবেন বলেছেন।"

"দিচ্ছি,—এ রকম আঘাত কত?"

"ও রকম আর বড় নেই। মাথায় একটা আছে, অতটা নয়।"

"কাপড়ের সঙ্গে একটা আইডিনের শিশি আছে, দিই?"

"কাপড় দিন, শিশির দরকার নেই।"

"কেন?" বলিয়া মহিলা অগ্রেই সেই হাতে কাপড়খানা দিলেন। দিতে গিয়া দেখিলেন, সুন্দর তাহার করপত্র, তাহাতে সুশ্রী কয়টি অঙ্গুলি, তাহার একটিতে পরানো একটি আংটী। আংটী নিতান্ত মূল্যহীন নহে।

কাপড় লইয়া আগন্তুক হাত আবার ভিতরে প্রবেশ করাইল।

মহিলা আবার শিশিটা লইতে অনুরোধ করিলেন,—"শিশিটা নাও, একটু আইডিন লাগিয়ে দাও। নইলে ঘাটা sceptic হ'তে পারে।"

"তবে দিন।"—আবার হাত বাহির হইল।

"Sceptic মানে বোঝো?"

"বিষাক্ত। দিন আইডিন।"

শিশি দিতে গিয়া মহিলার মুখে হাসি আসিল। এ চোর ত মন্দ নয়! হাত আবার ভিতরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন—"আমি এইবারে বসতে পারি?"

"রাত কত হ'তে পারে?"

মহিলা বাম হস্ত আলোর কাছে তুলিয়া ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, "এগারোটা বেজে দশ মিনিট।"

"দানাপুর পৌছিতে কত দেরী হবে?"

"আর দেরী কি, এসে পড়ল ব'লে।"

"আপনি বসুন।"

মহিলা কিন্তু বসিলেন না। লোকটা কিরূপ আহত হইয়াছে, তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা হইল। যদিও ইহা বিশেষরূপে নীতিবিরুদ্ধ, তথাপি তাঁহার করুণার্দ্র হৃদয় তাঁহাকে এ দেখা হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না।

কবাটের ঈষৎ ফাঁকের মধ্য দিয়া তিনি দেখিলেন, লোকটি কামরার দেওয়ালসংলগ্ন আয়নার দিকে মুখ করিয়া মাথার ক্ষতে আইডিন লাগাইতেছে। তিনি তাহার পশ্চাদ্ভাগমাত্র দেখিতে পাইলেন। পৃষ্ঠদেশ দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, লোকটা নিতু যা বলিয়াছে, তাই, তরুণ বটে। পিঠের রংটাও নিতুর দাদাবাবুরই মতন—উজ্জ্বল শ্যাম। কিন্তু পিঠের এমন অনেক স্থানে আঘাত-চিহ্ন, যেখানে সে নিজে কোনও মতে ঔষধপ্রয়োগ করিতে পারিবে না।

যুবক নয়—তাহার পদতলে পরিত্যক্ত কাপড় ও জামা

পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার দত্ত কাপড় পরিবার এখনো পর্য্যন্ত সে অবকাশ পায় নাই।

অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া তিনি, বালক যেখানে শুইয়া ছিল, তাহার বিপরীত দিকের বেঞ্চে যাইয়া বসিলেন।

গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইতেই তাঁহার দত্ত বস্ত্র-পরিহিত হইয়া, অর্দ্ধবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া আগন্তুক কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

মহিলা দেখিলেন, সে তরুণও বটে, সুন্দরও বটে! তাহার স্বরূপ ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া মহিলা এতক্ষণ বেশ তাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন। এখন সুস্পষ্ট তাহাকে দেখিতেই তাঁহার কেমন একটা সঙ্কোচ আসিল। প্রথমটা তাঁহার মুখ হইতে যেন কথা বাহির হইতে চাহিল না।

কবাটটা বন্ধ করিয়া, মহিলাকে নমস্কার করিতে করিতে আগন্তুকই প্রথম কথা কহিল—"এইবারে দানাপুর?"

"এরই মধ্যে চ'লে এলেন যে?"

"গাড়ী থামছে দেখে।"

"তা থামুক, আপনি আবার ভিতরে যান, যেখানে যেখানে আঘাত, অষুধ লাগিয়ে দিন। দানাপুরে না হয়, পাটনায় নামলেও চলবে।"

যুবক আর ভিতরে গেল না। নিতুবাবুর সম্মুখের সিটে কবাটের নিকটেই উপবিষ্ট হইল।

"হাতের আঘাতটা আর একবার দেখতে পারি?"

যুবক হাত তুলিল।

"ওখান থেকে বুঝতে পারব কেন, নিকটে আসুন।"

"গাড়ী যে থেমে গেল!"

"থামুক, আপনাকে দানাপুরে নামতে হবে না। কোনও সঙ্কোচ করবার প্রয়োজন নেই।"

যুবক স্থান ছাড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু একবারে বিশেষ নিকটে আসিল না।

মহিলা সিট ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত দ্বারা তাঁহার সম্মুখের বেঞ্চ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এইখানে বসুন। কোনও সঙ্কোচ নেই—আমাকে ভগিনী মনে করুন।"

"নেমে যাব না?"

"সে কথা পরে বলব। বয়স কত হবে? দেখে মনে হচ্ছে, আমার চেয়ে ছোট।"

"চব্বিশ।"

"ও! ঢের ছোট। বোসো।"

তবু যুবক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তখন স্মিত-বিকসিত মুখে, ঈষৎ তিরস্কারের ভাবে মহিলা তাহাকে বলিলেন—"ক্রীতদাস হয়েছ না? এই তোমার মনিবের হুকুম পালন? এমনই ক'রে প্রতিজ্ঞা রাখবে?"

যুবক বসিল এবং মস্তক অবনত করিয়া দুই করে মুখ ঢাকিয়া রহিল।

"প্রতিজ্ঞা করেছ যে, ভাই, আমার ত অপরাধ নেই! যাক্‌, হাত পরে দেখছি, কিছু খেয়েছিলে কি?"

"সারাদিন—"

"পেটে কিছু পড়ে নি?"

যুবক মুখ হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া, তুলিয়া মলিন হাসির সহিত মাথা নাড়িল।

"বটে! তা হলে ত আগে কিছু খেতে হবে ভাই! কি তোমরা?"

"ব্রাহ্মণ।"

"পৈতে কৈ?"

কাপড়ের খুঁটের ভিতর দিয়া যুবক তাহার গলসংলগ্ন উপবীত-সূত্র খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহিলা হাসিয়া বলিলেন—"থাক্‌, বুঝতে পেরেছি, আর খুঁজতে হবে না।"

"জামা খুলতে বোধ হয় প'ড়ে গেছে—আমি খুঁজে নিয়ে আসি।"

"থাক্‌, এর পরে খুঁজো। ও যায়গায় প'ড়ে যাওয়া পৈতে আর গলায় ওঠবার যোগ্য নয়।" বলিয়াই মহিলা একটা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন—"কিন্তু আমি যে বড় মুস্কিলে পড়লুম; খাবার যথেষ্ট থাকতেও তোমাকে যে দিতে ভরসা করি না, ভাই—তোমার নাম কি?"

"শরৎ।"

"দিতে যে সাহস হচ্ছে না, শরৎ! এ দিকে গাড়ী ছাড়তেও ত বিলম্ব নেই!"

"আপনারা কি?"

"কায়স্থ।

"তবে দিতে সঙ্কোচ হবে কেন?"

"শুধু কায়স্থ বলায় ঠিক হ'ল না। আমার স্বামী বিলাত-ফেরত—ব্যারিষ্টার। আমাদের স্পর্শকরা জিনিষ খেতে পারবে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া যুবক বলিল—"কখনও খাইনি।"

"তবে?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার ফাঁকে মুখ বাহির করিয়া মহিলা ডাকিলেন—"মিশির!"

আর মিশির—গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

"আপনি আর ব্যস্ত হবেন না, দিদি, বসুন আপনি।"

"একেবারে যে এক ঘণ্টার বিলম্ব হয়ে গেল, ভাই!"

"বিলম্ব হবে না—আমাকে এখনই কিছু খেতে দিন!"

"দেবো?"

"না দিলে আমি আর বসতে পারছি না।"

"তা ত দেখতে পাচ্ছি।"

"আপনি খেতে দিন।"

"আমাদের খাওয়ার বিচার—একেবারেই নেই নয়—গোঁড়া হিন্দুর মত নেই।"

"না থাক্।"

"দেব?"

"সত্য কথা বলতে কি—আমার কথা কইবার শক্তি পর্য্যন্ত নেই।"

"তবে ওই basketটার ভিতর থেকে তুমিই বার ক'রে নাও। ওতে তোমার যোগ্য খাবার আছে। আর মনে হচ্ছে, আমি ওটাকে এঁটো হাতে ছুঁইনি।"

"আপনিই দিন।"

"দেখো ভাই, আমি যেন অপরাধী না হই।"

মহিলা উঠিলেন, খানিক জল একটা কুঁজো হইতে লইয়া প্রথমটা হাত ধুইয়া লইলেন, তাহার পর একটা ডিস্ বার দুই তিন সেই কুঁজোর জলে ধৌত করিয়া, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাতে খাদ্য সাজাইয়া যুবকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন।

"খাও, ভাই, এতে তোমার জাত যাবার কিছু নেই—পুরি, কচুরি, ভাজি আর গোটাকতক মিষ্টি সঙ্গে এনেছিলুম, আমাদের সঙ্গে এক জনের আসবার কথা ছিল, তাঁর জন্য। তিনি আমাদের মত যা' তা' খান না।"

কোনও কথা না কহিয়া যুবক মহিলার হস্ত হইতে খাদ্য-পাত্র গ্রহণ করিল।

একটু অপেক্ষা, আগে একটু জল দিয়ে গলা ভিজিয়ে নাও। সারাদিনের উপবাস—গলায় আঘাত লাগবার সম্ভাবনা।"

* * * * * * *

অল্পক্ষণের মধ্যেই এই অজ্ঞাতকুলশীলা ভগিনীর অযাচিত স্নেহের উপহারে যুবক আপনাকে পূর্ণ পরিতৃপ্ত বোধ করিল।

"এইবারে দেখাও দেখি, কোথায় কোথায় আঘাত!"

যুবক মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল—"আর দেখাবার প্রয়োজন নেই।"

"সে কি, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, প্রয়োজন আছে। দিদির কাছে অত সঙ্কোচ কিসের জন্য? —শিশিটে?"

যুবক সেটা বাথরুমে ফেলিয়া আসিয়াছিল। আনিবার জন্য উদ্যোগ করিতেই মহিলা বলিলেন—"থাক্, তোমার উঠ্‌তে হবে না, আমি আন্‌ছি।"

৯

Bath room হইতে ফিরিয়া আসিতে মহিলার একটু বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে ট্রেণ পাটনায় আসিয়া পড়িল। আর মুহূর্ত্ত পরেই দ্বার খুলিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল মিশির।

দিদিমণির পরিবর্ত্তে এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত

"হ্যালো—আপ কোন হ্যায় ?"
"কমিশন্যার !"

পুরুষকে বসিতে দেখিয়া প্রথমটা সে অবাক্ হইয়া গেল। সে মনে করিল, দিদিমণির গাড়ী মনে করিয়া অন্তের গাড়ীতে বুঝি উঠিয়াছে। সুতরাং উঠিয়াই সে নামিতেছিল।

নিতুবাবু এই সময় তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তখন সন্দিগ্ধনেত্রে যুবকের দিকে চাহিয়া সে ডাকিল, "দিদিমণি!"

"যাচ্ছি, ভাই" বলিয়াই কতকগুলা কাপড়ের টুক্‌রা ও শিশি লইয়া মহিলা কামরার ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

"দানাপুরে হামাকে ডাকিয়েছিলে?"

"ডেকেছিলুম, ভাই, এই বাবুটির জন্য। উনি আমাদের দেশের গুরুপুত্তুর, হঠাৎ আঘাত পেয়েছেন। খুবই চোট লেগেছে।—এই দেখ,"—যুবকের হাত ধরিয়া মহিলা প্রথমে মিশিরকে বড় আঘাতটাই দেখাইলেন। তাহার পর মাথা, তাহার পর দেহের দুই এক স্থান।

"ভারি চোট লেগেছে, ভাই মিশির!"

মিশির দেখিয়া শুধু নিশ্চিন্ত হইল না, একটু করুণার্দ্রও হইল। সে দিদিমণির দয়াপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে বহুকাল হইতেই পরিচিত। বলিল,—"হামাকে কি হুকুম, দিদিমণি!"

মহিলা যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"Restaurant থেকে একটু stimulant আনতে দিই, ঠাকুর?"

যুবক বলিল—"না।"

"এ সময় খেতে কোনও দোষ নেই। যন্ত্রণার অনেক উপশম হবে।"

যুবক বলিল,—"না দিদি, আমি খাব না।"

"আর কিছু? শীগ্‌গির বল। এখানে আট মিনিট stoppage—সিগারেট?"

ক্ষণেক চুপ করিয়া যুবক বলিল,—"না।"

"তবে যাও, মিশির। ভাল কথা, তোমার কাছে কোনও কুর্ত্তি-উর্ত্তি আছে?"

"দাদাবাবু একঠো সিল্‌কের কামিজ দিয়েছে।"

"শীগ্‌গির এনে দাও, ভাই, ওঁর জামা-কাপড় সব নষ্ট হয়ে গেছে। জল্‌দি—জল্‌দি।"

দ্রুত কামরা পরিত্যাগ করিয়া মিশির ছুটিয়া গেল। মহিলা গবাক্ষের ফাঁকে মুখ বাহির করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হাতে জামা দিয়া মিশিরও চলিয়া গেল, ট্রেণও পাটনা ছাড়িল। মিশির যাইবার সময় মহিলা তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন,—"রাত্রির মত বিশ্রাম নাও। আর তোমাকে আসতে হবে না।"

"মিশির দেখে গেল, ভালই হ'ল," বলিয়া মহিলা এবারে যুবকের একরূপ পার্শ্বেই আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং সিল্‌কের কামিজটা নিজের পার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন, —"আমাকে একটু awkward positionএ পড়তে হয়েছিল। কেন, বুঝেছ? তুমি বাইরে, আমি ভিতরে। ও এসে তোমাকে দেখতে পেলে আমাকে দেখতে পেলে না, ও আমাদের old servant. নিতুকে ত মানুষ করেইছে, আমাকেও ও কাঁধে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। ওর কাছে একটু মিথ্যে কইতে হ'ল। একে বলে lie circumstantial —অশ্বত্থামা হত ইতি গজ—কি বল?" বলিয়া মহিলা হাসিয়া ফেলিলেন।

যুবক মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, মহিলার প্রশ্নে মাথা তুলিয়া বলিল—"ওকে দেখে আমারও অবস্থা ঐ রকম হয়েছিল। একটি কথাও আমি মুখ থেকে বার কর্‌তে পারি নি। ও যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ত, আমি কে, তা হ'লেই আমাকে মুস্কিলে পড়তে হ'ত।"

"তা কি সে কর্‌তে পারে! সহবতি চাকর সে, তোমাকে তার দিদিমণির গাড়ীতে দেখেছে। দেখে বুঝেছে, নিশ্চয় এখানে বসবার তুমি অধিকার পেয়েছ। যাক্, আমার ওরূপ কথা বলায় কি কিছু দোষ হয়েছে?"

যুবক উত্তর দিল না। শুধু মহিলার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিতে তাহার অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিল।

"মিথ্যাই বা কেন, সত্যই ত তোমরা দেশগুরু।"

"সে কোন্ সত্যযুগের কথা, দিদি!"

"হুঁ, আজকাল একটু গোলমাল হয়ে গেছে বটে। তা যাক্, সকলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ, সবারই কিছু কিছু হয়েছে। এইবারে দেখাও দেখি, ভাই, কোথায় কোথায় তোমার আঘাত।"

যুবক কেবল হাত দেখাইল।

মহিলা বলিলেন—"হাতও দেখেছি, মাথাও দেখেছি—দেখবো তোমার পিঠ—যার জন্য তোমাকে দানাপুরে নামতে দিলুম না।"

তাঁহার কথার আর কোনও প্রতিবাদ না করিয়া যুবক পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করিল। মহিলা পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তাঁহার দেখা দূর হইতে, সুতরাং স্পষ্টতঃ সমস্ত দেখা হয় নাই। এখন দেখিলেন, দেখিয়া শিহরিলেন। পৃষ্ঠে এমন স্থান নাই, যেখানে ফাঁক আছে! প্রায় সর্ব্বত্রই আঘাত-চিহ্ন। বেতের ছড়ির দাগ, অনেক যায়গায় কাটিয়া গিয়াছে।

কেন, কিসের জন্য, এ সব কথা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া তিনি যুবককে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। নীরবে তাহার পৃষ্ঠে ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কেবল হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময়ে বলিলেন—"দেখলুম, তোমার কাপড়-জামা দুই-ই একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে। তা থেকে, যেখানটা যেখানটা ভাল আছে, ব্যাণ্ডেজ করবার জন্য ছিঁড়ে আনলুম। আর যা রইল প'ড়ে, সে টুকরো-গুলোকে ফেলে দিতে হবে।"

"ফেলে দিয়ে আসছি, দিদি।"

"সে আমিই ফেলছি, তুমি ব'স। তুমি আবার রক্ত-হাত করতে যাবে কেন? আমাকে ত এর পর সাবান দিয়ে হাত ধুতেই হবে।"

উঠিতে উঠিতে যুবকের ওঠা হইল না।

পৃষ্ঠে, স্কন্ধে, মাথায়, হস্তে যেখানে যেখানে ঔষধ প্রয়োগ করিবার, করিয়া মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কি রকম বোধ করছ?"

"Volcanic erruption."

এ কথায় মহিলা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতেই তিনি বলিলেন—"বল কি!"

"সর্ব্বদেহটায় যেন আগুন লেগে গিয়েছে!"

"কৈ, একটু উঁ আঁ ত করলে না!"

মৃদুহাসি মুখে মাখিয়া যুবক মহিলার মুখের পানে চাহিল মাত্র। তাহার হাসিতে নিরস্ত না হইয়া মহিলা বলিলেন—"কিন্তু lavataryতে যখন ছিলে, তখন ত করছিলে!"

"আপনি শুনতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি বৈকি। এ দিকে কায-কর্ম্ম কথাবার্ত্তা করছিলুম বটে, কিন্তু মন তোমার দিকেই প'ড়ে ছিল।"

এতক্ষণ যুবক প্রাণহীনেরই মত মহিলার সেবা গ্রহণ করিতেছিল, কিন্তু তাঁহার ঐ এক কথাতেই সে ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া ফেলিল।

মহিলা দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাহার সেই ক্রন্দন দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে তাঁহারও চোখে জল আসিল। আপনাকে সত্বর প্রকৃতিস্থ করিতে গিয়াও দুই ফোঁটা অশ্রু তাঁহার গণ্ডে পতিত হইল।

যুবকের অলক্ষ্যে অঞ্চল দিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত চক্ষু দুটি মুছিয়া তিনি বলিলেন—"ও জ্বালা বেশীক্ষণ থাকবে না। একটু পরে তুমি relief feel করতে পারবে।"

"এখনই feel করছি, দিদি! জ্বালা আর বুঝতে পারছি না।"

"তা হ'লে ব'স, আমি হাত-পা ধুয়ে ফিরে আসি। এর মধ্যে আর কোথাও যদি আইডিন লাগানো বোধ কর, লাগিয়ে নাও।"

"আর প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু আমি জানি, প্রয়োজন আছে।"

যুবক অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

"নিতুবাবুকে দিয়ে তোমার সেবা করাতে পারতুম, কিন্তু ছেলেটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার জন্য ওরও বড় কম anxiety হয়নি।"

"তা হ'লে, দিদি, আমিই আগে ঘুরে আসি।"

"উঁহু, আমাকে আগে যেতে হবে।"

মৃদু হাসির সহিত বলিয়া মহিলা চলিয়া গেলেন।

সে বিচিত্র-চরিত্রার বিচিত্র হাসি যুবকের চক্ষুকে কিছুক্ষণের জন্য নিস্পন্দ করিয়া দিল। তাহার উপর সে দেখিতে পাইল, চলিতে চলিতে তাঁহার অবগুণ্ঠন স্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরিষ্কৃত হস্তে সেটাকে মাথায় তুলিবার তাঁহার উপায় ছিল না।

যদিও মুহূর্ত্ত সময়ের জন্য, তথাপি যুবক দেখিল, তাঁহার গতি মরালের সঙ্গে উপমেয়, তাঁহার বঙ্কিম গ্রীবা, সেমিজে আবৃত থাকিলেও তাঁহার পৃষ্ঠের অপূর্ব্ব গঠন। আর দেখিতে পাইল, মাথায় কতক বদ্ধ, কতক মুক্ত,

বিপুলতায় উচ্ছ্বসিত বিলাতী ধরণে সাজানো কেশ-রাশি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল, ল্যাভে-টারিতে আশ্রয় লইবার সময়ে সেই প্রথম দৃষ্ট ছবি।

চক্ষু দুটা দুইই করতলে দৃঢ়রূপে চাপিয়া সে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

১০

"মাথা তুলবে, না ওই ভাবেই ব'সে থাকবে?"

"আপনি এসেছেন!"

"সে কি এখন!"

"বলেন কি!"

"প্রথমটা মনে করলুম, ডাকবো না, বড়ই ক্লান্ত তুমি বিশ্রাম নিচ্ছ, নাও। তার পর ভাবলুম, তোমার শোবার ব্যবস্থা করতে হবে ত!"

বিস্মিত নেত্রে যুবক তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাহাকে কোনও কথা কহিতে না দিবার জন্যই যেন মহিলা প্রশ্ন করিলেন— "ও কামরায় আর যাবে না?"

"না। আইডিন লাগালে কাপড়খানা নষ্ট হ'তে পারে।"

"তা ঠিক, তা হ'লে একটি বার যে উঠতে হবে। আমি ঐখানেই তোমার বিছানা ক'রে দিই।"

"শুধু একটা বালিস দিলেই চলবে।"

"তুমি ওঠো।"

প্রভুর আদেশ—যুবককে উঠিতে হইল।

"ভাল কথা, জামাটা ইতিমধ্যে প'রে ফেলো। ওটা পেয়েও আমার বড় একটা anxiety ঘুচে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাতঃকালে তোমাকে আমার এ carriageএ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়তো।"

"তা আমিও বুঝেছিলুম।"

"অবশ্য, আমার এ কথায় তুমি মনে কিছু করবে না, আমি জানি।"

"মনে কিছুই করব না, অথবা সমস্তই আমাকে মনে করতে হবে" বলিয়া যুবক কামিজটা পরিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহিলা নিজের শয্যা যেখানে ছিল, সেখান হইতে উঠাইয়া, যুবক যে বেঞ্চে বসিয়াছিল, সেই বেঞ্চে পাতিয়া দিলেন।

যুবক দেখিল, মহিলা নিজের বেঞ্চে একটা মাথার বালিস মাত্র রাখিলেন না, তখন জিজ্ঞাসা করিল— "আপনার?"

"তোমার ভাই সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, আর আমি স্ত্রীলোক। কোম্পানীর দেওয়া এই গদীই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নাও, ভাই, রাত্রি বারোটা বাজে, তুমি বড়ই ক্লান্ত, শুয়ে পড়।'

যুবকের শয়নের যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে শয়ন করিল না। শয্যার উপর বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ঢুলিতে লাগিল। মহিলার যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ হইয়াছে। তাঁহারও শয়নের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শয়ন করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, যুবক বসিয়া আছে। ভাবিলেন, তাঁহর মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যই সে শুইতে পারি-তেছে না।

নিতুর বেঞ্চের পার্শ্বের বেঞ্চে ছিল তাঁহার শয্যা। তিনি সেই বেঞ্চেই শয়ন করিলেন। সেখানে শুইলে যে বেঞ্চে যুবক বসিয়াছিল, দেখা যাইতেছিল না। তাঁহা-রও অবস্থান যুবকের দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

শয়ন করিয়াই তিনি যুবককে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন—"আমি শুয়েছি, এইবারে তুমি শুতে পার, শরৎ।" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন— "শুয়েছ?" কোন উত্তর না পাইয়া তাঁহাকে একবার মাথা তুলিতে হইল। দেখিলেন, যুবক চক্ষু মুদিয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

"ও কি! তুমি এখনও ব'সে আছ?"

"হাঁ দিদি, কোন্ ষ্টেশনে morning হবে, বলতে পারেন? আমার ত বোধ হচ্ছে আসানশোল।"

"না, আমার মনে হচ্ছে বর্দ্ধমান। চার ঘণ্টার উপর late অবশ্য অনেকটা make up ক'রে নিতে পারে। তবু ছ'টার পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে পৌঁছিতে পারবে, আমার মনে হয় না। কিন্তু এ প্রশ্ন তোমার মনে উঠলো কেন, শরৎ, তুমি কি আমার কথাও off-nce নিলে?"

"মনুষ্যত্বের কণাও যদি আমাতে থাকে, আপনার মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য ক'রে তা আমাকে থাকতে নিষেধ করবে।"

"বেশ, সে ত ছ'ঘণ্টা পরে গো, এখন ত ঘুমোও।"

"অদ্ভুত।"

"কে? আমি?"

এতক্ষণ কেহ কাহাকেও না দেখিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল! এইবারে মহিলা উঠিয়া বসিলেন।

"আমি অদ্ভুত?"

"অদ্ভুত। কবি-কল্পনার সীমারও পারে। অন্ততঃ আমি ত কখনও কল্পনায় আনতে পারি নি।"

"কে তুমি, কি করেছ, কি জন্য হয়েছ, এ সব কথা জিজ্ঞাসা করি নি ব'লে?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, ভাই, জানবার জন্য ভারী curiosity হয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম, সেটা আমার wicked cuiorsity, যে curiosity হ'তে Eve কর্ত্তৃক Adamএর পতন হয়েছিল ভেবে curiosityটাকে supperess ক'রে ফেললুম।"

"আপনার এ অদ্ভুত চরিত্র চিরজীবনের জন্য স্মরণীয়।"

"বা! তুমি ত বেশ সাধু ভাষায় কথা কইতে পার দেখছি। বেশ, ভাই, যখন ও কথা তুললে, তখন আমাকে বলতে হবে—আমাকে বোন্‌টি মনে ক'রে।"

"ভগিনী কেন, আপনি মা।"

"ত্যেৎ—মা হ'তে যাব কেন? আমি কি বুড়ী? অনেক বড় বলেছি ব'লে কি আমি বিশ পঁচিশ বৎসরের বড়? বড় মাত্র দু' বছরের। আমার বয়স ছাব্বিশ। আমার যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন আমার ঐ ভাইটি জন্মগ্রহণ করে। সেই বৎসরেই আমার বিবাহ। সেই বৎসরেই matric দিই।"

"আপনি matriculation পাশ করেছেন?"

চক্ষুতারকা ঈষদূর্দ্ধ করিয়া ঈষৎ হাসির সঙ্গে মহিলা বলিলেন—"বাবার শাসনে আমাকে বি, এ পর্য্যন্ত পাশ করতে হয়েছে। বিবাহের পরেই বাবা আমার স্বামীকে বিলাত পাঠিয়েছিলেন I. C, S পাশ করতে—I. C. S. অবশ্য জানো।"

"জানি—Civil Service।"

"Civil Service আর তাঁর হ'ল না। বছর চারেক থেকে তিনি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এলেন। তবে আমার তাতে অনেক সুবিধা হ'ল। আমি ইতোমধ্যে আই এ, দিয়ে ফেল্লুম। এম, এটাও দেবার ইচ্ছা ছিল। বাবা ও মা দুজনেই মারা গেলেন। ঐ ভাইটিকে নিয়ে আমাকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হ'ল—এম, এ দেবার আর সুবিধা হ'ল না। তা যাক্, ঘটনাটা আমাকে বলতে হচ্ছে।"

যুবক করযোড় করিল।

"তা হবে না, ভাই, যখন কৌতূহল উদ্দীপ্ত করলে, তখন অন্ততঃ কিছু না শুনে ছাড়ছি না।"

যুবক উত্তর দিতে পারিল না।

মহিলা আসন ত্যাগ করিয়া যুবকের কাছে আসিলেন এবং যুবকের পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন—"বল, ভাই, না শুনলে আমার ঘুম হবে না, বল!"

আপনার শোনবার একান্ত অযোগ্য।"

"একটু যোগ্যের মত ক'রে বল! সত্যই কি তুমি চুরি করেছিলে?"

যুবক হাসিয়া উত্তর দিল—'করেছিলুম্। তবে তা টাকাকড়ি, হীরে-জহরাৎ নয়।"

"এ সব নয়, তবে কি?"

"একান্ত শুনতেই হবে?"

"তুমি যে শোনবার জন্য আরও আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুললে!"

"আপনার এই অপূর্ব্ব স্নেহ হ'তে যদি বঞ্চিত হই?"

"কখনও হবে না, প্রতিজ্ঞা করছি; তবে আমি বুঝতে পেরেছি।"

মহিলার মুখ গম্ভীর হইল।

দেখিয়া যুবক বলিল—"বললুম ত, দিদি, স্নেহ হারাবো।"

"আমার প্রতিজ্ঞা কি মিথ্যা, শরৎ? তোমার দিদির স্নেহ। ঐ তোমার ভাই নিতু, আর এই তাহার দাদা তুমি। স্নেহ হারাবার ভয় ঘুচে গেল ত?"

উচ্ছ্বসিত অশ্রুপ্রবাহে যুবক উত্তর প্রদান করিল।

"নাও, ভাই, এইবারে শুয়ে পড়। আর আমি শুনতে চাই না।"

"আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিন অন্তর্দাতনায়

ভরা মোগল বাদসাদের মুকুটে কোহিনুরের মত, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত আমাকে উপহার দিয়েছে। আজ থেকে আমার পুরোনো আমিটা ম'রে গেল। তাহার পূর্ব্বাচরণ স্মরণ করতেও এখন আমার ঘৃণা হচ্ছে।"

"আমাকে শোনাবার আর প্রয়োজন নেই" বলিয়া মহিলা উঠিলেন। কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে একটা কথা—এটা শুনতে বোধ হয় দোষ হবে না।"

"জিজ্ঞাসা করুন।"

"সে কি সুন্দরী?"

"সুন্দরীও বটে, বিদুষীও বটে।"

"বিদুষীও বটে!"

"ইংরাজী পড়া ও শুনা যথেষ্ট আছে, তবে পাশ করা নয়!"

"তোমারও কিছু পড়াশুনা আছে তা হ'লে? হাসি কেন? হাসিতে ত আর উত্তর হয় না!"

M. Sc.

M. Sc.?

"Gold medalits P. R. S. দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম, হঠাৎ বাবা মারা গেলেন ব'লে বাধা প'ড়ে গেল!"

"তা ঐ কথা আগে আপনি—"

"ও কি দিদি, আমার এত বড় অপরাধ তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে পারলে না, আর এই তুচ্ছ পাশ—"

সলজ্জভাবে যুবকের চিবুকে হস্ত দিয়া মহিলা বলিলেন —"মাফ্ কর, ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে। তা' হ'লে psychology বল।"

"হাঁ দিদি, modern psychology, আর এই সব ahysiological applicationই হচ্ছে তার medicine."

মহিলা এ কথায় হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না।

যুবক বলিতে লাগিল—"Calcutta Universityর lowest classএর পড়াও শেষ করতে পারি নি। যেটা শেষ করার জন্য আর্য্য ঋষিরা এত ইন্দ্রিয়শাসনের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। সেটা পারি না ব'লে তার অবাধ প্রশ্রয় দেওয়াটাকেই এখন আমরা গর্ব্বের কার্য্য মনে করি।"

"খুব lecture দেওয়া হ'ল, এ বারে শুয়ে পড়" বলিয়া মহিলা বিশ্রাম লইতে চলিয়া গেলেন। যুবকও শয়ন করিল।

যাইবার সময়ে মহিলার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, যুবক শুনিল। শয়ন করিতে গিয়া যুবকের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, মহিলা শুনিলেন।

১১

শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই মহিলা ডুকরিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—

"হাসলেন যে, দিদি?"

"হাসি এল, হাসলুম।"

"অবশ্য তার একটা কারণ আছে?"

"কারণ এমন বিশেষ নেই। আমরা এত কাণ্ড করলুম, নিতু কিছু জানতে পারলে না।"

"নিতু ভাই জেগে থাকলে আরও আনন্দ হ'ত।"

"জেগে থাক্‌বার ঢের চেষ্টা করেছিল, পারলে না। স্বাস্থ্যের হানি হ'তে পারে ব'লে জাগালুম না।"

"ভালই করেছেন।"

"আচ্ছা শরৎ—"

"বলুন।"

"না, থাক্। তুমি হয় ত দুষ্য মনে করবে।"

"ইচ্ছা হয়ে থাকে, বলুন, দিদি!"

দিদি কিন্তু কিছুই না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। শরৎও আর কোনও কথা কহিল না।

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। যেন উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ট্রেণও অবিরাম চলিয়াছে।

ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থামিল।

"এটা কোন্ ষ্টেশন, শরৎ?"

"জানতে হ'লে উঠতে হয়।"

"না, প্রয়োজন নেই। এত শীগ্‌গির মোকামা নয় নিশ্চয়ই।"

গাড়ী থামিল ও ছাড়িল। উভয়েরই বুঝিতে বাকী রহিল না, ষ্টেশন মোকামা নয়। সেখানে ট্রেণ আধ ঘণ্টার উপর দাঁড়ায়।

অল্পক্ষণ পরেই মহিলা আবার হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু শরৎ এবারে কোনও কথা কহিল না।

"অবশ্য, তুমি যে ঘুমিয়ে পড় নি, এটা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।"

"ঘুম এখনও আসে নি, দিদি!"

"কি অদ্ভুত রাত্রি; মনে পড়ছে আর আমার হাসি পাচ্ছে। এক এক বার ইচ্ছা হচ্ছে, অবশিষ্ট রাত্রিটে ভাই-বোনে গল্প ক'রে কাটিয়ে দিই। কিন্তু একটু ঘুমুতে না পেলে কাল আর তুমি উঠতে পারবে না।"

"আমি উঠিতে পারি আর না পারি, আপনার শরীর অসুস্থ হবে নিশ্চয়ই।"

"ওঃ! ভাইয়ের আমার কি দয়া!"

এতক্ষণ দুই জনের যে কথোপকথন হইতেছিল, কেহ কাহাকেও না দেখিয়া।

আবার উভয়েই নীরব। ট্রেণ আর একটা ষ্টেশন পার হইয়া গেল। এই বারে তাহা মোকামায় পৌঁছিবে। মহিলা শায়িত অবস্থাতেই বাম হাতটা একটু তুলিয়া ঘড়ী দেখিলেন।

"কত বাজলো, দিদি!"

"এখনও তুমি ঘুমোও নি" বলিয়া মহিলা উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, তাঁহার বেঞ্চের দিকে মুখ করিয়া কাত হইয়া শরৎ শুইয়া আছে। উঠিতেই তার মুক্ত চোখের উপর চোখ পড়িল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"আমি ত তোমার জন্য একটু ব্রাণ্ডি আনতে চেয়েছিলুম, ভাই; জানি, তোমার ঘুম হবে না।"

"সে জন্য নয়, দিদি, ঘুম আসতে চাচ্ছে, আসতে দিচ্ছি না। আমার ইচ্ছা, এই মোকামাতেই নেমে যাই।"

এই কথা শুনিয়াই মহিলা গম্ভীর হইলেন—বলিলেন, "বেশ, যেতে ইচ্ছা একান্তই যদি হয়ে থাকে—"

"ওরূপ ভাবে বললে, দিদি, আমার ত যাওয়া হয় না। যাবার জন্য আমার মনুষ্যত্ব আমাকে উৎপীড়িত করছে।"

"যাবার যোগ্য তুমি, এতটা সুস্থ নিজেকে মনে করছ?"

"না, দেহ খুবই অসুস্থ, কিন্তু মন—তার অসুস্থতার তুলনায় দেহ যথেষ্ট সুস্থ।"

"সঙ্গে কিছু আছে?"

"কিছু না।"

"তবে? কি সাহসে নেমে যাবে?"

"সাহস আমার—ভগিনী।" শরতের মুখ হইতে 'মা' কথা বাহির হইতেছিল।

"মা ব'লে তৃপ্তি পাও, তাই বল। আমার সন্তান হবার সম্ভাবনা খুব অল্পই আছে। না প্রসব ক'রে তোমার মত পরম সুন্দর, পরম পণ্ডিত সন্তানের যদি মাতৃত্ব পাই, সেটা যে আমার অমূল্য লাভ, শরৎ!"

শুনিতে শুনিতে যুবকের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বলিতে বলিতে যুবতীর গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিল। বুঝি, অন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন মাতৃত্ব অবকাশ পাইয়া অকস্মাৎ প্রবল-বেগে তাঁর হৃদয়টাকে আক্রমণ করিয়াছে।

ঘুমন্ত নিতু বেশ বড়গোছের একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল। শুনিয়াই তিনি আবার মৃদুহাস্যে সুন্দর শান্ত মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া বলিলেন, "শুনে নিতুর অন্তরাত্মার রাগ হয়ে গেল, শরৎ, তার মায়ের স্নেহের আর এক জন অংশীদার হচ্ছে দেখে। ওকে প্রসব ক'রেই মা মারা যান। এই দশ বৎসর আমিই ওকে পালন ক'রে আসছি। ও আমাকে মা বলেই ডাকতো। বছরখানেক বলা ছাড়িয়েছি।— কায নেই, ভাই, তুমি আমার ভাই-ই হও। তা না হ'লে ঐ ছোট্ট নিতুটি হবে তোমার মামা। সে শুনতে বড় awkward হবে। বড় দিদির ত মায়ের পাশেই স্থান।"

"আচ্ছা দিদি।"

"আর ঐ শান্ত নিতুটির মত ঘুমিয়ে পড়। যে ষ্টেশনে সকাল হবে, ইচ্ছা হয়, নেমে যেও। দিদির এ সেবাটাকে পণ্ড ক'র না।"

"আচ্ছা। রাত্রি কত?"

"একটা বাজতে মিনিট তিন।"

"তোমাকেও কিন্তু ঘুমুতে হবে, দিদি।"

"নিশ্চয়, ভাই।"

৩২

"এটা কোন্ ষ্টেশন, শরৎ?"

"ঝাঁঝা।"

"উঁহু, মধুপুর।"

"না দিদি।"

"বাজি? হাজার টাকা।"

"হারলে ভাইটিকে দিদির ব্যাঙ্কেই চেক কাটতে হবে।"

"কোনও আপত্তি নেই।"

বলিয়াই মহিলা শায়িত অবস্থাতেই শার্সির মধ্য দিয়া ষ্টেশনটা যেন বিশেষভাবেই দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

"না হে ভাই, আমারই যে হার হয়ে গেল—ঝাঁঝাই ত বটে! ঐ যে ঝাঁঝার পাহাড়।"

"রাত?"

"জানবার কোনও প্রয়োজন নেই—ঘুমোও! ভাল কথা—গায়ের ব্যথা?"

"ব্যথার কথা আর মনে ক'রে দিও না, দিদি!"

"আমি যে পূর্ব্বেই তোমাকে একটু brandy গ্রহণ করতে অনেক অনুরোধ করেছিলুম, ভাই।"

"তা হ'লে, দিদি, আমার ব্যথা একেবারেই নেই।"

"জানতুম আমি, একটু পরেই বেদনায় তোমাকে কষ্ট পেতে হবে।"

"যতটা মনে করছেন, তত নয়। আইডিনে বিশেষ উপকার করেছে।"

"ঘুমোও।"

১৩

"দিদি, দিদি, দিদি!"

"কি ও—কে—ও—শরৎ? আমরা বর্দ্ধমান এসেছি?"

"বর্দ্ধমান নয়, আসানসোল। এইখানেই ভোর হয়ে গেল।"

"তাই ত, ভাই, সমস্ত রাতটা জেগে শেষকালটায় ঠ'কে গেলুম—আমাকে তোমায় ডেকে তুলতে হ'ল।" এইখানেই কি নেমে যেতে ইচ্ছা কর?"

"বর্দ্ধমানে পৌছিতে ঢের বেলা হবে।"

"একটু ব'স।"

"গাড়ী অনেকক্ষণ থেমেছে।"

"থামুক, তুমি ব'স" বলিয়া মহিলা শরৎকে ধরিয়া বসাইলেন এবং নিজে আসন ছাড়িয়া নিতুর শয্যাতলে রক্ষিত নোটের তাড়া বাহির করিলেন।

"এই নেও, ভাই, দিদির স্নেহোপহার।"

তাড়া খুলিতেই যুবক অবাক্ হইয়া তার দিদি'র মুখের পানে চাহিল। কথা ত তার মুখ হইতে বাহির হইলই না, চক্ষুও কিছুক্ষণের মত নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

"তোমাকে দেবার যোগ্য উপহার নেই ব'লে দিতে পারলুম না। এইতে ইচ্ছামত যে কোনও জিনিষ কিনে নিও।"

"না না না।"

"হাঁ হাঁ হাঁ। কথার প্রতিবাদ ক'র না, শরৎ—তুমি আমার ক্রীতদাস। উপহার বলতে কুণ্ঠিত হও, মনে কর, এটা এই অপূর্ব্ব রাত্রির চিরস্মরণীয় আনন্দ-উপভোগের দক্ষিণা। তুমি ত ব্রাহ্মণ, দক্ষিণায় তুমি ত 'না' বলতে পার না।"

"ব্রাহ্মণ? চণ্ডালের চেয়েও অপবিত্র অন্তর নিয়ে আমি আপনার এই গাড়ীতে প্রবেশ করেছিলুম—চণ্ডালকেই বা অপবিত্র বলা আমার মত হীনের অধিকার কি? আমি—"

"আর লেক্‌চার দিতে হবে না, first whistle বেজে উঠলো। ভাল কথা—" বলিয়াই মহিলা গাত্রাবরণের ভিতর হইতে একখানা টিকিট বাহির করিয়া যুবকের হস্তে দিলেন।

নমস্কার—প্রতি-নমস্কার! কাহারও মুখে আর কথা নাই! গাড়ী হইতে অবতরণ করার মুখে যুবক একবার ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল—"আপনার—"

"দিদির নাম কি জানতে চাচ্ছ? তা হ'লে যে একটু বসতে হয়, ভাই! আমার নামের একটা ইতিহাস আছে।"

"না দিদি, আর শুনবো না। তোমার নাম করুণা।"

"তোমাকে মুক্তি দেবার ইচ্ছা ছিল, দিলুম না। আবার কি একটা কাণ্ড ক'রে বসবে!"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল, যে যার পানে চাহিয়া রহিল।

"দিদি!"

"কি রে ভাই, উঠেছিস্?"

"কালকের সে লোকটা?"

"কে লোক রে?"

"বা!"

"তুই বোধ হয় স্বপ্ন দেখেছিস্, নিতু।"

"বা! স্বপ্ন দেখবো কেন?"

"তবে বোধ হয়, আমিই স্বপ্ন দেখেছি।"

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

কোণের ঘর

তার পর চল্‌তে চল্‌তে সে পাখী ?

পাখী আবার চলে না কি ? কি বিশ্রী গল্প তোমার !

চলে না ত পাখী করে কি শুনি !

পাখী ওড়ে, পাখী বলে—

পাখী—ওড়ে আর বলে সে
যাবো আজ দূরদেশে—

ভারি ত তোমার গান, সুর নেই—খালি কথা—বিশ্রী !

তোমারি বা গল্পের ছিরিটা কেমন——মাথা নেই কথা !

রাজকন্যের কথা শুনে রাজপুত্র ভারি রাগ ক'রে উঠে চ'লে যান ঘর ছেড়ে। রাজকন্যা সে গোঁসা-ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে প'ড়ে থাকেন,—তিন দিন, তিন রাত উপোস করেন, কিন্তু রাজপুত্র ফেরে না ! শেষে সখী এসে গোঁসা ভাঙ্গায় কন্যের—খায় দায় কন্যে আর থেকে থেকে কাঁদে, রাজপুত্রের কথা মনে করে। ও-ধারে রাজপুত্র ঘোড়ায় চ'ড়ে উধাও—

কে জানে কোন্ খানে
মন তার কে টানে !

দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল, বছর গেল ঘুরে, তার পর আরও কত দিন গেল, লাখ কথার পরে লক্ষহীরের দেশ থেকে ফকির রাজপুত্র ফিরে এলেন ! এসেই রাজকন্যাকে বিয়ে—লাখ টাকা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব যৌতুক নিয়ে !

ছেলে হ'ল, নাতি হ'ল, পুতি হ'ল, সেই সঙ্গে সেই সে দিনের রাজপুত্র রাজকন্যা বুড়ো হয়ে সংসার কর্‌তে কর্‌তে হয়ে পড়লো—এক মস্ত দাড়িওয়ালা মহারাজা সে, আর পাকা চুলে সিঁদুর পরা মহারাণী তিনি !

মহারাজা সোনার পালঙ্কে আড় হয়ে, তাকিয়া হেলান দিয়ে, নবরত্ন-মালা জপ করছেন, মহারাণী পুরু গদিমোড়া সুখাসনে ব'সে এক দুই তিন মেজরাণী সেজরাণী ছোটরাণীর সঙ্গে পান্না আর মতী চুনি আর নীলার ঘুঁটি নিয়ে দশ পঁচিশ খেলতে আছেন, এমন সময় মহারাজার ছোট নাতি —যেন জরীর সাজ পরা ছোট খাটো হাতী—রাজা মহাশয়ের গলা জড়িয়ে ব'ল্লে, গল্প বল না, আজা ভাই !

মহারাজা দাড়ি মুচড়ে গোঁফে তা দিয়ে সুরু করলেন—সে কি আজকের কথা, তখন চাঁদটা ছিল ভারি সাদা আর সূর্য্যিটা ছিল ভারি লাল !

ছোট নাতনী একটা এই সময়ে কোথা থেকে এসে গল্প শুন্‌তে ব'সে গেল,—ভারী সুন্দরী—সে রাজার গলা জড়িয়ে ব'ল্লে চাঁদ ছিল, সূর্য্যিও ছিল !

. ছিল বই কি ! চাঁদটি ছিল ঠিক কেমন ধারা জানো ? -

"না" বলেই নাতনী চুপ করলে।

রাজার নাতি সে দেখতেও মোটা, বুদ্ধিতেও মোটা ; ব'লে উঠলো, আমি দেখেছি,—কেমন ছিল সে চাঁদ ঠিক আজা ভাইয়ের দাড়ির মত সাদা—!

রাজা ঘাড় নেড়ে বল্লেন, হল না, রংএ মিল্লো, রূপকে মিল্লো না একেবারেই ; যাও, আমি গল্প বলব না ! নাতনী রাজার গলা জড়িয়ে ব'ল্লে, আমি বলব। চাঁদ ছিল ঠিক যেন রাণীদিদির হাসি হাসি মুখটি ! - রাজা বল্লেন, হ'ল না হ'ল না !—

রাণী সতরঞ্চের একটা ঘুঁটি কেটে বল্লেন, কেন ঠিক হবে না,'ও ত ঠিক উপমা দিয়েছে !

রাজা বল্লেন, আগে বুঝি তুমি দেখতে ছিলে চাঁদের মত ! তোমার চোখ দুটো ছিল ঠিক ঐ আমার পোষা হরিণটার চোখের মত একেবারে কাজল মাখা, আর দাঁতগুলি ছিল ঠিক দাড়িমের বিচ, আর ঠোঁট দুটো ছিল একেবারে তেলাকুঁচ ফল আর চুল ছিল কাকের পালকের মত কালো মিস্ আর—

'যাও যাও' ব'লে মহারাণী মাথার ঘোমটা টেনে বল্লেন—আচ্ছা, না হয় তোমারি মত দেখতে ছিল চাঁদটা, মিছে বোকো না, খেল্‌তে দাও !

ধমক খেয়ে রাজা চুপ, রাজার কোলে নাতনী পিঠে নাতি কাঠের পুতুলের মত স্থির, কিন্তু চোখ তাদের বলছে, গল্প বল, গল্প বল, আজা ভাই !

রাজা বেশিক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, সুরু করলেন—"তখন চাঁদ ছিল মস্ত, সূর্য্যি ছিল তার চেয়েও মস্ত, তালগাছ ছিল তার চেয়েও মস্ত আর রাজা রাণী দুজন

হামাম-বিলাসিনী

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ।

ছিল কিন্তু ভারী ছোট্ট, যেন পুতুল-খেলার রাজা ও রাণী। একটা মস্ত আটচালা ঘরের এক কোণে ছিল তাদের একটা গোঁসাঘর, আর এক কোণে ছিল খাজনাঘর; আর দুটো কোণ, তার একটায় ছিল খাঁচায় ধরা এক পাখী, অন্য কোণে ছিল একটি বীণা—সোনার তার বাঁধা বীণা; সে যেন সোনার তারে ঘেরা পাখী। রাজার ভাব পাখীর সঙ্গে আর রাণীর ভাব বীণার সঙ্গে!

রাজার পাখী রাজায় বলে—"এক দিন আমি চলব!" "বলি কোথায় চলবে?" পাখী বলে—"সে অনেক দূরে—ঐ সে ও কোণে, যেখানে আর এক পাখী ডাকাডাকি করে আমায় থেকে থেকে!"

"বলি ঐ অত দূর! পাখী, তুমি চলতে পারবে কি? শক্ত মাটী বেদনা বাজবে পায়ে পায়ে চলার বেলায়।" পাখী তবু বলে চলব! বলি কত আর ঠেকাই পাখীকে!

এক দিন নিরালা ঘরে যে কোণে যা সব আছে; কেবল রাজরাণী দুটিতেই নেই সেখানে। কেন নেই, তা এখন আর মনে পড়ে না। হয় ত বীণা বাজাত যে রাজার মেয়েটা, সে গোঁসা-ঘরে খিল দিয়ে ছিল, হয় ত পাখী পুষেছিল যে রাজার ছেলে, সে আপনার খাজনা-ঘরে ব'সে ব'সে কেবলি গুণতে ছিল মোহর আর টাকা টাকা আর মোহর। সেই সময় পাখী খাঁচা খুলে চলতে সুরু করলে—পায়ে পায়ে পায়ে এ কোণ থেকে ও কোণ!

খাঁচায় ধরা নাচন পাখী, সে উড়তে জানে না, এ কোণ ছেড়ে ও কোণে চ'লে যায় নেচে নেচে—তার সে গোপন-পাখীর নাগাল চেয়ে নাচন-পাখী বাঁধা বীণার তারে তারে পাখা বুলিয়ে সাধে—"এস না, এস না।"

গোপন-পাখী, সে কি আর লুকিয়ে থাকে, বুক তার নাচন পাখীর ডাক শুনে সুরে কাঁপে রীরী তারই ঝিনিক লাগে বীণার তারে আর সেই নাচন-পাখীর নাচনে।

ঠিক সেই সময় সেই কোণে খুট ক'রে গোঁসা-ঘরে খিল খোলে, আর এই কোণে খিট ক'রে খাজনা-ঘরের চাবি ফেরে—রাজা বার হন এক দিক থেকে, রাণী বার হন আর এক দিক দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হব হব। সেই সময় আনিকে আমাদের আজা এক আনা পয়সায় চির-কালের মত কিনে ফেল্লেন, আর আজাকে তোমাদের আনি—আর বলতে হ'ল না সতরঞ্চ খেলা ফেলে মহারাণী ধা ক'রে বল্লেন—এক কাণা কড়িতে, এটা কি একটা গল্প না কথা, মাথা আর মুণ্ডু হচ্ছে।

রাণীর ঝগড়ার রকম দেখে নাতি-নাতনীরা হেসে বাঁচে না, ঠিক সেই সময় রাজার বিদূষক এসে উপস্থিত—গোলগাল নধর যেন গণেশঠাকুরটি। গল্প গেল তল, বিদূষকের চেহারা দেখেই হাসির রোল উঠল। হেলতে দুলতে বিদূষক মোটা-সোটা রাজার নাতিটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "এ কেমন হ'ল জানেন মহারাজ, এ যেন—'মৌক্তিকং ন গজে গজে'।"

রাজা তামাসাটা ঠিক না বুঝে ব'লে উঠলেন, "তোমার রহস্য রাখ, গল্পের রসভঙ্গ করো না বলছি।"

মহারাণী ব'লে উঠলেন, "এমনি ভাঙ্গে যা, তেমন শক্ত রকম রসকথা না-ই বলতে, এতক্ষণ ধ'রে কেবল বাজে বকাই হ'ল তোমার।"

রাজা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বল্লেন, "বারে বারে বাধা দিলে গল্প কখন চলে?"

রাণী শ্লেষ ক'রে বল্লেন, "তোমার গল্প যতটা চলবার চলেছে, এ কোণ আর ও কোণ, তার বেশী আর চলবে না, গল্পের পা আছে না কি যে চলবে?"

"আচ্ছা, পা নেই ত চলুক উড়ে এবারে গল্প" বলেই রাজা সুরু করলেন—"ঐ যে পাখী পড়েছিল না-দেখা পাখীর ভালবাসায়, ঐ যে সে নাচন-পাখী চলেছিল এ কোণ থেকে ও কোণ, ঐ যে বলেছিল বীণার তারে ডানার ঝাপটা দিয়ে দিয়ে—এস না, এস না, সেই পাখী আর সেই বীণা—তাদের কথা আর মনে পড়ল না, রাজা খুসি হলেন এক আনি রাণী পেয়ে, আর আনি তিনি নাতী পেলেন, স্বর্গে দেবার কত বাতি জল্লো, ঘরে ঘরে অন্দরে সদরে, তবে আনি খুসি হলেন কি না, তা তাঁর মুখ দেখে বোঝাই গেল না। তিনি একেবারে গম্ভীর হয়ে পড়লেন মহারাণী হওয়া মাত্রেই। রাজা ভাবেন—এ কি সেই সে দিনের যাকে আনি বল্লে মানেই বুঝত না, বলত, কি আনবে?—সোনার ময়ূর না পান্নার গাছে যে মুক্তোর ফল খায় পাখী, তাই? এ কি সেই না আর কেউ?

আর রাণী ভাবেন—এ কি আমার সেই রাজা, সাত সমুদ্রপারে যেতে যে ডরাত না, এ কি সেই, না আর কেউ গির্দা ঠেসান দিয়ে পড়েই আছে, নড়েও না, চড়েও না?

এ খোঁজে সেই সে দিনের রাজা ও খোঁজে সেই সে দিনের রাণী,—পায় না। মস্ত বড় নতুন রাজবাড়ী। একখানি পাতর তার পুরোনো নয়—সব নতুন। ঝাড় লণ্ঠন গালচে দুলচে নতুন নতুন বদল হচ্চে দিনে দিনে; পুরোনোর একটি কুটোও পাওয়া যায় না সেখানে। তারই মধ্যে রাজা-রাণীর চুল পাকলো খুঁজে খুঁজে সেই পুরোনো দিনের রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে। রাজপুরী ভ'রে উঠলো নতুন নতুন লোকজন আত্মীয়স্বজনে; পুরোনোর স্থান হ'ল না সেখানে একটুও।

হঠাৎ এক দিন রাজার কি হ'ল, আধারাতে তিনি স্বপ্নের ঘোরে বল্লেন—"আচ্ছা, সে ঘরটা?" রাণী ভয় পেয়ে "বল্লেন, কোন্ ঘর কি বলছো তুমি?" রাজা উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। রাণীর সারারাত আর ঘুম এল না, কেবলই মনে হ'তে লাগলো—সে ঘরটা!

সেই যে পুরোনো আটচালা—যার এক কোণে গোঁসা-ঘর, অন্য কোণে খাজনা-ঘর, সে কোণে পোষা পাখী, ও কোণে বাঁধা বীণা, সে ঘর খুঁজতে রাজা বার হলেন যুদ্ধের ঘোড়ায়। রাণী চল্লেন চতুর্দ্দোলে। দেশে বিদেশে খুজে হায়রাণ—কোথাও নেই সে পুরোনো ঘর। হতাশ হয়ে নতুন রাজাবাড়ীতে বসেন বুড়ো রাজা-রাণী। রাজা বলেন —"হায় আমার সে সোনার খাঁচা!" রাণী বলেন -"আহা, আমার সে বাঁধা বীণা!" রাজপণ্ডিত—তিনি থেকে থেকে উপদেশ দেন দুজনকে 'গতস্য শোচনা নাস্তি।'

রাজা-রাণী পণ্ডিতের কথায় কানই দেন না; খোঁজা-খুঁজি চলে সব কায ছেড়ে। রাজমিস্ত্রীরা মাটী খুঁড়ে পুরোনো ঘরটা খোঁজে, নতুন ভিত ভেঙ্গে দেখে—পুরোনো ঘরটার নাগাল পায় কি না। রাজমন্ত্রীর বেশী বুদ্ধি, তাই তিনি চুপি চুপি রাজমজুর খাটিয়ে একটা নতুন ঘর তুলে তাকে আবার ধুলো-কাদা দিয়ে ঠিক পুরোনো করে, চার-কোণা ঘরটাকে ভাঙ্গা বীণ, ভাঙ্গা খাঁচা, মরচে-ধরা তালা, উইপোকায় খাওয়া সিন্দুক দিয়ে বেশ ক'রে সাজিয়ে রাজা-রাণীকে ভুলিয়ে দেবেন ভেবে মহাসমারোহে এক দিন দুজনকে সেখানে নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু পুরোনো করা নতুনে কায হবে কেন? মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ল।

পণ্ডিত হারল, মন্ত্রী হারল, ডাক পড়লো তখন চিত্র-করের। পাকা পোটো সে, কামরূপের মন্তর-জানা পোটো, মনের মতোকে ধরার রঙ্গীন ঝুলি কাঁধে সে ফেরে দেশে দেশে। রাজা-রাণীর দুঃখ দেখে সে বল্লে,"মহারাজ, মহারাণী, আমার সঙ্গে চোখে কাপড় বেঁধে চ'লে আসুন, দেখাবো সেই ঘর।" চোখ বেঁধে রাজা-রাণী চলেন দিনের পর দিন—কিছুই দেখেন না। শুধু দিনই যায় এইটুকুই জানেন তাঁরা। থেকে থেকে রাজা শুধোন, "ওহে চিত্রকর, আর কত দিন?"পোটো বলে, "দর্শন হ'ল বলে।" এই হ'তে হ'তে হঠাৎ এক দিন রাজা-রাণীর চোখের পর্দ্দা খুলে যায়। দুজনেই দেখেন, সেই কত দিনের ঘরখানিতে অন্ধকারের মধ্যে চিত্রকর সে কোথায় স'রে গেছে দুজনকে একলা রেখে! রাজা রাণীর হাত ধ'রে বলেন, "আনী;" রাণী রাজার গলা ধ'রে বলেন—"এই যে আমি।" অন্ধকারে সেই সে পাখী ডাকে—"এস না এস না!" বীণার তার সেই আর এক গোপন-পাখীর ডাকে রীরী করে, মনে হয় যেন—সে যে কি মনে হয়, কেউ বলতে পারে না।

মুক্তি কোথায় ?

কে তুমি অনন্তের পথে চলিয়াছ ? অনন্তের পথে তুমি কাহার সন্ধানে চলিয়াছ ? কোন্ সুন্দর পুরুষ তোমার মনোহরণ করিয়াছেন ? দিকে দিকে ত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহাতেও কি তুমি তৃপ্তিলাভ কর নাই ? আরও সৌন্দর্য্য চাহ ? আমি বুঝিয়াছি—কেন তুমি এত সৌন্দর্য্যের মধ্যেও অতৃপ্তির খুঁৎ-খুঁতানি লইয়া বাস করিতেছ। তুমি এক জন পুরুষ—ইচ্ছাশীল, জ্ঞানবান্ ও সৌন্দর্য্যবোধবিশিষ্ট পুরুষ; তোমার এই সমস্ত জড় অচল সৌন্দর্য্যতৃপ্তি আসিতেছে না। তুমি চাহ—নিত্য সচল পুরুষের সৌন্দর্য্যে নিজের সৌন্দর্য্যবোধকে ডুবাইয়া দিয়া আপনাকে নিত্য নব রসে অভিষিক্ত করিতে। ভাল; কিন্তু সেই আসল সুন্দর পুরুষের পূর্ণ সৌন্দর্য্য যদি তোমার সম্মুখে সহসা প্রকাশিত হয়, তাহাই কি তুমি দেখিতে পাইবে ? পাইলেও তুমি তাহা ধারণা করিতে পারিবে না—তোমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। অনন্ত সুন্দর পুরুষের সন্ধানে তুমি যাইতেছ—যাও। কিন্তু তোমাকে আমি একটি রহস্য বলিয়া দিই। সেই সুন্দর পুরুষের আদেশে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে যাইয়া ব্যথা পাইয়াছেন, আহত হইয়াছেন, এমন অনেক ত্যাগী পুরুষ তোমার যাত্রাপথের দুই ধারে দেখিতে পাইবে। তাঁহাদের চক্ষুর দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিও—দেখিবে, সেই চক্ষুর ভিতর হইতে কি বীর্য্য, কি তেজ, আর সেই সঙ্গে কি মাধুর্য্য, কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে ! তাঁহাদের সেই অটল অচল ধৈর্য্যপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতেই সেই মহান্ সুন্দর পুরুষের সকল সৌন্দর্য্যের সুন্দর প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে।

প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে ত সেই মহাসুন্দরের হাতের ছাপ মুদ্রিত আছে। কিন্তু সকল সময়ে সকল অবস্থায় সেই ছাপ আমাদের মনোযোগ ভালরূপ আকর্ষণ করিতে পারে না। অনেক সময়েই আমাদের দৃষ্টি সেই ছাপের উপর নিপতিত হইলেও কেমন সহজেই পিছলাইয়া যায়; কিন্তু অবস্থাবিশেষে পিছলাইয়া না যাইয়া আটকাইয়া যায়। প্রলয়ের অনুবোধক ঘোর অন্ধকার নিশীথের গগন আচ্ছাদিত রাখে। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন সেই অন্ধকার কনক-তপনের অরুণ-কিরণের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে দৃষ্টিসীমাস্থ কুজ্ঝটিকার আকারে একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতে থাকে এবং অরুণ-তপন যখন বিজয়ীর বেশে আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়, তখন সেই আবির্ভাবের মধ্যে সুন্দর পুরুষের সুন্দর হাতের ছাপ কত সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় এবং আমাদের মনকে তাহার দিকে সবলে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখে। তাই মনে হয়—বুঝি বা, যেখানে রুধিরাক্ত প্রলয়ের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে, সেই স্থানেই শ্যামল সৃষ্টির নবীন ভাবের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য উঁকিঝুঁকি মারিয়া ব্যাকুলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। তাই বুঝি কবিরা বলেন যে, সৃষ্টি ও স্থিতির ভিতরেও যাঁহার সুন্দর হাতের ছাপ দেখা যায়, প্রলয়ের ভিতরেও তাঁহারই সুন্দর হাতের ছাপ দেখা যায়।

প্রলয়ের ভিতরেও যাঁহার গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তুমি কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ? প্রলয়পয়োধি ভেদ করিয়া যিনি এই সৃষ্টিকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন, নিজের সৌন্দর্য্যধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য তুমি এ-দিক্ ও-দিক্ বৃথা ছুটাছুটি করিতেছ কেন ? যে দিকেই তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই ত প্রতি অণু-পরমাণুরই ভিতরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তবু আমি তোমাকে একটি গুপ্তরহস্যের সন্ধান দিতেছি। তুমি যাহাদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা কর, যাহাদের মুখ দেখিলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা আশঙ্কা কর, সেই সকল পাপীদের মধ্যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের চরণে যাহারা আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহাদের ভিতরে সেই মহান্ সুন্দর পুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আত্মনিবেদিত পাপীর মধ্য দিয়াই তিনি সব চেয়ে বেশী আত্মপ্রকাশ করেন। পাপীর মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ দেখিলে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া তাঁহার সন্ধান করিবার প্রয়োজন হইবে না।

পাপীর ভিতরেও এই প্রকারে ভগবানের আত্মপ্রকাশ দেখিলে কেবল যে তীর্থে তীর্থে ঘুরিবার প্রয়োজন হইবে না, তাহা নহে; কেবল যে তাঁহাকে নির্জ্জনের ভিতরে, আর গভীর ধ্যানের মাঝেই স্বপ্রকাশ দেখিতে পাইবে, তাহা নহে; তখন তুমি তাঁহাকে হাটে-ঘাটে-বাটে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই স্বপ্রকাশ দেখিবে; তখন তুমি

তাঁহাকে নির্জ্জনের ন্যায় সজনেরও ভিতরে প্রত্যক্ষ করিবে; তখন তুমি তাঁহাকে ধ্যানের মত কর্ম্মের প্রবল ঝঞ্ঝনার ভিতরেও উপলব্ধি করিবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে—কবীর কেন গাহিয়াছেন,—

"পাণিমে জীন পিয়াসী রে—
লোক শুনত শুনত লাগে হাসি রে।"

যখন তুমি তাঁহাকে এই প্রকারে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবে, তখনই তুমি তাঁহাকে প্রিয়তম বলিয়া জানিতে পারিবে। তখনই উপনিষদের ঋষিদের মত তোমারও নিকটে তিনি "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"—পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্য সকল হইতে প্রিয়তমরূপে প্রকাশিত হইবেন। তখন আর তোমার এই জিজ্ঞাসার অবসরই আসিবে না যে, তোমার প্রিয়তম আছেন, কি নাই? তখন ত তিনি তোমায় চতুর্দ্দিকেই মহাসত্যরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবেন—তোমায় "নাই" বলিতে দিবে কে? তখন তুমি সুখসমুদ্রের ভিতরেও যেমন তাঁহার বরাভয়-প্রদ দক্ষিণ-হস্ত দেখিতে পাইবে, তেমনই দুঃখ-বিপদের ভিতরেও সেই রুদ্রদেবেরই প্রসন্ন বদন দেখিয়া ধৈর্য্যে ও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে অটল অচল হইয়া থাকিবে।

সেই অটল অচল শ্রদ্ধা-ভক্তি লইয়া যখন তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন তোমার সে বল, বীর্য্য ও তেজের সম্মুখে দাঁড়াইবে, কাহার সাধ্য? তখন তোমার রসনা অগ্নিময় হইয়া উঠিবে; তখন তোমার প্রতি বাক্য চতুর্দ্দিকে অগ্নিকণা ছড়াইতে থাকিবে। তখন তুমি কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া যদি নিহতও হও, তবে ত তোমাকে অভিনন্দন করিয়া সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য দেবগণের মধ্যে উলুধ্বনি পড়িয়া যাইবে। জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসান উভয়ের প্রতি সমচিত্ত হইয়া যখন তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে পারিবে, তখন তুমি সংসারে জয়ী হইলেও জয়ী, আর পরাজয় লাভ করিলেও জয়ী। তখন তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—অনন্তকাল ধরিয়া তোমার বিজয়ঘোষণা করিতে থাকিবে।

তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিলে ত বিজয়ী হইবেই; কিন্তু এই সর্ব্বস্ব নিবেদন করা কখন্ সহজসাধ্য হয়, তাহা কি জান? আবার একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান দিতে অগ্রসর হইতেছি—অনধিকারীর নিকটে সহজে এই সন্ধানের সংবাদ দিও না। সুখসম্পদ যখন তোমার হাতের কাছে আসিয়া বিকশিতদন্তে হাস্য করিতে থাকিবে,—ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও—তখন তুমি "তাঁহার চরণে এই সর্ব্বস্ব নিবেদন করিলাম" বলিয়া বাহিরের লোক-দেখানো ভড়ং করিলেও কিছুতেই সত্য সত্য সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে পারিবেই না। সত্য বলিতে কি, তোমার প্রিয়তম সেই লোক-দেখান পূজা গ্রহণ করিতে আসিবেনই না। কিন্তু, যখন দুঃখ-জ্বালার তীক্ষ্ণধার করাত তোমার হৃদয়ের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া একটা গুপ্ত স্থান প্রস্তুত করিবে এবং সেই স্থানটি যখন তুমি অশ্রুবিধৌত করিয়া সুমার্জ্জিত করিবে, তখনই দেখিবে, তোমার প্রিয়তম কোথা হইতে গুপ্তভাবে আসিয়া সেই গুপ্ত স্থানটি তোমার অজানত অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন এবং অন্য কথা দূরে থাকুক, তোমার দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেও তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন।

তিনি যখন তোমার সেই নিবেদিত অশ্রু গ্রহণ করিবেন, তখন সেই অশ্রুই যে তাঁহার আশিসরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমার অন্তরে বজ্রের বল প্রদান করিবে। অশ্রু তাঁহারই বলের কণা লাভ করিয়া বজ্রের বল ধারণ করিবে। তুমি ত জান যে, তাঁহার বলক্রিয়া লুকান নাই—প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে তাহা স্বপ্রকাশ। সেই বল-ক্রিয়ার প্রভাবে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতেছে। সেই বল অপ্রতিহত—কাহার সাধ্য যে, তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়, তাহাকে প্রতিহত করে? সেই বলের অধিকারীই যখন তোমার অন্তরে আসন গ্রহণ করিবেন, তখন দুঃখ-দৈন্যই বা কোথায়, নিরাশা-নিরানন্দই বা কোথায়? তখন তুমি স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, ইহা খুবই সত্য কথা যে, তিনি অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল; তিনি অনাথের নাথ। তখন তোমার মন-প্রাণ নিশ্চয়ই আশায় ও আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিবে। তখন তোমাকে দুঃখ-ক্লেশ ব্যথা দিতে পারিবে না; কর্ম্মের ভীষণ গর্জ্জনও তোমার অন্তরের নীরবতা ভাঙ্গিতে পারিবে না। তখন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, যেখানে প্রাণিমাত্রের চিহ্ন

দৃষ্ট হয় না, যেখানে নীরবতা মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিত্য বিদ্যমান, সেখানেও তুমি। আবার সমতল ভূমির কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, যেখানে কোলাহল-কলরব, দুঃখ-দৈন্যের ক্রন্দন-হাহাকার নিত্য জাগ্রত, যেখানে সংসার-সংগ্রামের উত্তাল-তরঙ্গ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বজ্রধ্বনি করিয়া তোমায় গ্রাস করিবার বিভীষিকা প্রদর্শন করে, সেখানেও তুমি। তখন তুমি পথহারা পথিকের শ্রান্তি-ক্লান্তির মধ্যে, তাহার হতাশ প্রাণে অতুল বল-বীর্য্য ও শক্তি-সামর্থ্য ঢালিয়া দিয়া সহজেই তাহাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিবে।

তখন তোমার অন্তরে একটা বিরাট বিপুল স্বাধীনতার বিমল বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং তাহার প্রতি হিল্লোল মুক্তির অপূর্ব্ব সুগন্ধ বহন করিয়া আনিবে। তখন তোমার অন্তরের সুষুপ্তি বিদূরিত হইবে এবং জাগিয়া উঠিবে—এক বিরাট—মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি।

সুখের চরম

আজি মনে পড়ে, নাথ, পূর্ব্বকথা যত—
কোথা তুমি, কোথা আমি — বিধির ঘটনে
কেমন মিলিনু দোঁহে — পূর্ণ অনুগত
হইলাম পরস্পর — ভেদ নাহি মনে।

তার পর কত দিন বাহুর বন্ধনে
বাঁধিয়াছ অধিনীরে সোহাগে যে কত,
কি মধু দিয়াছ ঢালি' মধুর চুম্বনে,
ত্রিদিবে নাহিক কিছু বুঝি তার মত।

কিন্তু হয় নাই, নাথ, পূর্ণ মোর সুখ
জাগিছে হৃদয়ে মোর অতৃপ্তি বিষম —
তব কোলে মাথা রাখি' দেখি' চন্দ্রমুখ
মরিবারে পারি যদি মৃত্যু মনোরম,
বাসনার পরিতৃপ্তি, মরণে কৌতুক,
সেই দিন হবে মোর সুখের চরম।

বিবিধ বিচিত্র চিত্রে করি নেত্রপাত।
বুঝহ কাঙ্গালী কেন বাঙ্গালীর জাত॥

প্রেম-কাব্য !
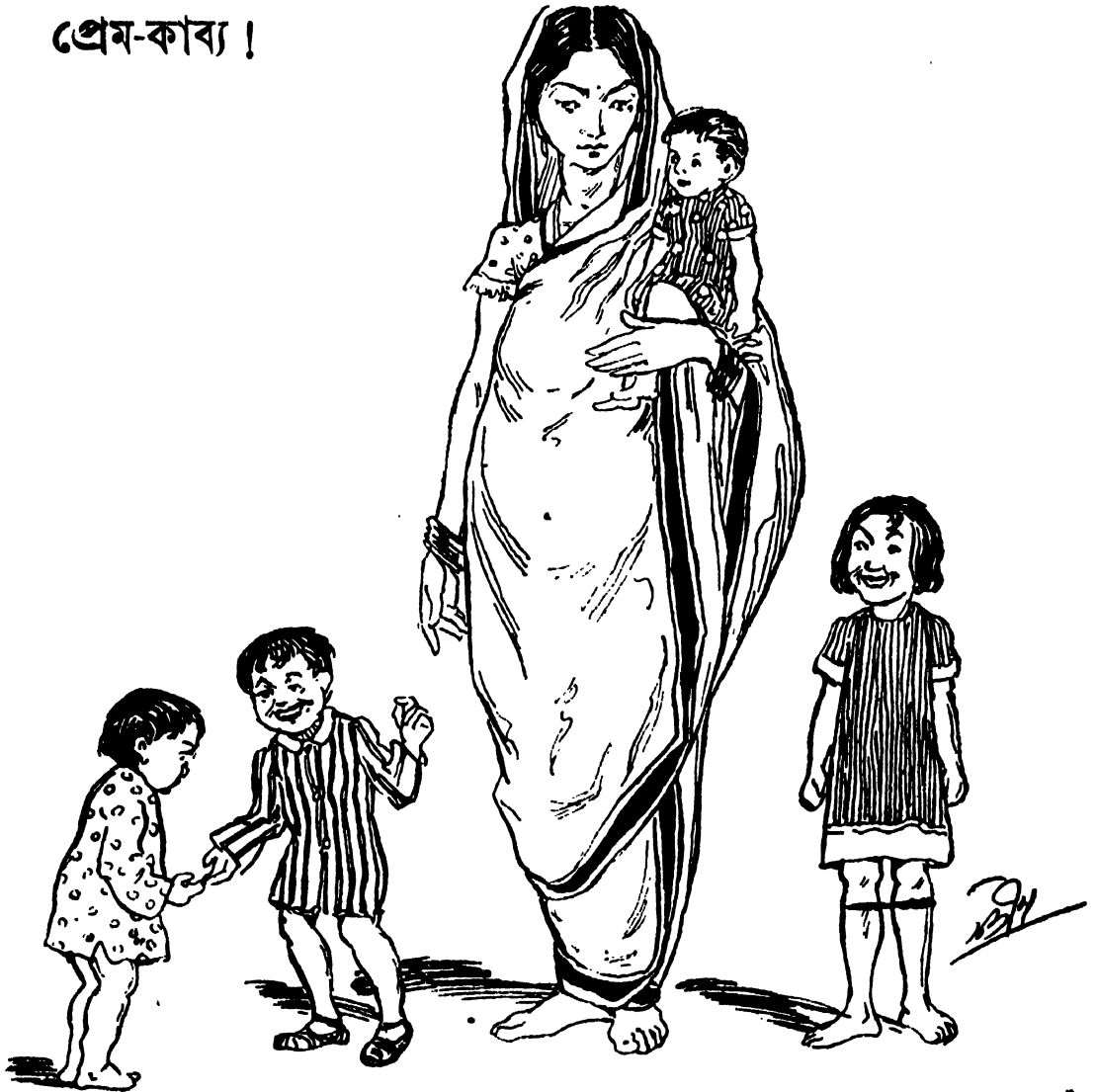
জয় জয় জয় মা ষষ্ঠীর জয়।
ষোল বর্ষে তিনটি হাঁটে একটি কোলে —বক্ষে যক্ষ্মা-ভয়॥

শিশুপাল-বধ কাব্য !

‘উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।’
বয়ের ঝুড়িতে মন করহ নিবেশ ॥

খেলা-ধূলা হাসি-খুসি দিয়ে বিসর্জ্জন।
হামা দিতে দিতে ভাবো কিসে উপার্জ্জন

উমেদারী কাব্য।

পাশ ফাস সমঝি না মুই এম এ, বিএ, আই-এ।
তিনটি মাস লেখবা 'আডোর' ঘরের ভাত খাইয়ে॥

সূঁচি-প্রবেশ কাব্য !

কাপড়া বেচতা পাওভি দাবতা পয়লা কলকাতা আকে
ওহি বাবু আভি কাবু—পরদেশী জুড়ি হাঁকে ॥

বিবর্ত্তন-কাব্য !

উনকা লেড়কে মোটর চড়কে বাবু বনা আজ।
বাবা এক রোজ পায় দাবায়া ছেলিয়া চাহে সোফিয়ারকা কাজ ॥

নীতি-কাব্য।

বাবা তাবা ঢের দেখেছি ভুঁড়ি দেবো ফাঁসিয়ে।
টাকা আদায় কর্ত্তে জানে ছেলে তোমায় শাসিয়ে॥

কেরাণী-কাব্য !

হাতে সূতো বেঁধে বিয়ে ক'র্ত্তে হয়নি লাজ
গণ্ডা-ভরা অপগণ্ড ক্ষিদেয় মরে আজ ॥

অপসারণ-কাব্য !

পাদোদক জলের তরে দোরে যে দিয়েছে ধন্না
চৈত্র মাসে মৈত্র মশায় যারে করেচেন ঘেন্না ॥
তারি চিত্র নেত্র খুলে দেখ অন্য পত্রে ।
গোত্র ভুলে মিত্র-পুত্র হাত বুলুচ্চেন গাত্রে ॥

সমাদর-কাব্য।

দাড়ি ধরে হীরে হাড়ির করচেন কত আদর।
চাচ্চেন বারো গণ্ডা আরো বেশী বেচিয়ে গায়ের চাদর॥

বাবু-কাব্য !

টা টা করচে বাড়ী সুদ্ধ, উপোস করচে ঠা।
ফতো বাবুর চলচে চুরুট, উনুনে চোয়ানো চা ॥

উদ্বন্ধন !

দান-সাগর সাজিয়ে দেছেন তবু যোড়হস্ত।
কন্যা দেবেন ধনের গাদায় গাধায় এক মস্ত ॥

গৃহ কাব্য।

"এখনো দেখেছি অনেক পাজিতে,
বাপেরে বলে না তামাক সাজিতে,
যদিও বাসন মাজিতে তারা বসে গো আপন মায় ;
দাসী যবে প্রেয়সীরে হেসে সাবান মাখায়।"

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

বিসর্জ্জন

দুইখানি যাত্রী-গাড়ী দুই দিক্ হ'তে
জনশূন্য ষ্টেশনের প্রদীপ্ত আলোতে
বিপরীত পথগামী—দাঁড়াইল আসি';
কলিকাতামুখী এক, অন্যখানি কাশী।

তখন গভীর রাত্রি; বারোটাই বাজে;
ভাঁটা প'ড়ে আসিয়াছে চলাফেরা কাযে।
জানালায় ব'সে আছি, ঘুম নাই চোখে,
সহসা পড়িল দৃষ্টি উজ্জ্বল আলোকে

একখানি কচি-মুখে—যেন পরিচিত!
সমস্ত বুকের রক্ত করিয়া স্পন্দিত।
একেবারে পাশাপাশি দুইখানি গাড়ী—
হাত দুই ব্যবধান মাঝে শুধু তারি।

তরুণী বসিয়া একা বাতায়নে তার
জাগর নয়ন দু'টি মেলিয়া এ ধার।
সহসা চকিত মোর দৃষ্টি বিনিময়ে
আঁখি দুটি তারো যেন ভরিল বিস্ময়ে!

আর রহিল না বাকী; বুঝিনু নিমেষে,
পাঁচটি বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত বিদেশে
তারি সাথে হয়েছিল বিবাহের কথা;
কি জানি কি বিঘ্নে হ'ল প্রতিবন্ধকতা!

তখন লক্ষ্ণৌয় মোরা থাকি পাশাপাশি,
কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচিত; উভয়ে প্রবাসী।
প্রতিবেশী পরিবার, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ;
ঘনিষ্ঠতা এত বেশী জিনি আত্মজন!

কিন্তু এ কি! এ যে দেখি বৈধব্যের বেশ,
কুঞ্চিত নিতম্বচুম্বি তরঙ্গিত কেশ!
এ যে দেখি, স্কন্ধে পড়ে ভুজঙ্গের মত;
সদা হাস্যভরা দৃষ্টি ব্যথা অবনত!

জগতে অনেক সত্য কল্পনা অধিক—
ঘটিবার পূর্ব্বে কেহ বুঝে না তা ঠিক!
বিস্ময়ে বিস্মিত করি স্তব্ধ করি' মোরে,
শুধাইল সহসা সে নমস্কার ক'রে—

হে বন্ধু, আছ ত ভাল? বহু বহুদিন,
তোমার পাইনি দেখা; বড় ভাগ্যহীন;—
মোর কথা শুধায়ো না—একা আমি আজ;
এবারের মত মোর ফুরায়েছে কায!

এ কি কথা! সেই শৈল; কি কহিব আর,—
কি না সে পারিত হ'তে জীবনে আমার!
সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, সব চেয়ে বেশী,
সকল সম্বন্ধবাড়া সেই পরদেশী!

এই শৈল! এ যে মোর জীবন অধিক,
যৌবন বসন্তে মোর কলকণ্ঠ পিক;
এ নিঃসঙ্গ জীবনের পথের দোসর,
সেই প্রিয়া আজি মোর পর হ'তে পর!

নিষিদ্ধ তাহার সঙ্গে মুখের আলাপ,
করস্পর্শ তার—সে ত অতি বড় পাপ!
চাহিবারও অধিকার নাহি বুঝি ফিরে',
যে ছিল প্রাণের রাণী, সে আজি বাহিরে!

এই এত কাছে মোর, হাতটি বাড়া'লে,
হৃদয় থাকে না আর হৃদয় আড়ালে;
ওই ত সম্মুখে মোর পিপাসার বারি,
মুহূর্ত্তে তৃষ্ণার জ্বালা নিবাইতে পারি!

চমক ভাঙ্গিয়া গেল ফিরে' তারি ডাকে,
প্রাণপণে রুদ্ধ করি' বিদ্রোহী আত্মাকে!
ত্বরিতে নামিয়া দ্রুত গেনু তার পাশে,
শুধানু দু'চারি প্রশ্ন অবরুদ্ধ ভাষে।

কি বেদনা, কি আঘাত ওইটুকু প্রাণে,
সমাজ জানে না তাহা, ধর্ম্ম শুধু জানে!
নিরুপায়—প্রাণ যায়, তবু উপবাসী—
তাই সে সর্ব্বস্ব ছাড়ি চলিয়াছে কাশী!

তাই যাক্—তাই হ'ক্, শান্তি যদি পায়,
বিশ্বনাথ পদে আজি অর্পি আপনায়!
তাই হ'ক্—না ঘটুক কোন পরিবাদ,
ছিন্ন ধুতুরায় হোক্ শিবেরই প্রসাদ।

অশ্রুপ্লুত চারি চক্ষু মৌন বেদনায়,
গাড়ী ছাড়িবার সাড়া পড়িল ঘণ্টায় !
মনে নাই শেষ কথা - কি বলিয়া হায়,
কেমনে বিদায় দিনু প্রাণ-প্রতিমায় !

পড়িল শেষের ঘণ্টা ; আসিলাম ফিরে' ;
কাশীর যাত্রীর গাড়ী ছাড়ি গেল ধীরে—
দেবভোগ্য ভোগ বহি' ত্যাগের শ্মশানে ;
বিধাতার অভিপ্রায় বিধাতাই জানে।

তাই যাক্—এ জগতে কে না ব'ল যায়,
সার্থক ত সেই যাত্রা, লভে যা' বিদায় !
আপনারে বিসর্জ্জিয়া বিশ্বের বিধানে—
পড়িল দ্বিতীয় ঘণ্টা ; আরোহিনু যানে।

তখন শেষের রাত্রি—ভোরের বাতাসে,
সর্ব্ব অঙ্গ, দেহ, মন হিম হয়ে আসে !
দৃষ্টি নাহি চলে চোখে ; হায়—হায়—হাওয়া,
হাহাকারে হারাইয়া শেষ ফিরে' পাওয়া।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

যাই

ওগো আমার মনে কে আছে - আমি চাই না
দীন মলিন পাণ্ডুর — এত কেন কেন চাহি গো।
এত দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ দিবস
এত ধূলার ধূসর বসন বিবশ
এত কাঁদি কাঁদি ঐ দুয়ারে আছি মোর পথ চাহি গো
তার কেঁদে বিফল এত না কামনা
এত না সাধনা সঞ্চিত,
তার এত না আশায় কেঁদে বিফল নিরাশ
এত বাসনায় বঞ্চিত ;
আজি মনে পড়ে আমার বধূর
সেই প্রিয় মুখ মলিন মধুর
আজি আমার প্রাণ [illegible] আকুল অধীর প্রায় গো

[illegible]
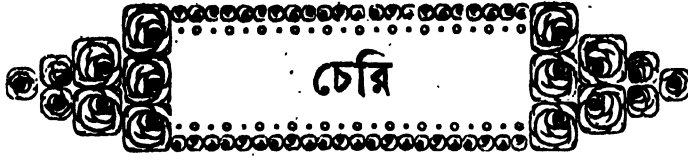
চেরি

ছবির মতন আঁকা কাননেতে হেরি,
কিবা সে সুন্দরী মেয়ে পাড়িতেছে 'চেরি' !
বিলাতী বেগুণে রং, গোলাপীর ছিটে
কপোলেতে খেলে তার সুধাভরা মিঠে।
পথে যেতেছিল তথা ধনী মস্ত লোক—
দেখে তারে ফিরাইতে পারিল না চোক।
ভুলে গিয়ে নিজ কাম পথধারে এসে
কাছে তা'র আসি ধনী বলে ভালবেসে—
"ওই যে বাদাম গাছ, উহার ছায়ায়
চল গো বসিব মোরা বসন্ত হাওয়ায়।

ওইখানে দেখিছ যে চারু ঘরখানি,
করে' দিব ওইখানে তোমারেই রাণী ;
রবিকরে শোভে যেথা কত শত ফল
বাগানেতে কত রঙ্গে করে ঝলমল।"
এই বলে' দিল তা'রে চেরিগুলি পেড়ে—
বনের সরলা বালা হাত থেকে কেড়ে
হাসিয়া লইল ফল - বলে, "থোলো থোলো
দিব সব মা'র কাছে, সেইখানে চল।

মা তোমারে বাড়ী আর দিবেনাক যেতে ;
ঝরণার জল সেথা বড় মিষ্টি খেতে—
পাহাড়ে পাহাড়ে মোরা ছুটে ছুটে যাব,
সেথায় বনের গান দু'জনায় গা'ব।
হেথা হ'তে চল সেথা, দূর নয় বেশী
কাননে মেঘেতে সেথা হয় মেশামেশি।"
এত ব'লি হাত ধরি, ল'য়ে গেল তা'রে
সরলা বালিকা সেই বনের ও-পারে।

বুড়ী মা'র এক মেয়ে—হ'তে দেখি' দেরী
কত কি ভাবিতেছিল, হেনকালে 'চেরি'
অঞ্চল ভরিয়া আনে, শোভে রং নানা—
হাতটি ধরিয়া কা'র অচেনা অজানা।
ত্বরায় ছুটিয়া এসে, মা'র মুখ চুমি
বলিল মধুর স্বরে—"খেতে দাও তুমি
এরে ; যা' দেখিছ সব এ দিয়েছে পেড়ে
গত গাছে চেরি ছিল পাকা পাকা বেড়ে।"
সে লোকের মুখপানে নিরীক্ষণ করে'
মা তা'র ভাবিল ঠিক—রাজপুত্র ধরে'
কোথা হ'তে আনে তা'র দুষ্ট সেই মেয়ে !
জিজ্ঞাসিল বুড়ী তা'রে—"তোর সাথে কে এ,
নিবাস নগরে কোন্, কোথা এর ঘর ?"
মেয়েটি বলিল তা'রে—"ভাবিনাক পর,
এ যে মোর আপনার র'বে সাথে সাথে,
যেখানে আমরা যাব রাজী আছে তা'তে ;
মোদের দেবতা যিনি সতেজ নূতন
এ যে সেই বনদেব মনের মতন।"
মা তা'র বলিল তা'রে—"বাঞ্ছিত যে ফল
পেয়েছিস্, হ'ক চির জীবন সফল।
পাহাড়, বনের গাছ, ঝরণা ও নদী
সকলি তোদের, সুখে থাক নিরবধি।
এই যে ব্রততীখানি বাঁধি দিনু করে
অক্ষয় বন্ধন হবে দোঁহে চিরতরে।" *

* 'চেরি' শীতপ্রধান স্থানের ফল—যেমন সুস্বাদু, তেমনি সুন্দর ; কাশ্মীর অঞ্চলে ও য়ুরোপে প্রচুর জন্মে। পাঠক এই গল্পটিতে 'চেরি'র সেই সুমিষ্ট রস উপভোগ করিবেন।

MOHONBAGAN MATCH RESUL

-AFTER THE RESULT.

সংবাদ অনুসন্ধানে

(মোহনবাগানের জিত হয়েছে দেখে "ইয়ং" কর্ত্তাটি ডাকলেন তাঁর গিন্নীকে খপর দেখবার জন্যে)

'LOOK HERE WIFE!'

"--ও গিন্না, দেখে যাও!"

সুশীলা না পিপুলা ?

(গল্প)

ভাগলপুরে আমার পিতা ওকালতী করিতেন, সেই স্থানেই আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ।

আমাদের বাড়ী হইতে অল্প ব্যবধানেই পিতার বন্ধু আর এক জন উকীলের বাড়ী ছিল। তাঁহার নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকালে আমি তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায় প্রতিদিনই খেলা করিতে যাইতাম। চন্দ্রনাথবাবুকে আমি কাকা মশাই ও তাঁহার পত্নীকে কাকীমা বলিতাম। কাকী-মা'র তখনও কোনও সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি আমাকে খুবই যত্ন করিতেন;—কোলে বসাইয়া আমাকে মিঠাই খাওয়াইতেন, মুখ ধোয়াইয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া আমায় পাউডার মাখাইতেন। চলিয়া আসিবার সময় চুমো খাইয়া বলিতেন, "আবার কাল এস, বাবা।" মা আমায় মারিলে, কাকীমা'র কাছে গিয়াই আমি নালিশ করিতাম। তাঁহার উপর আমার আব্দার ও মান-অভিমানের সীমা ছিল না।

কিন্তু কাকীমা'র গৃহে আমার এই অত্যধিক আদর অধিক দিন রহিল না। আমার বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন তিনি স্বয়ং জননী হইলেন,—একটি আধটি নয়—একসঙ্গে দুই দুইটি কন্যা তিনি প্রসব করিয়া বসিলেন। ইহাকেই বলে, "রামজী যব দেতা তব ছাপ্পর ফোড়কে দেতা।" আমি তখন সাত বৎসরের বালক হইলেও, ঘটনাটি বেশ স্মরণ আছে। তাহার অল্পদিন পুর্ব্বেই আমি ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম।

যাহা হউক, কাকীমা'র কন্যা দুইটি দিন দিন "শুক্ল-পক্ষের শশিকলার" মতই বাড়িতে লাগিল। আমিও ক্লাসের পর ক্লাস উঠিতে লাগিলাম। আমি আর বড় একটা কাকী-মা'র বাড়ী যাই না। একটু বড় হইলে, তাঁর মেয়ে দুটি আমাদের বাড়ী খেলা করিতে আসিতে লাগিল। একটির নাম সুশীলা, অপরটির নাম পিপুলা বা প্রফুল্লনলিনী। একে ত যমজ ভগিনী, কোন্‌টি কে, চেনাই শক্ত—তার উপর আবার তাদের মা দুষ্টামী করিয়া দুইটিকে একই রকমে সাজাইতেন। দুইটির চুল ঠিক একই রকমে বাঁধিয়া, একই রঙের একই ডিজাইনের ফ্রক দুইটিকে পরাইতেন, জুতা-মোজা পরিলে তাহাও ঠিক একই রকমের হইত। আমাদের বাড়ীতে দুইটি প্রায় একসঙ্গেই আসিত। কখনও একটি একলা আসিলে বাড়ীর সকলেই জিজ্ঞাসা করিত—"সুশীলা না পিপুলা?" যে আসিত, সে নিজের নামটি বলিত।

আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে একটি ফুল-ফলের বাগান ছিল, আমি কখনও সুশীলাকে, কখনও পিপুলাকে, কখনও উভয়কে সেই বাগানে লইয়া যাইতাম। সকল ফলের মধ্যে পেয়ারাটাই ছিল তাহাদের অত্যন্ত লোভের বস্তু। পেয়ারা পাড়িয়া দিতাম, উভয়ে খাইত। কখনও স্বহস্তে পেয়ারা পাড়িবার আব্দার লইত—পাকা পেয়ারা খুঁজিয়া তাহার নিম্নভাগে দাঁড়াইয়া, একে একে উভয়কে আমি কাঁধে তুলিয়া বসাইতাম, তাহারা আনন্দকলরবে পেয়ারা পাড়িত।

তখন আমার পৈতা হইয়া গিয়াছে—বয়স বারো বৎসর। সুশীলা পিপুলা পাঁচ। এক দিন আমার সাক্ষাতেই কাকীমা মাকে বলিলেন, "সুশীলা কি পিপুলা, একটিকে ভাই তোমায় নিতে হবে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত, ছিলে খুড়ী, হবে শাশুড়ী।" বারো বৎসর বয়সের সকল ছেলে এই কথোপকথনের অর্থ বুঝিতে পারিত কি না, জানি না; কিন্তু আমি জলের মতই বুঝিয়াছিলাম; বাল্যকালে আমি বোধ হয় একটু অকালপক্কই ছিলাম। পরদিন স্কুলে গিয়া,

ক্লাসের বুজম ফ্রেণ্ড হরিগোপালকে জলখাবার ঘরের নিকট একাকী পাইয়া চুপি চুপি বলিলাম, "ওরে আমার যে বিয়ে।"

হরিগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কবে রে, কবে?"

বলিলাম, "তা জানিনে, ভাই। বোধ হয়, বড় হ'লে, পাসটাস করলে।"

হরিগোপাল তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "ধুৎ, সে ত ঢের দেরী। কোথায় সম্বন্ধ শুনি? কার সঙ্গে?"

"চন্দ্রবাবুর মেয়ের সঙ্গে।"

"সেই সুশীলা পিপুলা?"

"হ্যাঁ।"

"কোন্‌টার সঙ্গে?"

"তা এখনও জানিনে, ভাই। তুটোর মধ্যে একটার সঙ্গে।"

"তা, তোর কোন্‌টাকে পছন্দ শুনি।"

"তা কি জানি, ভাই, তুটোই ত এক রকম।"

হরিগোপাল আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড়। সে তখন সিগারেট খাইতে ও নভেল পড়িতে শিখিয়াছে। এ সব বিষয়ে আমার চেয়ে সে ঢের বেশী বিজ্ঞ। হরিগোপাল গম্ভীরভাবে বলিল, "তোর মা-বাপ যদি তোকে জিজ্ঞাসা করেন, তুই সুশীলাকে বিয়ে করবি, না পিপুলাকে বিয়ে করবি, তুই কি উত্তর দিবি, শুনি?"

"তাই ত, ভাই, কি উত্তর দেবো, ব'লে দাও।"

হরিগোপাল গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "এর মধ্যে আসল কথা কি হচ্ছে, জানিস?"

"কি?"

"আসল কথা হচ্ছে ভালবাসা। অনেক নভেলে আমি পড়েছি, ভালবাসা ভিন্ন বিয়ে হ'লে সে বিয়েতে সুখ হয় না। এখন তোকে খোঁজ নিতে হবে, কে তোকে বেশী ভালবাসে —সুশীলা না পিপুলা! যে তোকে বেশী ভালবাসে, তাকেই বিয়ে করবি—এ ত সোজা কথা।"

"আচ্ছা" বলিয়া আমি ক্লাসে চলিয়া গেলাম।

পরদিন রবিবার ছিল; সুশীলা-পিপুলা আসিলে আমি তাহাদিগকে বাগানে লইয়া গিয়া, ফুল ও ফল উপহার দিয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোরা তুজনের মধ্যে কে আমায় বেশী ভালবাসিস, বল্‌ দেখি? যে আমায় বেশী ভালবাসে, তাকেই আমি বিয়ে করবো।"

পিপুলা বলিল, "আমি তোমায় বেশী ভালবাসি, আমায় তুমি বিয়ে কর, সুরোদাদা।"

সুশীলা বলিল, "না সুরোদাদা, ওকে বিয়ে ক'র না— আমি তোমায় বেশী ভালবাসি, আমায় তুমি বিয়ে কর।"

পিপুলা বলিল, "হ্যাঁ, তোকে বিয়ে করবে বৈ কি, তুই সে দিন সুরোদাদাকে কি ভয়ানক কামড়ে দিয়েছিলি, মনে নেই? সুরোদার পায়ে এখনও দাঁতের দাগ রয়েছে।"

সুশীলা মিনতিমাখা অনুতাপের স্বরে বলিল, "আর আমি তোমায় কামড়াবো না, সুরোদাদা, আমাকেই বিয়ে কর, তোমার তুটি পায়ে পড়ি।"

সুশীলা-বিষয়ে পিপুলা-কথিত অপবাদের ইতিহাসটুকু এই;—মাস দুই পূর্ব্বে পেয়ারা পাড়িবার জন্য সুশীলাকে আমি কাঁধে তুলিয়াছিলাম; নামাইবার সময় আমারই অসাবধানতা বশতঃ সে পড়িয়া যায়। এই পতনে রাগিয়া সে আমার পায়ের গোছে এমন কামড়াইয়া দিয়াছিল যে, তাহার সেই ধারালো ৩।৪টা দাঁত আমার পায়ে প্রবেশ করিয়া রক্ত বহাইয়া দিয়াছিল। ঘা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, সে ক্ষত শুকাইতে মাসখানেক লাগে।

বিবাহ জন্য তুই বোনে রীতিমত ঝগড়া বাধাইয়া দিল। অবশেষে সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তখন সান্ত্বনার ছলে বলিলাম, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোরা ঝগড়াঝাঁটি করিসনে, আমি তু'জনকেই বিয়ে করবো।"

২

ষোল বৎসর বয়সে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এম, এ, পড়িতে গেলাম। (তখনও ভাগলপুরে কলেজ খোলে নাই।) কালক্রমে বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ল ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম।

ছুটীতে বাড়ী আসিয়া দেখিতাম, সুশীলা-পিপুলার সেই একই ভাব—অর্থাৎ কোন্‌টি কে, চিনিবার উপায় নাই। ১০।১১ বৎসরের হইলে তাহারা আর ফ্রক পরিত না—শাড়ী পরিত; কিন্তু তখনও তাদের মা, তুইটিকে একই পাড়ের শাড়ী ও জামা প্রভৃতি পরাইতেন। স্থানীয় বালিকা-বিত্তালয়ে তাহারা পড়ে। স্কুলের গাড়ী আসিলে হিন্দুস্থানী দাই নামিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করে—"মনে আছে ভাই?"—ভিতর হইতে বালিকারা উত্তর দেয় "সীতারাম"—

এবং বহি-সেলেট লইয়া বাহির হইয়া আইসে,—ইহাই ছিল সেই বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রচলিত সঙ্কেত।

এ কয় বৎসর প্রথম প্রথম সুশীলা-পিপুলা আমার সহিত পূর্ব্বের মত মিশিত বটে, কিন্তু যতই তাহারা বড় হইতে লাগিল, ততই মিলামিশা কমিয়া আসিতে লাগিল। প্রথম প্রথম আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় তাহাদের জন্য কিছু কিছু খেলনা, ছবির বই প্রভৃতি উপহার আনিতাম, শেষ দুই বৎসর আর কিছু আনি নাই। এখন তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে বড় একটা বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না, কদাচিৎ আমাদের বাড়ী আসিলে তাহারা মা'র কাছে গিয়া বসিত; কদাচিৎ আমি তাহাদের বাড়ী গেলে কাকীমা'র সঙ্গে বসিয়া খানিক গল্প করিয়া চলিয়া আসিতাম।

পূজার ছুটী ফুরাইতে আর দুই তিন দিন মাত্র বিলম্ব আছে। দ্বিপ্রহরে আহারের পর আমি একখানা উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম; অপরাহ্লে ঘুম ভাঙ্গিলে মা আসিয়া আমার কক্ষে বসিলেন। দুই চারি কথার পরেই আসল কথাটি পাড়িলেন—"বাবা, ছেলেবেলা থেকে তোর ও বাড়ীর কাকীমা'র ইচ্ছে, সুশীলা পিপুলা একটির সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, এ কথা তুই জানিস ত?—অনেক সময়েই ঘরে এ কথা আমরা বলাবলি করেছি।"

আমি বলিলাম, "জানি বৈ কি, মা।"

"এ বিষয়ে তোর কোনও অমত নেই ত?"

"আমার মতামতের জন্যে আর কি যাচ্ছে আসছে, মা?—তুমি, বাবা যা বলবে, আমি তাই করতেই প্রস্তুত আছি।"

মা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "সে ত জানি, তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে। আচ্ছা বেশ, তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওদের বাপ একটি পাত্র স্থির করেছেন। একটি তাকে, একটি তোকে দিতে চান। সুশীলা পিপুলা দু'জনের মধ্যে কাকে তোর পছন্দ বল্ দেখি?"

কাহাকে আমার পছন্দ, তাহা আমি মনে মনে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলাম। তবু, মা কি বলেন শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"যমজ বোন্ ওরা, দেখতে ত দুজনাই সমান—তোমার কাকে পছন্দ, তাই বল।"

মা বলিলেন, "শুধু যে দেখতে দুজনেই সমান, তাই নয়। দু'জনেরই মেজাজ, ভাবগতিকও সমান। আমি ত বাবা জন্মাবধি ওদের দেখছি—দোষে গুণে দুজনাই ঠিক একই রকমের। তবে, যেন মনে হয়, ওরই মধ্যে পিপুলা একটু অভিমানী। দুজনই অভিমানী, তবে পিপুলা যেন একটু বেশী।"

আমি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি ওদেরই কাহাকেও বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি সুশীলাকেই বিবাহ করিব। ছেলেবেলায় সেই আমায় কামড়াইয়া দিয়াছিল—তাহারই দাঁতের চিহ্ন এখনও আমার পায়ের গোছে বর্ত্তমান; সুতরাং, এক হিসাবে সে নিজস্ব বলিয়া আমায় চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর, এই কামড়ানো অপরাধের জন্য পাছে তাহাকে বিবাহ করিতে না চাই, এই জন্য ৫ বৎসরের সুশীলার সেই ব্যাকুলতা; সেই কান্না—এত দিনেও আমি ভুলিতে পারি নাই—তাহার সেই কচি করুণ মুখচ্ছবি আমার অন্তরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আর একটা কথা, তাহারও নামের আদ্যক্ষর "সু," আমারও নামের তাই, সেই জন্য আমি মনে করিতাম, বিধাতা বুঝি সুশীলাকেই আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তাই মাকে বলিলাম, "ও অভিমানী-টভিমানী দরকার কি, মা, তার চেয়ে সুশীলাই ভাল।"

মা বলিলেন, "বেশ—তাই হবে।"

সুশীলাকে আমি মনোনীত করায় পিপুলা হইল ভেকাণ্ট। পাত্রপক্ষ যথাদিনে পিপুলাকে আসিয়া দেখিয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল। কাকীমা উভয় কন্যার বিবাহ এক দিনেই দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাই হইল। পিপুলাকে যিনি বিবাহ করিলেন, তিনি আমার চেয়ে বছর দুই বয়সে বড়—নাম সরোজনাথ। পাটনায় তাঁহার পিতা জজ আদালতের সেরেস্তাদার—এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর তিনিও পিতার আপিসে চাকরী পাইয়াছেন।

সুশীলার জ্যেঠা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি আমায় সুশীলা দান করিলেন; কাকা মহাশয় সরোজকে পিপুলা দান করিলেন। কন্যাদানের আসন ও ছানলাতলা দুইটি হইয়াছিল বটে—পুরোহিতও দুই জন; কিন্তু বাসরঘর হইল একটিমাত্র। এক বাসরে দুই বর পাইয়া, নিমন্ত্রিতা তরুণীগণ সে দিন আমোদের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন।

আমার অভিপ্রায় ছিল, ফুলশয্যার রাত্রিতে নববধূ আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আমি আমোদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিব—"সুশীলা না পিপুলা?"—কিন্তু আনাড়ী আমি জানিতাম না,—সে সময় বধূর সঙ্গে কয়েক জন নিমন্ত্রিতা পুরমহিলাও আসিয়া থাকেন। সুতরাং প্রশ্নটা মুলতুবী রাখিতে হইয়াছিল। শয়নগৃহ নির্জ্জন হইলে, আমি নববধূর উভয় স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি গো, তুমি সুশীলা না পিপুলা?"

যে বর বাল্যকালে কাঁধে চড়াইয়া পেয়ারা খাওয়াইয়াছে এবং যাহাকে কামড়াইয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করা হইয়াছে—নববধূ হইলেও তাহাকে লজ্জা করা একটু কঠিন বৈ কি!—সে লজ্জা সুশীলা করিল না—দুষ্টামীর উত্তরে দুষ্টামী করিয়া বলিল, "কাকে পেলে খুসী হও?"

আমিই বা দুষ্টামী ছাড়িব কেন? বলিলাম, "পিপুলাকে।"

সুশীলা বলিল, "তাকে কাগে নিয়ে গেছে। এখন আর হায় হায় করলে কি হবে বল?"

সরোজের রঙটা কিছু কালো, তাই সুশীলার এই বক্রোক্তি। পরে শুনিয়াছিলাম, দুই জামাইয়ের দেহবর্ণের পার্থক্য বিষয়ে মেয়ে-মহলে একটু আলোচনা হইয়াছিল। সকলে বলিয়াছিল—"যেমন দুটি বোন্—নিক্তির ওজনে রূপে গুণে সমান জামাই দুটিও সেই রকম হ'লে বেশ হ'ত!"

৩

পরবৎসর, আমি আইন পাস করিয়া ভাগলপুরেই ওকালতী সুরু করিলাম।

সুশীলা বেশীর ভাগ আমাদের বাড়ীতেই থাকিত। মাঝে মাঝে "ও-বাড়ী" যাইত। উভয় ভগিনী একত্র হইলে কাকীমা—অধুনা শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী—মেয়ে দুইটিকে পূর্ব্বের ন্যায় আর সমান সাজে সাজাইতেন না।

আমি আটপৌরে জামাই—পাছে অজ্ঞাতে কোনও গোলমাল করিয়া ফেলি, ইহাই বোধ করি, তাঁহার আশঙ্কা ছিল। শ্বাশুড়ীর এই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন কিন্তু অধিক দিন রহিল না। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এক দিন সংবাদ আসিল, সরোজ পাটনায় হঠাৎ কলেরা রোগে মারা গিয়াছে।

পিপুলা বিধবা-বেশ ধারণ করিয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। দুই যমজ ভগিনীর বেশে এই হৃদয়-বিদারক পার্থক্য দর্শনে আত্মীয়বন্ধু সকলেরই চক্ষুতে জল বহিল।

বৎসরখানেকমধ্যে পিতৃদেব বুঝিয়াছিলেন, ওকালতী ব্যবসায়টি আমার ঠিক উপযোগী নহে; তাই তাঁহার উপদেশে মুন্সেফীর জন্য আমি আবেদন করিয়াছিলাম।

পিপুলার বৈধব্যের পর বৎসরখানেকমধ্যে পাটনা সহরে ভীষণ প্লেগ রোগ দেখা দিল এবং সেই ব্যাধিতে আমার জনক ও জননী এক সপ্তাহের ব্যবধানে, উভয়ে স্বর্গারোহণ করিলেন। এই সর্ব্বনাশে আমি মাসখানেকের উপর জড় পুত্তলিকাবৎ হইয়া রহিলাম। তাহার পর আমার মুন্সেফীতে নিয়োগবার্ত্তা গেজেট হইল। আমি ত প্রথমে উহা প্রত্যাখ্যান করিতেই প্রস্তুত হইয়াছিলাম; কিন্তু শ্বশুর মহাশয় আমায় অনেক করিয়া বুঝাইলেন। ফলে, ঐ পদ আমি গ্রহণ করিলাম। আসবাবপত্র কতক বিক্রয় করিয়া, কতক একটা কামরায় তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া বাড়ীটা ভাড়া দিয়া সুশীলাকে লইয়া আমি কর্ম্মস্থান মোতিহারিতে গমন করিলাম।

এই নূতন স্থানে সুশীলার সেবা-যত্নে, পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে আমার চিত্ত ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। কাযকর্ম্মে আমার সুখ্যাতিও হইল। ছুটীতে ভাগলপুরে যাইতাম, শ্বশুরালয়েই অবস্থিতি করিতাম।

সে বার পূজার ছুটীতে গিয়া দেখিলাম, শ্বশুর মহাশয়ের শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ওয়ালটেয়ারে বাড়ীভাড়া লইয়াছেন—মহাপঞ্চমীর দিন যাত্রা করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পূজার ছুটীটা মাত্র সেখানে যাপন করেন; কিন্তু শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর বিশেষ জেদাজেদিতে বড়দিনের ছুটীটা পর্য্যন্ত সেখানে কাটাইতে সম্মত হইয়াছেন। আমাকেও সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করিলেন, আমিও সহজেই সম্মত হইলাম।

ওয়ালটেয়ারে যে স্থানে আমাদের বাড়ীটি লওয়া হইয়াছিল, তাহা একেবারে ফাঁকা—সহর হইতে মাইলখানেক দূরে হইবে। সেখানে সপ্তাহখানেক থাকিবার পরেই শ্বশুর মহাশয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। প্রাতে ও বৈকালে আমরা বেড়াইতে বাহির হইতাম

এখানে আসিয়াই শাশুড়ী ঠাকুরাণী পিপুলাকে থান ছাড়াইয়া আবার পাড়ওয়ালা শাড়ী পরাইলেন, হাতে দুগাছি পাতলা সোনার চুড়ি পরাইয়া দিলেন। এ জঙ্গলে আর কে আছে যে, দেখিয়া নিন্দা করিবে? ইহাতে মায়ের প্রাণ যদি একটু শান্তিলাভ করে, এই মনে করিয়া শ্বশুর মহাশয়ও এ কার্য্য অনুমোদন করিলেন।

পূজার এক মাস ছুটী দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসিল। মোতিহারিতে ফিরিবার জন্য আমি তল্পিতল্পা বাঁধিতে লাগিলাম। সুশীলা আসিয়া আমায় বলিল, "দেখ, বাবা মা'র ইচ্ছে, এ দুটো মাস আমি এইখানেই থাকি। তোমাকে তাঁরা ভরসা ক'রে বলতে পারছেন না।"

আমি বলিলাম, "তোমার কি ইচ্ছা, তাই বল।"

সুশীলা বলিল, "আর কিছু নয়,—সেখানে একলা তোমার কষ্ট হবে—নইলে দুটো মাস না হয় আমি থেকেই যেতাম।"

বুঝিলাম, সুশীলার মনোগত অভিলাষ, দুই মাস এখানেই পিতামাতার নিকট অবস্থান করে। হাসিয়া বলিলাম, "না, আমার তেমন বিশেষ কোনও কষ্ট হবে না। তুমি দু'মাস এখানে থেকে, ওঁদের সঙ্গেই ফিরো। আমি একটা রবিবারে ভাগলপুরে গিয়ে তোমায় নিয়ে যাব এখন।"

সুশীলা বলিল, "তবে বাবা-মাকে বলি গে, আমায় রেখে যাবার তোমার মত আছে।"

বলিলাম, "তা বল গে।"

৪

যথাসময়ে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলাম।

মোতিহারি জিলায় অনেকগুলি অরণ্য আছে। অরণ্যের সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হইল। আমার প্রেয়সী-হীন গৃহ আর গৃহ বলিয়া মনে হইল না, অরণ্য বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

অতি কষ্টে দুই মাস গৃহারণ্যে কাটাইলাম। ৫।৭ দিন অন্তর সুশীলার একখানি পত্র পাইতাম—তাহাতে অরণ্যবাসের ক্লেশ কতকটা লাঘব হইত। কবে বড়দিন আসিবে —কবে আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইব—কবে "মধু গেহ, গেহ বলি মানব"—এই চিন্তাতেই কাটাইতাম।

পৌষের প্রারম্ভে হঠাৎ শ্বশুর মহাশয়ের একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলাম—"বাবাজী, বড়ই দুঃখের বিষয়, গত শুক্রবার সন্ধ্যার পর তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ হার্ট ফেল হইয়া পিপুলা মারা গিয়াছে। এই শোকে আমরা পাগলের মত হইয়াছি। কিছু দিন আমরা কাশীধামে গিয়া বাস করিব স্থির করিয়াছি। আগামী রবিবার সন্ধ্যা ৮টার সময় এক্সপ্রেস গাড়ীতে আমরা মোকামা পাস করিব, তুমি যদি কিছু দিনের ছুটী লইয়া আমাদের সঙ্গ লইতে পার, তবে বড়ই ভাল হয়, বাবা! এ শোকের সময় তোমায় কাছে পাইলে আমাদের অনেক সান্ত্বনা। বিশেষ চেষ্টা করিও। এ বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব।"

পত্রখানা পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বাল্যকালে, যমজ ভগিনীর দুই জনের মধ্যে এক জনের জ্বর হইলে, অপরটিরও গা গরম হইত। উহারা বড় হইলে সেরূপ আর দেখা যায় নাই বটে,—কিন্তু—ইহা যে মৃত্যু! যদি আমার সুশীলার কিছু হয়, তবে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?

বড়দিনের ছুটী হইতে তখনও ১৫ দিন বিলম্ব আছে। কাছারী গিয়া, জজ সাহেবকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, সোমবার হইতে বড়দিনের বন্ধের দিন পর্য্যন্ত ছুটী মঞ্জুর করাইয়া লইলাম। শ্বশুর মহাশয়কে সেই মর্ম্মে তারও করিয়া দিলাম।

যথাদিনে আমি মোকামা ষ্টেশনে শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সেকেণ্ড ক্লাসের একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া যাইতেছিলেন, আমিও সেই কামরায় উঠিলাম। শাশুড়ী আমাকে দেখিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুশীলাও ঘোমটার ভিতর ফোঁপাইতেছে—বুঝিতে পারিলাম। বড় ইচ্ছা হইল, তাহার হাতটি ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনার কথা বলি, তাহার চোখ মুছাইয়া দিই; কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর সমক্ষে তাহা করিবার উপায় নাই। শ্বশুর মহাশয় চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিপুলার পীড়া ও চিকিৎসার কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

দানাপুর ষ্টেশনে ট্রেণ পৌছিলে, লুচি প্রভৃতি খাবার কেনা হইল। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "সুশীলা, দেখ ত মা, ঐ ব্যাগের মধ্যে পাণের কৌটায় সাজা পাণ আর আছে

কি না ? না থাকে ত কিনতে হবে।"—সুশীলা উঠিয়া, ব্যাগ হইতে পাণের কৌটা বাহির করিয়া, তাহা খুলিয়া পিতাকে দেখাইল—কৌটাটি শূন্য। পাণের খিলিও কেনা হইল।

শ্বাশুড়ী দুইটি শালপাতায়, আমাদের দুই জনকে খাবার দিয়া বলিলেন, "সুশীলা, সোরাই থেকে ওঁদের দু' গ্লাস জল গড়িয়ে দাও ত মা!"

সুশীলা উঠিয়া জল গড়াইয়া দিল। আমরা আহার শেষ করিলাম। হাত ধুইয়া, পাণ খাইয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী দু'জনেই মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। সুশীলা এখন আর কাঁদিতেছে না। একবার যদি চোখো-চোখি হয়,এই আশায় আমি সুশীলার পানে মাঝে মাঝে চাহিতে লাগিলাম;—কিন্তু সে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। তখন হঠাৎ মনে পড়িল, আমি রহিয়াছি বলিয়া সুশীলা বা শ্বাশুড়ী কেহই খাইতে পাইতেছেন না। আরা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমি শ্বশুর মহাশয়কে বলিলাম, "আমি তবে এখন ও কামরাটায় গিয়ে শুই গে।"—আমার বিছানার বাণ্ডিলটি বগলে করিয়া, আমি নামিয়া গেলাম।

৫

পরদিন কাশীধামে পৌঁছিয়া আমরা এক "যাত্রা-ওয়ালার" বাড়ীতে উঠিলাম। দুইখানি ঘর ভাড়া লওয়া হইল। এখানে ২।১ দিন থাকিয়া, একটি বাড়ী খুঁজিয়া লইবার পরামর্শ ছিল।

বাসায় জিনিসপত্র রাখিয়া ধূলাপায়ে গঙ্গাস্নান এবং বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিয়া পাকাদি সমাপন হইতে অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইল। আহারান্তে বিশ্রাম, শ্বশুর মহাশয় ও আমি একটি কক্ষে শয়ন করিলাম। সুশীলাকে লইয়া শ্বাশুড়ী অপর কক্ষে রহিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে সন্ধ্যার সময় উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, আমরা তিন জনে বিশ্বনাথের আরতি দর্শনে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আর পাকাদির উদ্যোগ হইল না, বাজার হইতে লুচি, আলুর দম, রাবড়ী প্রভৃতি আনাইয়া তাহার দ্বারাই জলযোগ সম্পন্ন হইল।

আহারান্তে ধূমসেবন করিতে করিতে শ্বশুর মহাশয় আমার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। আমি মাঝে মাঝে ঘড়ী দেখিতেছি। এতক্ষণ বোধ হয় সুশীলা ও শ্বাশুড়ীর খাওয়া হইল। এইবার বোধ হয়, শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া ও ঘরে যাইবেন এবং সুশীলাকে এ ঘরে পাঠাইয়া দিবেন। কিংবা এমনও হইতে পারে, শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী এ ঘরে আসিয়া, আমায় ও ঘরে যাইতে বলিবেন। সুশীলার সঙ্গে দেখা করিবার—তাহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক রাত এক দিন এত কাছাকাছি দু'জনে রহিয়াছি—অথচ দেখা-সাক্ষাৎ নাই। একবারমাত্র—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নানের সময় আমি সুশীলার মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম; দু'জনে চোখো-চোখি হইয়াছিল—কান্নায় ফোলা সে চোখ দুটি, আমার চক্ষুর সহিত মিলিত হইবামাত্র সুশীলা মুখ নামাইয়া লইয়াছিল। দুই মাসের উপর দুজনে দেখা-শুনা নাই। সুশীলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আদর করিবার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় যখন ১০টা, শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাদের কক্ষে আসিলেন। পাণ আনিয়াছিলেন, তাহা রাখিয়া বলিলেন, "তোমরা তা হ'লে শোও এখন দোর বন্ধ ক'রে।"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরাও শোও গে, রাত হ'ল।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বাড়ীর কি হ'ল ?"

শ্বশুর উত্তর দিলেন, "যাত্রাওয়ালা বল্লে, তার সন্ধানে দু'তিনখানি বাড়ী খালি আছে। কাল সকালে সেগুলো দেখাবে। তার পর যেটা পছন্দ হয়।"

"আচ্ছা"—বলিয়া শ্বাশুড়ী প্রস্থান করিলেন, শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া দ্বারে খিল লাগাইয়া দিলেন।

আমি পিছু ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছিলাম। অল্পক্ষণমধ্যেই শ্বশুর মহাশয়ের নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। আমার কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি নিদ্রা হইল না। অবশেষে এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম,—ধুত্তোর কাশীর কাঁথায় আগুন! এখানে কি সবই উল্টো? বিশ্বনাথের মন্দির আলাদা, অন্নপূর্ণার মন্দির আলাদা—আমারই বা দুঃখ করলে চলবে কেন?—অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, যাত্রাওয়ালার

সঙ্গে আমরা বাড়ী দেখিতে গেলাম। নদীয়া ছত্রে একটি বাড়ী আমাদের বেশ পছন্দ হইল। তখনই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘরটি আমার শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যাত্রাওয়ালা এক জন চাকর ও এক জন ঝি ঠিক করিয়া দিবার ভার লইল।

সেখান হইতে ফিরিয়া, গঙ্গাস্নানান্তে দেবদর্শনাদি সারিয়া, যাত্রাওয়ালার বাসায় আসিয়া আমরা আহারাদি করিলাম। বিশ্রামান্তে বিকালে নূতন বাসায় উঠিয়া যাওয়া গেল। বহুকাল বিচ্ছেদের পর আজ আমার সুশীলাকে পাইব জানিয়া মনে মনে বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলাম। —আমার এই প্রণামটি লইয়া, বাবা বিশ্বনাথ বোধ হয় হাসিয়াছিলেন।

আরতি দেখিয়া আসিয়া, নৈশ ভোজন সমাপনান্তে যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম, রাত্রি তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। অধীর আবেগে আমি সুশীলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর ধীরপদক্ষেপে সুশীলা আসিয়া প্রবেশ করিল। ধীরে দ্বারটি ভেজাইয়া দিল। জন্ম-দরিদ্র ব্যক্তি সহসা মহারত্ন লাভ করিলে যেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, আমারও অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িল, আমার মুখ দিয়া হঠাৎ সেই পুরাতন রসিকতা বাহির হইয়া পড়িল—"সুশীলা না পিপুলা ?"—কথাগুলি উচ্চারণমাত্র সকল কথা আমার মনে পড়িল—আমি মরমে মরিয়া গেলাম। ছি ছি, আমি কি একটা মানুষ, না পশু ?

মেঝের উপর আমার বিছানা পাতা ছিল, সুশীলা সজল-নয়নে ধীরে ধীরে বিছানার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু বিছানায় আসিল না ; কিছু দূরে, মেঝের উপর বসিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "আমায় মাফ কর, সুশীলা, আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। পিপুলা আজ নেই—আজ ও রকম রসিকতা করা আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।" —বলিয়া তাহাকে টানিয়া বিছানায় লইবার জন্য বাহু বাড়াইলাম।

সুশীলা হঠাৎ দূরে সরিয়া বলিল, "আমায় ছুঁয়ো না।"

তাহার এই ভাব দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, আমি তোমায় ছোঁব না কেন, সুশীলা ?"

উত্তর—"আমার পানে বেশ ক'রে চেয়ে দেখ দেখি—আমি কি তোমার সুশীলা ?"

তাহার মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভয়ে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল। বলিলাম, "নিশ্চয়ই তুমি আমার সুশীলা।"

উত্তর পাইলাম—"না, আমি তোমার সুশীলা নই। তোমার সুশীলাকে ওয়ালটেয়ারে চিতার আগুনে পুড়িয়ে এসেছি। আমি হতভাগিনী পিপুলা।"—বলিয়া সে চোখে অঞ্চল দিল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কক্ষচ্যুত হইয়া যেন আমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি নারায়ণ স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদিলাম। আমার দেহ কাঁপিতে লাগিল। আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না—শয্যায় এলাইয়া পড়িলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিটকাল এইরূপ বিহ্বল হইয়া ছিলাম। তাহার পর আবার চক্ষু খুলিলাম। একদৃষ্টে—সুশীলা বা পিপুলা যেই হোক—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।—সুশীলাই ত—কে বলিল পিপুলা ? অন্যে দুই জনের পার্থক্য বুঝিতে না পারুক,—যাহার সঙ্গে আমি ছয় বৎসর ঘর করিয়াছি—তাহার সম্বন্ধে আমারও কি ভ্রম হওয়া সম্ভব ? বলিলাম, "তোমার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সুশীলা ?"

"পরিহাস নয়। সত্যিই তোমার সুশীলাকে যমে নিয়ে গেছে।"

"তবে যে বাবা আমাকে লিখেছিলেন, পিপুলা মারা গেছে ?"

"বাবার তখন মাথার ঠিক ছিল না, তাই ও রকম লিখেছিলেন।"

"কি বল তুমি !"

"যা সত্য ঘটনা, তাই আমি তোমায় বল্‌ছি। সুশীলাকে পুড়িয়ে এসে, পরদিন বাবা মাকে বল্লেন—এখানে আমাদের কেউ চেনে না—সুশীলা মরেনি,হতভাগিনী পিপুলাই মরেছে। এ বয়সে পিপুলার বৈধব্যবেশ আমি চোখে দেখতে পারছিলাম না—দিন-রাত আমার বুকে চিতার আগুন জলছিল। আজ থেকে ও আর পিপুলা নয়, ও সুশীলা—ও গিয়ে ওর স্বামীর ঘর করুক।"

আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, না জাগিয়া আছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, "মা শুনে কি বল্লেন ?"

"মা বল্লেন, ছি ছি, তাও কি হয়? পিপুলা সুশীলা সেজে গিয়ে স্বামীর ঘর করবে কি? জামাই কি এ জাল ধরতে পারবে না? বাইরের লোক না পারুক, তুমি আমি যেমন ঠিক চিনি, কোন্‌টি পিপুলা, জামাইও নিশ্চয় সেই রকম চিনবে যে, এ সুশীলা নয়। তখন কি উপায় হবে? আর যদি ধর, জামাই চিন্‌তে না-ও পারেন,—হিঁদুর মেয়ের পরলোক ব'লে ত একটা জিনিষ আছে? জালিয়াতী ক'রে, ইহলোকে দু'দিন না হয় পিপুলা সুখভোগ ক'রে নিলে। তার পর—পরলোকে কি উপায় হবে?"—বলিয়া পিপুলা চুপ করিল।

আমিও কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিয়ংক্ষণ পরে বলিলাম, "তার পর?"

"তার পর বাবা বল্লেন, 'আমি তোমাদের ও সব পর-লোক-ফরলোক মানি নে।' মা বল্লেন, 'তা না মানতে পার, কিন্তু মানুষে মানুষে সত্য ব্যবহার আর জালজুয়াচুরির মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম—তা ত মান?' বাবা বল্লেন, 'তা মানি বটে।' শেষকালে বাবাতে মায়েতে পরামর্শ হ'ল, স্ত্রীবিয়োগ হ'লে অনেকেই ত ছোট-শালীকে বিয়ে করে। এই কাশীতে অনেক তান্ত্রিক সাধক, অনেক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন; তাঁদের মধ্যে এক রকম বিবাহ প্রচলিত আছে তার নাম শৈব বিবাহ। তোমার মত ক'রে, এখানে তোমাতে আমাতে শৈব বিবাহ দেওয়ার জন্যেই বাবার কাশী আসা। তোমার এ বিষয়ে মত কি, তাই জানবার জন্য বাবা মা আমায় আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না—চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। কে এ? কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছি? সুশীলা এ নয়, কে বলিল? সুশীলা আর পিপুলা—কোন্‌টি কে? তফাৎই বা কি? এ ত ঠিক আমার সেই সুশীলার মতই কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "আমি পিপুলা"—এ কথা না বলিলে, আমি ত ইহাকে সুশীলা বলিয়াই গ্রহণ করিতাম।

চক্ষু খুলিলাম। পিপুলা সেই ভাবেই বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি বড় বিষণ্ণ। আমি তাহাকে গ্রহণ করিব, না প্রত্যাখান করিব—এই সংশয়েই কি?

বলিলাম, "আচ্ছা, তোমার কি মত, বল?"

পিপুলা বলিল, "আমি জানিনে।"—বলিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অল্প-ক্ষণ পরেই সে উঠিয়া প্রস্থান করিল।

* * * * *

সপ্তাহ পরে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে অতি গোপনে আমাদের উভয়ের শৈব বিবাহ হইল। পুরোহিত হইলেন, নদীয়া ছত্রের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রথম মিলন-রাত্রিতে পিপুলা বলিল,—"মনে আছে তোমার? ছেলেবেলায় আমরা দু' বোনেই তোমায় বিয়ে কর-বার জন্যে কেঁদেছিলাম—তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?"

আমি বলিলাম, "মনে আছে। বলেছিলাম, কাঁদিসনে, —আমি তোদের দুজনকেই বিয়ে করবো।"

পিপুলা বলিল, "তাই করলে, তবে ছাড়লে!"

পিপুলার নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল। যাহাকে বিবাহ করিলাম—জনসমাজে সে-ই সুশীলা বলিয়া পরিচিত হইল।

আমাদের একটি কন্যা জন্মিয়াছে। তাহার বিবাহের সময় কি হইবে, এই সমস্যা মাঝে মাঝে মনে উদয় হয়। ঠকাইয়া কাহাকেও মেয়ে দিব না। যাহাকে পাত্র নির্ব্বাচন করিব, আসল কথা সমস্তই তাহাকে খুলিয়া বলিব। সুতরাং একটি উচ্চশিক্ষিত উদারমতাবলম্বী সুপাত্রের প্রয়োজন। তবে এখনও তাহার দেরী আছে। কন্যাটি আমার দেড় বৎসরের মাত্র।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
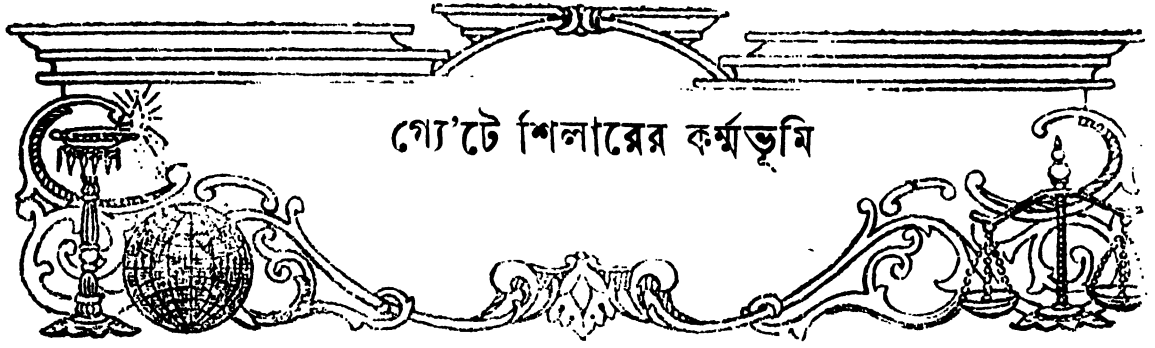
১

ট্যু রিঙ্গেন প্রদেশ

প্রুসিয়াকে এক কথায় উত্তর-জার্ম্মাণী বলা হয়। এই হিসাবে দক্ষিণ-জার্ম্মাণী বলিলে সহজে ব্যাভেরিয়া বুঝি। এই দুইয়ের মাঝামাঝি ট্যু রিঙ্গেন (টুরিঙ্গিয়া) প্রদেশ। এ এক পাহাড়ী মুল্লুক। ট্যু রিঙ্গেনের বনভূমি ও পাহাড় সম্বন্ধে ভারতেও পাঠশালায় কিছু কিছু অন্ততঃ পক্ষে নামতঃ জানা হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণদের মতে ট্যু রিঙ্গেনের বনপাহাড় স্বাস্থ্যকর জনপদ হিসাবে মূল্যবান। প্রুসিয়ার লোকেরা গরমের ছুটীতে এই প্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আরাধনা করিতে অভ্যস্ত।

বৎসর দেড়েক হইল, এক বার এই মুল্লুক দেখিবার সুযোগ জুটিয়াছিল। অঞ্চলটাকে পাহাড়ী ভূমি না বলিয়া উচ্চ সমতল টেবলল্যাণ্ড বলাই যেন যুক্তিসঙ্গত। উত্তর আর দক্ষিণ-ভারতের মাঝামাঝি ডেক্কান প্রদেশের কথা মনে পড়িতেছে। তবে এখানে ওখানে ছোট-খাট পাহাড়ের শিরও নজরে পড়ে।

ট্যু রিঙ্গেন অঞ্চল একমাত্র জার্ম্মাণ জাতির কেন্দ্র নহে। দুনিয়ার সকল দেশেই ট্যু রিঙ্গেন প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কবিবর গ্যে'টে আর শিলার তাঁহাদের জীবনের প্রধান ভাগ এই প্রদেশেই কাটাইয়াছিলেন। সাহিত্য-রসিকদের নিকট গ্যে'টে-শিলারের কর্ম্মক্ষেত্র যে সারধারণ তীর্থক্ষেত্র নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

২

ভারতে গ্যে'টে-কথা

গ্যে'টে আর শিলারের নাম ভারতে সুপরিচিত বটে, কিন্তু গ্যে'টে ও শিলারের কোন রচনা কোন ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। আজ আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই দুই সাহিত্যবীরের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই একমাত্র ইংরাজী তর্জ্জমার দাস। জার্ম্মাণ ভাষায় পণ্ডিত হইবার পর কয় জন ভারতবাসী গ্যে'টে সাহিত্যে এবং শিলার কাব্যে ডুব দিয়াছেন, জানি না। আর বাঙ্গালা বা হিন্দী সাহিত্যে গ্যে'টে শিলার আজও বোধ হয়, দুইটি লোকের নাম মাত্র। নব ভারত এই লজ্জা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইবে না কি?

কয়েক বৎসরের ভিতরই গ্যে'টের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। সেই সময়ে জার্ম্মাণরা নিশ্চয় মহা ঘটা করিয়া গ্যে'টে তিথি পালন করিবে। জগতের ছোট বড় সকল "সভ্য" দেশ হইতে জার্ম্মাণ জাতির নিকট গ্যে'টে-অর্ঘ্য আসিবে। ভারতসন্তান কি তখন বলিবেন,—"বড়ই দুঃখের কথা, আমরা আজও কোন স্বদেশী ভাষায় গ্যে'টের এক কাঁচ্চাও পাই না?" যুবক ভারত, তখন তোমরা তোমাদের জার্ম্মাণ বন্ধুদের নিকট মুখ দেখাইতে পারিবে কি?

৩

হ্বাইমারের জ্ঞান-মণ্ডল

জার্ম্মাণ "কুল্‌টুর" বলিলে যে সাহিত্য, সভ্যতা, দর্শন ও শিল্প সাধারণতঃ পণ্ডিতমণ্ডলে আলোচিত হয়, তাহার জন্মকাল ১৭৮০ হইতে ১৮৩০ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসর। সেই ৫০ বৎসরের জার্ম্মাণ-কীর্ত্তি এই ট্যু রিঙ্গেনের এক নগণ্য নগরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। নাম তাহার হ্বাইমার।

হ্বাইমারের এক মামুলী নবাব, জমীদার বা রাজা কার্ল আউগুষ্ট ভারতীয় বিক্রমাদিত্যের মত এক "নবরত্ন" কায়েম করিয়াছিলেন। এই জার্ম্মাণ বিক্রমাদিত্য তখনকার দিনের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ কবি, নাটককার, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, চিত্রকর, বাস্তুশিল্পী, সঙ্গীতাচার্য্য ইত্যাদি সুধীকে

বৃত্তি দিয়া "সংরক্ষণ" করিতেন। কোনও শ্রেণীর পণ্ডিত বাদ পড়িতেন না।

এই নবরত্নের জ্ঞানমণ্ডলে জার্ম্মাণ এক অপূর্ব্ব আন্দোলন লাভ করে। দুনিয়ার পণ্ডিতরা তাহাকে "রোমান্টিক" বা ভাবুকতার আন্দোলন বলিয়া থাকেন। হ্বাইমারের ফোয়ারায় উনবিংশ শতাব্দীর এই বিপুল চিন্তাধারা য়ুরোপের সমাজকে প্লাবিত করিবার পথে ছুটিতে থাকে। হ্বাইমারের কল্যাণেই পাশ্চাত্য নর-নারী একটা বড়-গোছের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

কাজেই হ্বাইমার ভারতবাসীর পক্ষেও সমাদৃত হইবারই কথা। হ্বাইমারে একসঙ্গে জার্ম্মাণ কল্‌চুরের গোড়াটা আর বর্ত্তমান জগতের মূলপ্রস্রবণ দুই-ই হাতে হাতে পাকড়াও করা সম্ভব। বিশ্বশক্তির উপাসকরা হ্বাইমার তীর্থে ঐতিহাসিক আনন্দ পাইবেনই পাইবেন। বহু ভারতীয় পর্য্যটকই ইতঃপূর্ব্বে হ্বাইমারে "গঙ্গাস্নান" করিয়া যাইয়া থাকিবেন।

৪

নাট্যকার শিলার

হ্বাইমারের লাগাও একটা ছোট সহরের নাম য়েনা। রেলে যাইতে লাগে ২২ মিনিট। সেই নবরত্নের যুগে য়েনাও প্রসিদ্ধ ছিল। গোটের ভাষায় য়েনা ছিল,"নেষ্টখেন" বা ছোট্ট একখানা নীড়বিশেষ। সহজে বলা যাউক, য়েনা ছিল হ্বাইমারের মফঃস্বল। এই দুই নগরেই জার্ম্মাণ কালিদাস-বরাহমিহিররা বসবাস করিতেন।

খাস য়েনায় আর আশেপাশের গায়ে গায়ে গোটে-শিলার যুগের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতেছি। কোন্ কোন্ ঘরে, কোন্ কোন্ বাগানে, কোন্ কোন্ দরিয়ার কোণে কোন্ টেবলে বসিয়া কোন্ লেখক কোন্ রচনাটা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, হ্বাইমার-য়েনার বন্ধুরা সে সব দেখাইতেছেন। এই ধরণের বীরপূজায় বাস্তুভিটা-তত্ত্বের সকল অনুষ্ঠানই আছে। জার্ম্মাণীতে যাহা দেখিতেছি, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, এমন কি, আমেরিকায়ও তাহা দেখিয়াছি। ভারতবাসীর নিকটও এই সব কায়দা অজানা নহে।

আজকালকার মালিকরা অবশ্য ঘরগুলাকে বিশেষ কোনও সম্মানযোগ্য চিহ্ন বিবেচনা করে না। কোনও কোনও বাড়ীতে ত প্রবেশ করাই দুর্ঘট। তবে কোনও কোনও মালিক বিদেশী পর্য্যটকের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে রাজি।

য়েনায় শিলারের আবহাওয়া পাইতেছি দস্তুরমত। "শিলার-টিশ" নামে শিলারের টেবল রক্ষিত হইতেছে। খোলা কলারওয়ালা জামা পরিয়া এই টেবলে বসিলেই অবশ্য গণ্ডগলিয়া কবিতা বাহির হয় না।

শিলারকে প্রধানতঃ নাট্যকাররূপে মান দেওয়া হয়। গীতি-কবিতায়ও শিলারের হাত সরসভাবে খেলিত। তবে নাটকগুলাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি সন্দেহ নাই। "হ্বিল্‌হেল্ম টেল" নাটক গল্পাকারে ভারতীয় পাঠশালায়ও সুবিদিত। স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল শিলারের প্রত্যেক নাটক-রচনায় "ধুয়া" বা "মুদ্রা।"

কোনও নাটকের কথাবস্তু সুইস, কোনও নাটক স্পেনের ঘটনা লইয়া লিখিত। এক নাটকের রসদ জোগাইয়াছে স্কটল্যাণ্ড। ফরাসী বীরাঙ্গনার কীর্ত্তিও শিলারের প্রাণকে তাতাইয়া তুলিয়াছিল। মধ্যযুগ আর পুরাতন কথা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা শিলার-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ রোমান্টিকতার অন্যতম লক্ষণ। এই সকল তরফ হইতে বাঙ্গালার দ্বিজেন্দ্রলাল বিংশ শতাব্দীর শিলার।

আমাদের 'শকুন্তলার' ধাঁচে শিলার 'থালিয়া' নাটক রচনা করেন। হ্বাইমারের যুগে গোটে-মণ্ডল কালিদাসের 'শকুন্তলা' লইয়া তুমুল লাফালাফি করিত। গোটে 'শকুন্তলা-ময়' হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিদের ত কথাই নাই, দার্শনিকরাও ভারতবর্ষের নামে ভূমানন্দ অনুভব করিতেন। জার্ম্মাণ কল্‌চুরের গোড়াটা জার্ম্মাণ-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, য়ুরোপীয় জীবনের রোমান্টিক বিপ্লব, বর্ত্তমান জগতের জন্মকথা,—এই সব লইয়া যে কোনও পণ্ডিতই ঘাঁটাঘাঁটি করুন না কেন, তাঁহাকে ডাইনে-বাঁয়ে পায়তারা করিতে করিতে একবার না একবার গুপ্ত ভারতের সাম্রাজ্য-মণ্ডলকে সেলাম ঠুকিতেই হইবে।

৫

য়েনা

য়েনা নেহাৎ ছোট সহর,—বড় রকমের একটা পল্লী বলা যাউক। আজকাল লাখ-লাখ লোকের বস্তি না দেখিলে

য়েনার বাজার

কোনও জীবনকেন্দ্রকে সহজে সহর বলিতে ইচ্ছা হয় না। দুনিয়ায় হাঁটিতে হাঁটিতে নজর বড় হইয়া গিয়াছে! স্বাই নার বোধ হয় য়েনার চেয়েও ছোট। লোকসংখ্যা প্রত্যেকটারই ৩০।৪০ হাজারের কাছাকাছি

"বুর্গ-কেল্লার" নামক সেকেলে দুর্গের নীচের তলায় অবস্থিত রেষ্টরাণ্টে খাইতে না গেলে য়েনা দেখা হয় না। এই ধরণের "কেল্লার" জাতীয় ভোজনালয় জার্ম্মাণীর বোধ হয় প্রত্যেক সহরেই আছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা জার্ম্মাণীতে এই সকল ব্যবস্থাকে "বুর্গার্লিখ" বলিতে অভ্যস্ত। তবে নীচের তলায় খানিকটা আধ্যাত্মিক অন্ধকারময় আবহাওয়ায় বসিয়া পেটপূজা করা অনেকের পক্ষে বোধ হয়, একবারের বেশী পোষায় না। দেশ দেখিতে আসা গিয়াছে যখন, তখন সবই করা চাই এই নীতি অনুসারে বুর্গ-কেল্লারকে বাদ দেওয়া চলে না।

যে হোটেলে আড্ডা গাড়া গিয়াছে, তাহার নাম "ড্যারচেস হাউস" বা জার্ম্মাণ ভবন এটাও "বুর্গার্লিখ"ই বটে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বলিলে যে জীব বুঝা যায়, সেই জীবের আনাগোনা এখানে বেশী।

ধর্ম্ম-সংস্কারক লুথারের মূর্ত্তি এখানকার এক গির্জ্জার বৈশিষ্ট্য বাড়ী-ঘরের বৈশিষ্ট্য কোথাও নজরে পড়ে না। জার্ম্মাণী-সুলভ "গথিকে"র ছায়া এখানে ওখানে লক্ষ্য করিতে হইবে মাত্র।

৬

জীবতত্ত্ববিদ্ হেকেল

বৎসর কয়েক হইল, য়েনার জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ হেকেলের মৃত্যু হইয়াছে। ইংরাজ ডারউইন আর ফরাসী লামার্কের মত জার্ম্মাণ হেকেল ক্রমবিকাশতত্ত্বের অন্যতম জন্মদাতা। জার্ম্মাণীর বাহিরে হেকেলের নাম-ডাক যত, অন্য কোনও জার্ম্মাণ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের নাম ডাক ততটা কি না, বলা কঠিন। এই সকল তুলনা কার্য্যে জরীপ করার মাপকাঠি লইয়া গোলযোগ উঠিতে পারে। কাজেই এ সম্বন্ধে বেশী নাড়াচাড়া না করাই সঙ্গত। তবে আসল কথা এই যে, প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করিতে যাইয়া সকলকেই হেকেলের মতামত পরখ করিয়া দেখিতে হয়।

হেকেলের একাধিক গ্রন্থ ইংরাজীতে পাওয়া যায়। "দুনিয়ার হেঁয়ালি" নামক কেতাব ভারতীয় ইংরাজী-পাঠকদের অপরিচিত নয়। মানুষ, আত্মা, সংসার আর দেবতা এই চারি বিষয়ের আলোচনায় ভারতবাসী যে সকল বুকনি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত, তাহার অনেকগুলাই হেকেলের নিকট হইতে চুরি করা মাল। জগতের সকল ভাষায়ই

নগরের বিভিন্ন দৃশ্য—(য়েনা)

এমন কি "অসভ্য জাপান" ও চীনের ভাষায়ও এই গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে। কে জানে, কোনও ভারতীয় ভাষায় আছে কি না? বাঙ্গালায় বোধ হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য ভারতের সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য কি না! উর্দ্দুতে থাকা অসম্ভব নয়। শুনিয়াছি, হিন্দীতে আছে।

"চায়েস হাউস" হোটেলের অনতিদূরেই হেকেলের বাড়ী। সেই বাড়ীটা এক্ষণে মিউজিয়ামে পরিণত হইয়াছে। ৮৫ বৎসর বয়সে হেকেলের মৃত্যু হয়। মরিবার দিন পর্য্যন্ত ইনি কর্ম্মক্ষম ছিলেন। টেবলের উপর শেষ লিখাগুলা সাজানো রহিয়াছে। কলমটাও সেই অবস্থায়ই রক্ষিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শমিড হেকেলের এক চেলা। মিউজিয়ামের কাগজপত্র দেখা-শুনা করা শমিডের কাম। হেকেলের অনেক লিখা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেই সব সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যও শমিড ব্যস্ত আছেন।

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, হেকেল এক জন অসাধারণ চিত্রকর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক অভিযান উপলক্ষে হেকেলকে দেশ-বিদেশের বনে জঙ্গলে পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষও বাদ যায় নাই। সেই সকল দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য হেকেল ছবি আঁকিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রায় ২ হাজার চিত্রের সংগ্রহ দেখিলাম। ছবিগুলার ভিতর উদ্ভিদতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আকরতত্ত্ব, পাহাড়তত্ত্ব, নদ-নদীতত্ত্ব সবই বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যের সহিত বাছিয়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক অঙ্কনেই অংশগুলাকে সাজাইবার ক্ষমতা এবং নানাবর্ণের সাহায্যে বৈচিত্র্যের ভিতর সামঞ্জস্য ফুটাইবার দক্ষতা দেখিতেছি। এই হিসাবেই হেকেল সুকুমার শিল্পী বৈজ্ঞানিক না হইয়া একমাত্র চিত্রকরভাবে জীবন কাটাইলেও দুনিয়ায় যশস্বী হইতে পারিতেন বোধ হয়।

৭

কার্ল-ৎসাইস

জার্ম্মাণীর নগরে নগরে "ফোল্কস বাড" বা সার্ব্বজনিক স্নানাগার নামক বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। য়েনায়ও দেখিতেছি, নিজ নিজ বসত-বাড়ীতে স্নানের ব্যবস্থা করা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব। স্নান এই সকল দেশে নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতির অন্তর্গত নহে। কালে-ভদ্রে, মাসে একবার বা দুইবার, এখানকার জনসাধারণ স্নানারামের বিলাস ভোগ করিতে অভ্যস্ত।

য়েনার নাম আজকাল প্রধানভাবে গোটে-শিলারের স্মৃতিজড়িত কি হেকেলের বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি-সংশ্লিষ্ট, বলা কঠিন। তবে এখানকার একটা কারখানা জগতে অদ্বিতীয় যশ সম্ভোগ করিয়া থাকে। এমন কি, ভারতের উচ্চশিক্ষিত লোকরাও ৎসাইসের কাচ দেখুন বা না দেখুন, সেই বিষয়ে গল্প শুনিয়া থাকেন। দূরবীণ, অণুবীণ ইত্যাদি যন্ত্রের জন্য যে সব কাচ ব্যবহার করা হয়, তাহা তৈয়ারী করিয়াই কার্ল-

বিশ্ববিদ্যালয়—(য়েনা)

ৎসাইস প্রসিদ্ধ। কারখানাটা য়েনা সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত।
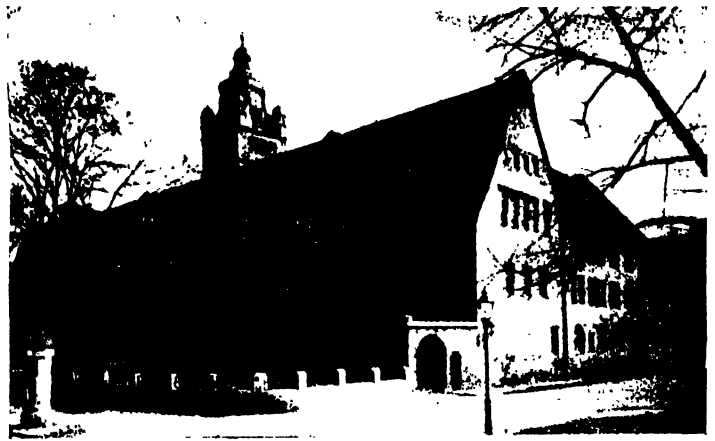
কারখানার লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল। প্রায় চার হাজার লোক কাম করে। কয়েক গণ্ডা বিজ্ঞান-সেবী এখানকার বিজ্ঞানশালায় "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ" বা শিল্প-গবেষণার কাযে মোতায়েন আছেন। পুরাতনের বর্জ্জন আর নয়ার উদ্ভাবন "চৌপর দিনরাত" চলিতেছে।

য়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপক আবে ছিলেন ৎসাইসের কারখানার বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা। মজুরদিগকে সকল প্রকারে সুখী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আবে জার্ম্মাণ-সমাজে অমর হইয়াছেন। কারখানার পরিচালনায় মজুরদের হাত আছে। উচ্চহারে মজুরীও জুটে। মজুর-সমস্যা লইয়া যে সকল জননায়ক, শিল্পনায়ক বা ধনবিজ্ঞানসেবী মাথা ঘামাইয়া থাকেন, তাঁহারা কার্ল-ৎসাইস ও আবে প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলা খুঁটিয়া খুঁটিয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। সোশ্যালিজম, কামনিজম ইত্যাদির অনেক গন্ধ এই জগৎপ্রসিদ্ধ "বুর্জোআ" কারবারের আবহাওয়ায়ও পাওয়া যাইবে।

তথাপি মজুর-সমস্যা য়েনায়ও দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ গোটা টিরিঙ্গেন প্রদেশটাই জার্ম্মাণীর ছোট-খাট বোলশেভিক বাথান। এই প্রদেশের মজুররা রুশভাবাপন্ন লেনিনভক্ত লোক। রুসিয়ার সোভিয়েট সরকার জার্ম্মাণির এই জিলাগুলাকে রুস সাম্রাজ্যেরই মফঃস্বল বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মক্ষেত্র আজ ধনসাম্যপন্থী সমাজ বিপ্লবধর্ম্মী নরনারীর জীবন কেন্দ্র। ইহারই নাম "সাইট-গাইষ্ট" বা যুগধর্ম্ম। বিংশ শতাব্দীতে গ্যেটে-শিলার মহাত্মারা বড় বেশ "কল্কে" পান না! মজা বটে!

৮

দার্শনিক অয়কেন

য়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অয়কেন দুনিয়ার জ্ঞানমণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত: নোবেল প্রাইজ পাওয়া লোক। অয়কেনের রচনাবলী ইংরাজীতে ভারতেও আলোচিত হইয়া থাকে। বুড়া লোক ভাল।

ভারতবাসী আজকালকার দিনে যখনই অধ্যাত্মতত্ত্ব, আদর্শবাদ, ভাবুকতা ইত্যাদির ফোড়ন ঝাড়েন, তখনই ইহারা হয় জার্ম্মাণ অয়কেন, না হয় ইতালীয়ান ক্রোচে, না হয় হেগেলপন্থী ইংরাজ ব্রাডলে ইত্যাদির মতগুলা বাঙ্গালায় বা অন্য কোনও স্বদেশী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দেন। তবে কথাগুলাকে "খাঁটী স্বদেশী" এবং ভারতীয় আদর্শের প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রচারিত করিবার জন্য ইঁহারা রচনা বা বক্তৃতার এখানে সেখানে দেড়'লাইন গীতার শ্লোক এবং গোটা আড়াই উপনিষদের শব্দ চড়াইয়া দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ভারতের মাথার দাম যে এক কড়াও নয়, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। যাক্ সে কথা।

অয়কেনের জার্ম্মাণ শিষ্যরা "অয়কেন বুন্দ" বা অয়কেন পরিষৎ কায়েম করিয়াছেন। নানা দেশে এই বুন্দের শাখাস্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। অয়কেনের পত্নী হইয়াছেন সম্পাদক। ভারতের জন্য কতকগুলা ঠিকানা চাহিলেন। য়েনার নানা লোকহিতকর কাজে অয়কেন পত্নীর যোগাযোগ আছে

দুনিয়ার অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মত অয়কেনও ভারতবর্ষ, ভারতীয় সভ্যতা, ভারতবাসীর ধর্ম্ম ইত্যাদি বলিলে একমাত্র আদর্শবাদ, পরলোকতত্ত্ব, বৌদ্ধ দর্শন, উপনিষৎ ইত্যাদি বুঝিতে অভ্যস্ত। ভারত সম্বন্ধে এরূপ একদেশদর্শিতা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট হইতে এশিয়ার পণ্ডিতরা নকল করিয়াছেন।

অয়কেন নিজে যখন আদর্শবাদী, তখন দুনিয়ায় আদর্শবাদীর সংখ্যা যত বাড়ে, ততই ইহার পক্ষে সুখের কথা! কাজেই ভারতবাসী সত্য সত্যই পুরাপুরি আদর্শবাদী কি না, তাহা নিক্তির ওজনে বিচার করিবার মত ধৈর্য্য অয়কেনের নাই। এই ধৈর্য্যের অভাব বার্টাণ্ড রাসেল, রোমাঁ রোলাঁ ইত্যাদি আদর্শবাদীদের স্বভাবগত।

ভারতবাসীর পক্ষে এইটুকু বুঝিয়া রাখা উচিত যে, প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো, গ্রেকো, রোমান যুগের প্লটিনস, ক্যাথলিক খৃষ্টান ঋষি, ইতালীয়ান টোমাস আকিনাস, জার্ম্মাণ য়াকোব বোয়েমে ইত্যাদি চিন্তাবীরগণ তথাকথিত হিন্দু-চীনা-সুফী বা প্রাচ্য আদর্শবাদে ও ভাবুকতায় ভরপুর! পাশ্চাত্যেরা উপনিষৎ তাও-তে চিঙ আর রুমির উপাসনা না করিয়াও স্বদেশেই নিজ নিজ ভাবুকতার খোরাক পাইতে পারেন। তবে আজকালকার ইয়োরামেরিকান সুধী-মহলে পাশ্চাত্য আদর্শবাদের কথা অনেক সময়েই মনে থাকে না। এই জন্যই তুলনা-মূলক দর্শনের আসরে তর্কে গোল বাধিতেছে।

৯

গ্যেটে-ভবন

গ্যেটে হ্বাইমারের এক বাড়ীতে বৎসর সাতেক ভাড়াটিয়ারূপে বসবাস করেন। পরে বাড়ীটা নিজের সম্পত্তিতে

পরিণত করেন। ১৭৯২ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর ধরিয়া কবিবর এই ভবনে ছিলেন। এই কারণে "গো'টে হাউস" সাহিত্যপ্রেমিকদের নিকট আদরের বস্তু।

১৮৮৬ সালে "গো'টে-ভবন" হ্বাইমার নগরের সম্পত্তি হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থায় দেখিতেছি, আজকাল এখানে এক বিরাট মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয়। গো'টের জীবনের আর গো'টে সাহিত্যের নানা তথ্য কামরায় কামরায় সাজান রহিয়াছে।

গো'টে-ভবন—(হ্বাইমার)

"গো'টে নটেসিওনাল ম্যুজেয়ুমের" ভিতর প্রবেশ করিলে সাহিত্য ছাড়া আরও অনেক চিজ চোখে পড়ে। ছবি, মূর্ত্তি, কেতাব, গাছ, পাতর, জীবজন্তু ইত্যাদির সংগ্রহ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এইগুলা সবই গো'টের নিজের হাতে সংগ্রহ করা জিনিষ।

এই সংগ্রহগুলাকে কেবলমাত্র "বাতিক" বলা চলে না। নানা দিকে গো'টের বাতিক যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু আসল কথা, গো'টের মাথাটা একসঙ্গে বহু ক্ষেত্রে সজাগভাবে খেলিত।

লোক সাধারণতঃ গো'টেকে একমাত্র কবিরূপে চিনে। গো'টের গীতিকাব্য, গো'টের নাটক, গো'টের উপন্যাস, গো'টের কথোপকথন এই সবই সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞানের মহলে গো'টের কীর্ত্তি অতি উঁচু দরের। গো'টেকে উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের অন্যতম জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। ডারউইন লামার্ক আর হেক্কেল ইত্যাদির যে ইজ্জৎ, ক্রমবিকাশতত্ত্বের ইতিহাসে গো'টেরও সেই ইজ্জৎ।

অধিকন্তু পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন এই দুই দিকেও গো'টের "রিসার্চ্চ" বা অনুসন্ধান চলিত। সে যুগের অন্যান্য বিজ্ঞানসেবী যেরূপ ল্যাবরেটারীতে বসিয়া মাপিয়া জুকিয়া বস্তু-পরীক্ষা করিতেন, গো'টেও নিজ ভবনের কয়েকটি কামরায় ঠিক সেইরূপ পরীক্ষাকার্য্যে মোতায়েন থাকিতেন। বিজ্ঞানালোচনাটা গো'টের পক্ষে নেহাৎ বাতিকমাত্র ছিল না,—জীবনের এক প্রচণ্ড সাধনায় পরিণত হইয়াছিল। রঙের বিশ্লেষণ করিয়া কবিবর বৈজ্ঞানিক-মহলে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লোক জন্মিয়াছেন। কিন্তু একসঙ্গে বহুবিধ চিন্তাক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ যশের অধিকারী বড় বেশী নাই। গো'টের কৃতিত্ব বোধ হয় এই হিসাবে সবসে সেরা। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে, গো'টে এক জন মহা কর্ম্মবীরও বটে। হ্বাইমার রাষ্ট্রের কর্ণধারই

হ্বাইমারের গ্রন্থশালা

গ্যে'টে-বান্ধবী ফোনষ্টাইনের ভবন—(হ্বাইমার)

ছিলেন তিনি। অবশ্য, হ্বাইমার এমন কিছু বড় দেশ ছিল না। তবে সে-যুগের জার্ম্মাণ মুল্লুকে ঝগড়া, চুকলী, মারামারি, কোঁদল, ষড়যন্ত্র এত বেশী চলিত যে, এক জন ভাবুক প্রেমিক কবি বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একটা দেশের শাসনভার লইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত সেই কাজে মোতায়েন থাকা একটা মুখের কথা নহে।

১০

হ্বীলাণ্ড ও হার্ডার

কার্ল আউগুষ্ট (১৭৭৫—১৮২৮) একসঙ্গে বহুবীরের সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন। গ্যে'টেকেই তিনি গুরুদেব বিবেচনা করিতেন সন্দেহ নাই। গ্যে'টে-মণ্ডলের ভিতর শিলার ছাড়া আরও অনেক জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সভ্যতায় তাঁহারা সকলেই অমর। দুনিয়ার লোকও তাঁহাদের তারিফ করিয়া থাকে।

হ্বাইমারের "শ্লস" বা প্রাসাদদুর্গের ভিতর সেই গ্যে'টে-মণ্ডল বা নবরত্নের জ্যোতি কিছু কিছু মালুম হয়। গ্যে'টের নামে আর শিলারের নামে দুইটা কামরা অভিহিত হইতেছে। দুইয়ের রচনাবলী চিত্রাকারে এই দুই কামরায় দেখিতে পাই।

সে যুগের এক বড় কবি হ্বীলাণ্ড জার্ম্মাণ বিক্রমাদিত্যের সংরক্ষণ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে এক কামরা দেখিতেছি। উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনা ছিল তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। প্রাচীন গ্রীক এবং অন্যান্য পুরাণের গল্প অবলম্বন করিয়া হ্বীলাণ্ড নবযুগ গড়িতেন।

এক কামরা দেখিতেছি, হার্ডারের নামে। হার্ডার ছিলেন দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ। প্রাচীন আর মধ্য-যুগের মানবজীবন-বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা ছিল হার্ডারের এক বড় কাজ। তর্কের আসরে এই কারণে হার্ডারের পান-সুপারি মিলে। বিদেশী সাহিত্য স্বদেশী ভাষায় প্রচার করা ছিল হার্ডারের আর এক বড় কাজ। জার্ম্মাণ জাতিকে হার্ডার বিশ্বমুখী করিয়া তুলিতেছিলেন। এই সূত্রে ভারতীয় কাব্য ও দর্শনের দিকেও হার্ডারের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

হার্ডারের নাম আজকালকার দিনে বড় বেশী শুনা যায় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হার্ডারের চিন্তা-ধারা ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানমণ্ডলে এক বিপুল শক্তি। কি সুকুমার শিল্প, কি কাব্য-সাহিত্য, কি লোকাচারতত্ত্ব, কি ধর্ম্মকর্ম্ম, কি দর্শন বা রীতিনীতি, সকল ক্ষেত্রেই আজকাল তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর রেওয়াজ দেখিতে পাই। এই রেওয়াজের এক জন্মদাতাই হইতেছেন হার্ডার।

জার্ম্মাণরা হার্ডারের প্রভাবে একসঙ্গে স্বজাতিনিষ্ঠ, অতীতপ্রিয় এবং স্বদেশবৎসল হইতে শিখে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিবার দিকেও যুবক জার্ম্মাণীর খেয়াল গজাইয়া উঠে। জার্ম্মাণ ন্যাশন্যালিজম হার্ডারের প্রচেষ্টায় গভীরতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্ম্মাণদের রোমাণ্টিকতায় শিলার যে আগুন ছুটাইতেছিলেন, সেই আগুনই হার্ডারের সাহিত্যসাধনার ফলে জনসাধারণকে দৃঢ়তা ও সঙ্ঘবদ্ধতার দিকে লইয়া যাইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে "জাতীয়তার" আন্দোলন হার্ডারের রোমাণ্টিকতায় পুষ্ট হইয়াছে। ইতালীয়ান ভাবুকবর জাতীয়তার ঋষি মাৎসিনি হার্ডারের অন্যতম ভক্ত ছিলেন।

১১

মফঃস্বলের আর্থিক অবস্থা

জার্ম্মাণীর মফঃস্বলে মফঃস্বলে টো টো করিলে বেশ বুঝা যায় যে, লড়াইয়ে হারিয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণীরা নেহাৎ দরিদ্র

হইয়া পড়ে নাই। বড় বড় সহরের থিয়েটারে, হোটেলে, নাচ-গানের মজলিসে আর জিনিসপত্রের দোকানে অনেক ক্ষেত্রেই লোকের ভিড়ের ভিতর বিদেশীদের সংখ্যা অনেক। কাজেই সেই সব কেনা-বেচা, আমোদ-প্রমোদ-বিলাসভোগ ইত্যাদি দেখিয়া খাঁটি জার্ম্মাণ নর-নারীর আর্থিক অবস্থা বুঝা সহজ নহে।

কিন্তু ছোট ছোট সহরে এবং পল্লীতে বিদেশীদের চলা-ফেরা কম। ভাইমার, য়েনা ইত্যাদি অঞ্চলে "নেটিভ"দের সংখ্যাই বেশী। এখানকার সড়কে যে সব নর-নারী চোখে পড়ে, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের লক্ষণ নাই। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া পোষাক পরা ইয়োরামেরিকানদের দস্তর। জার্ম্মাণরা সেই দস্তর রক্ষা করিয়াই চলিতেছে।

য়োদানিস-দরওয়াজা

রেষ্টরাণ্টে কাফেতে দর রোজই বাড়িতেছে। কিন্তু চড়া হারে চর্ব্ব্যচুষ্য উপভোগ করিবার লোক কমিতেছে না। সিনিমায় আর রঙ্গালয়েও জার্ম্মাণ নর-নারী যথাপূর্ব্বং তথা-পরম্।

জিনিষপত্রের দর বাড়িতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মাণীর কেরাণী, কর্ম্মচারী, কুলী, মজুর, ঝী ইত্যাদির মাহিয়ানা বা সাপ্তাহিক বেতনও যেমন তেমন বাড়ান হইতেছে। কষ্ট কাহাকে বলে, বেতনভোগী কোন লোকই জানে না। কাজেই দুঃখ-দারিদ্র্য চোখে পড়িতেছে না। লড়াইয়ের পূর্ব্বে জার্ম্মাণদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি যেরূপ ছিল, আজ তাহার চেয়ে সেই মাপকাঠি অনেক খাটো, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিব না।

ভারতীয় দারিদ্র্যের মাপকাঠি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে অন্যায় করা হইবে। আমাদের চেয়ে জার্ম্মাণরা আজ বেশী সুখে আছে কি বেশী কষ্টে আছে, তাহা আলোচনা করিতে বসা সম্প্রতি নিষ্প্রয়োজন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উহাদের অবস্থা কি, তাহাই বিচার করা সঙ্গত।

১২

মধ্যবিত্তের দশা

তবে জার্ম্মাণীর কোনও সমাজে আজ দুঃখ নাই, এ কথা বলা চলে না। মধ্যবিত্ত এবং বিশেষতঃ মস্তিষ্কজীবীদের শ্রেণীতে আর্থিক কষ্ট অনেক স্থলেই দেখিয়াছি—কি বার্লিনে, কি মফঃস্বলে। স্কুলমাষ্টার, চিকিৎসক, উকীল, সাহিত্য-সেবী, সংবাদপত্রের লেখক, চিত্রকর, স্থপতি, গায়ক ইত্যাদি ব্যবসায়ের লোকরা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে। এই ধরণের লোকের কষ্ট আজ ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে আর ইতালীতেই বা কম কি?

ভারতে আমরা কি নিম্নশ্রেণী, কি মধ্যবিত্ত, সকলেই সারাজীবন আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে অভ্যস্ত। না খাইতে পাইয়া মরা, পোষাকের অভাবে শীতে, বর্ষায় কষ্ট পাওয়া আমাদের সনাতন ধর্ম্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অসুখ হওয়া, বিনা চিকিৎসায় মরা ইত্যাদিও আমাদের হাড়ে সহা সামাজিক ব্যবস্থা। এই সকল কষ্টে আমাদের দেশে হাজার লোক ভুগে কি দশ লাখ লোক ভুগে, তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করা আমরা আবশ্যকই বিবেচনা করি না। কেন না, দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-ব্যাধিপ্রপীড়িত ভারতবাসীর সংখ্যা অগণিত।

কিন্তু জার্ম্মাণরা এবং ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিণ ইত্যাদি জাতিরা দারিদ্র্য-দুঃখকে সনাতন স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত নহে। ইহাদের দেশে যদি কোনও সহরে, এমন কি,

দশটা মাত্র পরিবারে সপ্তাহের প্রতিদিন মাখম বা দুধ বা চিনি বা মাংস না জুটে, তাহা হইলে ইহারা তাহা লইয়া সরকারকে—সমাজকে উস্তম-ফুস্তম করিয়া ছাড়ে। কাযেই আজকাল ছয় কোটি জার্ম্মাণ নর-নারীর দেশে "মধ্যবিত্ত" পরিবারের হাজার দশ-বিশেক লোক খাওয়া-পরার কোনও কোনও অনুষ্ঠানে কম-বেশী কষ্ট পাইতেছে, এই দৃশ্য ইহাদের পক্ষে সহনীয় নহে। এই কথাটা মনে না রাখিলে ভারতবাসীরা জার্ম্মাণীর সুবিচার করিতে পারিবে না।

বিষয়টা আরও তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনও কোনও লোক কষ্ট পাইতেছে বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া গোটা জার্ম্মাণ সমাজ আর্থিক হিসাবে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে কি? বোধ হয় না। যদি গোটা জার্ম্মাণীর ছয় কোটি লোক দারিদ্র্যে ভুগিত, তাহা হইলে জার্ম্মাণ পল্লীসহরের দোকানে, থিয়েটারে, রেষ্টরাণ্টে কোনও জার্ম্মাণেরই টিকি দেখা যাইত না। কিন্তু সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণদের টিকি দেখিতেছি।

১৩

শ্রেণী-বিপ্লব

আসল কথা, লড়াইয়ের ফলে অন্যান্য দেশের মত জার্ম্মাণীতেও একটা সমাজ-বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। আগে যাহারা ধনী লোক ছিল, তাহাদের অনেকেরই সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মার্কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি টাকার কিম্মৎ আর কিছুই নাই। লক্ষপতিরা আজ সত্য সত্যই পথের ভিখারী। সুদের টাকা গণিয়া যে সব বিধবা জীবনযাপন করিত, তাহারা অনাহারে মরিতেছে। এই সব শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি। অতি সুশিক্ষিত ভদ্র ঘরে এমন কি, এক বেলাও পূরা পেটে খাওয়া-দাওয়া ঘটে না। এই ধরণের দৃষ্টান্ত বোধ হয়, প্রত্যেক বিদেশী পর্য্যটকের অভিজ্ঞতায় দুই একটা পড়িয়াছে।

পুরাতন ধনীরা লুপ্ত হইতেছে। তাহাদের স্থানে উঠিতেছে "নয়া ধনী।" ইহারা সকলেই ইহুদী, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। খাঁটি খৃষ্টান জার্ম্মাণ নর-নারীরা নতুন নতুন শিল্পে—ব্যবসায়ে লক্ষপতি হইয়াছে। পুরাতনদের যায়গায় আসিয়া বসিতেছে নয়ারা। এক শ্রেণীর ঠাঁইয়ে দেখিতেছি অপর শ্রেণী।

শ্রেণীবিপ্লব জগতের ইতিহাসে নূতন কিছু নহে। প্রত্যেক লড়াই এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন ধনীরা ধূলিসাৎ হয়, আবার নয়া এক জাত সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ভারতে যাহারা ধনী লোক নামে পরিচিত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষরা সকলেই ধনী ছিল কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে যে "রাষ্ট্র-বিপ্লব" ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে "রামার ধন শ্যামা পাইয়াছে, পদার ধন পাইয়াছে যদু।"

জার্ম্মাণীতেও ঠিক তাহাই ঘটিতেছে অনেকবার। ১৯১৮-২১ খৃষ্টাব্দেও আবার তাহাই ঘটিয়াছে। তথাকথিত বোল্‌সেভিক-নীতি কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা জাতি-বিশেষের একচেটিয়া আবিষ্কার নহে। ধনদৌলতের ওলট-পালট, ধনীর দরিদ্র হওয়া আর দরিদ্রের ধনী হওয়া ঐতিহাসিক যুগপরম্পরার সনাতন ও মামুলী তথ্য।

ফুখ্‌স্‌-টুর্ম—(য়েনা)

এই উপায়েই জগতে সুখের সীমা বাড়িয়া যাইতেছে; নয়া নয়া শ্রেণীর লোক ঐশ্বর্য্য চাখিবার সুযোগ পাইতেছে। ঐশ্বর্য্যভোগের সঙ্গে সঙ্গে "নয়া ধনীরা" অর্থাৎ "হঠাৎ বাবুরা" ক্রমে ক্রমে সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-ভব্যতা, এক কথায় "কুল্‌টুর" উপভোগ করিবার

পথে অগ্রসর হইতেছে। জার্ম্মাণীতে সভ্যতাবিকাশের ধারাটা হাতে হাতে পাকড়াও করা সম্ভব। পুরাতন ধনীরা অর্থাৎ আজকালকার কুল্টুরওয়ালারা অবশ্য কথায় কথায় "নয়া ধনী"দের বর্ত্তমান কুল্টুর-হীনতা দেখিয়া স্বদেশের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে হাহুতাশ করিতেছে। এইরূপ হাহুতাশ করা ঠিক নহে। কেন না, আজকালকার কুল্টুরওয়ালাদের ঠাকুরদাদারা অনেকেই নেহাৎ নির্ধন এবং কুল্টুরহীন ছিলেন, আবার আজকালকার কুল্টুর-হীন নয়া ধনীদের নাতি-নাতনীরা হয় ত বা এক গভীরতর কুল্টুরের স্তম্ভে পরিণত হইবে। তবে জীবনে যাহারা কখনও কষ্ট পায় নাই, অথচ বর্ত্তমানে যাহাদিগকে দারিদ্র্যে ভুগিতে হইতেছে, তাহারা "ভবিষ্যবাদের" ভাবুকতায় কখনই মাতোয়ারা হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

১৪

য়েনা মাহাত্ম্য

য়েনার মাঠে নেপোলিয়ান জার্ম্মাণ জাতির হাড় গুঁড়া করিয়া দিয়াছিলেন। সে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তাহার ৭ বৎসর পরে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণরা ফরাসীদের দাসত্ব হইতে মুক্তি পায়। সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম উপলক্ষে য়েনা যুবক জার্ম্মাণীর কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। দার্শনিকপ্রবর ফিকটে ছিলেন যুবক-জার্ম্মাণীর আধ্যাত্মিক গুরু। য়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা ছিল তখন ফিকটের কায।

জার্ম্মাণীতে আজকাল যৌবন আন্দোলন চলিতেছে তুমুলভাবে। সেই সূত্রে ফিকটে আবার যুবক-জার্ম্মাণীর গুরুদেবে পরিণত হইয়াছেন। য়েনাকে যুবক-জার্ম্মাণী আবার তীর্থক্ষেত্র সমঝিতেছে। য়েনাকে ভুলিয়া থাকা জার্ম্মাণ ভাবুকদের পক্ষে অসম্ভব। য়েনার আবহাওয়ায় বিদেশী পর্য্যটকরা জার্ম্মাণজাতির ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সবই একসঙ্গে স্পর্শ করিবার সুযোগ পায়।

এই স্থানে আর একটা কথা উল্লেখ করা উচিত। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে নবীন জার্ম্মাণ গণতন্ত্রের শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জার্ম্মাণরা লড়াইয়ে হারিয়া যাইবার পর যখন স্বদেশের পুনর্গঠনের কথা ভাবিতে বাধ্য হয়, তখন ইহারা সদলবলে ছয় মাস ধরিয়া হ্বাইমারে আসিয়া আড্ডা গাড়ে। হ্বাইমারের প্রসিদ্ধ থিয়েটার-ভবনে দিন-রাত সভার বৈঠক বসিত। সেই সকল বৈঠকেই বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর শাসন-প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে। "হ্বাইমারার ফাফাস্থুঙ" অর্থাৎ "হ্বাইমারের শাসনপ্রণালী" নামে এই ব্যবস্থা জার্ম্মাণ-সমাজে প্রচারিত। গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মক্ষেত্র আজও জার্ম্মাণদের জীবন পুষ্ট করিতেছে।
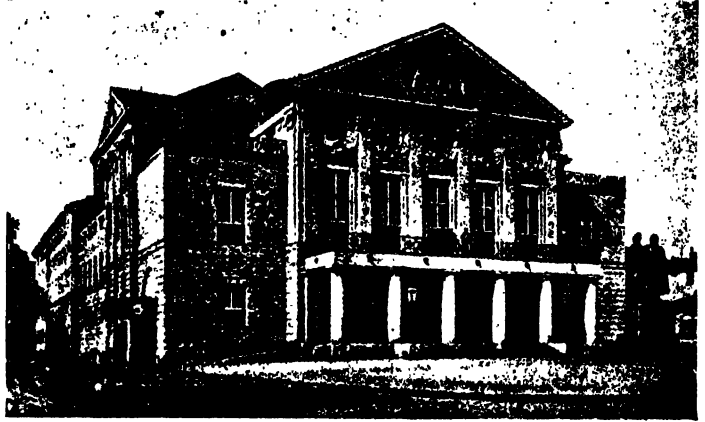
হ্বাইমারের থিয়েটার-ভবন

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

১

প্রশান্ত আমার বাল্যবন্ধু। ব্যারিষ্টার হয়ে বাড়ী ফিরে—সস্ত্রীক বেড়াতে বেরিয়েছে। কাল আমার বাসায় এসে পৌছেছে। বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় উভয়েই যেন সেই তরুণের কোটায় ফিরে এসেছি। সেই বয়সের সেই সব কথা উল্লেখ ক'রে ভারী একটা সরল জীবনের স্বাদ উপভোগ করা চলেছে। ইতোমধ্যে জীবনটাকে জড়িয়ে যে সব কাঁটা দেখা দিয়েছে, তাদের কথা—তাদের ব্যথা কোথায় স'রে গেছে! আনন্দের আর আয়োজনের ঘটা প'ড়ে গেছে—কি বাইরে কি অন্দরে। কথা আর ফুরায় না।

এখানে অল্প বাঙ্গালীই থাকেন। আজ রবিবার প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছেন—দেবেনবাবু, নীরদবাবু, নৃত্যবাবু ও শরৎবাবু।

হরকিষণবাবু এই স্থানেরই বাসিন্দা। আমার বাসার সামনেই পথের ও-পারে তাঁর বাড়ী ও বাগান। বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গালা বলেন, বাঙ্গালা উপন্যাস পড়েন, বাঙ্গালীদের সঙ্গেই তাঁর বসা-দাঁড়ানো। খুব মিশুক আর মজলিসী লোক। চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন,—শরীর আর অর্থ এই দুই বাড়ায় বাড়ী এসে বিশ্রামের কায নিয়েছেন। ইংরাজী কেতা-দুরস্ত ভদ্রলোক।

তিনিও উপস্থিত হয়েছেন। বিলাতের কথা পড়েছে।—প্রশান্ত বক্তা। বৈঠকে বেশ উৎসাহ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

হতভাগ্য আমি,—আমাকে আজও ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে এমন মজলিস ছেড়ে আপিসে যেতে হবে! আপিস নিকটেই। সকলের চা পাওয়া হ'লে আমি আপিসের জন্য প্রস্তুত হ'তে গেলুম।

মিনিট পনেরো পরে বাইরে এসে দেখি—তর্কের তুমুল সংগ্রাম সুরু হয়ে গেছে। প্রশান্ত, হরকিষণবাবু, শরৎবাবু আর নীরদবাবু,—অপর পক্ষে দেবেনবাবু আর নৃত্যবাবু। দ্বিতীয় দল যুক্তিতে পেছিয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু দেবেনবাবুর হাফ-আকড়ায়ের গলা—উঁচু সুরে সকলকে দাবিয়ে চলেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর সকলেরই সুপরিচিত;--তিনি যখন নিশীথ রাত্রিতে পত্নীর সহিত সুমিষ্টালাপ করেন,—পথের পাহারাওয়ালা হেঁকে প্রশ্ন করে—"রাত্‌মে কেয়া ঝামেলা হায়, বাবুজী!"

তর্কের বিষয়টা খুবই গুরু—সাংঘাতিক বলাও চলে,—আমরা সতী বা সতীত্ব বলতে যা বুঝি, সেটা একটা মনগড়া কথা মাত্র। তার প্রমাণের কোনও রাজপথ নেই। যে বস্তুর সঙ্গে কেবল দেহেরই সম্পর্ক, তাকে ধর্ম্মের কোটায় তুলে ধ'রে নারীদের লোক-লজ্জায় ফেলে নির্ম্মম লোকরা তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করতো। আর নারীধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জাতের গৌরব গেয়ে বেড়াত। গোঁড়াদের কাছে আজও ওটা সেকেলে পচা জাম্বিরায়ের মত বস্তাবন্দী হয়ে আছে,—ধোপে টেঁকে না। হ্যাঁ—ভালবাসা, প্রণয় এ সব আলবৎ স্বীকার করি,—তাও আজীবন এক সুরে বলে না। বিলাতে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা-গবেষণার পর তাই স্ত্রীজাতিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের মত ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ নেই। যখন তখন চুক্তিভঙ্গও হচ্ছে, মনের মত নির্ব্বাচনও চলছে। গোঁজামিল নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি দলে ভারীদের কথা।

দেবেনবাবুর প্রধান অস্ত্র গলা আর পৌরাণিক প্রমাণ। তিনি বেহুলা নিয়ে লড়ছেন, আর সীতা-সাবিত্রীর শরণ নিচ্ছেন। নৃত্যবাবু বলছেন—বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, তর্কে বহু দূর। যাদের তা নেই, তাঁদের কাছে

ভগবান্ পর্য্যন্ত না থাকতে পারেন। তাঁর থাকা আর না থাকাও তাঁদের দয়া মরজির উপর নির্ভর করে। যাঁরা মামলায় নথি দেখিয়ে সতী জিনিষটা উড়িয়ে দিতে চান, তাঁদের কাছে পরাজয়-স্বীকারই সমীচীন ইত্যাদি।

বাইরে বেরিয়ে মুস্কিলে প'ড়ে গেলুম। উভয় পক্ষই আমার মত জানবার জন্যে জেদ্ ধরলেন। বললুম "—আমি আমার সতীত্ব রক্ষা করতে চলেছি, তার চেয়ে বড় ধর্ম্ম এখন আর মাথায় আসবে না, ভাই। তোমাদের চলুক না,—এসে শুনবো অখন। কিন্তু সাবধান হয়ে—"

শরৎবাবু হেসে বললেন—"ওঃ, কার মত চেয়েছ! উনি যে বেজায় স্ত্রৈ—"

প্রশান্ত হাসিতে যোগ দিয়ে, আমার দিকে চেয়ে বললে - "বটে, সত্যি না কি, বিজন?"

হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়লুম।

দশটার মধ্যে ফিরে এসে দেখি, সভাভঙ্গ হচ্ছে—সব দাঁড়িয়ে।

দেবেনবাবু বললেন—"আমরাই হারলুম।"

বললুম—"ও আলোচনা হেরে থামিয়ে দেওয়াটাই জিত।"

২

আনন্দময়ী সে বছর কিসে এসেছিলেন, সে কথাটা আজ মনে নেই, কিন্তু এ কথাটা এ জন্মে ভুলতে পারব না যে, তাঁর আসার সাড়া পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-প্রদেশে দুর্ভিক্ষের ভেরী দিকে দিকে লক্ষ কণ্ঠে বিকট রবে বেজে উঠেছিল।

যার যেটি প্রাণাপেক্ষা বা প্রাণসম প্রিয়, বিপদের সময় সে সেইটিকে নিরাপদ রাখবার চেষ্টা পায়। সে বস্তুটি তোমার আমার কাছে মূল্যহীন হ'লেও বা অত্যা-বশুক না হ'লেও,—তার যে সেটি না হ'লে নয়!

চেতলায় চেলোপটীতে আগুন লাগে। অগ্নিদেব যখন বৈদ্যনাথদের চালা দুখানিতে জিহ্বা স্পর্শ করলেন, বৈদ্যনাথের মা পাগলিনীর মত চীৎকার ক'রে উপায়ের তরে ছুটোছুটি করতে লাগলেন।—তাঁর যে যথাসর্ব্বস্ব—নারায়ণ, দু'তিনখানা গহনা, কাপড়, বিছানা বাসন, সবই ঐ ঘরে।

বারো বছরে বৈদ্যনাথ বাড়ী ছিল না। সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে মাকে তদবস্থ দেখে বললে, "চেঁচাস্‌নি, চুপ কর, দেখ না, আমি এক মিনিটে সব বার ক'রে আনছি।" মা তাকে ধ'রে রাখতে পারলেন না—"ওগো, আমার সব গেল" ব'লে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বৈদ্যনাথ কিন্তু বীরের মত একলাফে তার যথাসর্ব্বস্ব অর্থাৎ ঘুঁড়লাটাই নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল! লোকের প্রিয়া-প্রিয়ের কি বাঁধা-ধরা বিধি আছে!

আমরা থাকতুম জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে। এই ক্যাণ্টনমেণ্ট্ জিনিষটি কোনও একটি বড় যায়গায় "কাঞ্চন ment" করা স্বতন্ত্র অংশ,—সেনানিবাস। যেখানে দেশরক্ষার সজীব ও নির্জ্জীব যন্ত্র সকল থাকে, আর তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের ব্যবস্থা,—আপিস, হাঁসপাতাল, ক্লব, ব্যায়ামভূমি, ক্রীড়াকৌতুকের স্থান, থিয়েটার, পার্ক ইত্যাদি সব সরঞ্জামই মজুদ্ থাকে। রাজভোগ রুটী, মাখম, মটন, expertএর (অভিজ্ঞের) পরীক্ষান্তে তাঁদের পেটে যায়। সেনাপতি, এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি সাহেব-সুবোর বড় বড় বাংলা, বাগান, বারুদখানা, সবই সেথায় হাজির। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, কোথাও ময়লা জমবার জো-টি নেই, Health officer দুবেলা দেখেন। বাজারে পচামাল পাচাড় হয় না। সংক্রামক রোগ সভয়ে স'রে পড়েন, ভুলে পা বাড়ালেই সিগ্রিগেসন্-ক্যাম্পে (Segregation campএ) বন্দী হন। এর মাঝেও যদি একটি গোরা সৈনিক সাধারণ কোন রোগে অকালে মরে ত হুলস্থূল প'ড়ে যায়, অষ্টবজ্রের কমিটী বসে, ব্যারাকের অন্ধি-সন্ধি আর চা থেকে মাংস পর্য্যন্ত পরীক্ষার ধূম প'ড়ে যায়,—তিন দিস্তে কাগজ কৈফিয়ৎ দিতে খরচ হয়। অর্থাৎ মরে কেন এবং মলো কেন? কিসের কমতি হয়েছিল,—রাজভোগের ত খুঁৎ রাখা হয় নি, গোরা তবে ৮০ বছরের আগে মরে কি দুঃখে? মলেই হ'ল! তাই তার কারণ বার করতে আকাশ-পাতাল এক ক'রে ফেলা হয়। সে সমস্ত

বোটানিক্যাল গার্ডেন

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—এস, জি, ঠাকুর সিংহ।

যমেরও বোধ হয় বেজায় দুশ্চিন্তায় সময় কাটে,—ফিরিয়ে বা দিতে হয়! ব্যাপারটি এমন কঠিন।

আমাদের নন্দের গোপাল ননী খেতেন বটে, কিন্তু এতটা তোয়াজ তিনি যে পাননি, সে কথা চোখ-কান বুজে বলা যায়।

যাক, এই গোরারাই রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং মূল্যবান্ আঁসবাব,—বৈদ্যনাথের ঘুড়িলাটাই! তাই নজরটা ওদের ওপরই সমধিক। সেটা থাকাও স্বাভাবিক এবং উচিতও। কারণ, ওরাই জান্-মানের রক্ষক। ওদের তরেই ক্যান্টনমেণ্ট। সেই ক্যান্টনমেণ্টেই আমরা থাকতুম। আর থাকতো সরকারী সাঙ্গোপাঙ্গরা (followersরা) যাদের রসদের ব্যবস্থা সরকারই ক'রে থাকেন, রস মরতে দেন না,—দালরুটীর ত্রুটি হয় না!

ক্যান্টনমেণ্টগুলো প্রায়ই হয় সহর থেকে ক্রোশাধিক তফাতে; সহরের বদ হাওয়া না সেখানে ধাওয়া করে। এই সহরগুলিই হচ্ছে ভারতের খাসমহল,সাম্যের সনাতন ভূমি। আগন্তুকমাত্রেই এখানে আশ্রয় পান;—আকাল, রোগ, মড়ক সকলকেই "স্বাগত" ব'লে এখানে গ্রহণ করা হয়। কারুর বাধা পাবার বালাই নেই।

রোজই কানে আসতে লাগলো—অন্নক্লিষ্টের কঙ্কাল-মূর্ত্তিতে সহর ভ'রে গেল, পথে-ঘাটে পা বাড়াবার স্থান নেই। ছেলে-মেয়েরা ভয়ে বাজার-হাটে বেরোয় না।

আনন্দমঠ প'ড়ে শিউরে উঠতাম, কখনও ত সে অবস্থা চোখে দেখিনি। ভাবতুম, সত্যি এমন হয় না কি? যা হ'ক্, আমরা ক্যান্টনমেণ্টে থাকি,—এ নিদারুণ দৃশ্য দেখতে হবে না। এ একটা কম স্বস্তির কথা নয়! এখানে হুকুম বেরিয়ে গেছে,—চারদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন্,দুর্ভিক্ষপীড়িত পাখীটিরও ক্যান্টনমেণ্টে প্রবেশ-পথ রাখা হয়নি। সে চেহারা দেখলে কি আর রক্ষা আছে! প্রাণের প্রফুল্লতা, মনের স্ফূর্ত্তি, দেহের স্বাস্থ্য এক চাউনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে। সুখের ঘরে এ আপদ আবার কেন!

৩

"হ্যায় ভুখা হুঁ!"

"থোড়া কুছ খানে দেও, মাঈ-বাপ্!"

"চার রোজ এক দানা নেহি মিলা!"

"বাচ্চাকো বাঁচাও, মাঈ!"

রাত শেষ হয়েছে,—এখন প্রায় চারটে হবে। ঘুম পাতলা হয়ে এসেছিল। আচম্কা অস্বাভাবিক কণ্ঠের এই সব আওয়াজে চম্‌কে উঠলুম। এ কি ক্যান্টনমেণ্টে! না, তারা নয়। পাহারা পেরিয়ে আসবে কি ক'রে।

আবার সেই আওয়াজ! কথা বুঝা কঠিন,—একটা কাতরধ্বনি মাত্র। শুনলে শিউরে উঠতে হয়।

প্রশান্ত আর আমি বাইরের বৈঠকখানাতেই শুচ্ছিলুম। সে দেখি বালিস থেকে মাথা তুলে শুনছে। পরক্ষণেই তড়াক্ ক'রে তার খাট থেকে লাফিয়ে প'ড়ে আমার খাটের পাশে হাজির। আমাকে সজোরে একটা নাড়া দিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—"ঘুমুচ্ছ না কি?"

"না,—কেন?"

"এটা কি haunted house? (ভূতের বাড়ী)"

"কে বললে?"

"কিছু শুনছো না?"

"ও বোধ হয়, দু'এক জন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক, অন্ধকারে ছট্‌কে পাহারা এড়িয়ে এসে প'ড়ে থাকবে।"

"Humbug,—আওয়াজটা শুনছ না, আর এই গভীর রাত্রে!"

"গভীর রাত্রি কি হে, চারটে বাজে যে। ঘড়ীটে দেখ না।"

"দেখেছি, দেশের ধারা ঠিকই বজায় রেখেছ,—এক চুলও এগোও নি। বিলেত হ'লে অপরাধটার গুরুত্ব বুঝতে পারতে,—ও রকম একটা ফাঁদ রাখবার মজা টের পেতে। সেখানে থেকে আমাদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, ঘুমন্ত ব'লে দিতে পারি—সময়টা কত। বড় জোর দু'তিন মিনিটের তফাৎ হয়।"

"এখন তা হ'লে ক'টা?"

"Quarter to twoর বেশী নয় (পোনে দুটোর বেশী নয়) সে কথা এখন থাক। ওঠো দেখি, এঁদের একবার খোঁজ নেওয়া ত দরকার। এতক্ষণ সব কি করছেন, বলা যায় না।"

"করবেন আবার কি—বেশ নাক ডাকাচ্ছেন।"

"না না, তামাসা নয়, তুমি ওঁদের thoroughly

জান না, ফিট্‌টিট্ হয়ে যেতে পারে—চাই কি হয়েই গেছে, উঠে পড়, উঠে পড়।"

"তুমিই দেখে এসো না, তোমার বউদি ত তোমার সঙ্গে কথা কন।"

"তোমারও একটা duty (কর্ত্তব্য) আছে ত,—এ রকম অবস্থায় না গেলে তাঁকে অপমান করা হবে না? চল চল।"

আসল কথা, প্রশান্ত একা যেতে পারছিল না। এই সময় দেয়ালের পাশেই একটা গোঁগানি শব্দ শুনে সে একদম আমার ঘাড়ে এসে পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। বললুম, "চল।"

সে আমার পাশে পাশে চললো। ঘরে ল্যাম্প জলছিল, বাইরে বেরুতেই আলো দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলো—"এ কি, এর মধ্যে ফর্সা,—কি দেশ বাবা!"

"এখানে যে দিকে চাইবে, সেই দিকেই 'ফর্সা' পাবে।"

আমার কথায় কাণ না দিয়ে, কথা শেষ না হতেই প্রশান্ত বললে, "কিন্তু I bet, এটা তোমার haunted house, মার্বল রক্ দেখা মাথায় রইলো, আমি first train এই ফিরছি।"

আমিও সে কথায় কান না দিয়ে, বল্লুম—"এঁদের অবস্থাটা আগে দেখা যাক্, ভাই—God forbid (ঈশ্বর না করুন)"

"God bless" বলেই সে একলাফে জানালার সামনে গিয়েই মুখ ফিরিয়ে দু'পা হঠে এসে বললে, "excuse me আমার হুঁস ছিল না, দুজনেই অসাড়ে ঘুমুচ্ছেন।" তার পরেই চিন্তিতভাবে "অজ্ঞান হয়েও ত থাকতে পারেন" উদ্বিগ্ন স্বরে—"সারা—সারা!"

হাসি চেপে তাড়াতাড়ি বললুম, 'ঘুমুলে আর কার জ্ঞান থাকে? শুনতে পাচ্ছ না, দুটো সুর পাশাপাশি পাল্লা দিচ্ছে, দুজনে যেন বাহাদুরী-কাঠ চিরছে।"

উৎকর্ণ হয়ে শুনে প্রশান্ত একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, "Thank God, কিছু মনে করো না, বিজু, আমাকে upset ক'রে ফেলেছিল। মহিলাদের সম্বন্ধে neglectful হওয়াটা আমি চরম অভদ্রতা ব'লে মনে করি, ভাই।"

"তা ত দেখতে পাচ্ছি।"

Now to the danger zone (এইবার বিপদের মুখে) – ভোলা—ভোলা, রাসকেল্, এখনও ঘুম মারছো?"

ভোলা চাকরদের কামরা থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এসে বললে—"হুজুর!"

"শূয়ার, এই বিপদের ওপর আবার এক চোখ দেখান! দু-চোখ বোজ। আচ্ছা, হয়েছে। শীগ্‌গির—খুব শীগ্‌গির, দ্যাখ"—এই ব'লে বাঁ হাতের মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বাড়া-বাড়া এক ইঞ্চি দেখিয়ে বললে, "বুঝলি?"

"আজ্ঞে, আজ্ঞে, না হুজুর!"

"You cheeky rascal, দেড় মাসে তোমার মাত্রা-জ্ঞান হ'ল না" এই ব'লে ঘুসী পাকিয়ে যেতেই ভোলা "বুঝেছি, হুজুর" বলতে বলতে তাড়াতাড়ি ছুটে হুকুম তামিল ক'রে মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রে দিলে।

প্রশান্ত এক চুমুক নিয়ে বললে—"রিভলভারটা।"

বললুম—"রিভলভার কেন?"

"কেন! ব্যাপারটি light (সহজ) ভেবো না। এটা একটা adventure জেনো।"

"এটা Non-reguleted Province, সেটাও জেনো, রিভলভারের All India Pass আছে ত?"

ভোলা সেটা আনতেই প্রশান্ত বললে—"একদম আমার সুট-কেসের তলায় রেখে দিয়ে আয়,—এখুনি—আগে।"

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—"তুমি ক্ষেপেছ, বিজু;—আমি কি টোটা রাখি!"

"তবে শুধু শুধু এ risk (বিপদ) বয়ে মরা কেন?"

"তোমরা যে রকম বীর, কেবল ওর leather caseটা বার করলেই হাজার লোক হুড়মুড় ক'রে হঠে যাবে, সেটা স্বীকার কর ত?"

"সেইটিই কি টোটা না রাখবার কারণ?"

"কারণ অনেক। একটা কথা মনে রেখো—তরুণী বা যুবতী মহিলা ঘরে থাকলে কখ্‌খনো অমন ভুলটি ক'রো না। আমি ও জাতটিকে thoroughly জানি, সামান্য কারণে ওঁরা অসামান্য কাণ্ড ক'রে ফেলেন। যাক্,—এখন চল দেখি।"

আমাকেই দোর খুলে আগে বেরুতে হ'ল। পিছন থেকে খুব মিহি সুরে whisperএর মত 'দুর্গা দুর্গা' কানে এলো! তখনও ঝাপসা ভাব আছে। ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে প্রশান্ত বললে—"এখনও কি বলতে চাও,—এটা haunted house (ভূতের বাড়ী) নয়! ভিয়ানা হোটেলেও experience (অভিজ্ঞতা) আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে, মরতে মরতে বেঁচে এসেছি। তোমাকে আজই এ বাড়ী বদলাতে হবে, বিজু। আর এক রাত্তিরও আমি তোমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছি না।"

রাস্তার ওপারেই হরকিষণবাবুর বাগান। দেখি, তাঁর ফটকের কাছে বিশ ত্রিশটি ছায়ামূর্ত্তি;—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ব'সে, কেউ শুয়ে। বোধ করি, চেঁচাবার আর শক্তি নেই,—এক জন কেবল চিঁ চিঁ ক'রে বার দুই বললে "কুছ খানে দেও,—জান্ চলা যাতা হায়—"

প্রশান্ত আমার পেছনেই ছিল, চমকে উঠে আমার কাঁধ ধ'রে চুপি চুপি বললে—"শুনলে! তোমরা 'রাম রাম' ব'লে থাকো না!"

চালাকি ক'রে তার রামনাম করাটা শুনে কষ্টে হাসি চাপতে হ'ল।—হরকিষণবাবুর ফটকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললুম—"দেখছ না, আমি যা সন্দেহ করেছিলুম, তাই।"

"বল কি! ভোলা, চট ক'রে আমার হ্যাট আর cane (বেত)—"

ভোলা ভয়ে নড়ে না!

"বেটা, ভয় পেলি না কি? আমি রয়েছি, ভয়? এই তোর দিকে চেয়ে রইলুম—যা,—চট্।"

ভোলা না খসে!

"বেটা—আমার চাকর হয়ে ভয়! Shame! কালই দূর ক'রে দেবো! Arrant coward তোদের রাম রাম বলতে বলতে যা না মুখখু। আচ্ছা, এসো ত বিজু—হ্যাট না হ'লে হবে না।"

"আমার টোনে Oxford drone থাকায়,—মানুষ হয় ত ছুট মারবেই। তুমি মজা দেখ না।"

হ্যাট আনা হয়েছিল; বললুম—"আমি মজা দেখতে চাই না, ভাই। ওরা মরেই রয়েছে, ওদের আর তাড়াহুড়ো ক'রো না।"

সে তখন তাদের Oxford drone শোনাচ্ছে। তারা ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রয়েছে। চক্ষু কোটরগত—যেন দূরের তারার মত জ্বলছে। এক মাথা ক'রে ধূসর চুলের বোঝা, রংগের দু'পাশ ব'সে গেছে। হনুর হাড় বেরিয়ে পড়েছে, সবার দাঁতই বাইরে। পেট পিঠ এক, হাত আর আঙুল—ময়লা চামড়া-ঢাকা কঙ্কাল! মানুষের কাটামো মাত্র। দেখলে ভয়ই হয়, অন্য কোনও ভাব আসে না।

Oxford droneএ কোনও সাড়া না পেয়ে প্রশান্ত হিন্দী সুরু করলে,—"জল্‌দি বাগো, দিক্ মৎ করো। জান্‌টা—ইঁহা টোপখানা হায়—আবি উড়া দেগা, বাগো!"

"খানা"র নাম শুনে কয়েক জন প্রশান্তকে ঘিরে ফেললে—"খানা দেও, সাব, কুছ, খিলাও, সাব।"

চেয়ে দেখি, বেশ ফর্সা হয়েছে, লোক জমতে সুরু হয়েছে, হরকিষণবাবু উঠে এসে অবাক্ হয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। বোধ হয়, খবর পেয়ে চিফ সাহেব (কোতোয়াল) পাঁচ সাত জন কনষ্টেবল সঙ্গে ক'রে এসে পৌছুলেন।

প্রশান্ত তখন 'হটো হটো' করছে। চিফ সাহেবকে দেখে বললে—"আপনি এসেছেন, ভাল হয়েছে, এদের ধ'রে না নিয়ে গেলে নোড়বে না। আমাকে ত আগে বার ক'রে দিন।"

চিফ সাহেব বললেন—"ওদের ধরাধরি আর কি আছে, বাবুজী। ওদের কাছে ঘেঁস্‌বেন না। আমি ওদের নিয়ে যাবার উপায় করছি।"

চিফ্ সাহেবটি হিঁদু, লোকও ভাল। তিনি কনেষ্টবলদের ইসারা করতেই তারা গুড় আর ভিজে ছোলা এক এক মুটো দিতে দিতে তাদের নিয়ে চললো।

প্রশান্ত "Dregs! pestilence!" বলতে বলতে আর 'ভোলা—ভোলা' করতে করতে বৈঠকখানায় গিয়ে পৌছিল। হরকিষণবাবু আর আমি ঢুকে দেখি, কার্ব্বলিক সোপ, ইউক্যালিপটস্ প্রভৃতি নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

প্রশান্ত থাকবে না—আজ সে যাবেই। হরকিষণবাবু নিমন্ত্রণ ক'রে তাকে আটকালেন।

৪

আমরা চার পাঁচটি উপস্থিত। প্রশান্ত বিলেতের গল্প করছে—সেখানকার Maidরা (দাসীরা) কি রকম যত্ন করে, কতটা Interest নেয়, কি সভ্য! প্রত্যেক Movementএ (নড়াচড়ায়) সৌন্দর্য্য যেন ছড়াতে থাকে, Atmosphere (আবহাওয়া) মধুর হয়ে উঠে। সেই সুখেই দেশে ফিরতে মন চায় না—ফিরি ফিরি করেও ছ' মাস কেটে যায়। Passage money (ফেরবার টাকা) দু' তিন বার ফুরিয়ে যায়। যাঁদের হৃদয় আছে, তাঁদের পক্ষে তাদের সেই করুণ দৃষ্টি আর কাতর অনুনয়-অনুরোধ এড়িয়ে আসা সম্ভবই নয়। ইত্যাদি উত্তেজনা-পূর্ণ বর্ণনায় আমাদের সান্ধ্য সম্মিলন জ'মে উঠেছে।

দেবেনবাবু এসে সংবাদ দিলেন, "রাস্তাঘাট যে দুর্ভিক্ষপীড়িতে দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ালো! ছাউনি (Cantwonment) যে ছেয়ে ফেললে। বড় যে বলেছিলেন - কৈ, কোথায় গেল আপনার ক্যান্টনমেণ্টের কড়া হুকুম!"

দেবেনবাবু কথাগুলো আমাকে লক্ষ্য করেই বললেন। প্রশান্তর অমন উপভোগ্য আলোচনার মাঝখানে দেবেনবাবুর এই সত্য প্রচারটা মুহূর্ত্তে সকলের উৎসাহ নষ্ট ক'রে দিলে।

দেবেনবাবু ছিলেন স্পষ্টবক্তা (prosaic), তার মধ্যে poetryর প্রবেশাধিকার ছিল না।

নৃত্যগোপালবাবু বললেন - "দেবেনবাবুর চোখে কখনও কোন ভাল জিনিষ পড়তে শুনলুম না।"

"ভাল কিছু থাকলে ত পড়বে, নেত্য বাবু' তবে জমীদারী থাকলে, কি বাপের ভাতে থাকলে অনেক অ-ভালকেও নিজের রং চড়িয়ে ভাল ক'রে নিতুম। পাঁচ জন পোষ্য নিয়ে পয়তাল্লিশ টাকায় বাজে খরচ চলে না। এই ত বর্ষা গেল, মাসিকগুলো খুললেই দেখি—

'খাল বিল উথলিয়া উঠে।'

কোথা রে বাবা! জল কৈ! আমার চোখে ত খাল বিল খট খট করে। হ্যাঁ, চাষীদের চোখের জল বটে উথলিয়া উঠে। তার প্রমাণ ত আর খুঁজে দেখতে হবে না। প্রমাণগুলো সারা প্রদেশময় পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে! এই দেখে কি বলতে হবে——'আহা' কি সুন্দর দৃশ্য—যেন শ্মশানের লম্বা লম্বা পোড়া কাঠগুলো জলন্ত জলন্ত পেটের প্রদীপ্ত শিখায় পথ আলো ক'রে চলেছে।"

শরৎবাবু তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলেন—"Bravo (সাবাস) দেবেনবাবু, কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ম'রে গেছেন!"

কথাটা সকলেই সহাস্যে সমর্থন করলেন। কেবল নেত্যবাবু বললেন, "আশ্চর্য্য! আমার ধারণা ছিল, ইনি অক্ষয় দত্তর অমর আত্মা!"

হরকিষণবাবুর আবির্ভাবে আলোচনাটা থেমে গেল। তিনি তাঁর গেষ্ট (guest) প্রশান্তকে নিতে এসেছিলেন।

বললুম,—দেবেনবাবুর আসল কথাটা ছিল—'ক্যান্টনমেণ্টের কড়া পাহারা আকাল-ক্লিষ্টদের আটকাতে পারলে কৈ, তারা যে এক দিনেই ছাউনি ছেয়ে ফেল্‌লে।' কথাটা কম দুর্ভাবনার নয়। দেখে পর্য্যন্ত বুঝেছি, তাদের আর রুখবে কে, কোন্ শক্তি তাদের বাধা দিতে পারে! প্রাণের চেয়ে প্রিয় কিছুই নেই, তাই যখন তাদের যেতে বসেছে, তখন আর তারা কিসের ভয় রাখে? তাদের মধ্যে চাষী, মজুর, দেহাতি, মধ্যবিত্ত সবই এক হয়ে গেছে, সকলেই মৃত্যুমুখী,—একই পথে চলেছে! তাদের তরে যম স্বয়ং যখন তাঁর ফটক খুলে দেছেন, তখন মানুষ তাদের আটক করবে কি দিয়ে? সকালে চিফ সাহেব বলেছিলেন—'ওদের ধরবো কোন্‌খানটা, ধরবার আর আছে কি!' কথাটা ফেলে দেবার নয়।

হরকিষণবাবু অতিষ্ঠ বোধ করছিলেন। বল্‌লেন—"বড়বাড়ীর ব্যবস্থাটা কাল বোঝাই যাবে, তার পর যতটুকু পারা যায়, পাঁচে মিলে করলেই হবে। এ আলোচনাটা আজ ঠাণ্ডা হ'তে দিলে, কাল আবার গোরমে নেওয়া যেতে পারবে, কিন্তু ব্যারিষ্টার সাহেবের খানাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে

মাটী হয়ে যাবে; মুখে করতে পারবেন না। ৯টাও বেজেছে, সুতরাং with your permission—আমি ওঁকে নিয়ে চল্লুম।"

"নিশ্চয়ই যাবেন", ব'লে তাঁর কথাটা সকলেই অনুমোদন করলেন।

হরকিষুণবাবু প্রশান্তকে নিয়ে চ'লে গেলেন। আমাদেরও বৈঠক ভাঙ্গলো।

* * * *

আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকছি, দেখি, হুড়হুড় ক'রে ছুটে হুজন দালানে গিয়ে দম নিলে—সরযূ আর আমার পত্নীদেবী। মুখে আঁচল দিয়ে সরযূর চাপাহাসি আর থামে না।

সরযূ আমার সঙ্গে কথা কন। জিজ্ঞাসা করলুম—"ব্যাপার কি, ভোলার নাক ডাকছে বুঝি?" তাতে যেন হাসির কলে দম দেওয়া হ'ল! দম একটু ক'মে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাগা, কাদের যৌবন-শ্রী সিলোনের বসন্তের মত সর্ব্বাঙ্গে ঘোরালো হয়ে দেখা দেয়, সেটা তারা রাখতেও জানে বিশ বছর?"

সর্ব্বনাশ, এ যে প্রশান্তর উচ্ছ্বসিত মেড-মাহাত্ম্যের "ফ্রেজিওলজি" (বাক্যবিন্যাস)!

বললুম,—"ওঃ, প্রশান্ত যা বলছিল বুঝি! ও সেই বিলিতী ময়নাগুলোর কথা, এমনই সেখানকার জল-হাওয়া।"

"বটে! আবার তাদের কাতর অনুনয়-অনুরোধে প্রকৃত-হৃদয়বানদের বাড়ী ফেরবার 'প্যাসেজ-মণি' না কি পকেট গ'লে স'রে পড়ে,—এক বার নয়, হুবার নয়, তিন তিন বার! পাখী বটে! তা না ত আর সে দেশের মানুষ এ দেশের পুরুষগুলোকে জানোয়ার বানিয়ে রেখেছে!"

কথাগুলি বলবার সময় তাঁর হাসি মন্দা প'ড়ে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখে চোখে অভিমান, অপমান ও রোষের আলো ও ছায়া লুকোচুরি খেলছিল।

প্রমাদ আসন্ন দেখে হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি বললুম—"তা হ'লে প্রশান্ত সত্যিই সার্টিফিকেট পেতে পারে, তার 'চাল' বিফল হয়নি—আপনাকে ঠিক ঠকিয়েছে ত!"

"চালটা কি শুনি।"

"আপনারা যে অন্তরালে উপস্থিত হয়েছেন, সেটা সে জানতে পেরেছিল, আমাকে তাই চোখ টিপে বলে—রোসো একটা মজা করি। এই ব'লে উচ্চকণ্ঠে বিলেতের গল্প আরম্ভ ক'রে দেয়, এত জিনিষ থাকতে বিশেষ ক'রে—ঝি-মাগীদের কথা! আপনাদের এখনই বুঝা উচিত ছিল—এক জন মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবার পক্ষে ঝিয়েদের যৌবনশ্রী নিয়ে অতটা উচ্ছ্বসিতভাবে নব-পরিচিত পাঁচ জনের কাছে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবই নয়। প্রশান্তকে আপনার চেয়ে বেশী কে চেনে? তার ঐ আমোদ-প্রিয় স্বভাবটাই ত সব চেয়ে মধুর। যাক্, এর মধ্যে আরও একটা রহস্য ছিল—সেটা আমাকে নিয়ে। সকাল থেকে সে আমাকে হুতিনবার শুনিয়েছে—নারীজাতি সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞানই নেই, সে নিজে কিন্তু তাঁদের thoroughly বোঝে। সেটা এখন স্বীকার করি কি অস্বীকার করি?"

সরযূ ইতোমধ্যে আমার পরিবারের সঙ্গে হাসিমুখে চার-পাঁচবার দৃষ্টি-বিনিময় করেন। বুঝলাম—এক জন নূতন বন্ধুর সাক্ষাতে যে অপমানটা অকস্মাৎ এসে গিয়েছিল, আর আঘাত করছিল, সেটা চাউনির মাঝে উভয়েরই শুভদৃষ্টি পেলে।

বেশ টের পেলুম, একটা গর্ব্বের নিশ্বাস ফেলে, হাসি চেপে সরযূবালা বললেন—"বোঝেন, না—ছাই বোঝেন!"

পরেই—"ও মা কি অধম্ম! রাত হয়ে গেল যে,—দাদাকে আগে খেতে দাও ত, বউদি, তার পর ওঁর বোঝা-বুঝির কথা বলছি।"

* * * *

আমি আহারে বসলুম। সরযূবালা সুরু করলেন,—

"ওঁর বোঝা-বুঝিটে একবার শুনুন, দাদা। বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ পড়েছিলুম, তাঁর অন্য বইগুলো পড়বার তরে মনটা ভারী চঞ্চল হ'ল। এক দিন বললুম, 'আজকাল ত অনেক ভাল ভাল বই বেরিয়েছে,—'বসুমতী'তে বিজ্ঞাপন দেখছিলুম। এক সেট এনে দাও না।'

"কি এলো জানেন? রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আর এক গাড়ী পদ্মপুরাণ! বোধ হয়, আগামী তিন পুরুষের মধ্যে সে বাড়ীর কেউ তা ছোঁবে না! শেষ,—পাশের বাড়ীর মেয়েদের দিয়ে উপন্যাস আনিয়ে পড়ি। সেই ব্যবস্থাই চলছে। কেমন মেয়েদের বোঝেন, দেখলেন!

"'আলিবাবা' আর 'তরুবালা' দেখবার জন্যে ভারী ইচ্ছে হ'ল। রোজ রোজ এর-ওর কাছে শুনে শুনে আর থাকতে পারি না। বললুম, 'পাড়ার সবাই আজকালকার নতুন বই দুখানার অভিনয় দেখে এসে ভারী সুখ্যেত করছে, এক-বার দেখিয়ে আনবে চল না ;—এই শনিবার আবার হবে।' ও মা,—আর কোথায় নে গে উপস্থিত করলেন, দেখি—'পাণ্ডব-গৌরব' সুরু হ'ল! সে'কি চীৎকার!

"শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে' বলে তখুনি ফিরে এলুম।

"সে দিন আমার থিয়েটার দেখা হয় নি ব'লে, আর এক দিন স্বইচ্ছায় নিয়ে গেলেন। কি পাপ!—'নরমেধ-যজ্ঞ!' যত ন্যাকড়াপরা নোড়ে ভোলার দল! সে দিনও অসুখ করছে ব'লে বাড়ী ফিরে বাঁচি। আর বলিও না, যাইও না। ওঁর ধারণা—থিয়েটর দেখতে গেলেই আমার অসুখ করে। আমাদের thoroughly বোঝাটার প্রমাণ পেলেন?

"সকল বিষয়েই আমাদের ঐ রকম বোঝেন! গহনা, কাপড় প্রভৃতি যেটা পছন্দ করি, ঠিক অন্য জিনিষ এনে বলেন—'এই দেখ, তার চেয়ে ভাল আর দামী জিনিষ এনেছি।' কথাটা সত্যি, কিন্তু তা চেয়েছে কে? ট্রাঙ্কে প'ড়ে পচে! আমি নিন্দে করছি না,আমাদের thoroughly বোঝাটা কেবল দেখাচ্ছি! আর শুনবেন?"

পত্নী শেষ-পাতে দুখানা মাছভাজা দিয়ে ফিরছিলেন। সরযুর কানের কাছে মুখটা বাড়িয়ে ফিস্-ফিস্ ক'রে ব'লে গেলেন, "সব শালগ্রামই গোলাকার—তবে পুজোর জিনিষ!"

তাঁর "ফিস্-ফিস্"টা আমার অভ্যস্ত কানে কড়িমধ্যমে ছড়ি বুলিয়ে গেল।

জাতটিকে চিনি না চিনি, তাঁরা যে দয়ার দরিয়া, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। পরিত্রাণ পাবার জন্যে—"উঃ—মস্ত একটা কাঁটা গলায় আটকালো গো" ব'লে যাতনা ও নিষ্কৃতির চেষ্টা প্রকাশ করায় উভয়েই all attention হয়ে পড়লেন, অনেক কিছু কায়দা বাতলাতে লেগে গেলেন।

"তাই ত, কিছুতেই যে যাচ্ছে না, হ্যাঁ বউদি, তোমাদের সে মেনীটে কোথায় গেল,—বেড়ালকে প্রণাম করলে এখ্খুনি নেমে যায়!"

দেড় হাত তফাতেই পত্নীদেবী মুখে রাজ্যির চিন্তা মেখে বিমূঢ়বৎ দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাড়াতাড়ি তাঁকেই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লুম।

তিনি গর্-গর্ করতে করতে থর্-থর্ ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সরযূ খুব হাসতে হাসতে আর—"আপনারা আমাদের যত চেনেন, আমরাও আপনাদের ততই চিনি" বলতে বলতে তাঁর সঙ্গ নিলেন।

৮

দিনটা বিষণ্ণমুখে দেখা দিলে। মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন,—দেখে শয্যা ত্যাগ করতে মন চায় না, পাশ ফিরে শুতেই ইচ্ছা হয়। কিন্তু সরযূ তাড়া দিচ্ছেন—চায়ের জল চড়ানো হয়েছে। অন্য দিন ভোলাকে ডেকে তুলতে হয়, আজ সে ফর্সা কাপড় আর গেঞ্জী প'রে ছুটোছুটি করছে। টিফিন-ক্যারিয়ার ভরতি করা হচ্ছে। প্রশান্ত শুয়ে শুয়েই হুকুম করলে—"আমার বাস্কেটটা নিতে ভুলিস্ নি।" তাকে আবার পাশ ফিরে শুতে দেখে সরযূ ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠ-লেন—"উঠে নড়ে-চড়ে দেখে নেওয়া হোক্ না, ওর এখন অনেক কায,—যা ভোলা, টঙ্গা নিয়ে আয়,—দু'খানা।"

"পাইপটে দিয়ে যা" ব'লে প্রশান্ত উঠে বসলো। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ভাবটা চোখে পড়তেই সে ব'লে উঠলো "ইস্, এই দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে লোক রাস্তায় বেরোয়!"

"বেশ ত, কায কি?" গম্ভীরভাবে এই কথা কয়টি ব'লে সরযূ চ'লে যাচ্ছিলেন।

বললুম—"আপনি কি প্রশান্তর স্বভাবটা জানেন না? কাল আমাকে বলেছে—রদ্দুর দেখলে আমি এক পা বেরুতে পারি না; গা চিড়বিড় করে। বিলেতে ঐ বালাইটি নেই—সকলে তাই ছুটে বেড়ায়। আমারও সেই অভ্যাস হয়ে গেছে, মেঘ দেখলে ঘরে ব'সে থাকতে পারি না—রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ভারী স্ফূর্ত্তি হয়।"

"তার প্রমাণ দেখতেই পাচ্ছি।"

"বেশীক্ষণ দেখতে হবে না" বলেই প্রশান্ত তড়াক্ ক'রে উঠে পড়লো। "দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়া চাই—রদ্দুর দেখা দিতে পারে!"

সরযূ প্রসন্নমুখে বাড়ীর মধ্যে ছুটলেন, প্রশান্ত প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

*　*　*　*

যাঁরা একটু ফাঁকায় থাকেন, তাঁদের কাছে জব্বলপুরের প্রভাত একটা উপভোগ্য দৃশ্য। আজ কিন্তু আমার মনটায় একটুও উৎসাহ আসছিল না। প্রকৃতি অপ্রফুল্ল, মাথার উপর কাক, চিল, শকুন কুগ্রহের মত ঘুরছে, দিকে দিকে কুকুরের চীৎকার শুনা যাচ্ছে—সে যেন কোন্ অদৃশ্য-পুরীর অশুভ আহ্বান! প্রাণটা উদাস হয়ে যাচ্ছে। এমনটা এক দিনে ঘটে নি।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতরা দলে দলে এসে ক্রমেই সহর, সদর ভ'রে ফেলছিল;—কেউ পেটের জ্বালায়, কেউ কাযের আশায়। তাদের চেহারা দেখলে প্রাণ আতঙ্কে শিউরে উঠে, অবস্থা ভাবলে বুক ফেটে যায়। যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করতে যান, ক্রমে ভিড় দেখে আর সেই সব জীর্ণ শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কাল দেখে'ভয়ে, ভগবানের হাতে ভার দিয়ে পেছিয়ে আসেন।—যাঁর আছে, তাঁরও মুখে রাঁধা ভাত উঠে না!

সরকারের কর্ম্মচারীরা অবশ্য নিশ্চিন্ত ছিলেন না, যতটা পারছিলেন, ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে লেগেছিলেন। আর বিশেষ ক'রে সদরে বা ক্যাণ্টনমেণ্টে তারা ঢুকে না উৎপাত করে, রোগ না ছড়ায়, চিত্তচাঞ্চল্য এনে সুস্থ শরীর না ব্যস্ত করে, সে দিকে খর দৃষ্টি রেখেছিলেন।

প্রশান্তকে এ সব খবর দেওয়া হয় নি, তা হ'লে সে পালাতো। হরকিষণবাবু তাকে আজ অষ্টাহ আটকে-ছেন। তিনি Up-tc-date gentleman, তাঁর সঙ্গ পেয়ে প্রশান্ত বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটাচ্ছিল।

৬

ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে "মার্ব্বল রক্" ১৩ মাইলের কম নয়। সাড়ে সাতটার মধ্যেই খেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। রাঁধবার ব্যবস্থা সঙ্গে নেওয়া হ'ল। সরযূ, সাবিত্রী আর ভোলা একখানি টঙ্গায় আগে আগে চললো, দ্বিতীয়খানিতে প্রশান্ত, আর আমি—পশ্চাতে।

পূর্ব্বেই টঙ্গা-ড্রাইভারদের একান্তে ব'লে দিয়েছিলুম, এমন পথ দিয়ে নিয়ে যায়, যে দিকে দুর্ভিক্ষপীড়িতের দেখা নেই।

পাতরের প্রশস্ত পথেই গাড়ী চললো। দুসার গাছের ছাওয়া, আকাশ মেঘ-মলিন, পথ জনশূন্য। দূরে ও নিকটে ছোট ছোট পাহাড়। মাঠে পাঁচ সাতটি কঙ্কালসার গাভী বা দু'একটি ঘোড়া বৃথাই তৃণ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে, আবার মুখ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখলেই প্রাণটা কেমন ক'রে ওঠে, দীর্ঘনিশ্বাস আপনা আপনি ঠেলে বেরোয়।

দু'জনেই চুপচাপ চলেছি, নিস্তব্ধতা যেন চেপে ধর-ছিল। আমরা যেন গোরস্থানের যাত্রী। নূতন জিনিষ দেখতে যাবার উৎসাহটা যেন ভিতরে ভিতরে আত্মহত্যা করেছে।

হঠাৎ এক পাল কুকুরের ডাক শুনে চমকে চেয়ে দেখি, যে ভয় করছিলুম,তাই। অদূরেই নির্জ্জীব কঙ্কালমূর্ত্তিতে পথের দু'ধার পূর্ণ, সঙ্গে সজীব ও সুপুষ্ট দু'তিনটি অপর লোকও দেখা যাচ্ছে। প্রশান্ত ব'লে উঠলো—"এ কি হে!" মেয়ে-দের গাড়ীর ড্রাইভারকে হেঁকে বললে—"গাড়ী রোকো, গাড়ী রোকো।" তাঁদের গাড়ী দাঁড়ালো। আমাদের গাড়ী এগুতেই সরযূ সভয়ে বললেন, "কেন, কি বলুন দেখি, দাদা, ওরা কে?"

"দেখে বলছি।"

উভয়ে গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে দেখি, পথের দু'ধারে পাতরের বড় বড় চাঁই, আর তার আশেপাশে আমন্ত্রিত কঙ্কালরা—কেউ সেই পাতরে হাত রেখে হাঁ ক'রে ব'সে, কেউ তাতে কপাল ঠেকিয়ে ঝুঁকে, কেউ মাথা রেখে চিৎ-পাত হয়ে প'ড়ে আছে। একটা টুলের উপর এক জন ভদ্রবেশী বাবু ব'সে পান চিবুচ্ছেন আর বিড়ি টানছেন। দু'পাশে দুজন ভীমদর্শন চৌকীদার পাতরে ব'সে খইনি টিপছে আর কঙ্কালদের সুমধুর স্বরে মুখভঙ্গী সহ গালি দিয়ে কায করতে ভীম তাড়া লাগাচ্ছে। তার মানে—পাতর ভাঙ্গ, রাস্তা কোপা, ঝুড়ি ভ'রে ভাঙ্গা পাতর এনে রাস্তায় ফ্যাল, রাস্তা দুরমুস কর—যে যা পারিস। মনিবের পয়সা ফাঁকি দিয়ে পাবি নি। উঠো উঠো—লেও—জলদি করো।"

কাঁপতে কাঁপতে উঠে কেউ গাঁতির বাঁটে হাত ঠ্যাকালে, কেউ পাতর-ভাঙ্গা হাথোর স্পর্শ করলে, তার পর শুষ্কমুখে

হতাশভাবে চৌকীদারদের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো; তারা "সিধে কথায় হবে না দেখছি" ব'লে চোখ পাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"এদের মারবি না কি" ব'লে প্রশান্ত আস্তীন গুটিয়ে এগুচ্ছিল, আমি টেনে রাখলুম—"তুমি নিজে ল-ইয়ার, তা মনে রেখো।"

"তবে চল, বাড়ী ফিরি; এই—গাড়ী ঘুমাও। Hellish brutes (সয়তান)!"

স্ত্রীলোকরা কপালে হাত দিয়ে কেবল "এ ভগবান্!" ব'লে, আর পোড়া কাঠের মত পুরুষগুলি—"আরে রামজী!' ব'লে সেই দুঃশাসনদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মোচকে ব'সে পড়লো।

সরযূ আঁচলে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে বললেন—"আমি পাতর (মার্ব্বল রক) দেখতে আর যাব না, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।"

তাঁরা বাড়ীর মধ্যে বন্ধ থাকলেও কিছু কিছু শুনছিলেন, এখন তার বীভৎস রূপ দেখে অধীর হয়ে পড়লেন!

গাড়ী ফিরলো, সব চুপচাপ। কেবল গাড়োয়ান দুজন গালি দিতে দিতে আর "ঐ চামারবাবু আর ঐ দু'বেটা কসাই মনিবের পয়সাটা লুঠ্ছে। জন দশেক ঠিকে কুলী নিয়ে রোজ সামান্য কিছু কায দেখিয়ে এই দেড়শো লোকের বিল (bill) ক'রে টাকাটা ভাগ ক'রে খায়। এই গরীব বেচারারা যেমন না খেয়ে মরছিল, তেমনই মরছে। বেইমান দেশের লোকই যদি দেশের লোক মেরে রোজগারের রাস্তা খোঁজে, তবে আর কে কি করবে!" ইত্যাদি বলতে বলতে চললো।

* * * *

বাড়ী ফিরে রান্নাও হ'ল, খেতেও বসা হ'ল, কিন্তু গ্রাস আর কারুর মুখে উঠলো না।

"না, এখানে আর নয়" ব'লে প্রশান্ত উঠে পড়লো।

পরিবার বড়ই অপ্রভিত হয়ে আমাকে বললেন, "জেনে শুনে তুমি কেন এই দেখতে নিয়ে গিয়েছিলে? দেখ দেখি, কি কাণ্ডটা ঘোটলো!" অর্থাৎ সব দোষটাই আমার।

আজ শনিবার। ওঁদের মার্ব্বল রক দেখাবার জন্যই ছুটী নিয়েছিলুম। প্রশান্ত যে এমন মনমরা হয়ে পড়বে, সেটা আশা করি নি।

চুপ্চাপ্ বিছানায় প'ড়ে পড়েই বোধ হয় সন্ধ্যা হয়ে যেত—যদি শরৎবাবু না এসে পড়তেন।

"এ কি! চারটে বাজে, এখনও শুয়ে! মার্ব্বল রক দেখতে যাবার কথা ছিল না? এত শীগ্গির ফিরলেন কি ক'রে?" বলতে বলতে শরৎবাবু বৈঠকখানায় এসে ঢুকলেন।

আমরা উঠে পড়লুম। চাকরকে তামাক দিতে ব'লে মুখ-হাত ধুতে গেলুম। এসে দেখি, প্রশান্ত সিগারেট-কেস্ থেকে একটি সিগারেট বার ক'রে অন্যমনস্কভাবে সেটায় একবার এদিক একবার ওদিক বাঁ হাতের চেটোয় ঠুকছে।

শরৎবাবু আমাদের ভাব দেখেই বুঝেছিলেন—কিছু একটা ঘটেছে, তাই প্রশ্নগুলার পুনরুত্থাপন করতে ইতস্ততঃ করছিলেন।

এই সময় হরকিষণবাবুও এসে গেলেন।—"এ কি,—খুব সকাল সকাল ফিরেছেন ত? শরৎবাবুকে ঢুকতে দেখে আমি এলুম, তা না ত সন্ধ্যের পর আসতুম। ব্যারিষ্টার সাহেব, কেমন দেখলেন,—বলুন ত worth seeing নয় কি—দেখবার জিনিষ না?"

প্রশান্ত আমার দিকে ইঙ্গিত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললে, "বিজনকে জিজ্ঞাসা করুন।"

তিনি আমার দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যার মানে—"ব্যাপার কি?"

সংক্ষেপে ব্যাপারটা তাঁদের জানিয়ে বললুম—"প্রশান্তর পেটে আজ এক গ্রাস অন্নও যায় নি, মুখে দিতেই পারলে না।"

মিনিট তিনেক কারুর কথা সরল না—সকলেই নীরব। পরে হরকিষণবাবু বললেন—"ব্যারিষ্টার আমাদের বনেদী বড়ঘরের ছেলে, জগতের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে কোনও পরিচয়ই নেই, তাই এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছেন। এ ত দুনিয়ায় কোনও না কোনও স্থানে দেখা দিচ্ছেই। দেখলে প্রথমটা বিচলিত হ'তে হয় বটে, তার পর কর্ত্তব্য এসে উৎসাহ দিয়ে কায করায়। সেইটাই এখন দরকার। এখানেও কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে—যেখানে প্রায় তিনশো লোককে যথাসম্ভব খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে।"

পুতুল নাচের রমণী

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশান্ত উৎসাহের সহিত ব'লে উঠলো—"হয়েছে?"

"হয়েছে বই কি,—মানুষ কি চুপ ক'রে থাকতে পারে! যান, এখন একটু বেড়িয়ে আসুন।"

শরৎবাবু বললেন—"আমিও তাই বলি,—চলুন।"

"আমি আর কোথাও বেরুচ্ছি না—একদম ইষ্টেশন যাবো।"

"একটু না বেড়ালে এ অবসন্ন ভাবটা কাটবে না। আমি মিলিটারী লাইন ঘেঁসে নে যাব, সে দিকে ওসবের সম্পর্ক নেই। একটা কিছু দেখবেন না, চলুন বাদশা-মন্দির দেখিয়ে আনি, অতি সুন্দর স্থান—পাহাড়ের উপর। সেখানে একটি গুহা আছে—যা না কি নর্ম্মদা পর্য্যন্ত গিয়েছে। বেশী দূরও নয়, মাইল তিনেকের মধ্যে। উঠে পড়ুন।"

হরকিষণবাবু বললেন—"সেই বেশ কথা, দেখবার স্থানও বটে। অনেক যায়গা ঘুরেছি, কিন্তু বাদশা-মন্দিরের গণেশজননীমূর্ত্তির মত—শ্বেত পাতরের অমন life size সৌষ্ঠবপূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি কোথাও নজরে পড়েনি। মুখে মাতৃভাবের অমন সুস্পষ্ট বিকাশ কোথাও দেখিনি! দেখে আসুন—দেখবার জিনিষ। চা খাওয়া হয়েছে কি? আমরা প্রস্তুত—"

প্রশান্ত "All right, ভোলা—চা নিয়ে আয় আর বিস্কুটের টিনটা খুলে ফ্যাল" বলেই উঠে পড়লো।

চা-পানান্তে ১৫ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে প্রশান্ত, শরৎবাবু আর আমি বেরিয়ে পড়লুম।

পাক্কা পৌনে তিন মণ ওজনের হরকিষণবাবু দশ বারো বছর আগে থেকেই হাঁটা পথের দাবী ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজের বাগানে গিয়ে ইজি-চেয়ার নিলেন।

মিলিটারী লাইন ঘেঁসে খোলা মাঠের হাওয়া খেতে খেতে চলা গেল। এ দিকে সবই ঝর্‌ঝরে, পরিচ্ছন্ন! মাঝে মাঝে অফিসারদের বাংলো—বাগান, ফুলে-ফলে হাসছে। বিবিধ বর্ণের গোলাপ আর ক্রাইসেনথিমামে উদ্যান আলো ক'রে রয়েছে। মাঝখানে টেনিস-কোর্ট—সাহেব-মেমসাহেবরা কি উৎসাহেই খেলছে! আনন্দের হাসি—নানা সুরে রূপ ধ'রে ফুটে উঠছে; প্রত্যেক অঙ্গ আনন্দ-তরঙ্গে গতিশীল,—ভাসছে! সাবান-সুমার্জ্জিত কুকুরগুলো সেই আনন্দে যোগ দিয়ে বলের (ballএর) পিছনে ছুটোছুটি করছে; অস্তগামী সূর্য্যের আভায় তাদের লোমগুলি রেশমের মত চক্‌চক্‌ ক'রে উঠছে। কোনটিকে কাছে পেয়ে কোন মেমসাহেব কোলে তুলে নে চুমো খেয়ে ছেড়ে দিচ্ছে! আনন্দের অমরাবতী!

প্রশান্ত হঠাৎ ব'লে উঠল—"This is life, জীবন একেই বলে। They know how to enjoy comfort সুখ ভোগ করতে এরাই জানে।"

সারাদিন পরে তাকে খাতে আসতে দেখে, কোনও কথাই কইলুম না। শরৎবাবু কেবল বললেন—"তাতে আর সন্দেহ আছে?"

এই রকম কয়েকখানি বাংলো পার হয়ে "নর্ম্মদা রোডে" ওঠা গেল। পাতর আর কাঁকরের পথ—ধপ ধপ করছে, লোকের ভীড় নেই। দুধারেই বাঁশের ঝাড়—কে যেন টবে বসিয়ে গেছে। কি সুচ্ছন্দ সমাবেশ!

মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় দেখা দিচ্ছে। পথের প্রায় সান্নিধ্যেই একটি পাহাড়ের মধ্যে "গুপ্তেশ্বরনাথ" মহাদেবের স্থান,—সুন্দর ও শান্তিময়। একটু এগিয়েই অপেক্ষাকৃত উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর "মদন-মহল।" "রাণী দুর্গাবতী" আর "মদন" ব'লে এক জন প্রসিদ্ধ ডাকাতকে নিয়ে এই স্থানটি ঘিরে বহু legend ও গল্প-গুজব প্রচলিত। আর এই পাহাড়েই সেই Balancing Stone বা rock বর্ত্তমান, যা দেখবার জন্যে ও রহস্যোদ্ভেদ করবার জন্যে দূর-দেশান্তর হতেও গণিতশাস্ত্রের জ্ঞান-অভিজ্ঞরা আজও আইসেন।

আমাদের লক্ষ্য "বাদশা মন্দির," তাই এ সব পশ্চাতে ফেলে অগ্রসর হওয়া গেল;—"বাদশা-মন্দির" আর আধ মাইল পথ।

৭

মদন-মহল সম্বন্ধে গল্প করতে করতে এক-পো পথ পেরিয়ে পড়া গেছে। প্রশান্ত বললে—"তা হ'লে ওটা দেখতেই হয়েছে।"

সহসা কতকগুলো শিয়াল, বোধ করি, রাস্তার কাছেই ব'সে ছিল, আমাদের দেখে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌লো। প্রশান্ত "By Jove" ব'লে লাফিয়ে উঠলো। "এ কি! দিনের বেলা, ক্ষ্যাপা নয় ত!"

সকলেই সচকিতে সেই দিকে চাইলুম।

যা দেখলুম, তাতে আতঙ্কে তিন জনেরই সর্ব্বশরীরে শিহরণের সাড়া পৌঁছে গেল।

ঘন জঙ্গল পথ-প্রান্তে ক্রমেই বিরল হয়ে এসেছে। তারই মধ্য হ'তে ধূসর কেশাবৃত একখানি শীর্ণ মুখে দুটি চোখের নিষ্পলক তীব্র দৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য করছে দেখে, নেকড়ে বাঘ ব'লে ভ্রম হয়েছিল, এ লোকালয়শূন্য স্থানে বিচলিত ক'রে দিয়েছিল। কাপড়ের রং মাটীর সঙ্গে মিশে থাকায় দেখতে পাইনি। শরৎবাবু সেটা লক্ষ্য ক'রে বললেন,—"কাপড় দেখতে পাচ্ছেন না, মানুষ।"

দেখা গেল, সে কষ্টে কাঠির মত দুখানি কম্পিত হাত তুলে যোড় করলে।

প্রশান্তই সর্ব্বাগ্রে এগুলো, আমরাও চললুম। নিকটে গিয়ে দেখি স্ত্রীলোক, আর তার পাশেই প্রায় ছ' ফিট লম্বা, অস্থি-চর্ম্ম-সার একটি পুরুষ প্রলম্ব প'ড়ে আছে! মৃত কি জীবিত, বুঝা যায় না। কি ভয়ানক দৃশ্য, যেন প্রেত-যুগল!

স্ত্রীলোকটি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, "একটু জল, পাঁচ দিন ইনি জল পান নি! শিয়ালের ভয়ে এঁকে একলা ফেলে খুঁজতে যেতেও পারি নি, তা হলেই টানাটানি করবে, সঙ্গেই রয়েছে! যাবার সময় একটু জলও দিতে পারলুম না!" এই ব'লে লোকটির দিকে চেয়ে এমন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, যা বোধ হয়, ত্রিভুবন ভেদ করতে পারে! তার পর আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে আমার দিকে চাইলে, যেন জানালে, "My kingdom for a horse"!

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, -"বেঁচে আছে কি?"

"এখনও আছেন।"

আমিই পুরোনো লোক, আমিই ছুটলুম। জলই বা কোথায়, আনবই বা কিসে, তা জানি না! একমাত্র ভরসা "বাদশা মন্দির।" সেবায়েতটি লোক ভাল, পরিচয়ও আছে।

ভগবান্ দয়া করলেন, অর্দ্ধপথেই দেখি, দু'জন শ্রমিক নর্ম্মদার স্নান ক'রে ফিরছে,দু'জনের হাতেই এক এক লোটা জল। তাদের অবস্থা জানিয়ে চার চার আনা দেব ব'লে রাজি ক'রে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত এসে পৌঁছুলুম।

জল দেখে স্ত্রীলোকটি এক বার আকাশপানে চাইলে, তার পর হাত পাতলে। শ্রমিকরা ঘটি দিতে চাইলে না, দিলেও সে তুলতে পারত না, হাতে ঢেলে দিতে লাগল। জল নিয়ে, ধীরে ধীরে পুরুষটির চোখ-মুখ ধুইয়ে দিতেই সে চেয়ে দেখলে, মুখ থেকে ক্ষীণ স্বরে শুনা গেল—"রেবতী?"

"হাঁ—পিয়ো।"

"তোমারা হ্যায়?"

"বহুৎ।"

পুরুষটি ধীরে "বহুৎ" কথাটি অভিনব ভঙ্গীতে উচ্চারণ ক'রে অনেকখানি জল খেয়ে "ছুট্টি" ব'লে চোখ বুজলে।

"হায় বিনায়ক!" ব'লে স্ত্রীলোকটি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। অনেক বলায় এক অঞ্জলিমাত্র খেলে। একটি ছোট্ট পুঁটলি খুলে একটা লম্বা টিনের কৌটো বার ক'রে তার এ জগতের শেষ সম্পত্তি দুটি টাকা, কয়েক গণ্ডা পয়সা আর একটি নথ মাটীতে উপুড় ক'রে ঢেলে দিলে, পুঁটুলিটাও দূরে ঠেলে দিলে। তার পর বললে, "এই টিনটায় জলটুকু রেখে দিন।" তাতে পো-খানেকও ধরলো না।

শ্রমিক দু'জন "আরে রামজী" বলেই দ্রুত প্রস্থান করলে। এত বললুম, এত ডাকলুম, কিছুতেই কিছু নিলে না, পয়সার কথায় কানও দিলে না।

সন্ধ্যা আসন্ন দেখে প্রশান্ত বললে,—"এ স্ত্রীলোকটিকে বাঁচানো চাই, বিজু— ও বাঁচবে।"

স্ত্রীলোকটি আপন মনে ব'লে চললো—"আর তুমি কতক্ষণই বা আছ, আমার সকল ঐশ্বর্য্য তোমার সঙ্গে যাচ্ছে। আজ ১৯ বছর পরে আমাকে একলা ফেলে যেতে পারবে এই দুনিয়ায় রেখে? যেখানে অন্ন না পেয়ে অকালে তোমাকে যেতে হ'ল, সেই দুনিয়ায় অন্ন খেতে আমি থাকবো! না, বিনায়ক, তা যেন না হয়।"

মাথার ঠিক নেই।

প্রশান্ত বিলিতী অভ্যাসে অনেক বুঝিয়ে বললে, "তুমি নিজেই দেখছো, ও ত আর বাঁচবে না, তুমি কিন্তু চিকিৎসা আর আহার পেলে বাঁচবে। আমরা গাড়ী আনছি, চল। আমরা ওঁকে দেখবার লোক দিচ্ছি। অমন হাজারও হাজারও লোক নিত্য মরছে, উপায় কি? যে যাবে, তার জন্যে নিজের প্রাণটা বৃথা নষ্ট কর কেন? তাতে পাপ আছে। জীবন অমূল্য জিনিষ। গাড়ী আনাই।"

স্ত্রীলোকটি অবাক্ হয়ে শুনছিল, হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বিকৃত স্বরে ব'লে উঠলো, "যাও, দিক্ মৎ করো। পিপাসিতকে জল খাইয়েছেন, ভগবান্ আপনাদের ভাল করবেন। প্রাণের মূল্য এখনও কি আপনার চোখে পড়ে নি? কত বড় প্রাণ আজ না খেতে পেয়ে চ'লে যাচ্ছে, তা জানেন?—যাও।"

একটু হেসে, তাচ্ছীল্যস্বরে বললে, "ওঁকে এই সময় ফেলে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে যাব—১৯ বছর পরে! আর অপর লোক ওঁকে দেখবে! সে ওঁকে দেখবার কি জানে? ওঁর প্রত্যেক শিরার সূক্ষ্ম গতিটি পর্য্যন্ত যে আমার কাছে আমারই মত পরিচিত! ওঁর ভাগ নেবার অধিকার আর কার আছে?—যাও।"

পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে—"যদি একটু জল চান, কি ডেকে আমায় সাড়া না পেয়ে হতাশ প্রাণে কষ্টের শ্বাস ফেলেন, আমার যে জীবনব্যাপী পূজা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওঁর কাতর উচ্ছ্বাসগুলির আশ্রয় যে আমার মাঝে। এ সব তুমি বুঝবে না,—যাও, আর দিক্ কোরো না।"

কোন প্রকারেই কোন পরিচয় দিলে না। এ অবস্থায় ফেলে যেতেও কারুর মন সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু উপায় কি?

প্রশান্ত বললে, "বেশ, আমরা গাড়ী আনিয়ে তোমাদের দু'জনকেই নিয়ে যাচ্ছি, চল।"

"উনি আর অল্পক্ষণই আছেন, তুলতে গেলেই মারা যাবেন। শান্তিতে যেতে দিন। আমরা মাটীর মানুষ, মাটীর কোলে মিশিয়ে যেতে দিন।"

"তার পর, এই জনশূন্য জঙ্গলে, অন্ধকার রাত্রিতে মৃতের পাশে তুমি একলা থাকবে? তোমাকে দেখবে কে?"

"যো আজ দেড় মাহিনা দেখ রহা হায়, যাও—যাও। হামারা রাস্তা সিধা হায়। বড়লোকের দয়া এখন বড় অশান্তিকর,—যাও।"

আমরা দেখতে এসে বড়ই সমস্যায় প'ড়ে গেলুম। না কোনও কাযে লাগছি, না নড়তে পারছি।

ক্ষণেক নীরব থেকে বললুম—"মা, আমরা কি আপনাদের কোন কাযে লাগতে পারি না? আমাদের কিছু বলুন।"

একটু শান্ত হয়ে, কাতর কণ্ঠে বললেন—"শিয়ালরা আজ তিন চার দিন পিছু নিয়েছে, আজ দিনের বেলাও নিষ্কৃতি ছিল না। তাদের আর সবুর সইছে না। আমার সামর্থ্য ওরা বোঝে। কাল রাতেই এসে ধরেছিল, অনেক ক'রে বাধা দিয়েছি। আজ আর পারব না। আপনাদের দেখে অন্তরালে গিয়ে অপেক্ষা করছে। ওঁর দেহে এখনও প্রাণ রয়েছে,কিন্তু আপনারা চ'লে গেলেই আমারই চোখের সামনে ওঁকে টানাটানি করবে, ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে! যন্ত্রণায় বিনায়ক আমাকে ডাকবে—আমি যে কিছুই করতে পারব না!"

এইবার তিনি ভেঙ্গে পড়লেন—"হায় ভগবান্!" ব'লে একটি দীর্ঘনিশ্বাস শেষ করেই ফুলে ফুলে কেঁদে ফেললেন। কে সে দৃশ্য দেখতে পারে! স্ত্রীলোকের এত বড় অসহায় অবস্থা যে কল্পনাও করা যায় না!

প্রশান্ত আমার দিকে অসহায়ের মত চাইলে।

বললুম—"তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি উপায় করতে পারি কি না দেখি। আমার আধ ঘণ্টাটাক্ দেরী হ'তে পারে।"

দ্রুত বাদশা মন্দিরে গিয়ে, সেবায়েতকে সব ব'লে, এক জন লোক চাইলুম। সে সারারাত সেখানে উপস্থিত থাকবে, শিয়ালে না উপদ্রব করে। আমরা সকলেই আসবো, সে এক টাকা বকসিস পাবে।

সেবায়েত লোক ক'রে দিলেন আর তাকে গাঁজা খাবার জন্যে আলাদা চার আনা এখনই দিতে বললেন। লোকটি লাঠি, লণ্ঠন, গাঁজা, কলকে আর দেশালাই যোগাড় ক'রে নিয়ে আমার সঙ্গে এলো।

সকলেই ভারী একটা স্বস্তি বোধ করলুম।

স্ত্রীলোকটি যেন বল পেলেন;—বললেন, "এখন আর আমার কোন চিন্তা নেই। এর চেয়ে এ দুনিয়ায় বড় প্রার্থনা আমার আর ছিল না; ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন। কাল সকালে এ দিকে যদি একবার আসতে পারেন—"

কথা অসমাপ্ত থাকতেই প্রশান্ত ব'লে উঠলো, "নিশ্চয়ই আসবো, আপনি একলা কি করবেন, আপনাকে নিয়ে যাব। তখন ত আর কোনও আপত্তি থাকবে না?"

তাঁর সেই কষ্টক্লিষ্ট মুমূর্ষু মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেল, চক্ষু কি একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবে ভেসে উঠলো। একটা পবিত্র বিমলজ্যোতি মুখে যেন ছাড়িয়ে গেল। যে মুখ

দেখে পূর্ব্বে তিন জনই ভয় পেয়েছিলুম, সহসা সেই মুখে অপূর্ব্ব শান্ত-শ্রী দেখে তিন জনই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ইনি এই বেশে এই অবস্থায়ও এত সুন্দর! কৈ, এতক্ষণ ত লক্ষ্য করি নি।

সরম-ঢাকা স্নিগ্ধ হাসির মধ্যে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "উনি গেলে, আমি কি আর থাকতে পারি? উনি ছাড়া কি আমি? নারীর আর কি রইল, কোন্ ঐশ্বর্য্য রইল! উনি যে আমার স্বামী!"

সন্ধ্যা হ'ল। "আমাকে মর্ম্মান্তিক যাতনা থেকে মুক্তি দিলেন, এখন আমার আর কোন অভাবই নেই, ভগবান্ আপনাদের সুখী করুন। আর কষ্ট পাবেন না, বাড়ী যান।" বার বার জেদ ক'রে আমাদের ফিরিয়ে দিলেন।

পথের দুধারে কি আছে না আছে, সে দিকে কারও আর নজর রইল না। যেন একলাটির মত তিন জনই নীরবে চললুম।

মিনিট পনেরো পরে প্রশান্ত ব'লে উঠলো—"জব্বলপুর আসা সার্থক হয়েছে, আর কিছু দেখতে চাই না। এমনটি এ জীবনে দেখিনি।" অন্যমনস্ক হয়ে বললে—"বড় সব অপরাধ হয়ে গেছে!"

শরৎবাবুর জীবনটা এলোমেলো—বিবাহ করেন নি। মাথা তুলে বললেন—"সবুর করুন, ব্যারিষ্টার সাহেব, যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না। জীবনটা অত ফ্যালনা জিনিষ নয়। তবে খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক বটে, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার মন্ত্র জানে। অনেক স্ত্রীলোকেরই ওইটা craft. আমি আপনাদের চেয়ে বহুৎ দেখেছি। কাল সকালে বুঝতে পারবেন। আপনারা ভাবছেন বুঝি প্রাণ দেবে! হুঃ অকূলপাথারে পড়বার মুখে ও বাহাদুরী-কাঠ পাকড়ালে।"

কথাগুলো তখন বিষাক্ত ছুরীর মত আমাদের বিঁধছিল। প্রশান্ত পাছে উগ্র হয়ে ওঠে, আমি তার হাতটা চেপে চুপ ক'রে থাকতে ইঙ্গিত করলুম।

বাসার কাছে এসে শরৎবাবু প্রশ্ন করলেন, "কাল সকালে আবার যাচ্ছেন না কি?"

প্রশান্ত বিরক্তভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "নিশ্চয়ই।"

"দেখি—রবিবার আছে," ব'লে শরৎবাবু নিজের বাসায় চ'লে গেলেন। তাঁকে বসতে বলবার মত ভদ্রতা সে দিন আর আমাদের এল না।

প্রশান্তর অনুরোধে রাত্রিতেই দুখানা টঙ্গা আর একখানা Platform cart ব'লে রাখা হ'ল।

* * * *

ভোরেই গাড়ী এসে হাজির হ'ল। আমরা চা খেয়েই রওনা হলুম। বাড়ীতে ব'লে যাওয়া হ'ল, ফিরতে একটা বেজে যেতে পারে। সঙ্গে এক বোতল দুধও নেওয়া হ'ল।

একটু এগিয়েই দেখি, শরৎবাবু দাঁড়িয়ে। "চলুন, ভুলটো ভেঙ্গে আসবেন" ব'লে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। কি জানি কেন, দুজনেরই সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

পৌঁছেই দেখি, নিযুক্ত লোকটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

"কি রে, খবর কি?"

"সব চুক্ গিয়া!"

"মাঈ?"

"মাঈ ভি।"

বললে, আমরা ফেরবার ঘণ্টাখানেক পরে পুরুষটি কি বলায় স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি তার মুখে "জয় রেবা মাঈ" ব'লে জল দিতে দিতে বললে—"চলো হাম আয়ে!"

পরে আমার দিকে ফিরে বললে, "বাবুলোককো হামারা নমস্কার দেকে বোলনা—হামে না আলগ কিয়া যায়।"

তার পর যেমন দেখছেন, ঐ ভাবেই আছে, নড়েও না, সাড়াও দেয় না।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখি, স্বামীর বুকে মাথা রেখে সতী চ'লে গেছেন—উপুড় হ'য়ে পড়ে আছেন। জীবনের কোন চিহ্নই নেই।

প্রশান্ত রুমালে চোখ মুছতে মুছতে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "বিজন্, এক জন ফটোগ্রাফার চাই, ভাই।"

বললুম, "বিচলিত হয়ো না প্রশান্ত, এর সঙ্গে বিলাতী মিশিও না।" সে বুঝলে।

মায়ের ইচ্ছামত নর্ম্মদাকূলে একই চিতায় দু'জনকে দাহ ক'রে যখন বাসায় ফিরে এলুম, দেড়টা বেজে গেছে। "বাড়ীতে ব'লে আসা হয় নি" ব'লে শরৎবাবু সেই পথের ধার থেকেই ফিরেছিলেন, বেলা তখন সাড়ে সাতটা।

* * * * *

প্রশান্ত সেই দিনই সন্ধ্যার বম্বে-মেলে চ'লে গেল।

—শ্রী কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
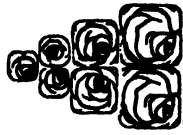
আরণ্য মোহ

মানুষের মনে এক বার যদি খোলা বাতাসের নেশা ধরে, তা হ'লে জীবনে সে আর কাটতে চায় না। অবসরসময়ে নতুন উদ্যোগ, ভ্রমণে কৌতূহল, আর স্মরণে অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চয় ক'রে নেবার জন্য এই নেশা বার বার উৎসাহ দিতে থাকে। ফলে দেহে যে স্বাস্থ্য, মনে বিশ্রামের যে শান্তি, অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের যে নির্ম্মল সুখ উপার্জ্জন হয়, তার তুলনায় গতিবিধির সামান্য অসুখ-অসুবিধা অতি অকিঞ্চিৎকর। চারিদিকে জীবনস্রোতের উচ্ছল গতি দেহের রক্তধারায় যেন নবযৌবন ফিরে আনে, বনের মর্ম্মর, কচি পাতার চুপি চুপি কথা, তানলয়যুক্ত গানের মত প্রাণকে মুগ্ধ করে। জীর্ণ পাতার আড়ালে নব প্রসূনের উন্মেষ, জীবন যে অমর, সে বারতা স্পষ্ট ক'রে জানায়। উড়ে চলা পাখীর ডানার শব্দ মনকে উধাও করে, প্রকৃতির স্বরাজ্যে, মুক্ত জীবনের স্পন্দনের তালে তনু-মন সমভাবে আন্দোলিত হ'তে থাকে। ঘর ছেড়ে এই মাঠে, বনে, পথে, অপথে যাত্রার ফলে শনির দশা আসে না, আনন্দই সাথী হয়। বনের পথে চলতে চলতে অকস্মাৎ যখন নদীপ্রবাহের গলিত রজতধারা চোখের সম্মুখে অবারিত হয়, সূর্য্যালোক কিংবা জ্যোৎস্নাস্পর্শে সে যেন সঞ্জীবিত হয়ে চোখ মেলে চায়, তখন তার সৌন্দর্য্যলীলায় একান্ত মোহিত না হয়ে কেউ কি পারে? আর সেই সঙ্গে যদি লেখকের কল্পনায় এই ছবিখানি ভাস্বরমূর্ত্তিতে দেখা যায়, যদি তার মনে হয়, পার্ব্বতী যেন মহাদেবের চরণকমল স্পর্শ ক'রে প্রণাম করছেন, ধ্যানবিরত যোগিবর মুহূর্ত্তকালের জন্য মুগ্ধ সস্পৃহ নেত্রে সেই অনবদ্য সুন্দরী তরুণী উমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের তরঙ্গের মুখে যেমন ঈষৎ অরুণ আভা প্রকাশ পায়, সেইমত সুকুমার অরুণিমায় উমার পেলব কপোল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তবে তাকে অপরাধী করা যায় না।

শীকারীবেশে ব্যারিষ্টার মিঃ কে, এন, চৌধুরী

বনপথের দুই ধারে অসংখ্য ফল;—কোনটি ভোরের

প্রথম আলোর মত সিন্দুরবর্ণ, কোনটি বা পাকা জামের মত গায় নীল-লোহিত, পাতার ফাঁকে ফাঁকে শীর্ণ গাছের বুকের পাশে আত্মপ্রকাশ ক'রে যেন পক্ষিশাবক ও মানবশিশু উভয়কেই নিমন্ত্রণ ক'রে বলছে—এসো, খাও, জিভে তোমাদের নীল ছোপ ধরবে, ঠোঁটগুলি রাঙ্গা হয়ে উঠবে। কোকিলের কুহু ডাকে প্রাণের সাড়া পাই। অতীতের স্মৃতিতে জীবনের জীর্ণ আশায় আবার যেমন নব চেতনার সঞ্চার হয়, চারিদিকে তেমনই গাছে কচি পাতা, নতুন ফুলের কুঁড়ি সেই সুরে জেগে উঠবার আয়োজন করে।

কেন না, কোকিলার মন বড় চঞ্চল, ইনি একব্রতা নন।

কোকিল যতখানি প্রদেশ অধিকার করে, তার গানের সুরের রাজ্য বিস্তার করে, সেটা প্রায় সম্বর হরিণের রাজ্যের মতই বিস্তৃত; কেন না, কোকিলজায়া একত্র অনেকগুলি ডিম্ব প্রসব করে। এ পক্ষী পরভৃৎ-জাতীয়, কাযেই এই ডিম্ব পরিবেষণের জন্য অনেকগুলি বায়স-কুলায়ের প্রয়োজন হয়। কোন এক অঞ্চলের সমস্ত কাকের বাসায় ডিমগুলি নির্ব্বিঘ্নে রেখে অন্যত্র যায়। আবার

শীকারের অন্বেষণে

আমরা লিখিলে প্রিয় গায়ক পিকবরকে অভিবাদন জানাই, তাঁর হীন জন্মকথা আর স্মরণ করি না। এই কোকিল-দম্পতির মধ্যে কোনটি যে দুর্নীতির অধিক পৃষ্ঠপোষক, সে কথা বলা কঠিন। কোকিলের অবিরাম কুহু-স্বর কোকিলজায়ার মনোযোগ আকর্ষণের একমাত্র উপায়—আমাদের পক্ষে দুঃসহ হ'লেও তার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

নবোৎসাহে নূতন স্বয়ংবরব্যাপারের অনুষ্ঠান চলে। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যদিও বন্য অবস্থায় শুকজাতীয় পাখীদের কণ্ঠস্বর কর্কশ থাকে, তবুও তারা আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত মানব-কণ্ঠস্বরের ও গায়ক পাখীদের শ্রুতিকটু ও মধুর সঙ্গীত অবিকল অনুকরণ করিতে পারে।

কোকিল যেমন আপন সন্তান-সন্ততি কাকের দ্বারা প্রতিপালন করায়, পাপিয়াও তেমনই ছাতারে পাখীদের সাহায্যে আপন বংশধরদের ধাত্রীত্বের দায় হইতে উদ্ধার লাভ করে। সন্তানপালনের কোনই ক্লেশ নিজেরা বহন করে না। তবে দুশ্চরিত্রতায় পাপিয়া কোকিলের মত অতটা অগ্রসর হ'তে পারে নি। য়ুরোপীয়গণ এই পাখী-দিগকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখেন না, তাই এদের অবিরাম গান তাঁদের কানে বিকারের রোগীর অশ্রান্ত প্রলাপের মত মাতালের মত রাতদিন শুঁড়ীর দোকানে মদের দরখাস্ত পেশ করছে।

পাপিয়ার গানে অবিরাম তান ও মূর্চ্ছনা তার প্রাণে প্রণয়ের প্রাবল্যবশতঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনাই প্রকাশ করে। দুর্ভাগা তখন একেবারে মরিয়া হয়ে প্রণয়িনীকে ডাকতে আরম্ভ করেছে—প্রাণ যখন পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, তখন আর জ্ঞানকাণ্ড থাকে না। পাপিয়াকে দেখতে বড় পাওয়া যায় না, গানই কানে আইসে। কোকিলের উপর আর এক

হস্তিপৃষ্ঠে অরণ্যরক্ষক

শ্রান্তিকর ও বিরক্তিজনক বোধ হয়; সেই কারণেই এদের নামকরণ করেছেন "সান্নিপাতিক রোগী।" ভোর হ'তে তপ্ত দুপহর, দুপহর হ'তে স্নিগ্ধ শিশিরসিক্ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এদের গানের আর বিরাম হয় না। তবে সে সুরে রোগ-প্রলাপের চেয়ে রাগ আলাপের মাধুর্য্যই আমরা অধিক অনুভব করি—তাই পাপিয়ার এই পাশ্চাত্য নামকরণ আমাদের মনে ধরে না। যাঁরা এই সুন্দর গায়কের এমন নাম দিয়েছেন, তাঁরা বোধ হয়, বিলাতের চ্যাফিং Chaffing পাখীর চীৎকার কখনও শোনেন নি। তাঁরা ত মনে হয়,

বিষয়ে তার জিৎ, গলা তার কখনও ভাঙ্গে না, কোকিলের সেইটি হয়—তাও শুনি লোভের দোষে, অত্যধিক জম্বুফল আহারের ফলে। এটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কোকিল আর পাপিয়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কণ্ঠযন্ত্র একই গঠনের—উভয়েরই গানের শক্তি এক হওয়া উচিত। কিন্তু কাযে তা হয় না; স্বামী স্ত্রীর চেয়ে অনেক ভাল গান করে। সুন্দরী স্ত্রীজাতি যদি রসনা সংযত করতে শুধু পারতেন, তা হ'লে না জানি কি সম্মোহন অরুণ কিরণে তাঁদের অধরপল্লব ও চিত্তকমল নিরন্তর অনুরঞ্জিত থাকত।

কবি কীট্‌স্ গেয়েছিলেন—"আমরা চিরদিন প্রেমমুগ্ধ আর তোমরা চিরসুন্দর।"

এখন অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠের আলোচনা স্থগিত রেখে অন্য বীরোচিত স্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাক। সঙ্গীর উদ্দেশে আহ্বান শুধু দিনচর পক্ষিকুলেরই বিশেষত্ব নহে। সূর্য্যাস্তের পর বনভূমিতে যখন ছায়ার চাঁদোয়া বিছান হয়, নিশানাথ সুন্দরী ধরণীর প্রণয়কাহিনী রচনা ক'রে চলেন, তখন জ্যোৎস্নাজালে নিশাচর পশুপাখী সঙ্গীর উদ্দেশে আপন আপন আহ্বান প্রেরণ করে। যথাকালে সম্বরমৃগ ঘন-বিন্যস্ত তরুগুল্মের কুঞ্জগৃহে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বহু রাত্রি ধ'রে আপন অনুরূপ সঙ্গিনীকে আহ্বান করতে থাকে, ব্যাকুলতাবশতঃ চঞ্চল চরণাঘাতে ভূমিতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়; কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত অনুরাগিণী হরিণী তাহার আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিয়ে সেখানে এসে সম্মিলিত না হয়, তত দিন সেই ব্যগ্র আহ্বানধ্বনির আর বিরাম হয় না।

এই মৃগের অধিকৃত প্রদেশে যদি অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী অনধিকারপ্রবেশ করে, তবে সে দুরাশয়ের আর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। ফলে যুদ্ধের দ্বারা স্বাধিকার সাব্যস্ত হয়। সম্বর মৃগের দলপতি সাধারণতঃ স্বতন্ত্রভাবে একক বাস করে, তরুণ হরিণদের মত সদা-সর্ব্বদা হরিণী-দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না। এ অন্তরীণ বাস তার স্বেচ্ছাকৃত, সেই জন্যই তাহাতে নির্ব্বাসনদুঃখ বোধ করে না। মহিষ-দলপতিকে কিন্তু প্রবীণ বয়সে বাধ্য হইয়া দলছাড়া হ'তে হয়, যুবক মহিষসম্প্রদায় বয়স-দোষে তখন দলপতির প্রাধান্য স্বীকার করে না। পাছে তরুণী মহিষীদের মধ্যে এই প্রৌঢ় আবার প্রভাববিস্তারের চেষ্টা পায়, সেই জন্যই তাকে একঘরে করে। শীকারীরা বলে, মাঝে মাঝে ব্যাঘ্ররাজ সম্বর-দলপতির ঘণ্টাধ্বনির আহ্বানের অনুকরণে হরিণীদের যথার্থই উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দেয়। তবে এ কথায় বড় বেশী আস্থা স্থাপন করা চলে না, কারণ, যদিও ব্যাঘ্ররাজ কখনও কখনও ঘণ্টার সংহত শব্দের ন্যায় শব্দ করে বটে, কিন্তু মৃগয়াদক্ষ ব্যক্তির কানে সম্বর মৃগের আহ্বানরব হ'তে তা এত পৃথক্ যে, ভুল হবার কোনও সম্ভাবনা ঘটে না।

হস্তিপৃষ্ঠে শীকার

সম্বর হরিণের ভীতি-সঙ্কেত আর প্রীতি-আহ্বান সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যাঘ্রজৃম্ভণের গভীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সহিত কেমন ক'রে সে শব্দ অভিন্ন ব'লে ধারণা হ'তে পারে, তাহাও বুঝা কঠিন। ব্যাঘ্রের বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্ম নয়, স্থূল, আর যে উপায়ে আদিম আমেরিকাবাসী বৃহদাকার মুস (moose)

নামক জন্তুকে ভ্রান্ত ও আকৃষ্ট ক'রে আনে, সেই পন্থা উদ্ভাবন করা বাঘের পক্ষে সম্ভব ব'লে মনে হয় না। বাঘ অনেক সময় ভীষণ গর্জ্জনে অরণ্যদেশ কম্পিত ক'রে, জটিল-কুটিল পথ ধ'রে এমন যায়গায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে যে, সেখানে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে কারও সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় না। কিন্তু যখন সে 'বাঘিনীর' অভিসারে বনপথে এগিয়ে চলে, আর মনে করে, তার বাঞ্ছিতা হয় ত নিকটেই কোথায়ও আছে, তাকে খুঁজে ঘুরে বেড়ায়, এক রাতের মধ্যে অনেক দূর চ'লে যায়, তখন তার বজ্রগম্ভীর নিনাদ শৈল-কান্তার অতিক্রম ক'রে সুদূর অধিত্যকা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাঘিনীদের স্ত্রীজাতিসুলভ প্রচুর বংশবিস্তার-ক্ষমতা অন্যান্য জন্তুর মতই আছে। তাই যৌন নির্ব্বাচনে আপন প্রাকৃতিক সংস্কারের অনুসরণ করতে কিংবা আপন মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করতে দ্বিধামাত্র করে না। আমি অনেকবার এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে, হয় ত শীকারীর গুলীতে বাঘটি মারা পড়েছে, বাঘিনী কিন্তু যত দিন ভাগ্যবশতঃ অপর কোনও সঙ্গীর দেখা না পেয়েছে, কিংবা তার দারুণ মিলনস্পৃহা কালবশতঃ শান্ত না হয়েছে, তত দিন সে উচ্চকণ্ঠে বিলাপ ক'রে ফিরেছে।

ব্যাঘ্র-লাঙ্গুল

বাঘের লেজটি মোটে ২৭ ইঞ্চি। কিন্তু রোলাণ্ড 'সাহেবের' মাপের নিয়ম অনুসারে নাকের আগা হ'তে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত তার শরীরের মাপ ৭ ফুট। বাঘটির বয়স অল্প, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ, সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ যৌবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। গায়ের আঙরাখাটি শীতের দিনের উপযোগী প্রচুর ঘনলোমে সমৃদ্ধ, প্রকাণ্ড জোরাল চোয়ালের চারিদিকে ঘিরে বিপুল চাঁপদাড়ী। কিন্তু নিতান্ত ছোট্ট বেঁটে লেজটিকে দেখলে হাসি আসে, পুলিসের বেটনের মত একেবারে ভোঁতা, সেটা আস্ফালন ক'রে রাগ কি আনন্দ কিছুই প্রকাশ করা চলে না। তার আগায় দোদুল থোপনাটুকু পর্য্যন্ত নেই, শুধু বাহারের জন্য নয়, সেটুকু থাকলে মাপটা যেমন বাড়ত, রাজকীয় মহিমাতেও কিঞ্চিৎ

মৃগয়া শিবির

সংযোগ হ'ত। এই সব জন্তুর মাহাত্ম্য বড় কম নয়; রূপ, গৌরব, পদ, পসার সবই সে অনুপাতে বেড়ে যায়। সবটুকু বজায় রেখে শেষটুকু কেন খুইয়েছে, কিছুই বুঝা গেল না। হয় ত তার হিংস্র স্বভাবের পরিচয় যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, জয়-পরাজয়ের কোন অতীত ঘটনার নিদর্শন! তাই বোধ হয়, এর আগে তার গোঁজে যারা গিয়েছিল, সে তাদের সম্মুখে লজ্জায় সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেনি। শীকারীদের চোখে তার পরিস্ফুট বিশাল বপুর আবির্ভাব হলেও পশ্চাতের গৌরবহীন পুচ্ছটি অদৃশ্য ছিল। দুবার সে আমাদের এড়িয়ে চ'লে গেল।

অন্তর্ধান। রাজপ্রতিনিধিগণ যে সকল বাঘ শীকার করেন, তাদের পুচ্ছগুলি যেমন স্থিতিস্থাপক, তেমনই ব্যাপক—লাঙ্গুলের অতিদৈর্ঘ্য হেতু এই সকল বাঘের নূতন নামকরণ হয়েছে—মহাশার্দ্দূল। এ লাঙ্গুলের পরিমাপ গজ দিয়ে করা হয় না, রাজকর্ম্মচারীর পদবীর উচ্চতা অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়। তাই কোনও নিয়মেরই অধীন নয়। পশ্চাদ্ভাগের গৌরবচিহ্ন ব্যাঘ্রদেহে কিংবা রাজকীয় রঙ্গমঞ্চের কলাপী মানব নামেই সংযুক্ত হোক, ফল একই দাঁড়ায়। যখন ঢাকায় লাটসভার অধিবেশন হ'ত, তখন আমি এক জন

কতিপয় নিহত ব্যাঘ্রের মুণ্ড

গাছের ফাঁক দিয়ে বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘের মত চকিতের মধ্যে যখন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তখন আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ তার উত্তমাঙ্গের দিকেই ছিল, লাঙ্গুলটি দেখা হয় নি। যখন সে হত ও ধরাশায়ী, তখন বন্ধুবর সে দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে যা বলেছিলেন, সেটা এখানে উহ্য থাকাই ভাল। পরে তিনি অতি যত্নে লেজটিকে তুলে ধ'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তার কোথাও পুরাতন কি অধুনাতন কোনও অত্যাচারের চিহ্ন বর্ত্তমান কি না। কিছুই দেখা গেল না। বোধ হয়, বাল্যকালের দুর্ঘটনা। পুচ্ছদেশের নমনীয়তাও

সভ্যকে বিশেষ বিলাপ-পরিতাপ করতে শুনেছিলাম যে, কলিকাতার সভ্যদের পিছু পিছু লাল উর্দ্দিধারী চাপরাসী চলে, ঢাকার সভ্যরা সে গৌরবে বঞ্চিত—লাট-দরবারে দরখাস্ত পেশ করেও তাঁর বিশেষ ফললাভ হয় নি। এমন প্রভেদ করা কিন্তু নিতান্ত অন্যায়, তা বলাই বাহুল্য। সম্মান-সমৃদ্ধির বাহ্যপ্রকাশের জন্য লাঙ্গুলজাতীয় কিছুই যদি না থাকে, তবে তা দশের জ্ঞানগোচর হয় কেমন ক'রে? এক বার আমার এক বন্ধু আসামে একটি বাঘ শীকার করেন, সে-ও ছিল লাঙ্গুলহীন। আমি যে সব বাঘ মেরেছি, তাদের

লেজের মাপ সর্ব্বদাই এক গজ ত হয়ই, কখন কখন ২।১ ইঞ্চি বেশীও হয়ে থাকে। এ বাঘটির লেজের বহর কম হলেও আর সব দিক্‌ হতেই এমন একটি শীকারবিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তা নিঃসংশয়ে বলা চলে,আর কেমন ক'রে যে এমন লাভ হ'ল, সেই কথাই বলব। "মতিপিয়ারীর" পিঠে দুলতে-দুলতে আমরা যখন তাঁবুতে ফিরছি,এক সংবাদ-বাহক চিঠি নিয়ে এল "গাড়া হো গিয়া" অর্থাৎ বাঘকে ভুলিয়ে আনবার জন্য যে জন্তুটি বাঁধা হয়েছিল, সেটি মারা পড়েছে। কাযেই না ফিরে আমরা এগিয়ে চললাম। যখন বন পিটিয়ে আস্‌ছিল, তখন বাঘটা ঠিক এগিয়ে এসেছিল। এই সময় শীকারীদের কারও ভুলে সে ভিন্নপথে চ'লে গেল। শীকারীদের যথাসময়ে থামা উচিত ছিল। যাই হোক, সে যে কেমন ক'রে হাত ফসকে পালিয়ে গেল, কেউ লক্ষ্য করতে পারে নি। লম্বা ঘাসের মধ্য হ'তে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল। যে সময় আমরা শীকারে গিয়েছিলাম, সে সময় জঙ্গল এতই ঘন ছিল যে, বাঘটি অনায়াসেই তার রাজকীয় বিশাল বপু প্রচ্ছন্ন রাখতে পারত। পরদিন বাঘিনী নিকটেই দু একটি জানোয়ার খুন করে। তবে তার ছোট ছোট বাচ্চা ছিল ব'লে তাকে মারবার জন্য আমাদের তেমন আগ্রহ হ'ল না। তার পরদিন আবার সেই জঙ্গলে হত্যাকাণ্ড হ'লো। এবার বাঘের কীর্ত্তি, পায়ের চিহ্ন এক বিঘতপরিমাণ। ভাবে বোধ হ'ল, শেষ রাতের দিকে এসে কার্য্য সমাধা ক'রে, নালার মধ্য দিয়ে আধ ক্রোশ পথ যাত্রা ক'রে মনোমত বধূ লাভ করেছে। নিকটে তাদের উভয়ের অষ্টপদীগমন-চিহ্ন বুঝা না গেলেও দেখা গেল, তারা বহু দূরপথ অতিক্রম ক'রে চ'লে গিয়েছে। পরে তারা দুজনেই একত্র ফিরে বাঁধা জন্তুটি দিয়ে বৌ-ভাতের ভোজ সমাধা ক'রে ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করেছে। ব্যাঘ্রবর সেইখানেই অবস্থিতি করছেন। বধূ বোধ হয় জোড় ভাঙ্গতে বাপের বাড়ী গেছে। বাঘটিকে এ বারও আমরা ঘেরাও করতে পারি নাই। মাহুত তাকে দেখতে পেয়েছিল। ঘন বনে দলিত ঘাসের নিশানা ধরেও শীকারী তার চলা পথ আবিষ্কার করলেও তাকে খুঁজে পায় নি। কদিন আর তার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। ষষ্ঠ দিনে সঙ্গিনীর খোঁজে সে গভীর গর্জ্জনে বন কাঁপিয়ে তুলে উত্তর-মুখে চ'লে গেল। আবার দুটি জন্তু তার উদ্দেশে বাঁধা হ'ল। অন্ধকার গিয়ে সবে যখন সকালের নবীন রাঙ্গা কিরণ আকাশ আর পৃথিবী আলো ক'রে তুলেছে, তখন সু-খবর এল যে,বাঁধা জানোয়ার সদ্য মারা পড়েছে—পথে রক্তের চিহ্ন এঁকে হত্যাকারী কাছেই আছে। কাযেই শীকারীরা অধিক দূর পিছু ধ'রে যায় নি। এ সব সময় সতর্কতার বিশেষ আবশ্যক। বন্ধু চারিদিক একবার খুঁজে পেতে দেখতে গেলেন। আর অতি সত্বর বাঘটিকে ঘেরাও করার আয়োজন আরম্ভ হ'ল। তখন জঙ্গলটি পরিপাটী ছিল, ঘন ঘাস কি কাঁটা-ঝোপ ছিল না। তাই বুঝা গেল, এ কায কঠিন হবে না। আমরাও বেশী দূরে ছিলাম না।

চৌদিক ঘিরে শক্ত পাহারা বসান হ'ল। শীকারীর দল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সাজান হয়েছিল। ক্রমেই তাদের এগিয়ে আসবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাঘের "হাও" "হাও" হুঙ্কার শুনা গেল। সে তখন পাশের রাস্তার দিকে ঝুঁকেছিল, কিন্তু কড়া পাহারা দেখে অবিলম্বে প্রাণপণে দৌড়ে ফিরে এল। দুদিকের পাহারাই তাকে এমন ভাবে আটক ক'রে ফেলেছিল যে, পালাবার পথ না পেয়ে সে পাগলের মত লাফালাফি আর রাগে চীৎকার সুরু করলে। এই তামাসা কিছুক্ষণ চল্‌ল। তার পর গাছপালা ঝোপ-ঝাড় না মেনে দৌড় দিলে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তার পায়ের সোনালী রঙ থেকে থেকে বিদ্যুতের মত চমকে উঠতে লাগল। দশ পনের হাত দূরে একটা ফাঁকা যায়গা ছিল, পালাতে গেলে এটা অতিক্রম না ক'রে উপায় ছিল না; কাযেই সেখানে উপস্থিত হ'তে না হ'তেই তার জীবনের শেষ গর্জ্জন বন্দুকের গম্ভীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের মত নিঃশব্দ হয়ে গেল।

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী—

প্রাণের দান

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি ক'জন দিতে পারে
দৈবে তারে মেলে।
ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মত কি আছে এই ভবে
কি খনিতে রাজার কি ভাণ্ডারে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে
প্রাণের জিনিস তোমায় প্রিয়ে!
তাই ত বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে ॥

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি ক'জন দিতে পারে।
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে,
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মত পাওয়া যারে কহে,
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মত কি আছে এই ভবে।
কি খনিতে রাজার কি ভাণ্ডারে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
প্রাণের জিনিস তোমায় পাব প্রিয়ে!
তাই ত বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিসর্জ্জন নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে] [ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়—১৮৯৩

বিসর্জ্জন নাটকে—জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘুপতি—কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] [জয়সিংহ—শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে] [ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়—১৮৯৩।

বাল্মীকি-প্রতিভায়—দস্যুগণ ও বাল্মীকি
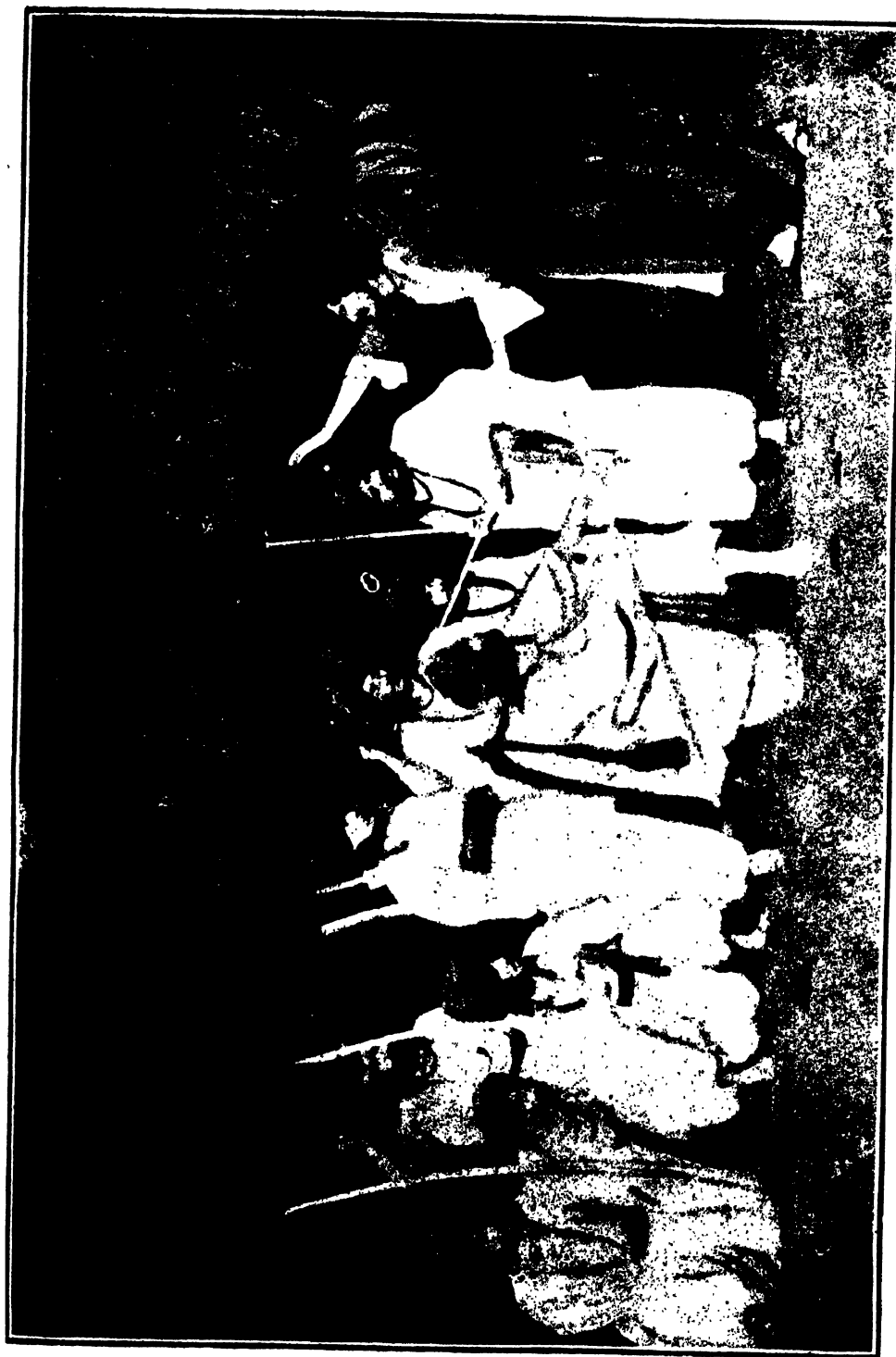
দক্ষিণ হইতে—বাল্মীকি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দস্যু-সর্দ্দার—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দস্যুগণ—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়গণ।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে]

[ঠাকুর বাড়ীতে লেডী ল্যান্সডাউনের সম্বর্দ্ধনার অভিনয়—১৮৯৩।

"কৃপাণ খর্পর ফেলে দে—দে— বাঁধন কর ছিন্ন—মুক্ত কর এখনি রে!"

—বাল্মীকি-প্রতিভা।

বালিকা—শ্রীমতী অভিজ্ঞা দেবী। অন্যান্য ভূমিকা—৩য় চিত্র দেখুন।

[ঠাকুর বাড়ীতে লেডী ল্যান্সডাউনের সম্বর্দ্ধনার অভিনয়। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে]

"—যাও লক্ষ্মী অলকায়—যাও লক্ষ্মী অমরায় এসো না—এসো না এ দীন-জন কুটীরে !"

—বাল্মীকি-প্রতিভা।

বাল্মীকি—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লক্ষ্মী—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, এম্-এ।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে] [ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়।

বন্দিনী [প্রস্তর-মূর্ত্তি]

বসুমতী-সুবর্ণপদক প্রাপ্ত ১৯২৬] [ভাস্কর—শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আরাধনা [মৃণ্ময় মূর্ত্তি]

বসুমতী প্রেস] [ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক

গৃহ-লক্ষ্মী [মৃণ্ময় প্রতিমা]

বসুমতী প্রেস] [ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক ।

শিল্পী

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

শুভদিন

১
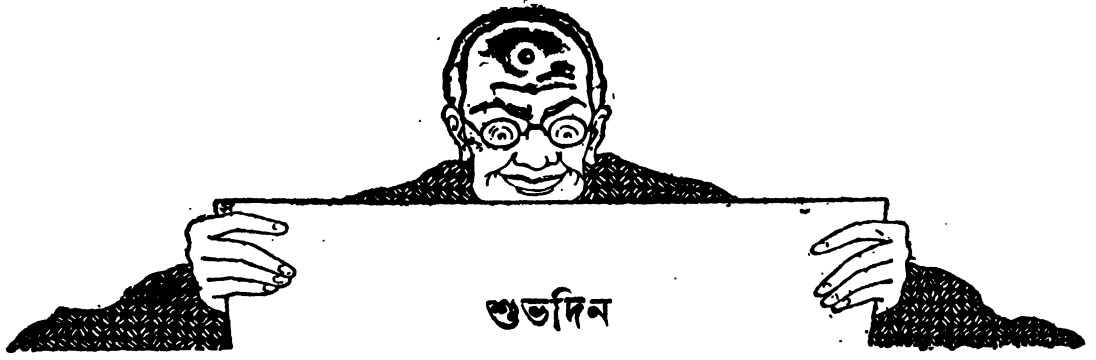
নিস্তারের গর্ভধারিণী রামী সমাদ্দার আলিপুরে মোক্তারী ক'রে জান্‌বাজার অঞ্চলে একখানি ছোট-খাটো বাড়ী ক'রে গেছলো। কলিকাতা কর্পোরেশনের ইনস্পেক্টর, ওভারসিয়ার, কেরাণী প্রভৃতি কর্ম্মচারিণীগণের সুবিধার জন্য একটি প্রসূতি-প্রাসাদ স্থাপনের প্রস্তাব জেনারেল কমিটীতে মঞ্জুর হওয়ায়; ঐ বাটী প্রস্তুতের জন্য যে স্থানটি নির্ব্বাচিত হয়, তার মধ্যে রামী মোক্তারের বাড়ী পড়ায় নিস্তারকে ভদ্রাসনটুকু ছেড়ে দিতে হয় এবং সে নেবুবাগানে একটু জমী নিয়ে একখানি ছোট দোহারা বাড়ী প্রস্তুত করে। এক ভাগে আপনি সপরিবারে বাস করে এবং অন্য ভাগ ভাড়া নেয় ঘেসো কামিনী; অন্নপূর্ণার ঘাটের নিকট তার খড় ও ঘাসের কারবার ছিল ব'লে তাকে ঘেসো কামিনী ব'লে সবাই ডাক্‌তো।

নিস্তারের দুই সংসার। তার প্রথম পতির অকালমৃত্যু-বিবরণ সাতিশয় বিষাদপূর্ণ।

নিস্তারের বয়স যখন বছর সাতাশ আটাশ, তখন সে এক দিন থিয়েটার দেখতে যায়, তার আদরের পতি বিংশতিবর্ষীয় সুন্দর যুবক তাকে সঙ্গে নেবার জন্য স্ত্রীর কাছে আবদার করে; নিস্তার কতকগুলি ভাগলপুরের বন্ধু তার সঙ্গে থিয়েটারে যাবে ব'লে পতিকে না নিয়ে একলা চ'লে যায়।

অভিমানী সুরেশ এই ব্যথাটুকু বুকের ভেতর লুকিয়ে এক বোতল কেরোসিন তেলের সাহায্যে লাঞ্ছিত জীবন-ধারণের লজ্জা নিবারণ করে।

এই ঘটনার পর প্রায় দু'বৎসর নিস্তার কতকটা পাগলের মত হয়েছিল, খায় দায়, বাজার করে, আফিসে যায়; কিন্তু কোন কাযেই যেন মন নেই—সংসারে একেবারে বিরাগ। পরে পুত্র-দায়গ্রস্ত তার এক আফিসের বিধবা বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে দ্বিতীয়বার সংসার করে।

চোদ্দ বছরের ছোক্‌রা ফুলকুমারকে ঘরে এনে প্রথম প্রথম নিস্তার ততটা তাকে কাছে ঘেঁস্ দিত না; যাকে তাচ্ছীল্য করা বলে—ঠিক তা নয়, তবে তার প্রথম পতির বিষাদমাখা মু'খানি সে তখনও ভুল্‌তে পারে নি; আর ফুলকুমারের বালক-সুলভ চাঞ্চল্য তাহার হৃদয়যন্ত্রের প্রেমের তারে পরশ পায় নি। কিন্তু অষ্টাদশ বর্ষের যৌবন-জোয়ার যখন ফুলকুমারের অঙ্গসৌষ্ঠবে সাঁড়াসাঁড়ির বান ডাকিয়ে দিলে, যখন তাহার জ্যোৎস্নাশুভ্র অংসদেশ ভ্রমরকৃষ্ণ সুরভিপূর্ণ কুঞ্চিত কুন্তলদলের ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত হ'ল, দীর্ঘায়ত কজ্জলোজ্জ্বল নয়ন দুটি হ'তে প্রাণঘাতী মধুময় বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হয়ে আদেশমিশ্রিত মিনতির এক মর্ম্ম-নিবেদন তারহীন তড়িৎসংবাদের ন্যায় নিস্তারের পাঁজরের ভিতর পৌঁছে দিলে, যখন হাসির অবকাশে ফুলকুমারের ঈষদ্ভিন্ন অধরের ভিতর হ'তে গুটি দুই মুক্তা পত্নীর রিক্ত-হৃদয়কে এক অচিন্ আনন্দ-রসে সিক্ত কল্লে, তখন নিস্তার ভুলে গেল যে, সে আশী টাকা মাইনের সদাগরী আফিসের কেরাণীমাত্র। ভুলে গেল যে, বিদ্যমান আছে তার প্রথম পক্ষের একটি একাদশবর্ষীয় পুত্র; এখন তাহার প্রাণের পল্লবী আমূল শাখাগ্র পর্য্যন্ত ফুলকুমারের কুসুমিত কিসলয়ের লাবণ্যে প্রফুল্ল।

কিন্তু দয়িতের যৌবন-সৌন্দর্য্যে মোহিতা নিস্তার মাঝে মাঝে নিজের কেরাণী-জীবনের কথা ভুলে গেলে-ও আফি-সের সাহেব যে ঐ স্ত্রীলোকটি তাঁর মাইনের চাকরাণী, সে কথা তিনি ভোলেন না, আর নিস্তার যে বিস্তর দিন দেরীতে অফিসে আসে, আর মাঝে মাঝে পাঁচটা বাজবার ৫।৭ মিনিট আগে-ই পালায়, সেটি ভোলেন না

সৌদামিনী শীল--বড় বাবু

ঐ আফিসের বড় গিন্নী সৌদামিনী শীল মশাই; তাঁর মা-গোঁসাইয়ের ননদের আই, এ ফেল-করা মেয়েটি অনেক দিন উমেদারীতে আছে; কা'র কেদারাখানি খালি ক'রে তাকে বসিয়ে দেবেন, এই মতলবে শীল-বুড়ী অনাত্মীয়া যে কয়টি কেরাণী-রমণী ঐ আফিসে চাকরী করেন, তাঁদের আসা-যাওয়া, ওঠা-বসা, কলম-ঘষা, আঁক-কষা প্রভৃতি সকল কাযের-ই উপর শনির দৃষ্টি সতত নিক্ষেপ করেন।

আবার ভোর ৬টা থেকে বেলা ৯টা অবধি বাড়ীতে যে একটু ছুটী ক'রে নবীন প্রিয়তমের চোখ দু'টির পানে চেয়ে ব'সে থাক্‌বেন, তার-ও সাবকাশ নেই; দাঁতন করতে করতে তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলেটির 'প্রসাধন-শিক্ষার' মানে ব'লে দিতে হয়, বাড়ীতে একটি গাই আছে, তার জাবটা-ও মেখে দিতে হয়, তার পর ছুটতে হয় বাজারে; কেন না, গুবরীর বাপ এ-বেলা ও-বেলা দু'ঘরের বাসন মাজে; এদের এই তুশ্চু চার গণ্ডা ট্যাকার জন্তে সে আবার বাজার দৌড়ুতে পারেক না। কেরাণীদের বাড়ীর ঘড়ী অন্ততঃ মিনিট কুড়িক ফাষ্ট ক'রে রাখা হয়; সুতরাং ৯টার কাঁটা ঠিকানায় পৌছলেই তাড়াতাড়ি কলে মাথা দিয়ে চুলটো মুছে অমনি জড়িয়ে নিয়েই উড়েনীর রান্না আধ-সিদ্ধ ভাত কান্নার জলে মেখে আলুভাতের সঙ্গে গোগ্রাসে মুখের ভিতর গুঁজে আফিসের সাড়ী-সেমিজ প'রে ছাতা হাতে 'বাসে'র উদ্দেশে ছুটতে হয়। আফিসে ১০ টার আগে-ই পৌছান চাই, কেন না, সেখানে অন্যান্য লোকের সঙ্গে নিস্তার-ও বিলক্ষণ জানে যে, 'সদু শীল শালী' রাত্রে মাত্র আহার করে, সে ৯ টার আগে এসে-ই সাহেবকে প্রথম সেলাম দেবার জন্য ওত পেতে ব'সে আছে, যার যার উপর তার নজর, তার মিনিটখানেক দেরী হ'লেই বড় সাহেবের কাছে আটখানা ক'রে লাগাবে। সারাদিন কলমপেষা, বড় গিন্নীর কাছে খাতা হাতে যাওয়া-আসা, এ সাহেবের ও সাহেবের ঘরে সই করাতে যাতায়াত, দপ্তরী কুদরৎ উল্লোর "তোমার ঠাকরুণ যে রোজ রোজ নিব্‌ বদলানো, আর কি কালিটা যে নোকসান না কর, তা বড় গিন্নী জান্‌তি পার্‌লে--বোঝ তো—" ব'লে রসুন-ঘষা দাঁতগুলির খিঁচুনিতে সেকালের জগৎ সিংহের প্রাণ থেকে-ও প্রণয় 'বয়কট' ক'রে দিতে পারে, তা আমাদের গেরস্তের মেয়ে নিস্তার ত নিস্তার।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এসে সেই বেতো গতর আর তেতো মন নিয়ে-ও নিস্তারের নিস্তার নেই; ছেলেটা হাঁড়ী থেকে বেড়ে চাড্ডী কড়কড় ভাত, একটু হলুদগোলা-মাখান গুলে-মাছের তরকারী একখানা পিঁড়ির সামনে ধ'রে দেয় বটে, কিন্তু বারান্দা থেকে পানের শীষ, ফুলকুমারের পায়ের আল্‌-তার শুক্‌নো লুটি আর এটা ওটা জঞ্জাল নিস্তারকে নিজে-ই ঝাঁট দিয়ে উঠোনটুকুতে ফেল্‌তে হয়, গুবরীর বাপ ত আর দুটো টাকা মাইনে বাড়িয়ে না দিলে দোতালায় উঠতে পারে না। তা ছাড়া বিছানাটি তাকে নিজে-ই ক'রে নিতে হয় আর লগন্‌সার বাজার পড়লে গুবরীর বাপ্‌কে আজ এর বাড়ী, কাল ওর বাড়ী, যজ্জির বাটনা বাটতে ডাক পড়ে, ঠিকের নগদ বারো আনা আর 'হাতানোর' ধনে হলুদ-সরষের মায়া ছেড়ে সে ত আর মাস-মাইনের চাকরী করতে আস্‌তে পারে না; কাযে-ই নিস্তারকে কলের মুখে রাখা বাসনগুলো যা হোক্‌ একটু নুড়ো বুলিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। এর উপর যে দিন বাড়ী ফিরেই দেখে যে, ফুলকুমারের হিষ্টিরিয়া হয়েছে, সে শুয়ে শুয়ে চিৎ ক'রে ফেলা কাঁকড়ার মত দাঁড়া নাড়ছে, সে দিন

একেবারে বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট; কোথায় গোলাপ-জলের বোতল, কোথায় স্মেলিং সল্টের শিশি, হাতের তেলো ঘষা, পায়ের তেলো ঘষা, আজ বা নরী ডাক্তারকে আটটা টাকা দিতে হয়, এই ভাবনা একেবারে বেচারাকে অস্থির ক'রে তোলে।

এক আছে রবিবারে ছুটী;—তা নিস্তার সহ্ শীলের গোদা পা ছ'টীতে মাথা ঠেকাতে-ও রাজী আছে, যদি সে সাহেবকে ব'লে ক'য়ে ঐ দিনটাতে-ও আফিস খুলিয়ে রাখ্তে পারে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ত মুদী, গোয়ালা, কয়লাওয়ালা, বাড়ীর ভিতর কাপড়বেচা মিন্‌ষে ও অন্য কত পাওনাদারের হাঁটাহাঁটি তাগাদা, তার উপর ছাদে বিছানা রৌদ্রে দেওয়া, মশারির কোণগুলি খুলে খুলে ছারপোকা মারা, পতির হাতের তৈরী ফুলবড়ী, আমের আচার, ছড়া তেঁতুল, পেয়ারার জেলি প্রভৃতির হাঁড়ী জার-টার ছাতে দিয়ে আসা। ছুটীর দিন সন্ধ্যার পর যদি রাই ঠান্‌দি, গোলাপী বিশ্বাস, ক্ষীরি হালদার আর এই রকম ছ'চার জন বন্ধু এসে নিস্তারকে নিয়ে বৈঠকখানায় পাশা

নিস্তারিণীর পাশা খেলা

খেলতে বসে ত অমনি উপর থেকে পাঁচ মিনিট অন্তর ছেলেটার মারফৎ তলব আসছে,—কোন দিন বা ফুল-কুমারের মাথা ধরেছে, কোন দিন বুকে একটা কিসের ব্যথা, কোন দিন সোডা খেয়ে-ও গলাজ্বালা যাচ্ছে না, এই রকম। নিস্তার কত দিন যে মনে মনে শ্মশানেশ্বরকে ডেকে বলত, "কেন বাবা, আমাকে এই মজুরীর নারীজন্ম দিয়ে-ছিলে, না হয় পুরুষ হয়ে গরীবের হাতে পড়তুম, ঘর নিকো-তুম, উঠোন ঝেঁটুতুম, সকাল সন্ধ্যা রাঁধতুম; কিন্তু এই নাকে মুখে গুজে আফিসে ছোটা, খিঁচুনী খাওয়া, কখন্ চাকরী যায়, কখন্ চাকরী যায় এই ভয়, আয়ে কুলোয় না, কাযেই ধার করতে হয়, আর তাগাদার লাঞ্ছনা অপ-মান, এর উপর পান থেকে চূণটি খসলে বাড়ীর ভিতর মুখ ভারী, চোখে জল—ধিক্ ধিক্, এ রমণীজন্মকেই ধিক্!"

নিশ্চিন্ত হয়ে প্রিয়-প্রেম-সঙ্গ-সুখের তরঙ্গে সাঁতার দিতে না পারলে-ও নিস্তার নবপতির প্রাণবিনোদনের জন্য যথাসাধ্য প্রণয়োপহার প্রদানে 'অবলের' মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন, মাসকাবারে মাইনে পেলে-ই বাড়ী আসবার সময় মুর্গীহাটা থেকে হয় ছ'খানা নতুন চিরুণী, নয় কাশীর জর্দা কি চোখের সুরমা, হ'ল বা এক শিশি গুম্ফলীন তৈল কিনে এনে ফুলকুমারের ফুলের মত কোমল বাঁ হাতখানিতে দেয়। ফুলকুমার বই পড়তে ভালবাসে ব'লে 'স্বর্ণ বাইয়ের জীবনী' 'এলাহিজানের আত্মকাহিনী' Hills male Emancipationএর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি কলায় পুরুষ্ট ও নীতি-গরবে গরিষ্ঠ সাহিত্যরত্ন এনে নিস্তার সতী পতিকে উপহার দেন।

২

ছুপুরবেলাটা পাড়ার পাঁচ জন সখার সঙ্গে গল্পে তাস-খেলায় কাটতো, কিন্তু গেল শনিবার সুরমার স্বোয়ামী গিরিজা বোম্ হেরে যাওয়ায় সেই রাগে এক'দিন আর এমুখো হয় নি, আর রঞ্জিত-টঞ্জিতকে-ও এ দিকে আসতে না দিয়ে নিজের বাড়ীতে আটকে রেখেছে; ছেলেটাকে ডেকে তার সঙ্গে একটু বিন্তি খেলবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু উড়েনী এ বেলা আস্‌তে পারবে না ব'লে যাওয়ায় বিজয়কে-ই চারটি ময়দা মেখে নিজে হাতে-ই বেলে রুটি কখানা সেঁকে নিতে হবে, তাই আজ খেলার কোন সুবিধেই হ'ল না।

বিয়ের আগে বারো বছর বয়েসের সময় ফুলকুমার এক-খানি এ্যান্টিম্যাকেসার বুনতে আরম্ভ করে, অবসরবিনো-দনের অন্য উপাদানের অভাব হ'লে-ই এখন-ও ফুলকুমার সেই এ্যান্টিম্যাকেসারখানি আলমারী থেকে বের ক'রে তার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অনন্ত কার্য্যে স্ত্রীর পয়সার ক্রুসে কটন

আর নিজের চম্পক অঙ্গুলি ব্যবহার করেন। আজ মধ্যাহ্নে সেই এ্যান্টিম্যাকেসারখানি হাতে ক'রে তা'তে সূত্র সংযোগ বা আফিস-প্রত্যাগত পত্নীর বিরুদ্ধে কোন্ অদ্ভুত অভিযোগের সৃষ্টি করবেন, তার-ই কল্পনায় আপনাকে নিঃশেষ ক'রে ডুবিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে ব'সে আছেন; এমন সময় জরীপেড়ে খদ্দরের ধুতি, লেশের বর্ডার দেওয়া মিহি পাঞ্জাবী, রেশমের বুটিদার উড়ুনী উড়িয়ে. (Frangipani) ফ্র্যাঙ্গিপানির গন্ধ সিঁড়িতে ছড়িয়ে শ্রীকান্ত শ্রীমানী ঘরে ঢুকলেন। কুমার অবস্থায় ফুলকুমার ও শ্রীকান্ত একসঙ্গে "পঞ্চানন্দ আবরু" স্কুলে পড়তে যেতো, এক বাসে যাওয়া-আসা করতো, এক বেঞ্চিতে দু'জনে পাশাপাশি বোসতো, একসঙ্গে পিং-পঙ খেলতো—দুজনে গলাগলি ভাব; সেই স্কুল থেকে-ই পরস্পরের মধ্যে "স্বদেশ" পাতান ছিল। বিবাহের পর এক জনের বাস বাগবাজারে আর এক জনের এলগিন্ রোডে, সুতরাং মাঝে মাঝে চিঠিপত্তর চললে-ও দেখা-শুনোটা বড় বেশী হ'ত না।

শ্রীকান্তের সাংসারিক অবস্থা এখন খুব উন্নত, তাঁর পত্নী সুহাসিনী শ্রীমানী এখন এক জন নামজাদা ব্যারিষ্টার, ক্রিমিন্যাল কেসে তাঁর এক রকম একচেটে পসার; তিনি যখন ফুলো ফুলো চুলের দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে জুরীর হৃদয়ে কুটিল কটাক্ষের ছুরি বিঁধতে থাকেন, তখন আসামীকে 'নট গিল্টি' বলবার পূর্ব্বে ক্ষণিকের জন্যে রিটায়ার হওয়া একটা বাঁধাবাধি কায়দার সম্মান রাখা মাত্র দাঁড়ায়।

এল্‌গিন রোডে ক্রোটন-কুঞ্জ-বেষ্টিত টেনিসকোর্ট-প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মরমণ্ডিত হর্ম্ম্যে দেড় ডজন বাবুরচি, মশালচি, জমাদার, দরোয়ান, খানসামা, আয়া,বেয়ারা, মালী, সফেয়ার, কোচম্যান, সইস, এখন উছলিত যৌবন-শ্রীসম্পন্ন ভার্য্যার ঐশ্বর্য্য-গরবে গর্ব্বী শ্রীকান্তের আদেশ-ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় দিবারাত্র অপেক্ষা করে। মেরী জেন্ ব'লে একটি ফিরিঙ্গী রমণী প্রতিদিন অপরাহ্ণ তিনটের সময় এসে শ্রীকান্তের অমানিশির শিশিরঝারার ন্যায় নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ কেশদামগুলি সোপ-সাহায্যে সযত্নে সামপু ক'রে কারলিং আয়রণের মৃদু তপ্ত প্রেসারে কুঞ্চিত ক'রে দেয়; মেরী জেনের শিক্ষিত করের এমন সুচারু দক্ষতা যে, সেই হস্তলিপ্ত রুজ শ্রীকান্তর পাউডার-মার্জ্জিত সুকোমল কপোলযুগলে যেন প্রকৃতি-প্রসূত গোলাপের কলি বসাইয়া দেয়। কণ্ঠে মুক্তার

সুহাসিনী শ্রীমানী ব্যারিষ্টার

শেলি, সলমা-চুম্‌কির চাকচিক্যে ভূষিত খদ্দরের জ্যাকেট-শোভিত বক্ষে দোদুল্যমান তিন নর গার্ড চেন, দুই মণিবন্ধে দুই জহরতোজ্জ্বল রিষ্ট-ওয়াচ, বাম হাতের অনামিকা একটি-মাত্র হীরক-অঙ্গুরীতে শোভিত করিয়া ক্ষীণ-কটিজড়িত আশমানিরঙের জাপানী সিল্কের ধুতির মতিমণ্ডিত জুতির শুণ্ডচুম্বিত কুঞ্চিত কোঁচাগ্রভাগ লোটাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত অলস-হেলনে লীলাভঙ্গীভঙ্গ অঙ্গখানি 'রোল্‌স রয়েসের' উপর আয়েসে এ্যালাইয়া 'রেড রোডে' যখন শ্রীকান্ত ড্রাইভ করেন, তখন অনেক ব্রিটিশ বরণ্ গোমের মেম্-ও যুবা শ্রীকান্তের কমনীয়তাকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখেন।

পুরুষ কি নারী—যাঁদের ভোজন, শয়ন, প্রসাধন ভিন্ন কার্য্যজীবনের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, তাঁরা বিরাম-বিহীন অবসর নিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়েন; এই কর্ম্মক্ষেত্রে আবেগ উদ্যম উৎসাহপূর্ণ জনতার মধ্যে তাঁদের সখের দোসর মেলা সুলভ নয়; সেই জন্য এত ঐশ্বর্য্য, এত আড়ম্বর, এত

ব্যারিষ্টার সুহাসিনীর স্বামী শ্রীকান্ত

ভোগের মধ্যে-ও শ্রীকান্ত বড় একা। সকালে উঠতে, নাইতে, চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে, খাবার খুঁটতে, সাজতে-গুজতে বেলা ১১টা বাজিয়ে ফেললে-ও তার পর স্ত্রী আদালত থেকে সায়াহ্নে বাড়ী ফেরা পর্য্যন্ত মাঝের সময়টুকু একেবারে ভোঁ-ভাঁ। প্রত্যহ দুপুরবেলা দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে কেনা-বেচায় অরুচি হয়ে গেছে, আর কেন্‌বার উপযুক্ত নতুন জিনিষ-ও রোজ রোজ বিলাত থেকে এসে বাজারে পৌঁছোয় না; আবার অলস-জীবনের যে সঙ্গীর সাক্ষাৎ প্রত্যাশায় হেমিল্টনের বাড়ী ঢুকলেন, সে হয় ত মিনিট ৫।৭ আগে-ই সেখান থেকে 'হল এণ্ডারসনের' বাড়ী চ'লে গেছে; শ্রীকান্তের মোটর ঘুরে 'হল এণ্ডারসনের' দোরে পৌঁছতে না পৌঁছতে সোফিয়ার বললে, অজন্তা বাবুর 'কার' ঐ আগে যাচ্ছে; এইরূপ ঘুরে ঘুরে নিরাশায় কোন কোন দিন শ্রীকান্ত নিউ মার্কেটে নেমে ঝুড়ি দুই আপেল, আঙ্গুর, পিচ, পিয়ার, চা-চিনি, মাখম-রুটি প্রভৃতি কিনে জেনানা হাঁসপাতালে গিয়ে সেখানকার 'ম্যান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের' ধন্যবাদ লাভ করেছেন।

মেডিকেল কলেজের ধাত্রী যুবকরা-ও মধ্যে মধ্যে শ্রীকান্তসুন্দরের বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত হ'ত না।

'কোথায় যাই, কি করি' 'কোথায় যাই, কি করি' ভাবতে ভাবতে আজ অকস্মাৎ মনে প'ড়ে গেল শ্রীকান্তের বাল্যসখা ফুলকুমারকে। খেয়ালের বশে ক্ষিপ্রতা এইরূপ অলস জীবদিগের যতটা অভ্যস্ত, Now or never মন্ত্র-জাপক স্কচ সেয়ারের দালালের-ও ততটা নয়।

মার্জ্জার-মন্থর গতিতে শ্রীকান্ত কক্ষে প্রবেশ কর্ত্তেই নিস্তারের গৃহ-নারায়ণ বারেক তড়িদ্বেগে চমকে উঠলো,

ফুলকুমার ও শ্রীকান্তের চুম্বন

কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই প্রিয় সখার উষ্ণ আলিঙ্গনে তার প্রদত্ত চুম্বনের প্রতিদান দিয়ে আদরে একখানি কেদারায় বসিয়ে দিলে।

দুই একটা 'কেমন আছ ভাই?' 'তুমি ত ভাল আছ?' গোছ আলাপের পরই শ্রীকান্ত কড়িকাঠের দিকে একবার

চেয়ে দেখলে। ফুল বুঝতে পারলে যে, শ্রী ইলেকট্রিক পাখা খুঁজছে, তাই তার মুখপানে চেয়ে বিষাদ-মাখা একটু মৃদু হাসি হেসে বল্লে, "আমাদের ইনি ভাই কেরাণী, এক দিন যে বি, এ, পাশ করেছিলেন, সে কথা ভুলে-ই গিয়েছেন; মাস-মাইনের সংখ্যায় এখন-ও তিন অঙ্ক পোরে নি; তবে পাশের বাড়ীটুকুর দরুণ গোটা পঞ্চান্ন টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, আর শাশুড়ী বুঝি খানকতক কাগজ আর সেয়ার-ফেয়ার রেখে গেছলেন; কিন্তু তোমার ত ভাই—"; শ্রীকান্ত সখার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিলে, "আমার মেম সাহেব-ও ভাই প্রথম প্রথম অনেক কষ্টে পড়েছিলেন, এক দিকে ব্রিফের অভাবে গ্রীফ, অন্য দিকে সাহেবী সম্ভ্রমরক্ষার দায়ের গ্রীপ, তবে যা হোক আজকাল—।"

ফুল। সোনার তালে বুটের ঠোক্কর দিয়ে ফুটবল খেল।

শ্রী। খেলি, অন্ততঃ সখ হ'লে একটা ছোটখাট সোনার গোলা যে তৈরী করাতে পারিনে, তা নয়, তবে সোনার স আর সুখের স এই দুটো অক্ষর একখানা ছাঁচে ঢালা নয়।

ফুল। কেন, তোমার-ই কাছে ত শুনেছি, শ্রীমানী বিবি তোমায় যতদূর ভালবাসবার ততদূর ভালবাসেন। পোষাক আষাক, মোতি-জহরত, সোনা-রূপোর ডিস-প্লেটে আর পৃথিবীর সখের জিনিষ রাখবার আলমারী-ক্যাবিনেট, টিপয়-টেবিল ধরাবার যায়গাই ঘরে নেই, তবে আর তোমার কিসের অভাব?

শ্রী। অভাব খুঁজে পাচ্ছিনে, এই ভাই আমার অভাব; খানিকটা রোদ্দুরের তাপে না ঘুরে এলে কি বৃষ্টির মজা পাওয়া যায়; পোষ মাঘ মাসে পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে আমেরিকান তুলোর ৭×৫ মাপের একখানা গরম লেপ মুড়ি দিয়ে-ও পাখা খুলে না রাখলে আমার ঘুম হয় না।

ফুল। (ঈষৎ হাস্যে) এই ত ভাই একটা মস্ত দুঃখ খুজে বার করেছ।

শ্রী। ও রকম দুঃখ ভাই আরও ঢের খুঁজে খুঁজে বার করি। কোন জিনিষ-ই নজরে লাগে না ব'লে সখের মেয়ে-গুলো আমার নাম রেখেছে ঠেকারে, টেবিলে ব'সে কেবল-ই ডিসের উপর ডিস বাঁ হাতে ঠেলে সরিয়ে দি, তাতে খানসামা-বাবুর্চ্চিরা আমায় যে মনে মনে বেশী ক'রে আশীর্ব্বাদ করে, তা ত বোধ হয় না; পত্নীপ্রেমের আলিঙ্গন অতি ব্যবহারে ক্রমে তাপহীন হয়ে পড়ছে; এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলুম যে, আমার এক জন মদের দোকানে পড়ে-থাকা বখাটে ছাপা-খানার পেন্টীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, আর সে দুপুর রাত্রে নেশা ক'রে এসে আমায় ধ'রে মারছে, এমনি সত্যি স্বপ্ন যে, কেঁদে উঠে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, পাশে শুয়ে সুহাস, তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, আর একটু সুখের সোয়াস্তি-ও যেন বোধ হ'ল।

ফুল। এই দেখ, পরমেশ্বরের কত দয়া, ঘুমের ঘোরে তোমার মুখে একটু নালতের সুক্তো দিয়ে আবার ক্ষীরে অরুচি ঘুচিয়ে দিলেন।

শ্রী। আর আজ বালীগঞ্জ চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে বাগ-বাজারে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ফুল। তা এখানে-নাল্‌তে পলতা, নিম-হিঞ্চে যত ইচ্ছে, তত পেতে পার।

শ্রী। ঈ—শ্‌! দেখিস না এত দুঃখু!

ফুল। দুঃখের কথা কে বললে ভাই, যে কটা জিনিষের নাম করলুম, সবগুলিতেই পিত্তিনাশ ক'রে ক্ষিদে বাড়িয়ে দেয়; যতক্ষণ লোকের ক্ষিদে থাকে, ততক্ষণ সে সিধে থাকে, আর পেট যেই ভোরপুর হয়ে ভরে, অমনি আড় হয়ে প'ড়ে মরে।

শ্রী। পড়তিস্ যদি কোন ধনেশ্বরীর হাতে, তা হ'লে বুঝতিস, সস্তার অন্ন, ভাতের উপর কি ঘেন্না ধরিয়ে দেয়। তোর ঐ ছোট্ট ছাতটুকুর পানে চেয়ে মনে হচ্ছে যে, এক-খানি শীতলপাটি পেতে সন্ধ্যার পর ঐখানে শুয়ে চাঁদের পানে চেয়ে থাকা কত আরাম—আর এল্‌গিন রোডের লন অর্কিট ঘর, গোলাপকুঞ্জ কিছুই যেন নিজের ভোগের জন্য নয়, কেবল ডেকে ডেকে লোককে দেখাতে টাকা খরচ ক'রে তয়ের করা হয়েছে। সেখানে আয়া-ফায়া, চাকর-বাকর যার-ই পানে চাই, তাকে দেখে-ই মনে হয়, স্নেহ-ও নেই, মায়া-ও নেই, ভালবাসা-ও নেই, কেবল টাকার জন্যে বকশিসের প্রত্যাশায় আমায় মান্য করে—যত্ন দেখায়; এক একবার মনে হয়, ভাই, স্ত্রী-ও বুঝি আমায় পাঁচ জনের কাছে বার করবার মত তাঁর এক সচল সুন্দর সুকণ্ঠ সাজান-গোজান আসবাবের মতন মনে করেন।

ফুল। দূর!

শ্রী। মনে হয় বলছি, সত্যি ত আর নয়। তবে বড্ড নেওটো, আটপৌরে পরলে বেনারসীর-ও মর্য্যাদা থাকে না। স্ত্রী আমাকে-ই মনে মনে ভাববে, আমাকে-ই ভাল বাসবে, তবে উরির মধ্যে একটু-আধটু ছটকে ঘুরে এল, কোন বন্ধুর বরের পানে ঈষৎ হাসিমাখা চোখে চাইলে, তাই নিয়ে আমি একটু রাগ করলুম, দুটো কথা শোনালুম, হলো বা রুমালখানা দিয়ে একবার চোখটা মুছে নিলুম, এতে-ও বোধ হয় একটু সুখ আছে। তোমার কেমন, আফিস থেকে এসে একটু বেড়াতে-টেড়াতে যান?

ফুল। পোড়া! ততক্ষণ ঐ কোণে ব'সে দুটো বালিসের ওয়াড় শেলাই করবে। জন্মাষ্টমীর ছুটীর দিন আমি বললুম যে, যাও না, একবার কাঁকুড়গাছিটা ঘুরে এসো না; তা ঐ যে ছাত দেখলে, ওর বুকের মাঝখানটা চিরে একটা ফাটল হয়েছিল, বিলিতী মাটী আর কন্নিক নিয়ে তা মেরামত করতে ব'সে গেল।

শ্রী। সময় কাটাবার আমি ভাই একটা উপায় মনে মনে ঠাউরেছি, সেই জন্যে-ই আর-ও তোমার কাছে এলুম। অবশ্য শুনেছ যে, সুশিক্ষিত হিন্দু স্ত্রীলোকরা-ও আজকাল অবরোধ-প্রথার বিরোধী। এই দেখ না, তোমার-ই সংসারে হিঁদুয়ানী-ও আছে, ব্রত উপোস, জাত মানা—

ফুল। ফাউলকারী, পার্কে পায়চারী, খোলা ট্যাক্সি-গাড়ী সব-ই আছে।

শ্রী। আমি মনে করছি, বালীগঞ্জ-ফালীগঞ্জওয়ালারা আগেভাগে লেগে নাম জাহির করবার পূর্ব্বে তুমি আমি আর-ও দু' এক জন মিলে একটা 'পুরুষ-প্রমাদ-প্রলয়-কারিণী' সমিতি গঠন ক'রে ফেলি।

ফুল। তাতে কি হবে?

শ্রী। আমি বুঝতে পারিনে যে, পুরুষকে ভালরকম ক'রে সুশিক্ষিত করতে পারলে কেন না সে স্ত্রীলোকের-ই মত সমস্ত স্বাধীন কার্য্যে ব্রতী হয়ে আপনার প্রতিপত্তি প্রচারে সমর্থ হবে। পুরুষরা স্বভাবতঃ যেরূপ সেবা-পরায়ণ, ধাত্রীকর্ম্মে তারা যেরূপ দক্ষতা দেখাচ্ছে, তাতে ওদের ডাক্তারী শিক্ষা দিলে একটা humanityর কায হয়; বিশেষ লজ্জাশীল পুরুষরা তাঁদের অনেক রোগ নারী-ডাক্তারের কাছে প্রকাশ কর্ত্তে সঙ্কুচিত হন। ওকালতীতে একেবারে মালতী ঘোষ, তারকদাসী বা কায়েত কৈলিসীর মত প্রতিপত্তি না জমালে-ও, মিউনিসি-পাল কোর্ট, রেণ্ট কোর্ট, ইনকাম ট্যাক্স আফিস—এগুলো শীগ্‌গীর একচেটে ক'রে নিতে পারবে, তার আর কোন সন্দেহ নেই। আর ইঞ্জিনীয়ারিংএ ছোকরারা বাপ-কাকার কাছ থেকে, গঙ্গার ঘাটে নাইতে গিয়ে, মদনমোহনের বাড়ী-টাড়ী ঘুরে ঘর ভাঙা-গড়ার যা হোম ট্রেনিং পান, তাতে শিবপুরে না গেলে-ও তাঁদের সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত। আর স্কুল-মাষ্টারী—মেয়ে শাসন—তা মনে মনে তুমি-ও বুঝছো, আমিও বুঝছি—

ফুল। তা ভাই, তোমার পয়সার-ও অভাব নেই—সময়ের-ও অভাব নেই, আমার কাছে এত বড় কাযের তুমি কি সাহায্য পাবে?

শ্রী। পয়সা পয়সা একটা বাই হয়েছে লোকের, অর্থের অভাবে কোনো কায-ই বন্ধ হয় নি; উদ্যমের চেয়ে বড় মূলধন আর কিছুই নেই, আর সময়টা মশা'র কিসে সব্যয় হয়, বলুন দিকি? রাঁধতে হয়—না সংসারের আর কিছু দেখতে হয়?

ফুল। না, তা গেরস্তগোছের এক আধটা লোক-ও আছে, আর ছেলেটা বকুনি-টকুনি খায় বটে, তবে কাযটা আসটা করে।

শ্রী। তবে চল, কাপড় বদলে নাও, এখুনি দুজনে একবার বিরাজের কাছে যাই।

ফুল। না, আজ থাক ভাই; তাঁকে বলা-কওয়া নেই।

শ্রী। ঈস্! হুকুম নিতে হয় বুঝি?

ফুল। না—শনিবার দুটোয় ছুটী—তেতে পুড়ে আসবে।

শ্রী। তবে আমি বেস্পতিবারের দিন মোটর পাঠিয়ে দেব, তুমি একটার সময় ঠিক হয়ে থেকো—কেমন?

'আচ্ছা' ব'লে শ্রীকান্তর সঙ্গে ফুলকুমার-ও উঠে সখাকে নীচে অবধি পৌঁছে দিতে গেল।

But Man proposes, Woman disproposes,—এই শাস্ত্রবাক্য সার্থক করবার জন্য-ই যেন অন্তঃপুরবাসী পুরুষদিগের উদ্ধারের কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখতে হ'ল।

৩

কলিকাতার ক্রোশ ত্রিশ অন্তরে—জিলার আমতাড়া গ্রামে পালেরা প্রাচীন বংশ এবং এক সময়ে এঁদের প্রতাপ ও সম্পত্তি পল্লীগ্রামের পক্ষে খুব বড় রকম-ই ছিল; কিন্তু কলসীর জল তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে গড়াতে গড়াতে ক্রমে কাদা দেখা যাবার অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, পূজা-পার্ব্বণ হ'ত বটে, কিন্তু অশ্বত্থগাছ-গজানো দালানের ভিতর অমনি নমো নমো ক'রে। বেতন পাবার মত অবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করায় লাঠিয়ালরা-ও একে একে স'রে পড়ল; সুতরাং প্রতাপ-প্রভুত্ব প্রদত্ত.উপস্বত্বের অস্তিত্ব-ও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেলে।

এখন মাতঙ্গিনী পাল ঐ বংশের কর্ত্রী; ইনি কতকটা লেখাপড়া করার পর-ই বুঝেছিলেন যে, সভ্যতার দিনে লিটারাল লাঠির চেয়ে লিটারারি লাঠিই খেলোয়াড়কে বেশী লাভবান্ করতে পারে। জেলা-কোর্টে উকীলি ক'রে তাঁর বিলক্ষণ উপার্জ্জন হ'তে লাগল। কত দিন উপবাস ক'রে স্কুল-কলেজে গেছেন, বি, এল, পাশ করবার পরে-ও বছর তিনেক আর-ও কঠিন উপোসে কেটেছে স্মরণ ক'রে তিনি নির্ম্মম মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ নেবার বাসনায় পসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক ধনবান্ মক্কেলের বাড়ী হাঁড়ি চড়া বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর চক্-মিলানো দালানওয়ালা বাড়ী আবার ধবধবে সাদা হয়ে উঠল, পুরানো জানালা-দরোজার পরিবর্ত্তে গ্রীণ-মাখানো শার্সি, খড়খড়ি, কবাট সব ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল, সদর দরজায় ঢোকবার খিলানের উপরে প্রকাণ্ড শুণ্ডধারী গণেশটি আবার টুকটুকে লাল হ'ল, দেউড়ীর ভিতর হিন্দু-স্থানী দরোয়ানদের খাটিয়া পড়ল, অন্দরে চাকর-বাকর ও সদরে সৌখীন কালাপেড়ে ধুতি-পরা ঝিয়ের দল আবার ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সাধারণ মক্কেলদের কথাবার্ত্তা মুহুরিণীদের সঙ্গে-ই হয়, বড় জমীদার বা মাড়োয়ারী মক্কেল ছাড়া আর কোন বে-আক্কেল-ই কর্ত্রীর সামনে যেতে পায় না।

মাতঙ্গিনী উকীল এখন আর শুধু ওকালতী করেন না, তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, জিলা বোর্ডের ভাইস, ডিস্পেন্সারী ও স্কুলের সেক্রেটারী, গ্রামের 'বয়েজ বিদ্যোত্তম লাইব্রেরীর' পৃষ্ঠপোষক, কালীবাড়ীর ট্রাষ্টি ও ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য।

সরকারী উপাধিভূষিত হয়ে 'রায় বিবি মাতঙ্গিনী পাল' হবার পর তিনি একটু বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে একটা ভুল করেন। কালেক্টার সাহেবের ইঙ্গিতে ছাপ্পান্নটা টিউব-ওয়েল কেনবার প্রস্তাবে তিনি ভোট দেন নি, নইলে এত দিনে অনায়াসে 'রায়-রাহাজানি' খেতাবের তালিকায় তাঁর নাম গেজেট হয়ে যেত।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ব্যারিষ্টার সুহাসিনী শ্রীমানীর আপনার পিসী হলেন,রায়-'বিবি' মাতঙ্গিনী উকীল। বিলাত থেকে ফেরার পর প্রথম বছর তিনেক যখন ভাইঝিটি এ-বাড়ীর ভাড়া ছ'মাস, ও-বাড়ীর ভাড়া আট মাস বাকী ফেলে ঠাঁইছাড়া-মানছাড়া হয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন সে পিসীর কাছে বার বার দেশী বিলিতী করুণার ভাষায় আপনার দুঃখ নিবেদন ক'রে-ও কোনরূপ বেদনা-বারণের মালিস আদায় করতে পারে নি। পিতৃষ্বসা যখন লোকমুখে ও খবরের কাগজের মারফতে সংবাদ পেলেন যে, ভাইঝির সুধু শনির দশা কাটে নি, একেবারেই বৃহস্পতির শুভ সঞ্চার, তখন তাঁর হেড মুহুরিণী হরিমতি পাঁজাকে সঙ্গে দিয়ে বড়দিনের সময় এল্‌গিন রোডের বাড়ীতে একটা জাঁকাল রকম ভেট পাঠিয়ে দিলেন। কপি,কড়াইশুঁটি,গাজর, শিম, সালগম, লেটুশ, য়্যাসপ্যারাগাস, আলু, পিঁয়াজ,ভেটকী মাছ, মোচা চিংড়ি, এক জোড়া হাঁস, কমলা লেবু, খেজুর, বাদাম, পেস্তা, খোবানী, আপেল, আঙ্গুর, ডিম, সন্দেশ, চপ সন্দেশ, মাদরাজী কলা প্রভৃতিতে প্রায় টাকা শ' দেড়েকের কাছাকাছি জিনিষ, তার উপর ভাইঝির পতিটির জন্যে একটি মুক্তা রুবিবসানো সোনার ক্রচ আর একটি ফুলের বাস্কেট ও এক প্রকাণ্ড তোড়া; সব শুদ্ধ কিছু না হবে ত চার শ' টাকা আন্দাজ খরচ ক'রে রায়-বিবি পিসী ব্যারিষ্টার ভাইঝির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করলেন। এ সংসারে 'মাতঙ্গিনী-সাইকলজি' মানব-মনের উপর সাধারণতঃ সমধিক আধিপত্য করে; অভাবে অবজ্ঞা ও প্রাচুর্য্যের পূজাই কর্ম্ম-জগতের ধর্ম্মনীতি। "মামা, আজ তিন দিন হাঁড়ি চড়ে নি, আপনি না দেখলে দেখবে কে?" ব'লে দাঁড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে জবাব, "আমায় দেখে কে, বল্‌তে পার, বাপু, কায-কর্ম্মের চেষ্টা কর—চেষ্টা কর, যাও।" আর মোটর থেকে নেমে

শিবের চাদর লোটাতে লোটাতে মেসো মশায়ের কাছে ব'সে আলাপ করতে করতে তাঁর মারবেল টেবলের পানে চেয়ে—"বাঃ বাঃ, কি সুন্দর গোলাপ! আপনার বাগানের না কি? অতি চমৎকার!" বলবামাত্র চাকরকে ডেকে হুকুম, "ওরে, পিন্টু বাবুর যাবার সময় ঐ ফুল কটা মোটরে তুলে দিস্, বোল্‌টা শুদ্ধ দিস্, যেন বোকামী ক'রে খালি ফুলগুলো ঢেলে দিয়ে আসিস্ নি।" বোল্‌টির দাম দেড় শ' টাকার কম নয়।

এখন রায়বিবি প্রায়-ই মক্কেলদের ইসারা-ইঙ্গিতে জানান যে, এ কেশটায় আমি ত আছি-ই, তবে কলকাতা থেকে শ্রীমানী ব্যারিষ্টারকে আনালে আরও সুবিধা হ'তে পারে, আমি জানি, বিলেতে শ্রীমানী আর আমাদের জজ সাহেব একসঙ্গে হামেসা ক্রিকেট খেলতেন। হাইকোর্টে-ও ইদানীং পিসী ভাইঝির জন্য মোকর্দ্দমা জোগাড় ক'রে পাঠাতেন।

মধ্যে লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের দু'চারটি শিক্ষিতা কন্যাকে পাঠিয়ে সভানেত্রী হবার জন্য শ্রীমানী বিবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনান এবং তাঁর অভ্যর্থনার জন্য গেট বাঁধা থেকে কন্সার্ট বাজান আর লোহার ফুলের মালা দিয়ে গারল্যাণ্ডেড করবার যা কিছু খরচ, তা নিজের নাতনীর নামে চাঁদা লিখিয়ে রায়-বিবিই দেন।

এবার পুজোর ছুটীতে শ্রীমানী বিবি বিলাত যাবেন না শুনে, রায়-বিবি তাঁকে সপতিক আমতাড়াতে পুজো দেখতে আসবার জন্য সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান।

"চল, হপ্তাখানেক পাড়াগাঁয়ে গিয়ে countryfied হয়ে আসা যাক; it would be quite a fun;" পুজো—ফুজো—ভুলে-ই গেছি the old tamasha; ব'লে পতি ডিয়ারকে সঙ্গে যেতে সম্মত করান। কিন্তু শ্রীকান্ত একটি আবদার ধরে যে, একা সে অর্থোডক্স অন্তঃপুরে সাত ঘণ্টা থাকলে হাঁপিয়ে উঠবে, সুতরাং তার বাল্যসখা ফুলকুমারকে যদি সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করা হয়, তা হ'লে যেতে কোন আপত্তি নেই। অন্য কোন সোসাইটী যুবককে নিয়ে গেলে তার স্ত্রী ত অবশ্যই সঙ্গে যাবেন, আর তাদের আলাদা খাতিরের, থাকার, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত সেখানে ভাল হতে-ই পারবে না, কিন্তু ফুলকুমারের স্ত্রী কেরাণী, পিসীমার বাড়ীর ধুমধাম দেখে বরং আশ্চর্য্য-ই হবে।

৪

বাড়ী, বাগান, তালুক, জুড়ী, মোটর, হীরে, মতী, মিউনিসিপ্যালিটী, জিলাবোর্ড, উপাধি প্রভৃতি নিজের ঐশ্বর্য্যের প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আপনার ভাইঝি-ও যে এক জন বড় লিডিং কৌন্সলী, এ গর্ব্বটুকু যার তার কাছে যখন তখন বিজ্ঞাপিত করতে মহামহিম মহীয়সী পিসীমা কখনই ত্রুটি করতেন না; সুতরাং সদর বা নিজ গ্রাম বা অন্য যে কোন গ্রাম থেকে যে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাঁকে-ই বলেন যে, "এবার পুজোয় আমায় বড়ই ব্যতিব্যস্ত হ'তে হয়েছে; কলকাতা থেকে অনেকে-ই আস্‌ছেন, বিশেষ আমার সেই ভাইঝিটি;—আমি-ই প্রতি-পালন করেছিলুম—এখন সে অত বড় ব্যারিষ্টার, কবে বা 'নাইট' হয়, তবু আমায় মাথার টুপী খুলে নমস্কার করে, আর তার স্বোয়ামীটি অত বড় মেমের ঘরের বর হয়ে-ও কেমন মিষ্টি মিষ্টি বাঙ্গালা কথা কয়, এখানে এসে আসন পেতে ভাত খাবে পর্য্যন্ত স্বীকার করেছে; তাঁদের সঙ্গে-ও আরও অনেক বড় লোক আসবেন।"

বাস্তবিক রায়-বিবি পুজোর সময় বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, কেনা জিনিষের একটা পরিমাণও আছে, বাড়ীতে এসে পৌছিবার-ও একটা নির্দ্ধারিত সময় আছে; কিন্তু মক্কেলের ভেট, প্রজার নজর, কৃপাপ্রত্যাশীর দান উপহার এর আর সময়-ও নেই—সংখ্যা-ও নেই। মুড়ীর চাল, চিঁড়ে, খয়ের ধান, আতপ, মোটা চাল, সরু চাল, গুড়, নারকেল, কচু, কুমড়ো, কলার কাঁদি এ সব ত গাড়ী বোঝাই ঝাঁকা বোঝাই এতই আগে এসেছে যে, দেউড়ীর বাইরে পশ্চিম দিকের সেকালের দোহারা অতিথশালার ঘরে-ও যায়গা হচ্ছে না; তার পর আসতে আরম্ভ করেছে—মূলো, বেগুন, কাঁচকলা, মোচা, থোড়, ঝিংয়ে, ধুন্দুল, সিম, বরবটি, ছাঁচি কুমড়ো, আলু, নানান্ রকমের শাক, গাড়ী গাড়ী কলাপাত, আক,শশা,পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি ফল। মাড়োয়ারী মক্কেলরা পাঠাচ্ছে আনারস, আম, আঙ্গুর, খেজুর, পেস্তা, বাদাম, খোবানী,আখরোট, কাঁচা পাঁপর, বিকানীরের বড়ি, মিছরী, ঘি ময়দা চিনি, নানাবিধ চাটনী। এর উপর ষষ্ঠী থেকে বিজয়া পর্য্যন্ত নিত্য আসতে আরম্ভ হবে, দই, ক্ষীর, সন্দেশ, বরফী, কালাকন্দ। এই সব জিনিষের জন্য মূল্য দেওয়া ত

দূরে থাক, লোকবিদায়ের পয়সা দিতে-ও রায়-বিবির বাক্স খুলতে হয় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে কোন লুচি-ভাজা বামনীর মকদ্দমা মাতঙ্গিনী পালের হাতে পড়েনি, নইলে তাদের-ও পয়সা দিতে হ'ত না—যারা ঝাঁঝরী বেলম হাতে ক'রে এসে চতুর্থীর দিন থেকে ভিয়ানের কাযে লেগে জিলিপি, বঁদে, মতিচুর, খাজা, গজা, পক্কান্ন, বালুসাই, লেডীক্যানিং,পান্তুয়া,রসখোল্লা প্রভৃতি মিঠাই সামগ্রী তৈরী করছে। ছানা দুধের অভাব নেই, জেলায় গয়লাও আছে, জেলা-বোর্ডও আছে। দুণ্ডী-চাঁদ ফটকারামের কুঠী থেকে যে কাপড় এসেছে, তাতে মা দুর্গা থেকে গণেশের ইঁদুরের বস্ত্রখণ্ড পর্য্যন্ত হয়ে-ও এত বাঁচবে যে, আলস্যের প্রশ্রয় ও বিলাসিতা-বৃদ্ধির সাহায্যরূপ পাপের ভয় না থাকলে এই অনন্দময়ীর আগমনের দিনে উকীল-কুল-কোকিলা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী সেই কাপড় পরিয়ে সমস্ত গ্রামের দীন দুঃখী নারী নর বালককে হাসির সাগরে ভাসাতে পারতেন।

ষষ্ঠীর প্রভাত থেকে-ই জগজ্জননীর সুসজ্জিতা প্রতিমাখানি দালানটি আলো ক'রে বিরাজ ক'চ্ছে, দেখতে ইতর ভদ্র প্রতিবেশিনীদিগের ভিড় বিস্তীর্ণ উঠানটি জুড়ে দাঁড়িয়েছে; সামান্য গৃহস্থ ঘরের কতকগুলি কুলযুবারা-ও এসে চকের রকের এক পাশ থেকে উঁকি মেরে মনে মনে মাকে প্রণাম ক'চ্ছে, রাজী ঢুলিনী আর ছিমতী ঢাকী নিজের নিজের যা ননদ মেয়ে বউ নিয়ে ঢাক ঢোল কাড়া নাগরা জগঝম্প তাসা ট্যামটেমি সানাই কাঁসীর আওয়াজে জানান বাজনা বাজিয়ে বাড়ী সরগরম ক'রে তুলেছে। উড়েনীরা বাঁকে বাঁকে জল এনে সব বড় বড় জালা ভরছে।

পুরোহিত পদী ভটচায, তন্ত্রধার রাধারাণী পাঠক দালানে ব'সে বিল্বপত্রের কাঁড়ি বাচছেন, কার্ত্তিকের কালা পেড়ে ধুতির কোঁচার আগায় ফুল কেটে দিচ্ছেন, হ'ল বা বেলায় হাঁকে চাকরাণীদের ডেকে নৈবিদ্যি রাখার লটকান-গুলো শীঘ্র ধৌত ক'রে আনতে হুকুম করছেন। প্রধান চণ্ডী-পাঠক বিধুমুখী তর্কবাগীশ একখানি বৃহৎ আসনের উপর গম্ভীর হয়ে ব'সে আছেন—দু'জন ঝি তাঁকে দু'দিক থেকে পাখা করছেন।

সভ্যতার প্রথম বিকাশের পরই যখন কলাবিদ্যাবিশারদা সমাজ-সংস্কারিণী মহিলাগণ নগর-গ্রামাদি হ'তে পেশাকর

রাজী ঢুলিনী ও তাহার সঙ্গিনী

বারাঙ্গনা-বাস উঠিয়ে দেন, তখন এই বিধুমুখী তর্কবাগীশের প্রপিতামহী কলকাতার সোনাগাছিস্থ সুপ্রসিদ্ধা বিদ্যাধরী বেদানাসুন্দরী-ই সাতচল্লিশ মাত্র বয়সে প্রথমে-ই সাহিত্যিক পত্রে সতী বলিয়া পূজিতা হন। সংস্কারের প্রভাবে সতী হওয়ায় সেই অবধি তাঁর বংশে অন্ততঃ এক জন ক'রে সংস্কৃতপড়া পণ্ডিত হয়ে আসছেন।

বিধুমুখীর সীঁথিতে সিন্দুর, চোখে চশমা, নাকে নথ ও নস্য, গলায় মোটা দানা, দুই হাতে দুই সোনার শাঁখা আর পায়ে পাঁজর। একদা এক যজমানের বাড়ী চণ্ডীপাঠ কর্ত্তে কর্ত্তে ভাবে বিমোহিতা হয়ে বিধুমুখী এমন থিয়েটারী নাচ নেচেছিলেন যে, যজমান তাঁকে মেডেলের পরিবর্ত্তে ঐ শেষোক্ত অলঙ্কারটি উপহার দেন; সেই অবধি তর্কবাগীশ্বরী যে কোন প্রকাশ্য স্থানে যান, পারিতোষিকের মর্য্যাদা রেখে এই পাঁজোর জোড়াটি ব্যবহার করেন।

দেউড়ীর দরোয়ানরা আগন্তুক সামান্য লোকদের সরা সরা চিঁড়ে, মুড়কী ও নারকোল নাড়ু দিচ্ছে আর চার জন দারবান মুসলমানকে 'বাহার ঠার যাও, বাহার ঠার যাও' করছে।

বিধুমুখী তর্কবাগীশের চণ্ডীপাঠ।

এই মুসলমান প্রজা-চতুষ্টয় জমীদারণীর বাড়ীর পূজায় উপহারের জন্য যে কুড়ি খানেক জীব এনেছে, খড়্গাধারে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হবার পর তাদের নাম হবে 'মহাপ্রসাদ।'

অন্দর থেকে নহবতের শব্দ বাইরে এসে পৌঁছোচ্ছে, এই বাদসাই বাজনার দল পুরুষ এবং আপনাদিগকে নবাবের জাত ব'লে গর্ব্ব করে; সুতরাং তারা বাইরে মেয়ে-মহলে বাজাতে নারাজ।

এই দিন অপরাহ্নে চারটের গাড়ীতে মিসেস্ শ্রীমানীর পার্টি এসে আমতাড়া ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে নাম্‌লো। রায়-বিবির মেজ মেয়ে হেমাঙ্গিনী আগে থাকতেই এঁদের অভ্যর্থনার জন্য এসে প্লাটফরমে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর ইঙ্গিতে বালকবিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীর ছাত্র কুড়োরাম গিয়ে শ্রীকান্ত ও ফুলকুমারের গলায় এক এক ছড়া দোপাটি ফুলের মালা পরিয়ে দিলে। ষ্টেশনের বাইরে একখানা মোটর আর একটা জুড়ী হাজির ছিল, হেমাঙ্গিনী সমাদরে সকলকে নিয়ে গিয়ে তাতে উঠিয়ে দিলেন। সঙ্গের খানসামানী, চাপরাসিনী আর পুরুষ চাকরদের-ও ব'লে গেলেন যে, তাদের নিয়ে যাবার জন্যে এখুনি গরুর গাড়ী ও ডুলী এসে পৌঁছোবে।

মোটর ও জুড়ী গিয়ে পাকা রাস্তার যেখানে থাম্‌লো, সেখান থেকে যে বাগানে এঁদের অবস্থানের জন্য আপাততঃ বাসা নির্দ্ধারিত হয়েছে, সে প্রায় আধ মাইল, কাঁচা রাস্তা। ভাদ্রের ভিজে মাটী এখন-ও তত শুকিয়ে শক্ত হয় নি, চল্‌তে চল্‌তে মাঝে মাঝে এক এক যায়গায় পা ব'সে-ও যায়, কোথায় বা পিছলে পড়ে; সুহাসিনী ও নিস্তার বেশ দ্রুতপদ-ক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু শ্রীকান্ত আর ফুলকুমার যেতে যেতে মাঝে মাঝে টাল খেয়ে এ ওর গায়ে হেসে ঢ'লে পড়ে, ও ওর গায়ে হেসে ঢ'লে পড়ে।

সুহাসিনী ও শ্রীকান্ত আজ কয় বৎসর বিলাতী সঙ্গ, রঙ্গ ও ভাবে বাক্সবন্দী হয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতর দুর্গোৎসবের যে একটা আনন্দ-রব স্পন্দিত হ'তে থাকে, তা একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

আশ্বিন-প্রবেশে ছাদে শুকাতে দেওয়া শাল, বনাত, ঢাকাই, বেণারসী, সিল্ক, সাটিন, মখমল, বড়ী, আচারের হাঁড়ী প্রভৃতির উপর যে রৌদ্র পড়ে, তা যেন পূজোর বাতাসে আর্দ্র। উষায় ঝরা শেফালীর রাশি যেন পূজার হাসিমাখা; প্রভাতের ফোটা স্থলপদ্মের দলে দলে যেন পূজার পদ্য লেখা; ঘাসের মাঝে কাশকুসুম শুভ্র চূড়া দুলিয়ে পূজো আস্‌ছে পূজো আস্‌ছে ব'লে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। বর্ষার জলে ধোয়া আকাশখানির উপর থেকে শরতের চাঁদের আলোকে-ও পূজার পুলক।

বাগানে পর্য্যটন-পোষাক বদলে বাঙ্গালা কাপড়-চোপড় প'রে সুহাসিনী যখন শ্রীকান্ত, ফুলকুমার ও নিস্তারকে নিয়ে শুভ ষষ্ঠীর সন্ধ্যার পর পিসীমা'র বাড়ী উপস্থিত হলেন, তখন দালানের রকে ব'সে গ্রামস্থ এক ভদ্রস্ত্রীলোক একটা বড় তম্বুরা হাতে আগমনী গাইছিলেন:—

"গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল॥"

এই বাণী ক'টি সেই পুরাতন-প্রিয় সুরের স্রোতে মিশে কানের মধ্যে যেতে-ই যেন আগন্তুকদের প্রাণ স্পর্শ ক'রে ফেললে। কি আনন্দের ছন্দে গাঁথা এই আগমনী গান! এই জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতৃগণ বিশ্বকবি-ও নন—শিল্প-কবি-ও নন, কেবল বাঙ্গালার কবি। এই আগমনী, এই

আগমনী গান

বিজয়া-ই দুর্গাপূজাকে বাঙ্গালার জাতীয় উৎসবে পরিণত করেছে। যদি শাঁখ, ঘণ্টা, নৈবেদ্য উৎসর্গ ও চণ্ডীপাঠে-ই শরতে শরতে এই স্বর্গকামনার শেষ হ'ত, তা হ'লে ভক্ত বা শাক্তের ঘরে ঘণ্টানাড়া পুজোটা থাকলে-ও থাকতে পারত বটে, কিন্তু দুর্গোৎসব কবে কোন্ দিন উঠে যেত। এই দুর্গোৎসবের ব্যাপার বাঙ্গালীর মনে সুরথ রাজার স্বপ্ন-ও জাগায় না বা শ্রীরামচন্দ্রের রাবণ-বিজয়ের বোধন-ও বসায় না; জাগরিত করে মাত্র তাঁর সন্তান-স্নেহের সুশান্ত মোদন!

সেই বর্ব্বরযুগে যখন বাঙ্গালীর মেয়েরা অতি অল্পবয়সে বিবাহিতা হয়ে শ্বশুর-ভাসুরের অধীনতা স্বীকার ক'রে প্রভু-পদবাচ্য পতির ঘরে বাস করতেন, তখন সেই কন্যাদের তুল্য পরাধীনা জননীগণ মাঝে মাঝে মেয়ের মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল হতেন। শরতের আগমনে মায়ের প্রাণ সকরুণ রবে গেয়ে উঠত;—"কুস্বপন দেখেছি গিরি উমা আমার শ্মশানবাসী।" আবার আনন্দে আকুল হয়ে পড়তেন—যখন কেউ তাঁর কানে শোনাত:—

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণি তোর ঈশানী।"

বেশ জেন, না খাওয়ালে খেয়ে সুখ হয় না; না পরালে প'রে সুখ হয় না, পথ চল্‌তে চল্‌তে একটা নতুন কিছু ভাল জিনিষ দেখ লে আর এক জনকে 'দেখ দেখ' ব'লে দেখাতে না পারলে সে দেখার মজা কিছুই বোঝা যায় না।

দীর্ঘ দিন অদর্শনের পর মাতৃ-অঙ্কে পুনরাগত সন্তানের জন্য এই আদরের আবেগ সেকালের বঙ্গজননীগণকে নিজ কন্যাদের স্বগৃহে আন্‌বার প্রেরণায় পুলকিত করত। সেই কন্যাকে ব্যঞ্জন রেঁধে খাইয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে, নূতন কাপড়-চোপড় পরিয়ে, সাজিয়ে-গুজিয়ে মা-বাপের মনে যে আনন্দ হ'ত, সেই আনন্দের প্রফুল্ল হাসি গৃহস্থিত অপর সকলের মুখে প্রতিফলিত না দেখলে কি সুখের স্বাদ প্রাণ ভ'রে পাওয়া যায়?

আবার সুখ বিলিয়ে বিলিয়ে সুখের পিয়াসা মেটাবার সাধ কি সহজে পূর্ণ হয়; তাই কুটুমবাড়ী নতুন কাপড়ের তত্ত্ব, সেবক-সেবিকা, প্রতিবেশী, আলাপী সকলকে নব-বসনে ভূষিত করবার প্রথা বাঙ্গালার সমাজে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল।

এতটা বিশ্লেষণ ক'রে সুহাসিনী অবশ্য আগমনী গানের ভাষ্য নিজ মনে মনে স্থির করে নি, কিন্তু পিসীমা'র সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে যখন উপরে উঠছিল, তখন বনেদী আমলের সিঁড়ির অন্ধকার একটা কোণে সে চোখে এক-বার রুমালখানা ঠেকিয়েছিল, আর নিস্তারের নজরে-ও তা পড়েছিল।

৮

পুজোর গোলমালের এই ক'টা দিন নীচেকার টেবিল-চেয়ার-পাতা আফিস-ঘর বন্ধ ক'রে মাতঙ্গিনী উপরের দেওয়ানখানা নামে পরিচিত বৃহদায়তন সভাগৃহে-ই বসেন। মধ্যস্থলে দৈর্ঘ্যের দিকে একটি সারি সারি পঙ্খের কাযে ফুল-কাটা খিলানযুক্ত স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা সুপ্রসারিত দেওয়ান-খানাটি বিভক্ত। মেঝেটিতে আগাগোড়া সরু সপ

পদরাগ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে]

[শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কদমচাঁদ জহুরী অন্দর থেকে ফিরে এসে যে সব চেন্, শেলি, গুলবাধ, আংটী, ইয়ারিং, নাকছাবি যা সব বাবুদের ও ছোট ছোট ছেলেদের পছন্দ হয়েছে, সেইগুলি রায়-বিবিকে দেখাচ্ছেন, এমন সময় সুহাসিনী সদলবলে প্রবেশ ক'রে পিসীমা'র পায়ে প্রণাম করলেন। মাতঙ্গিনী সস্নেহে সবাইকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বসতে ব'লে উপস্থিত লোকদের পানে চেয়ে একটু হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, "চেন কি? কলকাতার বড় ব্যারিষ্টার শ্রীমানী বিবির নাম শুনেছ ত? ইনিই সেই—আমার ভাইঝি; যা হোক্ কষ্টে শ্রেষ্টে মানুষ করেছিলুম, তা আমার খরচপত্র করা সার্থক হয়েছে; এখন ওঁর মত বড় কৌন্সিলি হাইকোর্টে দু'এক জন ছাড়া বেশী নেই।" শ্রীকান্তের দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "ও বাবা, তুমি ওখানে বসলে কেন? এস এস, এই গদীতে উঠে ব'স; আমার সুহাসীর গৃহ-নারায়ণ, এক রকম পেটের ছেলে বললে হয়। আর ও ছেলেটি? উটির বুঝি ওই তোমার ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সুহাস?"

সুহাস। হ্যাঁ, ওঁর নাম ফুলকুমার। আমার বরের ছেলে-বেলাকার সখা; এই মিসেস্ নিস্তারিণী সমাদ্দারের স্বামী।

মাত। ভাল ভাল; তোমরা যে আমাদের হিঁদুয়ানী উৎসবে যোগ দিচ্ছ, এটা খুব ভাল। মনে মনে ভক্তি-শ্রদ্ধা

বিছোনো, বাহিরের প্রকোষ্ঠে তার উপর একখানি খুব পুরাতন গাল্‌চে, ভিতরে একখানি বড় সতরঞ্চ, তার উপরে একখানি সাদা ধপ্‌ধপে জাজিম, এক পাশে অধ্যাপক ব্রাহ্মণী আদির বস্‌বার জন্য একখানি সরু ছোট গাল্‌চে পাতা, আর দেয়ালের দিকে বৈঠকে বসানো রূপো-বাঁধানো হুঁকোর সারি। দেয়ালের চারদিকে ডবল-ব্রাঞ্চ দেওয়াল-গিরি, কড়ি থেকে ঝোলানো আটডেলে দু'ডেলে সব বাতি-জ্বালা ঝাড়, আর তার নীচে একখানা পুরোনো তসরের ঝালর দেওয়া টানাপাখা—যা জন চেরেক জোয়ানে টান্‌লে বোধ হয় একটু হেলাতে-দোলাতে পারে, কিন্তু হাওয়া হয় না। কর্ত্রীর বস্‌বার জন্যে এক ধারে একখানি উঁচু গদী পাতা, তার পেছনে কাঠের রেল দেওয়া 'ঠেসে' হেলানো বৃহৎ তাকিয়া, দু'পাশে দুটি ছোট ছোট ঝালর দেওয়া বালিস। নিকটে একটি হাতখানেক উঁচু পিতলের পিক্‌দান। বহিঃ-প্রকোষ্ঠের গাল্‌চের ওপর 'ভাবিনী ভাণ্ডারের' বিক্রয়িত্রী ক্ষেত্রমণি বাহারে বাহারে কাপড়, জামা, জ্যাকেট প্রভৃতির বস্তা নিয়ে ব'সে আছে; শৈলজা সাবান, এসেন্স, সুগন্ধী তেল, ফিতে, জরী প্রভৃতির অনেক নমুনো এনেছে; চিংফুং সাহেব ছোট ছোট মেয়েছেলেদের পায়ে জুতো ঠিক হয়েছে কি না, পরিয়ে পরিয়ে দেখছে; চন্দুরী অধিকারী গুটিচেরেক বালিকা নিয়ে ব'সে আছে- দুটো গান শুনিয়ে যাবে; আর ভেতরের দিকে বার্ষিক আদায়ের জন্যে বামুন ঠাক্‌রুণরা জাজিম জুড়ে ভিড় বেঁধে আছেন; গদীর উপর তাকিয়া হেলানদিয়ে ব'সে কর্ত্রী মাতঙ্গিনী স্বয়ং।

খোদার ওপর খোদকারী ক'র্ব্বেন না ব'লে তিনি চুলে কলপ দেন না, একটু সাবেকি চাল;—দুকানে দুই ঝুম্‌কো, রায়-বিবি উপাধি পাবার পর থেকেই বড় বড় মুক্তোর যুড়ী দেওয়া নথ ব্যবহার ক'র্ত্তে আরম্ভ করেছেন; গায়ে একটি সাদা মল্‌মলের বেনিয়ান বাড়ীতে সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, তার ওপর দু'নর ক'রে পরা বুকে দোলানো এক খুব মোটা দমাহার; খুব টক্‌টকে রাঙা কস্তাপেড়ে শাড়ীর উপর থেকে কোমরের চাবি-শিকলি ঝক্‌মক্ ক'চ্ছে। কুমারীকাল থেকে অভ্যাস ব'লে এখনো পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে একটু তামাকপোড়া মুখে দেন, তার রূপার কৌটোটিও হাতের কাছে রয়েছে।

বৈঠকখানায় মাতঙ্গিনী

করতে পার, ভালই; তা না হ'লে-ও দেশের উৎসবটা ছাড়বে কেন!

সুহাস। উপরে আসবার সময় দালানে ব'সে এক জন ভদ্রনারী একটি গান কচ্ছিলেন, আমরা একটু দাঁড়িয়ে শুনলুম। বাঙ্গালা কথায় এমন মিষ্টি গান হ'তে পারে, তথন জানা ছিল না; শ্রীকান্ত এক জন মন্দ কবি নয়, কিন্তু উনি বলছিলেন যে, সূর্য্যমুখীর কবিতা চাঁদের কিরণ ধ'রে বেয়ে উঠে অশ্লেষা নক্ষত্রের ভিতর আপনাকে নিঃশেষ ক'রে ফেলতে পারে বটে, কিন্তু ঐ পুরানো আগমনীর মত - কি, কথাটা কি শ্রী ?

শ্রী। মর্ম্মস্পর্শী নয়।

মাত। ওঁরা নবীন পুরুষ, কানেই প্রাণ-ও কোমল। কিন্তু জান কি, ও সব গান সেকেলে কোন কোন পুরুষের রচনা ?

সুহাস। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য; তবে পিসীমা, শ্রীকান্তরা যে পুরুষের উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করছে, তাতে আপনাদের ন্যায়—

মাত। (ঈষৎ হাস্য) প্রাচীনারা অমত করে কেন ?

সুহাস। না না, প্রাচীনা নয়।

মাত। প্রাচীনা নয়, তবে অ-নবীনা; যেমন অজাত নয়—অ-মুসলমান!

সুহাস। আমাদের বারে উইটিসিজিম্ এক রকম উঠেই গেছে, আপনাদের কিন্তু এখন-ও প্রাণ সরস আছে।

মাত। গ্রামের রাস্তায় যে এখন-ও খোয়া-ও পড়েনি গো —খোয়া-ও পড়েনি; এখানে খেজুরের শুঁড়ীতে-ও দা বসালে রস গড়ায়; সহরে পথে পাতর, কড়িতে লোহা আর লোকের বুকে বোতাম আঁটা; এখানে এখন-ও খোলা গা চলে, শীতে বড় জোর বালাপোষ। তুমি যা বলছিলে, কতকটা স্বাধীনতা ও শিক্ষা যে পুরুষদের দেওয়া অন্যায়, তা আমরা বলিনে, তবে একেবারে বি, এ, এম, এ পাশ, কি কর্পোরেসানে—কাউন্সিলে গিয়ে হুলস্থূল—

শ্রী। পিসীমা কি মনে করেন যে, আমরা যেখানে যাই, সেখানে হুলস্থূল বাধাই।

মাত। না না; যায়গাগুলো হুলস্থূলে, তাই বলছিলুম। পুরুষের প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল, তোমরা ফুলের ভারটি পর্য্যন্ত সইতে পার না, তাই ত তোমাদের অন্তঃপুরে রাজরাজেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠা ক'রে আমরা কঠিন নারীজাতি ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে বিবাহের সময় প্রতিজ্ঞা করি যে, পুরুষের ভরণ-পোষণ আরাম-আনন্দের জন্য নারীরা মাথার ঘাম পায় ফেলে পরিশ্রম ক'রে, চাকরী বা অনুরূপ কোন কার্য্য ক'রে সব ঝড়, সব চিন্তা, সব বিপদ-আপদ তারা আপনাদের কবরী-কুণ্ডলী পেতে মাথায় ক'রে নেবে; সমাদ্দার মহাশয়া কি বলেন ?

নিস্তার। আজ্ঞে, আপনি যা বলছেন, এর উপর আর কথা কি; পাছে চুল বাঁধতে হাতে ব্যথা হয়, এই জন্য আমরা ও বোঝাটা-ও মাথা পেতে নিয়ে পুরুষজাতির বেণী ঘুচিয়ে বাবরী ক'রে দিয়েছি।

ফুল। (ঈষৎ হাস্যে) তা বৈ কি! শুনেছি, সে কালে পুরুষদের-ও বড় বড় চুল ছিল, দীর্ঘকেশ অধীনতার চিহ্ন ব'লে ইদানীং পুরুষরা আপনারা-ই এ ফ্যাসান বার করেছে।

আলাপচারীটা একঘেয়ে হয়ে উঠছিল, আবার এর উপর রাজনীতি না এসে পড়ে, সেই জন্য সুহাস পিসীমাকে বললে, "আপনাদের এখনকার কালেক্টার ফিন্‌লের সঙ্গে এক দিন কলকাতায় (Amphibious club) য়্যাম্ফিবিয়স্ ক্লাবে আলাপ হ'ল quite a jolly old fellow বেশ আমুদে লোক। আপনার সঙ্গে তেমন -

মাত। লোক ওঁরা সবাই ভাল, তবে ভক্তের বোঝা-চাই, কি দিয়ে কার পূজা করতে হয়; মহাদেব তুষ্ট বিল্বপত্রে, নারায়ণ তুলসীপত্রে। ফিন্‌লে সাহেবের মাছ ধরা বাইটে খুব বেশী আছে। তাঁরই জন্যে আমি প্রায় ৭৫ টাকা খরচ ক'রে পালপুকুরের ঝাঁঝি সাফ করিয়ে দিয়েছি।

সুহাস। আসছে নিউইয়ার্স ডে'তে আপনার 'রায়-রাহাজানি' খেতাবটা নিশ্চয়ই বেরুবে।

মাত। আরে, খেতাব-ফেতাবে আমার সখ-ও নেই, ইচ্ছে-ও নেই, তবে পাড়ার পাঁচ জনে ছাড়ে না, কাছারীর সকলে-ও মান্য করে, ভালবাসে, তারা বলে, বাঙ্গাল বিলিসী রাণী-বাহাদুরণী খেতাব পেয়ে গেল, আর আপনি খালি গাফিলি করে-ই রায়-বিবির থাকে আজ ক'বছর রয়েছেন।

সুহাস। ঘর থেকে টাকার কাঁড়ি বার ক'রে দিয়ে টাইটেল নেওয়ার আমার-ও মত নেই। Immodestরা আমার নামের আগে 'বঙ্গতিলক' ব'লে ছাপাবে ব'লে হাজার পচিশ টাকা চেয়েছিল, আমি বললুম, যা—ছোঃ!

শ্রী। হ্যাঁ, তুমি বললে! না আমিই মানা করেছিলুম।

সুহাস। তুমি-ই ত আমার শুভাদৃষ্ট। দেখুন, পিসীমা, "নীচেয় আগমনী গান শুনে শ্রীর প্রাণে কেমন একটা আনন্দের ভাব এসেছে। উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, এখানে কি কাপড়-টাপড় কিনতে পাওয়া যায় ?"

মাত। তোমাদের পছন্দ কাপড় এখানে কোথায় পাবে! তবে গৃহস্থ-পোষা রকম সব জিনিষ-ই খুঁজলে মেলে। কাল মঙ্গলবার না, ভুতির ডাঙ্গার হাট মঙ্গলবারেই না বসে ?

সভাস্থ সকলে "আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ" ব'লে উঠল। রাইমণি ভটচায বললেন, "আজ্ঞে, সে হাটে রাঙ্গা ডুরে, নীলাম্বরী, পাছাপাড়—"

ই-ই-ই ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ফুলকুমারের ফিট হ'ল। তার সুরুচি-ধোয়া কোমল কানের ভিতর অশ্লীল কথা প্রবেশ করেছে। সকলে শশব্যস্ত হলেন; জল, পাখা, গোলাপ—"ওরে শীগ্‌গির আয়," "নিমীকে ডাক্তার ডাকতে পাঠা" "আহা—হা, আহা—হা" প্রভৃতি বোলে তখনকার সভা—ঠিক ভঙ্গ নয়, ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

পরদিন শ্রীকান্ত একটা নতুন কায পেয়ে বেঁচে গেল; সকালে পিস্‌শাশুড়ীর বাড়ী পূজা আরতি দেখে খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা দেড়টা নাগাদ স্বামী ও আর দুই এক জন সেবিকা সঙ্গে ক'রে নিয়ে মাইলখানেক হেঁটে ভুতির ডাঙ্গার হাটে গিয়ে এক রাশ ছোট বড় রং-বেরংএর সাড়ী ধুতি টুতি কিনে ফেললে; দাসীরা বলেছিল, পাড়াগাঁয়ে অনেক পুরুষ এখন-ও হাতে গলায় কোমরে গয়না-টয়না পরে, সেই জন্য কাচের চুড়ী-ও যা খরিদ করলে, তাতে দোকানীরা জমীদারণীর জয়গান করতে করতে বাড়ী গেল, এক দিনে এত টাকার জিনিষ এ হাটে কস্মিন্‌কালে-ও বিক্রী হয় নি। দুঃস্থ গৃহস্থবাড়ী খুঁজে খুঁজে অতি বিনয়ে অতি মিষ্ট কথা ক'য়ে অন্দরে অন্দরে ঢুকে শ্রীকান্ত প্রয়োজন বুঝে সরলপ্রাণ লজ্জাশীল পল্লীপুর-রমণদের সঙ্কুচিত ক'রে কাপড় চুড়ীটুড়ীগুলি গছিয়ে দিলেন। বারংবার অভ্যাসে ভিক্ষা করতে যাদের লজ্জা চ'লে গেছে, তাদের আক্রমণ থেকে-ও 'যথাসম্ভব-গোত্রনামায়' দিয়ে পথে শ্রীকান্ত পরিত্রাণ পেলেন।

প্রাচীন কুলপ্রথামত পাল-বাড়ীর বলি একটা দেখবার জিনিষ। অষ্টমীর দিনই বলির ঘটা বেশী; সরকারী খাতায় ৫১টা পাঁঠার ব্যবস্থা, তার উপর ১১টা ভেড়া, ৫টা মোষ, আক, কুমড়া, সুপারী বলি পর্য্যন্ত আছে। হিষ্টি-রিয়ার ভয়ে ফুলকুমার বলি দেখতে গেল না, কাযেই নিস্তা-রিণীকেও তার কাছে থাকতে হ'ল। সুহাসিনী সকালে পিসীর মোটর চেয়ে নিয়ে ১২ মাইল উত্তরে মীরকাসিমের হাতে পোতা যে প্রসিদ্ধ অশ্বত্থগাছ আছে, তাই দেখতে গিয়েছিল, এখন-ও ফেরেনি; একটা মোষ কাটাতে ক্ষান্ত কামারণীর হাতের কৌশল দেখেই শ্রীকান্ত বেচারী হুড় হুড় ক'রে সেখান থেকে ছুট।

নবমীর রাত্রে বিশেষ সমারোহ; কলকতা থেকে রায়-বিবি এবার দু' সম্প্রদায় তয়ফা আনিয়েছেন, একটি গায়িকা মুসলমানী—নাম তুতিয়া বাই। দ্বিতীয়টি বাঙ্গালী বাই—নাম নন্দলাল। নন্দ বাইজীর মজরো না হ'লে আজ-কাল কোন মজলিস-ই জমে না। অপবিত্র পুরুষের কণ্ঠে গান শুনে পাছে গ্রাম্য-চরিত্র নীতিভ্রষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় শক্তিপাড়ার 'স্বদেশসংস্কারিণী সভার' সভ্যা যুবতীগণ

ক্ষান্ত কামারণীর মোষ-বলি

স্বদেশসংস্কারিণী সভার সভ্যাগণ

নন্দ বাইজী

ক'দিন ধ'রে গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়ে লাঠী-ডাণ্ডা হাতে প্রোপাগাণ্ডা প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন যে, কেউ যেন নারী কি নর নন্দ বাইজীর গান শুনতে না যায়, আর গ্রামে এই পাপ প্রবেশ করানোর অপরাধে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যদি মাতঙ্গিনী পাল 'স্বদেশ উদ্ধারিণী সভার' লোকদের নিমন্ত্রণ বন্ধ ক'রে 'স্বদেশসংস্কারিণী সভার' খাতায় আড়াই শ' টাকা চাঁদা সই না করেন, তা হ'লে বন্ধের পর যাতে বার লাইব্রেরী থেকে ওঁকে বয়কট করা হয়, তার চেষ্টা করা হবে।

কলকাতায় শ্রীকান্ত যাই করুক, আর যে চালে-ই চলুক, এখানে কিন্তু সস্ত্রীক সঙ্গী সঙ্গিনীকে নিয়ে নাচের মজলিসে উপস্থিত ছিল।

সচরাচর নন্দ ধুতি-টুতি পরলে-ও বাইজীর পেশার মর্য্যাদা রেখে মজুরার সময় সে মুসলমানী কায়দায় ওড়না, পেশোয়াজ প্রভৃতি ব্যবহার করত। হাতে চুড়ী-রতন-চুড়-ও পরত, কানে গলায়-ও সোনা-মতি দোলাত।

ধেইধেইয়ের চেয়ে নন্দর মন্দ-মন্থর পাদক্ষেপ ও ললিত অঙ্গ-ভঙ্গী অধিক সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন ব'লে মনে হ'ল; আর তার সেঁইয়া-বেঁইয়ার অর্থ বুঝতে না পারলে-ও সুরের সৌন্দর্য্য ও কণ্ঠের মাধুর্য্য সকলকে-ই মোহিত করলে। শ্রীকান্ত চারখানি গিনি গোপনে নন্দ বাইজীকে পুরস্কার দেয়।

অপরিচিত আনন্দে বিজয়া কাটিয়ে সুহাসের পার্টি দ্বাদশীর দিন সকালে কলকাতায় ফিরে এসে পৌঁছিল।

৫

সওদাগর আফিস একাদশীর দিন থেকে প্রকাশ্যভাবে-ই খুলেছে, দু'দিনের অতিরিক্ত ছুটী মঞ্জুর করিয়ে নিস্তারিণী পঞ্চমীর দিন রাত্রি ৯টার পর কলম ফেলে বিদেয় নিয়েছিল, তবু-ও ত্রয়োদশীর দিনে আফিসে উপস্থিত হ'তে-ই বড় গিন্নী সত্য শীল তাকে খুব একবার ক'ড়কে নিলে, ইতর রসিকতায় আপ্যায়িত ক'রে বললে, 'কি, পাড়াগাঁয়ে কুটুম্বিতা রাখতে গিয়েছিলে, খেতে দিলে কি? দু' একখানা লুচি, কচুরী

মনে যা-ই বলুক, মুখে আর কোন উত্তর দিলে না। শীলের বেটী আবার বললে, "আফিসের সর্ব্বনাশ হয়েছে, কানে পৌঁছেছে—না কড়ায়ের ডাল আর পার্শে মাছের টক-ই মনে পড়ছে? কেশিয়ার কুসমী ঘোষ যে মবলোক ট্যাকা ভেঙ্গে স'রে পড়েছে, তা জান? জয়মণি ব্যাঙ্কে গেছে, তুমি ঐ লব্‌নীকে সঙ্গে ক'রে পুলিসে যাও, ছোট সাহেব বোধ হয় সেখানেই আছেন, যা হুকুম কর্‌বেন, তাই করবে।"

নিস্তার জিজ্ঞাসা করলে, "এখানকার আমার হাতের কায?"

সদু বললে, "ফিরে এসে হবে—ফিরে এসে হবে। না হয়, একটা টুকরো বাতী দেব, খানিক রাত থেকে যাবে, ক'দিন ত মজা লুটে এলে।"

নিস্তার লালবাজারে পৌঁছে শুনলে যে, তার ছোট সাহেব পুলিস কমিশনার সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গেছেন; কাজেই নিস্তার-ও বাংশাল আদালতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে তামিজুদ্দীন চাপরাশী মোতায়েন ছিল, নিস্তারকে দেখে বললে, 'আইছে যে পৌঁছতে পার্‌লা নিস্তার বিবি, এই তোমার বাহাদুরী; ম্যাকলুট ছাব তোমারে তালাস ক'রে ক'রে হায়রাণ হয়ে গেছে। ছোলতানী কর্ত্তে গিছিলে ক'নে?

নিস্তার সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "সাহেব কোথায়? আমার উপর ভারী রেগেছেন না কি চাপরাশী সাহেব?"

তামিজ উত্তর করলে, "মোরই মগজে গোঁসা চ'রে পরছে, তা ছাবের কথা ত জুদা। ঝাও—এহন য়্যাড্ডা ব্যাঞ্চ ট্যাঞ্চো ছাহে হা কোরে ঘণ্টা দুই ঘুম মারো, ছাব আসবে দু'টার পর টিফিন খাইয়ে।"

লাল পাগড়ী-বাঁধা কাঠ-খোট্টা পুরুষ পাহারাওয়ালারা হাতকড়ি-পরা আসামী মেয়েদের কোমরে দড়ি বেঁধে সিঁড়িতে ওঠাচ্ছে—নামাচ্ছে, বারান্দা থেকে ঘরের ভিতর নিয়ে যাচ্ছে, আবার বের ক'রে আনছে, মাঝে মাঝে রুলের গুঁতো দিচ্ছে দেখে—একটি ভদ্র পরিচ্ছদপরা যুবতী মদ খেয়ে হাঙ্গামা ক'রে ধরা পড়েছে শুনে নিস্তারের চক্ষু নিদ্রার কল্পনা অন্ততঃ তখনকার মত পরিত্যাগ করলে, বসবার-ও স্থান খুঁজে পেলে না। কোন বেঞ্চিতে পেশোয়ারীর ঠাসাঠাসি, একখানায় মেয়ে সাক্ষীরা জল খেতে খেতে ছানাবড়ার রস মাখাচ্ছে, পানের চূণ মুছ্চে, এই সব

ভদ্র-যুবতী মাতাল

প্রত্যক্ষ ক'রে নিস্তার ভাবলে, দু'চারটে পুলিস কেশের বিচার দেখে সময়টুকু কাটিয়ে দেবে।

সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট, মোছলমান ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে ঘুরে ঘুরে নিস্তারিণী অবশেষে এক অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রবেশ কল্লে।

রাণীকুমারী হাকিম

আজ রাণীকুমারী প্রতিভাসুন্দরীর বেঞ্চে বস্‌বার পালা। প্যাক্ট যে একটা ফক্ট, তা প্রমাণ ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবার মেঝের দুই ধারে বেঞ্চির উপর দুই জন ক্লার্ক—দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা ফেজ,বামে সিঁথিকাটা কার্ত্তিক বিরাজমান। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট রাজকন্তে, সখের চাকরীতে সম্মানিত হয়ে ভুবনভুলানো রূপে ও মণিমত্তির স্তূপে উকীল মক্কেল ফরিয়াদী আসামী ও দর্শকের হর্ষবর্দ্ধন করছেন। পাহারা-ওয়ালারা একটা একটা আসামী পাঁটাকে কাঠ-গড়ায় পুরছে আর জরিমানা শুনিয়ে টেনে বার ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। যে যুবতীকে মত্ত অবস্থায় দাঙ্গা করার অপরাধে হাজির করা হয়েছিল, তার মাতলামী প্রমাণ হ'ল না, কিন্তু দাঙ্গার অপরাধে ১৫ টাকা জরিমানা হ'ল; অগ্রিম আবগারী বিভাগে কিছু জমা দিলে সম্ভবতঃ ৫৲ টাকা দাঙ্গার দরুণ দিয়েই অব্যাহতি পেতে পারত।

এইবার একটা লড়ায়ে-মামলা উঠিবে। কোর্ট কনেষ্ট-বল দরোজার দিকে এগিয়ে চীৎকার ক'রে হাঁক পাড়তে লাগল—

"নালিশওয়ালা বিপিন—এ বিপিন নালিসওয়ালে—" ;

"গৈরুবী আসাম হাজির—হাজির হো গরুবী আসাম—"

বিপিন কিন্তু অন্তঃপুরবাসী যুবক ব'লে তার উকীল মনোমোহিনীর পাশের কেদারায় একখানা আধ-ময়লা শিল্কের চাদরে আপাদমস্তক আবৃত ক'রে বসেছিল, পাহারাওয়ালা-সাহেবের ডাকে কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে একটি সলাজ সেলাম দিলে। গৌরবিণী একটা ছাতি হাতে ক'রে দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে-ও একটা সেলাম ঠুকলে। নালিসের মর্ম্ম—স্ত্রী পতির প্রতি নিষ্ঠুরা-চরণ ক'রে বাড়ী থেকে মেরে তাড়িয়ে দেছে, খোরাকী দেয় না। মনোমোহিনী পুলিসের উকীল হ'লেও চালচলন কথাবার্ত্তা সব এক জন ব্যারিষ্টারের মত; তাঁর গাউন-বিলম্বী কেশদাম ঊর্দ্ধে বেণীবদ্ধ, নিম্নে গো-পুচ্ছ-লাঞ্ছন। রমণী ব'লে গোঁফ না কামিয়েই তাঁর ওষ্ঠখানি ঠিক ইংরাজ ব্যারিষ্টারের মত; হাতনাড়া, ঘাড় বাঁকানো, চেয়ারে এক পা তোলা, তর্জ্জনীর তাড়নে কূট প্রশ্ন, তার পর দু'টার সময় কাম্বকোর হোটেলের লাঞ্চ আর বাড়ী ফিরবার সময় আতু-রের বাক্স সবই তাঁর কাঞ্চন-সঞ্চয়ের সুপরিচয় দেয়। এ হেন মনোমোহিনীর চোখের তারার বিদ্যুতে বিপিনের পত্নী গৈরুবী বেচারীর উকীল বদরঙা ঝলঝলে গাউন গায়ে, পাকা মাথায় সিঁদুর পরা বুড়ো নয়নমণির দাঁত ভাঙা দাড়ায় যেন পক্ষাঘাত হয়ে গেল; সে থমকে থমকে your honour my client এই—ওই—একেবারে—এই তোমার গে not guilty—no cruelty; husband at once grand mascufemenine that is মদ্দা-মাদীনী—" কিন্তু বিপিনের মা পটোলমণি যখন সাক্ষীর কাটগড়ায় উঠে বল্‌তে লাগল—"আমার ছেলের মত সোনার চাঁদ ছেলে ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার ছেলেরা যার যার ঘরে পড়েছে, সেখানে সেখানে সংসার উথলে দেছে; তিন তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে রূপোর ঘড়া গাড়ু কন্যাভরণ দিয়ে ছেলের বে-দিলুম,তা সে দুটো মুখনাড়া দেবে না? ঐ হতভাগা ছুঁড়ী—গৈরুবীর উকীল উঠে বল-লেন, "I object." ম্যাজিষ্ট্রেট রাণীকুমার তাঁকে হাত নেড়ে বসিয়ে দিলেন। পটোলমণি ব'লে যেতে লাগল—"আমার ছেলের কপালে হতচ্ছাড়ী কেরাণীগিরি ক'রে খাবে, তা কি জানতুম।" এই রকম তিনিও তাঁর উপযুক্ত তিন কন্যা সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, গৈরুবীর মত রাক্ষসী, পিশাচী, অত্যাচারিণী, কুচরিত্রা স্ত্রী আর জগতে নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট গৌরবিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথায় চাকরী কর?"

গৈরুবী উত্তর করলে, "হুজুর, কলকাতা কর্পোরে-শনে।"

ম্যাজি। মাইনে পাও কত?

গৈরুবী। আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, এই এগার বছর বেলিফ-গিরি ক'রে সম্প্রতি ৪৭৲ টাকা মাইনে হয়েছে।

ম্যাজি। ভাল, এই সেপ্টেম্বর মাস থেকে তোমার স্বামী বিপিনবিহারীকে ২৭৲ টাকা ক'রে মাসে মাসে খোরাকী দেবে;—আদালতের এই হুকুম।

গৈরুবী। আজ্ঞে হুজুর, কুড়িটি টাকায় আমার চলবে কি ক'রে?

ম্যাজি। উপরি-ও ত তোমাদের পাওনা আছে।

গৈরুবী। আজ্ঞে, আপনি-ও ত এক জন কৌন্সিলার, আপনি ত সব জানেন।

ম্যাজি। না। এই গৃহস্থ-ঘরে স্ত্রীরা ইদানীং পর-প্রত্যাশী সরল শক্তিহীন পুরুষদের উপর বড়ই অত্যাচার করতে আরম্ভ করেছে, আমি তাদের examplary কি না দৃষ্টান্ত-দাত্রী শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি; তা ছাড়া এক জন যুবা পুরুষের—যত বড় গরীবের ঘরেই হোক,—রুজ হেজেলিনেই মাসিক খরচ অন্ততঃ ৭।৮ টাকা; তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, আলতা-জরদা—যাও যাও, তোমার প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করা হয়েছে—সাতাশ টাকা খোরাকী।

উপরিস্বরূপ গোটা দুই ধাক্কা দিয়ে পাহারাওয়ালা গৈরুবীকে বার ক'রে দিলে। বিপিন ঈষৎ মুচকে হেসে পটোলমণি-মা'র আঁচলখানি ধ'রে বোনেদের সঙ্গে বাড়ী গেল।

নিস্তার অবাক্ হয়ে মামলা দেখছিল। যদিও ফুল-কুমারের তর্জ্জন-গর্জ্জন নেই, তথাপি সেই লাবণ্যময় মুখখানি ও কৃষ্ণতারা চক্ষু দুটির ইঙ্গিতাস্ফালনে তার জীবনের যে সুখ-চিন্তার সঙ্গীতের ধারা কিছু ছিল, আগে-ই শুকিয়ে গেছে। আজ এই মকদ্দমার রায় শুনে মনে মনে বললে, "আমি হ'লে আজ-ই গৌরুবিণী নাম বদলে গুলজানী হয়ে গফুর-টফুর গোছ একটা খসম বেছে দিয়ে পর্দ্দার ভিতর ব'সে মজাসে তার খাটুনী দেখতুম, আর খাটিয়ার উপর থেকে পা দুলিয়ে গুড়গুড়ি টানতুম।"

শ্রী অমৃতলাল বসু

গঙ্গাবতরণ

(নর্ত্তক ত্রিপদীচ্ছন্দ)

অমিত বল ধরে, যতেক সুরাসুরে
দেখিছে দ্রুতগামী গঙ্গে।
করিয়া ঘোর ধ্বনি, ছুটিছে মন্দাকিনী,
ধবল ফেনরাজী সঙ্গে॥

কখন দ্রুত ধায়, কখন ঘুরে যায়,
উঠিছে কল কল শব্দ।
কভু বা রহে স্থির, কভু বা গতি ধীর,
হেরিছে সুরাসুর স্তব্ধ॥

সুনীল নভস্তলে, চপলা যেন খেলে,
ভ্রমিছে মীনদল হর্ষে।
জলেতে লাগি জল, ধ্বনিয়া কলকল,
ভবের দেহোপরি বর্ষে॥

নামিছে স্নানতরে, যতেক সুরবরে,
রুতন সুভূষণ অঙ্গে।
শতেক যেন রবি, উঠিল নভঃ শোভি,
গ্রথিত হয়ে একসঙ্গে॥

বরণ সুবিমল, অযুত স্রোতোদল,
শোভিছে নীলাকাশ-অঙ্গে।
শারদকালে যেন, হরষে ভ্রমে হেন,
মরাল যূথে যূথে রঙ্গে॥

যতেক সাধু ঋষি, সলিলে নামে আসি,
শাপেতে হয়ে যায় মুক্ত।
হরষে দেব-দেশে, মোহন দেববেশে,
স্বর্গলোকে চ'লে যায় উক্ত॥

৺ইন্দিরা দেবী।

বলিহারি রাজনীতি!

"কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে লাজে ম'রে যাই॥
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই না কি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে পরে বল্‌ব উমা ঘরে নাই॥"

মা'র প্রাণ, মা'র প্রাণ, মা মেয়েকে ভালবাসে, তার শাঁখা, সিঁদুর বজায় থাকা চাই, তার ছেলেপিলে সোনার দোয়াত-কলমে লেখাপড়া করে, মেয়ের জন্য কেবল এই প্রার্থনা করে; এমন কি, শিবের মত জামাই পেয়েও গৌরীকে ভিক্ষার ভাতে পেট চালাতে হয়, এ দুঃখ মা'র যায় না, তাই দাশু রায় মা'কে মা বানিয়েছেন—মেয়েকে মেয়ে বানিয়েছেন, কিন্তু আজ বাঙ্গালা মা একেবারে খাত-ছাড়া হ'য়ে গেছেন, তাঁর মাতৃত্ব আর কিছু নেই, আবার উঠবেন ব'লে যত সৃষ্টি-ছাড়া আবর্জ্জনা বুকে জড়িয়ে ধ'রে ধ'রে সারা হ'য়ে যাচ্ছেন।

দেবীপক্ষ শেষ হ'য়ে যায়, কিন্তু বাঙ্গালা মা আজ উমার খোঁজ পাচ্ছেনও না—দিচ্ছেনও না, বরং দেশে যারা মা'র খোঁজ করে, তাদের যে আজ হাড়ীর হাল—তারা যে আজ উঠতে বসতে কি নাকাল্‌ই হচ্ছে, এ খবরও তাঁর কাছে পৌঁছায় না।

আজ আগমনী রাজরাজেশ্বরীর বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাঁধা থাকবার কথা, ঘরে ঘরে কাঁসর-ঘণ্টা, শঙ্খ-শানাই, মৃদঙ্গ-এসরাজ, ঢোলক-পাখোয়াজ বেজে উঠবার কথা, আজ আনন্দে-উৎসাহে বুকভরা সাহসে জগদম্বা-সন্তান ডুবে থেকে সাঁতার কেটে বাঙ্গালীর দিগ্বিজয় করবার কথা—আর আজ বাঙ্গালী ভাবছে, কেমন ক'রে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীতে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ঘরে লুকিয়ে থাকা যায়। আজ মা'র আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় না কি আপৎকাল উপস্থিত হয়েছে, এখন হিন্দুরা এই দুর্গোৎসবের দিনে কি ক'রে আপদ্ধর্ম্ম রক্ষা করবে, তার চিন্তায় ব্যস্ত হয়েছে। আয় মা, কার্ত্তিকের মা, গণেশের মা, স্বয়ং মহাকালের ঘরণী, হিমালয়-সুতা পার্ব্বতী, এক দিন তোমার অপমানে দেবাদিদেব মহাদেবের তাণ্ডবে বসুন্ধরা কম্পমানা হয়েছিলেন, দাম্ভিক দক্ষের শিরে ছাগমুণ্ড স্থাপনের দ্বারা দক্ষরাণীর বৈধব্য নিবারণ হয়েছিল, আজ কি না সেই দুর্গা-পূজায় বিঘ্নের সম্ভাবনা আশঙ্কা ক'রে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ কেবল প্রাণরক্ষার জন্য কোথায় পুলিস, কোথায় পাহারা-ওয়ালা, কোথায় সেপাই, কোথায় শান্ত্রী, কোথায় কাজী, কোথায় কোতোয়াল, ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং ব'লে উচ্চৈঃস্বরে তাদের ডাকছে। এ দিকে অষ্টমী-পূজার দিন স্তব ক'রে "ভগবতি ভয়চ্ছেদে কাত্যায়নি চ মানদে।" কিন্তু আজ সেই মায়ের নামে ভয় তাদের আঁকড়ে ধরেছে। যারা "পশুপাশ-বিনাশায়" ব'লে মায়ের কাছে পশু বলি দিত, তারা আত-তায়ীর ডরে আপনাদের মনুষ্যত্বহীনতার জন্য সর্ব্ববিধ পশু-ভাবের অসম্ভবরূপ প্রশ্রয় দিচ্ছে, ইহার নামই না কি রাজনীতি, ইহার নামই না কি ধর্ম্মনীতি, ইহার নামই না কি জাতী-য়তা? তুমি মা, সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সংস্থিতা, আর জগতের একমাত্র মাতৃসাধক হিন্দু আজ কি না জাতিচ্যুত। আর জাতীয়তার নামে সেই জাতিনাশা কাণ্ডের মাহাত্ম্য ঘোষিত হচ্ছে; আজ তোমার বিসর্জ্জনে উৎসব করলে, বাদ্য-ভাণ্ডের অনুষ্ঠান করলে জাতীয়তার শত্রু ব'লে, শান্তিভঙ্গ-কারী ব'লে তার সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়, আর সমস্ত হিন্দু পাষাণের ন্যায় তা সহ্য করে। আজ যদি তুমি সত্য সত্যই এসে থাক, আজ যদি সত্য সত্যই আবাহনের বাজনা বেজে উঠে থাকে, আজ যদি বাঙ্গালীর কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে, আজ যদি দুর্গোৎসব তার পিতৃপিতামহের উৎসব হয়, তা হ'লে অন্ততঃ এই দিনে বাঙ্গালীর অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, মূকত্ব ও বধিরত্ব দূর হোক। আজ কোথায় পর ছেড়ে ঘরে যাব, আজ কোথায় মা'কে ঘরে নিয়ে দেশময় হাসির তুফান

ছোটাব, আজ পৃথিবীর সকল রকম দুষ্প্রাপ্য পদার্থ নিয়ে তাঁর মহাস্নানের ব্যবস্থা করব, আজ কোথায় তাঁর ভোগ-রাগ আরাত্রিক অর্ঘ্যের আয়োজনে দিবারাত্র উন্মত্ত থাকব, না, আজ কেবল পরের কথা—পরের ছাঁচতলা মাড়াবার জন্য দেশ ক্ষেপে উঠেছে। আজ সুরাসুরবন্দিনীর স্তব-স্তুতি ছেড়ে মানুষ ভোটপ্রার্থীর নিন্দা-প্রশংসায় কান ঝালা-পালা ক'রে তুলেছে। আজ আগমনী নাই—বিসর্জ্জন ত বন্ধ! আছে কেবল স্বরাজের নামে ভয়াবহ পরধর্ম্মের ঐকান্তিক প্রীতি।

উমাকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে গিরিরাণী কন্যা পরগৃহবাসী ব'লে অস্থির হয়েছিলেন, আর আজ সমস্ত বাঙ্গালাদেশ পরের পায়ে সঁপে দিয়ে স্বরাজলাভ হবে ব'লে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে আত্মহারা হয়েছে! বলি হারি, রাজনীতি!

কঃ পন্থা?

বাঙ্গালার রাজনীতিক গগন আজ ঘনঘটাচ্ছন্ন—তার উপর ভোটের সংঘট্ট সমুপস্থিত। এখন কঃ পন্থা?

মহাত্মা গাঁধি যখন অসমসাহসে অসহযোগ অভিযান আরম্ভ করেন, তখন দেশবাসী উৎফুল্ল হইয়া ভরসা করিয়াছিল যে, বুঝি মরা গাঙ্গে জোয়ার আসিল। কিন্তু তাহার আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। এখন মহাত্মাজীর অসহযোগ সহযোগী বিহনে ম্রিয়মাণ ও মুমূর্ষু—তাঁর চতুরঙ্গ 'বয়কট' আজ 'মিটিংকা কাপড়া'য় পর্য্যবসিত। তাই মহাত্মাজী নিজের Himalayan Blunder (হৈমালয়িক ভুল) কবুল করিয়া আরণ্যক হইয়াছেন। অরসিকে রহস্যনিবেদনে এই ফলই হয়! এখন কঃ পন্থা?

স্বরাজি-দলের বহ্বারম্ভ অতিমাত্র লঘু ক্রিয়ায় অবসিত হইয়াছে। সেই বাহ্বাস্ফোট, সেই লম্ফ-ঝম্প সেই Persistent ও consistent Obstruction উত্তম, মধ্যম, অধম সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে গভর্মেণ্টের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ এবং আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বিরোধ—এখন পর্য্যায়সিদ্ধ নিষ্ক্রমণ ও সংক্রমণের লজ্জাকর ক্রন্দনে কদর্থিত হইয়াছে। শত্রু হাসিতেছে, মিত্র ক্ষোভে অধোবদন, ব্যুরোক্রেশী আনন্দে উৎফুল্ল, স্বেচ্ছাতন্ত্র জাতির কষ্টার্জ্জিত অধিকার কবলিত করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত। ফলে,—

যদি বা রোগী ছিল ব'সে
স্বরাজি শোয়ালে এসে!

ইঁহারা ভাবিয়াছিলেন, রাজনীতিক আতসবাজীর দ্বারা বাজী মাৎ করিবেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, হাউয়ের ফোঁস শব্দ আছে বটে, ক্ষণিক আলোর ফুলঝুরি কাটে বটে—কিন্তু অবসানে পোড়া পাকাটি সার এবং ঘোর অন্ধকার। হায়, অদূরদৃষ্টি! এখন কঃ পন্থা?

প্রথমেই আমাদের বুঝা চাই যে, স্বরাজলাভের কোন যাদুমন্ত্র নাই—কোন রাজপদ্ধতি (Royal Road) নাই। ঐ বন্ধুর কঙ্করময় পথে বিচরণ করিতে গেলে আমাদের চরণ রক্তসিক্ত হইবেই। যাঁহারা পদ-পঙ্কজ অম্লান রাখিতে চান, তাঁহারা যেন এ পথ হ'তে দূরে থাকেন। এ পথে তাঁহারাই আসুন, যাঁহারা ত্যাগী, সংযত, নিঃস্বার্থ—যাঁহারা নির্য্যাতনকে ভয় করেন না, নিপীড়নকে তুচ্ছ করেন, অত্যাচারকে বরণ করিতে প্রস্তুত। এমন লোক যদি দেশে না থাকেন, তবে ন পন্থা।

বিগত পাচ বৎসর আমরা বহু ব্যর্থতায় ক্ষেপণ করেছি—অনেক শক্তি ও সময়ের অপব্যয় করেছি; যে পথে চলেছিলাম, সে পথটা যে ভ্রান্ত, অনেক পান্থ তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এখন এক বার দেশাত্মবোধের সাকার মূর্ত্তি তিলক মহারাজের Responsive Co operation সহযোগে সহযোগ নীতির অনুসরণ করিলে হয় না? এক বার দল ভুলিয়া দেশের দিকে চাহিলে হয় না—Party spiritএর স্থলে Public spiritকে বসাইলে হয় না?

বর্ত্তমান অবস্থায় বোধ হয়, ইহাই পন্থা—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ইহাতে আর কিছু যদি না ও হয়, অন্ততঃ জাতীয় জীবনে যে নীচতা ও হীনতা প্রবেশ করেছে, যে গ্লানি ও দৈন্যের সঞ্চার হতেছে, তার কতকটা প্রতীকার হ'তে পারে।

বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল বেশ ভদ্র লোকের মুখেও শুনা যায় যে, স্বরাজ যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন এমন কোনই হীন কাম নাই—যা না করা যায়। ভারতবাসীর মুখেও এ কথা শুনিতে হইল! কি শোচনীয় অধঃপতন!

আমরাই না এক দিন বলিতাম, 'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ?' সুবিধাবাদী হ'লে ভারতবাসীর কোন দিন কল্যাণ হবে না—স্বরাজের মত উচ্চ জিনিষ নীচ উপায়ে কখনই লাভ হবে না। হীন মলিন না হ'লে যদি স্বরাজলাভ না হয়, তবে স্বরাজ কিছু দিন না হয় স্থগিত থাকুক। কারণ, এ উপায়ে স্বরাজ পেলে সে স্বরাজ রাখা যাবে না—মাঝ থেকে আমরা আত্মঘাতী হব। বিধাতা সেই চরম অবনতি থেকে বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করুন! কারণ,—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তান্ তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥
—আত্মঘাতীর এমনই দুর্দ্দশা!

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

বর্ত্তমান সমস্যা

ব্যবস্থাপক সভা লইয়া আমরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। অল্প-দিন পূর্ব্বে এক দল উহাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়া-ছিলেন; আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নাই, কাযে তাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, তাহা সম্ভব নহে। কাযেই তাঁহারা মত-পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতিরোধ করিবার সঙ্কল্পে দলবদ্ধ হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলেন। তথায় যাইয়া তাঁহারা বুঝিলেন, সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা যায় না। কেন না, অনেক সময়ে বাধ্য হইয়াই সরকারের প্রস্তাব সমর্থন করিতে হয়। তাঁহারা তাহা করিলেনও বটে, কিন্তু মুখে তাহা স্বীকার করিলেন না। আজ আর এক দল উপস্থিত; ইঁহারা কারণে অকারণে প্রতিরোধ না করিয়া প্রয়োজনে তাহা করিবার অভিলাষী। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা যতটুকু কায করান যায়, সেটুকু ত্যাগ করিতে চাহেন না। এই মতপরিবর্ত্তনের একটা কারণ আছে, এ কথা স্বীকার করায় লজ্জিত হইবার কারণ নাই, যাঁহার যাহা নিজস্ব, তিনি তাহাই লইয়া দেশসেবায় প্রবৃত্ত হইবেন। যিনি বক্তা, তিনি বক্তৃতা করিবেন; যিনি লেখক, তিনি লিখিবেন; যিনি কবি, তিনি দেশমাতার বেদনাকে রচনায় প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবেন। ইহাতে অপমান কি?

এ দেশে এক দল এমন লোক আছেন, যাঁহারা ব্যবস্থা-পক সভার কাযকে এখানকার একটা প্রধান কায বলিয়া মনে করেন। আমাদের প্রধান কায বাঁচিয়া থাকা। জাতির অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আলো, বাতাসের সুব্যবস্থা করা। কিরূপে এই সকল ব্যবস্থার সুবিধা ক্রমে অধিক লোক সম্ভোগ করিতে পারে, সেই বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে অন্য লোক যত অগ্রসর হইতেছে, আমরা ততই পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছি। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের অযোগ্যতাকে ভিত্তি করিয়া যাহারা আপনাদের অন্নসংস্থান উপায় করিয়া লইতেছে, আমাদের যোগ্যতার্জ্জনের পক্ষে তাহারাই প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সেই বাধা সত্ত্বেও আমাদিগকে যোগ্যতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। এ জন্য আমাদিগকে এক দিকে যেমন স্বাবলম্বী হইতে হইবে, অপর দিকে তেমনই অপরের সঙ্গে একটা রফা নিষ্পত্তি করিতে হইবে। ইহা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সে জন্য যে প্রতিষ্ঠান হইতে যতটুকু সাহায্য লাভ করা যায়, তাহা ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির উৎস সৃষ্টি করিতে হইবে। এই কায ব্যবস্থাপক সভায় সীমাবদ্ধ নহে; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাকে এ কাযের গণ্ডী হইতে বাদ দিলেও চলে না। কাযেই ব্যবস্থাপক সভাকে বর্জ্জন না করিয়া তথায় এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করা প্রয়োজন, যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা দেশের যথাসম্ভব উপকার করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু প্রয়োজন হইলেই সরকারের কাযের প্রতিবাদে প্রতিরোধ অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবেন না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বঙ্গমহিলাদের সম্মান
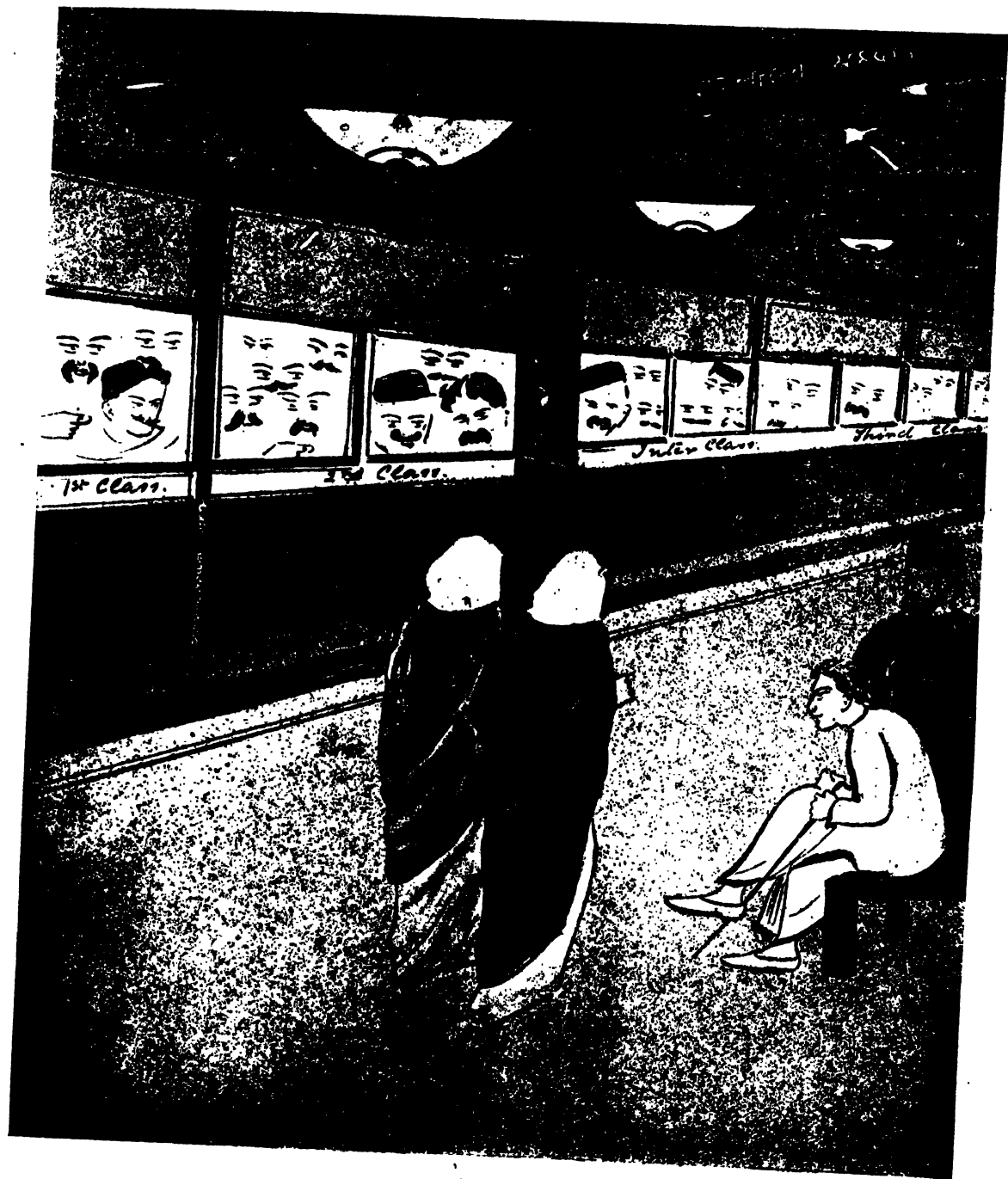
শিল্পী—শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আয়রণ অক্টোবরের প্রত্যাবর্ত্তন

বাপ। রাত তিনটের সময় পাড়ার মদ্দিখানে গোপাল দা গোপাল দা ব'লে চেল্লাচিস্—তোর জন্যে মান ইজ্জৎ সব গেল।

ছেলে। আর এত রাত্রে বাবা—ও বাবা ব'লে ডাক্‌লে একেবারে মান ইজ্জৎ বাড়তো—গোপাল দা—গোপাল দা ব'লে ডাক্‌চি—পাড়ার লোকে মনে মনে কর্‌বে গোপালের কোন ইয়ার এসেছে।

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী মহারাজের স্বহস্ত লিখিত অভিমত ঃ—

I was taken to the Basumati offices. I was pleased with the appointments. I congratulate the proprietor on the choice and cheapness of some of his publications.

12th Aug.'25 M K Gandhi

TELEPHONE No. 261.

J. F. MADAN

TELEGRAMS "JEFMADAN" CALCUTTA.

WINE AND GENERAL MERCHANTS.

HEAD OFFICE AND STORES.—

5, DHARAMTALA STREET, CALCUTTA

Branches in Calcutta, Lucknow, Darjeeling and Delhi.

LARGEST IMPORTERS IN BENGAL OF PROVISIONS, WINES, STORES, ETC, ETC.

PURVEYOR to Regimental Messes, Depots, Coffee Shops, Co-Operative Stores, Leading Clubs, Commanders of Steamers and Sailing Vessels and to the Trade.

SOME OF OUR POPULAR WINES etc.,

AT POPULAR PRICE.—

BEER :		Per doz Rs.	As.	Per bot. Rs.	As.
Lassie Brand (German Beer)	qts	7	8	0	10
Cinema Girl Brand (German Beer)	qts	7	8	0	10
White Star, Gold Bottle (The finest Beer—brewed and bottled in Germany) ...	qts	7	8	0	10
Do. do.	pts	5	3	0	7

BRANDY :		Per doz Rs.	As.	Per bot. Rs.	As.
Marie Brizard and Roger's Old Liqueur Brandy	qts	188	0	15	12
Do. do. do.	pts.	98	8	8	4
M. B. & R. Spider Brand	qts	56	0	4	12

WHISKY SCOTCH :		Per doz Rs.	As.	Per bot. Rs.	As.
O. V. G. (Old Vatted Glenlivet Whisky) ...	qts	74	0	6	4
Special Reserve (Old Vatted Whisky) ...	"	75	8	6	6
Green Stripe, Fine Old (A Blend of Choice of Whiskies)	"	80	0	6	12
Royal Liqueur Whisky...	"	74	0	6	4
Robert Brown's Four Crowns Whisky ...	"	70	4	5	15

Order Executed with Promptness and Despatch.

EVERY ARTICLES IS GUARANTEED FRESH AND IN FIRST CLASS CONDITION. WE UNDERTAKE TO REPLACE ANY ARTICLES WHICH IS OTHERWISE THAN SATISFACTORY.

আমরা নিবেদন করিতেছি যে,—

ভারতের রাজন্যবর্গ, রাজা, মহারাজা ও শ্রমশিল্প সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক প্রভৃতির জন্য চলচ্চিত্র পট (Film) তুলিয়া দিবার ভার লইতে প্রস্তুত আছি।

MADAN THEATRE LIMITED,

ম্যাডাম থিয়েটার লিমিটেড

বিদিত করিতেছেন যে, তাঁহাদিগের সুদক্ষ আলোক-চিত্র গ্রহণকারিগণ (**Camera men**) বহুবর্ষ কাল চলচ্চিত্রের কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা এই কার্য্য সম্পাদনে সকলেরই তুষ্টিসাধন করিতে পারিবেন। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত দেশসংক্রান্ত বহু বিষয়ের চিত্র তুলিয়াছেন। তদ্ব্যতীত বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত চিত্র ও **রাজা, মহারাজদিগের বিশেষ আদেশে** বিবিধ চিত্তাকর্ষক বিষয়ের চিত্র তুলিয়াছেন, এমন কি, **আফগানিস্থানের আমীর, ভারত-গবর্ণমেণ্ট** ইত্যাদি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির আদেশ পালন করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠান ও মহানুভব ব্যক্তিদিগের কার্য্য সম্পাদন করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছি, নিম্নে তাঁহাদিগের কতিপয়ের নাম ও চিত্র বিষয়ের উল্লেখ করা হইল ;—ইম্পিরিয়েল টোব্যাকো কোম্পানী, জাপান কটন ট্রেডিং কোম্পানী, **কাশ্মীরের জেনারেল রাজা সার হরিসিংহের** বিবাহ উৎসব, হিজ হাইনেস ভাওয়ালপুরের নবাব বাহাদুরের অভিষেক অনুষ্ঠান, বলরামপুর রাজ্যের রাজবংশোচিত সমারোহে বিবাহ অনুষ্ঠান, **হিজ রয়েল হাইনেস যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলসের** কপূরতলা রাজ্যে গমন, আফগানিস্থানের আমীরের জন্য বিশেষ বিশেষ চিত্র, **ভারত-গভর্ণমেণ্টের** ডাক বিভাগের চিত্রসমূহ, বিলাতের ওয়েম্বলী প্রদর্শনীর জন্য বাঙ্গালাদেশের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদিগের পরিচালিত বহু চটকলের চিত্র, উত্তকামণ্ডের ই, ও এস্ কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটি লিমিটেডের জন্য চা বাগান ও চা প্রস্তুত সংক্রান্ত চিত্র, মহামান্য রাজপ্রতিনিধির জামনগর রাজ্যে গমনের চিত্র এবং সর্ব্বশেষে কলিকাতার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নূতন গৃহে প্রবেশ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের মহাসমরোহের চিত্র উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া—

MADAN THEATRE LIMITED,

ম্যাডাম থিয়েটার লিমিটেড

৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

কাব্যাকাশে দ্বাদশ সূর্য্য! কাব্যকীর্ত্তির হিমালয় ধূলিসাৎ!

কবি-সম্রাট—অমিত্রাক্ষর কাব্যের স্রষ্টা
মাইকেল মধুসূদন দত্তের

[১] মাইকেল গ্রন্থাবলী

১। মেঘনাদবধকাব্য (১ম ও ২য়,) ২। বীরাঙ্গনা, ৩। তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, ৪। ব্রজাঙ্গনা কাব্য, ৫। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, ৬। অপূর্ব্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, ৭। কৃষ্ণকুমারী নাটক, ৮। পদ্মাবতী নাটক, ৯। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, ১০। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, ১১। একেই কি বলে সভ্যতা? ১২। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত টীকা টিপ্পনীসহ বিস্তারিত জীবনী। এই ১২৲ মূল্যের ১২ খানি কাব্যরত্ন ১।০, বাঁধাই ১॥০ টাকা।

জাতীয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

[২] রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী

সাহিত্য-রাজ্যে প্রথমে যিনি ক্ষাত্র তরবার তুলিয়াছিলেন!
সেই "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
দাসত্ব শৃঙ্খলে বল কে পরিবে পায় রে!"

১। পদ্মিনী, ২। সুরসুন্দরী, ৩। কর্ম্মদেবী, ৪। কুমারসম্ভব, ৫। নীতি-কুসুমাঞ্জলি, ৬। কাঞ্চী-কাবেরী, ৭। কবির জীবনী এই ৭ খানি জাতীয়-কাব্য একত্রে ১৲, বাঁধাই ১।০

নাট্য ও মহাকবি নাট্য-সাহিত্যের স্রষ্টা
রসাবতার দীনবন্ধু মিত্রের

[৩] দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী

১। নীলদর্পণ, ২। সধবার একাদশী, ৩। নবীন তপস্বিনী, ৪। জামাইবারিক, ৫। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, ৬। কমলে কামিনী, ৭। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ৮। পোড়ামহেশ্বর, ৯। লীলাবতী, ১০। সুরধুনী কাব্য [১ম] ১১। সুরধুনী কাব্য [২য়], ১২। পদ্য সংগ্রহ ১৩। দ্বাদশ কবিতা, ১৪। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ১৫। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত কবির জীবনী।

একত্রে ১৬৷৷০ মূল্যের নাট্যরত্ন ১৷৷০ বাঁধাই ১৸০

কাব্যের নন্দন কানন!
বাঙ্গালার ঋষিকবি, কাব্যসুধাকর—কল্পনার মানসপুত্র
কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

[৪] সুরেন্দ্র গ্রন্থাবলী

১। মহিলা ১৷৷০, ২। বর্ষবর্ত্তন, ১৲ ৩। সবিতা সুদর্শন ১৲, ৪। ফুলরা ১৷৷০, ৫। হামির ১৲, ৬। কবির জীবনী ৷৷০, ৭। মাদক-মঙ্গল ৷৷০। এই ৬৷৷০ মূল্যের কাব্য নন্দনের পারিজাতমালা মাত্র ৸০ আনায়।

কল্পনার বরপুত্র—জাতীয় মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

[৫] হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১। চিন্তাতরঙ্গিণী, ২। বীরবাহু কাব্য, ৩। বৃত্রসংহার (১ম), ৪। বৃত্রসংহার (২য়) ৫। আশাকানন, ৬। ছায়াময়ী, ৭। চিত্ত-বিকার, ৮। দশমহাবিদ্যা, ৯। ভারত-কবিতা, ১০। রহস্য কবিতাবলী, ১১। অপূর্ব্ব কবিতাবলী, ১২। বিবিধ কবিতাবলী ১৩। নানাবিষয়ক কবিতা। এই ১৬৲ মূল্যের ১৩ খানি একত্রে ১।০, বাঁধাই ১৷৷০ টাকা।

মাতৃপূজার তাজমহল!
ভারতের স্বরাজ সূর্য্য—মাতৃপূজার পুরোহিত—বাঙ্গালার নবতন্ত্রের ... দাশের

[৬] দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী

১। মালঞ্চ ১৲, ২। কিশোর কিশোরী ১৷৷০, ৩। সাগর-সঙ্গীত ৪৲, ৪। মালা ১৲, ৫। অন্তর্য্যামী ১৲, ৬। কবিতার কথা ৷৷০, ৭। কাব্যের কথা ৷৷০, ৮। বাঙ্গালার গীতি-কাব্য ৸০, ৯। রূপান্তরের কথা ৷৷০, ১০। দেশের কথা ১৲, ১১। ডালিম ১৲, ১২। অপ্রকাশিত কবিতা ১৲, ১৩। উদ্দীপনাময়ী অগ্নিস্রাবী বক্তৃতাবলী

জাতীয়-ভাণ্ডারের এই অমূল্য সম্পত্তি—জাতীয়-সাহিত্যে দেশবন্ধুর দান—যাহা অতি সস্তাতেও ১৬৸০ মূল্যে বিক্রীত হইত
গৃহে গৃহে এ স্মৃতি প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার জন্য ১৲ টাকা

আবার একত্রে এই ৬ ছয় খানি কাব্য-গ্রন্থাবলী মাত্র ৬৲ ছয় টাকা।

প্রাচীন কাব্যের অভাবনীয় সমাবেশ—সাহিত্যের অমর অবদানরাজি।

কবীন্দ্র-রবীন্দ্রগুরু কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর

[৭]

এত দিনে কবিবরের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত

১। বন্ধুবিয়োগ ১॥০, ২। প্রেমপ্রবাহিনী ১॥০, ৩। নিসর্গসন্দর্শন ১।০, ৪। বঙ্গসুন্দরী ১॥০, ৫। স্বপ্নদর্শন ১৲, ৬। বাউলবিংশতি... শতক ১॥০, ৭। মায়াদেবী ১৲, ৮। সারদা-মঙ্গল ২৲, ৯। শরৎ ১৲, ১০। ধূমকেতু ১৲, ১১। দেব-রাণী ১।০, ১১। বাউলবিংশতি ১৲, ১২। সাধের আসন ১॥০, ১৩। কবিতা ও সঙ্গীত ১৲, ১৪। কবিত্ব সমালোচনা ১৲, ... টাকা মূল্যের কাব্যজ্যোৎস্নারাশি ৸০ আনায়।

... কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ... কমলাপুরীরঞ্জিত

[৮]

১। বিদ্যাসুন্দর ... রাজাজ্ঞ। ২। পদাবলী [মা নামের অমৃত উচ্ছ্বাস]। ৩। শ্রীকালীকীর্ত্তন [ভক্তির ... উচ্ছ্বাসিত হইতেছে], ৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন [যেই ... সেই রূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখুন], ৫। সীতা-বিলাপ [করুণার উজান], ৬। আগমনী [সেই— যাও যাও গিরি আন গে গৌরী], ৭। বিজয়া [করুণা প্রবা-হিনী], ৮। অপূর্ব্ব ... কবিতাবলী ৯। কবির জীবনী এই আট খানি দুষ্প্রাপ্য মধুমাখা গ্রন্থ ৸০ আনা।

সরস্বতীর বরপুত্র—সাহিত্য-গুরু—হাস্যরস-রত্নাকর
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত সংস্করণ হইতে মুদ্রিত

[৯]

যাঁহার কাব্যমাধুরীধারা প্রভাবে খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্যকে অমর করিয়া রাখিবার জন্য স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার গ্রন্থাবলী সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়াছিলেন, যাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রতি খণ্ড ৪৲ হিসাবে ৮৲ মূল্যে বহুকাল সগৌরবে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, সেই সর্ব্বরসের সাগর গ্রন্থাবলী সমগ্র ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ৩৷৩ টাকা।

বঙ্গসাহিত্যের চির সমাদৃত কোকিল—রায় গুণাকর

[১০]

১। অন্নদামঙ্গল, ২। বিদ্যাসুন্দর, ৩। মানসিংহ, ৪। চোরপঞ্চাশৎ, ৫। রসমঞ্জরী, ৬। সত্যপীর, ৭। ধেড়েভেড়ের কৌতুক, ৮। ফর্দ্দরকৎ, ৯। হিন্দী কবিতাবলী, ১০। বালিরাজা, ১১। চণ্ডী [নাটক], ১২। নাগাষ্টক, ১৩। সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী, নানাভাষার কবিতাবলী, ১৪। কবির জীবনী, ১৫। ঋতুবর্ণনা, ১৬। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমালাপ, ১৭। কবিতাবলী, ১৮। গোপাল উড়ের ৫০০ টপ্পা। এই আবালবৃদ্ধ বনিতা সমাদৃত সাহিত্য-সমৃদ্ধি একত্রে মূল্য ১৲ টাকা, বাঁধাই ১।০।

বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি—মহাপ্রেমিক ভাবুক চূড়ামণি

[১১]

যাঁহার কমকর্ঝঙ্কারে ... চিরমুখরিত—
সেই আনন্দময়—উচ্ছ্বাসময়—প্রেম-পদ কল্পতরু
বিস্তারিত জীবনী সহ সম্পূর্ণ—সমগ্র সটীক সুসংস্কৃত
পরিবর্দ্ধিত-সংস্করণ—মাত্র ৸০ আনায়।

মিথিলার সেই বিশ্ব-বিমোহন প্রেমিক কবি

[১২] বিদ্যাপতির পদাবলী

পরিবর্দ্ধিত—পরিশোধিত—ব্যাখ্যাসহ অভিনব সংস্করণ
শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেম-মাধুর্য্যের সম্ভোগলীলা। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, দূতীসংবাদ, সন্দর্শন, সখীসংবাদ, অভিসার, মিলন, বসন্ত-বিহার, রসালাপ, মান, মানান্তে মিলন, প্রেমবৈচিত্র্য, বিরহ, আত্মনিবেদন, হরগৌরী, বিবিধ (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)। এই প্রেমলীলাসমৃদ্ধি ৩৲ টাকা।

আবার একত্রে এই ছয় খানি কাব্য-গৌরব গ্রন্থাবলী ৫৲ টাকা।

[illegible] নাট্যকারের পাঠের জন্য নিনাদ !

আপনারা জাতীয় গৌরবের জন্য ব্যাকুল—কিন্তু জাতীয় নাট্য-কবির সম্মানে পরাঙ্মুখ !

সেক্সপীয়র জগতের বরেণ্য কবি—সেক্সপীয়রের নাম শ্রবণে—স্মরণে ইংরাজ জাতীয়গৌরবে গর্ব্বে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, সে স্মৃতিরক্ষার কত ব্যবস্থা—কত উৎসাহ—আর বাঙ্গালার জাতীয় নাট্যকবি গিরিশচন্দ্র অনাদৃত—উপেক্ষিত !

তাই আজ বাঙ্গালার জাতীয় নাট্যমহাকবির কালজয়ী অমর অবদানরাজি প্রতিগৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য

ওজনদরে অপেক্ষাও সুলভে—নামমাত্র মূল্যে বিতরিত হইতেছে !

অমৃতের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী জাতি যদি উদ্দীপিত—অনুপ্রাণিত হয়—বিদেশের কাঁচ ফেলিয়া স্বদেশের কোহিনূর মাথায় তুলিয়া লইতে পারে—বিদেশের ভ্রান্তি-মদিরায় বিভ্রান্ত না হইয়া স্বদেশের প্রতিভার অমৃতে সঞ্জীবিত হইতে পারে

নাট্য-সম্রাট—নাট্য-সাহিত্যের সেক্সপীয়র—বঙ্গের গ্যারিক—বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা

অমর নাট্যমহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুনির্ব্বাচিত

[১]

কবিবরের গ্রন্থাবলী রত্নাকর বিশেষ—অফুরন্ত—অপরিসীম—
সমগ্র গ্রন্থাবলী ক্রয় করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে !

এ জন্য নাট্যপ্রিয় নবীন সমাজে আমাদের বহুদিন হইতে একটি সুনির্ব্বাচিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিতেছেন—সাহিত্যোৎসাহিগণের সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য—কবিবরের সর্ব্বজনপ্রিয় বাছা বাছা—স্বনামপ্রসিদ্ধ—সর্ব্বজনবাঞ্ছিত নাট্য-জগতের শীর্ষস্থানীয় সর্ব্বরসের আধার—নাটক প্রহসন পঞ্চরংরাজি সমাবেশে

সুনির্ব্বাচিত গিরিশ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া নামমাত্র মূল্যে প্রচারিত

কোন্ কোন্ নাট্যরত্নের অভাবনীয় সমাবেশে এই নাট্যরত্ন-মুকুট সুগঠিত—

১। শঙ্করাচার্য্য	১৲	১০। পারস্যপ্রসূন (পারিসানা)	৸০	১৭। বড়দিনের বক্‌সিস্
২। তপোবল	১৲	১১। সীতার বনবাস	১৲	১৮। য্যায়সা কি ত্যায়সা
৩। অশোক	১৲	১২। বেল্লিকবাজার	৸০	১৯। গৃহলক্ষ্মী
৪। প্রফুল্ল	১৲	১৪। আলাদীন	৸০	২০। আগমনী
৫। বিল্বমঙ্গল	১৲	১৪। আবুহোসেন	৸০	২১। দোললীলা
৬। পাণ্ডবগৌরব	১৲	১৫। ভ্রান্তি	১৲	২২। হীরার ফুল
৭। চৈতন্যলীলা	১৲	১৬। বুদ্ধদেব	১৲	২৪। বলিদান
৮। জনা	১৲			২৪। গৈরিক
৯। হারানিধি	১৲			

এই ২২॥০ সাড়ে বাইশ টাকা মূল্যের নাট্য-রত্নমালা—বাঙ্গালার সেক্সপীয়র গিরিশচন্দ্রের আজীবন সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সর্ব্বগৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য

কেবলমাত্র ৩৲ তিন টাকায় ও বাঁধাই ৩৷০ সাড়ে তিন টাকায় দিব।

এত সস্তার কল্পনা কখনও করিয়াছেন কি ?

দ্বিজেন্দ্রলাল ত শুধু কবি নন—হাস্যরস-সমুজ্জ্বল সম্মোহন গানের রচয়িতা নন—তিনি যে জাতীয়তায় পুরোহিত—বাঙ্গালীর নূতন পথ-প্রদর্শক। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙ্গালীর অবদান-হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ—দেশভক্তি ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটী কোটী ভারত-সন্তানের জীবন্মুক্তি সাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

.কখানি পাথর আনিয়া যেমন তাজমহলের সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন সম্ভব নহে, তেমনি শব্দবিন্যাসে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা বিশ্লেষণ অসম্ভব!

১ম উপহার—১ম ভাগ দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলীতে

কোন্ কোন্ দেশভক্তের দীপক রাগিণীর অপূর্ব্ব সমন্বয়-

সাজাহান ১॥০ (সর্ব্বজন-পরিচিত স্বনামপ্রসিদ্ধ নাটক)

সীতা ১৲ (সর্ব্বজন-সম্মোহন নাট্যলীলা)

৩। সোবাররুস্তম ১৲ (হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহ)

৪। সিংহলবিজয় ১॥০ (বাঙ্গালীর বীরত্ব-গৌরবে গৌরবময়)

৫। পরপারে ১৲ (সমাজের স্বরূপ বিভীষিকা)

৬। হাসির গান ১॥০ (সাহিত্যের নূতন সৃষ্টি, যাহার উপমা নাই, তুলনা সম্ভব নহে)।

৭। কালিদাস ও ভবভূতি ২৲ (প্রতিভাবিশ্লেষণ নৈপুণ্য)

৮। আর্য্যগাথা (১ম ভাগ) ১৲ (যশের মন্দার মালা)

এই ১০॥০ মূল্যের জাতীয় গ্রন্থনিচয় বসুমতীর গ্রাহকগণ

উপহারে মাত্র ১॥০ দেড় টাকা

.য় উপহার—(দ্বিতীয় ভাগ)

রাণা প্রতাপসিংহ ১৲ (.শী যুগের সেই প্রলয়কারী মাতৃমন্ত্রপূত মহানাটক)

চন্দ্রগুপ্ত ১॥০ (কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান)

। বিরহ ১৲ (প্রেমের ব্যঙ্গ-কৌতুক)

৪। বঙ্গনারী ১॥০ (কবিবরের শেষ স্মৃতির অশ্রুজল)

৫। কল্কি অবতার ১৲ (সমাজ-বিদ্রূপের জ্বালাময় চিত্র)

৬। আনন্দ বিদায় ১৲ (অনুকৃতি কৌতুকরঙ্গ)

৭। চিন্তা ও কল্পনা ২৲ (মানসসরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল অপ্রকাশিত প্রবন্ধলহরী

৮। আর্য্যগাথা (২য় ভাগ) ১॥০ (দেশ-মহিমার গর্ব্ব)

এই ১০॥০ টাকা মূল্যের জাতির প্রাণসম্পদস্বরূপ গ্রন্থরাজি বসুমতীর উপহারে মাত্র ১॥০ দেড় টাকায় পাইবেন।

জ্ঞানগ্রন্থ প্রচারের তপোবন উন্মুক্ত!

এমন জ্ঞান বিশ্বে কোন্ জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে আছে?

ধর্ম্মজগতের পবিত্র জ্যোতিঃ—ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মানন্দের কুবের ভাণ্ডার—

শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

জ্ঞানের অমৃত উৎস—এই ভোগবিলাসের যুগে মুক্তি ও দিব্যজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। জ্ঞানীর সম্বল—ত্যাগীর মুক্তি—সংসারীর শিক্ষা—মুমুক্ষুর বৈরাগ্য একাধারে। যিনি ভক্তি ও মুক্তির ভিখারী—নির্ব্বাণ মুক্তিলাভেচ্ছু—সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ—তিনি আচার্য্য শঙ্করের পদাশ্রয় গ্রহণ করুন। শান্তি ও তৃপ্তির সঙ্গে প্রপঞ্চময় মিথ্যা সংসারে একমাত্র সত্য ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভে বিভোর হইবেন—মুক্তিমার্গের পথিক হইবেন।

মূল ও অনুবাদসহ ৭৬ খানি মহাগ্রন্থের সমাবেশ—সপ্তম সংস্করণ—অদ্বৈতবাদের সুমেরুসদৃশ

বেদান্ত-রত্নাবলী

কেবল নামেই যাহার মাহাত্ম্য সুপ্রকাশ, সেই ভারতপূজ্য জ্ঞানরত্নাকরের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

কি কি অমূল্যরত্নের অপূর্ব্ব সমাবেশ—

১। মোহমুদ্গর, ২। মণিরত্নমালা, ৩। বিজ্ঞাননৌকা, ৪। হস্তামলক ৫। কৌপীনপঞ্চক, ৬। আত্মষট্‌ক, ৭। ব্রহ্মনামাবলীমালা, ৮। নির্ব্বাণষট্‌ক, ৯। আত্মবোধ, ১০। অপরোক্ষানুভূতি, ১১। যোগতারাবলী, ১২। কেবলোহং, ১৩। সাধনপঞ্চক, ১৪। সারতত্ত্বোপদেশ, ১৫। আত্মজ্ঞানকথন, ১৬। দশাবতারস্তোত্র, ১৭। আর্ত্তত্রাণনারায়ণাটাদশক ১৮। বাক্যবৃত্তি, ১৯। গুর্ব্বষ্টক, ২০। প্রশ্নোত্তরমালিকা, ২১। গঙ্গাস্তোত্র, ২২। শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র, ২৩। শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র, ২৪। বেদসারশিবস্তোত্র, ২৫। শিবনামাবল্যষ্টক, ২৬। দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক, ২৭। কালভৈরবাষ্টক, ২৮। সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্র, ২৯। ষট্‌পদীস্তোত্র, ৩০। অচ্যুতাষ্টক, ৩১। শিবপরাধক্ষমাপণস্তোত্র, ৩২। পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক, ৩৩। নারায়ণস্তোত্র, ৩৪। কৃষ্ণাষ্টক, ৩৫। অচ্যুতাষ্টক (প্রকারান্তর) ৩৬। ভগবন্মানসপূজা, ৩৭। হরিস্তুতি, ৩৮। হরিনামমালাস্তোত্র, ৩৯। ত্রিপুরাসুন্দরীস্তোত্র ৪০। দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র ৪১। আনন্দলহরীস্তোত্র, ৪২। নির্ব্বাণদশক, ৪৩। অন্নপূর্ণাস্তোত্র, ৪৪। ধন্যাষ্টকস্তোত্র, ৪৫। দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র, ৪৬। চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র, ৪৭। মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র, ৪৮। গঙ্গাষ্টকস্তোত্র, ৪৯। নর্ম্মদাষ্টক, ৫০। যমুনাষ্টকপ্রকারান্তর, ৫১। কাশীপঞ্চকস্তোত্র, ৫৩। আত্মপূজা, ৫৪। আত্মানাত্মবিবেক, ৫৫। অজ্ঞানবোধিনী, ৫৬। তত্ত্বোপদেশ, ৫৭। আনন্দলহরী, ৫৮। বিবেকচূড়ামণি, ৫৯। গণেশ দশভুজঙ্গস্তোত্র, ৬০। প্রাতঃস্মরণস্তোত্র, ৬১। অর্দ্ধনারীশ্বরস্তোত্র, ৬২। উমামহেশ্বরীস্তোত্র, ৬৩। বিষ্ণুভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র, ৬৪। ভবানীভুজঙ্গস্তোত্র, ৬৫। শারদাভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকস্তোত্র, ৬৬। ললিতপঞ্চরত্নস্তোত্র, ৬৭। ভবান্যষ্টকস্তোত্র, ৬৮। মীনাক্ষীপঞ্চরত্নস্তোত্র, ৬৯। ভ্রমরাষ্টকস্তোত্র ৭০। পুষ্করাষ্টকস্তোত্র, ৭১। কাশীস্তোত্র, ৭২ আত্মপঞ্চক, ৭৩। মনীষাপঞ্চক, ৭৪। দশশ্লোকীস্তুতি, ৭৫। হরগৌর্য্যষ্টকস্তোত্র, ৭৬। নিরঞ্জনাষ্টকস্তোত্র।

ইহার উপর বর্ত্তমান সংস্করণে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের মহাজীবনী ও দিগ্বিজয়কাহিনী সন্নিবেশিত।

জ্ঞানের রত্নাকরসদৃশ এই মহাগ্রন্থরাজি প্রচারোদ্দেশ্যে মূল্য ২৲ টাকা, বাঁধাই ২।০ মাত্র।

বেদান্ত-শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য মহাজ্ঞানগ্রন্থ—
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার!

পঞ্চদশী

বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম বৈদান্তিক মহাপণ্ডিত
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের প্রামাণ্য অনুবাদ।

মূল—টীকা—সরল বঙ্গানুবাদসহ পঞ্চদশপরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। পঞ্চবিবেক—পঞ্চদীপ—পঞ্চ আনন্দের ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানগ্রন্থ। জ্ঞানলাভের প্রথম সূত্র হইতে চরমে মোক্ষলাভ—অচ্যুতানন্দলাভ। তত্ত্ববিবেকাদির বিচার ও

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত

বেদান্তসার।

সুবোধিনী-নাম্নী প্রসিদ্ধ টীকা-সমন্বিত—বিশদ সরল ব্যাখ্যাযুক্ত—৫ম সংস্করণ। আমাদের বেদান্তসারের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তত্ত্বনিরূপণের জন্য আর্য্য-শাস্ত্র-সাগরে যতগুলি জ্ঞানগ্রন্থ আছে—বেদান্ত তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র মহোদয় বেদান্ত-গ্রন্থরাজি সঙ্কলিত করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ মুমুক্ষু মানবের মুক্তির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সুগম পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার উপর সুবোধিনী টীকার এই মায়ালীলাময়

ভক্তি গ্রন্থরাজির অপূর্ব্ব সমাবেশ—তেমনি আশাতীত সুলভ।

বৈষ্ণবগণ আবেশ-সম্ভ্রমে বিহ্বল হইবেন! ভক্তগণ আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা হইবেন!

ভক্তের কণ্ঠহার, জগতে অমূল্য ভক্তিগ্রন্থাবলী।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

অসংখ্য টাকা চাঁদা তুলিয়াও যে সকল মহাগ্রন্থ উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতেছে, সেই সকল মহাগ্রন্থের একত্র সমন্বয় প্রচার উদ্দেশ্যে নামমাত্র মূল্যে!

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক, ২। নরোত্তম বিলাস, ৩। দুর্লভসার, ৪। আত্মতত্ত্ব, ৫। মনঃশিক্ষা, ৬। শ্রীচন্দ্রিকা, ৭। পাষণ্ডদলন, ৮। অমৃত রসাবলী, ৯। ভক্তিতত্ত্বসার, ১০। হাটপত্তন, ১১। শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, ১২। পারিষদ-বন্দনা, ১৩। নামসঙ্কীর্ত্তন, ১৪। চৌত্রিশ পদাবলী, ১৫। বৈষ্ণববন্দনা, ১৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, ১৭। নরোত্তম দাসের প্রার্থনা। একত্রে মূল্য ৷৶০ আনা, বাঁধাই ১৲ টাকা।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তীর

১। লীলাগান-পদ্ধতি

চৌষট্টি রসের প্রণালী-নির্ণয় ও পদসংগ্রহ। মূল্য ৩৲ স্থলে ২৷৷০।

২। লীলামাধুরী

শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী। মূল্য ১৲

মহাপ্রভুর পারিষদ মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবতসার

মহাপ্রভুর নিত্যপাঠ্য প্রেম ভক্তি ও জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার। রামায়ণ মহাভারতের মত সুললিত পয়ারছন্দে

অভিনব রাজসংস্করণ তিন খানি ভক্তিগ্রন্থ

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

জ্ঞান ও ভক্তি শুদ্ধাভক্তি ও মহিমা কীর্ত্তনের ভাবাবেশে পুলকের বন্যা বহিতেছে। আমাদের শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এত আদরের কারণ, ইহা অতি বিশুদ্ধ, বড় বড় অক্ষরে মূলের নিম্নে সরল অনুবাদ, পরে কবিরাজ গোস্বামীর সুবিস্তৃত পয়ার—টীকা টিপ্পনীর সংযোগ। ভক্তের কণ্ঠহার পবিত্র তুলসী-মালা সদৃশ মহাগ্রন্থ কাপড়ে বাঁধাই ২৲।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের চিরসমাদৃত অলঙ্কার—ভক্তগণের জপমালা

ব্যাসাবতার শ্রীমদ্ বৃন্দাবন ঠাকুর বিরচিত—

২। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

নানাস্থানের বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট হস্ত লিখিত পুঁথি সংগ্রহে এই পবিত্র গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন-সম্পদ
সেই জানে ভক্তিতত্ত্বসার।
গৌরাঙ্গ মধুর-লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

সরল পয়ার ছন্দে মহাপ্রভুর আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলা সুবিখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর মধুর লীলা পাঠ করিয়া ভাবে গদগদ প্রেম ভক্তিতে পূর্ণ হইতে চাহেন, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত তাঁহাদের পরম ধন অমূল্যনিধি। প্রেম ভক্তির ভাণ্ডার এই মহাগ্রন্থের—বাঁধাই সংস্করণ মাত্র ১৷৷০ টাকা।

বৈষ্ণব সাহিত্যের চির সমাদৃত অলঙ্কার—ভক্তজনের জপমালা

৩। শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ

অমিয় ভক্ত-চরিতমালা।

ভক্তমালের ন্যায় সহস্র ভক্তের প্রেমভক্তি মাধুরী মণ্ডিত জীবনী ইতিহাসপূর্ণ মহাগ্রন্থ আর কোন ভাষায় নাই। ইহা অতুলনীয় বিচিত্র ভক্তিপূর্ণ উপাখ্যানে বিস্ময়কর চরিত্র সংশোধনে—প্রাণের ব্যাকুলতায় শ্রীভগবানদর্শনের অপূর্ব্ব বিবরণ। মীরাবাই, করমেতিবাই, বিল্বমঙ্গল, অলর্ক, শ্রীজয়দেব প্রভৃতি মহাত্মার প্রকৃত ইতিহাস ভক্তিতত্ত্ব, প্রেম-মাহাত্ম্য।

'নামে রুচি জীবে দয়া' স্মরণে নামামৃত পানে বিভোর হউন!

বৈষ্ণবস্তোত্রনামামৃত

সুধাক্ষরিত সুধাধারা। বৈষ্ণব সাহিত্য ভক্তিজগতে কি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছে, তাহা বৈষ্ণবনামামৃত পাঠ না করিলে উপলব্ধি হয় না! বহু আয়াসে বহু সাধনার এই লুপ্তপ্রায় মহারত্নরাজি শ্রীধাম নবদ্বীপ, পুণ্যতীর্থ শ্রীবৃন্দাবন, মথুরার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে এই সকল অতুল্য অমূল্য সমৃদ্ধি সংগ্রহ করিয়া ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিলাম। ৪১ খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সমন্বয়ে এই বৈষ্ণবস্তোত্রনামামৃত সুসম্পূর্ণ। ভক্তগণ সাদরে গ্রহণ করুন।

ভক্তিজগতের এই অমৃতনির্ঝর-স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-চূড়ামণি সাধকোত্তম বিরচিত প্রেম-ভক্তির অমিয় উজানময়—দুস্তর সংসার-সাগরে মুক্তিপ্রদ মুকুন্দমুক্তাবলী, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, গোপীগীতা হইতে উপদেশামৃত উৎকণ্ঠা দর্শক পর্য্যন্ত ৪১টি লুপ্তপ্রায় মহা রত্নের অপূর্ব্ব সমাবেশ!

শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে স্বয়ং বলিয়াছেন—

আমার নাম আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তবে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? আসুন! আমাদের বহু আয়াসে কীট-

হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী!

সেই গৌরবময় বসুমতী সংস্করণ মহাভারত

বহু দিন পরে—বহু যত্নে সুসংস্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্যগৌরব—শাস্ত্রগৌরব ভারত-গৌরব উপন্যাস-প্লাবিত শুদ্ধান্তঃপুর
আবার মহাভারতের পুণ্য-ঝঙ্কারে মুখরিত হউক!

ঋষিপদরেণুপূত ভারতের মুক্তিমন্ত্র সমাহিত মহাগ্রন্থ!

আর্য্যকীর্ত্তির অক্ষয় ভাণ্ডার, আর্য্যজ্ঞানের রত্নাকর! বেদগাথা-মুখরিত আর্য্যতপোবনের বীণার ঝঙ্কার "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"—পুণ্যবান কাশীরাম দাস অমিয়ময় পয়ারছন্দে ভারত গান গাহিয়া ভূতলে অতুলকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—কালের প্রভাবে ইহা অবিনশ্বর। ভক্তি ও মুক্তির ভিখারী, ত্রিতাপদগ্ধ, মুমুক্ষু, বিলাসী ও ত্যাগী যুগে যুগে এ অমৃত পানে শান্তি ও মুক্তিলাভ করিবে। পাষাণ হৃদয়ও এ করুণা ঝঙ্কারে বিমুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়। রুচিবাগীশগণের "অশ্লীলতা" আতঙ্ক নীতি অনুসরণ করিয়া আমরা এই পুণ্যময় গ্রন্থের সংস্কার সংহার করি নাই—

এই অমিয় ভারতগাথা যথাযথভাবে প্রাচীন পুঁথিদৃষ্টে মুদ্রিত, সুসংস্কৃত সুসম্পূর্ণ—
সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব্ব—বড় বড় অক্ষরে, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজাধিরাজ সংস্করণ।

এবার আমাদের মহাভারত চিত্রসম্পদে অতুলনীয়—প্রাতে নমস্ত—ভক্তিমাধুরী সমুজ্জল—

ত্রিবর্ণ সুরঞ্জিত—বড় বড় ৩০ খানি চিত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ!

এক রঙের চিত্রনিচয় | ত্রিবর্ণ সুরঞ্জিত চিত্র-তালিকা

১। জন্মজয়ের সর্প যজ্ঞ
২। একলব্যের গুরুদক্ষিণা
৩। কীরাত অর্জ্জুন
৪। শমীবৃক্ষে অর্জ্জুন ও উত্তর
৫। ঘটৎকচ বধ
৬। জয়দ্রথের ছিন্নমুণ্ড
৭। কুরুক্ষেত্র রণস্থলে গান্ধারী
৮। জনা ও প্রবীর
৯। শাম্বের প্রতি অভিশাপ
১০। প্রচ্ছদপট ব্যাস ও গণেশ

১১। বিশ্বামিত্র ও মেনকা
১২। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা
১৩। মেনকা ও শকুন্তলা
১৪। গঙ্গা ও শান্তনু
১৫। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা
১৬। দ্রৌপদীর শিবপূজা
১৭। সুভদ্রা হরণ ১৮। পাণ্ডবের বনগমন
১৯ উর্ব্বশী ও অর্জ্জুন
২০। সাবিত্রী ও যম
২১। সুদেষ্ণা ও দ্রৌপদী

২২। শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা
২৩। কুরুক্ষেত্রে গীতা প্রচার
২৪। ভীষ্মের শরশয্যা
২৫। উত্তরা ও অভিমন্যু
২৬। দুঃশাসনের রক্তপান
২৭। ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ
২৮। অর্জ্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ
২৯। শিবিরদ্বারে অশ্বত্থমার শিবা-র্চন
৩০। হর্ষবিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু
৩১। হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর পতন

সঙ্গে সঙ্গে কাশীরাম দাসের জীবনী ও বিশদ ভূমিকা এই ভক্তিপ্রস্রবণ মহাগ্রন্থ

প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য মাত্র ৩৲ টাকায় পাইবেন।

উপন্যাস সাম্রাজ্যে যুগপ্রলয়!

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১। রুশিয়ার কালনিমে

পল্লীসমাজে অতিরঞ্জনবিহীন চিত্র। যাঁহারা পল্লীর স্নেহ-ভালবাসা হারাইয়া সহরের কর্ম্মকোলাহলকে জীবনের সম্বল করিয়াছেন এ উপন্যাসখানি তাঁহাদের মনোরম্য হইবে।

সুশোভন সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১৸০ সাত সিকা

২। রুষদর্পহারী শিখ

এই শিখটি কে? বিরাট বিশাল রুষসামাজ্যের অধীশ্বর দ্বিতীয় নিকোলাসের দর্প চূর্ণ করিয়া শিখের গৌরবপতাকা গগনে উড্ডীন করিয়াছিলেন? তিনি পঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের পৌত্র ভিক্টর দলীপ সিংহের ভ্রাতা, তাঁহার জননী ইংরাজ মহিলা। তিনি রুষিয়া ও তুরস্কের সম্মিলিত রাজশক্তি ব্যর্থ করিয়া কি বিস্ময়কর উপায়ে শত্রুপক্ষের কূট কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহারই নায়ক-নায়িকার প্রেম! স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল বিকাশ, দেশাত্মবোধের ও গভীর স্বদেশপ্রেমের এরূপ হৃদয়স্পর্শী গৌরবময় কাহিনী স-চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য দুই টাকা মাত্র!

৩। উজীর-নন্দিনী

ভারতের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মহাপরাক্রান্ত নরপতি আমীরের সহিত ভারত সীমান্তস্থিত দুর্দ্ধর্ষ হাজরা জাতির লোমহর্ষণ সংঘর্ষ! প্রতি পরিচ্ছেদে নব নব দৃশ্যের নয়নাভিরাম বায়স্কোপ! দুইটি স্বাধীন জাতির নরনারীগণের প্রেম ও বিরহের, স্বাধীনতা প্রীতি ও আত্মবিসর্জ্জনের হৃদয়স্পর্শী করুণ কাহিনী। আফগান নরপতির অন্তঃপুরের অশ্রুতপূর্ব্বকাহিনী পাঠে স্তম্ভিত হইবে। পৌনে চারি শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অতি চমৎকার বাঁধাই মূল্য ২৲।

মোসলেম সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সুলেখক এম. মনির হোসেনের

অপরিচিতা

প্রেমরাজ্যে অপরিচিতার সমাদর চিরপ্রসিদ্ধ—তাহার উপর এই অপরিচিতা প্রেমময়ী। এ প্রেমে সুধাও আছে—গরলও আছে। প্রেমতৃষিত পাঠক সাদরে অপরিচিতাকে ঘরে লইয়া যান। সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১।০ টাকা

ব্যথিতা

এ ব্যথায় সম্মোহন কাহিনী আছে, এ ব্যথায় প্রাণের ব্যথা উপশম হয়—মর্ম্মের ব্যথা আকাঙ্ক্ষার সুরে জাগিয়া উঠে—এ ব্যথা যে প্রেমের সংগোপনে কাহিনী। পাঠক সাদরে ব্যথিতাকে গ্রহণ করিয়া প্রাণের ব্যথা উপশম করুন।

সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৷০ আট আনা।

মোহমুক্তি

হিন্দুর গৃহে বিধবায় যে মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি—আত্মত্যাগের—পরহিতব্রতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গৃহে গৃহিণী, বিপদে শক্তিরূপিণী—সন্ন্যাসীর বিজন আশ্রমে তেজোময়ী তপস্বিনী—সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠানে করুণাময়ী, মঙ্গল শঙ্খধ্বনির ন্যায়—সর্ব্বত্র পবিত্রভাব বিতরণ করিয়া কিরূপে মোহান্ধকে মোহমুক্ত করেন, নিজে পড়ুন এবং আত্মীয়স্বজন সকলকে পড়িতে দিউন।

নানারূপ বিরুদ্ধ ঘটনা মধ্য দিয়া হিন্দু বিধবা কিরূপে আত্মরক্ষা করিলেন এবং আত্মীয়-স্বজন এমন কি আততায়ীকে রক্ষা করিলেন পড়িতে পড়িতে বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উদীয়মান ঔপন্যাসিক কালীপদ বাবুর

ভবেশ

লোকশিক্ষার জন্য পাপ ও পুণ্যের দুটি স্বরূপ ফটো পাশাপাশি সুসজ্জিত—সুখৈশ্বর্য্যের পার্শ্বে পাপের দারুণ দুর্দ্দশা, পরিস্ফুট করিয়া কৃতী ঔপন্যাসিক সমাজের মধুর উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছেন। এ উপন্যাস পাঠে সার্ব্বজনীন আনন্দ স্বাভাবিক। সুন্দর অ্যান্টিক কাগজে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই মূল্য ২।৷৩ স্থলেন ৩৷০ টাকা।

প্রবীণ সুলেখক দেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত—

গোপালের মা

ভক্তিধারা প্রবাহিত—স্নেহাশ্রু সঞ্চারিত মধুর উজ্জ্বল উপন্যাস—এ্যান্টিকে ছাপা, ভাল বাঁধা, মূল্য ১৷০ টাকা।

মৌলিক গবেষণাপূর্ণ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পুস্তক

জীবন রহস্য

মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য কি—কেন জন্মিয়াছি—কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে—জীবনের গতি কোন দিকে কোথায়—শান্তিযোগ কাহাকে বলে ইত্যাদি তত্ত্ব ও তথ্য বিশদ বিবৃত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

নবীন ঔপন্যাসিক প্রিয়লাল বসু প্রণীত

গলগ্রহ

বিবাহের পূর্ব্বরাগের সম্মোহন মোহলম্পট স্বামীর তৃষ্ণা-তৃপ্তির পর কি নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়, সাধ্বী স্বামী প্রেমের সেই স্মৃতিটুকু সংগোপনে রক্ষা করিয়া জীবন যৌবন কি ভাবে সার্থক জ্ঞান করে—অনাদৃতার কল্পনার তাসের প্রাসাদ মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইলেও মানসিক ঐশ্বর্য্যে কি ভাবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, দেখিয়া প্রশংসা করুন।

সুবর্ণখচিত বাঁধাই মূল্য ৷৹ আট আনা।

১৲ টাকা সিরিজের প্রত্যেকখানি ॥০ আনা

৯। বিভীষিকা

সত্যই বিভীষিকা—কিন্তু যেন গোলকধাঁধা—আর গোলকধাঁধাই বা বলি কিরূপে? এ যে শত শত প্রহেলিকার বিচিত্র সম্মিলন! খুনের পর খুন—ডিটেক্‌টিভ খুন—যে সন্ধানে যায়—সূক্ষ্ম সূত্র আবিষ্কার করে, সেই খুন—আবার অনেকে পাগল হইয়া গেল! শেষ মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ কুহকিনীর মায়াজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইল।

পূর্ব্ববঙ্গের সেই যশস্বী সুলেখক—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

১০। শুভঙ্কর

সুশিক্ষার পরিকল্পনাময় মাধুরীমাপূর্ণ নবীন নবন্যাস নারী-হৃদয়-রাজ্য জয়ের জন্য অভিনব অভিযান। প্রেমের মোহিনী শক্তির প্রভাবে নারী স্বর্গের দেবী আর লালসার উদ্দীপনাময় পিশাচী-প্রতিমা! নারীর পুণ্যপ্রভাবে সংসার নন্দনও হইতে পারে আবার নরকও হইতে বিলম্ব হয় না। তাই কৃতি লেখক দেখাইয়াছেন, জীবনগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত—পুণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত—প্রেমের মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে না পারিলে—এ জীবন মরুভূ প্রায়।

১১। বাঙ্গালী সমাজ

দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নীর দাপট—থিয়েটার দেখিতে না পাইয়া নবপরিণীতা রূপসী যুবতীর দুর্জ্জয় অভিমান—কোর্টসিপ করিয়া মনোমত পত্নী নির্ব্বাচন হইল না বলিয়া শিক্ষিত বাবু ক্ষেপা! 'নভেল নলিনীর' সদম্ভ আক্রোশ!

নবীন ঔপন্যাসিক বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

১২। কালের খেলা

প্রণয় স্বপ্নের মোহন আবেশময় উপন্যাস।

ভুবনমোহন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনূদিত

১৩। গলিভার ট্রাভাল

অপূর্ব্ব ভ্রমণ ও অজ্ঞাতরাজ্য দর্শন। গলিভারের পৃথিবী পরিভ্রমণ—অদ্ভুত অত্যদ্ভুত দৃশ্যদর্শন—অপূর্ব্ব ভঙ্গিমাপূর্ণ বর্ণনা পাঠে হাসিয়া হাসিয়া অস্থির হইবেন।

মিশর-সুন্দরীর লীলানিকেতন উন্মুক্ত!

১৪। রূপসী মরুবাসিনী

যাঁহারা মিশর-বিমোহিনী লাভের জন্য অসাধ্যসাধনের অলৌকিক সিদ্ধি দেখিতে চাহেন—যদি ভীষণ শাহারা মরুর দুর্দ্ধর্ষ 'ভারুইন' দস্যুগণের বিভীষণ প্রতাপ দর্শনে চমকিত হইতে চান—যদি জন্ম মৃত্যুর রহস্য-প্রহেলিকা সু-অবগত হইতে চান ত' এই বৃহৎ ও সম্পূর্ণ বৃহৎ নবন্যাস সর্ব্বাগ্রে পাঠ করুন।

পূর্ব্ববঙ্গের ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্র গুপ্তের

১৫। ঋণের দায়

রূপের উন্মাদনা—লাবণ্যের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ—প্রাপলিটিক্সের তুমুল আন্দোলন—রূপের সঙ্গে অনুরাগে সম্মোহন মিলনে প্রেমের অজস্র ধারা। মনুষ্যের পরিশোধ হয় কিন্তু প্রেমের ঋণ—কৃতজ্ঞতার ঋণ স্নেহের ঋণ যে অপরিশোধনীয়।

সুঔপন্যাসিক যতীন্দ্রনাথ পালের

১৬। দেশের মেয়ে

নূতন ধরণের বিবাহসমস্যায় চিন্তাপূর্ণ উপন্যাস! ধনী আদরিণী কন্যাকে লাভের জন্য সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ লাভের জন্য বিপুল চক্রান্ত। প্রেমের সহিত বিবাহ—প্রাণের সহিত বিবাহ—ধনের সহিত বিবাহ—রূপের সহিত বিবাহের নানা আয়োজন—কেমন করিয়া প্রেম যাচাই হয়!

জাতীয় অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন গুপ্তের

১৭। শিবরাত্রি

ব্রাহ্মসমাজে বয়স্থা কন্যার বিবাহ-সমস্যা শেষে হিন্দু বিবাহে সমাপ্তি। কন্যার বিদ্যা বরের বিদ্যাপেক্ষা অনেক বেশী—এ সমস্যার সমাধানের উপায় কি?

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রমোহন সেনের

১৮। নন্দনপাহাড়

স্নেহময়ী বৌদিদির সুমধুর বাৎসল্য। আনন্দময়ী পত্নীর প্রেমে জীবনের অবসাদ—জাড্যের অবসান!

মনস্তত্ত্ববিদ্ কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্তের

১৯। দেশের ছেলে

দেশের ছেলে আদর্শ উপন্যাস—দেশ মাতৃকার সেবার জন্য কিরূপ আত্মত্যাগের প্রয়োজন, আত্মাহুতি না দিলে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয় কি না, তাহা জলন্ত অক্ষরে প্রতিফলিত।

বিদুষী সুলেখিকা শ্রীমতী সরসীবালা বসুর

২০। শিবাণী

প্রেম-নৈরাশ্যের হৃদয়ভাঙ্গা দুর্জ্জয় অভিমান! সংসার যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়া গেল, লালসার দাবানলে ভস্মীভূত—প্রবল তরঙ্গে সাঁতার

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হরিসাধন বাবুর

২১। গুলকাসেম

তড়িৎ-কান্তিময়ী সুন্দরীকে লাভ করিবার জন্য বীরেন্দ্রগণের বিপুল প্রয়াস—স্বামীর প্রেমের গর্ব্বে গৌরবান্বিত রূপসীর ঐশ্বর্য্যের শিরে সদম্ভ পদাঘাত—কামলালসার উৎকট জ্বালা। প্রেম-নৈরাশ্যের প্রতিহিংসার লাভাপ্রবাহ, কামিনীর কটাক্ষের বিজলী তরঙ্গ

১ খানি ১৲ লইলে মূল্যে মূল্যে এই সিরিজের যে কোন এক খানি সম্মোহন উপন্যাস উপহার।

বাঁধাই বাহার বড় বড় উপন্যাস প্রত্যেকখানি ৮০ বার আনা।

ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রনাথ পালের

২২। বরের নীলাম

বাহের পণপ্রথা ক্রমে কি ভাবে নীলামের ডাকে পরিণতি লাভ করিয়াছে—মেকেঞ্জিলায়ালের নীলামে বরের ডাক চড়িতেছে—তাহারই স্পষ্ট চিত্র, উপন্যাসের রসভাবে রচিত। বড় ঘরে বিধবা নিলামের ডাকে বর কিনিয়াছেন—এবার অর্থলোলুপ পিতা কি করেন একটা দেখিবার জিনিস!

কুলমপ্রিয় সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

২৩। কুলুই চণ্ডী

দুঃখী কুমারীর সুখের স্বপ্ন শ্বশুর গৃহে আসিয়া কি ভাবে চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়—স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা বড়ঠাকুরাণীর অনাদৃতা প্রাণ ঢালিয়া স্বামীর মঙ্গল কামনায়ই কিরূপে জীবন সফল করিতে পারেন—সেই আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বামীর সৌভাগ্য কি ভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে, দেখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন।

ঔপন্যাসিক মহারথী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

২৪। পরশমণি

প্রেমের পরশমণির সংস্পর্শে লৌহ সুকঠিন হৃদয় কেমন করিয়া কষিত-কাঞ্চনে পরিণত হয়—প্রেমের সম্মোহনমন্ত্রে প্রেমের পাষাণ প্রতিমা কেমন অত্যুজ্জল হীরকের সমুজ্জল প্রভায় পরিণত হয় দেখিয়া পুলকিত হউন।

মহিলা সুলেখিকা শ্রীমতী মালিনী দেবী

২৫। যোগীগৃহী

সংসারবিরাগী কেমন করিয়া প্রেমের ভেষজে আবার গার্হস্থ্য সুখে সুখী হন—জীবনের মহত্তোমহীয়ান কল্পনা প্রেমের জল্পনায় কেমন করিয়া ধরা দেয়, চাঁদধরা রূপের ফাঁদ পাতিয়া প্রেমের খেলায় কেমন করিয়া হারিয়া জিতিতে হয়, দেখিয়া বিস্মিত—সম্মোহিত হউন।

সুবিখ্যাত সুলেখক বঙ্গবাণী সম্পাদক শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদারের

২৬। সীতার ভাগ্য

মেঘ উঠিল—প্রেমের পুলকজ্যোৎস্না ঢাকিয়া লালসাময়ী বিধবার প্রেমের মোহান্ধকার ঘনীভূত হইল, কিন্তু সতীত্বের জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। লালসার পঙ্কিল আবর্ত্তে প্রেমের পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, সতীত্বের মহিমা সমুজ্জল হইল।

নায়ক সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭। দরিয়া

দরিয়া প্রেমের পাথার—পরকীয়া রসের সাঁতার—যে রসে যে জন মজে সেই রসের বিপুল বাহার—প্রেমলীলা লালিত্যের তানতরঙ্গ—আবার সমাজের বীভৎস্য ছবি! শিক্ষার সঙ্গে প্রমোদ, হাস্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতা—বিদ্রূপের সঙ্গে তীব্র সমালোচনার জ্বালা!

বিখ্যাত নভেলিষ্ট যতীন্দ্রনাথ পালের

২৮। ভবানীপ্রসাদ

দরিদ্র দুঃখে ও ধনীর সম্পদে কি বিভীষণ সংঘর্ষ! লালসার যূপকাষ্ঠে সতীর সতীত্ব কি অত্যাচার অনাচারে বলী হয়, দেখিয়া বিস্মিত হউন—মর্ম্মের ব্যথা প্রাণে অনুভব করুন।

ঔপন্যাসিক নবীন রথী ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের

২৯। লক্ষ্মী

এই উপন্যাস সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না, উপন্যাসসম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"লক্ষ্মী বইখানি পড়িয়া আমার ভাল লাগিয়াছে, এই নবীন গ্রন্থকারের যে দুই একটি গল্প ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই আনন্দ দান করিয়াছিল। মনে হয়, এ খানি পড়িয়াও [illegible] হইবেন।"

ঔপন্যাসসম্রাট শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

৩০। বামুনের মেয়ে

সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনায় মধুর উজ্জ্বল প্রেমলীলালহরিত উপন্যাস!

বিক্রমপুর ইতিহাসপ্রণেতা যোগেন্দ্রগুপ্তের

৩১। লক্ষ্যপথে

রূপের সঙ্গে প্রেমের মদিরায় কেমন সম্মোহনমন্ত্রে উদ্‌ভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে হয় দেখিয়া দিশেহারা হউন! ফুটনোন্মুখ যৌবনের ভালবাসা-বসন্তহিল্লোল দেখিয়া প্রমোদিত হউন। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় প্রেমের জয়গান করুন।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযতীন্দ্রনাথ পালের

৩২। গৃহিণী

যাঁহার গৃহে পাকা গৃহিণী নাই—তিনিই সযতনে গৃহিণী গ্রহণ করুন।

প্রিয়তমাকে যাঁহার সুগৃহিণী করিবার সাধ আছে, তিনি সাদরে গৃহিণীকে উপহার দিন। সাধের পুত্রবধূকে যিনি সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপিণী গৃহিণী করিতে চান, তিনি আজই সেই কুললক্ষ্মীকে গৃহিণী উপহার দিন! সংসারের অনেক অশান্তির জ্বালা দূর হইবে—স্বর্গীয় আনন্দের প্রাণমাতানো সুমধুর ঝঙ্কারে বিমোহিত হইবেন।

নবীন ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর

৩৩। অভিমানিনী

অভিমানের বিপুল গর্ব্ব! প্রেমের নিকট আত্মসম্মান উপেক্ষা! দাম্ভিকার হৃদয় জয়ের জন্য বিপুল অভিযান! সুকৌশল নৈপুণ্যে প্রেমের কেল্লা দখল। প্রণয় সুষমার বিকাশে সৌভাগ্য-জ্যোৎস্নার উদয়!

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রনাথ পালের

৩৪। হিন্দুগৃহ

হিন্দুর সংসারের জলন্ত আলেখ্য! মরীচিকার ছলনা! প্রেমের রাগিণী ঝঙ্কার মহিলাপাঠ্য এমন উপন্যাস বিরল। পাঠে আনন্দতরঙ্গে পুলকিত হইবেন।

কর্ম্মময় জগতে কর্ম্মস্রোতের তুমুল সংঘর্ষ !

সুদৃশ্য বাঁধাই রহস্যলহরী সিরিজ প্রত্যেকখানি ৸৹ বার আনা।

২৬। কণ্টকে কমল
প্রেমের মধু ও বিষ একাধারে।

২৭। লেডী ডাক্তারের লেড়কা
গুপ্ত-রহস্য ও গুপ্ত কাহিনীর সমন্বয়।

২৮। মুকুট-লুণ্ঠন
সামরিক উপন্যাস—এদেশে বিরল !

২৯। নিরুদ্দেশ রহস্য
ধৈর্য্যশীল পাঠকও হাবুডুবু খাইবেন !

৩০। চীনের পুতুল
পুতুল পুতুল নহে—চীনের ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—যে পুতুলের জন্য বিশ্ববিপর্য্যয় কাণ্ড—স্তম্ভিত হৃদয়ে পাঠ করুন।

৩১। শোণিত তৃষা
ইটালিয়ান গুপ্ত-সমিতির বলশেভিকগণের ভীষণ প্রতিহিংসা-কাহিনী !

৩২। দার্দ্দানেলিসের কয়েদী
রণাঙ্গণের উপন্যাস—উৎসাহের অগ্নিস্রোত বহিতেছে পাঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্দীপিত হৃদয়ে পরিভ্রমণ করিবেন !

৩৩। রূপসীর নবরঙ্গ
প্রেমের নূতন ঢেউ নহে, প্রলয়ের সূচনা

৩৪। জাল মোহান্তের আত্মলালা
বিপর্য্যয় কাহিনী—এ স্বপ্ন না সত্য ! অতি ভীষণ চক্রান্ত, অসাধ্যসাধনে প্রাণপণ, বিজ্ঞানবলে অলৌকিক কাণ্ড !

৩৫। সৈনিকের কর্ম্মফল
স্তব্ধ হৃদয়ে এই হৃৎকম্পকাহিনী পাঠ করুন—বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অজানা-রাজ্যে যাইবেন।

৩৬। খোদার উপর খোদকারী
জাল মোহান্তের অলৌকিক কাণ্ড—ছদ্মবেশে তিব্বতের লামা সাজিয়া জন্মান্তর রহস্য ভেদ। বিপর্য্যয় লীলা—চমক মুহুর্মুহু।

৩৭। চীনের চক্র
রাজনৈতিক প্রহেলিকাময় নবন্যাস ! ষড়যন্ত্রের উপর ষড়যন্ত্র জাল—এ রহস্য উদ্ঘাটন মানবের অসাধ্য।

৩৮। হীরার লহর
যেমনি ঘটনাবৈচিত্র্য—তেমনি রহস্য সংঘর্ষ ! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি না হয় ক্ষতি নাই—কিন্তু বিস্ময়ের বন্যায় ভাসিয়া যাইবেন।

৩৯। কুতের অবরোধ
রণাঙ্গনের তীব্র উদ্দীপনামদির উপন্যাস !

৪০। রূপসী ঋণ-রঙ্গিণী
রমণীর প্রেমরঙ্গ ত অনেক পড়িয়াছেন, এবার ঋণ-রঙ্গে তাঁহারা কতটা বাহাদুরী লইতে পারেন দেখুন !

৪১। জালের জাহাজ
রহস্য বোঝাই বিরাট বাষ্পপোত আসিয়াছে—যাহার যত প্রয়োজন তত পাইবেন।

৪২। আর্ম্মেনিয়ার মর্ম্মভেদ
তুরস্কের প্রভাব হইতে আর্ম্মেনিয়াকে উদ্ধারের জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দের রণায়োজন !

৪৩। অদ্ভুত আবিষ্কার
বিজ্ঞানকে পরাজিত করিয়া প্রেমের মনস্তত্ত্ব বিকাশিত। এরূপ উপন্যাস সাহিত্যে বিরল !

৪৪। নাবিক বধূ
লোমাঞ্চকর রহস্যজাল-সমাচ্ছন্ন নবন্যাস

৪৫। রণাঙ্গণে রিপোর্টার
বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়ের জলন্ত বর্ণনা—উপন্যাসের ও ইতিহাসের রস একাধারে।

৪৬। শমন সহচরী
মৃত্যু-সঙ্গিনীই বটে। দর্শনেই বিভীষিকা আসিতেছে—হৃদকম্প কাহিনী

৪৭। চিকিৎসা সঙ্কট
চিকিৎসা না হত্যা—প্রহেলিকা না বিভীষণ চক্রান্ত—নির্ণয় করা অসাধ্য।

৪৮। জাল মুসলমান
চতুর চূড়ামণি দস্যুরাজ প্রমারের নূতন ছদ্মবেশ। মুসলমান-রাজ্যে মসজেদ মধ্যে গভীর নিশীথে ইংরাজ পর্য্যটকের গুপ্তহত্যা ! মৃত সুলতানের সংরক্ষিত বিপুল হীরক জহরতরাশি মরুবক্ষস্থ ওয়েসিস হইতে অপহরণ ! মরুপ্রান্তরে আরব সর্দ্দারের পৈশাচিক অনুষ্ঠান !

৪৯। চোর সদাগর
ফরাসী দস্যু মহামহোপাধ্যায় 'ছুঁচোর' গুপ্ত ব্যবসায় ! চীনদেশ হইতে সদাগরী জাহাজে অদ্ভুত কৌশলে অবৈধ ভাবে লণ্ডনে অহিফেনের আমদানী।

৫০। মহতের পুনর্জীবন
ডাঃ নিকোলার বিশ্বস্তম্ভিত কাণ্ড—কল্পনা বিপর্য্যয় কাহিনী—বিস্ময়ে পাগল হইবেন।

৫১। কারা রহস্য
গুপ্ত রহস্য সুপ্রকাশ—পাশবশক্তির তাণ্ডবলীলা।

৫২। গ্রহের ফের
চক্রান্তের উপর চক্রান্ত—বিস্ময়ের আগ্নেয় গিরি।

৫৩। উড়ো সঙ্কট
এরোপ্লেনের রহস্য-বিপর্য্যয় কাহিনী ! ঘুমের স্বপ্ন নহে, বিস্ময়ের প্রবল বন্যা

বিচিত্র বাঁধাই—শোভন সংস্করণ!

বাঁধাই বাহার অপাঠ্য আড়াই ফর্ম্মার উপন্যাস সগৌরবে যে বাজারে ১॥০, ২৲, ৩॥০, ৫৲ মূল্যে বিকাইতেছে—
সেই বাজারে বসুমতী সিরিজের কত বড় বড় শিক্ষাপ্রদ উপন্যাসরাজি কেমন সুন্দর বাঁধাই কত সস্তা দেখুন।

জাতীয় কলেজের অধ্যাপক
কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্তের

১। আপন পর

বাঙ্গালীর ঘরে ছবি। ইহাতে দেখিবেন মায়ারাজ্যের সেই নিত্যনব লুকোচুরি কৌতুক—কে আপন কে পর? উপহারে প্রিয়জনরঞ্জন!

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক সরোজ বাবুর

২। বিদ্রোহী

স্বপ্নের ফুলের মত প্রেমের তুষার পাত। নারী-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, প্রেমের বিকাশ, চরিত্র বিশ্লেষণ মাধুরী।

রসরাজ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩। ডিউক ভাবচাঁদ

আর্টের চূড়ান্ত নিদর্শন—লালসার তীব্র জ্বালাময়! সাবাস সাবাস! জয় প্রেমিকার জয়! রসের রসগোল্লা—লালসার তীব্র জ্বালা!

৪। জেলখানা

বিলাতী বদমাসগণের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী। জেলের বিলাতি রঙ্গিনী। বিচিত্র রঙ্গ। বীভৎস রসের তাণ্ডব-লীলা

৫। সম্পত্তিরক্ষা

খুড়ার চালবাজীতে ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বস্বান্ত! উঃ কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! আরঙ্গজেব পরাজিত—পশুপতি বিধ্বস্ত!

৬। মদনপিয়াদা

পেয়াদার শ্বশুরবাড়ী অভিযান! আদালতের হুমকী। সাহেব বিষম রঙ্গ।

লাঞ্ছিত স্বদেশী-নেতা বিধু বাবুর

৭। পাপিষ্ঠা

রমণীর আত্মদান। এ কি ব্যাভিচার না ভ্রান্তি, প্রেমের সম্মোহন ছবি।

৮। বনবালা

প্রেমের ডালা! নব প্রণয়ের অনুরাগে সম্মোহিত অভিমানে পুলকিত স্বপ্নময় উপন্যাস! প্রেমের বিচিত্র অভিযান!

৯। সুভদ্রা

প্রেমের পূর্ব্বরাগ, প্রেমিকার আত্মদান, ক্ষত্রিয়ের গন্ধর্ব্ববিবাহ, বীরপত্নীর সমর অভিযান। বীরাঙ্গনার বীরত্বলীলা।

বণলতা প্রণেতা তারকনাথ গাঙ্গুলী প্রণীত

১০। বিধিলিপি

বিবাহের বরের নীলাম, পণপ্রথার অসহ্য জ্বালা। ক[illegible] হত[illegible]।

সাহিত্য [illegible]

১১। [illegible]

বন্ধুপ্রীতি সমাজজ্ঞানে কত উ[illegible] দেখুন। প্রাচীন ও নবীনের সম্মোহন দ্বন্দ্ব

যশস্বী গল্পলেখক নারায়ণ বাবুর

১২। লক্ষ্মীছাড়া

সমাজিক নানা কেলেঙ্কারীর নানা লীলা যে সমাজ দুর্ব্বলের শক্ত বন্ধনের পদলেহক তাহার করাল ক[illegible]!

বসুমতী সম্পাদক হেমেন্দ্র বাবুর

১৩। হৃদয়ের শ্মশান

নিরাশ প্রেমিকের প্রত্যাখ্যানের আত্মকাহিনী। সে সর্ব্বনেশে ভুল—যে ভুলে প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, ভালবাসা উড়িয়া যায় সোহাগ গলিয়া যায়, প্রেমময় জীবন মরুভূমিতে পরিণত হয়—সেই ভুল! সেই ভ্রম-প্রহেলিকাময় উপন্যাস!

সাহিত্যাচার্য্য সরোজনাথ ঘোষের

১৪। মহত্ত্বের মূল্য

গল্পের মঞ্জুষা, স্বপ্নের পারিজাত, ভক্তির মন্দাকিনী, আদর্শের অমরাবতী, সৌন্দর্য্যের নন্দনকানন!

১৫। রসাল

রসের সমুদ্র—পাঠে প্রাণ হবে ভরপুর! যদি আহ্লাদে অট্টহাসি হইতে চান—দমভোর হাসিয়া প্রাণকে হালকা করিতে চান ত' সর্ব্বাগ্রে পড়ুন।

১৬। কুলকামিনী

প্রেম লীলামণ্ডিত সুধাধারা।

১৭। হেমপ্রভা

প্রেমের রাণী, রূপের খনি, বিদুষী বুদ্ধিচাতুরী। সংসারের জ্বালা নিবৃত্তি

১৮। চিত্র

মনোরম গল্পগাথা। গার্হস্থ্যচিত্রের সমুজ্জ্বল দৃশ্য! অবশ্যই আনন্দপ্রদ।

১৯। পাপের পরিণাম

সমাজহিতৈষী গ্রন্থকার পাপীর জন্য যে শাস্তিবিধান করিয়াছেন তাহা শিক্ষণীয় উপেক্ষনীয় নহে।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রাইডার হ্যাগার্ডের সেই সর্ব্বজন সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস—প্রবীণ ঔপন্যাসিক রায় জলধর সেন বাহাদুর প্রণীত

২০ আয়েশা কোয়াটার মেইন

ইংরাজী সাহিত্যে যে উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল—যাহা য়ুরোপের সকল ভাষায় অনূদিত হইয়া বিশ্বসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে—সেই সর্ব্বজন চমৎকার চির-নবীন উপন্যাসের আর নূতন পরিচয় কি দিব? মানব কল্পনাতীত অসাধ্য সাধনের এমন বিপর্য্যয় কাহিনী আর কোন উপন্যাসে পাইবেন না! পাঠে হৃদয়ে কর্ম্মের নব উদ্দীপনা! বিদ্যুৎপ্রবাহে সঞ্চারিত হইবে! কৌতুকাবহ সংঘর্ষময় রোমাঞ্চ প্রেমকুঞ্জের সম্মোহন ছবি! জীবনের মমতা বিসর্জন দিয়া মানুষ কি অসাধ্য সাধনের প্রয়াস অনুষ্ঠান করিতে পারে—তাহার চরম নিদর্শন! চমকে বিদ্যুৎ বহিতেছে—মুহুর্মুহু সন্ত্রস্ত চমকিত হইবেন

ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত

২১। মঞ্জরী

নবীন সমাজের ফুলের মতন উপন্যাস প্রেমের অমিয় লীলামাধুরী, স্বপ্নের কুহু কল্পনাকে পরাজয় করিয়া ফুটিয়াছে

আবার একত্রে ২১ খানি উপন্যাস ১০৲ দশ টাকা।

রাণী-ইউজিনীর
বৈঠক

লাটে লাটে গুদাম সাবাড়! প্রতি লাট ॥০ আট আনা!!

৯নং লাট :—

স্বদেশ-প্রেমের পুণ্য-জ্যোৎস্না।—
সেই বিখ্যাত ভারত-সমস্যা

১। খেলাফৎ সমস্যা
যে তুর্ক প্রহেলিকায় সমগ্র জগৎ সন্ত্রস্ত তাহারই মূর্ত্ত ইতিহাস।

২। করাচার বিচার
রাজনৈতিক গগনের উল্কা।

১০নং লাট :

নবযুগের অবতার মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের

১। উদ্দীপনাময় বক্তৃতাবলী

২। মসলেম জননায়ক
মসলেম সমাজের অবশ্য পাঠ্য।

১১নং লাট :—

১। আরাম
সাহিত্যের চাটনী—কাব্যের মদিরা।

২। প্রণয়-প্রসঙ্গ
ভালবাসার লীলা—প্রেমের খেলা।

৩। প্রণয় প্রলাপ
কাব্যরস সুধাধারা—হাসির বাহার।

১২নং লাট :—

১। বৈদ্যনাথ কথা
মাহাত্ম্য, ইতিহাস ও স্বাস্থ্য-সম্পদ।

২। প্রকৃতি
প্রকৃতি দেবীর লীলামাধুরীময় উপন্যাস

৩। আমি কে
আমিত্বের প্রসারে আত্মজ্ঞান উদ্দীপিত

৪। সোরাব রুস্তম
সেই চিরন্তন প্রেমের সম্মোহন কাহিনী

১৩নং লাট :—

১। সত্যনারায়ণ
মেবাখণ্ডের প্রাচীন পুঁথিদৃষ্টে মুদ্রিত।

২। বাসনার সমাধি
এরোপ্লেনে চড়িয়া কল্পনারাজ্যে পরিভ্রমণ করুন।

৩। প্রবোধ রত্নমালা
প্রাণমাতোয়ারা কাব্যমাধুরী ধারা।

১৪নং লাট :—

১। আশা ও কল্পনা
কল্পনার কল্পনালোকে বিচরণ করুন

২। আরাধনা
ভক্তিমাধুরী ধারা—শান্তি নিলয়।

৩। কিশোরী মিলন
পুলকের বন্যা বহিতেছে।

৪। নীহার
ক্ষুদ্র উপন্যাস—ক্ষুদ্র হলেও মনোরম।

১৫নং লাট :—

১। মুসাবিদা
সর্ব্ববিধ দলীল লিখন প্রণালী—ব্যবসায়ীর নিত্য প্রয়োজনীয়।

২। চিত্রগুপ্ত
যাহার নিকট জীবনের হিসাব নিকাশ দিতে হইবে তাহারই কাহিনী

১৬নং লাট :-

১। পদরাগ
কবিবর ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধুরী ঝঙ্কারে পুলক তরঙ্গে আত্মহারা হইবেন। সুদৃশ্য বাঁধাই।

২। ভারত প্রসূন
স্বদেশ-প্রেমের কবিতালহরী।

১৭নং লাট :—

কবিবর ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

১। সপ্তস্বর
কবিতার জ্যোৎস্নালোকের পরিস্ফুট মাধুরী সুন্দর বাঁধাই।

২। অনিলা
বর-বদলের কৌতুক রঙ্গ।

১৮নং লাট :—

কৃতবিদ্য ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রণীত

১। ম্যালেরিয়া
ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়।

২। পুষ্পাঞ্জলি
সুরসিক কবি রসময় লাহা প্রণীত চতুর্দ্দশপদী কবিতার লহরী।

১৯নং লাট :—

পুলিস কোর্টের উকীল—নাট্যকার সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

১। যৎকিঞ্চিৎ
হাসির লহরলীলা—রসের ফোয়ারা।

২। শ্মশান
বাঙ্গালার শ্মশানের সকরুণ কাহিনী।

২০নং লাট :—

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

১। খুড়োমা

২। প্রায়শ্চিত্ত
সেই সর্ব্বজন পরিচিত মনোরম উপন্যাস বাঁধি

২। প্রাণের হিসাব
অকিঞ্চনের আত্মনিবেদন।

আবার একত্রে ২০টী লাট ১০৲ স্থলে ৯৲ নয় টাকা মাত্র।

[illegible]